পাঁচটি
ঐতিহাসিক উপন্যাস

শ্রীপারাবত

পাঁচটি
ঐতিহাসিক উপন্যাস

শ্রীপারাবত

পাঁচটি ঐতিহাসিক উপন্যাস

শ্রীপারাবত

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
(প্রকাশন বিভাগ)
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

পরিবারের সকলের উদ্দেশে--

সূচি

তুতনখামেনের রাণী

সব সময় এক অজানা আশঙ্কায় বুক কাঁপে অনখেসেন-অটেনের, কতই বা বয়স তার? কৈশোর অতিক্রম করতে চলেছে সবে। সে নাকি অপরূপা রূপসী। মা নেফেরতিতির চেয়েও। একথা বিশ্বাস হয় না তার। আরও ছোটবেলায় মায়ের মুখের দিকে সে তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকত। মা বলতেন, কি দেখছিস অত? লজ্জিত হয়ে সে উত্তর দিত, তোমাকে। মা হেসে তার গাল টিপে দিয়ে চলে যেতেন। দু'দণ্ড কি মেয়ের কাছে বসার উপায় ছিল? কত কাজ তাঁর। তিনি যে মিশরের ভাগ্যবিধাতা ফ্যারওর পত্নী। তিনি রাজ্ঞী। তাছাড়া তাঁর রয়েছে আরও পঞ্চকন্যা।

অনখেসেন-অটেনের জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর নাম মার্ত-অটেন। সেও কম সুন্দরী নয়। মার্ত-এর পরের জন হ'ল মকত-অটেন। সে তো জীবন্মৃত। চিররোগী সে। একটি অন্ধকার কক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে দিনের পর দিন কাটে তার। এখন থেকেই সে যেন পিরামিডের অভ্যন্তরে সমাধিস্থ। প্রাসাদের মানুষগুলোর মনের ভেতরেও বুঝি ঘুটঘুটে অন্ধকার বিরাজ করছে। সব সময় প্রচ্ছন্নভাবে একটা কিছু ঘটে চলেছে। চোখে দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না, অথচ অনুভব করা যায়। ভীষণ ভয় করে তার মাঝে মাঝে। একটা ষড়যন্ত্র যেন—একটা চক্রান্ত। কিসের চক্রান্ত বুঝতে পারে না। মায়ের ওই সুন্দর চোখের দৃষ্টির মধ্যেও অস্থিরতা। পিতা অখেন-অটেন মাঝে মাঝে পাগলের মতো ব্যবহার করেন। চিৎকার করে ওঠেন। বলেন,—আমি মিশরের ফ্যারও, সবার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। নীলনদের স্রোত আমার আদেশে প্রবাহিত হচ্ছে। আমি অটেনের জীবন্ত প্রতিনিধি। আমি তাঁর পুত্র।

পিতার এই চিৎকারে শঙ্কিত হয় অনখেসেন। তার চেয়ে সে যখন বাঁদীদের সঙ্গে খর্জুর বীথিকার নীচ দিয়ে বালুকাময় প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায় তখন খোলা হাওয়ায় তার মনের অন্ধকার দূর হয়ে যায়। নিজেকে ভীষণ হালকা লাগে। প্রাসাদের কথা মনেও থাকে না। ভাবে, পৃথিবীটা কি সুন্দর।

কিন্তু বড় অস্থায়ী এই সময়টুকু। প্রাসাদে ফিরে আসার কথা মনে হতেই মন আবার ভারী হয়ে ওঠে। বুকের ভেতরে বাসা বাঁধতে থাকে সেই অজানা শঙ্কা। প্রাসাদে ফিরলে একটা কালো ছায়া তাকে ঘিরে ধরতে চায়—টুঁটি চেপে ধরতে চায়।

এই সময় একদিন শোনা গেল, তাদের বৈমাত্রেয় ভাই স্মেনখকরের সঙ্গে মাত-অটেনের বিয়ের কথাবার্তা চলছে। শুনে মনটা বেশ খুশি হয়ে উঠল। ভালই হবে। ভাইদের সঙ্গে বোনেদের বিয়ে হলে খুব মজা। বাইরে কোনো অজানা পরিবারে চলে যেতে হয় না। তাই বোধহয় তাদের বংশে প্রথাটা চালু হয়েছে। তাদের পিতামহ তো নিজের কন্যাকেই বিয়ে করে বসেছিলেন। কাকে সম্প্রদান করবেন কন্যা? অমন অভিজাত পরিবারই বা কোথায়? বিবাহ দিতে হলে সেই সুদূরে। সেই সিনাই কিংবা আরও কোন দূর দেশে। অনখেসেন জানে, স্মেনখকরে হবে পরবর্তী ফ্যারও। অর্থাৎ মার্ত হবে সম্রাজ্ঞী—এখন তাদের মা নেফেরতিতি যেমন।

স্মেনখকরের সঙ্গে বিবাহের সংবাদে প্রসন্ন তার অন্তরকে মার্ত-অটেনই আবার দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তুলল।

বলল—যার বিয়ে তার চেয়ে তোরই দেখি বেশি আনন্দ।

—কেন? তোর হচ্ছে না?

—কি জানি।

—বাঃ, এ আবার কেমন কথা।

—তুই জানিস, মায়ের সঙ্গে ফ্যারওর ঝগড়া চলছে?

—ঝগড়া? জানিনা তো।

—বাবা মাকে একটুও সহ্য করতে পারে না।

—কিন্তু আমি যে শুনেছি—

—শুনেছিস, মায়ের ওপর বাবার অগাধ ভালবাসা। ওসব কথা ভুলে যা। ওসব প্রথম জীবনের ব্যাপার।

—কিন্তু মা তো এখনও সুন্দরী।

—তাতে এসে যায় না। বিরোধটা হয়েছে ধর্ম নিয়ে। বাবার বিশ্বাসকে মা এখন আর কিছুতেই মানতে পারছে না।

—কেন?

—অটেন দেবতাকে মায়ের পছন্দ নয়।

—সেকি! অটেন দেবতা যে সর্বব্যাপী। তিনি যদি প্রতিদিন উদিত না হতেন তাহলে পৃথিবী চিরকাল অন্ধকার থেকে যেত।

—এ তো শোনা কথা বলছিস। তুই কি কিছু বুঝিস?

—আমি কি করে বুঝব?

—তবে? আমি একটু একটু বুঝি। পড়াশোনা করছি। প্যাপাইরাসের ওপর লিখতে শিখেছি আজকাল।

—সত্যি? কে শেখালো?

বোন মার্ত সলজ্জ হেসে পাল্টা প্রশ্ন করে—বলতো কে?

—আমি কি করে বলব?

—স্মেনখকরে।

—ওমা, আমি ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখব তো।

—খবরদার। ও বলতে মানা করেছিল। বলেছিল ফ্যারওর স্ত্রী হতে হলে একটু একটু করে লেখাপড়া শিখে রাখা ভাল।

—তাই বুঝি? ইস, আমারও ফ্যারওর রাণী হতে ইচ্ছে করছে।

—ইচ্ছে করলেই তো হলো না। ভাগ্য থাকা চাই। অটেনের আশীর্বাদ।

—মা, এই দেবতাকে পছন্দ করেন না। কাকে করেন তবে?

—সেই আদি কালের অমেন দেবতাকে।

—তিনি কে?

—জানি না। মা তো বলেন, তিনিও ওই একই সূর্য দেবতা। রা নামে যাঁর পরিচয় ছিল এককালে।

—কিন্তু ফ্যারওর সঙ্গে এমন করা কি উচিত?

—কখনো না।

—তুই তাহলে মাকে বুঝিয়ে বল। মা শুনবে।

—আমি বলেছি। মা শোনেনি। মা বোধহয় ভাবেন, যতদিন তাঁর রূপ রয়েছে, বাবা তাঁর বশীভূত। স্মেনখকরে হেসে হেসে বলে, পুরুষদের তো তোমার মা চেনেন না। আমার মা হাড়ে হাড়ে চিনত। আমার মা রাণী হবার জন্যে জন্মায়নি। সাধারণ ঘরের মেয়ে ছিল। তাই অকালে মরল।

অনখেসেন বলে—এ কথার অর্থ।

—অতি সহজ। রূপের অত দেমাক ভাল নয়।

—আমি আজই মাকে বলব।

—না। তোকে কিছু বলতে হবে না।

অনখেসেন কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে—আমার কেমন ভয় ভয় করে।

মার্ত-অটেন বলে—আমার কথায় কথায় অত ভয় করে না। ভয় পেলে রাণী হওয়া যায় না।

—তুই মাকে ভালবাসিস?

—না।

অনখেসেন অবাক হয়। কারণ মা নেফেরতিতি তাদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখলেও তাঁর প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব না করে পারে না সে। জানে সে, ওই সুন্দরী নারীর গর্ভে একদিন সে স্থান পেয়ে তারই রক্তে মাংসে গড়ে উঠেছিল তিল তিল করে। হয়ত স্তন্য পানও করেছিল মায়ের। সঠিক জানে না সেকথা। কারণ পূর্বদেশ থেকে নিয়ে আসা অনেক ক্রীতদাসীর বুকেও দুধ থাকে। তবু নেফেরতিতি যে তার মা একথা তো কেউ অস্বীকার করবে না। একথা ভাবতেও ভাল লাগে। সে লক্ষ্য করেছে মায়ের ওই প্রখর ব্যক্তিত্বের আবরণ একটু সরিয়ে দিতে পারলে মরুদ্যানের ইঙ্গিত মেলে। কত সময় সে মনের ভয়কে জয় করে মাকে জড়িয়ে ধরেছে। খুব শৈশবে মা তার গাল টিপে দিয়ে একটু হেসে চলে যেতেন। কিন্তু বড় হবার পরও এভাবে জড়িয়ে ধরলে রূঢ়ভাবে কখনো ঠেলে দিতে পারেননি।

একটু হেসে প্রশ্ন করেছেন—কি হ'ল, জড়িয়ে ধরলি যে?

—এমনিতে। রাগ করলে মা?

—না। ছেড়ে দে। কাজ আছে অনেক।

তবু মার্ত মাকে ভালবাসে না। অনখেসেন মুচকি হেসে বড় বোনকে দুষ্টুমী করে বলে—মাকে না হয় ভাল না বাসলি। কিন্তু স্মেনখকরেকে?

—তাকেও ভালবাসি না।

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি খায় অনখেসেনের মন। সে বলে—কি বললি?

—ঠিকই শুনেছিস। ওকে ভালবাসি না।

—অথচ ওকে তুই বিয়ে করবি ওর পত্নী হবি। শুনছি ফ্যারও ক'দিন পরে ওকে সহশাসক করে নেবেন। তার মানে, তখন তুই রাণীও হবি।

এবারে মার্ত খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে। বলে—তাতে কি হয়েছে? রাণী হবার সঙ্গে ভালবাসার কি সম্পর্ক? তোর কি তাই ধারণা? দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। একটার সঙ্গে আর একটার সম্পর্ক নেই।

অনখেসেন ভেবে পায় না কি উত্তর দেবে। আসলে ভালবাসা কি জিনিস সে নিজেও তেমন জানে না। আলোচনা শুনেছে শুধু। আর বয়ঃসন্ধিকাল থেকে বুকের ভেতরে একটু একটু অনুভব করছে যেন। একজন বেশ থাকবে তার সম্পূর্ণ একলার এবং অবশ্যই সে হবে পুরুষ। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কথা শুনে মনের মধ্যে সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যায়। তবে বোধহয় নারীর হৃদয় ওই বহুদূরে মরুভূমির বুকে দণ্ডায়মান নিঃসঙ্গ পিরামিডের মতো যার ত্রিভুজাকৃতি হৃদয় থেকে অটেনের তপ্ত কিরণ বিচ্ছুরিত হয় শুধু। হৃদয়ে প্রবেশের পথ পায় না কখনো। যেটুকু উত্তাপ প্রবেশ করার জন্য ছটফট করে, প্রবেশের পথ না পেয়ে উপরের স্তরে আটকে যায়। তলদেশে পৌঁছবার পথ খোঁজার আগেই সূর্যাস্তের ফলে শীতল হয়ে যায়।

সে বলে—তবে যে দেখলাম সেদিন, তুই ওকে দেখে এগিয়ে গেলি ওই খেজুর বনের দিকে। আড়ালে গিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরলি। তারপর ও তোকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল বাহু দিয়ে, পা দিয়ে, মুখ দিয়ে—সমস্ত দেহ দিয়ে।

মার্ত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ছোট বোনের চোখের দিকে চেয়ে বলে—তুই দেখেছিস?

—হ্যাঁ। আমি যে মাঝে মাঝে পালিয়ে ওদিকে যাই। যখন বুকটা ভারী হয়ে থাকে, যখন একা একা ভালো লাগে না তখন চলে যাই সবার অলক্ষ্যে। ওইভাবে তোদের দেখতে পেয়েছিলাম সেদিন। মনে

হলো, তোরা পৃথিবীকে ভুলে গিয়েছিস। তারপর স্নেহখকরে তোর হাত ধরে টানতে টানতে একটা বিরাট পাথরের আড়ালে চলে গেল। তোর মুখ দেখে মনে হলো, খুব আনন্দ হয়েছিল। তুই ওর সঙ্গে চলে গেলি। বাধা দেবার চেষ্টাও করলি না। ওটা কি ভালবাসা নয়?

—না না। ওটা অন্য জিনিস। তবে সেদিন যে প্রত্যাশায় গিয়েছিলাম তাও পূরণ হয়নি। তুই আগাগোড়া ভুল করছিস। অটেনের কৃপায় তোর ভুল ভাঙবে। ভালবাসা অন্য জিনিস। তার স্বাদ আলাদা। তুই বুঝবি না। ভাল না বেসেও ফ্যারও অনেক নারীর সংস্পর্শে আসেন। আবার ফ্যারওকে ভাল না বেসেও তাঁর রাণী হওয়া যায়। কোনো বাধা নেই।

অনখেসেন এভাবে মার্তকে প্রশ্ন করে—ওটা যদি ভালবাসা না হয়, তাহলে ভালবাসা কি? তুই যখন বলছিস ওটা ভালবাসা নয় তখন কোন্‌টা ভালবাসা তাও নিশ্চয় জানিস।

মার্ত-অটেন এবারে একটু অসহায় বোধ করে। তারপর ছোট বোনের চোখের নিষ্পলক দৃষ্টির দিকে চেয়ে অস্ফুট স্বরে বলে—ফ্যারওর প্রধান পুরোহিত, তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা অয়-এর বাড়িতে গিয়েছিস কখনো?

—কতবার। অয় আমাকে নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছেন।

—আমি মাত্র একবার গিয়েছি। আমি যে বড়। সেইসময় একজনকে দেখেছিলাম সেখানে।

—কাকে?

—অয়-এর ছোট ভাইয়ের ছেলেকে।

—তাতে কি হয়েছে?

—সেও আমাকে দেখেছে।

—বেশ তো। এমন কত লোককেই তো কত লোক দেখে।

—হ্যাঁ, কিন্তু এ দেখা অন্য দেখা। জীবনে বোধহয় একবারই এমন দেখা দেখতে পাওয়া যায়। আমাকে দেখেই সে ভালবেসেছিল। আমিও তাকে।

অনখেসেন ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করে—কোথায় সে?

—জানি না। আরও তিন চারবার সে আমাকে দেখেছে। আমিও তাকে দেখেছি। বুঝতে পারি, কত কষ্ট করে সে আমাকে দেখার সুযোগ করে নিত।

অনখেসেন এক সঙ্কুচিতভাবে প্রশ্ন করে—সে তোকে স্পর্শ করেছে?

—হ্যাঁ। নীলনদের পাশে ওই শ্যামল ক্ষেত্রে। ওখানে অনেক গাছপালায় ঘেরা জায়গা পৃথিবীকে যেন পৃথক করে রাখে। পৃথিবীর মলিনতা ওখানে গিয়ে পৌঁছতে পারে না, এত পবিত্র ওই স্থান।

—তুই সেখানে গিয়েছিলি?

—হ্যাঁ।

—ফ্যারওর কন্যা হয়ে? একা?

—হ্যাঁ। একা, সবার অজ্ঞাতে। তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করার সাধ্য আমার ছিল না। কোথায় তখন ফ্যারওর কন্যার মর্যাদা? তার কোনো অস্তিত্ব থাকে না। পৃথিবীতে তখন শুধু একজন পুরুষ, আর আমি তার একমাত্র রমণী। সেইখানে আমি ছুটে গিয়েছিলাম ওর পাশে। ও যে আমায় ডেকেছিল।

রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে থাকে অনখেসেন তার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর দিকে। এ যেন অজানা অচেনা কোনো নারী যে এক ভিন্ন জগতের কথা শোনাচ্ছে।

সে প্রশ্ন করে—তারপর?

—সে আমাকে স্পর্শ করল। আমি কি করে যেন অনুভব করেছিলাম সে আমাকে স্পর্শ করবে। এটুকুও অনুভব করেছিলাম, এই স্পর্শটুকুর জন্যে আমি অনাদিকাল অপেক্ষা করেছিলাম। তারপর ধীরে ধীরে সে আমার দেহ মনের মালিক হয়ে গেল। আমি নিশ্চিন্ত হই সবটুকু উৎসর্গ করে।

—তারপর?

—তারপর আর কি?

—আর দেখা হয়নি?

—না।

—কেন?

—কি করে হবে? সে যে চিরতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। অদৃশ্য হবার আগের দিন অয় আমাকে কঠোর স্বরে বলেছিল—ভুলে যেও না মার্ত, তুমি দেবমহিষীর মতো। তোমাদের বংশে কিছুদিন আগেও দেবমহিষীর প্রথা প্রচলিত ছিল। একজন রাজকন্যাকে নির্দিষ্ট রাখা হ'ত ভবিষ্যতের রাজমহিষীরূপে। যাঁর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হবে তিনিই হবেন ফ্যারও। কিন্তু তোমার পিতামহ তৃতীয় অমেনফিস সেই প্রথা ভেঙে দিলেন। তিনি সাধারণ ঘর থেকে নিয়ে এলেন রাজ্ঞীটিকে। তিনি হলেন প্রধান মহিষী। তবু তোমাকে সবাই দেবমহিষীর মর্যাদা দেয়। এক মুহূর্তের জন্যেও বিস্মৃত হয়ো না একথা। তোমার মনকে রাখতে হবে অটল—পিরামিডের মতো। তাই বলছি, যখন তখন যাকে তাকে দেখে উতলা হতে নেই। অন্তত তোমার সেটা সাজে না।

—অয় তোকে হঠাৎ একথা বলল কেন?

—সেদিন আমিও ওর কথার মাথামুণ্ডু বুঝিনি। তবু বুকের ভেতরে ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, এ যেন কোনো অশুভ সঙ্কেত। সেই সুদর্শন তরুণের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। কিছুদিন পরে অয়-এর কথার মর্মার্থ বুঝতে পেরেছিলাম।

—কি বুঝেছিলি?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মার্ত বলে—অয় চায়নি আমি সেই তরুণকে ভালবাসি। তাই সরিয়ে দিয়েছিল তাকে।

—কোথায়? ন্যুবিয়ায়? সিরিয়ায়? নাকি ইজিয়ান দ্বীপমালায়?

শুষ্ক হেসে মার্ত বলে—না। অতদূর যেতে হবে কেন? মরুভূমিতে তো অগাধ বালুকারাশির অভাব নেই। কত পর্বত কন্দর রয়েছে। আর রয়েছে অসংখ্য সমাধিস্থল—এত পিরামিড। এমনিতেই এটা হ'ল মৃতদের নগরী। আর একটা অতিরিক্ত মৃতদেহের সংখ্যা বাড়লে কারও নজরেই পড়বে না।

—এ যে ভাবা যায় না। অয় এমন কাজ করতে পারল?

—হ্যাঁ। না করে উপায় ছিল না। ভ্রাতুষ্পুত্র ফ্যারও হলে যে তার অধীনে থাকতে হ'ত। আমার সঙ্গে তার বিবাহ হলে সে হতো ভাবী ফ্যারও। আর সেটা সহ্য করতে পারেনি অয়। মায়ের গর্ভে কোনো পুত্র সন্তান নেই। আমরা শুধু ছয় বোন। স্মেনখকরে আবার সাধারণ একজন রাণীর গর্ভের সন্তান। আমি তার স্ত্রী না হলে সেও ফ্যারও হতে পারবে না। মিশরের নিয়মই এই। দেবমহিষী প্রথা উঠি উঠি করেও একেবারে উঠতে পারে না।

—অয় নিষ্ঠুরের মতো কাজ করেছে। নইলে তুই যাকে ভালবাসতিস তাকে ফ্যারও করা যেত।

—সে ফ্যারও না হলেও ক্ষতি ছিল না। আমি শুধু তাকেই চেয়েছিলাম, আর কিছু নয় পৃথিবীর আর কিছুর ওপর আমার আজও কোনো আকর্ষণ জন্মায়নি তেমন। জানিনা পরে কি হবে।

অনখেসেন ভাবে, সে কত কম বোঝে। মার্ত-এর প্রতি সহানুভূতি আর শ্রদ্ধায় তার মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

কিন্তু এই দুই উদ্‌ভিন্ন যৌবনা সহোদরার কথা জানতে হলে তাদের দেশ সম্বন্ধে এবং সেই দেশের রাজবংশ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন।

মিশরকে বলা হয় নীলনদের দান। অর্থাৎ এই ভূখণ্ডের উপর দিয়ে যদি নীলনদ প্রবাহিত না হতো

তাহলে সাহারা মরুভূমির দৈর্ঘ্য আরও বিস্তৃত হয়ে আরবের মরুভূমির সঙ্গে একাকার হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু নীলনদ তা হতে দিল না। সে বহুদূরে আফ্রিকার প্রায় অভ্যন্তরের হ্রদরাজি থেকে জন্ম নিয়ে সহস্র যোজন পথ ছুটে এলো মিশরের পরিত্রাতারূপে। কতটুকু পথই বা সে মিশরের ভেতর দিয়ে গিয়ে সাগরে পড়েছে? কিন্তু তাতেই মরুভূমি পরিণত হলো স্বর্ণভূমিতে। আফ্রিকার ভেতরের দেশগুলো থেকে অফুরন্ত পলিরাশি অবিশ্রান্তভাবে বয়ে এনে সে মরুভূমিকে করে তুলল সুজলা সুফলা। তার আগে সে তার গতিপথে ছয়টি প্রপাতের সৃষ্টি করেছে। তার মধ্যে একটি প্রপাত রয়েছে শুধু মিশরের মধ্যে। মিশরের প্রতি নীলনদের পক্ষপাতিত্ব একটু বেশি। নইলে এখানে এসে সে অনেক ধারায় বিভক্ত হয়ে যেত না। এইভাবে সে অনেকখানি অঞ্চলকে প্রাকৃতিক সেচের আওতায় এনে দিয়েছে। ফলে এখানেই ঘটে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার উন্মেষ।

নীলনদের গন্ডিপথ সারা বৎসর জন্মলগ্ন থাকে না। বৎসরের নির্দিষ্ট কিছু সময় তার দুই ধার কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়। তাই এক অতি প্রাচীন কৃষিনির্ভর সভ্যতা গড়ে ওঠে এখানে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয় না এখানকার কৃষকদের। নির্দিষ্ট সময়ে নদীর বুক জলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেইভাবে থাকে বৎসরের অনেক কয়টি মাস। তারপর একসময় পলিমাটি ফেলে রেখে সে অতি সঙ্কীর্ণ হয়ে সাগরের বুকে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তার শীর্ণ জলধারায় প্রতিবিম্বিত হয় মাতৃস্নেহের প্রশ্রয়। সেই প্রশ্রয়ভরা চাহনি নিয়ে সে উৎসুক ভাবে চেয়ে চেয়ে দেখে কৃষকদের কর্মব্যস্ততা। তাদের ফসল ফলানোর উদ্যোগ। প্রকৃতি এখানে খেয়ালি নয়। তাই কৃষকেরা নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ।

কিন্তু তবু কৃষকেরা তেমন সুখী নয়। কারণ বৎসরের অনেকটা সময় তাদের কর্মহীন অবস্থায় বসে থাকতে হয়। ফলে দারিদ্র্য এসে উঁকি দেয় তাদের পরিবারে। আর তখনই আসে ফ্যারওর ডাক—চলো তোমরা ওই দূরের পাহাড়ে। ওখানে তোমাদের জন্য অফুরন্ত কাজ। নিষ্কর্মা বসে থাকতে হবে না।

কৃষকরা জানে, অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে সেখানে। পরিবর্তে পাবে যৎসামান্য পারিশ্রমিক। তবু যেতে হয়। নইলে ফ্যারওর কোপ এসে পড়ে। জানে সেখান থেকে গৃহে ফেরার সময় পারিশ্রমিকের কিছুই প্রায় অবশিষ্ট থাকবে না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অনশনক্লিষ্ট স্ত্রী পুত্র কন্যার চোখের আশার আলো তাদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দপ্ করে নিভে যায়। তবু যেতে হয়। কর্মহীন অবস্থায় ঘরে বসে থেকে চোখের সামনে অর্ধাসনে ক্ষুধার্ত প্রিয়জনের কাতর চাহনি নিজের চোখে দেখতে হয় না। তাই যেতে হয় ফ্যারওর ডাকে। কারণ উপার্জনের হাতছানি রয়েছে তাতে।

তারা যায়। দূর পাহাড় থেকে বিশাল বিশাল প্রস্তরখণ্ড তারা বয়ে আনে তাদের বর্তমান আর ভবিষ্যতের ফ্যারওদের সমাধিস্থল নির্মাণের উপাদানরূপে। এই ত্রিভূজাকৃতি সমাধি মন্দিরের প্রথম সৃষ্টি হয় নাকি বহু বছর আগে ফ্যারও জোসেরের রাজত্বকালে। তাঁরই রাজত্বকালে ইমহোটেপ নামে এমন একজন ছিলেন যাঁর প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী। সেই শুরু। তারপর থেকে প্রতি ফ্যারওর রাজত্বকালে এটি প্রায় নিয়মে পর্যবসিত হ'ল। প্রত্যেকেই নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী ছোট হোক বড় হোক মৃত্যুর পরে বসবাসেব জন্য সুখপ্রদ আগাম একটি বাসস্থান নির্মাণের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সেটি নির্মাণে ব্যর্থ হলে প্রজাবৃন্দের কাছে বুঝি মর্যাদা রাখা দায় হয়ে ওঠে। তাই নদী যখন থাকে জলে টই-টুম্বুর, কৃষকগণ থাকে কর্মহীন, তখন তাদের আজও, এই অখেন-অটেনের রাজত্বেও পাঠানো হয় সেই দূরের পর্বতমালায় যেখানে সারা বছর ধরে অসংখ্য শ্রমিক পাথর কেটে চলেছে অবিরাম গতিতে। কারণ পিরামিড নির্মাণের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নেই। কত অশান্তি গেল, উত্তর আর দক্ষিণের মিশরবাসীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ হলো, কতবার ফ্যারওর সেনাপতিরা সিনাই-এর দিকে অভিযান চালালেন, তবু সুদূর পর্বতগাত্রে ছেনি আর হাতুড়ির শব্দের বিরাম হলো না। সেখানে লৌহের সঙ্গে প্রস্তরের প্রচণ্ড সংঘর্ষে নিরন্তর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে আজও এই অখেন-অটেনের রাজত্বেও।

এই অখেন-অটেনের পূর্বপুরুষেরা প্রায় দুশো বছর ধরে মিশরে রাজত্ব করে এসেছেন।

অখেন-অটেন এঁদের বংশের নবম পুরুষ। এঁরা অনেক যুদ্ধবিগ্রহে অংশগ্রহণ করেছেন। অনেক ব্যবসা বাণিজ্য করেছেন। দেশে সোনার অভাব নেই ন্যুবিয়ার স্বর্ণখনির দৌলতে। কিন্তু রৌপ্যের ছিল একান্ত প্রাদুর্ভাব। এই দুর্লভ সামগ্রী সংগ্রহের জন্য যেতে হ'ল ঈজিয়ান অঞ্চলে। তাছাড়া সিরিয়ার তৈরি অতি সুদৃশ্য সুরা ইত্যাদি রাখার পাত্র নিয়ে আসা হয়। কিন্তু কৃষকদের দুঃখ কাটে না। চিরস্থায়ী হয়ে বাসা বেঁধেছে তাদের দুর্দশা। কারণ অধিকাংশ জমির মালিক হলেন ফ্যারও এবং মুষ্টিমেয় উচ্চ পরিবার। যারা প্রকৃত ফসল ফলায়, জমি কর্ষণ করে তারা মজুর হয়ে সে সব করে। অনেকে জমি বর্গা নেয়। চাষের জন্য অনেক শস্য তুলে দিতে হয় জমির মালিককে।

এই সব অবিচার আর অত্যাচারের জন্য দেশের অধিবাসীদের মধ্যে একটা চাপা অসন্তোষ বিরাজ করে। তবু তারা তাদের নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী গোপনে পূজা করে তাদের আরাধ্য দেবতা অমেনকে। অখেন-অটেন সেই স্বাধীনতাতেও হস্তক্ষেপ করতে চান।

নেফেরতিতির সঙ্গে ফ্যারওর মনোমালিন্য এতটাই বৃদ্ধি পায় যে সেটা পাঁচকান হতে হতে নগরবাসীদের মধ্যেও জানাজানি হয়ে যায়। নেফেরতিতি অমেন দেবতাকে যতই আঁকড়ে ধরতে চান ততই বাধা আসে স্বামীর তরফ থেকে। মায়ের মুখের দিকে চেয়ে অনখেসেনের বুক ফেটে যায়। মায়ের মধ্যে একটা অসহায় ভাব ফুটে উঠেছে যেন। যতই ব্যক্তিত্বসম্পন্না হোন না কেন দেশের শাসকের বিরুদ্ধাচরণ করা বড় কঠিন! তার প্রভাব মনের সঙ্গে সঙ্গে মুখের উপর পড়বেই। মায়ের অনিন্দ্যসুন্দর রূপেও মনে হয় এখন ভাঁটার টান। একদিন সে নিরিবিলিতে পেয়ে মায়ের হাত দুটো চেপে ধরে।

—কি হ'ল? হাত ধরলে যে বড়।

—মা আমাকে তুমি এখনো কি ছোট ভাব?

—না। তা ভাবব কেন? মায়েরা ঠিক জানে মেয়ে কবে বড় হ'ল। তুই দুই বছর আগে বড় হয়েছিলি। মনে নেই শুকনো মুখে চোখ বড় বড় করে আমার কাছে ছুটে এসেছিলি?

অনখেসেনের মুখে সলজ্জ হাসি ফুটে ওঠে। সে বলে—তুমি আমার কথা এড়িয়ে যেতে চাও। তোমার জন্যে আমার বড় দুশ্চিন্তা হয়।

—কেন?

— তুমি জান না? চেপে রাখার চেষ্টা করলেই চাপা থাকে?

মা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যান। সেই সময় তুতনখটেন সেখানে এসে মায়ের পাশে দাঁড়ায়। ডাগর ডাগর চোখ তুলে ও একটু হাসে। অনখেসেনের চেয়ে সে সামান্য ছোটই হবে। তবে ওকে অনখেসেনের ভাল লাগে। ওর চোখের দৃষ্টিতে মায়া মাখানো। অমন দৃষ্টি ফ্যারওর প্রাসাদে কারও নেই। ও একটা ব্যতিক্রম।

মা তুতন্খকে নিয়ে চলে যেতে যান। অনখেসেন বাধা দিয়ে বলে—দাঁড়াও।

এবার মা ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়ের মুখের দিকে ভালভাবে তাকান। জানিনা কি দেখলেন তিনি কন্যার চোখের মধ্যে। বললেন—চাপা যখন নেই তখন প্রশ্ন করে আমাকে মিছিমিছি কষ্ট দেওয়া কেন?

তুতন্খ-এর সামনে অনখেসেন কেঁদে ফেলে। বলে—আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারব না জানি। ধর্মের প্রতি বিশ্বাসকে কখনো বদলানো যায় না। যদি যেত, বলতাম আগের মতো অটেনের আরাধনা শুরু কর। কিন্তু তা যে হবার নয়। তাই আমার বড়ই আশঙ্কা। মার্তের মুখে সেদিন একটা ঘটনার কথা শুনে তোমার জন্যে বড় ভয় হয় মা।

—মার্ত কি বলেছে?

অনখেসেন একবার তুতন্খ-এর মুখের দিকে চায়। সে ছোট হলেও মার্তের ভালবাসার কাহিনী না

বোঝার মতো নির্বোধ বোধহয় নয়। তবে সে পুরুষ। পুরুষদের এই বয়সে নাকি প্রেমের কথা বোঝার বুদ্ধি হয় না। কিন্তু তুতন্‌খকে দেখলে মনে হয় অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ। তাই তাকে নম্র কণ্ঠে অনখেসেন বলে—তুমি একটু ওদিকে যাবে তুতন। মাকে দুটো কথা বলব।

তুতন্‌খ বাধ্য ছেলের মতো ঘাড় হেলিয়ে দূরে সরে যায়। অনখেসেন তখন ধীরে ধীরে মার্তের সেই অপূর্ব প্রেমের কাহিনী শোনালো—পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রাণীরূপে এ পর্যন্ত যা সে শুধু একাই জানত।

অনখেসেনের মুখে জ্যেষ্ঠা কন্যার বেদনার কাহিনী শুনে নেফেরতিতি স্পষ্ট উপলব্ধি করলেন অনখেসেন শুধু কৈশোর অতিক্রম করেছে তাই নয় সে এখন পরিপূর্ণ নারী। মরুদেশের তপ্ত জলহাওয়া বোধহয় এই নারীত্বকে তাড়াতাড়ি এনে দেয়।

অনখেসেনে দেখে, মায়ের চোখে জল টলটল করছে। কন্যার ব্যথায় ব্যথী তিনি হতে পারেননি। হতে চাননি কখনো। তাই বোধহয় দগ্ধ হৃদয়ের অনুতাপ বিগলিত হয়ে অমন অশ্রুর রূপ ধরে চিক্‌চিক্ করছে।

মা বলেন—আমার ভাগ্যে তেমন যদি কিছু থাকে কেউ খণ্ডাতে পারবে না। তার জন্যে তোর উতলা হতে হবে না।

—এ তুমি কি বলছ মা?

—তুই কি সত্যি আমাকে ভালবাসিস?

—ভালবাসব না?

—কেন? আমি তো কখনো মায়ের কর্তব্য করিনি।

—তা জানি না। মার্ত বোধহয় ভালবাসে না। তোমার মেজ মেয়ের কথা আলাদা। বেচারা শুধু রোগে ভোগে। সে অন্যের কথা ভাবার সময় পায় না।

—হ্যাঁ, মক্‌ত-অটেন বড় দুর্বল। মনে হয় বেশিদিন বাঁচবে না। ও তোর চেয়ে এক বছরের বড়, অথচ ওকে মেয়ে বলে মনেই হয় না। বুক দুটো ঠিক ছেলেদের মতো রয়েছে এখনো।

একটু দূরে তুতন্‌খ নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে বাইরে আকাশের দিকে। ওর চোখে মুখে সূর্যাস্তের রক্তিমাভার খেলা। দেখতে খুব ভাল লাগছে। ঠিক যেন দেবপুত্র। ওকে বড় বেশি নিষ্পাপ বলে মনে হয় অনখেসেনের কাছে। মুহূর্তের জন্য তার হৃদয় একটু উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। সে লক্ষ্য করেছে কিছুদিন থেকে তার মা তুতন্‌খকে নিজের কাছাকাছি রাখছেন। স্বামী কর্তৃক অবহেলিত হয়ে তুতন্‌খ যেন তার শেষ আশ্রয়স্থল। অথচ তুতনখের সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক নেই। বরং বলা যেতে পারে তুতন তাঁর স্বামীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তৃতীয় অমেনফিসের অতি বৃদ্ধ বয়সের ফসল। সে যখন পৃথিবীর আলো দেখল তখন বর্তমান ফ্যারও অখেন অটেন পিতার সঙ্গে সহ-শাসকরূপে প্রায় সাত বছর অধিষ্ঠিত। সেই সময়ে সম্রাজ্ঞী টি'র গর্ভে এলে এই সন্তান। টি নিজেই তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে নিদারুণ এক লজ্জা। কারণ তখন তাঁর পুত্রবধূ নেফেরতিতি তৃতীয়া কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়ে ফেলেছেন।

টি'র মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্না রমণী স্বামী অমেনফিসের কাছে কেঁদে বলেছিলেন—এ বড় লজ্জা। আমাকে উদ্ধার কর।

—কিভাবে? শিশু হত্যা করে?

—না না। ছিঃ!

—তবে?

—আমাদের জ্যেষ্ঠা কন্যা সিতামানের গর্ভজাত বলে ঘোষণা কর এই সন্তান। অমেনফিসের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে রাণীর এই কথায়। তিনি উষ্ণ কণ্ঠে বলেন—তোমার গর্ভে আর পুত্র সন্তান হচ্ছে না দেখে তোমারই পরামর্শে নিজের কন্যা হওয়া সত্ত্বেও সিতামানকে বিবাহ করি। কিন্তু তারপরেই

তোমার পুত্র সন্তান হলো। শুধু শুধু সিতামানকে বিবাহ করলাম। জানি, এমন কিছু অনুচিত কাজ করিনি। তবু দেশের মানুষের মধ্যে সাড়া জেগেছিল। সিতামান এখন অমেনের পূজারিণী হয়ে ভালই আছে। তার কত সম্মান। এর মধ্যে আমি তাকে নতুন করে জড়াতে চাই না।

রাণী টি আর কিছু বলতে সাহস পাননি। শিশু সন্তানকে এক দুগ্ধবতী ধাত্রীর হাতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হলেন। এই বয়সে আর ভাল লাগে না।

তবে নেফেরতিতি এসে খুব হেসেছিলেন টি-এর সামনে দাঁড়িয়ে। অথচ এর আগে তাঁর সামনে মাথা তুলতে পারতেন না। কারণ টি-এর ব্যক্তিত্ব আরও প্রখর আরও গভীর। তাই এতদিন পরে টি কে অপদস্থ করার প্রলোভন ছাড়তে চাননি তিনি। কিন্তু তাঁর সামনে এসে যখন দাঁড়ালেন টি তাঁর সমস্ত লজ্জা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আত্মস্থ।

নেফেরতিতির হাসি শুনে তিনি বিস্মিত হবার ভান করে বলেন—হাসছ কেন? এ ধরনের কুৎসিত হাসি ফ্যারও পরিবারে মানায় না।

—না। এমনি দেখতে এলাম আমার নতুন দেবরকে।

—দেখো, ভাল করে দেখে নাও। তোমার স্বামী সহ-শাসক হলেও তার মতি খুব অস্থির। তাই এই পুত্রকে জন্ম দিয়ে আমি ভবিষ্যত বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। ওর জন্যে আমি গর্বিত। পুত্রের জন্ম দেওয়া কম সৌভাগ্যের নয়। তুমিও দেবতার কাছে প্রার্থনা কর আমার মতো যেন পুত্রের জননী হতে পার। তোমার তিনটি সন্তানই কন্যা। জানিনা পরে আরও হবে কিনা। হলেও পুত্রের মা হতে পারবে কিনা কে জানে।

নেফেরতিতির পুত্রের মা হবার সৌভাগ্য সত্যিই হয়নি। ছয়টি কন্যা সন্তানের জননী তিনি। ফ্যারও অখেন-অটেন যতদিন স্ত্রীর রূপে মোহগ্রস্ত ছিলেন ততদিন কিছু বলেননি। কিন্তু পরে ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলতে শুরু করেছিলেন। আর এখন তো প্রধান মহিষীকে সহ্যই করতে পারেন না।

টি-এর সঙ্গে মায়ের এই কথোপকথনের কথা মার্ত ও অনখেসেন শুনেছিল এক ক্রীতদাসীর মুখে। তাই কিছুদিন ধরে তুতন্‌খকে মায়ের কাছাকাছি দেখে ও অবাক হয়েছিল। বলতে গেলে টি তাঁর সদ্যোজাত শিশুপুত্রকে অস্থিরমতি অখেন-অটেনের বিকল্প বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন। তবু সেই তুতন্‌খকে কাছে টেনে নেওয়া নেফেরতিতির পক্ষে অস্বাভাবিক বৈকি। অনখেসেনঅটেন ভাবে, তুতনকে নিশ্চয় ফ্যারওর রোষ থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছেন মা। হয়ত কোনো আভাস পেয়েছেন তুতন্‌খ-এর জীবন সংশয়ের। কত হত্যাই তো ঘটে চলে লোক চক্ষুর অন্তরালে এই সিংহাসনের জন্যে। মা হয়ত ভেবেছেন পিতা তাঁর প্রিয় পুত্র স্মেনখকরের সিংহাসন প্রাপ্তির নিশ্চয়তার জন্য তুতনকে সরিয়ে দিতে চান চিরতরে। পিতার প্রতি প্রতিশোধ নেবার জন্যই হয়ত মা তার পক্ষ নিয়েছেন। শত হলেও তার ধমনীতেও রাজরক্ত প্রবাহিত। স্মেনখকরেকে পছন্দ করেন না মা। তার একটি বিশেষ দোষ রয়েছে। মার্ত একদিন কথায় কথায় বলেছিল সেকথা। সে ঠিক বুঝতে পারেনি। স্মেনখকরের নাকি নারীদের চেয়ে পুরুষদের প্রতি আকর্ষণ বেশি। কথাটা বলে মার্ত খুব হেসেছিল। তারপর বলেছিল, তাতে এসে যায় না। এরপর মার্ত জলের মতো সব বুঝিয়ে দিয়েছিল। আসলে সে যে রাণী হবে তাতেই আনন্দ। স্মেনখকরের দেহের উত্তাপের জন্য সে বিন্দুমাত্র লালায়িত নয়।

মায়ের সঙ্গে অনখেসেনের কথা যখন শেষ হ'ল তখনো তুতন আকাশের দিকে তাকিয়ে। তবে সূর্যের শেষ রশ্মি তার মুখের ওপর ততটা আর রক্তিম নয়।

তুতন্‌খকে ডাকে অনখেসেন। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। নিজের মায়ের কথা তার মনে নেই। বাবার কথাও নয়। তবু সে বেড়ে উঠেছে পরিচারিকাদের তত্ত্বাবধানে। স্নেহ কাকে বলে সে জানে না বোধহয়। নেফেরতিতি তাকে একটু স্নেহ করেন, তাতেই সে বিগলিত। অনখেসেনের কষ্ট হয় তুতনের জন্য। যদি পারত তাহলে তুতন্‌খকে সে বিয়ে করত। অমন সুন্দর মানুষ হয় না। তাকে দেখতে সুন্দর,

মনটিও সুন্দর।

তুতন্‌খ কাছে এসে দাঁড়ালে অনখেসেনের ইচ্ছা হয় তার গায়ে হাত দিতে। মায়ের সামনেই একটা ছুতো করে বলে—তোমার মুখে ওটা কি লেগে রয়েছে? দেখি।

নেফেরতিতি বলে ওঠেন—কোথায়? কিছু তো নেই।

অনখেসেন ততক্ষণে তার মাথায় এক হাত দিয়ে সামান্য নীচের দিকে নামিয়ে আর এক হাত দিয়ে গালের ত্বক স্পর্শ করে বলে—এবারে ঠিক আছে।

নেফেরতিতি একটু হাসেন?

—হাসলে যে?

—না, চিররোগী মক্‌ত-অটেনের মতো তোর বুক তো মসৃণ নয়। বুকের ভেতরে অনেক ভালবাসা সঞ্চিত রয়েছে—অনেক স্বপ্ন।

অনখেসেন অপ্রস্তুত হয়ে বলে—কি যে বল মা।

—কিছু না। চল তুতন।

অনখেসেন সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের চলে যেতে দেখে। আবার নিঃসঙ্গতা। আসলে তাঁরা ছয় বোন হলেও সবাই নিজের মতো থাকে। সে চায় সবাইকে নিয়ে একটু আমোদ আহ্লাদ করতে। কিন্তু তারা অন্যরকম। তাই একটা কিছু নূতনত্ব চাই।

সেই নূতনত্বের আস্বাদন অনখেসেন পেল কিছুদিনের মধ্যেই। ফ্যারও অখেন-অটেন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁর পিতা যেমন তাঁকে সহ-শাসক রূপে অধিষ্ঠিত করেছিলেন তেমনি তিনিও স্মেনখকরেকে সঙ্গে নেবেন শাসক হিসাবে। কিন্তু তার আগে তার বিবাহ দেবেন মার্ত-অটেনের সঙ্গে পূর্বসিদ্ধান্ত মতো।

স্মেনখকরে নেফেরতিতির গর্ভজাত পুত্র নয়। সুতরাং তার প্রতি বিন্দুমাত্র স্নেহও নেই বরং রয়েছে কিছুটা বিরক্তি। কারণ স্মেনখকরে ফ্যারওর ঔরসজাত পুত্র হলেও তার গর্ভধারিণী ছিল সিরিয়ার ওদিক থেকে নিয়ে আসা এক সুন্দরী। বলতে গেলে ক্রীতদাসী। তাতেও কিছু অসুবিধা ছিল না। কারণ ফ্যারও পরিবারে এটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু একটা কৌতূহলোদ্দীপক গুজব শোনা যায় স্মেনখকরের জন্মেতিহাস নিয়ে। তার সুন্দরী গর্ভধারিণীর নিকট অখেন-অটেনের মতো নাকি তার পিতা অমেনোফিসও উপগত হতেন। এই গুজবের মধ্যে কতটা সত্য নিহিত রয়েছে এতদিন পরে সঠিক ভাবে বলা যায় না। তবু এখনো গুজবটা একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি। তাই মার্ত-অটেন বিয়ের রাতে অনখেসেনের গায়ে ছোট্ট একটা চিম্‌টি কেটে বলেছিল—কে জানে, কাকে বিয়ে করছি। ভাই, না কাকা?

মার্তের রসিকতায় অনখেসেনেরও হাসি পেয়ে গিয়েছিল। আর সেই হাসি দেখে ফেলেছিলেন স্বয়ং ফ্যারও। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাকে কাছে ডেকেছিলেন।

—হাসলে যে?

—আমি? না তো।

প্রচণ্ড ধমক দিয়েছিলেন ফ্যারও—আমি নিজের চোখে দেখেছি।

পিতার ক্রোধ, তাঁর খামখেয়ালিপনা, কোনো কিছু জানতেই আর বাকি নেই তার। তাই তাড়াতাড়ি বলে ফেলেছিলেন—মার্ত হাসছিল তাই।

—মার্ত হাসছিল কেন?

—খুব আনন্দ হয়েছে। বলছিল, ক'দিন পরে সম্রাজ্ঞী না হলেও একটু একটু রাণী তো হবে।

—একটু একটু কেন? একেবারে সম্রাজ্ঞী হবে।

—না না, রাণী নেফেরতিতি থাকতে—

—হ্যাঁ, তিনি থাকতেই মার্তকে প্রধানা মহিষী বলে ঘোষণা করা হবে। নেফেরতিতির কন্যা হলেও সে অটেনের সেবা করে। এতদিন যিনি রাণী ছিলেন তিনি আর অটেনের সেবিকা নন।

অনখেসেন বুঝতে পারে পিতা তার হাসির কথা ভুলে গিয়েছেন। সে বলে—মার্তকে বলব একথা?

—কোন কথা?

—আজ থেকেই সে প্রধান মহিষী।

ফ্যারও খিঁচিয়ে ওঠেন—অত তাড়াতাড়ি হয় নাকি? সব কিছুর একটা নিয়ম আছে। যাও এখান থেকে।

অনখেসেন পালিয়ে বাঁচে।

স্মেনখকরে সহ-শাসক রূপে ফ্যারওর কাজের অংশীদার হবার কিছুদিন পর থেকেই কর্মচারীদের মধ্যে তার সম্বন্ধে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হ'ল। তার মধ্যে ফ্যারও সুলভ গাম্ভীর্যের অভাব পরিলক্ষিত হ'ল। অনেক সময় এমন সব কাজ সে করতে লাগল যা তার পিতার খামখেয়ালিপনাকেও ছাড়িয়ে যেতে থাকে। এতে মার্ত-অটেন উৎকণ্ঠিত হয়। কারণ এতে তার রাণীর আসনে অধিষ্ঠিত থাকার স্থায়িত্বে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। ফ্যারওর প্রাসাদে সবই সম্ভব। মার্ত-এর প্রেমিকের মতো কত প্রেমিক প্রেমিকা কত রাজপুত্র আর রাজকন্যা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ফ্যারও পদে আসীন থাকতে হলে ক্ষমতাসম্পন্ন রাজকর্মচারীদের সঙ্গে অত্যন্ত কৌশলে ব্যবহার করতে হয়। সুযোগ বুঝে কাউকে কাউকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হয়, কারও ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দিতে হয়। সব কিছুই ফ্যারও করেন তাঁর সিংহাসন আর জীবনের নিরাপত্তার জন্য। কূট কৌশলের আশ্রয় না নিয়ে টিকে থাকা যায় না। অয়কে অনখেসেনের ততটা বিপজ্জনক বলে মনে হয় না। কিন্তু এখন যিনি নতুন সেনাপতি হয়েছেন সেই হোরেমহেবকে দূর থেকে দেখলে ভাল মনে হয় না। এটা হয়তো তার মা নেফেরতিতির এক মন্তব্যের জন্য। তার পিতামহী টি-এর মতো তার মায়ের জন্মও হয়েছে সেনাপরিবারে। তিনি অনেক খোঁজ খবর রাখেন। তিনি একদিন তাকে ডেকে হোরেমহেবকে দেখিয়ে বলেছিলেন—লোকটাকে দেখে রাখ। এদের পরিবার অত্যন্ত শিক্ষিত। এদের মধ্যে অনেক গুণ রয়েছে যা মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু এদের কোনো নীতিবোধের বালাই নেই। এরা বড় নিষ্ঠুর। উচ্চাশা পূর্ণ করতে এরা পারে না এমন কোনো কাজ নেই।

অনখেসেন মাকে বলেছিল—আমাকে বলে কি হবে? তোমার বড় মেয়েকে বল। তারই তো রাণী হবার কথা।

—হ্যাঁ। কিন্তু তাকে তো রাণী বলে ঘোষণা করা হলো না এখনো।

—ফ্যারওর নিজের একটা সম্মান আছে। তুমি এখনো সশরীরে রাজধানীতে রয়েছো। পুত্রবধুকে রাণী বলে ঘোষণা করলে লোকে হাসবে।

প্রশংসার দৃষ্টিতে তৃতীয়া কন্যার দিকে চেয়ে মা বলেছিলেন—এরই মধ্যে রাজনীতি বুঝতে শিখেছিস দেখছি।

—তোমার মেয়ে তো। কিন্তু হোরেমহেব খারাপ হলে আমার কি এসে যায়?

—না। তোর কিছু এসে যায় না। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি আমি এখানে না থাকি তখন মার্ত কিংবা ফ্যারওকে সাবধান করে দিতে পারবি।

—হোরেমহেব কিছু না করলে সাবধান করে দেবার প্রশ্ন ওঠে না।

—ওরা কখনো নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকে না।

—আর অয়?

—অয় অত্যন্ত বুদ্ধিমান। অত্যন্ত প্রতিভাবান। তার মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ রয়েছে কিছুটা। কোনো নৃশংস কাজ করতে দু'বার ভাববে সে। হোরেমহেবের মতো বেপরোয়া হবেন না।

—সেই নৃশংস কাজটা কি?

এবারে মা একটু জোরে বলে ওঠেন—হত্যা। ফ্যারওকে হত্যা। দরকার হলে ফ্যারওর পদ লাভের উদ্দেশ্যে যতগুলো প্রয়োজন হত্যা করা।

—কি বলছ তুমি মা?

—ঠিকই বলছি।

সেই সময় তুতন্‌খ ঘুমভাঙা চোখে এসে দাঁড়ায় মায়ের পাশে। মা নীরব হয়ে যান। তুতন্‌খ যেন রক্তমাংস দিয়ে গড়া সাক্ষাৎ সরলতা।

মা সহসা বলে ওঠেন—আজ আমার যদি কিছু হয় এই ছেলেটার দায়িত্ব নিতে পারবি?

অনখেসেন চমকে ওঠে। তুতন্‌খও। সে মায়ের দিকে চেয়ে বলে—তোমার কিছু হবে না। আমি হতে দেবো না।

মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন—এমনিতে বলছি। তোর তো আপন বলতে আর কেউ নেই।

প্রায় সমবয়সী অনখেসেনের দিকে চেয়ে মিষ্টি হেসে তুতন্‌খ বলে—তোমার কিছু না হলেও ও আমাকে দেখবে। আমি জানি।

মায়ের অনুসন্ধিৎসাপূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে অনখেসেন লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। কেন এই লজ্জা বুঝতে পারে না। শুধু তুতন্‌খ-এর ওপর রাগ হয় খুব। ছেলেটার বুদ্ধি হয়নি এখনো। আর কয়েক বছর না গেলে হবেও না।

—কি রে। তুই ওকে দেখিস নাকি?

—তুমি ওকে অত ভালবাস। তাই নজর রাখি।

—খুব ভাল। পারলে ওকে ভালবাসিস।

—ও আমার ভাই নয়।

—ভাই-এর মতো না হয় না বাসলি।

অনখেসেন হেসে বলে—তবে কাকার মতো?

তুতন্‌খও ওর কথার ধরনে আনন্দিত হয়।

মা বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—না। অন্যরকম। মার্ত-এর কাহিনী শুনিয়ে ছিলি? সেইরকম।

—তুমি পাগল হয়েছ মা? এ তো আমার চেয়েও ছোট।

—ছোটও একসময়ে বড় হয়। একবার এর দিকে চেয়ে দেখ তো। ক'দিন পরে কেমন দেখতে হবে কল্পনা কর। বুঝতে পারিস?

অনখেসেন মাথা নীচু করে বলে—পারি।

তুতন্‌খ বলে ওঠে—আমারও দাড়ি গোঁফ হবে। আমি যুদ্ধে যাব, শিকারে যাব। সিনাই দেশে গিয়ে নীলকান্ত মণি নিয়ে আসব।

অবুঝের মতো বললেও তুতন্‌খের কথায় খুব আনন্দ পায় অনখেসেন। প্রশ্ন করে—কার জন্যে আনবে ওই মণি?

মায়ের গায়ে হাত রেখে বলে—এর জন্যে।

—আর আমি?

—বা রে, তোমার জন্যে তো আনবই।

ভবিষ্যৎ কল্পনায় অনখেসেনের সর্বশরীর অবশ হয়ে ওঠে। মা আজ এক স্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন। কিন্তু কেন? আজ যদি ফ্যারও কোনো উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে তার বিবাহ ঠিক করেন তবে কি মা বাধা দিতে পারবেন? হোরেনহেবের কথাই ধরা যাক। সেও তরুণ। সে নতুন সেনাধ্যক্ষ হয়েছে, নিশ্চয় তার যোগ্যতার বলে। তার সঙ্গে যদি ফ্যারও বিয়ে দিতে চান তবে কি সে অমানুষ বলে মা এই বিবাহ ভেঙে দিতে পারবেন?

তুতন্‌খ চলে যায়। মাঝে মাঝে নেফেরতিতিকে স্পর্শ করে না গেলে সে বোধহয় নিশ্চিন্ত হতে পারে না। কিছুক্ষণ তাঁর সান্নিধ্যে থেকে আবার চলে যায় নিজের খেয়ালে।

অনখেসেন বলে—তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমার ভাগ্যকে যেন ছকে বেঁধে দিতে চাও। তুতন্‌খকে ভালোবাসা খুব সহজ। কিন্তু তারপর?

—তারপর ওকে বিয়ে করবি।

—পারব? ফ্যারও এখন তোমার কথায় চলেন না। তাঁকে পরামর্শ দেবার অনেক লোক আছে।

—জানি। কিন্তু অন্য কারও সঙ্গে যদি তোর বিয়ে না হয় তার জন্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব।

—কেন?

—বুঝতে পারলি না? তোকে যে বিয়ে করবে সে হবে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী।

—কেন স্মেনখকরে রয়েছে।

—কিন্তু তারপর?

—সেকথা এখন ভেবে কি হবে?

—না এখনি ভাবতে হবে।

—মার্ত-এর পুত্র হতে পারে।

—মনে হয় ওর কোনো সন্তানই হবে না। বুঝতে পারিস না? মার্তের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা তোর, ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখিস না কখনো! ওর সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথাও তো হওয়া উচিত। অয়-এর ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা তোকে বলতে পারে আর এখনকার বিবাহিত জীবনের কথা বলে না?

—জিজ্ঞাসা করিনি। ইচ্ছা করে না।

—আমার আর একটা ভয়ও আছে। হয়তো মার্ত রাণী নাও হতে পারে। হলেও বেশিদিন নাও থাকতে পারে।

—কেন?

—এখন বলব না। সময় হয়নি। কিন্তু আমার আশঙ্কা তাই।

—এতটা বললে আর এটুকু বলবে না?

—না। হয়তো চারদিকের চাপে আমার মস্তিষ্কও ফ্যারওর মতো অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাই আজে বাজে চিন্তা করছি। ফ্যারওর অসুস্থতার কথা একটু একটু করে সবাই জানতে পারছে। কতদিন আর আড়াল করে রাখব। এখন তো তিনি আমাকে কাছে ঘেঁষতে দেন না। আরও দূরে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে এ কথাও জানি। হোরেমহেব হয়তো মদত দিচ্ছে। তাঁর রাজনীতির মধ্যেও অপ্রকৃতিস্থতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে এখন। তাই আজ কৃষকেরা অভুক্ত। ওয়াদীর নিরালা স্থলে ফ্যারও তাঁর মৃতদেহের শেষ আশ্রয়স্থল নির্মাণ শুরু করলেও, কৃষকেরা পারিশ্রমিক আদৌ পায় কিনা সন্দেহ আছে। একটার পর একটা অমেনের মন্দির ধ্বংস করা হচ্ছে। সবাই ক্ষিপ্ত। জানিনা শেষ পর্যন্ত কি হবে।

কন্যার কথা ভুলে গিয়েছিলেন নেফেরতিতি। আপন মনে বকছিলেন। বলেন—দেখলি তো, আমিও অপ্রকৃতিস্থ।

—না। তুমি শুধু দুর্ভাবনাগ্রস্থ।

—তুতন্‌খকে আমি ভবিষ্যতের ফ্যারও রূপে কল্পনা করি। তোর সঙ্গে বিয়ে হলে সেটা অনেক সহজ হবে।

—তুমি তুতন্‌খের প্রতি আমাকে প্রলুব্ধ হতে প্ররোচিত করছ। কিংবা আমার প্রতি তুতন্‌খকে। এটা কি ভাল?

—না। কিন্তু, আমি চাই না আমার কন্যার স্বামী ছাড়া অন্য কেউ মিশরের সিংহাসনে বসুক।

—তুতন্‌খ কি বলে?

—তাকে এখনো বলিনি। কিন্তু সে আমার ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। তার মতামত জানার প্রয়োজন নেই। সেই বয়সও তার হয়নি। তুই মেয়ে—দেহে ও মনে অনেক বেশি পরিণত। তাই তোর প্রস্তুতির জন্য একথা বললাম।

অনখেসেন একটু চুপ করে থেকে বিষণ্ণ স্বরে বলে—এমন কিছু ঘটলে মার্তের যে কী দুর্গতি হবে! ভাবলে কষ্ট হয়।

—তেমন না হওয়াই ভাল। তবে মার্ত কখনো জননী হতে পারবে বলে মনে হয় না। স্মেনখকরের প্রতি অমেনের কৃপা হলে অবশ্য অন্য কথা।

—ফ্যারওর নিবাসে দাঁড়িয়ে এই নাম উচ্চারণ করলে।

—এ নাম আমার হৃদয়ে গাঁথা রয়েছে।

—তুমি মরবে মা।

—জানি।

ন্যুবিয়ার সোনার খনিতে কিসের যেন গণ্ডগোল হয়েছে। শ্রমিকরা কাজ করতে চাইছে না। তারা অর্ধভুক্ত, বহুদিন নিয়মিত পারিশ্রমিক পাচ্ছে না। তাদের অনেকে দল বেঁধে চলে গিয়েছে নীলনদের তীরে। সেখানে তারা চাষবাস করবে।

ফ্যারও অখেন অটেন খবর শুনে জ্বলে উঠলেন। বুঝলেন এ হলো অটেনের অভিশাপ। আর এই অভিশাপ বর্ষিত হচ্ছে নেফেরতিতির ঔদ্ধত্য আর অবিশ্বাসের জন্য। তিনি বহুদিন পরে নেফেরতিতির ঘরে আসেন। তাঁর চোখ-মুখের অবস্থা দেখে রাণী সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন।

—ফ্যারও, আপনি!

—হ্যাঁ। তাই বলে ভেবোনা তোমার রূপসুধা পান করতে এসেছি।

—জানি। সেই রূপ নেই, সুধা আর কি করে থাকবে।

—থাকলেও আসতাম না একজন হীনমনা নাস্তিকের কাছে। অটেন ক্ষমা করতেন না।

—তোমার ভয় কিসের? তুমি সাক্ষাৎ অটেনের পুত্র।

—চুপ কর। অপরাধ করলে তিনি পুত্রকেও রেহাই দেন না।

—কিন্তু তুমি তো কোনো অপরাধ করনি।

—আমি না করলেও তুমি করেছ। তুমি এখনো আমার রাণী। একই গৃহে বাস করছ। তাই অটেনের অভিশাপে চারদিকে অশান্তি। স্বর্ণখনির শ্রমিকেরা পালিয়ে যাচ্ছে। তুমিই সব কিছুর মূলে।

নেফেরতিতি নীরব থাকেন।

ফ্যারও বলেন—তোমার জন্যে কী না করেছি। জীবনটুকু শুধু দিইনি। তুমি অটেনের মন্দির গড়ে তোলার জন্য শ্রমিকদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম। তাই অনেক মন্দির অনেক সমাধি গৃহ তোমার চিত্র দিয়ে সাজিয়ে তুলেছিলাম। তোমার রূপ আমাকে নেশাগ্রস্থ করেছিল,

আর তোমার মন আমাকে আনন্দিত করেছিল। কিন্তু সব ভুল। আমি অয়কে আদেশ দিয়েছি যেখানে তোমার যত চিত্র আছে সব নষ্ট করে ফেলতে। মুছে ফেলতে। তোমার অস্তিত্ব এখন আমার কাছে বিষবৎ।

নেফেরতিতির মনে হয় এবারে তাঁর রক্তমাংসের দেহের অস্তিত্বও বোধহয় মুছে ফেলতে চান ফ্যারও। তিনি স্বামীর মুখের দিকে তাকান। সেই মুখ রক্তবর্ণ, চোখের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিকতা।

—তোমাকে আমি রাজধানীতে রাখতে চাই না। মৃত্যুদণ্ড দিতে পারতাম। কিন্তু দিলাম না। কারণ জীবনের প্রথমে তুমিও অটেনের ভক্ত ছিলে। তাছাড়া আমাকে তুমি সম্ভবত ভালবাসতে।

নেফেরতিতির দৃষ্টি ফ্যারওর দিকে বিশেষভাবে নিবদ্ধ হয়। হ্যাঁ, জীবনের প্রথম লগ্নে মানুষটিকে সত্যিই ভালবেসেছিলেন। তখন রাজনীতি আর প্রতিপত্তির লালসা তাঁকে এমন করে কলুষিত করেনি। নিজেও অবশ্য কম ভালবাসা পাননি। কিন্তু সেই সব দিনের কথা স্বপ্নের মতো মনে হয় আজ।

স্বামীর কথার জবাবে তিনি অস্ফুট কণ্ঠে বলেন—আপনার অসীম কৃপা।

—তুমি প্রস্তুত থেকো। হয়তো সাতদিনের মধ্যে রাজধানী ছেড়ে চলে যেতে হবে তোমাকে।

—আমি একা?

—হ্যাঁ। তোমার যে অপরাধ, সেই অপরাধ আর কেউ করেনি।

—কাউকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি না? যদি কেউ স্বেচ্ছায় যেতে চায়?

—না।

—এটাই আমার শেষ প্রার্থনা।

অখেন অটেন একটু বিচলিত হন। বলেন—কাকে নিতে চাও?

—তুতন্খটেন।

—ওটাকে আবার কেন?

—একলা থাকব কিনা। নিজের মেয়েদেরও পাব না। তাই—

—বেশ। নিও।

ফ্যারও চলে যান। নেফেরতিতি বুঝতে পারেন এত সব সত্ত্বেও ফ্যারও তার প্রতি হৃদয়ের এক অজ্ঞাত কোণে এখনো একটু ভালবাসা সঞ্চিত রেখেছেন। নইলে তাঁর কথার ঝাঁঝ অমন কমে যেত না ধীরে ধীরে। তুতন্খকে সঙ্গে না নিয়ে উপায় নেই। অয় আর হোরেমহেবের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে তাকে এখানে ফেলে রেখে যাওয়া কখনোই নিরাপদ হবে না। অসুস্থ মস্তিষ্ক নিয়ে ফ্যারও আব অপদার্থ স্মেনখকরে কতদিন টিকে থাকবে বলা মুশকিল ওই অতি উচ্চাশার স্বপ্ন দেখা মানুষ দু'টির জন্য।

সেদিন সন্ধ্যার পরে সহসা বৃষ্টি হ'ল একটু। এদেশে বৃষ্টি সর্বদাই অতিপ্রার্থিত। বৃষ্টি দেখে শহরের মানুষেরা ভীষণ পুলকিত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দিল। বর্ষণ এদেশে এক দুর্লভ ঘটনা। সবাই জানে, এই বৃষ্টি পিরামিডের ওপর যে সামান্য জলের স্পর্শ রাখল তা অতি সহজেই শুকিয়ে যাবে। তবু শত হলেও বৃষ্টি। আকাশ থেকে পড়ছে ঈশ্বরের কৃপার মতো।

ফ্যারও ঘোষণা করে দিলেন অটেন দেবতা ওই বৃষ্টি পাঠিয়েছেন। অধিকাংশ প্রজা মনে মনে জানে অমেন দেবতা ছাড়া এই ক্ষমতা আর কারও নেই।

বৃষ্টির সময় অনখেসেন আর তুতন্খ বাইরে ছিল। তারা গিয়েছিল নদীর তীরে। দিন শেষ হয়ে আসতে দেখে ওরা ফিরে আসছিল প্রাসাদে। সেই সময় বর্ষণ। তুতন্খ চেঁচিয়ে ওঠে। অনখেসেন তার ডান হাত চেপে ধরে শক্ত করে।

—কি হ'ল?

—দেখছ না, ওপর থেকে জল পড়ছে। কী সুন্দর।

—হ্যাঁ। তুমি আগে দেখোনি?

—মনে হয় দেখেছি একবার।

—তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে?

—হবে না?

—নিশ্চয় হবে।

—আমি গাড়ি থেকে একটু নামব?

—চলো, আমরা দু'জনেই নামি।

ওরা পথে নেমে পড়ে। গায়ে ওদের বৃষ্টির জল পড়ে। পোশাক সামান্য ভিজে ওঠে।

তুতন্‌খ হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলে—কী আরাম, তাই না?

—হ্যাঁ।

—তুমি আজ অন্যমনস্ক কেন?

— আমি, কই না তো? তোমাকে নিয়ে বেড়াতে এলাম, বৃষ্টিতে রাস্তা ধরে হাঁটছি। অন্যমনস্ক হবো কেন?

তুতন্‌খ একটু দাঁড়িয়ে পড়ে।

—থামলে যে।

তুতন্‌খ বলে—জানো, আমি অনেক কিছু তোমার চেয়ে কম বুঝি। কিন্তু তোমার মন খারাপ হলে ঠিক বুঝতে পারি।

স্তম্ভিত হয়ে যায় অনখেসেন। বলে—কেন? শুধু আমার মন খারাপ হলে কেন?

—আর কাউকে জানি না?

—ও।

বৃষ্টি থেমে যায়। বালুকাময় পথে বৃষ্টির ফোঁটার চিহ্ন বিলুপ্ত হতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। বর্ষণ এখন অতীতের কাহিনীতে পরিণত হ'ল। আবার কত মাস বা কত বছর প্রতীক্ষা করতে হবে কে জানে।

ওরা দু'জন পাশাপাশি হেঁটে চলে। নির্জন পথ। ওদের গাড়ি ও রক্ষী ওদের অনুসরণ করে। দিবসের প্রচণ্ড গরম সামান্য এই বর্ষণে অনেক প্রশমিত।

ওরা আবার গাড়িতে ওঠে। তুতন্‌খ আবার প্রশ্ন করে—তোমার কিসের দুঃখ আজ অনখেসেন?

—আমার কাছ থেকে তুমি যদি অনেক দূরে চলে যাও তাহলে তোমার কষ্ট হবে না?

—খুব হবে। কিন্তু তোমার তো হবে না।

—হবে। সেইজন্যই দুঃখ।

গাড়ির মধ্যে অনখেসেন তুতন্‌খকে জড়িয়ে ধরে। বড় যত্নের বলে মনে হয় একে। একদিন এ যুবক হয়ে উঠবে। তখন নিশ্চয় খুবই সুদর্শন হয়ে উঠবে। মুখের এই কোমল ভাব আর থাকবে না। ধীরে ধীরে একটা অদ্ভুত সুন্দর উদাস রুক্ষতা বিরাজ করবে এই মুখমণ্ডলে। সেই সঙ্গে একটুখানি বেদনা মেশানো থাকবে যা দূর করার জন্য অনখেসেন ব্যাকুল হয়ে উঠবে। কিন্তু তেমন দিন কি আসবে কখনো? মা বলেছেন কয়েকদিনের মধ্যে তুতন্‌খকে সঙ্গে নিয়ে তিনি থীব্‌স-এর পথে রওনা হয়ে যাবেন। ফ্যারওর নির্দেশ।

অনখেসেনের অশ্রুর কয়েক ফোঁটা ঝরে পড়ে তুতন্‌খ-এর বাহুর ওপর। তুতন্‌খ অনখেসেনের কোমল স্পর্শ উপভোগ করছিল এতক্ষণ। তার কেশ ও দেহ থেকে একটা অতি হালকা সুঘ্রাণ নাকে এসে লাগছিল। এখন অশ্রুর উষ্ণতায় সে চমকে ওঠে। অনখেসেনের গালে হাত দেয়।

—তুমি কাঁদছ।

অনখেসেন নীরব।

—কেন কাঁদছ? আমি তোমাকে কষ্ট দিয়েছি?

—না। তুমি কষ্ট দিতে জান না তুতন্খ।

—তবে? সত্যিই কি আমি দূরে চলে যাব?

—হ্যাঁ তুতন্খ হ্যাঁ। আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

—আমি যাব না।

—তা যে হয় না। মা তোমাকে নিয়ে যাবেন। মাকে চলে যেতেই হবে। ফ্যারওর হুকুম।

তুতন্খ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। কি বলবে ভেবে পায় না সে। তার চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে। কিন্তু গোপন করার চেষ্টা করে। সে জানে তাকে কাঁদতে নেই। সে কাঁদলে অনখেসেন আরও কষ্ট পাবে।

—জান অনখেসেন, অটেনের কৃপায় আমরা বেশিদিন আলাদা থাকব না। দেখে নিও। আমরা আবার এক হবো।

—তাই যেন হয়।

এবারে তুতন্খ অনখেসেনের বুকের মধ্যে মুখ লুকোয়। সে অনখেসেনের বুকের ধুকধুকানি শুনতে পায়। অনখেসেন তার মাথা দু'হাত দিয়ে আরও বেশি চেপে ধরে। তুতন্খ অনুভব করে অনখেসেনের বুকের ঝড় ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়ে আসছে। অবশেষে সে শান্ত হয় যেন। তখন তুতন্খ আবার সোজা হয়ে বসে। কেউ কারও মুখ দেখতে পায় না তেমন করে। বাইরে অন্ধকার। গাড়ির ভেতরে সেই অন্ধকার আরও গাঢ়।

অনখেসেন লক্ষ্য করে তুতন্খ তার চুল নিয়ে, তার মুখ নিয়ে, তার ঠোঁট নিয়ে খেলা করছে। তার মধ্যে কোনো উন্মাদনা নেই। অথচ ওই স্পর্শে অনখেসেনের শরীরের ভেতর থেকে কি যেন জেগে উঠতে চায়। সে সংযত থাকে। নিজেকে বার বার বোঝায়, না না, এ বালক। কিন্তু শেষে সে আর না পেরে তুতন্খকে পাগলের মতো চুমু খেতে থাকে। তুতন্খ প্রথমে অবাক হয়। তারপর দেখাদেখি সেও চুমু খায় অনখেসনকে।

নেফেরতিতি রাজধানী থেকে বিদায় নিতে প্রস্তুত হলেন একদিন। সঙ্গে তুতন্খ-অটেন। সবাই জানল ফ্যারওর জীবন থেকে এই অসামান্যা সুন্দরী প্রধানা মহিষী চিরতরে বিদায় নিতে চলেছেন। অটেন দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা ফ্যারও কখনো সহ্য করেন না। বিশেষ করে নিজেকে অটেনের পুত্র বলে ঘোষণা করার পর রাণীর এই বেয়াদপি ক্ষমার অযোগ্য। এতে প্রজারাও অটেনের প্রতি ভয় শ্রদ্ধা ভক্তি আস্থা সব হারিয়ে ফেলবে। নেফারতিতি যদি দেবতা সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করতেন অন্তত, তাহলে তাঁকে এই শাস্তি ভোগ করতে হতো না। কিন্তু তিনি অটেনকে অপদস্থ করার জন্য অমেন দেবতার শরণাগত হলেন।

বিদায় নেবার বেলায় মার্তকে ডেকে তিনি বলেন—এবারে তুই সত্যিই রাণী হলি।

—না। স্মেনখকরে এখনও সহ-শাসক।

—তাতে কি। অন্য কোনো রাণী তো আর রইল না। তোকে সবাই রাণী বলবে। তাছাড়া তোর বাবা কতদিন আর পারবে। দু'দিন পরেই উন্মাদ হয়ে উঠবে। আমি চিকিৎসকের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতাম বলে বেশি বাড়াবাড়ি হতো না। আমি নিজে তার কাছে যেতে না পারলেও ব্যবস্থা করেছিলাম। তবে অয় আর হোরেমহেব বোধহয় সন্দেহ করত। এবারে তারা স্বাধীন। স্মেনখকরেকে বলিস খুব সাবধান থাকতে।

আতঙ্কিত মার্ত প্রশ্ন করে—তুমি কি কোনো ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়েছ?

—না। তবে ফ্যারওর সিংহাসনের চারদিক ঘিরে চিরকাল ষড়যন্ত্র বাসা বেঁধে থাকে। চোখ আর

কান সব সময় খোলা রাখতে হয়। নইলে বিপদ। সেই কাজ আজ থেকে তোকে করতে হবে। আমি ফ্যারওর আশেপাশে না গেলেও সবাই জানত নেফেরতিতি প্রাসাদে রয়েছে। এখন তারা জানবে নেফেরতিতিকে বিতাড়িত করা হয়েছে।

মার্ত-এর মন প্রবোধ মানে না।

অনখেসেন আর তুতন্‌খ-এর এসব কথা কানে যায় না। অনখেসেন ভাবে, তুতন্‌খ চিরকাল প্রাসাদে বাস করেছে অথচ তার দিকে আগে ভালভাবে তাকানোর অবকাশ পায়নি সে। কিন্তু নেফেরতিতি তার মনের মধ্যে এমন এক বীজ বপন করে দিলেন যে সেই বীজ থেকে অঙ্কুর বের হয়ে এখন সেটি বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে। নইলে মন তার এত ব্যথাতুর কেন? কেন তুতন্‌খ-এর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না? এর চেয়ে আগেই ভাল ছিল। তুতন্‌খকে সে অন্য পাঁচজন বালকের মতো ভাবত। মা শুধু শুধু তার মনের ফল্গুধারার উৎসমুখের পাথরটিকে স্থানচ্যুত করে দিলেন। এর থেকে অব্যাহতি লাভের সম্ভাবনা নেই আর। কারণ মায়ের স্বপ্ন সফল ও বিফল হওয়া—দুটোই মর্মন্তুদ হবে। একদিকে স্মেনখকরে অন্যদিকে তুতন্‌খ। পাল্লার দুই দিকে দু'জনে। একজন নামলে অন্যজন উঠবে। না না, এ ঠিক নয়। শত হলেও মার্ত-এর অমঙ্গল সে চাইতে পারে না।

নেফেরতিতি তার দিকে চাইলে সেই দৃষ্টির মধ্যে অনেক কথা ফুটে উঠতে দেখে। মায়ের চোখের ভাষা সে বুঝতে পারে। তবু তার চির-পীড়িত দ্বিতীয় ভগিনীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে—মকত্‌ অটেনকে নিয়ে গেলে পারতো মা। ও অসুস্থ।

—জানি। কিন্তু নিতে পারি না।

—কেন?

—তোদের মতো মকত্‌ ও ফ্যারওর সন্তান। হুকুম নেই।

—মকত্‌কে একবার অন্তত দেখে যাও। জীবনে নিশ্চয় আর তাকে দেখতে পাবে না।

—তোদেরও কি দেখতে পাব?

—তবু সম্ভাবনা নিশ্চয় আছে। ওকে দেখার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

—গেলে কাঁদবে, তাই যাইনি। চোখের জল আর ভাল লাগে না।

অনখেসেন অনিচ্ছাকৃতভাবে একটু জোরে বলে ওঠে—তোমারই গর্ভের দুর্বলতম সন্তান ও। দরদ না থাকুক, ওর প্রতি তোমার শেষ কর্তব্যটুকু অন্তত করে যাও।

নেফেরতিতি এবারে ঘুরে দাঁড়ান। তিনি তৃতীয়া কন্যার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। সেই মুখ অগ্নিবর্ণা। এই রূপ কখনো তিনি দেখেননি। তাঁর ব্যক্তিত্বও এর কাছে নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

শান্ত কণ্ঠে মা বলেন—চলো।

সবাই অনখেসেন ও নেফেরতিতির পেছনে পেছনে চলে। তারা মকত্‌-অটেনের কক্ষের সম্মুখে এসে থেমে যায়। প্রায়ান্ধকার এই কক্ষ। মকত্‌ আলো পছন্দ করে না। চোখে সয় না।

নেফেরতিতি এক পা এক পা করে এগিয়ে যান। সঙ্গে অনখেসেন। তাঁরা উভয়ে মকত্‌-এর শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়ান। শয্যায় শায়িত রয়েছে অতি ক্ষীণ এক দেহ। নিস্পন্দ। মুখও ভাল করে দেখা যায় না।

নেফেরতিতি বলে ওঠেন—উঃ, এত অন্ধকার কেন?

—ও তো এই অন্ধকারেই থাকে বরাবর। কেউ ওকে আলো দেখায়নি কখনো।

—এভাবে কথা বলছ কেন? আরও বড় হও, তখন দেখবে আপাতদৃষ্টিতে আমার যে সব কথা, যে সব আচরণ তোমাকে বিরূপ করেছে তখন আর তা করবে না। আমার সমালোচনা তুমি করতে পার, কিন্তু সব কিছুর পেছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। তুমি বড় হও। আমার মতো বড় হও। তুমি সন্তানবতী হও। দেখবে, তোমার সন্তানরাও তোমার কাজের কত সমালোচনা করছে।

মায়ের হাত চেপে ধরে সে বলে—আমি সমালোচনা করতে চাইনি মা। তোমাকে নিষ্ঠুর হতে দেখলে বড় কষ্ট হয়।

ওরা কয়েক মুহূর্তের জন্য মকত্ অটেনের কথা বিস্মৃত হয়েছিল। এখন ঘরের অন্ধকার চোখে সওয়া হয়েছে। মকত্-এর মুখ ভালই দেখা যাচ্ছে। চক্ষু নিমীলিত।

অনখেসেন ভগিনীর গায়ে হাত দিয়ে ডাকে—মকত্।

কোনো সাড়া নেই।

—মা, এ যে কথা বলছে না। নড়ছে না।

—কেন? নড়বে না কেন? দেখি।

নেফেরতিতি বারবার কন্যাকে ডাকেন। কিন্তু সে কথা বলে না। নড়ে না। নেফেরতিতি রীতিমতো বিচলিত বোধ করেন। বেশ উচ্চকণ্ঠে বলেন এবারে—আমি তোর মা। দেখতে এসেছি। একবার চেয়ে দেখ।

না। মকত্ অনড়ই রইল। তার হাত পা একটু শক্ত শক্ত মনে হয়। সে মৃতা।

নেফেরতিতি এবারে কন্যার শিয়রে কান্নায় ভেঙে পড়েন। বলেন—তোর ওপর মায়া পড়ে যাবে বলে আমি দূরে দূরে থেকেছি। এইভাবে শোধ নিলি।

মকত্ কিভাবে যেন বিষ সংগ্রহ করেছিল। হয়তো অনেকদিন থেকেই প্রস্তুত ছিল। আজ তার সময় হয়েছিল। মৃত্যুবরণের উপযুক্ত সময়। তাই বোধহয় মায়ের অশ্রুজলের দু' ফোঁটা উপহার স্বরূপ পেয়ে গেল জীবনে এই প্রথম এবং শেষবারের মতো।

কিন্তু তার এই বিদায় নেফেরতিতির বিদায়কে কয়েকদিনের জন্য বিলম্বিত করল মাত্র। তার মৃত্যু প্রাসাদের কারও মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাতও করতে পারল না। কারণ, নিজ কক্ষের গণ্ডী পেরিয়ে বাইরের কারও সঙ্গে মেশার মতো অবকাশ সে পায়নি কখনো।

অনখেসেন ভেবেছিল মা তাঁর নিজের বোন মুতনেজেমেতকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। কিন্তু তেমন কোন লক্ষণ মকত্-এর মৃত্যুর দিনেও দেখা যায়নি, যেদিন তিনি প্রকৃতই থীবসের দিকে রওনা হলেন সেদিনও দেখা গেল না। মুতনেজমেত-এর সঙ্গে ফ্যারও কন্যারা খুব বেশি মেলামেশা করত না। যদিও সে নেফেরতিতির চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, প্রায় মার্ত-অটেনের বয়সী তবু কেন যেন তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়নি। নেফেরতিতি তাকে একটু আলাদা করে সরিয়ে রেখেছেন বরাবর। পরিচারিকারা ফিস্ ফিস্ করে বলত. ভয়ে রাণী ওকে আড়াল করে রাখেন। যদি ফ্যারওর দৃষ্টি পড়ে যায় ওর ওপর।

তাই বলে মুতনেজেমেত তার ভগিনীর মতো অতটা রূপসী নয়। তবে মোটামুটি সুন্দরী। কিন্তু যে সৌন্দর্য পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দেয় তার ধারে কাছেও নয়। সেই সৌন্দর্য এখন প্রাসাদে শুধু একজনের কাছে। অনখেসেনের।

নেফেরতিতি যাবার আগে বলে গেলেন কন্যাদের তাঁর বোন একলা থাকল। একটু কথাবার্তা বলতে তার সঙ্গে। সে একেবারে একা হয়ে গেল।

অনখেসেনের মনে হতে লাগল প্রাসাদ শূন্য, হৃদয় শূন্য। পৃথিবীতে যে দু'জনকে সবচেয়ে আপন বলে ভাবতে শুরু করেছিল, তারা চলে গেল। মার্ত এখন বলতে গেলে প্রকৃত রাণী। তার কাছে যখন তখন যাওয়া যায় না। মকত্ মৃত। তার কক্ষের দিকে চাইলে গা ছম্‌ছম্ করে। মনে হয়, কান পাতলে এখনো তার চাপা বেদনার্ত কণ্ঠস্বর শোনা যায়। যেন ডাকছে তাকে। তার দেহ শুধু চলে গিয়েছে সমাধিস্থলে। বাকি সবটুকু রয়ে গিয়েছে এখানে। এমনকি তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা এবং দীর্ঘশ্বাস পর্যন্ত।

অন্য তিন বোন খুব ছোট। তারা পরিচারিকাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে। তারা তিনজনে যেন ভিন্ন এক গোষ্ঠীর প্রাণী। সব সময় একই সঙ্গে থাকে, একই সঙ্গে খেলা করে, গল্প করে। পৃথিবীতে মা বলে যে বিশেষ কেউ থাকে এই বোধও তাদের নেই। তাদের ধারণা পৃথিবীতে তারা চিরকাল আছে, থাকবেও চিরকাল।

ক'দিন হলো বড় বেশি দেখা হয়ে যাচ্ছে হোরেমহেবের সঙ্গে। আনাচে কানাচে অলিন্দে—যত্রতত্র। অনখেসেন বুঝে উঠতে পারে না কেন এমন হচ্ছে। হোরেমহেবকে ফ্যারও বোধহয় বিশেষ ধরনের কোনো কাজে নিযুক্ত করেছেন। অনখেসেন সঙ্কোচে সরে আসে। যখনই দেখা হয়, লোকটা সম্বন্ধে তার মায়ের মন্তব্য কানে বাজে। নইলে তার খ্যাতি রয়েছে যথেষ্ট। সে বুদ্ধিমান, একেবারে অসুন্দরও বলা যায় না। বেশ বলিষ্ঠ পুরুষালী চেহারা। সেনানায়ক হবার উপযুক্ত। তবে অনখেসেনের চেয়ে অন্তত পনেরো বছরের বড় হবে।

মা কখনো ফাঁকা মন্তব্য করেন না। তাঁর প্রতিটি কথার যুক্তি আছে। তাই হোরেমহেবের সঙ্গে এভাবে দেখা হতে থাকায় একটু অস্বস্তি অনুভব করে সে।

একদিন সন্ধ্যার কিছু পরে হারেমের বহির্দ্বারের কাছে একেবারে সামনা-সামনি দেখা হয়ে যায়। সরে যাবার চেষ্টা করলে হোরেমহেব মৃদুকণ্ঠে বলে—একটু দাঁড়ান।

অনখেসেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

হোরেমহেব এগিয়ে এসে তার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসে পড়ে বলে—আমি তোমার রূপে মুগ্ধ। তোমাকে ভালবাসার জন্যে আমি উন্মত্ত। আমাকে তুমি অনুগ্রহ কর।

ছিটকে দূরে সরে যায় অনখেসেন। বলে—এভাবে কখনো আসবেন না। আমি ফ্যারওকে জানাতে বাধ্য হবো।

হোরেমহেব একটিও কথা না বলে চলে যায়।

অনখেসেনের বুক কাঁপতে থাকে। সেই কাঁপুনি তার হাঁটু দুটিতে সংক্রামিত হয়। তবু এক নতুন অভিজ্ঞতার আনন্দে সে পুলকিত হয়ে ওঠে। এত বড় একজন পুরুষ, দেশের প্রধান সেনাপতি তার সামনে নতজানু হয়ে প্রেম ভিক্ষা চাইছে। তার রূপে সে মুগ্ধ। রূপের এই মর্যাদা আর কেউ কখনো দেয়নি তাকে। খুব ভাল লাগে তার। কিন্তু মায়ের সাবধান বাণীর কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায়। এদের উত্তুঙ্গ উচ্চাশার সীমারেখা নেই। সেই উচ্চাশা পূরণের জন্য এরা সব কিছু করতে পারে। একজন নারীর মন গলানো তার মধ্যে একটি—যদি সেটা উচ্চাশা পূরণের পরিপূরক হয়। তার সঙ্গে বিবাহ হলে হোরেমহেব ফ্যারওর আরও ঘনিষ্ঠ হতে পারবে। জামাতা হিসাবে আরও কাছের মানুষ হবে। কিন্তু তাতে কি লাভ? এখনই তো যথেষ্ট কাছের মানুষ এবং ফ্যারওর বিশ্বাসভাজন। তবে কি সত্যিই তার রূপে ভুলেছে মানুষটা? তাই যদি হয় তাহলে অমন এক সুঠাম দেহের পুরুষ অত কাতরভাবে প্রেম নিবেদন করলে কিভাবে সে অস্বীকার করবে? মনের সেই জোর তার আছে তো? তুতনখ-এর কথা মনে হয়। মা তাদের দু'জনার ভবিষ্যৎ নিয়ে এক বিশেষ ধরনের স্বপ্ন দেখেন। এর আকৃতিতে মন ভুললে মায়ের সেই স্বপ্ন ফলবতী হবে না। যদিও মায়ের স্বপ্নের কোনো ভিত্তি নেই। স্মেনখকরের জীবনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। কেন এই সন্দেহ, ঠিকভাবে বুঝিয়ে বলতে পারেননি। একটা অনুভূতি মাত্র। হোরেমহেব একজন জ্বলজ্যান্ত বলিষ্ঠ পুরুষ। প্রেম নিবেদনের সময় তার কণ্ঠের ভগ্ন স্বরের মধ্যে রীতিমতো উত্তেজনা ও উন্মাদনা ঝরে পড়েছিল। একটা অত্যন্ত সুখদায়ক কম্পন ছিল সেই কণ্ঠস্বরে। এই বয়সে আসতে তুতনখ-এর অনেক বছর অপেক্ষা করতে হবে। ততদিন তার নিজের রূপের জেল্লা কতটা অবশিষ্ট থাকবে কে জানে। তাছাড়া তাকে শৈশব থেকে দেখে দেখে তুতনখ কি তার রূপের মূল্য অনুধাবন করতে পারবে? এই দীর্ঘ সময় সে কি নিয়ে থাকবে? মায়ের কথায়, হোরেমহেব সুবিধার মানুষ নয়। কিন্তু এভাবে যদি আর দু'দিন তার সামনে এসে দাঁড়ায় তাহলে

নিজেকে কি স্থির রাখতে পারবে? বুঝতে পারে না অনখেসেন।

সেইদিনই মার্ত অনখেসেনকে ডেকে পাঠায় তার নিজস্ব কক্ষে। মা চলে যাবার পরে সে মায়ের কক্ষগুলি নিয়ে নিয়েছে। ফ্যারও আপত্তি করেননি। মার্ত এমনিতে সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু কাউকে কোনো বিশেষ কথা বলার সময় নিজের কক্ষে ডেকে পাঠায়। তাদের মা নেফেরতিতিও এমন করতেন। মায়ের কাছে শিখেছে। এতে রাণীর মর্যাদা বাড়ে।

অনখেসেন মার্তের সামনে গেলে সে মুচকি হেসে বলে—শুনলাম, খুব মানুষ ভুলিয়ে বেড়াচ্ছিস?

—তার মানে?

—তুই জানিস না বলতে চাস? মনে রাখিস এখন আমি রাণী। আমার অনেক চোখ।

—সবই বুঝলাম। কিন্তু মানুষ ভুলিয়ে বেড়ানোর কথা আমি নিজেও জানি না।

—হোরেমহেব তোকে প্রেম নিবেদন করেনি?

—ও। এই কথা।

—কেন, কথাটা কি খুব নগণ্য?

—তা বলছি না। তবে আমি তাকে ভোলাতে যাইনি। ভোলাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও নেই।

মার্ত একটু শ্লেষ মিশিয়ে বলে—তবে বুঝি ও নিজেই ভুলেছে?

—জানি না। আমার প্রয়োজন নেই জানার।

এবারে মার্ত গম্ভীর হয়ে বলে—ওর অভিনয়ে ভুলিস না। আমি মানছি যে ও যথেষ্ট সুপুরুষ। বহু গুণ রয়েছে ওর মধ্যে। কিন্তু ও তোর কাছে এসে অভিনয় করছে।

—কি করে বুঝলি?

—একজন মানুষ একসঙ্গে কতজনের কাছে প্রেম নিবেদন করে?

—আর একজন কে?

—মায়ের বোন মুতনেজেমেত।

—সত্যি?

—মিথ্যে বলে লাভ?

অনখেসেন ভাবে, ভালই হ'ল। হোরেমহেবের আকুতিতে ভবিষ্যতে আর মন টলবে না। মার্ত তার মস্ত উপকার করল।

—তোর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। নইলে ও হয়তো আমার মন জয় করে নিত। কিন্তু লোকটার উদ্দেশ্য কি?

—ফ্যারওর বংশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন।

—কিন্তু কেন?

—বোধহয় নিজের বংশের গৌরব বৃদ্ধি করা।

—শুধু কি তাই?

—আর কি হতে পারে?

অনখেসেন একটু ইতস্তত করে বলে—হয়তো ফ্যারওর পদটির ওপরও লোভ আছে।

মার্ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে বলে—আমারও সেই রকম একটা ভয় আছে। বাবা সুস্থ নয় এ কথা সবাই এখন মোটামুটি জেনে গিয়েছে। শুধু ফ্যারও বলেই ওঁকে এখনো ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখা হয় না। আর স্মেনখকরের বুদ্ধি ঠিক পরিণত নয়।

—কি করে বুঝলি?

—বোঝা যায়। শত হলেও আমি তার স্ত্রী।

—এ তো শুধু লোক দেখানো। স্বামী হিসাবে সে কি সম্পূর্ণ?

—না। তবে ফ্যারওর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি না থাকলেও চলে যদি তার পরামর্শদাতারা, তার কর্মচারীরা দক্ষ হয়, বিশ্বস্ত হয়।

—অয়-এর মতো দক্ষ কেউ হতে পারে?

—না। কিন্তু অয় স্মেনখকরেকে পছন্দ করে না। তাই তেমন দিন যদি আসে একটুও দ্বিধা না করে সে স্মেনখকরেকে বিতাড়িত করতে পারে। কিংবা তার ভ্রাতুষ্পুত্রের মতো অন্য কিছু।

—এতটা দুঃসাহস হবে?

—কি জানি।

—আমার ধারণা এই সাহস অয়-এর হবে না। কারণ হোরেমহেব রয়েছে। প্রধান সেনাপতি সে। সৈন্যদল তার হেফাজতে। মা একবার বলেছিলেন, ওরা দু'জনা পরস্পরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে বলে ভরসা। কেউ বেশিদূর এগিয়ে যেতে পারে না।

—কিন্তু কোনো সময় একটা সুযোগ এসে যেতে পারে।

—একশোবার।

—তখন কি হবে?

—অত ভাবলে চলে না। তবে তুই স্মেনখকরের দিকে দৃষ্টি রাখিস। কেন যেন মনে হয় আমাদের চারদিকের নিরাপত্তার বেষ্টনী আগের মতো আর নিশ্ছিদ্র নয়।

—আমারও তাই মনে হয়। প্রাসাদ কিংবা প্রাসাদের বাইরে এক এক জায়গায় এমন সব মানুষকে দেখতে পাই যাদের সেখানে মানায় না। সেখানে থাকার কথাও নয়। রাতের বেলায় ছায়া মূর্তিও দেখি যেন। সবই কি আমার চোখের ভুল? তোর কি মনে হয়?

—বুঝি না। তবে অনেক কম বয়স থেকেই আমার মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধে আছে। এখন ফ্যারওকে দেখে মনে হয়, তাঁর মনের রোগ আমার মধ্যে রক্তের মাধ্যমে চলে এসেছে বুঝি। আমিও পাগল হয়ে যেতে পারি।

—বাজে কথা।

—হয়তো তাই। আমিও মাঝে মাঝে ভাবি, এই সব অবাস্তব আশঙ্কাকে আমল দেব না। কিন্তু পারি না। মা চলে যাবার পর থেকে দিন দিন সাহস হারিয়ে ফেলছি।

ফ্যারও অখেন-অটেনের মৃত্যু হ'ল। এই মৃত্যু খুবই স্বাভাবিক। তিনি ধীরে ধীরে তাঁর মানসিক ভারসাম্য একেবারে হারিয়ে ফেলেন। তবে নিজের মস্তিষ্ক বিকৃতি সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন শেষ পর্যন্ত। অয়কে আর স্মেনখকরেকে প্রায়ই বলতেন, তিনি আর বাইরে আসতেন না। তাঁর দিন ভাল যাচ্ছে না। তিনি সুস্থ নন।

তাঁর ক্ষুধা কমতে থাকে দিনের পর দিন। আপন মনে বিড়বিড় করে কথা বলতে লাগলেন। আর মাঝে মাঝে নেফেরতিতির নাম উচ্চারণ করতে থাকেন।

অনখেসেন একদিন ফ্যারওর মুখে মায়ের নাম উচ্চারিত হতে দেখে প্রশ্ন করেছিল—মাকে ফিরিয়ে আনব?

--এ্যাঁ?

—মাকে আপনার কাছে নিয়ে আসব?

—কে মা?

—সম্রাজ্ঞী নেফেরতিতি।

একটু হাসির রেখা ফুটে ওঠে যেন মুখের ওপর। ঘাড় দুলিয়ে বলেন—খুব ভাল। খুব ভাল।

—তাঁকে থীবস থেকে আনতে পাঠাব?

—কি বললি! না খবরদার।

তিনি শেষের দিকে খাওয়া দাওয়া একেবারেই ছেড়ে দিলেন। প্রাসাদের চিকিৎসক পেপির শত চেষ্টা বিফলে গেল। তাঁর দেহ শয্যায় মিশে গেল। অবশেষে মৃত্যু এলো।

ফ্যারওর নামের সঙ্গে মিলিয়ে নতুন রাজধানী তেল-এল-আর্নেবের নামও রাখা হয়েছিল অনখেটটেন। সেই সময়ে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সমাধিস্থল নির্মাণ করা হয়েছিল পূর্বদিকের মরু পাহাড়গুলো খনন করে। অখেন-অটেন নিজের সমাধিস্থলও নির্মাণ করেছিলেন ওয়াদিতে। ওয়াদিতে নিয়ে যাওয়া হ'ল তাঁর শবদেহ। সঙ্গে চলল বহু ভোগ্যপণ্য, বহুমূল্য আসবাবপত্র, স্বর্ণালঙ্কার, খাদ্যসামগ্রী। সমাধির অভ্যন্তরে সেগুলো ফ্যারওর ব্যবহারে লাগবে।

প্রজাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র শোকের ছায়া নামল না ফ্যারও-এর মৃত্যুতে। তারা মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এবারে বোধহয় তারা তাদের প্রাণের দেবতা অমেনের পূজা করতে পারবে। এবারে বোধহয় সৈন্যরা আবার দিগ্বিজয়ে বের হবে। এবার আবার ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশ সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে। প্রজাদের বিষণ্ণ মুখে হাসি ফুটবে। অখেন-অটেনের পিতা তৃতীয় অমেনোফিসের মৃত্যুর পর সব কিছুই বিসর্জন দিয়েছিলেন পুত্র। তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল অমেন দেবতার পরিবর্তে অটেনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। অমেনের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধাকে বিদ্বেষে পরিণত করা। তিনি সম্পূর্ণ বিফল হলেন। প্রকৃতির আর স্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে যেতে গিয়ে নিজেই হলেন অপ্রকৃতিস্থ। প্রজাদের কাছে হলেন অনভিপ্রেত।

কিন্তু অন্যদের প্রতিক্রিয়া যাই হোক, পিতার শবদেহ প্রাসাদ থেকে নির্গত হলে অনখেসেন ভূলুণ্ঠিতা হয়ে অশ্রুবিসর্জন করল। সে জানে, পিতা যেমনই হোন, মায়ের প্রতি তাঁর ভালবাসা অটুট ছিল শেষদিন পর্যন্ত। অনেক প্রমাণ সে পেয়েছে। তার অবস্থা দেখে মার্ত ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল।

—তুই হাসছিস্ মার্ত।

—তবে কি কাঁদব? ওই মানুষটা কার কবে কতটুকু উপকার করেছে সারা জীবনে?

—আর কার করেছেন বলতে পারব না। তবে তোর উপকার করেছেন। তোকে রাণী বানিয়ে দিয়েছেন।

—এমনিতেই হতাম।

অনখেসেন আঘাত পায়। সে বলে—অখেন-অটেন যত খারাপই হোন, তিনি তোর স্বামীর নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করে রেখেছিলেন।

—কিভাবে?

—এতদিন ফ্যারওর শত্রুপক্ষ জানত, একজনের মৃত্যু হলে অন্যজন রয়েছেন। কিন্তু এখন তোর স্বামী বে-আব্রু। তাকে সরাতে পারলেই উচ্চাকাঙ্ক্ষীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। সামনে শুধু একটি বাধা এখন।

মার্তের মুখের হাসি কোথায় মিলিয়ে যায়। তার চোখে ফুটে ওঠে আতঙ্ক।

সে বলে—তাই তো। তুই একদিন বলেছিলি বটে হোরেমহেবের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা। এমন আরও অনেকে আছে কিনা কে জানে।

অনখেসেন চুপ করে থাকে। কী বলবে সে? বলার কিছু নেই। পিতার মৃত্যুর পর নেফেরতিতির অভাব আরও তীব্রভাবে অনুভব করে সে। এই সময় মা থাকলে বড় ভাল হতো। তাঁর উপস্থিতি মার্ত আর স্মেনখকরের পক্ষেও মঙ্গলজনক হতো।

কিছুদিন পরে স্মেনখকরের সম্মতি নিয়ে পিতার সমাধিস্থল পরিদর্শনে যায় অনখেসেন। সেটি

এখন প্রস্তরখণ্ড দিয়ে গেঁথে ফেলা হচ্ছে। চারদিকে প্রহরীবেষ্টিত। শ্রমিকদের এমনভাবে এক একদিন এক এক জায়গায় কাজ দেওয়া হয়েছে যে সমাধির গর্ভগৃহের হদিশ তারাও পাবে না। তারা জানে না ঠিক কোথায় শবদেহ এবং কোথায় বহুমূল্যবান সামগ্রী রাখা হয়েছে। কারণ ভবিষ্যতে তারা সমাধিক্ষেত্র খনন করে সেই সব দ্রব্য অপহরণ করতে পারে। এমন ঘটনা ঘটেছে অতীতের কয়েকজন ফ্যারওর সমাধিক্ষেত্রে। অপহরণকারীরা দক্ষ শ্রমিক। তারা সোজাপথে না গিয়ে অন্যপথে সিঁধ কেটে সমাধিগর্ভে প্রবেশ করে। কেউ বুঝতেও পারে না। সেই পথেই তারা মহামূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী অপহরণ করে পালিয়ে যায়। অনেকের ধারণা অপহরণকারীদের পূর্বপুরুষেরা ওই সমস্ত পিরামিড বা সমাধিক্ষেত্রে কাজ করেছিল। বংশ পরম্পরায় তারা জানত সমাধির নকশা কেমন। নইলে ওভাবে চুরি করা অসম্ভব। তাই অখেন-অটেনের সমাধিস্থল প্রহরীবেষ্টিত। শ্রমিকদের এক একদিন এক একদিকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে। অনখেসেন ভাবে, এভাবে কি রক্ষা করা যাবে?

মরুপথ ধরে এগিয়ে চলে অনখেসেনের গাড়ি—সঙ্গে অনুচরবৃন্দ। চারদিকে ধূ ধূ বালুকারাশি। বৃদ্ধের বলিরেখাসদৃশ কুঞ্চিত বালুকাস্তর সম্মুখে। কোথাও কোথাও বালিয়াড়ির মতো বালুকাস্তূপ।

পিতার নির্ণীয়মান শেষ আশ্রয়স্থলের কাছে পৌঁছে গাড়ি থেকে অবতরণ করে সে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে। শ্রমিকেরা কর্মব্যস্ত। কোনোদিকে লক্ষ্য করার ফুরসৎ নেই তাদের। তাদের কাজের তদারকি করছে কিছু সর্দার শ্রেণীর লোক। মাঝে মাঝে উচ্চকণ্ঠে ধমকে উঠছে কোথাও কোনো শ্লথতা নজরে পড়লে।

সেই সময় একজন তরুণ শ্রমিক দলছুট হয়ে এগিয়ে আসে মৃত ফ্যারাও-এর কন্যা সমীপে। অনখেসেন অবাক হয়। সবাইকে আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আজ সে পরিদর্শনে আসবে। সবার মধ্যে তাই অতিমাত্রায় কর্মব্যস্ততা। তারা জানে, কাজে ঢিলে দিলে তাদের ওপর মর্মান্তিক নিপীড়ন হতে পারে। পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হবে তারা। তবু তরুণটি তার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে অভিবাদন জানায়। ঘর্মাক্ত পেশীবহুল মানুষটির দিকে চেয়ে মুগ্ধ হয় অনখেসেন। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে প্রবল অনুসন্ধিৎসা জাগে। এই দুঃসাহস যুবকটি পেল কোথা থেকে। কী তার অভিপ্রায়?

—আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি জেনেশুনেই অন্যায় করেছি আপনার কাছে এসে।

—কেন এসেছ? কি চাও?

—আমার বাবা গতকালও এখানে কাজ করেছে। আজ সে নেই।

—আসেনি?

—সে পৃথিবীতেই নেই। কাজ করতে করতে মুখ দিয়ে রক্ত উঠল আর মরে গেল। ওই যে কালো রঙের পাথরটা পড়ে রয়েছে দেখছেন। ওইখানে পড়ে মরে গেল।

—সে কি! তোমার বাবা অসুস্থ ছিল?

—না। আমার চেয়েও মজবুত ছিল তার দেহ। সে চাষ করত। এখন চাষের সময়। ফসল ফলাবার সময়। তবু তাকে জোর করে ধরে আনা হয়েছিল। তাই অনাহারে থাকতে হয়েছে আমাদের গোটা পরিবারকে। আমার ছোট বোন আগেই মরেছিল। বাবা কালকে মরল। আমি দু'দিন না খেয়েও বেঁচে আছি। আরও কয়েকদিন বাঁচব। কিংবা আপনার সামনে দাঁড়াতে দেখে আজও ফ্যারওর লোকজনেরা আমাকে মেরে ফেলতে পারে।

—না। কেউ তোমাকে মারতে পারবে না।

—মারুক। সেই ভয় নেই! আমি বলতে এসেছি এভাবে আমাদের অনাহারে রাখলে মৃত অখেন-অটেনের আত্মাও শান্তি পাবেন না। আগের ফ্যারওরাও যেমন পাচ্ছেন না। তাঁরা তাঁদের খাদ্য স্পর্শ করতে পারছেন না আমরা অভুক্ত বলে। তাঁরা ছট্‌ফট্ করছেন।

—কি বলছ তুমি?

—আমার বিশ্বাসের কথা বলছি।

—যুগ যুগ ধরে এই নিয়মে চলে আসছে। একে পরিবর্তন করা যায় না।

—ফ্যারওদের মৃত আত্মারাও তাই অতৃপ্ত রয়েছেন যুগ যুগ ধরে।

—না।

—আপনি আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন। আর পারছি না। নীলনদের পলিমাটি শুকিয়ে যাচ্ছে। সেখানে সবুজের সৃষ্টি হচ্ছে না। উর্বর ভূমি ব্যর্থতায় কাঁদছে। যারা কান পাততে জানে তারা এই কান্না শুনতে পাচ্ছে।

ঠিক সেই সময় যেন ভূতল জঠর থেকে আবির্ভূত হ'ল হোরেমহেব। অনখেসেন বিস্মিত হয়। কোথা থেকে এলো মানুষটা?

হোরেমহেব ক্রোধান্বিত কণ্ঠে বলে—তুমি এখানে এসেছ কেন? উনি ডেকেছেন?

অনখেসেন সঙ্গে সঙ্গে বলে—হ্যাঁ। আমি ডেকেছি।

যুবক হতবাক। হোরেমহেব বলে—আপনি? এই অপরিচ্ছন্ন শ্রমিককে আপনি ডেকেছেন? কেন?

অনখেসেনের মাথা গরম হয়ে ওঠে। বলে—আমার কৌতূহল হয়েছে। তাই।

—অদ্ভুত আপনার কৌতুহল।

—আপনার এখানে আসাও অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে। কেন এসেছেন?

হোরেমহেব শ্রমিকটিকে চলে যেতে ইশারা করে। সে চলে গেলে বলে—আপনারই জন্যে।

—আমার জন্যে?

—হ্যাঁ। আপনি অল্প কয়েকজন দেহরক্ষী নিয়ে এতদূরে এসেছেন শুনে আমি উৎকণ্ঠিত হয়েছিলাম। ফ্যারও হয়ত বুঝতে পারেননি। তাই আপনাকে আসতে অনুমতি দিয়েছিলেন।

—আপনার উৎকণ্ঠিত হবার প্রয়োজন ছিল না।

—কত সহজে কথাটা আপনি বললেন। অথচ যদি আমার বুকের ভেতরটা দেখাতে পারতাম তাহলে বুঝতেন হৃদয়ে কোথায় আপনাকে স্থান দিয়েছি।

অনখেসেন বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলে—আপনাকে দেখাতে হবে না। মুতনেজেমেত তাহলে স্থানচ্যুত হয়ে যাবেন। তার চেয়ে তিনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন। শত হলেও তিনি আমার মায়ের সবচেয়ে ছোট বোন। বয়সের তারতম্যেও ঠিক মানানসই হবেন।

হোরেমহেব কয়েক মুহূর্ত স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। সে একজন বাস্তববাদী সুচতুর মানুষ। তাই নিজের অস্বস্তির কথা অনখেসেনকে জানতে দিতে চায় না। সে সহাস্যে বলে ওঠে—বয়স? নারী পুরুষের প্রেমের রাজ্যে বয়স কোনো প্রতিবন্ধক হয়নি কখনো। ভুলে যাবেন না আপনার পিতামহ নিজ কন্যাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাছাড়া মুতনেজেমেত আমার হৃদয়ের ত্রিসীমানায় নেই।

—বেচারা। আর কতজনের সঙ্গে এই অভিনয় করছেন?

—আপনার পিতা আমাকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, তাতে অনেক নারী আমার সংস্পর্শে আসতে চায়। সুতরাং অভিনয় হয়ত করতে হয়। শুধু আপনি ছাড়া। আপনার জন্য আমার রাতের নিদ্রা গিয়েছে।

—আর দিনের আহার? তাও নিশ্চয় গিয়েছে।

—আপনি বিদ্রূপ করতে পারেন। আপনার বিদ্রূপও আমার কাছে মধুময়।

অনখেসেন এবারে সত্য সত্যই বিরক্ত হয়ে ওঠে। বলে—আপনি প্রধান সেনাপতি। এতগুলো প্রজার সামনে দৃশ্যের অবতারণা করে কোনো লাভ নেই। আমি পিতার সমাধিস্থল নিশ্চিন্তে দেখতে এসেছিলাম। আমার সাধ মিটেছে। পরে কখনো সম্ভব হলে আবার আসব। আপনি এবার অনুগ্রহ করে আমাকে নিষ্কৃতি দিন।

হোরেমহেব মষীবর্ণ মুখে স্থান ত্যাগ করে। প্রথম দিনের ঘটনায় লোকটির প্রতি সামান্য একটু দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল মনে। কিন্তু মুতনেজেমেতের কথা শুনে সে নিজেকে শক্ত করে ফেলেছে।

দূরে পাহাড়ের পর পাহাড় দেখা যায়। অনখেসেন জানে ওই সমস্ত পাহাড়ের অনেক গুলোতেই রয়েছে পুরাকালের বহু ফ্যারওর দেহ। শ্রমিক যুবকটি ওদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেই বলেছিল— ফ্যারাওরা ওখানে ছট্‌ফট্ করছেন।

হয়তো তাই। শ্রমিকদের অনাবৃত দেহগুলো সূর্যকিরণে চক্‌চক্ করছে। তারাও যেন এক এক খণ্ড পাথর। হয়তো অতটা কালো নয়। আবার কেউ কেউ ঘন কৃষ্ণবর্ণের। তারা এসেছে দক্ষিণের দেশগুলো থেকে। অমন আসে অনেকে। ওই সব দেশে নাকি প্রায়ই আকাল হয়।

দেহরক্ষীদের দলপতি এসে জানায় যে প্রত্যাবর্তনের সময় হয়েছে। অনখেসেন গাড়িতে ওঠার জন্য দুটি অতি ক্ষুদ্র ঢিবির মধ্য দিয়ে সঙ্কীর্ণ বালুকাময় পথ ধরে অগ্রসর হয়। কিছুটা পথ অতিক্রম করেই সে থমকে দাঁড়ায়। একটি রক্তাক্ত দেহ পড়ে রয়েছে অনতিদূরে একটি পাথরের ওপর।

দলপতিকে প্রশ্ন করে—এর এই দশা কে করল?

—ও আপনার মর্যাদা রাখেনি। অসম্মান করেছিল আপনাকে?

—আমাকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমাকে অসম্মান করল, অথচ আমি জানলাম না।

মৃতের মুখ দেখে সে স্তম্ভিত হয়। শ্রমিকদের মধ্যে একমাত্র এই যুবকটির সঙ্গে সে পরিচিত হয়েছিল। হোরেমহেবের প্রতি ঘৃণায় আর বিদ্বেষে তার মন ভরে ওঠে। আজীবন বিবাহ না করলেও হোরেমহেবের অঙ্কশায়িনী কখনো হবে না সে। বরং আগের সেই দেব-মহিষীর মতো জীবন কাটিয়ে দেবে।

ক'দিন পরে অয় একদিন অনখেসেনের দর্শনপ্রার্থী হয়। প্রাসাদে অয়-এর একটা বিশেষ স্থান আছে। অখেন-অটেনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ছিল অয়। তাছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুও বটে। সেই সঙ্গে প্রধান পরামর্শদাতা। শৈশব থেকে অয়কে অনখেসেন দেখে আসছে। অনেক আবদার করেছে তার কাছে। অনেক জ্বালাতন করেছে। অয়কে দেখলে স্নেহপ্রবণ বলে মনে হয়।

অয়কে বেশ গম্ভীর দেখায়। অনখেসেন সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলে—নিয়মমাফিক সাক্ষাতের জন্য সে আজ আসেনি।

সে অয়কে বলে—আপনি আজকের মতো অসময়ে আমার সঙ্গে কখনো দেখা করেননি।

—কারণ রয়েছে।

অনখেসেন অয়-এর মুখের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করে। অয় চুপ করে থাকে। বোধহয় ভাবে, কি করে শুরু করবে।

শেষে বলে—আচ্ছা অনখেসেন, তুমি তো জন্ম থেকে এখানেই আছ। তোমার জন্মের দিনের কথা আমার আজও মনে আছে। তোমার কি মনে হয় না, সব কিছু আগের মতো ঠিক চলছে না। কোথাও কিছু যেন একটা অস্বাভাবিকতা রয়েছে?

—আমরা দেশের আর কতটুকু দেখতে পাই। এই প্রাসাদেই বরাবর থাকি।

—আমি দেশের কথা বলছি না। শুধু প্রাসাদের এই ভেতরটুকুর কথাই বলছি। তুমি তো একটা ঘরে আবদ্ধ থাক না। সর্বত্র ঘুরে বেড়াও। কিছু কি কখনো তোমার নজরে পড়ে না, যা তোমাকে চমকিত করে? কিংবা ধর কোনো ফিস্‌ফিসানি?

—আপনি কি বলতে চাইছেন বুঝতে না পারলেও আমার অনুভূতি সব সময় আমাকে শঙ্কিত করে

রাখে। শঙ্কা আমার শৈশব থেকেই রয়েছে। তখন থেকেই মনে হয় মৃত্যু প্রাসাদের প্রতিটি মানুষকে তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কত সময় চমকে উঠেছি। পিতার মৃত্যুর পর থেকে সেই শঙ্কাভাব আরও বেড়ে গিয়েছে।

—ঠিক।

—কি ঠিক?

—তুমি ঠিক বলেছ।

—কোন বিষয়ে?

—ষড়যন্ত্র। একটা ষড়যন্ত্র ঘনীভূত হয়ে উঠছে যেন।

অনখেসেন বলে—ষড়যন্ত্র কি এই প্রথম?

—না। কিন্তু এ আরও ভয়ানক। একটা বংশের অবলুপ্তি ঘটানোর ষড়যন্ত্র এটি।

—কি বলছেন আপনি!

—আমি তোমাকে পরিষ্কার করে বলতে পারছি না। সময় হলে সব বলব। কিন্তু তুমি খুব সাবধানে থেকো।

—আমি? আমি কে?

—তুমি কে? এখন সেটা তোমাকে বলব না। তবে তুমি অনেক কিছু। বলতে গেলে, তুমি সব কিছু।

অনখেসেন মনে মনে ভাবে, মা নেফেরতিতিও বলতেন সে কথা। সে এবং তুতন্‌খটেন। কিন্তু অয়কে সে কথা বলা বোধহয় উচিত হবে না। অয়-এর দৃষ্টিভঙ্গি তাব জানা নেই। সে হয়তো অন্যরকম কিছু ভাবছে।

সে বলে—আমার নিরাপত্তা কি আমার ওপর খুব একটা নির্ভর করে?

—নিশ্চয়। তুমি সদাসতর্ক থাকলে অনেক বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পার। আমি যেটুকু সম্ভব নিশ্চয় দেখব।

—কিন্তু আপনার ভীতির এমন কি কারণ ঘটল? স্মেনখকরে দিব্যি রাজ্য শাসন করছেন। তিনি নীরোগ।

—জানি। তবু।

একটু বাজিয়ে দেখার জন্য সে অয়কে বলে—হোরেমহেব আমাকে বিবাহ করতে চায়।

লাফিয়ে ওঠে অয়। বলে— তোমাকে সে নিজে এসে বলেছে? এর মধ্যেই? জানতাম বলবে।

—আপনি জানতেন?

—হ্যাঁ। তোমাকে বিয়ে করতে পারলে ওর পথ মসৃণ হয়ে যায়। তখন শুধু একটি বাধা, একটি মৃত্যুই যথেষ্ট।

—কোন্ মৃত্যু? কার মৃত্যু?

—সেকথা এখনই বলতে পারব না। কারণ আমি প্রমাণ করতে পারব না। তুমি সাবধানে থেকো অনখেসেন।

—স্মেনখকরের সহসা মৃত্যুর কথা ভাবছেন?

চমকিত হয়ে বলে—তুমি বুঝতে পেরেছ তাহলে?

—আমি অনেক আগে থেকেই জানি।

—কি করে জানলে?

—মা বলেছিলেন।

—ও।

—আপনাকে একটা কথা বলব?

—নিশ্চয় বলবে। এখন থেকে আমাদের দু'জনার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলতে হবে।

—আপনি আমার মায়ের ফিরে আসার ব্যবস্থা করতে পারেন না?

—নেফেরতিতির?

—হ্যাঁ। বাবা মৃত। তাঁর আদেশ এখন বলবৎ থাকতে পারে না।

অয় একটু হেসে বলে—ফ্যারও কখনো মৃত হন না। দেহের পরিবর্তন ঘটে মাত্র। এক ফ্যারওর আদেশ পরবর্তী ফ্যারও বাতিল করতে পারেন বটে। কিন্তু কেন তাঁকে ফিরিয়ে আনতে চাও?

—মায়ের কাছে থাকব বলে। আমার জীবন বড়ই নিঃসঙ্গ। তুতেনখটেন মায়ের সঙ্গে ফিরে আসবে।

—ছেলেটি বড় সুন্দর। তাকে দেখলে মায়া হতো।

—ঠিক বলেছেন। আমারও।

—কিন্তু তোমার মা এলেও তুতন্‌খ-এর এখানে আসা ঠিক হবে না।

—কেন? তার অপরাধ?

—অপরাধ আছে বৈকি। সে ভূতপূর্ব অখেন-অটেনের ভ্রাতা। উভয়ের পিতাই অমেনোফিস। হোরেমহেব তাকে বরদাস্ত করবে না।

—কেন? সে তো স্মেনখকরে নয়।

—একবার ভেবে দেখো ফ্যারও হওয়া তার পক্ষে কত সহজ।

অনখেসেন একটু চুপ করে থেকে বলে—আমি জানি আপনি কি বলতে চাইছেন। আপনি বলতে চাইছেন হোরেমহেব ষড়যন্ত্র আর মৃত্যুর মাধ্যমে সিংহাসন অধিকার করতে চায়।

—ঠিক।

—আজ আপনি প্রবীণ না হলে আমাকে বিয়ে করতে পারতেন। আপনার পথও সুগম হতে পারত। তাই না?

—তুমি ভুল বুঝলে অনখেসেন। সিংহাসনের প্রতি ললুপতা অতটা আমার নেই। থাকলে তোমাকে বিয়ে করতে বাধা কোথায়?

—আমি আপনার মেয়ের চেয়েও ছোট।

—কিছু এসে যায় না তাতে। তবে হোরেমহেবকে বাধা দিতে হলে যদি তোমাকে বিয়ে করতে হয় আমি তাই করব।

—আমার নিজের মতামত নেই?

—থাকলেও এসে যাবে না। ওকে রুখতে আমি বেপরোয়া হবো।

—তাহলে দেখছি আপনারা দু'জনেই সমান।

—না। আমি তোমাদের বংশের পতন ঘটাতে চাই না। হোরেমহেবের মনের ইচ্ছা তাই। আমার একমাত্র লক্ষ্য হোরেমহেব যেন সফল না হতে পারে।

—তার মতলব এতটাই স্পষ্ট আপনার কাছে?

—হ্যাঁ। আমি অনেকদিন ধরে তাকে কড়া নজরে রেখেছি। তাই বুঝতে পারি। ভুলে যেও না অনখেসেন তোমার পিতামহের সময় থেকে আমি তোমাদের বংশের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছি। তখন আমি সবে যৌবনে পদার্পণ করেছিলাম।

—জানি। ছেলেবেলায় আপনি আমাদের স্নেহ করতেন, তাও বুঝতাম। তবু হিংসাকে যে আপনি প্রশ্রয় দেন, নিজের অধিকারক বজায় রাখতে নরহত্যায় যে আপনারও কোনো অরুচি নেই, তাও জানি।

বিস্মিত অয় বলে—কি বললে?

—যা বললাম, আপনি ভালভাবেই শুনেছেন।

—প্রকারান্তরে আমাকেও তুমি হত্যাকারী বলতে চাইছ।

—আমি জানি, আপনি যে হত্যাকারী, এ কথা মনেপ্রাণে কখনো অস্বীকার করতে পারবেন না।

অয় অনেকক্ষণ অনখেসেনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। শেষে তার মুখে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে। সে মাথা ঝাঁকায়। ভাবে, হোরেমহেব তার সম্বন্ধে নিশ্চয় কিছু বলেছে অনখেসেনকে। বেচারা সে কথা বিশ্বাস করেছে।

—হোরেমহেবের কোনো কথায় বিশ্বাস করো না। সে তোমার মন ভাঙাচ্ছে।

অনখেসেন নিজেকে সামলে নেয়। প্রাসাদে উপস্থিত মিত্র বলতে এখন মাত্র অয় রয়েছে। তাকে শত্রুতে পরিণত করা বিপজ্জনক হবে। বড় বোন মার্ত-এর প্রেমিককে কবে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছিল, সেকথা প্রকাশ না করাই ভাল। নিজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রাণ হনন এমন কিছু নতুন ঘটনা নয়। এর চেয়েও আরও নৃশংস, আরও ভয়াবহ ঘটনা ঘটে নীলনদের অববাহিকায়।

অয়-এর কথায় সে হেসে বলে—হতে পারে। হোরেমহেব যথেষ্ট বলশালী পুরুষ। তার কথায় একটা আকর্ষণ আছে। সহজেই বিশ্বাস করে ফেলি। তার যৌবন আছে, সে মোটামুটি সুপুরুষ। সেই জন্যেই বোধহয়।

—না না, তার যৌবনে কখনো ভুলো না। সে সাংঘাতিক।

—আপনার উপদেশ মনে থাকবে।

অনখেসেন-অটেন ভালভাবেই জানে সম্রাজ্ঞী হলেও তার বোনের মনে কোনো শান্তি নেই। শুধু পুরুষ পদবাচ্য একজন মানুষের সঙ্গে ঘর করা যায় না—ফ্যারও হলেও নয়। স্মেনখকরের ওপর দিনের পর দিন ঘৃণা সঞ্চিত হতে থাকে তার মনে এ খবর অনখেসেন ভালরকম রাখে। একজন পুরুষের লোভ-লালসা সবই আছে, অথচ সে নারী সঙ্গ চায় না, এর চেয়ে ঘৃণিত আর কি থাকতে পারে? মার্ত ভাবে এটা তার নারীত্বের প্রতি চরম অবমাননা।

অনখেসেন একদিন কথার ছলে বড় বোনকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল সেই দিনের কথা যেদিন স্মেনখকরে তার হাত ধরে খেজুর গাছের অন্তরালে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কথাটা শুনে ক্ষেপে উঠেছিল মার্ত।

বলেছিল—সেদিন আমি ভুল বুঝেছিলাম। সেদিন আমাকে শুধু চুমু খেয়েছিল। আর কিছু নয়। অথচ কত সুযোগ ছিল। তুই আমাদের দেখেছিলি কোনো সুযোগে। কিন্তু অন্য কোনো জনপ্রাণীকে দেখতে পেয়েছিলি? তুই-ই বল।

ঘাড় নেড়ে অনখেসেন বলে—না।

—তবে? কত সুযোগ ছিল। কিন্তু শুধু জড়িয়ে ধরা আর চুমু খাওয়া। এখন ভাবলে লজ্জা হয়, ঘৃণা হয়।

—কিন্তু সেদিন ফ্যারও নিশ্চয় অভিনয় করেননি।

—আলবৎ করেছে। ওর ভয় ছিল আমাকে বিয়ে না করতে পারলে ফ্যারও হতে পারবে না।

—কেন? ও নিজেও তো অখেন-অটেনের পুত্র?

—তবু।

—এ কথার কোনো যুক্তি নেই।

—আছে। অখেন-অটেন জানতে পেরেছিলেন ও সমকামী।

—*কি বলছিস!*

—হ্যাঁ। ও নিজে আমার কাছে কবুল করেছে। তাই আমার সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলা করছিল। আর সেটা আমার কাছে কত গোপন বলে মনে হয়েছিল সেদিন। কিন্তু প্রতিটি ঘটনায় সাক্ষী ছিল। পিতা নিজে সাক্ষী রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। উনি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন তাঁর উত্তরাধিকারী পুরুষের প্রতি অদম্য মোহ থেকে সরে এসে নারীর প্রতি আসক্ত হয়েছে কিনা। তখন এসব জানলে আত্মহত্যা করতাম।

অনখেসেন স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। তার মুখ দিয়ে বাক্য নির্গত হয় না। ভাবে, বড় বোনের মতো এমন ভাগ্যহীনা রমণী পৃথিবীতে বোধহয় খুব কমই আছে। ওর নিজের প্রেম অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছিল যৌবনের প্রথম উন্মেষের সময়। সেই প্রেম বালি চাপা পড়েছে। তারপর ভেবেছিল জীবনে প্রেম না আসুক, অন্তত নারীর মর্যাদাটুকু সে পাবে। স্মেনখকরে সেই মর্যাদায় পদাঘাত করেছে। সমবেদনার কথা যোগায় না তার মুখে।

মার্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে—এবারে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিস রাণী হয়েও আমি কত সুখে আছি?

—বুঝেছি। তবু স্মেনখকরের স্বার্থের সঙ্গে তোর স্বার্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে। তার মঙ্গলে তোর কতটা মঙ্গল জানি না। তবে তার অমঙ্গলে তোর অমঙ্গল তো বটেই।

—কি রকম?

—খুব সোজা। তার জীবনহানি ঘটলে তুই আর সম্রাজ্ঞী থাকবি না। কোথায় গিয়ে পড়বি কোনো স্থিরতা থাকবে না। কিংবা হয়তো কেউ ফ্যারও হবার লোভে তোকে জোর করে বিয়ে করবে।

মার্তের মুখে হাসি ফোটে। বলে—তেমন কোনো পরিত্রাতা আছে কি এই মিশরে?

—আছে বৈকি?

—কে?

—সেনাধ্যক্ষ হোরেমহেব।

—আহা, অটেন যেন তাই করেন।

—কি বলছিস তুই? এতে আমাদের পিতৃবংশ নষ্ট হবে।

—হোক। বয়ে গেল। আমার গর্ভের সন্তানের বংশ তো থাকবে।

—তুই বড় সর্বনাশা নারী।

—হ্যাঁ। কিন্তু সেটা আমার দোষ নয়। আমাকে অমন করা হয়েছে। আর করেছে আমার পিতৃবংশ। সেই বংশ নির্বংশ হলে আমার আনন্দই হবে।

অনখেসেন গম্ভীর হয়। তার তুতনখটেনের কথা মনে পড়ে। সে এই বংশেরই কিশোর। তার কোনো অমঙ্গল হোক একথা মনেও স্থান দিতে চায় না সে।

মার্ত দুঃখের হাসি হেসে বলে—চুপ করে রইলি কেন? রাগ না দুঃখ?

—হোরেমহেব না হয়ে অন্য কেউও তোকে জোর করে বিয়ে করতে পারে। ফ্যারওর সিংহাসন বড়ই লোভনীয়।

—যেমন?

—যেমন অয়।

মার্ত দুঃখেও হেসে ফেলে—ওই বুড়ো।

—কেন, বুড়োদের লোভ থাকতে নেই?

—থাকবে না কেন? কিন্তু সে আমাকে নিয়ে কি করবে?

—সেকথা কি করে বলব?

—আমি তাতেও রাজি। আমার এই রাজ্ঞীর আসন অটল রেখে সবটাতেই আমি রাজি।

এবারে অনখেসেন রেগে যায়। সে বিদ্রূপ করে বলে—কিন্তু তোর যে রকম ভাগ্য অত সুখ সইবে না। স্মেনখকরেকে পদচ্যুত কিংবা অন্য কোনোভাবে সরিয়ে তোকেও বালির নীচে পুঁতে ফেলতে পারে।

—ভুলে যাস না অনখেসেন আমি তোর বোন হলেও সম্রাজ্ঞী। ওজন করে কথা বলিস।

—আমি মাফ চাইছি। এই ভয় দেখানো বা আদেশের ক্ষমতাটুকু যাতে তোর বজায় থাকে আমিও তাই চাই। আর সেই জন্যেই এসেছিলাম তোর কাছে। স্মেনখকরেকে যতই ঘৃণা করিস, তার জীবনহানি যাতে না ঘটে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

—আমার কি করার আছে? ফ্যারওর মন্ত্রী আছে, সেনাধ্যক্ষ আছে। তারা তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে।

হতাশ অনখেসেন বলে—এতক্ষণ তবে বললাম কি? যাদের ওপর ওর নিরাপত্তা রক্ষার ভার তারাই যদি ক্ষতি করতে চায়, তাহলে?

—তাহলে কি? আমি ওর নিরাপত্তা দেখব?

—দেখবি বৈকি। নেফেরতিতি দেখতেন তাঁর স্বামীর নিরাপত্তা।

—নেফেরতিতি? যে তার সন্তানদের ভালবাসেনি কখনো?

ভুল ধারণা। তাঁর মনে যথেষ্ট স্নেহ ছিল। কিন্তু বড় চাপা। তবু বলব, স্নেহশীলা রমণীর মতো তিনি সত্যি ছিলেন না। তবে তারও কারণ আছে। তার ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন একদিন আমাকে। কিন্তু এখানে স্নেহের কথা বলছি না। তিনি আদর্শ সম্রাজ্ঞী ছিলেন, সেই কথাই বলতে চাইছি। তিনি তাঁর স্বামীর অপ্রকৃতিস্থতা বহুদিন সবার অগোচরে রাখতে পেরেছিলেন। স্বামীর কাছ থেকে সরে আসার পরই শুধু অখেন অটেন বে-আব্রু হয়ে পড়েন। নেফেরতিতি রাজ্যের সমস্ত ঘটনার কথা জানতেন। তিনি রাজনীতি বুঝতেন।

—এত কথা কোথায় শুনলি।

—তিনি নিজে থেকে আমাকে কিছু কিছু বলেছিলেন। তাছাড়া গোপনে একটা পত্র লিখে পাঠিয়েছেন।

স্তম্ভিত মার্ত বলে ওঠে—তোকে?

—হ্যাঁ। কাকে আর লিখবেন? সবাই তো বিরূপ।

—কেন আমি সম্রাজ্ঞী, আমাকে?

—জানি না। বোধহয় ভেবেছিলেন, আমাকে লিখলেই তুই জানবি।

—কি লিখেছেন?

—প্রথমেই লিখেছেন, ফ্যারওকে সরাবার ষড়যন্ত্র ঘনীভূত হচ্ছে।

—আমরা প্রাসাদে বসে জানতে পারলাম না, আর উনি অত দূরে বসে জেনে ফেললেন?

—ভুলে যাস না উনিই ছিলেন সম্রাজ্ঞী। অনেক বিশ্বস্ত অনুচর ওর ছিল যারা অহরহ খবরে এনে দিত। আজও তাদের কিছু কিছু তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত। হয়তো কোনো উপকার করেছিলেন তাদের। তোরও নিশ্চয় অনুচর রয়েছে। তুই সম্রাজ্ঞী।

উষ্ণ কণ্ঠে মার্ত বলে—না।

—সেকি। তুই যে একদিন বলেছিলি, তোর এখন অনেক চোখ।

—সে সব কথা থাক। আর কি লিখেছেন নেফেরতিতি?

—লিখেছেন ফ্যারওকে বারবার বলতে, হোরেমহেব যেন কোনো যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করে। নইলে সৈন্যদল বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। বসে থেকে থেকে তারা বিরক্ত। অন্য দেশে সমরাভিযানে

গেলে তারা শান্ত হবে। পরাজিত দেশে লুণ্ঠন করে কিছু অর্থ উপার্জন করবে। দেশের শান্তি বজায় রাখতে কৌশল হিসাবে এমন করতে হয় বলে মা লিখেছেন।

—আর?

—আর লিখেছেন, সৈন্য চলাচল হলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যও সচল হবে।

—এতই যখন জানতেন নেফেরতিতি সম্রাজ্ঞী থাকার সময় করেননি কেন?

—বাবার সঙ্গে তাঁর এই জন্যই বিরোধ। নইলে তুই তো শুনেছিস তিনি প্রথম জীবনে বাবাকে অনুসরণ করে অটেনকে বিশ্বাস করেছেন। তাঁর জন্যে অনেক মন্দিরও তৈরি করে দিয়েছেন। কিন্তু পরে বুঝতে পারেন বাবা ঠিক সুস্থ মস্তিষ্কের ছিলেন না। তাঁর একগুঁয়েমিও রোগের অঙ্গ। তবু চেষ্টা করেছিলেন যুদ্ধাভিযানের জন্য। পারেননি। ফ্যারওর পাগলামির কাছে ধাক্কা খেয়েছে তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা। বুঝলেন দেশ রসাতলে যেতে বসেছে। তখন শুধু ফ্যারওকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট হন। এই জন্যে তিনি কন্যাদের কাছে তো বটেই এমনকি স্বামীর কাছেও অপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

মার্ত চুপ করে থাকে।

অনখেসেনও সহসা নীরব হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে তার ভগিনীর কাছে কিছু বলা অনর্থক। কোনো ব্যাপারেই মার্তের আর আগ্রহ নেই। সম্রাজ্ঞী হয়েও সে জীবনের কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছে না। সে স্বামীর ভালবাসা পায়নি, স্বামীকেও সে ভালবাসতে পারেনি। তাই মিশরের ভাগ্য নিয়ে তার কোনো চিন্তা নেই। এইখানেই মায়ের সঙ্গে তার পার্থক্য। স্বামীকে এবং সেই সঙ্গে নিজেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখতে তার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। মার্তের মধ্যে তার ছিটেফোঁটাও নেই। তার একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষার সামান্য অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। সেটি হলো, অন্য যে কোনো পুরুষের পত্নী হয়েও যদি সে সম্রাজ্ঞী থাকতে পারে, তাতেও ক্ষতি নেই। হতাশাগ্রস্ত মার্ত তার মনুষ্যত্ব হারাতে বসেছে।

অনখেসেন একসময় উঠে দাঁড়ায়।

—উঠলি কেন? আর একটু বোস।

—না, যাই।

—বুঝেছি, আমার সান্নিধ্য ভাল লাগছে না।

—ঠিক ধরেছিস। বেঁচে থেকেও তুই মরে গিয়েছিস।

মার্ত খিল খিল করে হেসে ওঠে। তার হাসির ধরনে চমকে ওঠে অনখেসেন। হাসিটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। শেষ পর্যন্ত পিতার রোগ ওর মধ্যেও দেখা দিল নাকি? অসম্ভব কিছু নয়।

সে ভগিনীর দিকে নিমেষের জন্য দৃষ্টিপাত করে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। তখনো শুনতে পায় সে, মিশরের সম্রাজ্ঞী হেসেই চলেছে।

ফ্যারও স্মেনখকরের দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে। রাজ চিকিৎসক পেপির অভিমত তাই। কোনো রোগের বিরুদ্ধে যুঝবার ক্ষমতা তাঁর নেই। খবরটা গোপন। গোপনই থাকবে। তবে অনখেনসেন জানল অয়-এর কাছ থেকে।

অয় গম্ভীর হয়ে বলে—আসলে এটা প্রচার।

—আপনি বলতে চান, ফ্যারও রোগগ্রস্থ নন?

—তিনি অবশ্যই অসুস্থ। কিন্তু যা রটনা করা হচ্ছে অত্যন্ত কৌশলে সেটা আদৌ সত্য নয়।

—এ কথার অর্থ।

—আমি বেশ কয়েকবার হোরেমহেবকে ফ্যারওর ব্যক্তিগত চিকিৎসক পেপির সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলতে দেখেছি।

—তাতে কি প্রমাণ হয় যে সে চক্রান্ত করছে?

—অবশ্যই হয়। কারণ এর আগে পেপির সঙ্গে কখনো তাকে কথা বলতে দেখা যায়নি। যেটুকু কথা আমিই বলে এসেছি বরাবর। প্রাসাদের কারও অসুখ হলে, আমার কাছেই আসত সে। অথচ খোদ ফ্যারও অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও আমার সঙ্গে কথা বলল না এ পর্যন্ত। ওর বাবাও চিকিৎসক ছিলেন। তিনিও আমার পরিচিত ছিলেন। তিনিও কখনো আমাকে অবহেলা করেননি।

—অবহেলা করাটা বড় কথা নয়। চিকিৎসাই মূল কথা। চিকিৎসার অবহেলা হচ্ছে কিনা সেটুকু দেখতে হবে।

—অবহেলা বলছি, এই জন্য যে ফ্যারও-এর মন্ত্রিত্ব তাঁর ধর্মবিষয়ক পরামর্শদাতা, তার সব কিছুর দায়িত্ব আমার ওপর রয়েছে চিরকাল। হোরেমহেব মাত্র সেদিন সেনাদলের ভার পেয়েছে। চিকিৎসার বিষয়ে তার কি ভূমিকা থাকতে পারে? সেইজন্যই অবহেলার প্রশ্ন উঠেছে। চিকিৎসক আমাকে প্রাধান্য না দিয়ে ভুল করেছে। কারণ তাতে আমার সন্দেহ জেগেছে।

—আপনার কি সন্দেহ?

—ফ্যারওকে খুব ধীরে ধীরে বিষ দেওয়া হচ্ছে হোরেমহেবের পরামর্শ অনুযায়ী। তাঁর জন্য চিকিৎসক হোরেমহেবের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ পাচ্ছে।

অয়-এর কথা শুনে অনখেসেনের বুকের ভেতর কেঁপে ওঠে। সে বলে—আপনার এত বুদ্ধি এত ক্ষমতা। বলতে গেলে দুই পুরুষ ধরে আপনি ফ্যারওর পরই সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি। আপনি কেন তবে নিশ্চেষ্ট হয়ে রয়েছেন। আমি বলতে গেলে একজন অপরিণত বুদ্ধির নারী। আমার কাছে এসব কথা বললে কি ফ্যারওকে বাঁচানো যাবে?

—না। তবু বললাম। তোমার জেনে রাখা দরকার।

—স্মেনখকরেকে আপনি বাঁচাবেন না?

—চেষ্টা করছি। আমি ভাবতে পারিনি, চিকিৎসক এমন অপদার্থ। প্রাসাদের আর কাকে কিনে রেখেছে হোরেমহেব কে জানে?

বিরক্ত অনখেসেন বলে ওঠে—আসলে বয়স হয়েছে বলে আপনি একটু নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। প্রৌঢ়ত্বের পরে শুনি মস্তিষ্কও অত সক্রিয় থাকে না।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে অনখেসেনকে যেন দগ্ধ করতে চায়। সামলে নিয়ে বলে—পরে প্রমাণ পাবে। তখন আবার ঘটা করে ক্ষমা চেওনা যেন।

—আমি ক্ষমা চাওয়া পছন্দ করি না। অতটা নরম আমি নই। নিজেকে অত অসহায় ভাবি না। তবে আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়ার মতো দিন এলে খুশিই হবো। শত হলেও আপনি আমার পিতামহের আমল থেকে রয়েছেন।

অয় হেসে বলে—আমি জানি তুমি সোজা মেয়ে নও। তাই ভয় হয় শেষ পর্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার সংঘাত না বাধে।

—কেন বাধবে? আপনার সঙ্গে তো আমার স্বার্থের সম্পর্ক নেই?

—এখন নেই বটে। হতে কতক্ষণ? আমার তো ধারণা একটা সম্পর্ক হতে চলেছে।

—সে কি? আপনি কি আমাকে সত্যি সত্যিই বিয়ে করার মতলব করছেন?

অয় হেসে ওঠে। বলে—না। তবে তার কাছাকাছি কিছু। আমি চলি। অনেক কাজ। তুমি ঠিকই বলেছ। আগের মতো আর তৎপর নই আমি। চিকিৎসকের এই ব্যবহারই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

স্মেনখকরের সত্যিই মৃত্যু হ'ল। ক'দিন থেকেই তার অবস্থা খুব খারাপ চলছিল। অনখেসেন তার

শয্যাপার্শ্বে অনেকবার গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সব সময় সে দু'জন মানুষকে দেখেছে। একজন চিকিৎসক, যার ওখানে থাকা খুবই স্বাভাবিক। অপরজন হ'ল হোরেমহেব। মুখে তার দুশ্চিন্তার ছাপ মাখানো। অনখেসেন বুঝতে পারে না, ওই দুশ্চিনতার একশো ভাগই কৃত্রিম কিনা।

অয়কে একবারও দেখেনি অনখেসেন। না দেখে রাগ হয়েছে তার। লোকটা কোথায় আছে? মার্তই বা কোথায়। তাকেও দেখা যায়নি কখনও। এবার কি হবে তার? এখন মিশর দেশ ফ্যারও বিহীন। তবে স্মেনখকরের মৃতদেহ সমাধিস্থ করতে অন্তত দুটি মাস সময় রয়েছে হাতে। এটাই সাধারণ নিয়ম। এর মধ্যে একজনকে ফ্যারও নির্বাচিত করতে হবে। কিন্তু কাকে? অয়-এর খোঁজ পাওয়া যায় না। তাকে প্রশ্ন করলে সদুত্তর পাওয়া যেতে পারত। এখনি তো তুতনখটেনের অভিষেক হওয়া উচিত।

স্মেনখকরের মৃত্যুর পরই কক্ষের বাইরে হোরেমহেব তার সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে—আমার একটি প্রার্থনা রয়েছে।

অনখেসেন অনুমান করতে পারে। তবু অত্যন্ত শান্তকণ্ঠে বলে—বলুন।

—আমি এখনো আপনার রূপের পিয়াসী। আপনার প্রেমের কাঙাল।

—কেন? অত ঘটা করে মুতনেজেমেতকে সাদি করলেন।

—আপনি প্রত্যাখ্যান করলেন, ওদিকে সে কান্নাকাটি শুরু করল। কিন্তু আমার হৃদয়ে আপনার আসন চিরস্থায়ী। আপনিই হবে সম্রাজ্ঞী। মুতনেজেমেতের সেই যোগ্যতা নেই। যদিও সে আগের সম্রাজ্ঞী নেফেরতিতির ভগিনী।

—আপনি কি বলছেন? সম্রাজ্ঞী?

—হ্যাঁ। শুধু আপনার সামান্য একটু অনুমতি। চিরকাল আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।

—না।

হোরেমহেবের মুখ শুধু কঠিন হয়, হিংস্র হয়ে ওঠে। সে স্থানত্যাগ করে দ্রুতপদে। সঙ্গে সঙ্গে অয় এসে সম্মুখে দাঁড়ায়।

অনখেসেন বিস্ময়াপন্ন হয়। এতদিনের মধ্যে একবারও অয়কে সে ফ্যারওর পাশে দেখেনি। মনে মনে রাগ ছিল। সে বলে—এবার আপনার প্রস্তাব বুঝি?

—কিসের প্রস্তাব?

—আমাকে সম্রাজ্ঞী করার প্রস্তাব।

—হ্যাঁ, সেই জন্যই তো তোমার কাছে এলাম। আমি জানতাম হোরেমহেব তোমাকে হাত করার চেষ্টা করবে।

জ্বলে ওঠে অনখেসেন। বলে—আপনার লজ্জা করে না? এত বয়স হলো তবু একজন অল্পবয়সী মেয়েকে বিবাহের প্রলোভন! ফ্যারও হবার সাধ!

—কে বলল একথা?

—কেন, আপনি বললেন না এখুনি যে আমাকে সম্রাজ্ঞী করে দেবেন?

--বললাম তো।

—তার অর্থ আমি বুঝি না। এতই বুদ্ধিহীন ভাবেন আমাকে?

—ভাবতাম না এতদিন। এখন থেকে ভাবব ভাবছি।

—কিভাবে আমাকে সম্রাজ্ঞী করবেন?

--হোরেমহেব যেভাবে করতে চেয়েছে, সেইভাবে কখনই হয়।

—তবে?

—তুতনখটেনের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিয়ে। যদি তুমি রাজি হও।

—তুতনখটেন? সে কোথায়?

—রাজধানীর পথে অনেকটা দূর এগিয়ে এসেছে এতক্ষণে।

—অনখেসেনের বাক্যস্ফূর্তি হয় না। সে ডাগর ডাগর চোখে চেয়ে থাকে বৃদ্ধের দিকে। এখন সে ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখে বার্ধক্য অক্ষম করতে পারেনি অয়কে। তার দেহ সুদৃঢ়, তার চোখ দুটিতে বুদ্ধির দীপ্তি। তার ওষ্ঠে অস্পষ্ট হাসির ছোঁয়া।

—নম্রকণ্ঠে অনখেসেন বলে—কখন খবর পাঠালেন?

—কয়েকদিন আগে।

—স্মেনখকরে তখন তো জীবিত।

—কিন্তু জানতাম, তার মৃত্যু হবে। সঙ্গে সঙ্গে হোরেমহেবের তৎপরতা বাড়বে। তাই আগে থাকতে ব্যবস্থা নিতে হয়েছে।

অনখেসেন হেসে বলে—আগে জানলে আপনাকে বিয়ে করতে রাজি হতাম।

—যাক, ঢের হয়েছে। বেশি বুদ্ধি ভাল নয়।

অনখেসেন অবাক হয়ে ভাবে, স্মেনখকরের মৃত্যুতে যতটা আঘাত পাবে বলে ভেবেছিল তার শতভাগের এক ভাগও পায়নি। মার্তের দুর্দশায় যতখানি দুঃখ পাবে বলে মনে হয়েছিল, তেমন কিছুই পেল না। তবে কি সে নিজের স্বার্থটাই বড় করে দেখে মনে মনে? সেও কি হোরেমহেবের মতো আত্মসুখী। সে জানে, এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া বড় কঠিন। তবে সে যে বালুকাময় তপ্ত পৃথিবীর হীনতা ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে আদৌ নয়, একথা মনে প্রাণে স্বীকার করে।

সহসা মায়েব কথা মনে পড়ে যায় তার। তুতন আসছে, মা আসছে না? তুতনের সঙ্গে মায়েরও তো আসা উচিত।

অয়কে প্রশ্ন করে—মা! মা আসছেন না?

অয় বলে—ওসব কথা পরে হবে। মনকে প্রস্তুত কর। সাবধানে থাক। মনে রেখ, তোমার পাশে যে দাঁড়িয়ে আছে সেও শত্রু।

—কেউ নেই তো?

—এখন নেই, অন্য সময় থাকবে। হোরেমহেব কাঁচা নয়।

এতক্ষণ যেন মরু-ঝড় বইছিল। একটার পর একটা ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রাসাদের সবাই উদ্ভ্রান্ত। সে নিজেও ব্যতিক্রম নয়। তবে সবার মুখের ওপর একটা অনিশ্চিতের ছাপ পড়েছে। সে জানে, তার মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই। মায়ের কাছে এইটুকু শিখেছে সে। যাকে সে নিজের বলে ভাববে শুধু তার কাছেই তার মনের ভাব মুখের রেখায় স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠবে। অন্য কারও কাছে নয়। কিন্তু তেমন কি কাউকে পাবে সে জীবনে? তুতনখটেনকে সে ভালবাসতে পারবে ঠিকই। তার ওপর প্রচণ্ড টান তার। কিন্তু সেই টান কি আত্মসমর্পণের পর্যায়ে পৌঁছবে কোনোদিন? তাকে দেখলে যত্ন করতে ইচ্ছা করবে, আদর করতে ইচ্ছা করবে। কিন্তু তার সামনে নিজেকে মেলে ধরার নির্ভরতা কবে আসবে? সে যে এখনো একান্তই কিশোর। তারপর যখন সেই দিন আসবে তখন কি আজকের আকুলতা ততটা থাকবে? জানে না সে। এখন ওসব ভাবার সময়ও হয়নি। এখন শুধু প্রার্থনা করার সময়, যাতে তুতন নিরাপদে এসে পৌঁছতে পারে, যাতে তাদের মধ্যে বিবাহ নিরাপদে সম্পন্ন হয়, যাতে তুতন ফ্যারও রূপে অভিষিক্ত হতে পারে। অনেক যোজন পথ এখনো বাকি।

এবারে অনখেসেনের মনে হয়, বড় বোনের কাছে একবার যাওয়া উচিত। মন থেকে সায় দেয়নি। কারণ মার্ত-এর মনের খবর তার অজানা নয়। স্মেনখকরের মৃত্যুতে তার বিন্দুমাত্র দুঃখ হয়নি। কিন্তু একথা তো সত্য যে সে তার সম্মানের আসন থেকে স্খলিত হয়ে পড়ল। সে আর সম্রাজ্ঞী নয়—ক্ষমতার অধিকারিণীও রইল না। একথা ভেবে নিশ্চয় আফশোষ হচ্ছে তার। কতটুকু আফশোষ হচ্ছে সেটুকু দেখার জন্য মার্তের কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করে।

সে দেখে মার্ত এক টুকরো মাংসের হাড় চুষতে চুষতে ঘরময় পায়চারি করছে। সেই টুকরো বোধহয় চোষা শেষ হয়েছিল। তাই সেটিকে ঘরের একদিকের দেয়ালের গায়ে সশব্দে ছুঁড়ে ফেলে একটি সিংহমুখী সুদৃশ্য টেবিলের ওপর রাখা রেকাবি থেকে, আর এক টুকরো তুলে নিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে কামড় দেয়। অনখেসেনের প্রবেশের দিকে তার লক্ষ্য নেই।

মার্তকে কখনো এত একাগ্রভাবে মাংস ভক্ষণ করতে দেখেনি সে। ক্ষুধার্ত অবস্থাতেও খাদ্যদ্রব্যের প্রতি উগ্র লালসা তার কখনো ছিল না। বরং সে খাওয়ার ব্যাপারে বরাবর একটু বেশিমাত্রায় নির্লিপ্ত। ক্ষুধামান্দ্য ছিল বরাবর। অথচ আজ এ কি দেখছে সে? তবে কি তাকে খেতে দেওয়া হয়নি? কিন্তু তাহলে তো সে নিজেই চেয়ে নিতে পারত।

—মার্ত।

মার্ত চমকে ওঠে। তার হাত থেকে নতুন টুকরোটি খসে পড়ে মেঝেতে। সে তাড়াতাড়ি অদূরের শয্যার ওপর থেকে একটি অতি মূল্যবান তোয়ালে তুলে নিয়ে দুহাত মুছে ফেলে সেই তোয়ালে মাংসের রেকাবির ওপর চাপা দেয়।

—আমি কিছু খাইনি। ভাবছিলাম। অনেক কথা ভাবছিলাম।

মার্ত-এর কৈফিয়ৎ শুনে অনখেসেনের বুক কেঁপে ওঠে। বুঝতে পারে মার্ত ভীষণ ভয় পেয়েছে। বোধহয় ফ্যারওর মৃত্যু এর কারণ।

—তোর কি হয়েছে মার্ত?

মার্ত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে ভগিনীর দিকে। তারপর হেসে বলে—কিছু হয়নি। কিছু খাইনি। ভাবছিলাম।

—কি ভাবছিলি?

—ভাবছিলাম পেপি যতটা ওষুধ দিয়েছে সে খেয়েছি তো?

প্রাসাদের চিকিৎসকের নাম পেপি। তার সঙ্গেই হোরেমহেবকে কয়েকবার কথা বলতে দেখেছে অয়।

—পেপি কী ওষুধ দিয়েছে? কেন? কি হয়েছে তোর?

—বারে, আমার ঘুম পায় না, খিদে হয় না। তাই।

—পেপি কবে থেকে ওষুধ দিচ্ছে?

—অনেকদিন। স্মেনখকরেকে দিত, আমাকেও দেয়।

—কখনো বলিসনি তো?

—নিষেধ ছিল। তোরা তো সব আমার শত্রু। রাণী হতে চাস।

অনখেসেন বুঝতে পারে তার জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রকৃতিস্থ নয়। এটা সাময়িক কিংবা চিরস্থায়ী বোঝার উপায় নেই। তবে হোরেমহেব এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছে। এবারে বোধহয় তার পালা। অয়কে খবরটা দিতে হবে। তার ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। সে সাহায্য করবে আপাতত। কারণ হোরেমহেব তারও শত্রু। কাঁটা দিয়ে কাঁটা উদ্ধার।

অনখেসেন রেকাবির ওপর থেকে তোয়ালে তুলতে গেলে মার্ত ছুটে এসে হাত চেপে ধরে চিৎকার করে ওঠে—ছেড়ে দে বলছি। তুই অমার মাংসে বিষ মিশিয়ে দিবি। আমি জানি।

—মেশাব না।

—আলবৎ মেশাবি। পেপি বলেছে।

—বেশ। আমি হাত দেব না। ফ্যারও কোথায়?

কথাটা শুনে মার্তের মধ্যে কোনোরকম বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। সে অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বরে বলে— সাজানো হচ্ছে।

সমাধিস্থ করার আগে শবদেহের অস্তিত্ব চিরস্থায়ী করার জন্য নানান রকম তেল আরক ইত্যাদি দ্বারা সিক্ত করা হয়। নানান কিছু দেহে লেপন করা হয়। বস্ত্র দ্বারা দেহ আবৃত করা হয়। কিন্তু মার্তের কথা শুনে তেমন কিছু মনে হলো না।

জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে সে প্রশ্ন করে—সাজানো হচ্ছে কেন?

—নীলকান্ত মণি আনতে যাবে। যুদ্ধ করবে।

এতক্ষণে নিঃসংশয় হয় অনখেসেন যে মার্ত একেবারে অপ্রকৃতিস্থ। এখনি অয়কে কথাটা বলতে হবে।

সে ঘর থেকে বাইরে যাবার উপক্রম করতে মার্ত ছুটে এসে দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে। বলে—আমার ভয় করছে। চলে যাস্‌নে।

—কিসের ভয়? কাকে ভয়?

—জানি না। চারদিকে শুধু ছায়া ফিস্‌ফিস্‌ কথা।

—এ আর নতুন কি? আমি বহুদিন থেকে দেখি আর শুনি।

—তুই তোয়ালে তুলে মাংস দেখ, আমি কিছু বলব না।

—না। তুই বরং দরজা বন্ধ করে রাখ। কাউকে ঢুকতে দিবি না। তোর দেখাশোনার মেয়েরা কোথায়?

—জানি না।

—সে কি? এখনো স্মেনখকরেকে সমাধিস্থ করা হয়নি, এখনো তুই সম্রাজ্ঞী। কে সরিয়ে নিল ওদের?

—আমি তো চিরকালই সম্রাজ্ঞী। নেফেরতিতি আর ফিরে আসবে না। আমার একটা ছেলে থাকলে বেশ হতো। সে ফ্যারও হতো। তাতে বুকে নিয়ে শুয়ে ঘুমোতাম। জানিস, এই বুকের মধ্যে আগুন জ্বলছে। মনে হয় অটেন দেবতা ভেতরে ঢুকে বসে আছেন। দাউ দাউ, দাউ দাউ—অসহ্য।

বুক চেপে ধরে মার্ত ছটফট করে। তারপর ছুটে যায় তোয়ালে-ঢাকা মাংসের কাছে। তোয়ালে তুলে এক টুকরো মুখে দিয়ে বলে—খাবি?

—না।

অনখেসেন বাইরে চলে আসে। এবারে মার্ত ভ্রূক্ষেপও করে না। সে আপন মনে মাংস চিবোতে থাকে।

পরদিনই খবর রটলো যে সম্রাজ্ঞী উধাও। তাঁকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না। অনখেসেন বুঝল চক্রীরা ধীরে ধীরে জাল গুটিয়ে আনছে। সেই জালের মধ্যে তাকেও ধরার চেষ্টা করবে। কিন্তু কিছুতেই সে তা হতে দেবে না। ধরা পড়লেও কেটে বেরিয়ে আসবে। হোরেমহেব যত বড় ধুরন্ধর হোক না কেন সেও রাজনীতি শিখে ফেলেছে।

কিন্তু অয়-এর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। প্রাসাদে এত ঘটনা ঘটে গেল। তবু সে নেই। মার্ত-এর জন্যে একটু অনুকম্পা হয় মাত্র অনখেসেনের। অথচ দুঃখে ভেঙে পড়ার কথা। শত হলেও একই মাতৃগর্ভে জন্ম তাদের। শৈশবে একই সঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে। তবু তেমন কিছু হলো না। তার উদ্বেগ এখন কেন্দ্রীভূত হয়েছে তুতনখটেনকে ঘিরে। হয়ত তাকে অবলম্বন করে সে নিজে সম্রাজ্ঞী হবে বলে।

সন্ধ্যায় অয়-এর সাক্ষাৎ মেলে।

—আপনি কোথায় ছিলেন। আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান।

তুতনখটেন পরশু এসে পৌঁছবে। কাউকে বলো না।

—কিন্তু মার্তের খবর শুনেছেন?

আমি জানতাম এমন হবে।

—তাকে বাঁচাতে পারতেন না!

—হয়ত পারতাম, চেষ্টা করিনি। কারণ তার দিকে ওদের যতটা মন থাকবে তুমি থাকবে ততটা নিরাপদ। এখন তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা আমার প্রধান কর্তব্য।

—কর্তব্য কেন?

—আমি চাই ফ্যারও বংশের পরিবর্তন যেন না ঘটে। আমি এই বংশের কাছে ঋণী।

—ও। কিন্তু আপনি নেফেরতিতির কথা একবারও বলছেন না। আমি কি ধরে নেব এখনো তাঁর ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে? আমি মায়ের দেখা পাব না?

—আমি ইচ্ছে করে তার কথা তোমাকে বলিনি। কোনো নিষেধাজ্ঞা, কোনো আইন তাঁকে আর বাঁধতে পারবে না।

অনখেসেন খুশি হয়ে বলে—তিনি তুতন্‌খটেনের সঙ্গে আসছেন তাহলে?

—না, তোমাকে বললে ভেঙে পড়বে বলে প্রথম দিন বলিনি। কিছুদিন আগে এক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

অনখেসেন কান্নায় ভেঙে পড়ে। বুকের ভেতরে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে। মাকে সে সত্যিই ভালবেসে ফেলেছিল। মায়ের ওই বাহ্যিক কঠিন আবরণের অন্তরালে সে আসল মানুষটির সন্ধান পেয়েছিল। সে জানত মায়ের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আর অসামান্য রূপ মানুষকে কাছে টেনেও দূরে সরিয়ে রাখত। একটা আবেষ্টনী সৃষ্টি করে রাখত তাঁর চারদিকে।

—কি হয়েছিল?

—সঠিক জানি না। হোরেমহেবের হাত কি অতটা দীর্ঘ হয়েছিল? বোধহয় না। আমারও লোক রয়েছে ওখানে। তারা তুতন্‌খ আর তাঁর চারদিকে নিরাপত্তার বেড়াজাল দিয়ে ঘিরে রাখত। বোধহয় এটা নিছকই দুর্ঘটনা। কিন্তু এভাবে ভেঙে পড়ো না। এখনই জীবনে তোমার সবচেয়ে শক্ত ও ঋজু হয়ে থাকার সময় অশ্রুজলকে আগুনে পরিণত কর।

অনেকক্ষণ পরে অনখেসেন বলে—মার্তকে বোধহয় পাগল করে দেওয়া হচ্ছিল।

—সম্ভব বৈকি।

—তার খাদ্যে কিছু মেশানো হতো। কোনো নেশার জিনিস। সে বুভুক্ষুর মতো খাচ্ছিল। অথচ কোনো খাবারেই তার কখনো আগ্রহ দেখতাম না আগে।

—হুঁ। তোমার খাবার কে আনে?

—আমার নিজের লোক। বিশ্বস্ত।

—লক্ষ্য রেখো। তোমার প্রহরী?

—মায়ের সময়ের মেয়েরা।

—সেকথা জানি। তারা এখনো বিশ্বস্ত তো?

—প্রমাণ চান?

অনখেসেন একজন নারী রক্ষীকে ইঙ্গিতে ডাকে। সে কাছে এসে অভিবাদন করে দাঁড়ালে অনখেসেন বলে—এইমাত্র খবর পেলাম মায়ের মৃত্যু হয়েছে।

মেয়েটি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তার সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে ওঠে। নয়ন দ্বারা অশ্রু প্লাবিত হয়। সে চিৎকার করে কাঁদতে পারে না, ছুটে চলে যেতে পারে না। তার মুখ রক্তশূন্য হয়ে যায়।

অনখেসেন তাকে ধরে বলে—এখানে বসো। কিছু হবে না।

অনুমতি পেয়ে বসে পড়ে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

—দেখলেন তো। আমি আর মাকে কতটুকু ভালবেসেছি।

অয় মাথা ঝাঁকিয়ে স্থান ত্যাগ করে।

বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই তুতন্খটেন এসে উপস্থিত হলো রাজধানীতে। অয় বেশ ভাল ব্যবস্থা করেছিল। রাজপথ ধরে শোভাযাত্রা করে এলো তুতন্খটেন। সঙ্গে অনেক দেহরক্ষী। অভ্যর্থনাও করা হ'ল জাঁকজমকের সঙ্গে।

খবর পেয়ে সেনাধ্যক্ষ হোরেমহেব ছুটতে ছুটতে এসে সব কিছু দেখে থ' হয়ে যায়। অয়-এর কাছে এগিয়ে গিয়ে শুকনো হাসি হেসে বলে—বেশ ভালই ব্যবস্থা করেছেন দেখছি।

অয় প্রত্যুত্তরে বলে—আমি জানতাম আপনার মতো সমঝদার ব্যক্তি এর তারিফ করবেন।

—আপনাকে তারিফ করতে হয়, সবটা গোপন রাখতে পেরেছিলেন বলে।

—কূটনীতির নিয়মই তাই। ঢক্কা নিনাদ করে সমরাঙ্গনে যাবার নিয়ম। কূটনীতিতে ও সব চলে না।

—ঠিক তাই। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিপরীত নিয়মও দেখা যায়।

—যায় বৈকি। তবে কদাচিৎ।

তাহলে কূটনীতির পরবর্তী অধ্যায় কি হবে?

অয় জানে সৈন্যদলের অধিপতি হলেও হোরেমহেব ফ্যারওর বংশের কারও বিরুদ্ধে সেনাদের প্ররোচিত করতে পারবে না। তাদের বরাবরের একটা বদ্ধমূল ধারণা যে ফ্যারও যেমনই হোক তিনি দেবতার প্রতিনিধি। তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা যায় না। যদি এই ধারণা সাধারণ মানুষের না থাকত, তাহলে অখেন অটেনের রাজত্বকালে চূড়ান্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাঁকে উৎখাত করত তারা। কারণ অখেন-অটেন তাদের ধর্ম বিশ্বাসে প্রচণ্ডভাবে আঘাত হেনেছিলেন। তবু তারা সহ্য করেছে।

সাধারণ মানুষের মজ্জাগত এই মানসিকতাই অয়-এর সম্বল, তার শক্তি। সে জানত তুতন্খটেনকে একবার নিয়ে আসতে পারলে নির্বিঘ্নেই তাকে ফ্যারও করা সম্ভব হবে।

হোরেমহেবের প্রশ্নের উত্তরে অয় বলে,—পরবর্তী অধ্যায় তো খুবই সরল।

—যেমন?

—তুতন্খটেনকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হবে।

—আর রাণী?

—কেন, অনখেসেন অটেন।

—হুঁ। তুতন্খ একান্তই নাবালক।

—হ্যাঁ, তার বার্ধক্য আসতে অনেক বছর বাকি। ততদিনে আমার জীবিত থাকার প্রশ্নই ওঠে না। আপনিও অশক্ত হয়ে পড়বেন। আমাদের দুজনার স্থানই অন্যেরা দখল করবে। দুজনাই নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

—আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, আপনার কথা আলাদা। কিন্তু আমি এখনো বহু বছর চন্দ্র-সূর্যের উদয় আর অস্ত দেখব। নীলনদ দিয়ে অনেক—অনেক জলরাশি বয়ে যেতে দেখব। এই তো সবে শুরু।

—অটেন দেবতা, আপনার সহায় হোন।

—দেবতা সবলেরই সহায় হন। দুর্বলের নয়।

—আর বুদ্ধিমানেরও।

প্রাসাদে পা দিয়েই তুতন্খটেন অনখেসেনকে দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর অনখেসেন এক অজ্ঞাত কক্ষে গিয়ে আত্মগোপন করে। পৃথিবীর যাবতীয় লজ্জা যেন তাকে পেয়ে বসে অথচ এর

কোনো অর্থ নেই সে জানে। যার জন্যে এত লজ্জা সে এখনো কিশোর। তবু কাটিয়ে উঠতে পারে না অনখেসেন এই লজ্জা। সে জানে তুতন্‌খ মনে কষ্ট পাবে। কত উৎসাহ নিয়ে এসেছে সে। নেফেরতিতিকে হারাবার বেদনা তার চাইতে কাউকে বেশি স্পর্শ করেনি। গর্ভধারিণী না হয়েও নেফেরতিতি তার কাছে মায়ের চেয়েও বেশি ছিলেন। বলতে গেলে একমাত্র অবলম্বন। সে অবলম্বন হারিয়ে এখানে এসে সে অনখেসেনের কাছে আশ্রয় খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অথচ কিছুতেই সহজ হতে পারছে না অন্‌খেসেন।

তুতন্‌খ তাকে খুঁজে না পেয়ে নিরাশ হয়। সে বুঝতে পারে না কি করবে। প্রাসাদে কোন কক্ষে আগে সে ছিল, ভুলে গিয়েছে। এখন কোথায় থাকবে তাও অজানা। সে লক্ষ্য করে, তার দিকে সবার দৃষ্টি। সবাই তাকে নিয়ে ব্যস্ত।

সে অয়কে বলে—অনখেসেন কোথায়? তাকে তো খুঁজে পাচ্ছি না?

অয় চমকে ওঠে—সেকি! সকালেই তো দেখেছি। নিশ্চয় কোথাও আছে।

তুতন্‌খ-এর মুখ ভার হয়। বলে—না, নেই। আমি অনেক খুঁজেছি।

অয় এবার একটু ভীত হয়। হোরেমহেব কোনো কিছু করল নাকি। উঁহু প্রাসাদে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেছে বেছে লোক রাখা হয়েছে। তুতন্‌খকে এখানে আনার প্রস্তুতি চলেছে বহুদিন ধরে। হোরেমহেব সন্দেহ করতে পারেনি। কারণ স্মেনখকরে আর মার্ত-এর প্রহরীদের বদলি করা হয়নি তখন। কিন্তু স্মেনখকরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতেও হোরেমহেব সন্দেহ করেনি। কারণ এটা স্বাভাবিক।

প্রহরীদের প্রশ্ন করায় তারা পরস্পরের মুখের দিকে চায়। একজন শুধু বলে—উনি বাইরে যাননি। ভেতরেই রয়েছেন।

অয় তখন একজন একদা নারী রক্ষীকে জিজ্ঞাসা করে। সে একটু দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বলে—ভেতরে আছেন।

—কি করছে।

—কিছু না। বসে আছেন।

—বসে আছে?

অয় ভাবে, হোরেমহেব নতুন কোনো চাল চেলেছে নাকি এর মধ্যে। বলেছে নাকি, তুতন্‌খ তার রূপের কদর দিতে পারবে না—সেই বয়স হয়নি। শত হলেও মেয়েদের মন? অস্থির মতি—অল্প প্রলোভনেই ফাঁদে পড়ে যায়।

তুতন্‌খ নারী প্রহরীকে বলে—আমাকে নিয়ে চল।

—উনি বোধহয় রাগ করবেন।

—কেন?

মনে হলো, লুকিয়ে আছেন।

—কেন?

—জানি না।

—আমাকে নিয়ে চল।

নারী রক্ষীর দ্বিধা যায় না। সে ইতস্তত করে। অয় তখন তাকে বলে—তুমি ভাবী ফ্যারওর অবাধ্য হচ্ছ।

যারা ছিল সবাই স্তম্ভিত হয়। তুতন্‌খকে ঘটা করে অভ্যর্থনার বহর দেখে তারা বিস্মিত হয়েছিল। কিন্তু আসল খবরটি প্রাসাদের ভেতরে কেউ পৌঁছে দেয়নি। কারণ বাইরে যারা ছিল তারা সবাই হোরেমহেবের কেনা নোকর। এবারে তারা নতুন দৃষ্টিতে তুতন্‌খ-এর দিকে চায়। এঁকে শৈশবে

দেখেছে এমন কিছু কিছু নারী রক্ষী এখনো রয়েছে। এবং দেবশিশু সুলভ চেহারার একটা আকর্ষণ রয়েছে। যে সব শিশুকে দেখলে আদর করতে ইচ্ছা হয়, স্নেহ উথলে ওঠে, তুতন্‌খকে শৈশবে দেখতে তেমনই ছিল। এখন তিনি একটু বড় হয়েছেন, কিন্তু তার সৌকুমার্য একটুকুও হ্রাস পায়নি। উনি পরবর্তী ফ্যারও, একথা জেনে তাদের মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে। তারা আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানায়।

নারী রক্ষীর সঙ্গে তুতন্‌খ সেই কক্ষের দ্বারদেশে গিয়ে উপস্থিত হয়।

—এখানে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তুমি যাও।

এতদিন পরে দেখা হবে ভেবে তুতন্‌খ-এর ভেতরে চাপা উত্তেজনা। সেই সঙ্গে আবার সংশয়। কেন তার কাছে না গিয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখল অনখেসেন। বোধহয় তাকে ভুলে গিয়েছে। কিংবা তাকে আগের মতো আর ভালবাসে না। বাসলে যখন তাকে প্রাসাদে অভ্যর্থনা করা হ'ল, তখন উপস্থিত থাকত। ও যদি তাকে ভাল না বাসে তাহলে আবার থীবস্-এ ফিরে যাবে। দরকার নেই ফ্যারও হয়ে। কি হবে? নেফেরতিতি চলে গেলেন, ও সরে যাচ্ছে। বেঁচে থেকে লাভ কি?

সে দূরে অনখেসেনকে দেখতে পায়। কক্ষের অপর প্রান্তে। দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে বাইরের দিকে মুখ করে। ওকে দেখতে আগের মতই রয়েছে। ওর গায়ে কোন ধরনের সুঘ্রাণ—সেকথা বহুদিন পরে মনে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মনটা উতলা হয়ে ওঠে।

সে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে—আমি এসেছি। অনখেসেনের সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে যায়। সে দু'চোখ মেলে ভালভাবে তাকায় তুতন্‌খ-এর দিকে।

তুতন্‌খ বলে—আমি ফ্যারও হবো না, আবার চলে যাব।

—কেন?

তুমি আমাকে চাও না এখানে। আমি বুঝতে পেরেছি।

অনখেসেন দু' বাহু বাড়িয়ে তুতন্‌খকে জড়িয়ে ধরে। সে বলে—কে বলল একথা।

—তুমি লুকিয়ে আছ কেন?

—বললে, বুঝবে না তুমি।

—বুঝব। বল।

—লজ্জায়।

ততক্ষণে অনখেসেনের দেহের সেই পরিচিত ঘ্রাণ তুতন্‌খ-এর অভিমানকে গলিয়ে দিয়েছে। সে বলে—কিসের লজ্জা।

—কিসের আবার। তুমি দেখতে আরও সুন্দর হয়েছ। যত বড় হবে তত সুন্দর হবে।

তুমি আমাকে ভোলাচ্ছ।

—তোমাকে? তোমাকে কি ভোলাব! তুমি তো চিরকাল ভুলেই আছ।

—না। কাকে দেখে তোমার লজ্জা বললে না।

—তোমাকে। হ'ল তো?

তুতন্‌খ ভাবে, অনখেসেন মজা করছে তার সঙ্গে। সে বলে—আজ যদি মা আসত সঙ্গে, তাহলে তুমি অমন দূরে চলে যেতে না।

এবারে অনখেসেন আর স্থির থাকতে পারে না। তার দুচোখ প্লাবিত করে অশ্রুজল। ঝাপসা চোখে সে তুতন্‌খ-এর গালের সঙ্গে গাল ঠেকায়। তুতন্‌খ-এর গালও ভিজে যায়। তবু তার ভাল লাগে।

এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাটে। শেষে অনখেসেন বলে—মায়ের কি হয়েছিল।

—জানি না। শুধু তার রক্তাক্ত দেহ দেখেছি। সবাই বলল, পড়ে গিয়েছিলেন।

—কিভাবে।

—জানি না।

—হত্যা।

—কি বললে?

—তুমি ফ্যারও হলে প্রতিশোধ নিও।

—কার ওপর?

—খুঁজে বের করবে। মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে।

—অমন করো না। শান্তি পাবে না।

—কে বলেছে তোমাকে একথা?

—নেফেরতিতি। তিনি বলতেন, সব কিছুর মধ্যে কুটিলতা দেখতে দেখতে মন কুটিল হয়ে যায়। অন্যের পাপের খোঁজ করতে করতে নিজেই পাপী হয়ে যেতে হয়। তার চেয়ে পৃথিবীর ভালটুকু দেখাই ভাল তুতন্‌খ। তাতেই শান্তি।

—একথা তিনি বলতে পেরেছিলেন নির্বাসনে যাবার পরে। রানী থাকার সময়ে নয়। তুমি কুটিল হও আমি মনেপ্রাণে চাই না। তোমার প্রতিশোধস্পৃহা থাকুক তাও চাই না। তুমি যেমন আছ তাতেই আমার সবচেয়ে আনন্দ। কিন্তু ফ্যারওর ভূমিকা বড়ই জটিল। যাক্‌গে আজ আর ওসব কথা বলতে ভাল লাগছে না। আজ তোমাকে পেয়েছি বহুদিন পরে।

অনখেসেন বুঝতে পারে তুতন্‌খ আরও লম্বা হয়েছে বটে তবু দেহ-মনে এখনো সে অপরিণত। তার প্রেমের আস্বাদ পেতে হলে আরও অপেক্ষা করতে হবে। তাই করবে সে। তুতন্‌খ তার নিজের মতো চলুক। সে নেফেরতিতির ভূমিকা নেবে। তুতন্‌খ-এর চারদিকে নিশ্চিন্ততার আবেষ্টনী সৃষ্টি করবে। মার্ত সম্রাজ্ঞী হয়েও যথাযথভাবে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেনি। মার্ত যে সম্রাজ্ঞী একথা কারও মনের মধ্যে গেঁথে দিতে পারেনি। সে কিন্তু অমন হবে না। সে সম্রাজ্ঞী হলে অয় এবং হোমেরহেবও বুঝতে পারবে মিশরের ফ্যারও কারও হাতের পুতুল নয়। তাঁকে ইচ্ছা মতো চালনা করা যায় না। তার ইচ্ছাকে মর্যাদা দিতে হয়।

কক্ষের বাইরে পদচারণার শব্দ শোনা যায়। অনখেসেন বুঝতে পারে, তারা দু'জন এতক্ষণ একলা এখানে আছে বলে অয় ব্যস্ত হয়েছে।

—চল তুতন্‌খ বাইরে যাই। তোমাকে দেখার জন্য সবাই ব্যগ্র।

রাজ্যাভিষেকের পরে তুতন্‌খ হলেন মিশরের নতুন ফ্যারও। স্মেনখকরের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। তিনি এখন শান্তিতে চিরনিদ্রায় অভিভূত তাঁর নতুন আলয়ে। কেউ সেখানে তাঁর নিদ্রায় বিঘ্ন ঘটাতে যাবে না। পিতা অখেন-অটেন যে কোনো কারণেই হোক তাঁকে বড় বেশি প্রশ্রয় দিতেন। তাই পিতার শবদেহের পাশাপাশিই তাঁকে রাখা হয়েছে। অটেন দেবতা তাঁর পুত্র এবং পৌত্রের শান্তির দিকে নিশ্চয় নজর রাখবেন।

প্রজারা খুশি। নতুন ফ্যারওর চেহারার আকর্ষণ বড় বেশি। বয়স্কা রমণীরা তাঁর মধ্যে দেখতে পায় আদর্শ সন্তানের প্রতিরূপ। আহা, এমন পুত্রের জন্মদাত্রী হওয়া মহাভাগ্যের। সম্রাজ্ঞীটি'র পক্ষেই এমন পুত্রের জন্ম দেওয়া সম্ভব। অল্পবয়সী যুবতীরা আবার অন্য কথা ভাবে। তাদের কল্পনা অন্যরকমের। ভাবে, কিশোর বয়সেই এই রূপ—দু'তিন বছরের মধ্যে এ এক অসাধারণ যুবক হয়ে উঠবে। কিন্তু সম্রাজ্ঞী অনখেসেন এই ক'বছর কি করবেন? রূপসুধা পান করে কি তৃপ্ত হবেন? তবে তিনি জানেন, তাঁর ভবিষ্যৎ অতিরিক্ত সম্ভাবনাময়।

অয় এবং হোরেমহেব প্রথম প্রথম তুতন্‌খকে নিজেদের অভিপ্রায় অনুযায়ী চালনা করার চেষ্টা করেছিল। অনখেসেন বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করল তার স্বামী বেশ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং সেই ব্যক্তিত্ব রূঢ় নয়, বরং আনন্দদায়ক। অয় এবং হোরেমহেবের কোনো কথা তুতন্‌খ-এর পছন্দ না হলে তিনি খুবই সুমিষ্ট ভাষায় যুক্তি দেখিয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ওরা দু'জন মনে মনে হয়তো অসন্তুষ্ট হয়, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পাবে না। একদিন ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, অমেনফিসেব চেয়েও বুদ্ধিমান হবে এই ফ্যারও।

অনখেসেন অয় আর হোরেমহেবের হাবভাব লক্ষ্য করে আনন্দিত হয়। সে তার স্বামীর জন্য গর্ব অনুভব করে। তাই একদিন অকারণে চুম্বনে চুম্বনে স্বামীর গাল ভরিয়ে দেয়।

—একি করছ!

—কেন, করতে নেই?

—তা কেন? কিন্তু হঠাৎ এতবার।

—ইচ্ছে হ'ল, তাই। আচ্ছা, তুমি কার?

তুতন্‌খ একটু ভেবে বলে—মিশরের।

—কি বললে? তোমার জন্যে আমি দিনের পর দিন দগ্ধে মরছি, আর তুমি বললে কিনা তুমি মিশরের। যাও তোমার সঙ্গে কোনো কথা বলব না আজ থেকে।

তুতন্‌খ-এর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সে অনখেনসেনকে বাঁ হাত দিয়ে বেষ্টন করে, ডান হাত দিয়ে তার মুখ তুলে ধরে কাতর দৃষ্টিতে বলে—তুমি যে আমাকে বলেছিলে আমি সমস্ত মিশরের।

অনখেসেন এক ঝলক স্বামীর চোখ দুটোর দিকে চায়। স্বামীর কাতর চাহনিতে তার হৃদয় গলে যেতে চায়। তবু সে বলে—তাই বলে তুমি আমার কেউ নও?

—কে বলল একথা? তুমি এমন কথা বলছ কেন?

—সবচেয়ে আগে তুমি আমার। বল তাই কিনা।

—হ্যাঁ, সে কথা তো জানি, কিন্তু—

—কোনো কিন্তু নয়। তুমি শুধু আমার।

—খুব ভাল। চল না, আমরা কোথাও চলে যাই। এই ফ্যারও হওয়া আমার ভাল লাগে না।

—এ আবার কি কথা? তুমি ফ্যারও না থাকলে আমি সম্রাজ্ঞী রইব কি করে?

—তাও তো বটে। ঠিক আছে তুমি সম্রাজ্ঞী হয়ে থাকো। আমি ফ্যারও না থাকলে চলে না?

—না।

—তাহলে আমি ফ্যারও থাকব। সব গোলমাল হয়ে গেল। তুমি এত ভয় পাইয়ে দাও। তোমার রাগ দেখলে আমার ভয় হয়।

—তুমি আমাকে ভয় পাও? সত্যি বলছ?

—এ অন্যরকমের ভয়। ভয় হয় তুমি কথা বলবে না, তুমি আদর করবে না। রাতের বেলায় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থাকবে। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে না।

—ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। চল।

—কোথায়?

—তোমার মাথার চুলগুলো উস্‌কো খুস্‌কো দেখাচ্ছে। চলতো?

তুতন্‌খ-এর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে অনখেনসেন তার নিজের রূপচর্চার ঘরে। সেখানে সুন্দর আসনে তাকে বসায়। তারপর নানান রকমের সুগন্ধি বের করে স্বামীর পেছনে দিয়ে দাঁড়ায়। প্রথমে দু'হাত দিয়ে তার মাথার রেশমীর মতো কেশদামের প্রসাধনে ব্যস্ত হয়। নানা সুগন্ধি মাখিয়ে দেয়। তুতন্‌খ-এর চোখ বন্ধ হয়ে আসে আরামে। তাই দেখে অনখেসেন তার মাথাটা ঝাঁকিয়ে দেয়।

—কি হ'ল?

—ঘুমোচ্ছো নাকি? তা হবে না। আমি খেটে মরব, আর তুমি ঘুমোবে?

—না তো? আমি ঘুমোইনি। কিন্তু তুমি এসব কর কেন? আমার কেমন লাগে। মনে হয় তোমার খুব কষ্ট হয়।

—মানা করো না কেন?

—তুমি যে রেগে যাবে।

—বুঝেছি। চুপ করে বসে থাক।

এক সময়ে অনখেসেনের কাজ শেষ হয়। সে ঘুরে ফিরে নানান দিক থেকে তুতন্‌খকে দেখতে থাকে।

—কি দেখছ?

—দেখছি, কেমন লাগছে ফ্যারওকে।

—তাই আবার কেউ দেখে নাকি? আমি তো ছেলে।

—কি বললে? ছেলেদের কেউ দেখে না?

—দেখবে না কেন? কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—তোমাকে আমার দেখতে কত ভাল লাগে। তুমি কত সুন্দর। আমাকে দেখলে কি ভাল লাগে?

অনখেসেন হেসে ফেলে। তুতন্‌খ-এর মাথা বুকের মধ্যে চেপে ধরে বলে—ভীষণ ভাল লাগে।

হোরেমহেব সেদিন গৃহে প্রত্যাবর্তন করে স্ত্রী মুতনেজেমেতকে বলে—তোমাদের রকম-সকম বোঝা দায়।

মুতনেজেমেত একটু অবাক হয়ে বলে—কেন, আমি কি করলাম।

—তুমি না। তোমাদের জাতের কথা বলছি।

—আমাদের জাত?

—হ্যাঁ, মেয়ে জাত।

মুতনেজেমেত হেসে বলে—তাই বল। কিন্তু কি করেছি আমরা?

—তোমরা কী যে কর, আর কেন যে কর, সেকথা কি বুঝে সুঝে কর? হয়তো তোমরাও জান না, কেন কর।

মুতনেজেমেত একটু চিন্তিত হবার অভিনয় করে। তারপর বলে—আমি অন্তত জেনেশুনে করি।

—কেউই কর না। তোমাদের সম্রাজ্ঞীর কথাই ধর।

সঙ্গে সঙ্গে মুতনেজেমেতের সমস্ত উৎসাহ নির্বাপিত হয়। অনখেসেনের চেয়ে বড় শত্রু তার আর কেউ নেই। সম্রাজ্ঞী তার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কন্যা হলেও, ওই অসামান্য রূপবতী নারী তার স্বামীর মনকে এখনো আচ্ছন্ন করে রেখেছে। হ্যাঁ, একথা সে আজও মর্মে মর্মে অনুভব করে।

হোরেমহেবকে তুষ্ট রাখার জন্য সে প্রশ্রয়ের স্বরে বলে—কেন, সম্রাজ্ঞীর কি দোষ?

—দোষের কথা বলছি না, বুদ্ধির কথা বলছি।

মুতনেজেমেত এতক্ষণে স্বামীর কথা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করে বলে—তুমি ভুল করছ। অনখেসেন পৃথিবীতে সবচেয়ে বুদ্ধিমতী রমণী।

—তোমার চেয়েও?

মুতনেজেমেতের খট্‌কা লাগে। হঠাৎ স্বামী তাঁকে এতটা প্রাধান্য দিচ্ছে কেন? তবু তার মুখে

নিজের এত বড় প্রশংসা শুনে মনে দোলা লাগে।

সে বলে—আমার তো তাই মনে হয়! নইলে সে সম্রাজ্ঞী হ'ল কি করে? আমি তো হলাম না?

—ভুল করছ। সে তার বুদ্ধিবলে সম্রাজ্ঞী হয়নি। ফ্যারওর কন্যা সে। সম্রাজ্ঞী হবার পথ তার চিরকাল পরিষ্কার ছিল। সে যদি তোমার পর্যায়ের কোনো নারী হ'ত আজ তাহলে তাকে অতিক্রম করে তুমি সম্রাজ্ঞী হতে।

—কি যে বল। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। তাছাড়া তার রূপ? ওই রূপ কার আছে?

হোরেমহেব সহসা এগিয়ে আসে। স্ত্রীকে দুই বাহুপাশে আবদ্ধ করে কানের কাছে ফিসফিস করে বলে—কেন? তোমার?

কথা কয়টি মধু বর্ষণ করে যেন। এই একই ধরনের কথায় ভুলে সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে দিয়েছিল হোরেমহেবকে। আজও তার গাঢ় স্বরের এই কথাগুলির সম্মোহনী শক্তি অসীম। আজও একইভাবে সে তার দেহ-মন উন্মোচিত করে দিতে পারে। অন্য কোনো পথ নেই। এ যেন অটেন দেবতার ইচ্ছা।

তবু আগে যেমন হোরেমহেবের সব কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করত, সব কথা সোনার অক্ষরে মনের মধ্যে গেঁথে যেত, এখন অতটা যায় না। একটা দ্বিধা থাকে। সেই দ্বিধা তাকে বড় পীড়া দেয়। অথচ এখন সে হোরেমহেবের স্ত্রী।

তার সেই সুখ-সাগরে ভেসে চলার দিনগুলো বড় ভাল ছিল। তখন তার বদ্ধমূল ধারণা ছিল হোরেমহেব আর কারও নয়—শুধু তার একার। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর একদিন প্রথম সেই আঘাত এলো। আঘাত এলো হারেমের এক পরিচারিকার মাধ্যমে।

সেই পরিচারিকা এসে বলেছিল—কেমন বুঝছ, আমাদের সেনাধ্যক্ষকে?

আনন্দে গলে গিয়ে সে বলেছিল—উঃ, বলে বোঝাতে পারব না। তোমাকে বলতে তো বাধা নেই। হারেমে আমি যখন সবার অবহেলার পাত্রী, এমনকি আমার দিদিও যখন আমাকে পাত্তা দিত না, তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিতে। তোমাকে আমি চিরকাল মনে রাখব।

—জানি। তাই তোমাকে একটা দুঃসংবাদ দিতে এলাম।

শুষ্ক মুখে মুতনেজেমেত প্রশ্ন করে—দুঃসংবাদ!

—হ্যাঁ। কি করে যে বলি।

—বল, আমি সহ্য করব।

—তোমার উনি তো নতজানু হয়ে অনখেসেনের কাছে প্রেমভিক্ষা করছেন।

—কি বললে?

—অনেকেই দেখেছে।

চোখে সেদিন অন্ধকার দেখেছিল সে। তারপর রূঢ় সত্যকে মেনে নিয়েছিল। নারীকে কত কিছুই সয়ে নিতে হয়। নইলে সে উপায় নেই। পুরুষেরা অনেক কিছু দূরে নিক্ষেপ করে। নারীরা তা পারে না। হয়তো তাদের সেইভাবে গড়া হয়নি।

সেদিন মুতনেজেমেত অটেন দেবতার কাছে এইটুকুই প্রার্থনা করেছিল, হোরেমহেবের যেন মোহমুক্তি ঘটে। সে যেন আবার তাকে একান্তভাবে ভালবাসতে পারে।

তারপরে একটা কানাঘুষো কিছুদিন চলতে থাকলেও, কেউ নিশ্চিতভাবে তাকে এসে বলতে পারেনি যে অনখেসেনের কাছে হোরেমহেব আবার গিয়েছিল। তবু সে যেন অনুভব করত সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতম মুহূর্তেও হোরেমহেবের হৃদয়ের একটি বিশেষ তন্ত্রী যেন ঠিকমত বাজছে না। ফলে ছন্দোবদ্ধ একটা সুরেলা ভাবের অভাব থেকে যাচ্ছে—তাল কেটে যাচ্ছে। তারপর সেটাই অভ্যাসে পরিণত হয়। এখন আর কিছু মনে হয় না। তাছাড়া একথাও সত্য যে অনখেসেন এখন আর স্বামীর হৃদয় জুড়ে বসে

নেই। অত্যন্ত বাস্তববাদী তার স্বামী। অবাস্তবকে সযত্নে পরিহার করে।

কিন্তু আজ আবার সম্রাজ্ঞীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় তার বুক দুরু দুরু করে। স্বামীর কথার প্রত্যুত্তরে সে দুঃখের হাসি হেসে বলে—তার রূপ আর আমার রূপ? সে যদি হয় জ্যোৎস্নাবিধৌত রাতের একমাত্র রানী চাঁদ, আমি তাহলে কৃষ্ণপক্ষের কোটি কোটি তারার যে কোনো একটি—যার নিজস্ব কোনো বিশেষত্ব নেই, নেই কোনো গরিমা। সে সঙ্কোচে দ্বিধাগ্রস্তভাবে মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলে।

হোরেমহেব সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। সে তার স্ত্রীকে দু'হাতে শূন্যে তুলে নিয়ে শয্যার দিকে যেতে যেতে বলে—না না না। ভুল নয়। তুমি জান না তুমি কতটা সুন্দরী।

মুতনেজেমেতকে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে তার মুখের কাছে মুখ এনে সে বলে—ওরা তোমার রূপের প্রশংসাও করতে দেয়নি কাউকে, পাছে ফ্যারওর কন্যারা রেগে যায়। ফ্যারও-এর প্রাসাদে তাঁর কন্যাদের চেয়ে বেশি রূপবতী কারও অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না।

মুতনেজেমেত স্বামীর বাঁধভাঙা সোহাগ-আদরে বিগলিত হলেও তার সচেতনতা লুপ্ত হয় না। সে কোনরকমে তাঁর ওষ্ঠাধরকে একটু মুক্ত করে নিয়ে বলে—কিন্তু এতদিন পরে আজ একথা কেন?

—কেন জান? নানান কাজের মধ্যে থেকে কত সময় তোমাকে অবহেলা করি, কত সময় মেজাজ হারিয়ে রূঢ় হই। এই একদিন গভীর রাতে সেই সব কথা ভাবতে ভাবতে নিজেকে বড় অপরাধী বলে মনে হয়। তুমি তখন ঘুমে অচেতন থাক। তুমি জান না তখন তোমাকে কিভাবে পাগলের মতো আদর করি।

—সত্যি? আমার ঘুম তো ভাঙেনি কখনো।

—ভেবে দেখো তো?

—কি জানি। হয়ত ভেঙে থাকবে দু' একদিন।

—আমি যখন ছোট, তখন সম্রাজ্ঞী নেফেরতিতির আগুনের মতো রূপ দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। তখন নারীর রূপকে স্বভাবতই দেখতাম অন্য দৃষ্টিতে। তবু ওই রূপ আমার মনকে রূপ-সচেতন করে তোলে। নেফেরতিতির বয়স বেড়েছে। শেষ যেদিন তিনি থীবস্‌-এ রওনা হলেন সেদিনও তিনি রূপবতী ছিলেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু রূপের সেই ছটা ছিল না। হারেমে তোমাকে দেখে চমকে উঠেছিলাম। এ যে নেফেরতিতি! একই রূপ, একই হাসি। তোমার দিদি অবশ্য তখন হারেমেই ছিলেন। তুমি তো জান কত কষ্ট করে, কত ঝুঁকি নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতাম।

—বড় সুন্দর ছিল সেই দিনগুলো। আমাকে যখন দিদির সঙ্গে তুলনা করতে তখন আমার মনের যে কী অবস্থা হ'ত—

—আজও সেই তুলনাই করছি।

—আজ আমি একটু পরিণত। আজ জানি, দিদির রূপ দুর্লভ। শুধু অনখেসেন। হ্যাঁ, সে বোধহয় দিদিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে।

—আমিও প্রথমে ভেবেছিলাম সেরকম। তাই আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল। ভুল ভেঙেছে। অনখেসেনের মুখটুকু খুবই সুন্দর! কিন্তু তোমার মুখ দেহ বাহুদ্বয়—সর্বাঙ্গ দিয়ে তার চেয়ে অনেক সুন্দরী।

—তাই বুঝি?

—আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?

—বিশ্বাস করতে খুবই ইচ্ছা হয়।

—শোন, আমার সাধ, আমার স্বপ্ন তোমাকে সম্রাজ্ঞী করা।

—তার চেয়ে বল তোমার স্বপ্ন ফ্যারও হওয়া।

—একটার সঙ্গে আর একটা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তোমার কি সাধ হয় না অনখেসেনকে

সরিয়ে সম্রাজ্ঞী হতে?

মুতনেজেমেতের চক্ষুদ্বয় জ্বলে ওঠে। সে বলে—হ্যাঁ হয়। আমি ওদের ঘৃণ্য ছিলাম। অনখেসেনকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করতে ইচ্ছে হয়।,

তখন হোরেমহেব তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ ধবে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলে যেন কক্ষের দেয়াল শুনে ফেলবে।

শেষে হোরেমহেব বলে—রাজি?

—হুঁ।

হোরেমহেবের পত্নী মুতনেজেমেতকে সহসা প্রাসাদে আসতে দেখে বিস্মিত না হয়ে পারে না অনখেসেন। কারণ সে সম্রাজ্ঞী হবার পরে হোরেমহেব নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নিয়েছে। অন্তত বাইরে থেকে সেইরকমই মনে হয়। কাবণ তুতন্‌খকে তো বটেই, অনখেসেনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেও যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে কথা বলে। আর তারই নির্দেশে বোধহয় মুতনেজেমেতও প্রাসাদে আসা ছেড়ে দিয়েছে। নইলে প্রাসাদ তার অপরিচিত স্থান নয়। এখানে ফ্যারও বা তাঁর স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশের কিংবা তার ত্রিসীমানায় আসার অধিকার কারও না থাকলেও মুতনেজেমেত অনুমতি নিয়ে সেই সব অঞ্চলেও আসতে পারে। নেফেরতিতির ভগিনী হিসাবে তার খাতির আছে। হোরেমহেবের পত্নীরূপে সেই খাতির বৃদ্ধি না পেলেও মর্যাদা কিছুটা বেড়েছে বৈকি।

অনখেসেনকে সামনে দেখে মুতনেজেমেতের মধ্যে একটা অস্পষ্ট চাঞ্চল্য লক্ষ্য কবা যায়।

সে বলে—আপনাকে হারেমেব বাইবে দেখব ভাবিনি।

—আমি সব জায়গাতেই ঘুবে বেড়াই। হঠাৎ এখানে আজ? বহুদিন তো দেখিনি।

—না আসিনি। ক'দিন থেকেই আসব ভাবছিলাম। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়। দিদির কাছেই তো মানুষ হয়েছি। তবে দিদি একটা কথা বলত। বলত—ভুলে যাস না, তুই একজন সাধারণ মেয়ে। ফ্যারওর কন্যাদের সমকক্ষ ভাবিস না নিজেকে কখনো। আমার মেয়েদের সঙ্গে বেশি যোগাযোগ করিস না।

অনখেসেন একদৃষ্টে মুতনেজেমেতের দিকে চেয়ে থাকে। মুতনেজেমেতের চোখের পাতা ওঠানামা করে কয়েকবার। সে বলে—আমি দিদির কথা মেনে চলেছি ববাবর। আপনিই বলুন, কখনো বেশি ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছি?

—অতটা ভেবে দেখিনি। তবে কমই মেলামেশা করতাম আপনার সঙ্গে।

—আজ মনে হলো, মাঝে মাঝে এখানে আসলে ক্ষতি কি? আমার জানা অনেকেই আছে আজও। বাইরে কোথায় ঘুরব? বড় একঘেঁয়ে লাগে।

অনখেসেন বুঝতে পারে তার কাছ থেকে একটা অলিখিত ছাড়পত্র চাইছে এই রমণী। কিন্তু কেন? বোধহয়, হোরেমহেব দেখাতে চায় তার পত্নীর সঙ্গে ফ্যারও-পত্নীর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। সে মুতনেজেমেতের কথার কোনো জবাব না দিয়ে এড়িয়ে যায়। মুতনেজেমেত চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রাসাদের নারীরক্ষী বাহিনীর প্রধানাকে নির্দেশ দেয় সেনাধ্যক্ষের পত্নীর প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখতে। তিনি প্রাসাদে এলে তাঁর অজ্ঞাতে যেন ছায়ার মতো তাঁকে অনুসরণ করা হয়।

মাস খানেকের মধ্যে কয়েকটি খবর শুনে অনখেসেন তাজ্জব বনে যায়। সে শোনে, ফ্যারওর কক্ষের একজন পরিচারিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে দেখা গিয়েছে মুতনেজেমেতকে। অস্থির হয়ে ওঠে সে। পরিচারিকাকে এখনি সরিয়ে দিলে মুতনেজেমেত সাবধান হয়ে যাবে। আবার তাকে না সরালে যদি কোনো সর্বনাশ হয়ে যায়? সে একবার ভাবে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে অয়-এব

সঙ্গে কথা বলা উচিত। পরক্ষণেই স্থির করে, কাউকে একথা জানাবে না। রক্ষীবাহিনীর প্রধানা তার মায়েরও অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিল। তার ওপরই সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দেওয়া ভাল। তাকে বলে, পরিচারিকার প্রতিটি গতিবিধির ওপর যেন নজর রাখা হয়। তার কোনো কার্যকলাপ যেন দৃষ্টি না এড়ায়।

কয়েক সপ্তাহ পরে, একদিন সেই পরিচারিকাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে রক্ষী প্রধানা। অনখেসেন দেখে পরিচারিকা কাঁপছে। তার মুখ রক্তশূন্য। অনখেসেন রক্ষী-প্রধানার হাতে ফ্যারও-এর নিজস্ব সুরাপাত্র দেখে স্তম্ভিত হয়।

—কি ব্যাপার! এই পাত্র তোমার হাতে কেন?

পরিচারিকাকে দেখিয়ে সে বলে—ফ্যারও-এর এই সুরাপাত্রে সাদা গুঁড়ো মেশাতে দেখা গিয়েছে একে।

—সাদা গুঁড়ো? কোথায়?

—এই পাত্রের মধ্যে।

—পরিচারিকাকে অনখেসেন জিজ্ঞাসা করে—কি মিশেয়েছ?

—কিছু না।

অনখেসেন বলে—ঠিক আছে, একে বন্দী রাখ। আর প্রতিদিন এই সুরাপাত্র থেকে সুরা পান করতে দাও। এর চেয়ে ভাল সুরা মিশরে নেই।

পরিচারিকা চিৎকার করে ওঠে—না, না।

—কেন?

—ও খেলে আমি মরে যাব।

অনখেসেনের বুক কেঁপে ওঠে। রক্ষী-প্রধানার চোখের দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বল।

—কি মিশিয়েছ?

—বিষ।

—কে দিয়েছে?

—বলব না।

—বলতে হবে না। আমি জানি। কত অর্থ দিয়েছে?

সে নীরব থাকে।

কেউ জানল না, কেউ বুঝল না অথচ সেই বিশেষ পরিচারিকা সেদিন থেকে উধাও হয়ে গেল। তার হদিশ কখনো আর মিলবে না পৃথিবীতে। অনখেসেনের মনে পড়ে গেল অয়-এর ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা। দুটোই হত্যা, কিন্তু দুই রকমের। একটাতে পাপ আছে, আর একটায় নেই। একটা বিবেককে পীড়িত করে, আর একটি বিবেকের ওপর কোনো চাপ সৃষ্টি করে না। তুতন্‌খ-এর যে শত্রু তাঁকে ক্ষমা করবে না সে।

তবু বিবেক ততটা স্বস্তি পায় না যতটা পাবে ভেবেছিল অনখেসেন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে পরিচারিকা জঘন্য অপরাধ করেছিল। কিন্তু সেই অপরাধ করেছিল সামান্য অর্থের লোভে। অথচ ফ্যারও আর সম্রাজ্ঞী হবার লালসায় যারা তাকে নিয়োগ করেছিল সেই মূল অপরাধী দু'জন ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে গেল। তাদের স্পর্শ করতে পারল না।

এই ঘটনার পরে দু-একদিন মুতনেজেমতকে ব্যস্তভাবে প্রাসাদে আসতে এবং ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। একে ওকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করল। তারপর একদিন সরে গেল। সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে সাক্ষাতের সাহস আর সঞ্চয় করতে পারল না।

ভোর হয়েছে সবে। অনখেসেনের নিদ্রা ভঙ্গ হলেও শুয়ে রয়েছে। পাশে তুতন্‌খ নিদ্রামগ্ন। অনখেসেন স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে এক দৃষ্টিতে। সহসা সে লক্ষ্য করে স্বামীর কানের পাশ দিয়ে একটা হালকা শ্মশ্রুর রেখা গালের দিকে নেমে এসেছে। সে পুলকিত হয়। উপুড় হয়ে তুতন্‌খ-এর মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে দেখে ওপরের ওষ্ঠের ওপরও গুম্ফরেখা। সে সেইভাবেই ঝুঁকে থাকে তুতন্‌খ-এর মুখের দিকে।

একসময় তুতন্‌খ-এর নিদ্রা ভঙ্গ হয়। সে চোখ মেলতেই অনখেসেনের আগ্রহ ভরা মুখ দেখতে পায়। খুব আনন্দ হয় তার। হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে স্ত্রীর গ্রীবাদেশ। অনখেসেন স্বামীর বুকের ওপর পড়ে যায়।

অনখেসেন তুতন্‌খ-এর কেশের মধ্যে হাত চালাতে চালাতে বলে—তুমি নাকি দিগ্বিজয়ী বীর হবে?

—হব। নিশ্চয় হব।

—তুমি নাকি আমার জন্যে নীলকান্ত মণি এনে দেবে?

—দেব। তোমার জন্যে না আনলে কার জন্যে আনব? আমি ওসব নিয়ে কি করব? তোমার জন্যে আনলে কত আনন্দ হবে তোমার।

—আমার আনন্দে তোমার কি?

—বা রে, তোমার আনন্দেই তো আমার আনন্দ। তুমি একটা কথা জান না।

—কোন্ কথা।

—তোমার যখন আনন্দ হয়, তখন তা দেখে তোমার চেয়েও আমার বেশি আনন্দ হয়।

—তাই নাকি। জানতাম না তো? এতক্ষণে বুঝলাম কেন আমাকে আনন্দ দিতে চাও। তুমি ভীষণ দুষ্টু।

তুতন্‌খ হাসতে থাকে। যেন খুব জব্দ করে দিয়েছে অনখেসেনকে।

তুতন্‌খ সব রকমের অস্ত্রবিদ্যায় একটু একটু করে পারদর্শী হয়ে উঠছে। যদিও হোরেমহেব দেশের সেনাধ্যক্ষ, তবু তুতন্‌খ-এর প্রশিক্ষণের দেখাশোনার ভার অয়-এর ওপর। অনখেসেন এ ব্যবস্থা করেছে। সে জানে, অয় হোরেমহেবের চেয়ে অনেক বেশি বিশ্বস্ত। তাছাড়া তুতন্‌খ-এর প্রতি তার স্নেহ রয়েছে। নইলে তুতন্‌খকে ফ্যারও করার জন্য অত আয়োজন সে করত না। অবশ্য এর মূল কারণ হোরেমহেবের উচ্চাশায় বাধা দেওয়া। তবু অয় অনেক ভাল। সিংহাসনের লোভে সে অন্তত তুতন্‌খকে হত্যা করতে চাইবে না। বরং চাইবে তুতন্‌খ বহুদিন ফ্যারও হয়ে থাকুক। আরও চাইবে তুতন্‌খ-এর যেন পুত্র সন্তান হয়।

স্বামীর দেহের ওপর চাপ সৃষ্টি করে সে বলে—তোমার পরীক্ষা নেব কাল।

—কি পরীক্ষা?

—তোমার হাতের লক্ষ্য কেমন হয়েছে দেখতে হবে।

—বেশ তো।

—কাল আমরা নীলনদ ধরে দক্ষিণদিকে অনেকটা দূরে চলে যাব। সেখানে অনেক পাখি। তোমার পক্ষী শিকারের পরীক্ষা হবে।

—পাখি আবার শিকার নাকি? ও তো সবাই পারে। নিরীহ জীব।

—আস্তে আস্তে হবে। তারপর হবে হিংস্র জন্তু শিকার।

—তখন তোমাকে কিছুতেই নিয়ে যাব না।

—আমি যাবই। আমিই তো পরীক্ষা নেব।

—না। যদি কিছু হয়ে যায়।

—কিছু হবে না। তুমি তো সঙ্গে থাকবে। তুমি তোমার রাণীকেও রক্ষা করতে পারবে না ফ্যারও হয়ে?

তুতনখ মুশকিলে পড়ে। সে ঢোক গিয়ে বলে—নিশ্চয় পারব।

সেইদিনই সবাই জেনে গেল যে ফ্যারও পরদিন রাণীকে সঙ্গে নিয়ে পক্ষী শিকারে যাবেন। এটা একটা নতুন সংবাদ। কারণ অখেন-অটেন কবে শিকারে গিয়েছিলেন প্রবীণরাও মনে করতে পারে না। আর স্মেনখকরের ওসব বিষয়ে কোনো উৎসাহই ছিল না। যৌবনের প্রথম শুরুতে তার মধ্যে যে চনমনে জীবনীশক্তি দেখা দিয়েছিল কয়েক বৎসরের মধ্যেই তা নিঃশেষিত হয়ে যায়। সে হয়ে পড়ে নির্জীব। তাই তুতনখ রাণীকে নিয়ে শিকারে যাবেন শুনে সবাই উৎসাহিত বোধ করে।

ফ্যারও শিকারে গেলে সাধারণ মানুষের মতো একা একা যেতে পারেন না। পক্ষী শিকার হলেও তাঁর নিরাপত্তার জন্য লোক-লস্কর, রক্ষীরা যাবেই। হোরেমহেব প্রস্তাব দিয়েছিল, সেও যাবে শিকারে। অনখেসেনের পরামর্শে তুতনখ তাকে মিষ্টি কথায় ফিরিয়ে দেয়। বলে, সাধারণ এই শিকারে তার সঙ্গে থাকার প্রয়োজন নেই।

নগরীর রাস্তায় কিছু লোক জড়ো হয়েছিল, শিকার-যাত্রা দেখতে। আসলে তারা অল্পবয়সী ফ্যারওর দৃষ্টিনন্দন চেহারা দেখতে ভালবাসে। তার ওপর শুনেছে রাণীও সঙ্গে যাবেন। সুতরাং কৌতূহল অনেক বেড়ে গিয়েছে।

প্রাসাদ থেকে ফ্যারওর শকট নির্গত হয় একসময়। সবাই ভেবেছিল ফ্যারওর পাশে তাঁর পত্নী উপবিষ্ট থাকবেন। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা গেল অন্যরকম। সবাই দেখল ফ্যারও বসে রয়েছেন একটি উচ্চ আসনে, আর তাঁরই পদতলে বসে সম্রাজ্ঞী একটি একটি করে শর পরীক্ষা করে সযত্নে তুণে রাখছেন। ফ্যারও সহাস্যে তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি একরি শর ফ্যারওর হাতে দিয়ে কি যেন বলেন। ফ্যারও মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে শরটি রাণীর হাতে তুলে দেন।

এই দৃশ্যে সবাই মুগ্ধ হয়। তারা বুঝতে পারে, ফ্যারওর বয়স অত কম হলেও রাণী তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন—যথোচিত সম্মান দেন। প্রজাবৃন্দের সামনেও এই সম্মান প্রদর্শনে সম্রাজ্ঞী কুণ্ঠিত নন। সবাই অনুমান করে নেয় ফ্যারওর বয়স যতই কম হোক, তিনি বুদ্ধিমান এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। নইলে রাজ্ঞী সবার চোখের সামনে ফ্যারওকে অমন অকুণ্ঠিত চিত্তে মান্য করতেন না। রাণীর এই একটি কার্যে ফ্যারওর আসন সাধারণের মনের অনেক উঁচুতে প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

নগর থেকে অনেক দূরে নীলনদের পার্শ্ববর্তী এক হরিৎ ক্ষেত্রে অনেক রকমের পাখির ঝাঁক। তারা বছরের এই সময় নাম-না-জানা অনেক দেশ থেকেও উড়ে আসে।

ফ্যারওর শকট সেখানে গিয়ে থামল। ফ্যারও মুগ্ধ দৃষ্টিতে পাখিদের দিকে চেয়ে থাকেন। তাদের কুজনে চারদিক মাতোয়ারা। যেন কোনো এক বিরাট উৎসবে মেতে রয়েছে তারা। সেখানে ছোট বড় ভেদাভেদ নেই। কত বিভিন্ন ধরনের পাখি পাশাপাশি বসে রয়েছে। দল বেঁধে খাবার খাচ্ছে। কেউ কেউ জলের মধ্যে গা ডুবিয়ে আরাম উপভোগ করছে।

অনখেসেন স্বামীকে ওইভাবে তন্ময় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে তার বাহুতে হাত রাখে। তুতনখ সম্বিত ফিরে পায়। তার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল দেখায়।

অনখেসেন তার মুখের দিকে চেয়ে তার হাতে তীর তুলে দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। কিন্তু তা হলে তো চলবে না। তুতনখ-এর বয়স কম। একেতেই সে কোমল স্বভাবের। তার ওপর কম বয়সের জন্য একটু বেশি মাত্রায় অনুভূতিপ্রবণ। নিজেকে শক্ত করে নিয়ে প্রশ্ন করে—কি দেখছ।

—পাখি। কী সুন্দর।

—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি ফ্যারও একথা ভুললে তো চলবে না।

—সেকথা ভুলব কেন?

—ফ্যারওকে অনেক সময় অতিমাত্রায় কঠোর হতে হয়। নিষ্ঠুর হতে হয়। নইলে রাজ্যশাসন চলে না।

—সে কথা জানি।

—তাহলে দ্বিধা কেন। এই নাও তীর। ওই যে লম্বা গলা নিয়ে রাজকীয় চালে চলাফেরা করছে পাখিটা ওটাকে বিদ্ধ কর।

তুতন্‌খ-এর চোখে কাতর দৃষ্টি ফুটে ওঠে। অনখেসেন সেই দৃষ্টি এড়াবার জন্য অন্যদিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে—নাও। পরীক্ষা দাও।

তুতন্‌খ চুপচাপ দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে।

—কী হ'ল?

—ওই যে দূরে গাছে একটা সাদা ফুল ফুটে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ?

—হ্যাঁ। তাতে কি হ'ল?

—ওটা এই লম্বা গলার বড় পাখির চেয়ে অনেক ছোট আর অনেক দূরে। এই দেখ।

তুতন্‌খ অনখেসেনের হাত থেকে শরটি নিয়ে বাঁ পা সামনে এগিয়ে দিয়ে জ্যা টানে। পরমুহূর্তেই সেই ফুল কয়েকটি পাতাসমেত মাটিতে ঝরে পড়ে। অনখেসেন বিস্মিত হন। এই পারদর্শিতা অভাবনীয়। তক্ষুনি তুতন্‌খকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সেটা শোভনীয় নয়।

তুতন্‌খ পত্নীর মুখের দিকে চেয়ে তার লক্ষ্যভেদের প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করতে চেষ্টা করে। কিন্তু অনখেসেন কোনো কথা না বলায় সে ভগ্ন কণ্ঠে বলে—সন্তুষ্ট হলে না?

—না।

—কেন?

—ওতে তোমার নিশানার পরীক্ষা হ'ল শুধু। বাকি থাকল অনেক কিছু।

—কি বাকি থাকল?

—তুমি কতটা শক্ত তার প্রমাণ হয়নি। তুমি কতখানি সহ্য করতে পার তা জানা যায়নি। রক্ত দেখলে তুমি বিচলিত হও কিনা তাও বোঝা যায়নি।

—ও, কি করতে হবে আমাকে।

—লম্বা গলা পাখিটা উড়ে গিয়েছে। ঐ যে দূরে মাঝারি ধরনের মেটে রঙের দুটি পাখি পাশাপাশি বসে একজন আর একজনের গা পরিষ্কার করে দিচ্ছে, ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকাচ্ছে। ওটির মধ্যে বাঁদিকের পাখিটাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ কর।

—তুমি বলছ কি! ওরা যে তুমি আর আমি।

অনখেসেন হেসে ফেলে। বলে—নাঃ, তুমি ফ্যারও হবার যোগ্য নও। কিন্তু আমি ছাড়ব না। বেশ ওই যে দূরে একটা সাদা রঙের পাখি একা একা বসে ঝিমোচ্ছে, ওটিকে শেষ করে দাও। ও বেঁচে যাবে।

—কেন!

—ওর জোড়া মারা গিয়েছে। নাও, তাড়াতাড়ি কর। দেরি করো না।

তুতন্‌খ কয়েক মুহূর্ত সময় নিল মাত্র। পাখিটা ওখানেই কাত হয়ে পড়ল। পা দুটো সামান্য কেঁপে উঠল।

—হলো তো? ওর জোড়া মরে গিয়েছে জানলে কি করে।

—একথা জানতে সময় লাগে নাকি। যাও, ওটাকে নিয়ে এসো। একটু রক্ত দেখ। বন্য পশু শিকার করবে কি করে?

তুতন্‌খ জলাভূমিতে নেমে অনেকটা দূর গিয়ে পাখিকে নিয়ে আসে। তার সঙ্গের লোকেরা ব্যস্ত

হয়ে উঠে। অনখেসেন হাত তুলে তাদের নিষেধ করে। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে।

তুতনখ বিকৃত মুখে পাখিটা অনখেসেনের পায়ের কাছে রেখে বলে—খুশি?

—হ্যাঁ। তোমার প্রথম শিকার। আমার কাছে এর মূল্য অনেক।

—হিংস্র প্রাণী বধ করলে, আর রক্ত দেখলে এতটা বিচলিত হব না।

—হিংস্র প্রাণীদেরও স্নেহ ভালবাসা সবই আছে। তারা মাংস খায় বলে আর আত্মরক্ষা করার জন্য পালিয়ে না গিয়ে আক্রমণ করে বলে তারা খারাপ নয়। তুমি অবিচার করছ।

—ঠিকই বলছ। তবে তাদের শিকার করার সময়, তারা যখন আক্রমণ করবে, তখন এই নিরীহ প্রাণীটাকে মারার মতো মন টলবে না। কারণ জানব আমি না মারলে সে আমাকে মারবে।

অনখেসেন আবার অবাক হয়। বলে—তুমি এত গভীরভাবে ভাব? আশ্চর্য।

তুতনখ সঙ্কুচিত হয়।

অনখেসেন বুঝতে পারে তুতনখ-এর শ্মশ্রুগুম্ফ আগের চেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে লক্ষ্য করে তুতনখ মাঝে মাঝে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। তখন তাকে বড় বেশি বিষণ্ণ মনে হয়। সে নানান ভাবে প্রশ্ন করেও সদুত্তর পায় না। ফলে তার দুশ্চিন্তা বাড়ে। রাগ করে, অভিমান করে, আদর করে কিছুতেই তুতনখ-এর মনোভাব বুঝতে পারে না।

শেষে এক রাত্রে ঠিক করল ওর পাশে শোবে না। অন্য কক্ষে থাকবে। তার মায়ের সময়ের এক পরিচারিকাকে কথাটা বলল। পরিচারিকা শুধু বলে—চেষ্টা করে দেখুন। আমি বাইরে থাকব।

রাত্রে তুতনখ শয্যায় শুয়ে পড়লে, অনখেসেন তার গা চাদর দিয়ে ঢেকে বাইরের দিকে যায়।

—কোথায় যাচ্ছ?

—ঘুমোও। আসছি।

তুতনখ শুয়ে অপেক্ষা করে। অনেকক্ষণ হয়ে যায় তবু অনখেসেনের দেখা নেই। সে পাশে না থাকলে নিশ্চিন্ত হতে পারে না তুতনখ। ফাঁকা ফাঁকা লাগে। ভাবে কোনো কাজ আছে হয়ত অনখেসেনের। তার মুখে শুনেছে, দিদি মার্ত পড়াশোনা করত। সম্রাজ্ঞী হলে ওসব করা ভাল। তাই তারও প্রবল ইচ্ছা ছিল। তারপর তুতনখ এখানে আসার পর সম্রাজ্ঞী হয়েই সে শুরু করে দিয়েছিল। এখন ভালই লিখতে পারে। সব বোঝে। মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ধরে লেখে। কখনো পড়ে। এত রাতে মোমবাতি জ্বালিয়ে কি পড়াশোনা করছে?

ছটফট করতে শুরু করে তুতনখ। বুঝতে পারে অনেক রাত হয়েছে। একেতেই মন খারাপ হয়ে থাকে। কিছু ভাল লাগে না। নেফেরতিতির সঙ্গে থেকে থেকে সে অমেন দেবতার প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। একমাত্র তাঁকেই শ্রদ্ধা করে। থীবস্-এ অনেম দেবতার পূজা-মন্দির এখনো দু-একটি টিকে আছে। কিন্তু এখানে একটিও নেই। এখানে অটেন দেবতার প্রতিপত্তি ছিল এতদিন। স্মেনখকরের মৃত্যুর পরে সেই প্রতিপত্তি কিছুটা ঝিমিয়ে পড়লেও এখনো তাঁরই পূজা হয়। একটা অভ্যাস, কৃত্রিম হলেও ছাড়তে সময় লাগে। তাই তুতনখ-এর মন খারাপ হয়ে থাকে। সে জানে নেফেরতিতিকে কেন নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। নেফেরতিতি নিজেই একটু একটু করে সব কথা তাকে বলেছেন। তিনি তুতনখকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন—কখনো যদি ফ্যারও হতে পারিস, অমেনকে আবার স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিস। এইটুকু তোর কাছে প্রার্থনা।

—তুমি এ কি বলছ মা? এ তোমার আদেশ। ফ্যারও যদি কখনো হই, অমেন দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করব।

—প্রজাদের সমর্থন পাবি। আমি তাদের মনোভাব জানি।

ফ্যারও হয়ে কয়েক বছর কেটে গেল, এখনো মুখ ফুটে একথা উচ্চারণ করতে পারেনি সে। সে লক্ষ্য করেছে, অয় কিংবা হোরেমহেবের কোনো দেবতা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। তবে দোহাই দেবার সময় অটেন দেবতার নাম উচ্চারণ করে। কিন্তু অনখেসেনের মনোভাব বুঝতে পারে না। তার মনোভাব না বুঝলে কিছুতেই কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে না সে। একটা কথা ভেবে মনের ভেতরটা অহরহ ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে তার। সে নেফেরতিতিকে কথা দিয়েছে অমেনের পূর্ব গরিমা ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু অনখেসেন যদি অটেনে বিশ্বাসী হয় তাহলে সে কি করবে? নেফেরতিতির কাছে তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে? নাকি অনখেসেনের মন রাখবে? মৃত ব্যক্তির মর্যাদা রাখবে? নাকি তার সর্বক্ষণের সঙ্গিনীকে তুষ্ট করবে? মৃত ব্যক্তি বড়, না জীবিত ব্যক্তি বড়? এর ওপর আর এক সমস্যা, সে নিজে অমেনের ভক্ত। নিজের বিশ্বাসকেও কি জলাঞ্জলি দিতে হবে শেষ পর্যন্ত?

রাত বেশ শীতল। তবু তুতনখ-এর সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠে। অনখেসেন গেল কোথায়? গায়ের ওপর থেকে চাদর পা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে সে শয্যা থেকে নামে। কক্ষের বাইরে এসে দেখে একজন নারী প্রহরীর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে অনখেসেনের প্রাচীন পরিচারিকা।

—রাণী কোথায়?

যথাযথ সম্মান জানিয়ে সে বলে—ঘুমোচ্ছেন।

—ঘুমোচ্ছেন? কোথায়?

পার্শ্ববর্তী কক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে পরিচারিকা।

—ওখানে কেন?

—উনি বললেন আপনার মন খারাপ। আপনার ওখানে থাকলে আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত হবে।

—তাই বলেছেন?

—হ্যাঁ ফ্যারও।

—ওঁকে গিয়ে বল, আমার নিদ্রার ব্যাঘাত হবে না। এখুনি যেন আসেন।

—যে আজ্ঞে।

তুতনখ শয্যায় এসে বসার একটু পরেই হাই তুলতে তুলতে নিদ্রাকাতর চোখে অনখেসেন আসে।

তুতনখ তাকে দেখে অবাক হয়ে বলে—তুমি ঘুমোচ্ছিলে?

মিথ্যা বলতে বাধো বাধো ঠেকলেও অনখেসেন বলে—হ্যাঁ। কি করব। তোমার মন খারাপ। ভাবলাম, একা থাকলে ভাল ঘুম হবে তোমার।

—তুমি কাছে না থাকলে আমার ঘুম হয়?

—না।

—তবে?

—কিন্তু তোমার সঙ্গে তো আমার কোনো সম্পর্কই নেই। মুখ গম্ভীর করে থাকো। কি হয়েছে কিছুতেই বলতে চাও না।

তুতনখ বলে—বলতে পারলে আমার দুঃখ ঘুচে যেত। কিছুতেই বলতে পারছি না।

—আমি তোমার পর?

—না। সবচেয়ে আপন। সেই জন্যেই মুশকিল হয়েছে। একদিকে তোমার মা, অন্যদিকে তুমি। একদিকে প্রতিজ্ঞা রক্ষা অন্যদিকে তোমাকে সব সময় আনন্দে রাখা। কোনটা বড়। আমি জানি তুমিই আমার সব। কিন্তু মৃতের কাছে শেষ প্রতিজ্ঞা—তার মূল্য?

অনখেসেন তুতনখ-এর পাশে বসে তার গায়ের ওপর একটা হাত রেখে বলে—তোমাকে জীবিত কিংবা মৃত কারও কথা ভাবতে হবে না। তুমি শুধু বল তোমার সমস্যা কি? আমি সমাধান করে দেব এক মুহূর্তেই।

—আমি জানি তুমি কি সমাধান করবে।

—কি?

—তুমি আমার মন দেখবে। তুমি দেখবে আমি কিসে সুখী হই। সঙ্গে সঙ্গে নিজের সব সুখ জলাঞ্জলি দিয়ে তাই করবে।

—তুমি বড় বেশি আমার কথা ভাব। অত ভাবলে পুরুষেরা এগিয়ে যেতে পারে না। একই জায়গায় আবদ্ধ থাকে।

—তাই বলে তোমাকে দুঃখ দেব?

—নিশ্চয় দেবে। তবে আমি দুঃখ পাব না। কারণ তোমার সুখই আমার সুখ। কেউ আমাকে দুঃখী করতে পারবে না। তুমিও না। কারণ জানি, তুমি আমায় ভালবাস।

তুতন্‌খ-এর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে বলে—আমি তোমার মায়ের কাছে মানুষ হয়েছি। তিনি আমারও মা বলতে গেলে। তাই তাঁর ধর্ম বিশ্বাসও পেয়েছি তাঁরই কাছ থেকে। জানি, এখানে কেউ সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয়। তুমিও নও।

—কোন্ বিশ্বাসের কথা বলছ?

—তোমার মা কেন নির্বাসিত হয়েছিলেন তুমি জান?

—জানব না কেন? তিনি পিতার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন ধর্মবিশ্বাসে। তিনি অমেন দেবতার প্রতি বিশ্বাসী হয়েছিলেন।

—তিনি মৃত্যুর দু-এক মাস আগে আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন, ফ্যারও হলে আমি যেন অমেন দেবতার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনি।

অনখেসেন হাসে। বেশ পরিতৃপ্তির হাসি। এই হাসি তুতন্‌খকে শুধু আশ্বস্ত এবং তৃপ্তই করে না, এই হাসির মধ্যে সে দেখে এক নতুন সৌন্দর্য, যা তাকে জীবনে এই প্রথম তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। অনখেসেনকে সে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে পায়। এতক্ষণ অনখেসেন তার গায়ে হাত রেখেছিল, এখন সে সেই হাত ছাড়িয়ে দিয়ে তাকে টেনে নেয় নিজের কোলের ওপর। বিস্মিত অনখেসেন কোলের ওপর শুয়ে তুতন্‌খ-এর মুখের দিকে চায়। সে দেখতে পায় সেই ঝড়ের সঙ্কেত যার জন্য এতদিন সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। আত্মসমর্পণের দিন এতদিনে এলো।

তুতন্‌খ কথা বলতে পারছিল না। কি করবে ভেবে পায় না। অনখেসেনকে সম্পূর্ণরূপে পেতে চায়, কিন্তু কিভাবে পেতে হয়, জানে না সে। সে ছটফট করে। অনখেসেনকে দলিত-মথিত করে।

অবশেষে অনখেসেনকেই মুখ্য ভূমিকা নিতে হয়। মনে মনে সে ভাবে, এই প্রথম আর এই শেষ। এর পরে আর তুতন্‌খকে পরিচালিত করতে হবে না। এরপর থেকে সে হবে নায়ক। সব কিছু পরিচালনার ভার তার। অনখেসেন হয়ে থাকবে নিষ্ক্রিয়—ওর হাতের পুতুল।

সুখের ঘোর যেন কাটতে চায় না অনখেসেনের। তার আরও ভাল লাগে তুতন্‌খ-এর প্রভুত্বব্যঞ্জক মুখভাব দেখে। সে এখন অনখেসেনের দেহ-মন সব কিছুর ওপর প্রভুত্ব করছে।

তুতন্‌খ-এর অপার কৌতূহলের যেন শেষ নাই। অবাক চোখে বার বার সে অনখেসেনের দিকে চায়।

—আর কত দেখবে বল তো? দেখার কি শেষ হবে না?

তুতন্‌খ শুধু হাসে।

—তোমার সমস্যার কথাই তো শেষ হয়নি।

—আজ কিছু বলব না। কালও না, পরশুও না।

—তবে কবে?

—কি জানি?

—আমি তোমাকে একটা কথা বলব?

—কি কথা?

—শুনে তোমার খুব আনন্দ হবে। তখন আমাকে আরও ভালো লাগবে।

—এর চেয়ে ভাল লাগে নাকি?

—হ্যাঁ লাগে। মনের মিল হলে আরও ভাল লাগে। কোন বাধাই থাকে না দু'জনার মধ্যে। এখন তুমি বুঝতে পারছ না। ক'দিন পরেই পারতে, যদি মিল না হতো।

—তুমি কোন্ কথা বলছ?

অনখেসেন তুতন্খ-এর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে—আমিও অমেনকে শ্রদ্ধা করি। অটেনকে নয়।

তুতন্খ প্রায় লাফিয়ে ওঠে। তারপর আনন্দোচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ খুঁজতে থাকে।

অনখেসেন আনন্দাতিরিক্ত হতাশা প্রকাশ করে বলে—আমি জানতাম।

পরদিন সকালে প্রবীণা পরিচারিকা অনখেসেনের মুখ দেখে বুঝতে পারে সম্রাজ্ঞীর জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। নেফেরতিতির কথা মনে পড়ে যায় তার। এভাবে মাত্রাতিরিক্ত সুখের ঘোর নিয়ে সবাই তো জীবন শুরু করে। শেষ পর্যন্ত কয়জনের দীর্ঘস্থায়ী হয় এই সুখ। অমেন দেবতা কি এই মেয়েটির দিকে চাইবেন? জানে না সে।

অনখেসেন পরিচারিকাকে প্রশ্ন করে—কি দেখছিস?

—ঠিকই দেখছি।

—বাজে কথা বলিস না।

—মনের চোখ দিয়ে না হয় আমি দেখতাম শুধু। কিন্তু চর্মচক্ষু দিয়েও দেখতে পাবে অন্য সবাই।

—কি? কোথায়?

অনখেসেন মুখে মাথায় হাত বোলায়।

—উঠবে না। ওই মোমের মত মুখে এঁকে দেওয়া হয়েছে যে।

—তুতন্খটা যেন কি—

—ওঁর কি দোষ? উনি তো ফ্যারও। সব দোষের উর্ধ্বে।

অনখেসেন একটা কটাক্ষ হেসে চলে যায়।

কয়েকদিনের মধ্যে দু'জনা মিলে সিদ্ধান্তে আসে রাজধানী আর এখানে নয়, থীবস্-এ স্থানান্তরিত করতে হবে। সেখানে অমেনের মন্দিরগুলো সংস্কার করতে হবে। সেখানকার সবাই অমেনের ভক্ত। নিশ্চিন্তে তাঁর আরাধনা করবে সবাই।

অনখেসেন বলে—আমাদের দু'জনার নামও পরিবর্তন করতে হবে।

—হ্যাঁ, এখন তুমি অনখেসেন অটেন—অটেনের মধ্যে বসবাসকারী। তখন হবে অনখেসেন অমেন—অমেনের মধ্যে বাস।

অনখেসেন তুষ্ট হয়ে বলে—আর তুমি?

—এখন আমি তুতন্খটেন—অটেনের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তখন হব তুতন্খামেন—অমেনের জীবন্ত প্রতিমূর্তি।

—বাঃ, খুব ভাল হবে। কবে যাব আমরা?

—অয়কে জিজ্ঞাসা করব। সময় লাগবে কিছুটা।

তুতন্খ যেন হঠাৎ সাবালক হয়ে উঠেছে। সে এখন সব বিষয়ে বেশি সক্রিয়। এতদিন সে অনখেসেনের মুখের দিকে চাইত। এখন অনখেসেন তার মুখের দিকে চায়। প্রতিটি ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা তার। তাকে সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে অনখেসেন নিশ্চিন্ত। ভাবে, এবারে একটু ভালভাবে

রূপচর্চা করতে হবে। এক এক রাতে এক এক ভাবে তুতনখকে চমকে দিতে হবে। তুতনখ তার মধ্যে অপার রহস্যের সন্ধান পাবে। পড়া পুঁথির মতো একঘেঁয়ে লাগবে না তাকে। রূপচর্চার যাবতীয় সাজসরঞ্জাম সে আনার ব্যবস্থা করে নানা দেশ থেকে।

রাজধানী স্থানান্তরের কথা শুনে অয় বলে—সে যে বৃহৎ ব্যাপার।

—একটু বৃহৎ বৈকি। আপনি ব্যবস্থা করুন। আমি তিন মাস শেষ হবার আগেই চলে যেতে চাই। ওখানে আমি ছিলাম। সব জানি। কোনো অসুবিধা হবে না।

অয় ভাবে, তুতনখ-এর আর কতটুকু বয়স। তার পক্ষে এই পরিশ্রমসাধ্য কাজটা কিছু নয়। কিন্তু এই প্রবীণ বয়সে অত ঝঞ্ঝাট সামলাতে তার প্রাণান্ত হবে। তবু যেতে হবে। ফ্যারও নাবালক হলেও তিনি ফ্যারও। তাঁর আদেশ শিরোধার্য। তাছাড়া তুতনখ তাঁর স্নেহভাজনও বটে।

হোরেমহেব কথাটা শুনে প্রথমেই বলে ওঠে—অসম্ভব।

তুতনখ প্রশ্ন করে—কেন?

—সৈন্যদলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে।

—স্থায়ী সৈন্যদল আর কতটুকু? কয়েক হাজার। তাদের নিয়ে কি অসুবিধা হবে।

—হবে বৈকি। তারা সবাই এখানকার মানুষ। যেতে চাইবে না।

—সেটা কোনো যুক্তি নয়। আমি ফ্যারও, আমি চাই রাজধানী স্থানান্তরিত হোক। সৈন্যরা কি চাইছে, সেটা দেখা আমার কাজ নয়। সেটা আপনি দেখুন। ওদের ব্যাপারে মাথা ঘামানোর কাজ আপনার। আপনি দেখুন কিভাবে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজি করানো যায়। তেমন হলে কিছু সৈন্যকে ছাঁটাই করে দেবেন।

হোরেমহেব ফ্যারওর কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়। ছেলেটা অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সহসা খুব পরিণত হয়ে উঠেছে। কথার মধ্যে ব্যক্তিত্ব আর আদেশের দৃঢ়স্বর।

সে বলে—ঠিক আছে। ব্যবস্থা একটা হবে।

গৃহে প্রত্যাবর্তন করে হোরেমহেব স্ত্রীকে বলে—কী ব্যাপার বলতো?

মুতনেজেমেত জিজ্ঞাসা করে—কিসের ব্যাপার?

—তোমরা জাদু জানো নাকি?

—আমরা? আমরা কারা?

—তোমরা মেয়েরা।

মুতনেজেমেত একটু ধাতস্থ হয়ে মুচকি হেসে বলে—তা একটু জানতে হয় বৈকি?

—কি রকম?

—তুমি কি রকমের জাদুর কথা জানতে চাও আগে বল।

—ধর, কোনো অসহায় অবোধ শিশুকে মেয়েরা হঠাৎ বড় করে দিতে পারে? তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটাতে পারে?

একটু ভেবে নিয়ে মুতনেজেমেত বলে—পারে বৈকি? কিন্তু তুমি কার কথা বলছ?

—আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

—পারে। নিশ্চয় পারে।

তার আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠস্বরে হোরেমহেব একটু অবাকই হয়।

সে বলে—তুমি পার?

—হ্যাঁ।

—আমার মধ্যে পরিবর্তন আনতে পার?

—নিশ্চয় পারতাম।

—আনো দেখি।

—বললাম তো আগে পারতাম। এখন পারব না। অন্তত তোমার বেলায়।

—কেন?

—এর জন্যে চাই পরস্পরের প্রতি গভীর অকুণ্ঠ ভালবাসা। সেই ভালবাসা দিয়ে ব্যক্তিত্ব, বীরত্ব, নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ—সব রকমের পিরামিড গড়ে তোলা যায়। তোমার মধ্যে যে সেই জিনিস নেই।

—তোমার মধ্যে বুঝি আছে?

—নিশ্চয় ছিল। এখনো খুঁজলে কিছু কিছু ভালবাসার অবহেলিত টুকরো লুটিয়ে থাকতে দেখা যাবে।

—যত সব মনগড়া প্রলাপ।

—প্রলাপ নয়। এর চেয়ে সত্যি কিছু নেই। তুমি আমার সেই স্বর্গীয় ভালবাসার সুযোগ নিয়ে আমাকে দিয়ে ফ্যারওকে বিষপানে হত্যার চক্রান্ত করেছিলে পর্যন্ত। সেদিন থেকেই ভালবাসার তন্ত্রী ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন।

—সফল হলে এতদিনে সম্রাজ্ঞী হতে পারতে।

—এখন ভাবি, ওভাবে সম্রাজ্ঞী হয়ে হয়তো শান্তি পেতাম না।

থীবস্‌-এ এসে তুতনখ-এর খুব আনন্দ। পরিচিত স্থান। নেফেরতিতির স্মৃতি বিজড়িত স্থান। তাঁর হাত ধরে অমেনের মন্দিরগুলোতে সে যেত, প্রার্থনা করত। এখন সে যায় নেফেরতিতির কন্যাকে নিয়ে। সে মনে মনে ঠিক করে অনখেসেনের আনন্দের জন্য বাসভবনের সামনেই একটা মন্দির নির্মাণ করবে।

অয় মনে মনে ভাবে, এ ভালই হ'ল। হোরেমহেবকে এখানে গুছিয়ে বসে ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি গড়ে তুলতে কিছুটা সময় লাগবে। তবে ভাগ্য যদি তার ভাল হয় তাহলে অন্য কথা। সে লক্ষ্য করেছে হোরেমহেবের স্ত্রী মুতনেজেমেতের কাছে কয়েকজন অচেনা স্ত্রীলোক যাতায়াত করে। নজর রাখার ব্যবস্থা সে করেছে। সুরাপাত্রে বিষ মেশানো হয়ত সম্ভব হবে না, কিন্তু উপায়ের তো শেষ নেই। এ সব বিষয়ে দুরাত্মার বুদ্ধিও খেলে খুব বেশি। তুতনখ যেভাবে দ্রুত একজন যোগ্য প্রশাসকরূপে গড়ে উঠেছে তাতে হোরেমহেবের উতলা হবার কারণ যথেষ্ট। তাকে বিতাড়িত করা একেবারে অসম্ভব। কারণ সে সেনা পরিবারের সন্তান। সেনাদের ওপর তার স্বাভাবিক একটা আধিপত্য রয়েছে। সে যেমনই হোক সেনারা তাকে পছন্দ করবে। ফ্যারওর বিরুদ্ধে তারা যাবে না বটে, কিন্তু হোরেমহেবের অপসারণও শান্তভাবে মেনে নেবে না। সুতরাং লোকটা যতই অনভিপ্রেত হোক, সে থেকে যাবে। তাকে নিয়েই চলতে হবে তুতনখামেনকে।

মুতনেজেমেত প্রায়ই অমেনের মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করে। থীবস্‌-এর সবাই জেনে গিয়েছে সে কথা। সবাই তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকায়, যখন সে মন্দির থেকে প্রত্যাবর্তন করে। অনখেসেনের কানেও কথাটা যায়। অয়কে প্রশ্ন করতে অয় বলে—কি করে বলব কেন এত যায়।

—নিজের মর্যাদা বাড়াতে নয় তো?

—হতে পারে। সম্রাজ্ঞীর পরেই যাতে সাধারণের মনে স্থান করে নিতে পারে। সবই সম্ভব। তবে আসল খবরটাও এনে দিতে পারি একটু চেষ্টা করলে।

—দেখুন না চেষ্টা করে।

দু'দিন পর অয় হাসতে হাসতে বলে—আসল খবরটা জেনে এলাম।

কৌতূহলান্বিত অনখেসেন বলে—কি?

—মুতনেজেমেত এমনিতে যেমনই হোক, সে মন্দিরে যায় সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। এর মধ্যে কোনো রকমের বদ মতলব নেই।

—কিরকম?

—সে সন্তানবতী হতে চায়। খুব অশান্তি চলছে দু'জনার মধ্যে।

—স্বাভাবিক। অমেন যেন ওর প্রার্থনা শোনেন।

মনে মনে ভাবে অনখেসেন, সন্তান না হলে নারী হয়ে জন্মে লাভ কি? তারও নিশ্চয় হবে। সে বুঝতে পারে এখন না হোক, কোনোদিন সে সন্তানবতী হবেই। তুতনখামেন এখন বলতে গেলে পরিপূর্ণ পুরুষ। সে বেশ বলিষ্ঠও। আর বছর চারেকের মধ্যে তাদের একটি সন্তান হবে হয়ত। অবশ্য সেই সন্তান পুত্রও হতে পারে, আবার কন্যাও। প্রথমটা যাই হোক অমেনের আশীর্বাদরূপে মেনে নেবে তাকে।

সেদিন দ্বিপ্রহরের কিছু পরে ফ্যারও তুতনখামেন অনখেসেনের কক্ষে আসে।

—তুমি!

—হ্যাঁ।

—এখন!

—তুমি এভাবে কথা বলছ কেন অনখেসেন!

—কিভাবে বলছি?

—আমার মনে হচ্ছে অন্যায় করে ফেলেছি। আমি তো তোমার কাছে এসেছি।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

তুতন্‌খ-এর উৎসাহ একেবারে উধাও হয়। সে চুপ করে থাকে। কথা হারিয়ে যায়।

—কথা বলছো না কেন?

তুতন্‌খ অপ্রস্তুতের মতো বলে—না। আমি চলে যাচ্ছি।

—কেন?

—তুমি আমাকে চাও না বলে। তোমাকে দেখে, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি অনেক বড়। আমি চলি।

—দাঁড়াও।

তুতন্‌খ দাঁড়ায়। অনখেসেন তার কাছে আসে। তার সামনে দাঁড়িয়ে মুখের দিকে চায়।

ফ্যারওকে সে প্রশ্ন করে—আমার কথার উত্তর দিলে না তো? এখন এলে কেন?

—বললাম তো ভুল হয়ে গিয়েছিল। আমি চলে যাচ্ছি।

তুতন্‌খ এগিয়ে যেতে চায়। অনখেসেন তার পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—সরে যাও অনখেসেন।

—কোথায় যাচ্ছ?

—আমি আমার কক্ষে যাচ্ছি।

—তোমার সভার কাজ শেষ হয়ে গেল, এত তাড়াতাড়ি? অয়, হোরেমহেব, অন্য সবাই চলে গিয়েছেন?

—হ্যাঁ, আমার ভাল লাগছিল না। তাই চলে যেতে বলেছি।

—তোমার শরীর খারাপ?

—না।

—তবে?

—এমনিতে।

—এমনিতে খারাপ লাগে কখনো? তুমি একটা কিছু লুকোচ্ছ।

অনখেসেন লক্ষ্য করে তুতনখামেনের মুখ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। সে বুঝতে পারে শুধু শুধু এতক্ষণ একে কষ্ট দিচ্ছে। তবু বড় ভাল লাগছিল ওকে দুঃখ দিতে।

তুতন্‌খ তার রাণীকে ধাক্কা দিতে গিয়েও থেমে যায়। বুঝতে পারে ভুল করে ফেলছিল। অনখেসেনের ব্যথা লাগতে পারে। সে তাকে একটু ঠেলে চলে যাবার চেষ্টা করতেই অনখেসেন তার হাঁটুর কাছে বসে পড়ে দু' হাঁটু জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে।

তুতন্‌খ ব্যস্ত হয়ে ওঠে—কি হলো? লেগেছে, আমি তো কিছু করিনি।

—তুমি আমাকে আর ভালবাস না।

—কে বলল? তোমাকে ভাল না বাসলে বাঁচব কি করে। তুমি কি সব বলছ? ঘরে ঢুকতেই রেগে উঠলে। এতক্ষণে বুঝেছি নিশ্চয় তোমার শরীর খারাপ হয়েছে। ওঠো!

—না।

—ওঠো লক্ষ্মীটি।

অনখেসেন তবু তার হাঁটু জড়িয়ে বসে থাকে। তুতন্‌খ তখন তাকে দু'হাতে অতি সহজেই তুলে নেয়।

—কি করছ?

—তোমাকে শুইয়ে দেব। তোমার শরীর নিশ্চয় খারাপ।

—আমার শরীর খুব ভাল আছে।

—তাহলে?

—তুমি ঘরে ঢুকে আমার কথার উত্তর দিলে না কেন?

—কোন কথা?

—অসময়ে চলে এলে কেন? সে কথা বললে না আমাকে।

—বারে, তোমার কথা বারবার মনে হচ্ছিল। দেখলাম কোনো কাজ নেই। তাই ছুটে এসেছিলাম।

এবারে অনখেসেন তুতন্‌খ-এর গ্রীবা বেষ্টন করে বলে—এই সত্যি কথাটা এতক্ষণ বলা হয়নি কেন?

—ঘরে ঢুকতেই তো তুমি ধমকাচ্ছিলে।

অনখেসেন খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে বলে—আমার খুব ভাল লাগছিল।

—কি ভাল লাগছিল?

—তোমার মুখ কেমন হয়ে যাচ্ছিল। আমি ভাবছিলাম, যে ফ্যারওকে সবাই কত সমীহ করে, শ্রদ্ধা করে, তাকে আমি কেমন ভয় পাইয়ে দিয়েছি। তার মানে হ'ল আমি ফ্যারওর চেয়েও উঁচুতে।

তুতন্‌খ গম্ভীর হয়ে যায়। সে কোনো কথা বলে না।

—কি হ'ল আবার, উত্তর দিচ্ছো না কেন?

—তুমি এই সামান্য কারণে আমাকে এত কষ্ট দিলে? কত আশা নিয়ে ছুটে এসেছিলাম।

অনখেসেন তাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে টেনে নিয়ে বলে—খুব হয়েছে। এবারে এসো, সুদে আসলে তোমাকে আমি পুষিয়ে দিচ্ছি।

ওরা শয্যায় শুয়ে শুয়ে ঠিক করে অপরাহ্নে বাইরে বের হবে। অনেকদিন দু'জনা মিলে বাইরে যাওয়া হয়নি।

সেদিন তারা শকটে করে চলে গেল নগরের বাইরে বহু দূরে। সঙ্গে রক্ষীবাহিনী। ফ্যারওর শত্রুর

অভাব তো নেই। তুতন্‌খ-এর এই বাধ্যবাধকতা ভাল লাগে না।

সে অনখেনসেনকে বলে—একদিন পালাতে হবে।

—সেকি?

—ঠিক পালাব, তুমি দেখে নিও।

—কেন?

—চারদিকে এত লোকজন নিয়ে বের হতে আমার ভাল লাগে না।

—তাই বলে পালাবে?

—হ্যাঁ।

—একা?

—তা কেন? একা পালিয়ে মজা কোথায়? তুমিও তো সঙ্গে থাকবে। দু'জনা মিলে আরও দূরে চলে যাব। একটা পাহাড় থাকবে নীলনদের কাছে। লোকজন কেউ থাকবে না। শুধু তুমি আর আমি। ভাল হয় না খুব?

—খুব ভাল হয়। কিন্তু ওখানে কি খাওয়া হবে?

—কেন, বনের পশু?

—আর পাখি।

—ঠিক আছে পাখিও না হয় মারব। তুমি যখন বলছ।

—তা পাখির পালক ছাড়াতে পারবে? কাটতে পারবে?

—শিখে নেব। দু'দিনেই শিখে নেব। তুমি ভেবো না।

—আর রান্না?

—তুমি পারবে না?

—আমিও তাহলে শিখে নেব।

—বেশ রাজি।

—কিন্তু মশলা, লবণ—এসব?

তুতন্‌খ বলে ওঠে—অত সব ভাবার দরকার কি আগে ভাগে? সব ঠিক হয়ে যাবে।

—ঠিক আছে। কিন্তু অনেক দূর তো চলে এলাম। আজকে এখানেই নেমে একটু ঘুরে বেড়াই। ওই তো বেশ একটা তৃণভূমি রয়েছে—কিছু কিছু গাছপালাও আছে। চল, ওদিকে চলে যাই।

—চল।

ওরা শকট থেকে নেমে হাত ধরাধরি করে ছুটতে থাকে। ভুলে যায় ওরা একটি সুন্দর দেশের সম্রাট আর সম্রাজ্ঞী। মনে হয় দুই অল্পবয়সী ক্রীড়াসঙ্গী প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। রাজরক্ষীরা ওই দৃশ্যের যেমন সাক্ষী, তেমনি সাক্ষী আশেপাশের প্রতিটি বৃক্ষ এবং বৃক্ষশাখার বিহঙ্গকূল।

কিন্তু ওদের ছোটাছুটি খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। ওরা লক্ষ্য করে আকাশ জুড়ে সহসা মেঘের সঞ্চার হয়েছে। বৃষ্টি হবেই—দুর্লভ বৃষ্টি।

তুতন্‌খ বলে—আমি ভিজব।

অনখেসেনের মনে শঙ্কা। সে বলে—চল আগে গাড়ির কাছে যাই।

—কেন?

—বৃষ্টি তো বেশিও হতে পারে।

—বেশি আবার হয় নাকি?

—আজ খুব ঘন মেঘ। কেমন ডাকছে, আমার ভয় করছে তোমার জন্যে।

তুতন্‌খ-এর মন খারাপ হয়ে যায়। সে বলে—তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ। দেখো একটু পরেই সব

ঠিক হয়ে যাবে। এই সময়টুকু একটু আনন্দ করে নিই। কত বছর পরে আবার এমন দিন আসবে কে জানে।

—আমার মনে হচ্ছে বেশি বৃষ্টি হবে।

—কখনো বেশি হতে দেখিনি।

—তুমি দেখোনি, কিন্তু বহু বছর আগে নাকি অনেক বৃষ্টি হয়েছিল, দিনের পর দিন ধরে।

তুতন্‌খ হেসে বলে—ওসব কল্পনা।

—হতে পারে।

—জানো অনখেসেন, ওই যে বৃষ্টি আসছে, সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা পরিচিত সুঘ্রাণ পাচ্ছি।

—তোমার কথা বুঝলাম না।

—বৃষ্টি যেদিন আসে বছরের সেইদিন সেই সময় আমি একটা গন্ধ পাই।

—কিসের গন্ধ?

—একটা মিষ্টি গন্ধ। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশেষ দিনের কথা মনে পড়ে যায়।

—কোন দিন?

—তুমি হয়ত ভুলে গিয়েছ। একদিন আমরা দু'জনা শকটে করে নীলনদের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম, ফেরার পথে বৃষ্টি এলো। আমরা শকট থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করলাম। তখন অখেন-অটেন ছিলেন ফ্যারও। আমি কত ছোট। তোমার মা একটা বিশেষ সুগন্ধি তেল দিয়ে তোমার কেশচর্চা করে দিতেন। শকটে তুমি আমায় জড়িয়ে ধরেছিলে। সেই তেল আর তোমার গায়ের গন্ধ মিলিয়ে সুন্দর সুঘ্রাণ পাচ্ছিলাম তোমার বুকে মাথা রেখে। এখনো বৃষ্টি এলেই সেই সুঘ্রাণ পাই। আজও পাচ্ছি। অথচ সেই তেল এখন আর তুমি ব্যবহার করো না।

—তবে চল শকটে গিয়ে বসি, সেদিনর মতো। দেখি পাও কিনা সেই একই গন্ধ একইভাবে বসে। পেতেও তো পারো। এটাও কল্পনা হতে পারে।

—বৃষ্টিতে ভিজব যে।

—পরে ভিজতে পারবে।

—বেশ চল।

ওরা ছুটতে থাকে শকটের দিকে। আকাশের মেঘও ওদের তাড়া করে। একটু পরেই নামে মিশরের অতি আকাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি।

তুতন্‌খ নানান ধাতুর বিভিন্ন ধরনের দেব-দেবীর মূর্তি নির্মাণ করিয়ে অমেনের মন্দিরগুলোর ভেতরে আর বাইরে প্রতিষ্ঠিত করে। দেখতে অসাধারণ সুন্দর দেখায়। সে ইতিমধ্যে হোরেমহেবকে নির্দেশ দিয়েছিল বিরাট যুদ্ধাভিযান আপাতত যখন সম্ভব নয় তখন দক্ষিণের দিকে ছোটখাটো অভিযান চালাতে। হোরেমহেব অমান্য করতে পারেনি ফ্যারওর নির্দেশ। বেশ কিছু যুদ্ধবন্দীকে এনে উপহার দেয় ফ্যারওকে। তুতন্‌খ সেই সব বন্দীদের শ্রমিক হিসাবে কাজে লাগায়। রাস্তাঘাট নির্মাণ করে।

অয় একদিন ফ্যারওকে বলে—বৃদ্ধ হতে চললাম। একটা সখ আজও পূর্ণ হলো না।

—কোন্ সখ।

—আমার নিজের জন্য একটা সমাধি করার ইচ্ছা।

—আপনি তো শুরু করেছিলেন।

—হ্যাঁ। কিন্তু অত লোক পাব কোথায়? আপনি যদি কিছু বন্দীদের দেন, তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে পারি।

তুতন্‌খ বলে—বেশ তো নিন। কত চান?

—হাজার খানেক।

—নিন। আমার নিজের জন্যে তো আপাতত দরকার নেই।

অয় সন্তুষ্ট হয়ে চলে যায়।

অয় শ্রমিক পেয়েছে শুনে হোরেমহেবও চেয়ে বসে ফ্যারওর কাছে।

ফ্যারওকে বলে—আমারও ইচ্ছা একটা সমাধি সৌধ তৈরি করি নিজের জন্যে।

—নিশ্চয় করবেন। তবে এখন কেন? আপনি তো যুবক বলতে গেলে। অয়-এর কথা আলাদা। সত্যি তো। তিনি যথেষ্ট বয়স্ক।

—জীবন মরণের কথা কেউ কি বলতে পারে?

—তা পারে না বটে। তাই বলে একজন শিশু জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে তো তার সমাধি তৈরি করায় না। সেকথা চিন্তা করতে চায় না কেউ। ভয়ে মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আমার কথাই ধরুন। আমি নিজের জন্যে এখনো কিছু করার কথা ভাবছি না। এত তাড়াতাড়ি মৃত্যুর কথা ভাবব কেন?

—আপনি একেবারে তরুণ। তাছাড়া আমাকে যুদ্ধবিগ্রহে যেতে হয়। যুদ্ধাস্ত্র বয়স মানে না।

—আমাকেও যেতে হতে পারে যুদ্ধে।

—আমি থাকতে? তা হয় না।

—ফ্যারও হয়ে যুদ্ধে যাব না?

—নিশ্চয় যাবেন। তবে এই সব ছোট খাটো যুদ্ধে নয়। সিরিয়া কিংবা আরও ওদিকে যেতে হলে ভিন্ন কথা।

—আপনি লোক অবশ্যই পাবেন, কিন্তু অয়-এর মনস্কামনা পূর্ণ হোক আগে। আমি শ্রমিকদের যেভাবে কাজে লাগিয়েছি তাদের আর অন্য কোথাও দেওয়া যায় না। আপনি বরং কিছুদিন পরে আর একবার যুদ্ধে যান। কিছু বন্দী নিয়ে আসুন।

হোরেমহেব আশাহত হয়। বলে—বেশ। তাই হবে।

কিছুদিন থেকে আনখেসেনের মনে শৈশবের সেই ভীতি-বিজড়িত স্মৃতিগুলো ঘুরে ফিরে আসতে থাকে। ভেবে পায় না, কেন এমন হয়। এই প্রাসাদ তো ছেলেবেলার প্রাসাদ নয়। লোক-লস্করও পাল্টে গিয়েছে। এখন প্রাসাদের প্রতিটি স্ত্রী-পুরুষ তার বিশ্বস্ত। মা নেফেরতিতির মতো সেও নিজের একটি গোষ্ঠী তৈরি করে নিয়েছে। এদের মধ্যে গুপ্তচরও রয়েছে। এরা প্রয়োজনে বার্তা নিয়ে গিয়ে অন্যত্র পৌঁছে দিতে পারে। রাণীর জীবন বিপন্ন হতে দেখলে এরা যুদ্ধও করতে পারে। তাই এখনি অনখেসেনের নিশ্চিন্ত থাকার কথা। তবু ভেতরে ভেতরে অশান্তি। একটা যুক্তিহীন আশঙ্কা তার মনকে সব সময় ভারী করে রাখে। তুতন্‌খ-এর সোহাগও তাকে শান্তি দিতে পারে না। তবে সে তার মনের কথা তুতন্‌খকে জানতে দিতে চায় না। না চাইলে কি হবে, কোন্‌টা অভিনয় আর কোন্‌টা অভিনয় নয়, এটা সহজেই বুঝতে পারে তুতন্‌খ।

—তোমার কি হয়েছে?

—কিছু না তো?

—আমার কাছে কি গোপন করা সম্ভব? শুধু শুধু নিজে কষ্ট পাচ্ছ।

এবারে অনখেসেন একেবারে ভেঙে পড়ে। তার অশ্রুজলে স্বামীর বুক ভিজে যায়।

সে বলে—আমার সব সময় মনে হয় একটা বিপদ আসছে।

—কিসের বিপদ?

—জানি না। বুঝতে পারি না। তবু কেমন যেন মনে হয়।

—কেমন করে হবে? দেশের অরাজকতা এখন একেবারে কমে এসেছে। সবাই নিজের ধর্ম পালন করতে পারছে। সৈন্যদলেরা মাঝে মাঝে আশপাশের দেশে গিয়ে যুদ্ধ করে আসছে। তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা খুশি। কৃষকদের এখন আর অত বেশি বেগার খাটতে হচ্ছে না। তাদের স্থান পূর্ণ করেছে বন্দীরা। তবে কেন তোমার মনে অশান্তি?

—এ অশান্তি সেই অশান্তি নয় তুতন্‌খ। এর কোনো ব্যাখ্যা নেই।

তুতন্‌খ একটু হতাশ একটু চিন্তিত হয়। স্ত্রীকে এভাবে ভেঙে পড়তে সে দেখেনি। বরং অনেক সময় অনখেসেন তার মনকে সতেজ করে তুলেছে। তাকে উৎসাহ দিয়েছে।

—তোমার কি মনে হয় কেউ ষড়যন্ত্র করছে?

—না। আমি মুতনেজেতের ওপর দৃষ্টি রেখেছি। সে এখন নিজের যন্ত্রণাতেই কাতর। এখনো তার সন্তান হয়নি। হোরেমহেব বোধহয় আকারে ইঙ্গিতে তাকে কিছু শোনায়। মাঝে মাঝে তাকে অমেনের বেদীর ওপর অশ্রুপাত করতে দেখা গিয়েছে।

—তবে?

—আমি জানি না।

—তোমার মন খারাপ থাকলে আমি যে নিরাশ হয়ে পড়ি। তুমি শুধু বল, কি করলে তুমি শান্তি পাবে, আমি জীবন দিয়ে তাই করব।

দুঃখের হাসি হেসে অনখেসেন বলে—সেকথা কি আজ নতুন করে বলে দিতে হবে তুতন্‌খ? আমি যে তোমার কী, সেকথা আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না।

পরদিন তুতন্‌খ সভায় গেলে. অনখেসেন ঠিক করে সে অমেনের মন্দিরে যাবে। সেখানে গিয়ে আকুল প্রার্থনা জানাবে তার মনের ভীতি দূর করে দিতে, যে কালো ছায়া মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাকে অপসারিত করে দিতে।

মন্দিরের বিশাল প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে সে দেখে দূরে প্রান্তের বেদীমূলে মাথা রেখে একাকিনী এক রমণী বসে রয়েছে। নিস্পন্দ তার দেহ। কে এ? কৌতূহলী অনখেসেন একটু একটু করে এগিয়ে যায়।

কাছে গিয়ে দেখে মুতনেজেমেত নির্মিলীত চক্ষে অঝোর ঝরে অশ্রুপাত করে চলেছে। বিশীর্ণ হয়েছে তার শরীর। তার রূপের ছটাও যেন মলিন। অনুকম্পা জাগে মনে। নিজের কথা ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃত হয় অনখেসেন। একবার ভাবে, নিঃশব্দে আবার ফিরে যাবে প্রাসাদে। এই দুঃখিনীকে নিজের উপস্থিতির কথা না জানানোই ভাল। কাঁদুক, মন হালকা করুক। পৃথিবীতে সবাই অল্প বেশি কাঁদতে চায়। পারে না। কারও কাঁদা আসে না। কেউ অবকাশ পায় না। আবার অনেক নির্বোধ আছে যারা নিজেরাই জানে না তারা কত দুঃখী। তাদের অনুভূতির বৃত্তি অকেজো। আবার অনেকে আছে যারা পরম সুখের দিনেও খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কল্পিত দুঃখ তৈরি করে কাঁদে।

কিন্তু কেনই বা ফিরবে প্রাসাদে? সেও তো মুতনেজেমেতের মতো আর এক দুঃখিনী। দেবতার কাছে সবাই সমান। সবার সমান অধিকার প্রার্থনা জানাবার।

সেই সময় মুতনেজেমেত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চক্ষু উন্মীলিত করতেই নিকটে দণ্ডায়মান সম্রাজ্ঞীকে দেখে সচকিত হয়ে ওঠে।

—সম্রাজ্ঞী।

সঙ্কুচিত অনখেসেন বলে—আমি জানতাম না তুমি এখানে আছ। চলে যাচ্ছি।

মুতনেজেমেত উঠে দাঁড়িয়ে বলে—না.না, আমার হয়ে গিয়েছে। আমিই যাচ্ছি।

—ও।

—আমি নিজে থেকে জীবনেও আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারতাম না। আজ দেবতাই আপনাকে

পাঠিয়েছে। তাই কথা বলতে পারলাম। এই কথা বলাটুকু যে কতখানি আমার পক্ষে সে কথা শুধু আমিই জানি।

—কেন?

—আমি অপরাধী। অন্যের প্ররোচনায় আপনার সর্বনাশ করতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার মন সহজেই কলুষিত হতে পেরেছিল। কারণ মন ছিল ঈর্ষাকাতর।

—আজ ওকথা থাক। এই মন্দিরে দেবতার সামনে ওকথা কেন?

—নিজেকে ভার মুক্ত করার সুযোগ পেয়েছি আজ। আমার কখনো নিজে থেকে আপনার সামনে দাঁড়াতে সাহস হ'ত না।

—যা অতীত তা অতীতের গর্ভেই থাক।

—না। আমি জানি কেন আজ আমি নিঃসন্তান। সেদিনের সেই পাপের জন্য। কে চায় সম্রাজ্ঞী হতে? আমি চাই শুধু একটি মাত্র সন্তান। আপনি বিশ্বাস করুন।

—বিশ্বাস করি।

—আজ আমার জীবনে একটুও সুখ নেই। স্বামী কোনোদিনই ভালবাসতেন না। আগে তবুও একটু অভিনয় করতেন। এখন আমার প্রতি একেবারে বিরূপ।

—থাক। ওসব বলে লাভ কি?

—না। লাভ নেই। জানি সে কথা। তবু বলতে পেরে ভাল লাগছে।

—আমি একটু প্রার্থনায় বসব ভাবছি। সেইজন্যেই এসেছিলাম।

—হ্যাঁ। আমার অন্যায় হয়েছে। আমার প্রতি নজর রাখা স্বাভাবিক। তাই বলে সম্রাজ্ঞী নিজে নজর রাখতে এসেছেন একথা আমি না ভাবলেও, এখানে যে সবাই প্রার্থনায় আসেন, পূজায় আসেন, সেটা বোঝা উচিত ছিল। আমি চলি।

মুতনেজেমেত ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় প্রধান ঘরের দিকে। যতক্ষণ না সে দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায় ততক্ষণ অনখেসেন তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর প্রার্থনায় বসে।

অনেকক্ষণ সে চেষ্টা করে মনকে একাগ্র করে তোলার। পারে না কিছুতে। মুতনেজেমেতের অস্তিত্ব তার কথাবার্তা মনকে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে।

সে প্রাসাদে ফিরে যায়।

রাতে দু'জনা শোবার পরে তুতন্‌খ একবার অনখেসেনের গায়ে হাতে দেয়।

সে বলে—না।

—কেন?

—রাত ভোর হলে নতুন সূর্য উঠবে। তখন হয়ত আমার মনের এই ভীতি কেটে যাবে? তখন আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করব।

—কিন্তু তিন চারদিন সূর্য তিন চারবার উঠল। তোমার মন ভাল হচ্ছে না।

—কালকে হবে। লক্ষ্মীটি আজ ঘুমোও। আমার মনে হয় মাঝে মাঝে বাবার পাগলামী আমার ওপর ভর করে।

—বাজে কথা।

—তুমি বললে কি হবে, এমন হয়। মার্তও এমন হয়ে গিয়েছিল।

—মার্তের কথা জানি না। তবে তুমি হবে না। এসো।

—না। অমন করো না।

—বেশ। কালকে নতুন সূর্য উঠুক আবার। অমেন কি বলেন দেখি।

—ঠাট্টা করতে নেই।

তুতন্‌খ পাশ ফিরে শোয়। অনখেসেন তার গায়ে একটা হাত রাখে। একসময় দু'জনা ঘুমিয়ে পড়ে।

কয়েকদিন পরে অনখেসেনের মনের সেই কালো ছায়া মনে হলো কেটে যাচ্ছে। আরও দু'দিন পরে সে বেশ স্বাভাবিক হয়। এই ক'দিন তুতন্‌খকে বড় কষ্ট দিয়েছে সে স্বার্থপরের মতো। কতবার সে কাছে আসতে চেয়েছে তার, অথচ অনখেসেন নির্লিপ্ত থেকেছে। রাতে তুতন্‌খ কাছে গড়িয়ে এলে সে দু'হাত দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে। একটু পরেই তুতন্‌খ পাশ ফিরে শুয়েছে। সারা রাত একইভাবে পড়ে থেকেছে এদিকে আর একবারও ফেরেনি।

আজ রাতে তুতন্‌খ-এর সব কষ্ট ভুলিয়ে দিতে হবে। তাই সন্ধ্যা হতেই সে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে কখন রাত হবে। তারপর সতিাই রাত হয়। সে নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলে। রোজই সে সাজে, কিন্তু আজকের রাতের সজ্জা আরও সুন্দর।

কিন্তু তুতন্‌খ তার দিকে ফিরেও চাইল না। সে বুঝতে পারে, রাগ হয়েছে ফ্যারওর। এই রাগ ভাঙাতে হবে। খুব বেশি দেরি হবে না। অন্য কিছুতে না হলে একটু চোখের জল ফেললেই—ব্যস। তার কষ্ট তুতন্‌খ একটুও সহ্য করতে পারে না। অশ্রুজল পড়তে দেখলে মনে হয় তুতন্‌খ-এর হৃদ্‌পিণ্ড চুঁইয়ে রক্ত ঝরছে বুঝি। ঠিক তেমন ছট্‌ফট্‌ করে।

ঘরের কোনো একটি আলো জ্বলছিল। সেটিকে আরও কাছে নিয়ে আসে অনখেসেন। উস্‌কে দেয় আলোটি। তারপর তুতন্‌খ-এর পাশে বসে তার গায়ে হাত রেখে বলে—ফ্যারও।

তুতন্‌খ তার দিকে চেয়ে দেখে।

—আমাকে দেখো তো কেমন লাগছে?

—ভাল।

—ব্যস্‌? আর কিছু বলবে না?

—কি বলব?

—আমাকে দেখে আদর করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

তুতন্‌খ নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বলে—হ্যাঁ।

—তাহলে কর আদর। চুপ করে শুয়ে আছ কেন?

তুতন্‌খ বলে—কাল করব।

এই প্রথম অনখেসেন নিজেকে অপমানিত বোধ করে। শেষে তুতন্‌খ তাকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করল। তার রূপের তার ভালবাসার কোনো মূল্য দিল না। সে তো ইচ্ছে করে তাকে দূরে সরিয়ে দেয়নি। তার মনটা সত্যিই খুব খারাপ ছিল—মনে শঙ্কা ছিল। তাই বলে তুতন্‌খ এভাবে প্রতিশোধ নেবে? ঠিক আছে সে তবু কাঁদবে না। দেখা যাক ক'দিন এভাবে থাকতে পারে। একটু কাঁদলেই তো এখনি গলে যাবে। দরকার নেই কাঁদার।

সে শুয়ে পড়ে ওইভাবেই। শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করে। তার প্রত্যাশা ছিল রাত আর একটু গভীর হলে তুতন্‌খ-এর একটা হাত এসে পড়বে তার গায়ের ওপর। এলো না। এইভাবেই ভোর হয়ে গেল।

সকালে উঠে সে প্রথম অনুভব করল তুতন্‌খ তাকে ইচ্ছে করে জব্দ করেনি। তার একটা কিছু হয়েছে। সেই আগের মতো কোনো কারণে মন খারাপ।

ফ্যারওর পাশে গিয়ে অনখেসেন বলে—অত সুন্দর করে সাজলাম, তুমি মুখ ঘুরিয়ে রাখলে কেন?

—আমার কিছু ভাল লাগছে না।

—কি হয়েছে?

—জানি না।

—শরীর খারাপ?

—তেমন তো কিছু বুঝছি না।

—আজ কি বাইরে যাবে না?

—যেতে হবে। দরকার কাজ আছে।

অনখেসেন লক্ষ্য করল গত রাতের মতোই নিষ্প্রাণ সে। অথচ সব সময় প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর থাকে সে।

—আজ তুমি ফিরে এলে তোমাকে নিয়ে অমেনের পূজা দিতে যাব। দেখবে সব ভাল হয়ে যাবে। আমি সেদিন কিছুই করিনি, শুধু কিছুক্ষণ ওখানে গিয়ে বসেছিলাম। তাতেই সব ঠিক হয়ে গিয়েছে।

—বেশ যাব।

তুতন্‌খ-এর এই পরিবর্তনে মনে মনে শঙ্কা জাগে তার। অথচ চিকিৎসক ডাকবে কিনা বুঝতে পারে না। মন খারাপ হলে অমেন দেবতা নিশ্চয় ভাল করে দেবেন। আজকের দিনটা দেখে নেওয়া ভাল। কালও যদি এমন থাকে তাহলে চিকিৎসককে বললেই চলবে।

সেদিন সন্ধ্যায় তারা গেল অমেনের মন্দিরে। সেখানে তুতন্‌খকে পাশে বসিয়ে অনেকক্ষণ প্রার্থনা করল সে। ঘরের মধ্যে দেবতার সদাহাস্যময় মুখ। অনখেসেনের কেবলই মনে হতে লাগল, সেই মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে সেটি কঠোর হয়ে উঠছে। সেই চোখের স্নিগ্ধ চাহনি নিষ্ঠুরতায় ভরে উঠছে। পাশে তুতন্‌খ যেন অন্য জগতের মানুষ। পৃথিবীর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই বলে মনে হচ্ছে। অনখেসেন ডুকরে কেঁদে ওঠে।

—কেঁদো না। চল ফিরে যাই।

—তুমি এমন করছ কেন? তোমারও কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে?

—না। আমি সবই বুঝছি। আমার কিছু ভাল লাগছে না। চল ফিরে যাই।

—চল।

ভোর হতে অনখেসেনের ঘুম ভাঙে। সে তুতন্‌খ-এর গায়ে হাত রাখতেই চমকে ওঠে। গা গরম।

সে তাড়াতাড়ি স্বামীর বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে তাকে ডাকে। তুতন্‌খ চোখ মেলে একটু হাসে। তার চোখ রক্তবর্ণ।

—তোমার কি হয়েছে তুতন্‌খ।

বিড়বিড় করে সে বলে—কিছু না।

—তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে।

তুতন্‌খ কিছু উত্তর না দিয়ে পাশ ফিরে শোয়।

—তুতন্‌খ।

—আমি ঘুমোবো।

—তোমার কোনো কষ্ট হচ্ছে?

—না। গায়ে ব্যথা।

অয়কে সংবাদ পাঠায় অনখেসেন। চিকিৎসকদের ডাকে। চারদিকে রটে যায় ফ্যারও অসুস্থ।

অয় আসে। তুতন্‌খ-এর মুখের দিকে চায়। মুখখানা রক্তবর্ণ দেখায়। অস্বাভাবিক লাগে তার কাছে। অসুখ মানুষ মাত্রেরই হয়। কিন্তু মুখের চেহারা এমন হয় না।

চিকিৎসকেরা ফ্যারওকে দেখে গম্ভীর হয়ে যায়। অনখেসেনের প্রশ্নের উত্তরে বলে—খুব গুরুতর অসুখ।

—সারবে তো?

—আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

—এই অসুখ ভাল হয়ে যায় তো?

চিকিৎসকরা নীরব থাকে। তাই দেখে অয় তাদের একজনকে একান্তে ডেকে নিয়ে যায়। দু'জনার

মধ্যে অল্প একটু কথা হয়। অয় সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে যায়। হোরেমহেব একদল সৈন্য নিয়ে সমুদ্রের দিকে গিয়েছে। আজকালের মধ্যেই ফিরে আসার কথা। অয় সেদিকে লোক পাঠায়। তাকে নির্দেশ দেয় হোরেমহেবকে বলতে যে ফ্যারওর ইচ্ছা আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করে বেশি পরিমাণে রৌপ্য যেন নিয়ে আসে হোরেমহেব।

অয় দিনের শেষে অসংখ্যবার এসে ফ্যারওর খোঁজ নিয়ে যাচ্ছে। বারবার অনখেসেনের পাশে দাঁড়িয়ে বলে—একটুও চিন্তা করো না। রোগটা একটু কঠিন বটে, তবে ভাল হয়ে যাবে। ফ্যারও বলে কথা।

—কিন্তু ওর মুখ চোখ দেখে আমার ভাল লাগছে না। ও বাঁচবে তো?

—কি যে বল তুমি। এইসব অসুখ তো আগে কখনো দেখোনি, তাই এমন মনে হচ্ছে। আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক।

—কিন্তু ও যে বড় কষ্ট পাচ্ছে। ওই দেখুন কেমন করছে।

—অসুখ হলে তো সবাই অমন করে। আর এই অসুখ তো সাধারণ অসুখ নয়। ভুলে যেও না এটা ফ্যারওর অসুখ। সাধারণ মানুষের মতো নগণ্য কিছু ফ্যারওর হয় না।

—ওই দেখুন কেমন করে উঠল। মনে হচ্ছে খুব কষ্ট পাচ্ছে, অথচ বলতে পারছে না।

—চিকিৎসক তো দেখছে। একটু পরে আবার আসবে। ওকে সর্বক্ষণ এই ঘরে বসিয়ে রেখে তো লাভ নেই। নইলে আমি বসিয়ে রাখতে পারি। ও তাই চায়। আমি তোমার কথা ভেবে মাঝে মাঝে আসতে বলেছি। তোমার অসুবিধা হবে। তুমি ফ্যারওর পাশে বসলে তিনি আনন্দ পাবেন মনে।

—সেই হুঁশ কি আছে? ডাকলেও যে কথা বলছে না।

—বলবেন বলবেন। আস্তে আস্তে বলবেন।

অনখেসেন অয়-এর হাত জড়িয়ে ধরে বলে—আপনারা ওকে বাঁচিয়ে দিন। ও না বাঁচলে আমিও মরব। ওকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

—অবুঝ হয়ো না। ওভাবে নিজেকে কষ্ট দিতে নেই। ওই দেখ চিকিৎসক আসছে।

চিকিৎসক ফ্যারওকে দেখল। অয়-এর সঙ্গে কয়েক নিমেষের দৃষ্টি বিনিময় হলো। তারপর বাইরের দিকে পা বাড়াতেই সম্রাজ্ঞী সামনে এসে সজল চোখে বলে—কেমন দেখলেন?

এবার অয় বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে—আমি তো বললাম ধীরে ধীরে ফ্যারও সুস্থ হবেন। আমার কথা বিশ্বাস করছ না কেন?

অয়-এর কণ্ঠস্বর একটু অন্যরকমের শোনায়। বোধহয় দুর্ভাবনায় তারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। হতে পারে। তুতন্খকে কত স্নেহ করে। সেও নিশ্চয় ব্যথা পাচ্ছে।

ঠিক দু'দিন পরে ফ্যারও তুতন্খামেনের মৃত্যু হলো। অনখেসেন তার দেহের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে থাকে। কিন্তু কতক্ষণ আর কাঁদবে। ফ্যারও-এর দেহ নিয়ে যাবার জন্য চাপ দিতে থাকে সবাই। দেহটিকে মাসখানেক ধরে সংরক্ষণের উপযুক্ত করে তুলতে হবে।

কিন্তু অনখেসেন ছাড়তে চায় না। এই দেহের সঙ্গে সঙ্গে তার মর্যাদাও লুপ্ত হয়ে যাবে। মার্তের এমন হয়েছিল। সে স্বচক্ষে দেখেছে এই দৃশ্য। মার্ত পাগল হয়ে গিয়েছিল।

শেষে অয় এসে একটু কড়া স্বরে অনখেসেনকে বলে—বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। ছেড়ে দাও।

চমকে ওঠে অনখেসেন অয়-এর কণ্ঠস্বরে। এতটুকু সমবেদনা নয়, এতটুকু স্নেহ নেই সেই স্বরে। সে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অয়-এর দিকে।

অয়-এর চাহনি তখনো ভ্রূকুটিপূর্ণ। সে বলে—ছেড়ে দাও। অনেক হয়েছে। পৃথিবী থেমে থাকতে

পারে না।

অনখেসেনের চোখের জল মুহূর্তে শুকিয়ে যায়। তার উদ্বেলিত বিরহ বেদনা নিমেষে কোথায় মিলিয়ে যায়। সে বুঝতে পারে অয়-এর উদ্দেশ্য। ভেতরটা পাষাণ হয়ে ওঠে তার। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করে সহজে ছাড়বে না এই সিংহাসন।

যতদিন না তুতন্‌খ-এর দেহ সমাধিস্থ হচ্ছে ততদিন নতুন ফ্যারও নির্বাচিত হতে পারে না। ইতিমধ্যে হোরেমহেব ফিরে এসেছে। এই অভাবিত সুযোগ দেখে সেও পুলকিত। অয় যাকে তার কাছে প্রেরণ করেছিল সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ফ্যারওর মৃত্যু আসন্ন জেনে সে হোরেমহেবকে তুষ্ট করার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ সেনাবাহিনী তার অধীনে। তাছাড়া সে অল্পবয়সী। অয় আর কতদিনই বা বাঁচবে।

তবু অয়কে অতিক্রম করে হোরেমহেব রাজ্য শাসনের ভার পেল না! কারণ সে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হলেও, অয় ছিল ফ্যারওদের তিনপুরুষের সহযোগী। তার অভিজ্ঞতা, তার পরিচিতি অনেক বেশি। হোরেমহেবের পক্ষে তাকে ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না।

অনখেসেন অয়কে বলে,—কতদিন আমি প্রাসাদে থাকতে পারব?

—দুই মাস।

—তারপরে।

—অন্যত্র।

—ফ্যারও কে হবেন?

—আমি।

—আপনি আর কতদিন? আপনার পুত্রও নেই। তার চেয়ে আমরা দু'জনা থাকতে পারি না?

—কি করে? তুমি আমাকে বিয়ে করবে? কিন্তু এখন তা হয় না।

—আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র নেই কোনো?

—না।

—কি করে থাকবে? খুন করিয়ে বালি চাপা দিয়ে দিলে কি আর থাকে?

অয়-এর মুখ চোখ কেমন হয়ে যায়। সে বিকৃত কণ্ঠে বলে—কি বললে?

—পৃথিবীতে অতিরিক্ত বুদ্ধিমান হিসাবে কোনো জীবকে সৃষ্টি করেননি অমেন। সবার বুদ্ধিতেই ফাঁক থেকে যায়।

—তুমি জান?

—বহুদিন থেকে। কাউকে বলিনি।

—তোমার সঙ্গে মিলিতভাবে শাসন করতে পারি।

অনখেসেন মনে মনে জানে, বাধ্য হয়ে অয় স্বীকার করল। এতদিন তবু প্রাণ সংশয় ছিল না, এখন প্রথম সুযোগেই তাকে ভ্রাতুষ্পুত্রের পথে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইবে অয়।

অনখেসেনের এক একবার তুতন্‌খ-এর মৃতদেহ দেখতে ইচ্ছা হয় খুব। কিন্তু পারে না। নিয়ম নেই। তাছাড়া তার সেই প্রতিপত্তি তো আর নেই। এখন যেটুকু রয়েছে তা নিয়ম মাফিক। সেই গরিমা, সেই ঔজ্জ্বল্য অন্তর্হিত হয়েছে। সে হিসাব করে দেখে তুতন্‌খামেনকে সমাধিস্থ করতে আর পঞ্চাশ দিন বাকি। এরমধ্যে একটা কিছু চেষ্টা করতে হবে। সে জানে হিতিত্তির রাজা সুপ্পিলুলিমাসের অনেক পুত্র আছে। তার কাছে গোপনে দূত পাঠায় একটি পত্র দিয়ে। পত্রে লিখল—আমার স্বামী মিশরের ফ্যারও মৃত। হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে তাঁর। আমি শুনেছি আপনার কয়েকজন সাবালক পুত্র আছে। তাঁদের একজনকে অনুগ্রহ করে আমার কাছে সত্বর পাঠিয়ে দিন। আমি তাঁকে আমার পতিরূপে গ্রহণ করব এবং তিনিই হবেন মিশরের অধীশ্বর।

পত্র প্রেরণ করে অনখেসেন মনে মনে পরিকল্পনা করতে শুরু করে, কিভাবে সব কিছু গুটিয়ে

তুলবে। অয় বা হোরেমহেবকে কিছুতেই সে ফ্যারও হতে দেবে না। তুতন্‌খই যখন থাকল না তখন সবই সমান। তাই বলে এই সব বিশ্বাসঘাতকদের হাতে কখনোই মিশরকে ছেড়ে দেওয়া চলবে না। তার চেয়ে বিদেশী ভাল। তাছাড়া হিতিত্তির রাজকুমারকে বিয়ে করলে তার সম্রাজ্ঞীর পদটি অক্ষুণ্ণ থাকবে।

রাজা সুপ্পিলুলিমাস অনখেসেনের পত্র পেয়ে ভাবলেন যে প্রস্তাবটা আপাত দৃষ্টিতে লোভনীয় হলেও এর মধ্যে বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে। তাঁকে বিপদে ফেলার একটা ফাঁদও হতে পারে। তিনি মন্ত্রীদের নিয়ে শলাপরামর্শ করলেন। শেষে রাজকুমারকে না পাঠিয়ে একজন দূতকে পাঠালেন পত্র দিয়ে। তাতে লিখলেন—আপনার পত্র পেলাম। কিন্তু নিশ্চিত না হয়ে কোনো পুত্রকে আপনার ওখানে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। আমাকে জানান মৃত রাজার পুত্র কোথায়?

পত্রের আদান প্রদান হতে ইতিমধ্যে প্রায় এক মাস কেটে গেল। অনখেসেন এবারে অধৈর্য হয়ে ওঠে। সে বুঝতে পারে তার উদ্যম বোধহয় সফল হবে না। কারণ বড় বেশি সময় নষ্ট হয়ে গেল। তবু সে লেখে—আপনি আমাকে বিনা কারণে অবিশ্বাস করে অনেক ক্ষতি করে দিলেন। আপনাকে আমি প্রতারণা কেন করব? আমার স্বামী ছিলেন একেবারে তরুণ। তাঁর কোনো পুত্র সন্তান নেই। সেটাই সবচেয়ে দুঃখের। আজ যদি তাঁর কোনো সন্তান আমার গর্ভে থাক্‌ত তাহলে হয়ত এমন হ'ত না। অনুগ্রহ করে একজন পুত্রকে পাঠান। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এখনো চেষ্টা করতে পারি।

পত্রবাহক রাজধানী থেকে যাত্রার দশদিন পরে খবরটা হোরেমহেব জেনে ফেলল। এখানেও সেই বিশ্বাসঘাতকতা। অনখেসেনের অনুগত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ভাবল, সম্রাজ্ঞীর দিন শেষ হয়ে এসেছে। এখন তাঁর অনুগত থেকে লাভ নেই। অয় তো এক পা কবরে দিয়ে আছে। হোরেমহেবকে তুষ্ট করা উচিত। সে-ই সম্ভাব্য ফ্যারও।

হোরেমহেব সঙ্গে সঙ্গে একদল সশস্ত্র অশ্বারোহী পাঠায় নির্দেশ দিয়ে। তারপর অয়-এর সামনে এসে বলে—ফ্যারও হবার স্বপ্ন বোধহয় আপনার সফল হবে না। সম্রাজ্ঞী দারুণ চাল চেলেছেন।

—কি রকম?

হোরেমহেব তখন যা শুনেছে অয়কে বলে। সে অবাক হয়ে অয়-এর চোখে ভীতিমিশ্রিত চাহনি ফুটে উঠতে দেখে।

—আপনি ভয় পেলেন?

—ওকে আপনি চেনেন না হোরেমহেব। ও সাংঘাতিক।

—আপনিই ওকে সাংঘাতিক হবার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন বরাবর।

—যে জন্ম থেকে সাংঘাতিক, তার অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হয় না। তুতন্‌খ আর ও দু'জনাই প্রখর বুদ্ধির অধিকারী তুতন্‌খকে তো দেখলেন।

—তা দেখলাম বটে।

—অনখেসেনও সেই রকম।

—তাহলে এতদিন ওদের জন্য প্রাণ দিলেন কেন?

—ওদের নিমক খেয়েছি বলে। কিন্তু এখন আর সেই প্রশ্ন ওঠে না।

—কি করবেন? হিতিত্তির রাজকুমার এতক্ষণে থীবস্‌-এর পথে।

—আপনি গতিরোধ করুন।

—সে তো আর সসৈন্যে আসছে না নিশ্চয়। এলেও মুষ্ঠিমেয় কিছু লোক সঙ্গে আছে হয়ত। তাকে ঠেকাতে অভিযান চালানো যায় না।

—সে যেন না আসে এইটুকু দেখুন। আমি আর কতদিন ফ্যারও থাকব? আমি তো নিঃসন্তান। সুতরাং—

—জানি। লোক পাঠিয়েছি। রাজকুমার এদেশে পৌঁছোতে পারবে না। নিজের দেশেও ফিরে যাবে না। বলে দিয়েছি।

—বেশ করেছেন। এবারে তুতন্‌খকে সমাধিস্থ করে ফেলতে পারলে বাঁচি। একটা নতুন সমাধি মন্দির করতে তো অনেক সময় লাগবে। সবে শুরু হয়েছে।

হোরেমহেব একটু ইতস্তত করে বলে—একটা কথা বলব?

—বলুন।

—আপনার নিজেরটা তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ওখানে ব্যবস্থা করুন না। ইতিমধ্যে নিজের সৌধ শুরু করে দিন নতুন করে।

অয় সপ্রশংস দৃষ্টিতে হোরেমহেবের দিকে তাকায়।

—দারুণ পরামর্শ দিয়েছেন তো। হ্যাঁ তাই। পরশু দিনই হোক তাহলে?

—নিশ্চয়। যত দেরি, তত বিপদ।

তখন দ্বিপ্রহর। বাইরে ঝড় উঠেছে। চারদিকে বালুময়। অনখেসেন অস্থিরভাবে পদচারণা করছে ঘরের মধ্যে। হিতিত্তির রাজকুমার কত দূর এলো কিংবা আদৌ আসছে কিনা সে বুঝে উঠতে পারে না। সে শুনেছে অয় স্থির করেছে তার নিজের জন্য নির্মীয়মান অর্ধসমাপ্ত সমাধি সৌধে তুতন্‌খামেনের শবদেহ নিয়ে যাওয়া হবে পরশু। সেখানেই তাকে সমাধিস্থ করা হবে। এর মধ্যে হিতিত্তির রাজকুমার যদি পৌঁছে যেতেন, তাকে সবার সামনে স্বামীরূপে বরণ করে নিলে কেউ কিছু করতে পারত না। অয়ও নয়, হোরেমহেবও নয়। কিন্তু কিছুতেই খবর পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ তার নিজস্ব অশ্বারোহী দু'দিন আগে জানিয়েছে রাজকুমার রওনা হয়েছেন।

সেই সময় পরিচারিকা এসে বলে, হোরেমহেবের পত্নী মুতনেজেমেত তার দর্শনপ্রার্থিনী।

বিস্মিত হয় অনখেসেন। মুতনেজেমেতকে থীবস্‌-এ আসার পরে খুব কমই দেখেছে। কথা হয়েছে মাত্র একবার সেই মন্দিরে প্রার্থনার সময়।

সে এসে বলে—হোরেমহেব পাঠিয়েছেন।

—কেন স্ত্রীর মাধ্যমে বিবাহ প্রস্তাব?

—না।

—কিন্তু একজনকে তো বিবাহ করতেই হবে। নিজের স্ত্রী যখন নিঃসন্তান।

—আমি তোমার মায়ের ভগিনী। কোনদিন সেই সম্মান আমি পাইনি। জানি, এর জন্যে আমার দিদিই দায়ী। তবু তোমাদের প্রতি আমার বরাবরের বিদ্বেষ।

—তাই বলে বিষ প্রয়োগে ফ্যারওকে মেরে ফেলার চেষ্টাকে অনুমোদন করা যায় না। সে সম্বন্ধে আমার মনোভাবের কথা তোমাকে মন্দিরে জানিয়েছি।

—অতীতকে ভুলে যাও। বর্তমানে কি করবে বলে ভাবছ?

—কেন সম্রাজ্ঞী থাকব?

—হিত্তিত্তির রাজকুমার আর এসে পৌঁছোবেন না। তাঁর দেহ পড়ে রয়েছে ধূ ধূ প্রান্তরে।

অনখেসেন চিৎকার করে ওঠে—কে বলল?

—হোরেমহেব। সে একদল অশ্বারোহী পাঠিয়েছিল তাকে খতম করতে।

—কি করে জানলে?

—বলতে পারি না।

অনখেসেন এতক্ষণে হতাশায় ভেঙে পড়ে। সে বুঝতে পারে, এমন অবস্থাতেই তার বোন মার্তের

মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। কিন্তু সে স্থির থাকবে। বিচলিত হবে না। কিছুতেই না।

—কি বলতে এসেছিলে?

—হোরেমহেব জানতে চেয়েছে এবারে তোমার পরিকল্পনা কি?

অনখেসেন বুঝতে পারে নির্বোধ মুতনেজেমেত বুঝতে না পারলেও ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট।

সে বলে—আমি পরশু দিনই জানিয়ে দেব।

—হোরেমহেব সে কথা ভেবেছে। বলেছে, তাতে খুব দেরি হয়ে যাবে।

—বেশ আমি কালবে জানাব।

—কালকে আমি এই সময় আসব।

অনখেসেন একটু উচ্চকণ্ঠে বলে—আচ্ছা, তুমি কি সত্যিই এত নির্বোধ? কিছুই বুঝতে পার না?

মুতনেজেমেত বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে—নিঃসন্তান রমণীর অনেক কিছু বুঝেও বুঝতে নেই।

সে চলে যায়।

অনখেসেন ভাবে শেষ পর্যন্ত সম্রাজ্ঞীর মর্যাদা আঁকড়ে রাখতে মুতনেজেমেতকে সপত্নী রূপে মেনে নিতে হবে? এতই ললুপতা তার। তুতনখামেনকে কি এর মধ্যেই ভুলে গেল? না ভোলেনি। ভুলবেও না কখনো। ভুলতে পারে না। কিন্তু অয়-এর ওই আকস্মিক রূপান্তরের কথা ভাবা যায় না। তারপর থেকে একটা প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠেছে। নইলে কি হতো বলা যায় না।

সন্ধ্যা হতে শৈশবের সেই নিদারুণ ভীতি অনখেসেনকে পেয়ে বসে। তুতনখ-এর মৃত্যুর ক'দিন আগেও এমন হয়েছিল। আজ আবার সেই ফিসফিসানি, সেই ছায়ামূর্তির আনাগোনা। হয়তো বরাবরই তার মধ্যে তার পিতার উন্মত্ততার বীজ লুকিয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে বল প্রয়োগ করে বাইরে প্রকাশ পেতে চায়। সে জোর করে চেপে রাখে।

একবার তুতনখ-এর দেহখানা দেখতে বড় সাধ জাগে মনে। ওই দেহ তার কাছে অত্যন্ত প্রিয়, অত্যন্ত পরিচিত। ওটি লুপ্ত হবে না সে জানে। কিন্তু আগের সেই সুদর্শন মাধুর্য-মিশ্রিত রূপ বজায় থাকবে না। ওকে মনে হ'ত দেবশিশু। ওরা থাকে না এই বালুকাময় পৃথিবীতে। ওদের বোধহয় কষ্ট হয় থাকতে। এই পৃথিবী হোরেমহেব আর অয়দের বসবাসের জন্য। তুতনখামেনের বসবাসের জন্য নয়। তার উপযুক্ত স্থান অমেনের পাশে।

পরদিন প্রাসাদের কোথাও অনখেসেনকে খুঁজে পাওয়া যায় না। অনুসন্ধানের ধুম পড়ে যায়। অয় অতি ব্যস্ত হয়ে ওঠে। হোরেমহেবকে ডেকে পাঠায় প্রাসাদে। ব্যস্ত হোরেমহেব ছুটে আসে। সবাইকে ডেকে বলে, যে খুঁজে দিতে পারবে সম্রাজ্ঞীকে, তাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে।

তারপর একসময়ে অয়কে একান্তে পেয়ে হোরেমহেব জিজ্ঞাসা করে—কেউ খুঁজে পাবে না তো?

একটু ফিকে হেসে অয় বলে—পাগল।

একটি সদ্য কৈশোর-অতিক্রমা নারী পৃথিবীর নিষ্ঠুরতার কাছে নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও পরাজিত হলো। সে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। পড়ে রইল তার স্বামীর মৃতদেহ, স্ত্রীর স্মৃতিটুকু জড়িয়ে নিয়ে সুদূর ভবিষ্যতে সবটুকু কাহিনী উজাড় করে দেবার জন্য।

তখন ওয়ারেন হেস্টিংস

চিৎপুরের গোবিন্দরাম মিত্তিরের মন্দিরে ঘণ্টা বেজে ওঠে। সন্ধ্যারতি শুরু হলো। ওদিকে গঙ্গার ধারে ঝোপে-ঝাড়ে শেয়াল ডেকে ওঠে। বড়-বউ হেমলতা শাড়ির আঁচলে আড়াল করে প্রদীপ নিয়ে তুলসী মঞ্চের দিকে ত্রস্ত পদে এগিয়ে যায়। বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে আজ। অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। এ সময়ে নাকি অমন হয়। ছোট-বউ একথা বলেছে তাকে। ছোট হলে কি হবে—অভিজ্ঞতায় সে বড়। দেড় বছর বিয়ে হয়েও ছয় মাসের পুত্রের জননী। অথচ বড়-বউয়ের এবারে পাঁচ বছর পার হয়ে যাচ্ছিল আর একটু হলে। কিন্তু হলো না। তার আগেই শরীরের ভেতরে কী যেন একটা হয়ে গেল। একটা অরাজকতা। সব কিছুর ওলোট-পালট। তবু ভালো। এমন অরাজকতা যেন বছর বছর হয়। বাব্বাঃ, নইলে আগামী বৈশাখেই তার স্বামী টোপর পরার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। পাত্রীও ঠিক-ঠাক। ঘোসদের বাড়ি ছাড়িয়ে মারাঠা খালের পাশে গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ পাকা। শুধু আশীর্বাদটুকু বাকি ছিল। মেয়েও নাকি ডাগর-ডোগর চোদ্দ বছরের। রঙ হেমলতার মতো এমন কাঁচা সোনার না হলেও ময়লা বলা চলে না। তার স্বামী এ-সব ব্যাপারে মিথ্যা বলে না। সেইজন্যেই তো আপশোষ করে তাকে বলেছিল, তোমার মায়ের তো বারোটি সন্তান। তোমার এ দশা কেন? নইলে মিছি মিছি আর একটা বিয়ে করতে হতো না।

হেমলতা ভয়ে ভয়ে বলেছিল—মায়ের শুনছি একটু দেরিতে হয়েছিল।

—দেরিতে না আর কিছু। তোমার উনিশ বছর বয়স হলো খেয়াল আছে? ছোট-বউ কেমন সুন্দর ষোলো বছরে মা হয়ে গেল।

—আমি রোজ গঙ্গাস্নান করছি, রোজ মন্দিরে পুজো দিচ্ছি। ভগবান তবু মুখ তুলে চাইছেন না। তুমি আর একটা বছর অপেক্ষা কর।

স্বামী গোপাল মুখুজ্জে খুব গম্ভীর করে বলেছিল—তা হয় না হেম। মা অন্তর্জলিতে যাবার আগে কী বলেছিলেন তোমার মনে আছে?

হেমলতা চুপ করে থাকে। শাশুড়ি ঠাকুরাণীর শেষ কথা তার কানের ভেতরে বজ্রপাতের শব্দের মতো প্রবেশ করেছিল। শাশুড়ি বলেছিল মিনমিন করে—এ বছর শেষ হলে আর একটা বিয়ে করিস। আমার শেষ আদেশ এটা। এ বউ বাঁজা।

গঙ্গার দমকা হাওয়ায় প্রদীপ নিভে গেল। হেমলতা অস্থির হয়ে ওঠে। কোনো জিনিস ঠিক সময়ে না করলে, বিপত্তি ঘটে বেশি। দু'বার নিভলো প্রদীপ তার হাতে। শাশুড়ি বেঁচে থাকলে এতক্ষণে সারা সংসারে সাহেবদের ব্যাণ্ড বাজতে শুরু করত। ছোট-বউও নেই। জোড়াসাঁকোয় বাপের বাড়ি গিয়েছে।

তবে কথাটা সবার কানে উঠবেই। বাড়ির ঝি নীরু অমন ভালো মানুষের মতো ঘুরে বেড়ালে কি হবে, সব কথা সবার কাছে লাগাবে। অথচ যখন যাকে দলে টানবে, মনে হবে তার চেয়ে হিতৈষিণী বুঝি আর কেউ নেই। কিন্তু ওদের জন্যে হেমলতা অত ভাবে না। শত হলেও সে এখন বড়-বউ, দু'মাস আগেও তার চেয়ে ছোট-বউয়ের সম্মান এ বাড়িতে ছিল অনেক বেশি। আর তাকে সবাই ভাবত আশ্রিতা। উন্মুখ হয়েছিল তারা মারাঠা খালের ধারের বাড়ির সেই চোদ্দ বছরের মেয়েটির জন্য। কিন্তু দু'মাস পরে আজ তার সম্মান বাড়ির বউ হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। কারণ তার গর্ভধারিণীর মতো সেও দেরিতে গর্ভধারিণী হয়েছে। এতে নীরু আর সুখেনের মা ছাড়া সবাই সুখী। এমনকি ছোট-বউও তাকে জড়িয়ে ধরে ছলছল্ চোখে বলে উঠেছিল—তোমার মতো এমন রূপসী দিদি কি সবাই হতে পারে? মা গো, কী ভয়টাই হয়েছিল। কোথাকার এক কুৎসিত মেয়ে, আমার চেয়েও ছোট, তাকে দিদি বলতে হবে!

জা বলে কথা নয়, হেমলতা ভাবে, ছোট-বউ কমলা সত্যিই ভালো। তাই দু'বার প্রদীপ নিভে যাওয়াতে তার এমনিতে কোনো দুর্ভাবনা নেই। তার ভয় অন্যখানে। এই দু'বার প্রদীপ নেভায় তার বুকের ভেতরে অন্য কারণে কেঁপে ওঠে। কোনো অমঙ্গল হবে না তো! তুলসীমঞ্চে তৃতীয়বারের বার প্রদীপ রেখে সে তাই গলায় আঁচল জড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করে। মনে মনে কালীঘাটের মা কালীকে স্মরণ করে বলে—তোমাকে জোড়া পাঁঠা দেবো মা। বাঁচিয়ে রেখো একে। এ যেন ছেলে হয়।

তুলসীমঞ্চের এই জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন। তবু এইখানটা হেমলতা নিরাপদ মনে করে। কারণ এখানে এলে সে ভগবানের সান্নিধ্য অনুভব করে। তার মনে হয় নানান প্রেতাত্মা এখান থেকে কিছুটা দূরে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। সেই প্রেতাত্মাদের মধ্যে শাশুড়ি ঠাকরুণও একজন।

গোবিন্দ মিত্তিরের মন্দিরের আরতি আরও অনেকক্ষণ ধরে চলবে। কতদিন স্বামীকে বলেছে হেমলতা, আরতি দর্শনে নিয়ে যেতে। সময়ই হয় না তার। চাঁদপাল ঘাটে কবে কোন্ জাহাজ বিলেত থেকে আসছে সাহেবদের নিয়ে শুধু সেই চিন্তায় বিভোর। সেই সব জাহাজে আনকোরা সাহেব-মেম আসে বিলেত থেকে। তাদের ধরতে পারলেই পয়সা। কিভাবে যে পয়সা হয় হেমলতার মাথায় ঢোকে না। সে শুনেছে সাহেবরা ওদেশ থেকে একটা কড়িও সঙ্গে করে আনে না। অথচ এদেশে এসেই তারা এক একটা নবাব হয়ে যায়। আগে বিশ্বাস করত না হেমলতা। কিন্তু এই কয় বছরেই তো দেখলো সব। শ্বশুরের সাধারণ একটা ভিটে পাকা হলো। দোতালা উঠলো। বাড়ির ঝি চাকর কেউ ছিল না। এখন তিনজন। স্বামীকে দেখলে আজকাল মনে হয়, খুব আনন্দে আছে। রাত্রের দিকে মাঝে মাঝে গলা দিয়ে বেসুরো কালীকেত্তন বার হয়। নাটোরের রাণী ভবানীর পুষ্যিপুত্তুর নাকি ওই সব কেত্তন বাঁধেন। তাকে দেখেই হঠাৎ থেমে যায়। লজ্জা পেয়ে একদিন বলে উঠেছিল—বুঝলে বড়-বউ, তুমিই বাড়ির লক্ষ্মী।

—সেকি, মা যে বলতেন, ছোট-বউ?

—ধুৎ। ছোট-বউ লক্ষ্মী হলে মহীর হাতে টাকা আসত। সে তো কিছুই উপায় করতে পারে না। তুমিই আসল লক্ষ্মী, বুঝলে?

হেমলতার অভিমান হয়। সে বলতে চায়, আজ পেটে ছেলে এসেছে বলে লক্ষ্মী হয়ে গেলাম। দু'দিন আগে তো বিদায় করতে চেয়েছিলে। কিন্তু বাড়ির বউয়েরা কি সব কথা বলতে পারে? কোনো কথাই বলতে পারে না। তাই তো বুকের ভেতরটা কেমন করে। বিয়ের আগে তার এক সই ছিল। পাশের বাড়ির নলিনীর সঙ্গে 'বেলফুল' পাতিয়েছিল। তার সঙ্গে সব রকমের কথা হতো। মনটা হালকা হতো। এখানে সই নেই। একজন কেউ যদি সই থাকত বড় ভালো হতো।

ছোট-বউ কমলাকে স্বামী খাটো করার জন্য হেমলতার দুঃখ হয়। সে তাই বলে—তুমি কি মায়ের চেয়ে বেশি জান?

গোপাল মুখুজ্জে মুখখানা বোকা বোকা করে বলে—না, তা কেন? মা হচ্ছেন গিয়ে প্রাতঃস্মরণীয়া। তাঁর কথা কি মিথ্যে হতে পারে? তবে তুমি যে লক্ষ্মী একথা কারও তো অজানা ছিল না। তাই তিনি মুখ ফুটে আর বলেননি। ছোট-বউয়ের মনে ব্যথা লাগত তাহলে।

হেমলতা মনে মনে বলে, তা তো বটেই। মা আমাকে লক্ষ্মীই ভাবতেন বটে। প্রথম দিন বধূ বরণের সময় থেকেই হেমলতার কেন যেন মনে হতো শাশুড়ি তাকে হিংসে করে। হয়তো তার এই কাঁচা সোনার মতো রঙের জন্য। সে লক্ষ্য করেছে এ-বাড়ির দুই ছেলের কেউই ফর্সা নয়। তার বিধবা শাশুড়ির রঙও ছিল রীতিমতো শ্যামবর্ণ। অথচ তার এক পিস্‌শাশুড়ি এসেছিল বিয়ের সময় নটির হাট থেকে। তার রঙ ছিল খুবই ফর্সা। সেই পিস্‌শাশুড়ি যাবার সময় কানে কানে বলে গিয়েছিল—তোর কপালে অনেক ভোগান্তি আছে বউ। রঙটা একটু চাপা নিয়ে আসতে পারলি না হতভাগী?

হেমলতা বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। পিস্‌শাশুড়ি গলার সাতনরী হারটা মোচড়

দিয়ে বলে—বুঝলি না বোকা? এই বংশের রঙ তো তোর শাশুড়িই নষ্ট করেছে। আমার রঙ দেখছিস তো? তোর শ্বশুরের রঙের চেয়েও ধপ্‌ধপে ছিল। তোর বর আর দেওরের রঙ কালো হলো কেন? এবারে বুঝেছিস?

হেমলতা হেসে ঘাড় কাত করেছিল। ব্যাপারটা বুঝে ওর খুব মজা লেগেছিল।

—ওই হাসি টিকলে হয়? একটা যা পেয়েছিস শাশুড়ি। তোকে বরণ করে কী বলল শুনলি না?

হেমলতা শুনেছে। শুনে অতটা বুঝতে পারেনি। তবে শুনে বড় কষ্ট হয়েছিল। সবাই তার রূপ দেখে যখন তারিফ করছিল, তখন শাশুড়ি বলে উঠেছিল—থাক থাক অনেক হয়েছে। ওই রূপ ধুয়ে জল খেলে তো দিন চলবে না। রঙ থাকলেই রূপসী হয় না। চোখের রঙ যে কটা সেটা দেখছ না? কথায় বলে বেড়াল-চোখো। কটা-চোখো মেয়ে তো অলুক্ষণে।

মেয়েমহল প্রতিবাদ করতে গেলে শাশুড়ি চেঁচিয়ে উঠেছিল—চুপ কর সব। গায়ে গয়না আর মাথায় বেনারসীর ওড়না দেখলেই তোদের মাথা ঘুরে যায়। ছেলেদের আর দোষ কি?

সবাই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারণ হেমলতা জানে তার চোখ ঠিক কালো নয় বলেই তার চোখের প্রশংসা অনেক বেশি। কিন্তু এই চোখকে এ-পর্যন্ত কেউ কটা চোখ বলেনি।

স্বামী তার কাঁধে একদিন আলগোছে হাত রেখে বলেছিল—তোমার রঙ মেমসাহেবদের মতো।

—মোটেই না। মেমসাহেবরা লাল লাল দেখতে। মাথায় চুল কি সুন্দর। কারো সোনালী, কারো লাল। গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে বজরায় দেখেছি।

—সেই রঙের চেয়ে এই রঙই ভালো। সেই রঙ চোখে লাগে। কিন্তু মেয়েদের রঙের সঙ্গে বোধহয় টাকার সম্বন্ধ আছে।

—কেন!

—মেমসাহেবরা ফর্সা বলে সাহেবগুলো টাকা লোটে। লক্ষ্মী বোধহয় ফর্সা রঙ পছন্দ করেন। তাই তো লক্ষ্মীকে দেখতে ফর্সা—তোমার মতো ঠিক।

হেমলতা রীতিমতো রাঙা হয়ে ওঠে। স্বামী আজ বড্ড বেশি মুখ আলগা করছে দিনের বেলায়। গায়েও হাত দিল একবার। রাতের কথা আলাদা। তখন অন্ধকার থাকে। দরজার কপাট বন্ধ থাকে। সেজবাতিকে সে আড়াল করে দেয়। কিন্তু এই জ্বলজ্বলে দিনের বেলায় স্বামীর চোখে সেই ঢুলুঢুলু ভাব। ওই ভাবের অর্থ বোঝে সে। কাপড়-চোপড় সামলে এদিক ওদিক চেয়ে সে বলে—আজ তোমার হয়েছে কি গো? শরীর ভালো আছে তো?

—খুব বেশি ভালো আছে।

—তাই বুঝি কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাচ্ছে?

গোপাল মুখুজ্জে চট করে দু'পা পেছিয়ে গিয়ে বলে—তুমি বুঝতে পেরেছ? মেয়েমানুষ কী জাত রে বাবা।

—হয়েছে।

রাত-বেরাত বলে কথা নয়। আসলে হেমলতাকে গোপাল মুখুজ্জের এক একসময় দারুণ ভালো লেগে যায়। এই ভালো লাগার সঙ্গে অর্থাগমের ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক রয়েছে। গতকাল সে স্টিবার্ট নামে এক শাঁসালো সাহেবকে ধরেছে চাঁদপাল ঘাট থেকে। ফোর্টের বেশ উঁচুদরের লোক। গোরারা খুব সমীহ করে। সুতরাং এবারে সামনের ওই ফাঁকা জমিতে একটা মন্দির তুলতে হবে। গোবিন্দ মিত্তিরের মন্দিরের মতো না হলেও একটা ছোট গোছের তুলতে ক্ষতি কী। আর হেমলতাকে আরও কিছু গয়না আর ঢাকার শাড়ি।

সে তির্যক দৃষ্টিতে একবার হেমলতার দিকে চেয়ে দেখে।

—কী দেখছ?

—তোমাকে।

—যাঃ, তুমি ভাং খেয়েছ নাকি গো?

—এই সাত সকালে?

—তবে বারবার তোমার চাহনি রাতের বেলার মতো হয়ে যাচ্ছে কেন? জানো নীরু, সুখেনের মা পা টিপে টিপে সব দিকে ঘুরে বেড়ায়। যা কিছু দেখে আর শোনে পাশের ঘোষেদের বাড়ি গিয়ে বমি করে দিয়ে আসে।

গোপাল মুখুজ্জে হেসে বলে—কিছু না দেখলেও ওদের মুখ বন্ধ করতে পারবে না। একটু পানদোক্তা পাওয়ার জন্যে অনেক কথা ফাঁদতে হয় ওদের।

—তাই বলে তুমি ওইভাবে চেয়ে থাকবে?

—তুমি তো বললে মেমসাহেব দেখেছ গঙ্গার বজরায়। কাছ থেকে দেখেছ?

—না। কোথায় দেখব? শুনি নাকি বড়লোকদের বাড়িতে বাঈজী নাচ দেখতে আসে। নিয়ে চলো না একদিন, চিকের ফাঁক দিয়ে সাহেব মেমসাহেব দুই-ই দেখে নেব।

—ওসব ছাড়ো তো।

—কেন? নিমু মল্লিকের পেছনে পেছনে ঘুরে এত টাকা করছ, একটু সখ আহ্লাদ মেটাবে না?

গোপাল মুখুজ্জের মনের রঙ বউয়ের কথায় ধীরে ধীরে ফিকে হতে হতে মিলিয়ে যেতে থাকে। সে লক্ষ্য করেছে, তার খাবো খাবো ভাব দেখলেই হেমলতা একটার পর একটা বায়না ধরতে শুরু করে। অদ্ভুত জাত এরা। অনেক সময় সফল হয়। কিন্তু সব সময় যে হয় না, এটা বুঝতে পারে না। বুদ্ধি কম তো? সেইজন্যেই কাছা নেই ওদের। এ ধরনের বায়নায় যে উল্টো ফল হয় বুঝতে পারে না। ওরা কি মেমসাহেব যে সাহেবরা যেমন তোয়াজে রাখে, তেমনি রাখতে হবে? মেমসাহেব হবার সুখও আছে, দুঃখও আছে। দু' চোখ ভরে দেখছে তো প্রতিদিন। জর্জ ফ্রান্সিস গ্রাণ্ডের ফরাসী বউকে নিয়ে কী কেলেঙ্কারি। সাহেবমহলেই ঢি ঢি পড়ে গিয়েছে।

—কিগো নিয়ে যাবে নিমু মল্লিকের বাড়ি?

—নিমু মল্লিকের বাড়ি বাঈজী-নাচ হয় নাকি?

—টাকার কুমির আর নাচ হয় না?

নাঃ বড় আস্কারা দেওয়া হচ্ছে। পেটে ছেলে এসেছে বলে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে বড়-বউ। তবু আজ ওরই জিৎ হবে মনে হচ্ছে। কারণ ওর গায়ের মসলিন অদ্ভুত একটা রঙ ফুটিয়ে তুলেছে সর্বাঙ্গের। এই জ্ঞান সত্যি কথা বলতে কি, গোপাল মুখুজ্জ্যের ছিল না এ পর্যন্ত। কিন্তু সেদিন র‍্যাণ্ডেল সাহেব তার মাথায় ঢুকিয়েছে।

র‍্যাণ্ডেল সাহেব একজন ডাক্তার। এদিকে খুব উঁচুদরের অভিনেতা। অত্যন্ত সুপুরুষ—কণ্ঠস্বর ভারী অথচ খুবই মিষ্টি। মেমসাহেবদের মহলে দারুণ খাতির। সেই র‍্যাণ্ডেল সাহেব এক মেমসাহেবকে দেখিয়ে বলে—দেখছ মুখার্জি, মেমসাহেব ইচ্ছে করে তার নীচের পোশাক ছোট করে পরেছে। যাতে ওর গায়ের দিকে চোখ যায়।

গোপাল তার তিরিশ বছরের জীবনে এমন অদ্ভুত কথা কখনো শোনেনি। মেমসাহেবরা তাদের পাতলা গাউনের নীচে সব সময় অন্তর্বাস পরে থাকে। কিন্তু ইচ্ছে করে ছোট অন্তর্বাস পরে পুরুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার মতলবের কথা সে ভাবতে পারে না। তাহলে তাদের এবং সব বাঙালী পরিবারের মেয়েদের বেশ্যা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তারা ভারী ভারী গয়না পরলেও গায়ে যখন মসলিন জড়িয়ে থাকে, তখন এককথায় উলঙ্গই বলা যায়। কারণ অন্তর্বাসের বালাই নেই। অথচ এমন কথা কখনো মনে হয়নি। অবশ্য এ ধরনের বেশে স্বামী ছাড়া আর কারও সামনে বার হবার প্রথা নেই তাদের সমাজে। তবে মেয়ে-মহলে এতে কোনো আব্রু থাকে না।

হেমলতা স্বামীর কাছ থেকে জবাব না পেয়ে আবার বলে—তুমি কী ভাবছ?

—ভাবছি, এই ঢাকাই শাড়িটা পরেছ কেন আজ?

—ঠাকুরপো বাড়ি নেই। মানিকও নেই। তাই পরে ফেললাম। অনেক দিনের সখ।

—আমি তো বাড়িতে আছি।

—ওমা, তুমি থাকলে কি হলো?

—কী হলো, বুঝতে পারছ না? তোমাকে যে আস্ত দেখা যাচ্ছে।

—যাঃ।

হেমলতা ছুটে বার হয়ে যায়। সে নিশ্চয় শাড়িটা পালটে একখানা বেগমপুরী কিংবা ওই ধরনের কিছু গায়ে জড়িয়ে আসবে। র‍্যাণ্ডেল সাহেব তাকে যেমন জ্ঞান দিয়েছে, সেও তেমনি তার বউয়ের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে। গোপাল মুখুজ্জে বুঝতে পারে, আসলে সরল মনে উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ালেও পাপ নেই। পাপ ওই সাহেবদের মনে। কিংবা ওরা অন্যভাবে মানুষ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ। ওয়ারেন হেস্টিংস তখন শাসনকর্তা। গঙ্গার ঘাটে আসে পালতোলা জাহাজ। স্টিম শিপ তখনো কল্পনার বাইরে। চাঁদপাল ঘাট তাই বন্দর-ঘাট। বন্দরে জাহাজ ঢোকাতে তখন ড্রেজার দিয়ে মাটি খুঁড়তে হয় না। হাঙর-মুখো নৌকো নিয়ে হৈচৈ করতে হয় না জাহাজকে ঠেলে লকগেটের ভেতর ঢোকাতে। আজ যেখানে খিদিরপুরের লকগেট তখন সেখানে ওয়াটসন্ সাহেবের উইণ্ডমিল বিশাল পাখা নিয়ে বড় বড় চাকি ঘুরিয়ে গম পেষাই করে দিচ্ছে। ওটিই বোধহয় এদেশে প্রথম আর শেষ উইণ্ডমিল। প্রথম দিনে তো এদেশী লোকেরা ওটিকে চলতে দেখে দৈত্য ভেবে ভয়ে পালাতে গিয়ে আহত হয়েছিল অনেকে। ওয়াটসন সাহেব ভূ-কৈলাশের রাজার জমি নিয়ে এবং আরও জমি সংগ্রহ করে প্রথম ডকের পত্তন করার জন্য নিজে উঠে পড়ে লাগেন। কিন্তু তাঁর সেই প্রচেষ্টা ফলবতী হয়নি। পরে অবশ্য একই জায়গায় ডক হয়।

চাঁদপাল ঘাট আধুনিক যুগের বন্দর না হলেও সেখানে চেঁচামেচি আর কর্মতৎপরতা নেহাৎ কম ছিল না। অনর্থক চেঁচামেচির একটা প্রতিযোগিতা এ যুগের কর্মীদের মধ্যেও রয়েছে। কিন্তু তাদের কাজের মধ্যে ফাঁকির অংশ হয়তো কিছুটা কম, কিংবা হয়তো তখনকার মতো নির্ভেজাল খাদ্যদ্রব্য এ যুগে আমাদের পেটে পড়ে না বলে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের মতো অতটা হাঁক-ডাক এখন আর করতে পারি না। আমাদের এই চেঁচামেচি দেখে সাহেবরা খুব মজা পেত—কারণ এটাই আমাদের প্রধান জাতীয় দুর্বলতা। ফাঁকিকে আড়াল করতেই আমাদের হাঁকডাক। তাই ওরা সেই সময় আমাদের এই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিত। কারণ তখনো গোটা দেশকে ঠিকভাবে কব্জার মধ্যে এনে ফেলতে পারেনি ওরা।

নিমু মল্লিক তখনকার দিনের ডাকসাইটে বেনিয়ন। সেই নিমু মল্লিককে আদর্শ করে তার পেছনে পেছনে ঘুরে আজ গোপাল মুখুজ্জের কোঠার পর কোঠা উঠছে। হেমলতার দেহের গয়নার ওজন দিনকে দিন ভারী হচ্ছে। এমনকি তার ছোট ভাই মহীর স্ত্রী কমলাও ছিটেফোঁটা পাচ্ছে। মায়ের শেষ ইচ্ছার তো অমর্যাদা করা যায় না। নইলে ভাইয়ের প্রতি নিবিড় স্নেহ থাকা সত্ত্বেও এক একসময় মনে হয় মহীকে বাড়ি থেকে দূরে করে দেয়। মায়ের আদরে ছোটবেলায় পড়াশোনা হলো না। নিজের নামটা কোনোরকমে লিখতে পারে। হিসেব-নিকেশ একটু যদি বুঝত তাহলে কত সুবিধা হতো। কিন্তু যখনই চেষ্টা করত, মা বলতেন—থাক থাক, অতটুকু কাঁচা মাথায় কি ওসব ছাইভস্ম ঢোকে? তুই শিখেছিস, ওই তো যথেষ্ট। ও তোর চন্নমিত্তু খেয়ে খেয়ে জীবন কাটিয়ে দেবে।

তা তাতে আপত্তি ছিল না গোপাল মুখুজ্জের। ছোট ভাই যদি চবণামৃত সেবনের মতো বিনয়ী হয় তাহলে তার চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে? বরং দুইজনই বাইরে না চরে বেড়িয়ে একজন ঘরের সব দেখাশোনা করলে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু তার তো উপায় নেই। ভাই নেশাভাং ধরেছেন।

যেরকম চোয়াড়ে চেহারা হয়েছে, মেয়েঘটিত ব্যাপার রয়েছে কিনা কে জানে। সে নাকি অ্যাটর্নি হিকি সাহেবের মেয়েমানুষ কোন্ এক কিরণবালার কথা শুনিয়ে তার বৌদিকে মোহিত করে দিয়েছে। অশ্লীল সব ব্যাপার। সেই কিরণ নামে মেয়েটা থাকত হিকি সাহেবের কাছে। স্ত্রী-বিয়োগের পর সাহেবের একজন মেয়েমানুষ বাড়িতে না থাকলে বড় নিঃসঙ্গ বোধ করে। সেই কিরণবালার গর্ভে একটি সন্তানও হলো। কিন্তু রঙ তার মিশমিশে কালো। এ কেমন হলো? হিকি সাহেব তো খাঁটি সাহেবের বাচ্চা। আর কিরণের রঙও মোটামুটি মাজাঘষা। তার গর্ভের সন্তানটি অমন হলো কেন? হিকি সাহেব একদিন আদালত থেকে হঠাৎ ভর-দুপুরে চলে আসে। এসে দেখে তার আদরের মেয়েমানুষ তারই শয্যায় তার চাকরের সঙ্গে পাশাপাশি গভীর নিদ্রামগ্ন। এত গভীর নিদ্রা অনেক ক্লান্তির সুফল। সঙ্গে সঙ্গে বিদায়—দু'জনকেই। কারণ শিশু সন্তানটির উৎসের সন্ধান পেয়ে গেল সাহেব।

সাহেব বাড়ির ওই সব নোংরা কথা নিজের বাড়িতে উগরে দিয়ে আবহাওয়াকে কলুষিত করার কোনো অর্থ হয় না। কারণ এতে সাহেব বাড়ির খবর শোনার জন্য লালায়িত হয়ে থাকবে হেমলতা। এর একটা মস্ত কু-ফল আছে।

অথচ মহীর শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে শ্যালক, রামরতন নামে যে ছেলেটি আসে, সেও সাহেব পাড়ায় ঘোরাফেরা করে। গোপালের সঙ্গে দেখা করতে আসে রাইটারের কাজ সংগ্রহ করে দেবার জন্য। কিন্তু সে তো কখনো এ ধরনের গল্প করে না। কত সংযত সে।

গোপাল মুখুজ্জে, ভাইয়ের ওপর দিন দিনই বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে ভাদ্র-বউয়ের অবস্থার কথা শুনে। হেমলতা বলে, কমলা দিন দিনই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। তার মুখ কেমন শুকনো থাকে সব সময়। অনেক সময় ডাকলে চমকে ওঠে। কে জানে কি হয়েছে তার। কোনো খারাপ ব্যারাম না হলেই হলো। গোরাদের দৌলতে সে-সব ব্যামোর তো শেষ নেই এই শহরে। গোবিন্দপুরে নতুন ফোর্ট হবার পর থেকে গঙ্গার ধারে সারি সারি চালাঘরের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। সরাইখানাও অনেক। সেখানে ঢালাও মদ। আর পেটে একবার মদ পড়লে মানুষ তো মুর্শিদাবাদের নবাব হয়ে যায়।

আসলে ছোট-বউয়ের মনের হদিশ হেমলতার জানা নেই। সে যে ধরনের মেয়ে, ছোট-বউ কমলা তেমন নয়। জোড়াসাঁকোয় তার বাপের বাড়িতে লেখাপড়ার কিছু চর্চা রয়েছে। ফলে সে ভালো রকম শিক্ষিত। শুধু সংস্কৃত নয়, ফারসীও সে বেশ ভালোই জানে। হয়তো এতটা সে শিখতে পারত না, যদি না তার একটা ব্যাকুলতা থাকত। এই ব্যাকুলতার জন্যে তাকে গুরুজনদের কাছে কত ধমক খেতে হয়েছে। ছোট-বউ কমলা আর একটা ভাষাও একটু একটু শিখেছে, যা এখনো সবার অজানা।

হেমলতা একটা ব্যাপার ঠিকই বুঝেছে। সেটি হলো মহীর অযোগ্যতা। মহী যদি উপযুক্ত হতো, সে যদি কর্মঠ হতো, তাহলে ছোট-বউ এতটা বিমর্ষ হতো না কখনোই। কিন্তু সে যে আবর্তের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, মহীর মতো অপদার্থের পক্ষে সেই আবর্ত থেকে তাকে উদ্ধার করা তো দূরের কথা, বরং বার বার ঠেলে দিচ্ছে সে তার স্ত্রীকে সেই আবর্তের মধ্যে। নইলে কমলার মন যতটা দৃঢ়, সে যুদ্ধ করতে করতে ভেতরে ভেতরে যতটা ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে—মহীর বাড়িয়ে দেওয়া হাত ধরে সে সহজেই উঠে আসতে পারত। অথচ মহী সম্পূর্ণ নির্বিকার। পনেরো-ষোলো বছরের নতুন বউ ঘরে আসার পর পরই তাকে ঘেঁটে ঘুঁটে দেখা হয়ে গিয়েছে। তাই আজ সে একুশ বছরেই সন্তানের জনক। কমলার মধ্যে নতুনত্ব আর অবশিষ্ট কিছু নেই। তার সেই নেশা ধরানো নতুনত্ব ফুরিয়ে গিয়েছে। এর চেয়ে চাঁদপাল ঘাটের পাশের সেই ফিরিঙ্গি মেয়েটি কত সুন্দর। ভাঙা ভাঙা বাংলায় মিস্ ডানডাস্ যখন সোহাগের কথা বলে, তখন মধু ঝরে। মাদ্রাজের কথা বলে, বিলেদের কথা বলে। চোখ কী নীল, ঠোঁট কী লাল। তার কাছে কমলা! ছোঃ!

মহী জানে না, তার তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য আর অবহেলায় কমলার বিন্দুমাত্র এসে যায় না। বরং সে স্বস্তিতে থাকে। মহী বুঝতেও পারে না, কমলা সব সময় অন্য এক জগতে বাস করে। আর সেই

জগতের মধ্যমণি হয়ে আর একজন পুরুষ রয়েছে, যাকে সে অনেক চেষ্টা করেও সরিয়ে দিতে পারেনি। এই পুরুষ তাকে কখনো স্পর্শ না করেও দিব্যি দখল করে নিয়েছে তার মনটি। তার জীবনে মহী নামে রাহুর আবির্ভাবের আগেই সেই পুরুষের ছায়াপাত ঘটে। তার পরে হয়তো সেই ছায়া অন্তর্হিত হতে পারত—কিন্তু হলো না। কারণ তুলনামূলক বিচারে মহী সেই অজ্ঞাত ব্যক্তিটির ধারে কাছেও আসতে পারে না।

বিবাহের পরে মহী সন্তান চায়নি—চেয়েছিল তার দেহ। তাই তাদের পুত্র অদ্বৈত ওরফে অদু ছয় মাসের শিশু হয়েও যেন কেমন কেমন। কমলা শিক্ষিত হলেও এখনো সে কিশোরী। তবু অদুকে দেখলে মাঝে মাঝে সে চমকে ওঠে। প্রথম সন্তান বলে ওকে ভালবাসা দূরে থাক, ও কাছে না থাকলেই যেন ভালো হয়। ও যখন কাঁদে, তখন মনে হয় পাশের ওই শিরীষ গাছের ওপর থেকে শকুনের ছানা কাঁদছে। ও যখন হাসে মনে হয় তার জোড়াসাঁকোর বাপের বাড়ির পেছনের ঝোপের মধ্যে শেয়ালে ঝগড়া করছে। কিন্তু নিজের গর্ভের সন্তান সম্পর্কে এই মনোভাব বাইরে প্রকাশ করা পাপ—একথা জানে কমলা। পৃথিবীর মানুষে যা সহ্য করতে পারে না তাই পাপ। কোনো ভালো জিনিস অসহ্য হলেও পাপ। সত্যি কথা বলা বা সত্যি মনোভাব অকপটে প্রকাশ করাও পাপ। তাই মাঝে মাঝে এই সংসারটা যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন বাপের বাড়ি পালিয়ে যায় সে। অথচ গঙ্গার শান্ত শীতল স্রোত শ্বশুরবাড়ির ঘরে বসে ঘোষেদের গোয়ালঘরের পাশের ফাঁকটুকু দিয়ে স্পষ্ট চোখে পড়ে। কিন্তু গঙ্গার জলকেও তখন মনে হয় টগ্‌বগ্ করে ফুটছে। অদুকে দেখলে মনে হয় মহীর দেহ থেকে বার হয়ে আসা কুৎসিত কোনো পদার্থ হাওয়া লেগে ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয়ে তার সামনে প্রাণ পেয়ে কিলবিল করে নড়তে শুরু করেছে। পালিয়ে যায় তখন বাপের বাড়িতে। বড় জা হেমলতা কিছু বলতে পারে না। মানুষটি নরম, তবে নরম হলেও অদুকে কখনো কাছে রাখতে চায়নি। কমলা ভেবেছিল বড় জায়ের ছেলেপিলে নেই বলে এই আপদ তার ঘাড়ে চাপাতে পারবে। কিন্তু কিছুতেই হলো না। বড় জায়ের কেন যেন দৃঢ় ধারণা ছিল তার ছেলেপিলে হবেই। তার ধারণাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো। সেই সঙ্গে নীরুর ওপর কমলার বিশ্বাসের গোড়ায় জোর ধাক্কা লাগল।

নীরু বিধবা হলে কী হবে, বয়স তার বত্রিশ কিংবা তেত্রিশ। রঙও প্রায় কমলার মতো। কমলার শাশুড়ির গাঁয়ের মেয়ে। সাঁতরাগাছিতে বিয়ে হয়েছিল। বছর কাটতে না কাটতেই বিধবা। তারপর এ-ঘাট ও-ঘাট অনেক ঘাট ঘুরে কী করে যেন গোপাল মহীর মায়ের মন গলিয়ে ফেললো। সেই থেকে নীরু এখানে। একবেলা বেড়াতে যাবার মতো কোনো আত্মীয়ও নেই তার। শ্বশুরবাড়িতে এক দেওর ছিল। বছর দশেক আগে সাপের কামড়ে সেও মরেছে। জেঠিমা বলে ডাকার মতো কাউকে রেখে যায়নি।

কমলার ওপর পক্ষপাতিত্ব নীরুর বেশি। কারণ হেমলতার পাশে দাঁড়িয়ে তার রঙের কাছে নিজেকে বড় ম্লান মনে হয় নীরুর। কিন্তু কমলার কথাবার্তা যেন যাত্রার ঢঙের। এমন সব কথা বলে, মাথায় ঢোকে না নীরুর। অনেক কথার অর্থও বোঝে না। তবু নীরু কমলার দুঃখ বোঝে। সে জানে মহী তাকে ভালবাসে না। তাই লুকিয়ে লুকিয়ে বশীকরণ কবচ এনে দিয়েছে নিজের পয়সা খরচা করে। সে জানে বাপের বাড়ি থেকে যেটুকু পায় কমলা সেই পয়সাও মহী অনেক সময় কেড়ে নিয়ে যায়। দু' একটা গয়নাও নিয়েছে। হেমলতা জানে এসব। কিন্তু কেউই ভয়ে গোপাল মুখুজ্জের কানে তুলতে পারে না। নীরু বশীকরণ কবচ এনে দিলে কমলা লোক দেখানো আগ্রহভরে সেটি গ্রহণ করে। পরমুহূর্তেই সবার অজ্ঞাতে সেটিকে ছুঁড়ে বাইরের আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেয়। নীরু পরে জানতে চাইলে বলে কোমরে পরেছে।

এদিকে বশীকরণ কবচ এনে দিলে কি হবে, নীরুর মন নিস্তরঙ্গ নয়। যত নষ্টের গোড়া ওই সুখেনের মা। দেখতে গোবেচারা, বয়সেরও গাছ-পাথর নেই। মাথাটা দেখতে কদম ফুল। মুখখানা

আতাফলের মতো। এদিকে নষ্টামী বুদ্ধি রয়েছে ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা। বাড়ির ভৃত্য মানিকের দালাল হয়েছে। মানিকের সুখ্যাতি করে করে কান ঝালাপালা করে দিলো। কত সময় ইচ্ছে হয় কোমরে আঁচল জড়িয়ে সোজা মানিকের সামনে দাঁড়িয়ে বলে—নিজের সুখ্যাতি করার সাধ হয় নিজের মুখেই কর। তার জন্যে ওই বুড়িটাকে ভাড়া করা কেন? কিন্তু সেকথা বলা যায় না। কারণ মানিক খুব ভদ্র। নীরুর দিকে চোখ তুলে তাকায় না কখনো। নেহাৎ বাধ্য না হলে কথাও বলে না বড় একটা। বাইরের কাজ করে সে। ঘরের কাজের লোকের সঙ্গে সম্পর্কই বা কতটুকু। অথচ কী রকম ভিজে বেড়াল। সুখেনের মাকে লাগিয়ে রেখেছে। আগে বুঝতে পারেনি। একদিন সন্ধ্যার সময় ঢেঁকি ঘরের পেছনে ফিসফিস আওয়াজ শুনে উঁকি দিয়ে দেখে দু'জনায় খুব শলাপরামর্শ হচ্ছে। তাকে দেখেই মানিকে ছুটে পালাল। ভাবখানা দেখে মনে হলো যেন সুখেনের মায়ের বয়স সত্তর নয়, সতেরো। সেই থেকে বুঝে গিয়েছে নীরু। সেই থেকে তার নিস্তরঙ্গ মনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। মানিক শক্ত-সামর্থ পুরুষ। বয়সে তার চেয়ে আট-নয় বছরের বড় হবে। মুখপুড়ি সুখেনের মা এমন ইঙ্গিতও দিয়েছে যে কত পুরুষ-মেয়ে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়ে তীর্থস্থানে গিয়ে দিব্যি গেরস্থালী করছে। তার ওপর মানিক আবার কীর্তন গায়। নীরুর মনের তরঙ্গ বড় বড় ঢেউ তোলে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় মানিক কীর্তন গায় যেমন তেমনি আবার গাঁজাও খায়। গাঁজা খাওয়া পুরুষের ওপর বিশ্বাস কী? তার হাত ধরে সংসার সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। তাই নীরু গোপাল মুখুজ্জে আর হেমলতার প্রেমালাপ ইত্যাদি এবং ঘোষেদের মেয়ে-জামাইয়ের ঘরের ভেতরে এ-বাড়ির জানালা দিয়ে উঁকি মেরে নিজের মনের বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গগুলোকে যতটা পারে শান্ত রাখার চেষ্টা করে।

চাঁদপাল ঘাটে জাহাজ ভিড়েছে সাত সকালে। মহী অদূরবর্তী একটা সরাইখানায় বসে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে কাণ্ডকারখানা। সে দেখতে পায় তার দাদাও এসে জুটেছে। এত ভোরবেলায় এখানে পৌঁছোতে হলে রাত থাকতে উঠতে হয়। নইলে এতটা পথ অতিক্রম করে ঠিক সময়ে এসে পৌঁছোনো মুখের কথা নয়। তবে দাদা তার সাহেবদের ফিটনের ধরনে একখানা ঘোড়ার গাড়ি করেছে। দাদার অবস্থা দিন দিনই বাড়-বাড়ন্ত হচ্ছে। অথচ একটি কানাকড়িও হাত ফসকে বার হয় না মা মারা যাবার পর থেকে। কড়ির অভাব হলে খুব ছোটবেলায় মায়ের ওপর প্রচণ্ড অভিমান হতো মহীর। একটু বড় হলে অভিমানের জায়গায় রাগ হতো। এখন মৃত মায়ের ওপর রাগতে পারে না। তাই দাদার ওপর একটা বিদ্বেষ ভাব দানা বেঁধে উঠছে। এখন তাই মাঝে মাঝে কমলা যখন পালকি করে বাপের বাড়ি রওনা হয় তখনই সে গিয়ে হাজির হয় হেমলতার কাছে। বলে, রাতে বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ। বাড়ি ফিরতে পারবে না। হেমলতা প্রথম প্রথম বিশ্বাস করত। ভাবত চিৎপুরের রাস্তার ওপর ডাকাতি খুনখারাপি আকছার হয় রাতের বেলায়। তাই মহীর আসতে সাহস হয় না। কিন্তু এখন হেমলতার চোখের দিকে তাকিয়েও বুঝতে পারা যায়, সে মহীর কথা বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করে না। কেমন অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এমনকি বাড়ির ঝি চাকরেরাও যেন বুঝতে পারে কমলা এ-বাড়ি ছাড়ার অর্থ মহীর অবাধ স্বাধীনতা। কিন্তু সেই স্বাধীনতা ভোগ করতে হলে যথেষ্ট অর্থ চাই। কাল সে জীবনে প্রথম কমলার কানপাশা না-বলে সরিয়ে নিয়ে এসেছে। তাতে ভেতরে ভেতরে মনটা কেমন হয়ে গিয়েছিল। জোর করে নিয়ে এলে এমন হতো না। মহী লক্ষ্য করে গোপাল মুখুজ্জে সাহেবদের সঙ্গে কথা বলছে কত বিনয়ের সঙ্গে। নতুন সাহেবগুলো জাহাজ থেকে নামলে মনে হয় জংলী বানর। আর এদেশে যারা রয়েছে কিছুকাল, তারা ঠিক পোষা বানর। তেল জল পেয়ে একটু চকচকে। পোশাক-পরিচ্ছদের পরিপাটি কত বেশি। নতুন নামা সাহেবগুলোর মুখ দেখলে মনে হয় পেটে প্রচণ্ড ক্ষিদে নিয়ে ব্যাজার মুখে নেমেছে সব কিছুকে গ্রাস করার জন্যে। করেও তাই। তবে ওদের মুখের ওই স্বাস্থ্য-চঞ্চল ঔজ্জ্বল্য আর রক্তিমাভা কিছুদিনের মধ্যেই কেমন যেন পাংশুবর্ণ হয়ে যায়। ছোটবেলায় দাদার হাত ধরে সে আসত এখানে। তখন থেকে দেখতে দেখতে মহীর চোখ খুলে গিয়েছে। তখন দাদা ভাবত সেও বুঝি

ওই পথই ধরবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হলো না। মা চুপি চুপি বলত—ওর সঙ্গে জাহাজ-ঘাটে যাস না। বললেও যাবি না। তুই বাড়িতে থাকবি। অত কষ্ট করা তোর সয়?

কিন্তু জাহাজ ঘাটের একটা নেশা রয়েছে। তাই তো সে শেষ পর্যন্ত এখানে না এসে থাকতে পারে না। জাহাজ যখন জেটিতে এসে দাঁড়ায় তখন মনে হয় সারা পৃথিবীর মানুষ বুঝি এখানে এসে জুটেছে। ওখানে ইংরাজ আছে, ফরাসী আছে, ওলন্দাজ আছে, আরও কত দেশের মানুষ রয়েছে। অদ্ভুত লাগে। তার ওপর রয়েছে মিস ডানডাস্। তিনদিন হলো মিস ডানডাস্ এখানে আসছে না। সেও এক কাহিনী। কাল রাতে গ্রাণ্ট সাহেবের চাকর চাঁদ এসেছিল মদ খেতে। তার মুখেই সবাই শুনলো।

মিস ডানডাস্ থাকে আর এক সাহেবের বাড়িতে। সেই সাহেব আর তার মেম বড় অত্যাচার করত মিসকে। তাই সে ঠিক করলো হাইড সাহেবের কাছে যাবে প্রতিকারের জন্যে। হাইড সাহেব সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি। কোর্টে গিয়ে প্রতিকার চাওয়ার মতো অর্থ মিস ডানডাসের নেই। তাই ঠিক করলো চেম্বার ছেড়ে তিনি যখন সন্ধ্যার সময় পালকি করে লালদীঘির পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরবেন সেই সময় তাঁকে ধরবে। সে জানত হাইড সাহেব অত্যন্ত দয়ালু।

ঠিক যা ভাবলো তাই করলো সে। পথের মধ্যে পালকি থামিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করেছিল মিস ডানডাস্। অত রাতেও ভিড় জমে গেল। বিচারপতি হাইড সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন। শেষে ডানডাস্‌কে তাঁর বাড়িতে তখনি যেতে বলে পরিত্রাণ পান। সেই রাতে মিস ডানডাস্ বহুদিন পরে ভালো খাবার খেয়েছিল। শুধু তাই নয়, ভালো শয্যায় রাত কাটিয়েছিল। সবাই তার দিকে চেয়ে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে যখন চোখ নাচিয়েছিল সে গম্ভীর হয়ে বলেছিল—মহৎ লোকটার গায়ে কাদা ছুঁড়ো না।

মহী দেখতে পায় তার দাদা তিনজন নতুন বানরকে কব্জা করেছে। শেষ পর্যন্ত নিমু মল্লিক ওর কাছে হেরে না যায়। জাহাজ বজবজের ট্যাক ঘুরে গার্ডেনরীচের দিকে আসতেই কী করে যেন টের পেয়ে যায় দাদা। অথচ এর মধ্যে গার্ডেনরীচে থেমেও থাকতে পারে। কিন্তু দাদার কদাচিৎ ভুল হয়। সে যেন গুণে বলে দিতে পারে চাঁদপাল ঘাটে কখন এসে ভিড়বে তার সোনার খনি। সোনার খনি বৈকি। সেই খনির সোনা বউদির গায়ে উঠছে। কখনো দু' একটা কমলার গায়েও। আর ওদিকে বাড়ির শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। সেদিন হেমলতা বলছিল, পাশেই একটা নতুন বাড়ি তৈরি করার চিন্তায় মশগুল তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। অর্থাৎ মতলব হয়তো মায়ের পেটের ভাইটিকে আলগোছে এ-বাড়িতে ফেলে রেখে যাওয়া।

হঠাৎ মহী অদূরে একটি চেনা মুখের দেখা পায়। মুখটি তন্নতন্ন করে সরাইখানা আর ছোটখাটো ঝুপড়ি-ঝাঁপড়ির মধ্যে দৃষ্টি ফেলে কাকে যেন খুঁজছে। ওরও কোনো ফিরিঙ্গি মেয়ে জুটেছে নাকি? এদিকে তো সাধু সেজে থাকে। দেখে মনে হয় আকাশ আর চাঁদ ছাড়া তার দৃষ্টি নীচে নামে না। কী যেন নামটা। মহী ঠিক মনে করতে পারে না। যে জিনিসে তার আগ্রহ নেই সেই জিনিস সে কিছুতেই মনে রাখতে পারে না। এইজন্যেই লেখাপড়া হলো না, হিসেব শেখা হলো না। এই লোকটা সম্বন্ধে তার কোনো আগ্রহ নেই। তাই জেনেশুনেও এই মুহূর্তে নামটা কিছুতেই মনে আসছে না। পরে ঠিকই মনে হবে। অথচ লোকটি তার দূর সম্পর্কের শ্যালক। জোড়াসাঁকোয় যে দু'বার শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছে বিয়ের পরে সেই দু'বারই বাড়িতে ঢোকার আগে বিশাল নিম গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে তাকে। দেখেছে গাছের ডালের দিকে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে কী যেন আকাশ-পাতাল ভাবছে। তাই বলো, সেই জন্যেই নামটা 'নিমাই' বলে মনে হচ্ছিল বারবার। এবারে মনে পড়েছে। রামরতন চক্রবর্তী। লোকটা তাকে খুঁজছে নাকি? কমলা পাঠায়নি তো ওকে? মরেছে। মহী অআর একটু ভেতরে ঢুকে যায়। সামনে হঠাৎ দাদাকে দেখে চমকে যায় রামরতন। তারপর বিনীতভাবে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। সেদিকে সেয়ানা। বড়দের মন গলাতে হয় কিভাবে জানা আছে। ছেলেদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম আর মেয়েদের 'মা' বলে ডাক। নিজের বউয়ের বয়সী মেয়েদের ডাকলেও নাকি কাজ হয় অনেক সময়। দাদা রামরতনকে কি যেন জিজ্ঞাসা করে। দু'জনে হেসে হেসে খুব কথা হচ্ছে। রামরতন আঙুল তুলে

পুরোনো কোর্টের দিকে দেখিয়ে কি যেন বলছে। চাকরি পেয়ে গেল নাকি? সে শুনেছে তার বাড়িতে বেশ কয়েকবার গিয়েছে ও। কোনোবারই দেখা হয়নি। দাদার কাছে উমেদারী করতে গিয়েছে, সাহেবদের একটা রাইটারের চাকরি জুটিয়ে দেবার জন্যে। পেয়ে গেল নাকি? পেলে কমলা নিশ্চয় খুশি হবে। সুখেনের মা বলেছে, কমলার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেছে প্রত্যেকবার। সুখেনের মা সেদিকে যতবার গিয়েছে, তাকে কখনো পান, কখনো জল আনতে পাঠিয়েছে। এর অর্থ কি? স্বামীর কথা বাপের বাড়িতে জানিয়ে দেয়? কিন্তু তা হবে কেন? কমলা নিজেই তো বাপের বাড়ি যায় ঘন ঘন। আগে মা যেতে দিত না। এখন বউদির সংসারে অবাধ স্বাধীনতা। তবে? অত জল-পান খাওয়ার ঘটা কেন? সুখেনের মা কথাগুলো যেন কেমন করে বলে।

মহীর রাত-জাগা মাথা হঠাৎ গরম হয়ে ওঠে। ছুটে গিয়ে রামরতনকে মারধর করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু দাদা দাঁড়িয়ে রয়েছে মধ্যিখানে হিমালয় পর্বতের মতো।

সামনে দিয়ে কয়েকটা ফিটন ধুলো উড়িয়ে চলে যায় নতুন কোর্টের দিকে। এই সময় সাধারণত সাহেবরা হাওয়া খেতে বার হয় না। তারা বার হয় সন্ধেবেলা। সুতরাং কোর্টে বোধহয় জরুরি কোনো সভা-টভা আছে। সে শুনেছে হেস্টিংস-এর সঙ্গে গোরাদের বড়কর্তা জেনারেল ক্লেভারিং-এর ভালো রকম বিবাদ চলছে। সেই বিবাদকে নিয়ে কত সব মুখরোচক গল্প। গল্পগুলো ফোর্ট আর কোর্ট থেকে বার হয়ে প্রথমেই আসে চাঁদপাল ঘাটের আশেপাশে। তারপর সেটা ছড়িয়ে পড়ে সারা শহরে।

দাদা গোপাল মুখুজ্জে সাহেবদের সঙ্গে করে নিয়ে চলে যায়। রামরতন একা পড়ে যায়। মহী ধাঁ করে তার সামনে গিয়ে বলে—এখানে এসেছ কেন? আমাকে খুঁজতে?

—আপনি! আপনাকে খুজব কেন?

—তবে! তখন থেকে দেখছি সব জায়গায় উঁকি দিচ্ছ? তোমার কি এইসব জায়গায় বন্ধু-বান্ধব কেউ আছে?

রামরতন বুঝতে পারে না মহী নেশা করে আছে কিনা। এত সকালে নেশা করবে কোথায়? নিশ্চয় তার দাদার সঙ্গে এসেছে। কিন্তু এমন বিশ্রী দেখাচ্ছে কেন? পোশাকেও কোনো পারিপাট্য নেই। তার দাদার প্রতি স্নেহ কি এতই অন্ধ যে কিছুই চোখে পড়ে না। হতে পারে। নইলে অমন দাদার এমন ভাই হবে কেন? কমলার দিকে তাকানো যায় না। তার স্বামী যদি এমন না হতো বড় শান্তি পেত রামরতন। সে তো আর কিছুই করতে পারে না। কমলার যাতে কোথাও বিয়ে না হয় সেই প্রার্থনাই সে করেছিল বছর পাঁচেক ধরে। কিন্তু বিধাতা নির্মম। প্রার্থনায় কোনো কাজ হয় না। তার চেয়ে রামরতনের বাবার অবস্থা যদি ভালো হতো, তাহলে পৃথিবীতে আজ সে সবচেয়ে সুখী মানুষ হতে পারত। কমলাকেও অমন ভেতরে ভেতরে পুড়তে হতো না।

রামরতন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল মুহূর্তের জন্য। এটাই তার স্বভাব। এই স্বভাবের ভয়ে সব সময় তটস্থ থাকতে হচ্ছে তাকে কিছুদিন থেকে। বেনিয়ান দুর্গাচরণ মুখুজ্জেকে ধরে গোপাল মুখুজ্জে হিকি সাহেবের ওখানে তার চাকরি ঠিক করে দিয়েছে। তাই মহীর ওপর সে যতটা বিরক্ত গোপালের প্রতি ততটাই কৃতজ্ঞ।

—কী হলো! এখানেও আকাশ দেখছ। কথাটার উত্তর দেবে না?

—একটা কথা বলব?

—বলো।

—কমলার চেয়ে আমি বড়।

—তাই কি?

—এবারে আমার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা ভেবে নিন।

—ওঃ দাদা হতে চাও। তুমি কমলার কী রকম ভাই? পিসির দেওরের শালীর ননদের ছেলে?

—যে রকমই হই, ওদের বাড়িতে যাতায়াত তো আছে।

—হ্যাঁ। সেই সূত্রে আমাদের বাড়িতেও যাতায়াত ধরেছ।

—ঠিক। তবে আর যাব না। আমি চাকরি পেয়েছি, যাঁর কাছে কাজ পেয়েছি তাঁরই একজন চাকরকে খুঁজতে এখানে এসেছি। তিনি খোঁজ করতে পাঠিয়েছেন।

—খুব যে দাদা দাদা ভাব দেখাচ্ছ।

রামরতন কোনো কথা না বলে ধীরে ধীরে চলে যায়। মহী কেমন অসহায়ের মতো চেয়ে থাকে। সেই মুহূর্তে মনে হয় তার পৃথিবীতে আপন বলতে কেউ নেই। মানুষের ওপর রাগে অভিমানে তার চোখ ছলছল করে ওঠে।

রামরতন চক্রবর্তী অ্যাটর্নি হিকির 'রাইটারের' চাকরি পেয়েছে। সে চাঁদপাল ঘাটে খুঁজতে গিয়েছিল সাহেবের পেয়ারের ভৃত্য নবাবকে। নবাব নাকি সম্প্রতি লুকিয়ে চুরিয়ে রাত্রিটা বাইরে কাটায় মাঝে সাঝে। সাহেবের তাতে কোনো আপত্তি নেই। আপত্তি তার শুধু সময়ের জ্ঞান হারালে। একথা সাহেব রামরতনকেও প্রথম দিনই বলে দিয়েছিল। সে দেখেছে, সাহেবর দু' একজন ভৃত্য তার মদের বোতল থেকেও মাঝে মাঝে ভাগ বসায়। সাহেব বোঝে সবই। কিছু বলে না। সাহেব নিজেও বড় বেশি মদ্যপান করে। কিন্তু কাজের বেলায় এতটুকু গাফিলতি নেই। ভৃত্যদের বেলাতেও তাই চায় সাহেব, কিন্তু নবাব বাড়তে বাড়তে নাকি একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। তাই সাহেব রামরতনকেই পাঠিয়েছিল চাঁদপাল ঘাটে। রাইটারের চাকরি মানে শুধু লেখনী ধারণ নয়। এইসব কাজও সময়ে অসময়ে একটু-আধটু করতে হয়। নইলে সাহেবের সন্তুষ্টি আর বিশ্বাস অর্জন করা যায় না। বেনিয়ান দুর্গাচরণ মুখার্জি নিজে রামরতনকে এই ধরনের অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়েছে। সাহেবদের সঙ্গে বহুদিন ধরে মিশতে মিশতে, দুর্গাচরণ তাদের মনের ভেতরটা অবধি দেখতে পায়। সে বলে বিলাতী ইঁদুর ধরার জন্যে চাঁদপাল ঘাটে অনেকেই ফাঁদ পেতে রাখে। কিন্তু সেই ফাঁদে কী টোপ দিতে হবে সে খবর নিমু মল্লিকের পরে তারই সবচেয়ে ভালো জানা।

চাঁদপাল ঘাটে যে অদ্ভুত অবস্থায় তাকে পড়তে হয়েছিল সেই কথাই ভাবে রামরতন। মহী অমনভাবে ছুটে এলো কেন তার দিকে? কমলার সঙ্গে তার দেখা হওয়া একটু কঠিন। তার শ্বশুরবাড়িতে বরং রামরতন দেখা করতে পারত। কিন্তু বাপের বাড়িতে সহজে সম্ভব নয়। কারণ কমলার কাকীমা, আর তার পিসিমা রামরতনের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। পাঁচ বছর আগেও সে যখন খুশী কমলার সঙ্গে কথা বলতে পারত। কিন্তু তার পরেই কমলার এবং তার ভেতরে একটা পরিবর্তন নিশ্চয় লক্ষ্য করছিল বয়স্করা। তাই তাকে ও-বাড়িতে বেশি যেতে মানা করে দেওয়া হয়েছিল। তবে কমলাদের ভৃত্য আদ্যনাথ কেন যেন রামরতনকে পছন্দ করে ফেলেছিল। আদ্যনাথের মাথার চুল সব সাদা। গায়ের চামড়াও কুঁচকোতে শুরু করেছে। সে বলত—দিদিমণি তোমার ঘরে গেলে সুখী হতো। তোমার লেখাপড়ায় কত আগ্রহ। দিদিমণিরও তাই।

রামরতন আদ্যনাথকে কখনো প্রশ্ন করেনি, তার ঘরে কমলার আসায় বাধা কোথায়। কারণ প্রশ্নের উত্তর তার নিজের জানা। সে গরীব। তাছাড়া ঘর-জামাই হয়ে থাকাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তার মা বাবা আর ছোট ভাই রয়েছে। বাবার উপার্জন যৎসামান্য। আর একটি বড় কারণ হলো, কমলার বাবার সঙ্গে তার বাবার যৌবনে কোনো ব্যাপারে কলহ ছিল। সেই কলহ এখনো মেটেনি।

আদ্যনাথ বলেছিল—দিদিমণির এত সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে হতো না। ওর রকমসকম সবাই টের পেয়েছিল। তাছাড়া ওর ঘরে তোমার নাম লেখা বই পাওয়া গিয়েছিল।

রামরতন পরে বুঝেছে, বই-এর ওপর নাম লেখাটা উচিত হয়নি। কমলার বিয়ের পরেও সে আদ্যনাথের মাধ্যমে অনেক বই পাঠিয়েছে এবং এখনো পাঠায়। ওপরে বা ভেতরে কোনো নাম লেখা

থাকে না। ওদের বাড়িতে ঢোকার আগে একটা বড় নিমগাছের গোড়ায় প্রতি শনিবার বিকেলে সে গিয়ে দাঁড়ায়। সে সময় আদ্যনাথ বই পাল্টাপাল্টি করে নয়। তাকে মহীও একবার নিমগাছের নীচে আদ্যনাথের জন্য অপেক্ষা করতে দেখেছে। মহীকে দেখে চমকে উঠেছিল রামরতন, অথচ চমকে ওঠার কোনো কারণই ছিল না।

চাঁদপাল ঘাটেও সে মহীকে দেখে প্রথমে চমকে উঠেছিল। কিন্তু তারই মুখ-চোখের অবস্থা দেখে বুকের ভেতরে কেমন যেন মুচড়ে উঠছিল। মহীর অপমানজনক কথাতেও সে তাই একরকম চুপ করেই চলে এসেছিল। কমলার বিষাদমাখা মুখ দেখে সে তাকে তার শ্বশুরবাড়ির কারণ জানতে চেয়েছিল। বলেনি কমলা। শুধু বলেছিল—ইংরাজি শেখার ইচ্ছা হয়েছিল। শিখতে পারলাম না। দুঃখ হবে না?

রামরতন বলেছিল—কথাটা কেমন সাজানো-গোছানো মনে হচ্ছে।

—না। সাজানো হবে কেন? তবে তুমি এ-বাড়িতে আর এসো না। ইংরাজি শেখা এ-জীবনে আর হবে না আমার। কিন্তু তোমার এ-বাড়িতে যাতায়াত আছে, বাবা জানতে পারলে ভীষণ ক্ষতি হবে তোমার।

—আমি তো চাকরির জন্যে আসি।

ওরা, দু'জনেই জানে চাকরিই সব নয়। কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কাউকে কিছু বলে না। রামরতন জানে কমলার দুঃখ ইংরাজি না শিখতে পারার জন্য নয়। এখন সে বই সংগ্রহ করে নিজেই শিখতে পারে অনায়াসে। সেজন্যে মুখ অমন বিষাদমাখা হয় না। কী উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল কমলার বিয়ের আগে। কী হাসিখুশি। এই ক' বছরে কেমন যেন হয়ে গিয়েছে। ছেলেটি হবার পরে আরও যেন কেমন হয়ে গিয়েছে, দেখলে মনে হয়, অশোক বনে সীতা।

আদ্যনাথের হাতের বই-এর পাতার ফাঁকে কিছুদিন আগে সে এক টুকরো কাগজ পেয়েছিল। কমলার হাতের লেখা। অথচ চিঠি নয়। ফারসী ভাষায় কোনো শায়ার। সেই ফারসী ভাষার ভাবার্থ করলে দাঁড়ায়—ফুল ফুটে থাকলেও মাছি এসে তাতে বসে না। সে গিয়ে বসে আবর্জনায়। ফুলটি শুকিয়ে যায়।

এরপরে সংস্কৃতে এক ছত্র শ্লোক লেখা ছিল। তার অর্থ দাঁড়ায়—মরুভূমির কোনো দিকে যদি মরূদ্যান না থাকে, প্রখর সূর্যকিরণে পথিকের একমাত্র পরিণতি মৃত্যু।

তারপরেই ভাঙা ভাঙা ইংরাজি। তাতে লেখা আছে, পৃথিবী অত্যন্ত নোংরা। এর ওপর নির্ভর করা যায় না।

এই ইংরাজি লিখতে কমলাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে। কারণ ফারসী বা সংস্কৃত বাড়ির দু' একজন জানে। কিন্তু ইংরাজি এখনো কেউ জানে না। তাই ইংরাজির মাধ্যমেই সে প্রকৃত কথাটা বলতে চেয়েছে। তবুও কতটা সতর্ক সে। "পৃথিবী" বলতে সে সাত পাকে যার সঙ্গে আবদ্ধ তার সেই স্বামী "মহীকে" বোঝাতে চেয়েছে।

চাঁদপাল ঘাটে মহীকে দেখে কমলার সব ভাষায় লেখা কথাগুলো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল রামরতনের কাছে। তাই বুকের ভেতরে মোচড় দিয়ে উঠেছিল। মহী শুধু অশিক্ষিত নয়। তার স্বভাব ঘিনঘিনে। সে নেশা করে। কমলার মতো স্ত্রী থাকতেও সে চাঁদপাল ঘাটের ঝুপড়ির ভেতরে রাত কাটায়।

মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছে রামরতনের। মহীর দাদা গোপাল মুখুজ্জেকে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছোট ভাইয়ের কথা বলা উচিত ছিল। সে নিশ্চয় জানে না ছোট ভাই বাইরে রাত কাটাচ্ছে। জানলে অমন হাসিমুখে ঘুরে বেড়াতো না।

গোপাল মুখুজ্জে সোহাগের বশে হেমলতাকে রাতে গল্পটা শুনিয়েই দেয়। সেদিন হেমলতার

সামনে মুখ ফস্‌কে কথাটা বার হওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু না হয়েই বা উপায় কি। একজন কাউকে বলে একটু আমোদ করতে কার না সাধ হয়? কেচ্ছা জিনিসটা এমনি যে শুনেই গিলে ফেললে পেট ফাঁপবেই। যতক্ষণ না উগরে দেওয়া যাচ্ছে ততক্ষণে শান্তি নেই, আনন্দ নেই।

হেমলতা গোপাল মুখুজ্জের গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, সুখেনের মা বলে, তাকে দেখতে নাকি হয়েছে এগুাওলা তপ্‌সে মাছের মতো। তেমনি নিটোল। গোপাল হেসে উঠেছিল সুখেনের মায়ের রসবোধ দেখে। ঠিকই বলেছে। হেমলতা এখন বেশ ভারী ভারী হয়েছে। আর কয়েক মাস পরেই তাকে আঁতুড় ঘরে ঢুকতে হবে। সুতরাং এহেন স্ত্রী যখন আবদার করে সাহেবের কেচ্ছা শুনতে চায়, তখন না বলে থাকা যায় না।

কেচ্ছাটা হলো ফিলিপ ফ্রান্সিসকে নিয়ে। প্রচুর ক্ষমতা তার। গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস-এর কাউন্সিলের একজন সদস্য সে। এই ফ্রান্সিস সবাইকে বেশ অবজ্ঞা করেই চলত। কিন্তু ফেঁসে গেল সাংঘাতিকভাবে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে জর্জ ফ্রান্সিস গ্রাণ্ড নামে একজন জবরদস্ত কর্মচারী আছে। তার স্ত্রী হলো ফরাসী মহিলা। তাকে দেখে ফিলিপ ফ্রান্সিসের মাথা ঘুরে গেল। মহিলা রূপবতী সন্দেহ নেই, কিন্তু তার জন্য ওভাবে উন্মত্ত হয়ে ওঠা সত্যিই ফিলিপের পক্ষে শোভন হয়নি। কিন্তু কথায় আছে, যার সঙ্গে যার মজে মন। সে গ্রাণ্ডের অনুপস্থিতিতে রাতের বেলায় বিচিত্র সাজপোশাকে মই নিয়ে প্রাচীর টপকে গিয়ে নিয়মিত দয়িতার সঙ্গে মিলিত হতে লাগলো। ভৃত্যেরা একদিন দেখে ফেললো। তারপর একদিন চিনেও ফেললো, প্রেমিকপ্রবর ব্যক্তিটিকে। কিন্তু তাকে হাতেনাতে ধরার হিম্মত কোথায়? সুতরাং বাড়ির কর্তা ফ্রান্সিস গ্রাণ্ডের কানে তুললো কথাটা। শত হলেও গ্রাণ্ড সাহেবের নিমক খায় তারা। হুলুস্থুল পড়ে গেল সারা শহরে। এক ফ্রান্সিস আর এক ফ্রান্সিসের নামে মামলা করলো। জল গড়ালো অনেক দূর।

গোপাল মুখুজ্জে বেশ রসিয়ে রসিয়ে স্ত্রীকে সাহেবদের কথা বলে শেষে প্রশ্ন করলো—তোমার কাছেও তো কেউ অমন লুকিয়ে আসতে পারে, তোমার রূপ কি কম?

—মরণ।

—মরণ হবে কেন? সেই লোকটি যদি সবদিক দিয়ে আমার চেয়ে ভালো হয়? আমি তো নগণ্য।

—এসব কী বলছ তুমি? আমি না সতী। আমাদের মনে এসব চিন্তা উঁকি দেওয়াও পাপ, জান না তুমি?

—যদি উঁকি দেয়?

—কার দেয় জানি না। যদি কারও দেয়, সে নিশ্চয় সঙ্গে সঙ্গে গলায় কলসী বেঁধে গঙ্গায় ডুবে মরবে।

গোপাল মুখুজ্জে সেদিন স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে। তাই হেমলতা একটা কথা বলব বলব করেও স্বামীকে বলতে পারে না। কথাটা হলো দেওর মহী সম্বন্ধে। সে এখন প্রায়ই রাতে বাড়ি থাকে না, আজও নেই।

কমলার ঘর থেকে তার ছেলে অদ্বৈতর কান্না ভেসে আসে। ছেলেটা রোগাটে হয়েছে। সব সময় খুঁতখুঁত করে। মায়ের দুধ না পেলে যেমন হয়, কমলা স্বীকার না করলেও মনে হয় এখন জন্মের পর থেকে ঠিক মতো দুধ পায়নি সে। তোলা দুধ খেয়ে অমন হয়েছে বোধহয়।

অদ্বৈত চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে। কমলার জন্য কষ্ট হয় হেমলতার। স্বামী সোহাগিনীর গর্ব হেমলতার আর নেই। সেই গর্বে অন্যের স্ত্রীর মনের দুঃখ অনুভব না করার তুচ্ছতা হয়তো তার মধ্যেও দেখা দিত, যদি না তার পেটের সন্তানটি আসতে দেরি হতো। কমলার জন্য তাই সে অনেক সময় আড়ালে চোখের জলও ফেলে। কী উপায় যে হবে তার। শেষ পর্যন্ত কি জোড়াসাঁকোয় বাপের বাড়িতে ফিরে গিয়ে ভাই-বউদের অধীনে বিনি-পয়সায় ঝি হতে হবে বেশি বয়সে? মহীর মতিগতি কোনোদিন

ফিরবে বলে তো মনে হয় না।

অদ্বৈত আরও জোরে চেঁচাতে থাকে। কমলার দোষ হলো সে ছেলেকে বকতে পারে না, মারতে পারে না। কাউকেই সে কঠিনভাবে কিছু বলতে পারে না। যখন এই বাড়িতে হেমলতার চেয়ে তার সম্মান ছিল বেশি, তখনো হেমলতাকে জড়িয়ে ধরে প্রবোধ দিত সে। ছেলের কান্না দেখে এখন নিশ্চয় অসহায় হয়ে বসে রয়েছে কমলা।

স্বামীর হাত আলগোছে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসে হেমলতা। ধীরে ধীরে কপাট খুলে বাইরে আসে। চারদিক নিস্তব্ধ। ফুটফুটে চাঁদের আলোয় পাশের নারকেল গাছগুলোর পাতা চকচক করছে। গঙ্গার দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে তার গায়ে মুখে আছড়ে পড়ে। ভয় জিনিসটা হেমলতার কম নয়। বিশেষ করে শাশুড়ির প্রেতাত্মার ভয়ে সব সময় তার গা ছমছম করে। অনেক সময় বাড়িতে কেউ না থাকলে দিনের বেলাতেও সে নিরাপদ মনে করে না। তখন জোরে জোরে শাশুড়িকে শুনিয়ে বলে—আমার কিছু হলে আপনার বংশেরই ক্ষতি। আমার দিকে হাত বাড়াবেন না। ভালো হবে না।

আসলে পেটে ছেলে আসার পর থেকেই হেমলতার সাহস না কমে দিন দিন বেড়ে উঠেছে। তাই এত রাতে বাইরে বার হতেও তার গা কাঁপলো না। এখন তার মনে হয়, পেটের ওইটিকে বাঁচাবার জন্যে শাশুড়ি অন্য প্রেতাত্মার সঙ্গে লড়াই করতেও প্রস্তুত। এতদিনে শাশুড়িকে সে কলা দেখাতে পেরেছে।

কমলার দরজার সামনে এসে সে কড়া নাড়ে। অদ্বৈতর কান্না থেমে যায়।

—কমলা দরজা খোল। আমি দিদি।

কমলা দরজা খোলে। হেমলতা তার ঘরে ঢোকে। মহী যে নেই একথা অজানা নয়।

—আর পারি না দিদি।

—ওর কি হয়েছে?

—কিছুই হয়নি। রোজই রাতে জ্বালায়।

—পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে না তো?

—তাহলে এরকম চুপ করে যায় তোমায় দেখে?

—একটা কিছু অসুবিধে হয় নিশ্চয়। তুই ওকে কালমেঘ পাতার রস খাওয়া রোজ। আর সুখেনের মাকে নিয়ে শুলেই পারিস, ঠাকুরপো যেদিন না থাকে।

—এ-বাড়ির লজ্জা সেটা।

—আর তোর মুখপুড়ি? তোর লজ্জা না?

—না। ওকে তো আমি মানুষ করিনি। আমার জন্যে ও খারাপ হবে কেন?

—তুই ভোলাতে পারিস না বলে।

—তা বলতে পার। কি করে ভোলাতে হয় আমি জানি না।

—মেয়ে হয়ে জন্মেছিস কেন তবে?

—তা তো জানি না। ভগবানের সেই রকম ইচ্ছে ছিল বলে, তবে ছেলে করলে বড় ভালো হতো। ইচ্ছে মতো লেখাপড়া শিখতে পারতাম।

—ঠাকুরপো থাকে না বলে তোর কষ্ট হয় না?

—না। তবে থাকলে সুবিধে হয়।

—কিসের সুবিধে।

—যদি ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চিন্ত হতে পারি, ঘরে একজন ব্যাটাছেলে আছে।

—জেগে থাকলে?

—না। জেগে থাকলে কী বলবে, কী করবে ঠিক কি? জেগে থাকলে ঘরে ঢুকতে ঘেন্না হয়।

হেমলতা চেঁচিয়ে ওঠে—কমলা!

অদ্বৈত বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে চমকে উঠে ঠোঁট ফোলাতে থাকে। তবে হেমলতাকে তখনো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গলা দিয়ে স্বর বার করে না।

কমলা শান্ত স্বরে বলে—দিদি, তুমি তো আমার শাশুড়ি নও। তোমাকে সত্যি কথা বলতে ক্ষতি কি? মেয়ে হয়ে মেয়ের মন বুঝতে পার না—একথা বললেই বিশ্বাস করব? তুমি যতটা অভিনয় করতে পার, আমি তা পারি না।

—কী বললি?

—বলছি অভিনয় কি তুমি কর না? না করলে বড় ঠাকুরের মন তো শুধু রূপ দিয়ে জয় করোনি। তুমিও জান সব সময় তা হয় না। তবে স্বামী নামে জীবটি মোটামুটি একটা মানুষ হওয়া দরকার। নইলে অভিনয় মন থেকে আসবে কি করে?

—তোর কানে এসব বিষয়-মন্ত্র কে দেয় রে?

—এসব কি কানে দিতে হয়? এমনিতেই হয়।

কঠোর স্বরে হেমলতা বলে—না হয় না। তুই বলছিলি না, মেয়ে হয়ে মেয়ের মন বোঝা যায়, সে কথা তো মিথ্যে নয়, তোর মন আমি ভালোভাবেই বুঝি।

—কি বোঝো?

—তোর মরণ অনেক আগেই হয়েছে। ঠাকুরপোর সঙ্গে বিয়ের আগেই। চাকরির খোঁজে মানুষটি যখন আসত, আমি তখন বুঝেছি। তাকে দেখে নয়—তোকে দেখে। ঠাকুরপো দেবতা হলেও তোর মন জয় করতে পারত না। তুই কলঙ্কিনী। শুধু তোর সংসারের অমঙ্গল হবে আর আমার শ্বশুরকুলের দুর্নাম হবে ভয়ে আমি চুপ করে থাকি হতভাগী।

কমলার মুখ সেই চাঁদের আলোতে ছায়ামূর্তি মুখের মতো দেখায়। সে হেমলতার মতো সংস্কারাচ্ছন্ন নয় এবং তার মন বিদগ্ধ বলেই সংযত হয়ে বলে—তুমি বুদ্ধিমতী। তবে একটা কথা শুনে রাখো দিদি, সে আমাকে কোনোদিন স্পর্শও করেনি—করবেও না।

—তাতেই তুই খুশি। আর মনটা? মনটা বুঝি কিছুই নয়?

কমলা হাসে—মন আবার একটা জিনিস নাকি এই সংসারে? মন যদি একটা বিশেষ কিছু হয় তাহলে সেই মনকে ঘুরিয়েও দেওয়া যেতে পারে।

—মনকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়?

—যায় বৈকি?

—সতীর মনকে স্বামীর থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়?

—সতী কথাটা তো মন-গড়া।

—কী বলছিস কমলা! তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?

—ঠিকই বলছি দিদি। তোমাদের বড় বেশি সংস্কার। মন জিনিসটা বদ্ধ জলাশয় নয়।

হেমলতার মাথা ঘুরতে থাকে। এতদিনে সে উপলব্ধি করে এক সর্বনাশী বধূর বেশে মুখুজ্জে পরিবারে এসে প্রবেশ করেছে। সব ছারখার করবে সে। তারই প্রভাবে মহী আজ গৃহছাড়া—নইলে যত দোষই থাক তার এতটা অধঃপতন কখনো হতো না।

কমলা মনে মনে আপশোষ করে, এভাবে বলে ফেলায়। সে জানে তার মনের নাগাল পাওয়া বা কথার অর্থ বোঝার ক্ষমতা হেমলতার নেই। শুধু শুধু একটা চিরস্থায়ী মনোমালিন্যের সৃষ্টি। এই ভাঙা আর জীবনে জোড়া লাগবে না। হয়তো তার আজকের এই বিবেচনাহীন কথার জন্য অনেক দুর্গতি পোহাতে হবে, কিন্তু সে আর পারছিল না। ভেতরে ভেতরে কেমন যেন জ্বালা—হয়তো কোনোদিন

পাগল হয়ে যেত।

ফাল্গুন মাস। শীত বেশ কমে এসেছে। পথ চলতে কিছু কিছু পলাশ আর মাদার ফুল ফুটে থাকতে দেখা যায়। সাহেবরা লালদীঘি আর দুর্গের আশেপাশে আরও নামকরা গাছ লাগিয়েছে। তাদের কোনোটা নীল, কোনোটা হলুদ বা সাদা ফুলে ভরে থাকে। তবে গন্ধ নেই।

গোপাল মুখুজ্জে গায়ে তেল ঘষতে ঘষতে দ্রুতপদে গঙ্গার ঘাটে এসে দাঁড়ায়। কাজের তাড়া তার কিছু নেই আজ। তার চলনটাই এমন তড়বড়ে। যেন চাঁদপাল ঘাটে নতুন জাহাজ এসে ঠেকেছে—আর সে ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারেনি। নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে তার চোখে পড়ে বেশ কয়েকটি বজরা আসছে। তাদের সঙ্গে খানসামার নৌকো, বাবুর্চির নৌকো, ধোপাখানা—সবই আছে। সাহেব যাচ্ছে। সাহেব ছাড়া এত নবাবী আর কে করবে? হাতে টাকা থাকলে তারা নবাবী তো করেই, না থাকলেও আড়ম্বর দেখাতে ছাড়ে না। এটা ওদের স্বভাব। এইভাবে এদেশে ওরা সম্মানও আদায় করে। কিন্তু দু'চারজন বেশ ফাঁদে পড়ে যায়। জাঁক দেখাতে গিয়ে একরাশ টাকা ধার করে ফেলে চড়া সুদে বেনিয়ানদের কাছ থেকে। তারপর একসময় দেখা যায় আসলের চেয়ে সুদ বেশি হয়েছে। তখন আর শোধ করার উপায় থাকে না প্রায়। তবু অনেকে কৃচ্ছ্রসাধন করে শোধ দিয়ে দেয়। নিজের জাতের দুর্নাম তারা চায় না। অনেকে পালিয়ে যায় এ-দেশ ছেড়ে। আবার অনেকে শোধ করতে না পেরে থেকে যায় এদেশে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে। আচ্ছা জাত এরা।

দক্ষিণ দিক থেকে ভাসতে ভাসতে আসছে বজরা। নিশ্চয় চাঁদপাল ঘাট থেকে ছেড়েছে। কে যেতে পারে? নিশ্চয় এই নৌকোযাত্রা হঠাৎ ঠিক হয়েছে। নইলে গোপাল মুখুজ্জের অজান্তে এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেল ভাবাই যায় না। সাহেবের টাকারও দরকার পড়লো না?

স্নান করা হয় না গোপালের। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে যাবে নৌকো পূর্বদিকের পাড় ঘেঁষে চলেছে। সেটাই স্বাভাবিক। চাঁদপাল ঘাট ছেড়ে কেনই বা গঙ্গা পার হয়ে পশ্চিম দিকের কিনারা ঘেঁষে যাবে? সেটা যাবে চন্দননগরের পর থেকে। সাধারণতঃ তাই যায়। কারণ ওইখানে যাত্রীদের নৌকো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নেয়। মাঝি মাল্লারা খাওয়া-দাওয়া সেরে নেয় অনেক সময়।

সাহেব মেম দুই-ই দেখা যায় বজরায়। গোপাল লক্ষ্য করে গঙ্গার ঘাটের স্নানরতা মেয়েদের ভিজে ঘোমটা আরও লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে। অনেকে তাড়াতাড়ি উঠে ছুটে চলে গেল। সাহেব দেখে বড় ভয় এদেশের লোকের। শুধু মেয়েরাই নয়। কত অত্যাচারের কথা শোনে। ওদের অত্যাচারগুলো আরও বেশি প্রচার হয়ে যায়। অথচ যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে গোপালের তাদের বেশিরভাগই ভদ্রলোক। তবু সাহবে ভীতি—কোর্টের গোরারাই এই কীর্তি করেছে। তাদের বদনাম সব সাহেব ভাগ করে নিয়েছে।

এতক্ষণে চিনতে পারে গোপাল মুখুজ্জে। ডানকিন সাহেব। কিছুদিন আগে ভীষণ ভুগে উঠলো। দুর্গাচরণ মুখার্জির কাছ থেকে ধার নিয়েছিল কিছু টাকা। পরে হয়তো নিজে থেকেই টাকা সংগ্রহ করেছে। ডানকিন সাহেবের গোলমুখো মেমসাহেবও আছে। এই মেমসাহেব ঘোড়ায় চড়তে ওস্তাদ। কোর্টের পাশের মেঠো রাস্তা ধরে বিকেলের দিকে ধুলো উড়িয়ে চলে যায় আলিপুরের দিকে। আর ডানকিন সাহেব পেছনে পেছনে আস্তে আস্তে চলে। তাই সব্বাই বলাবলি করে সাহেবের চেয়ে তার বউয়ের গায়ের জোর বেশি। আরে, বজরায় অ্যালেন ডাক্তারও আছে দেখি তার পুতুলের মতো বউকে নিয়ে। এই ডাক্তার আর তার বউকে বোধহয় কোনোদিনই বাড়িতে খেতে হয় না। রোজই মেমসাহেবকে পাশে বসিয়ে ফিটনে চেপে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যায় এ-বাড়ি কিংবা ও-বাড়ি। চিফ জাস্টিস স্যার এলিজা ইম্পের বাড়ি কিংবা কর্নেল ওয়াটসনের গার্ডেনরিচের বাড়ি, জাস্টিস হাইডের বাড়ি অথবা অ্যাটর্নি হিকির বাড়ি, স্যার রবার্ট চেম্বার্সের বাড়ি কিংবা খোদ ওয়ারেন হেস্টিংস-এর বাড়ি। লেগেই আছে একটা না একটা। এছাড়া জাহাজের নেমন্তন্ন তো আছেই।

বজরাগুলো একেবারে কাছে আসে। আরও দু' একজন সাহেব ভেতরের দিকে কথাবার্তা বলছে। ঠিক চিনতে পারে না গোপাল।

ডানকিন্ সাহেবের সঙ্গে চোখাচোখি হয়। সাহেব মৃদু হাসে তাকে দেখে। বোধহয় নামটা মনে করতে পারলো না। তাই একটা কিছু বলি বলি করেও বললো না। মেমসাহেবকে আস্তে কিছু বলায় মেমসাহেবও তার পৈতে-ঝোলা নগ্ন দেহটা দেখে নিল। ভাগ্যিস্ ধুতি ছেড়ে গামছাটা পরেনি এখনো।

বজরা ঘাট পেরিয়ে যেতেই গোপাল মুখুজ্জে দেখে বেশ কিছু বউ-ঝি এগিয়ে আসছে ঘাটের দিকে। তারা সাহেব দেখে আড়ালে অপেক্ষা করছিল। ওপরের অশ্বত্থ গাছটা ছায়াও দেয়, আড়ালও করে। গোপাল দেখে যারা স্নান করছে তাদের অধিকাংশই অত্যন্ত দীন-দরিদ্র। সে ভাবে, যে বছর মন্বন্তর হয়েছিল তখন সে কত ছোট। দিনের পর দিন না খেতে পেয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তার বাবা ছিলেন পুরোহিত। সেবারে দুর্গাপুজোও হলো না একখানাও। কোনো পুজোই হলো না। গঙ্গার ধারে গিয়ে ছড়ানো মৃতদেহের পর মৃতদেহ ভাসতে ভাসতে চলে যেতে দেখত। জোয়ার আসায় তাদেরই অনেকগুলো ফিরে এসে পাড়ে ঠেকে যেত। কী দুর্গন্ধ! তবু তারই মধ্যে তারা বেঁচে গিয়েছিল। একদিন মাঝ রাতে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। শুনলো, তার বাবা কাঁপা গলায় কাকে বলছেন, —"আগে বাঁচতে হবে। তাই নিয়ে এলাম।" কী নিয়ে এসেছিলেন পরের দিনই দেখা গেল। প্রায় তিন মণ চাল। দেখে সে চিৎকার করে উঠতে গিয়েছিল। মা মুখে হাত চেপে ধরে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল— "চুপ কর। শুনতে পেলেই কেড়ে নিয়ে যাবে সবাই।" মহী তখন হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াত। ওই চালই তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছিল। সে কখনো জানতে চায়নি কীভাবে সংগ্রহ হলো ওই প্রাণদায়িনী লক্ষ্মী। তবে লক্ষ্য করেছিল বাবার গায়ে অনেক কাটা-ছেঁড়ার দাগ। সেইদিনই বুঝেছিল জীবন বাঁচাতে হলে, যে-কোনো পথ নেওয়া যায়। মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করা কোনো কাজের কথা নয়।

গোপাল মুখুজ্জে মাথায় জল ছিটিয়ে সবে দু'পা নেমেছে জলের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে পিছু ডাক। অসন্তুষ্ট হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে প্রতিবেশী পঞ্চানন ঘোষ। তার চেয়ে বয়সে কিছু বড়। বিজয়া দশমীর সময় ব্রাহ্মণ বলে তাকে প্রণাম করলেও আসলে তো গুরুজন। তাই মুখে হাসি ফোটাতে হয়।

পঞ্চানন ঘোষ বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে—শুনেছ খবর?

গোপালের বুকের ভেতরটা অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। হঠাৎ তার হুঁশ হয় অনেকদিন সে মহীকে দেখছে না। তাড়াহুড়োয় হেমলতাকে প্রশ্ন করতে খেয়াল থাকে না। মহীর কিছু হলো নাকি!

—কিসের কথা বলছেন?

—মীরকাশেম।

—মীরকাশেম! নবাব মীরকাশেম?

—হ্যাঁ হ্যাঁ এককালের নবাব। মারা গিয়েছে।

—কি করে?

—বড়ই দুঃখের। জানো গোপাল ওই লোকটার যত দোষই থাকুক, সাহেবদের পেছনে লেগেছিল।

—সেটা খুব ভালো করেছিল নাকি পঞ্চানন দাদা?

—ভালো না? ইংরাজ তো বিদেশী।

—তাতে কি? ওরা আসায় দেশে ন্যায়-বিচার হচ্ছে। তার আগে ছিল শুধু অত্যাচার।

—তুমি তো বলবেই। ইংরাজ আসায় পয়সা করেছ। মা লক্ষ্মীকে ঘরে বেঁধেছ।

গোপাল মনে মনে বলে, করেছিই তো। একশোবার করব। তোমাকে করতে কেউ মানা করেছে? মুখে বলে—শুধু তা নয়। অনেক কিছুই হচ্ছে ওরা আসার পর থেকে।

—আমি মানি না। ওরা বিদেশী। তাই মীরকাশেম মরে যাওয়ায় আমি কষ্ট পাচ্ছি। চোখে জল এসেছিল, জানো?

—আমারও দুঃখ হচ্ছে। হবে না কেন?

—জানো হাতে একটা কড়িও ছিল না লোকটার শেষ পর্যন্ত। না খেয়ে খেয়ে ছেঁড়া তাঁবুর মধ্যে মরেছে। কোঠাবাড়িও ছিল না। গায়ে একটা শাল ছিল, সেই শাল বিক্রি করে পয়সা তুলে কবর দেওয়া হয়।

—কোথায় মারা গেল? মুর্শিদাবাদ?

—মুর্শিদাবাদ! সেখানে থাকলে ওভাবে মরতে হতো না। সিরাজদ্দৌলার মতো অবস্থা হতো। মরেছে দিল্লি আর আগ্রার মাঝামাঝি এক জায়গায় পথের ধারে। একজন মাত্র লোক ছিল তার কাছে।

—খবরটা আনলো কে? আমি তো জানি। হেস্টিংস সাহেবকে চিঠি দিয়েছিল মীরকাশেম মিটমাট করে নেবার জন্যে। সাহেবরা বলাবলি করছিল। মহীর সেই শ্যালক রামরতন? সে এখন তো সাহেবের রাইটার—সে-ই শুনেছিল কথাটা।

—তারপরে।

—হেস্টিংস সাহেব আমল দেয়নি। ওই সব লোকের ওপর ভরসা করা যায় না। কখন যুদ্ধ বাধিয়ে বসে ঠিক কি? তাই মীরকাশেমের বেগম মুন্নি বিবির ছেলে নজমউদ্দৌলাই ভালো। অমন ভ্যাবাকান্ত নবাব মিলবে কোথায়?

পঞ্চানন ঘোষকে একটু হতাশ হতে দেখা যায় যেন মীরকাশেমের মৃত্যু সংবাদে। সাহেব আসায় এদের কোনো উন্নতি হয়নি। তাই সাহেব দেখতে পারে না। এদের কাছে নবাব ভালো। কারণ নবাব আমলে ঘোষেদের ঠাকুরদা ভালো কাজ করত।

আসলে সাহেবরা গোপালকে মুগ্ধ করেছে। সাহেবদের দৌলতে পয়সা না করলেও সে তাদের পক্ষে হতো। নবাবদের তো দেখল সে। এই যেমন টিপু সুলতানের বড় ছেলে ময়জুদ্দিন। তাকে আটকে রাখা হয়েছে বটে। কিন্তু কোথায় সেই দর্প সেই সাহস? শুনেছে হায়দার আলি আর টিপু সুলতান বীর ছিলেন। কিন্তু তাঁদের বংশধর অমন কেন? দিন রাত নাকি মাথা কোটে। কেন?

পঞ্চানন ঘোষকে কথাটা বলতেই সে ক্ষেপে ওঠে। বলে—সাহেবরা তোমাকে বশীকরণ করেছে। ওদের সব কিছুই এখন ভালো লাগবে। নইলে শেষে টিপু সুলতানের ছেলের সম্বন্ধে ওকথা বললে? একটা সাহেবকে এনে কয়েদ করে রাখো তো অতটুকু বয়সে—দেখব কত সাহস দেখায়?

গোপাল কথা বাড়াতে চায় না। পঞ্চানন ঘোষের মতো তার অত অবসর নেই। এখনি বার হতে হবে তাকে। সুপ্রিম কোর্টে খুব ভালো একটা মামলা চলছে। খুনের মামলা। স্যার রবার্ট চেম্বার্স হলেন মামলার বিচারপতি। এইসব মামলায় উপস্থিত থাকলে মজার মজার ঘটনার কথা শোনা যায়, দেখাও যায়। আবার অনেক সময় পয়সা উপায়ের পথও মিলে যায়। নিমু মল্লিক যেমন চাঁদপাল ঘাটের পথ দেখিয়েছে, তেমনি কোর্টের পথ দেখিয়েছে তাকে দুর্গাচরণ মুখার্জি, এই মামলার আসামী একজন সাধারণ মানুষ। সাত বছরের ছেলেকে খুন করে কুয়োয় ফেলেছে তার হাতের সোনার বালা দুটো নেবার জন্য। চেম্বার্স সাহেবের সামনে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে, সে বললো—এত কষ্ট করে যখন ধরলেন, তখন জিজ্ঞাসা করে কি হবে? খুন করেছি বলেই তো ধরা পড়েছি।

—স্বীকার করছ?

—না স্বীকার করার কি আছে?

চেম্বার্স সাহেব বিচারের ব্যাপারে খুঁতখুঁতে। তিনি বলেন—না তা হবে না। ওকে আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করতে হবে। ও অস্বীকার করুক।

খুনী বলে—ভালোরে ভালো। আজব ব্যাপার দেখি। স্বীকারও করতে দেবে না? ঠিক আছে আমি অস্বীকার করলাম। খুন করিনি। দেখি বিচারটা কেমন হয়।

চেম্বার্স সাহেব খুব খুশি—হুঁ। এইবারে বিচার হবে।

খুনীও নকল করে বলে ওঠে—হুঁ।

আদালতের সবাই হেসে ওঠে।

খুনী বলে—হাসলেন কেন? সাহেব কত বড় কাজী, তাঁর সামনে আপনারা হাসছেন? আমাকে যারা ধরেছেন সাহেব তাদেরও বিশ্বাস করেন না।

গোপাল মুখুজ্জে এই বিচার খুব উপভোগ করে। চেম্বার্স সাহেব যেমন পাগল, খুনীও তেমনি অদ্ভুত। শেষ পর্যন্ত বিচারে খুনীর অপরাধ প্রমাণিত হয় এবং তার ফাঁসির হুকুম হয়। গোপাল শুনেছে ফাঁসির দিন ভোরবেলাতেও খুনী সবাইকে খুব জব্দ করেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—তোমার কোনো সাধ আছে?

—সাধ? তা আছে বৈকি। আমাকে তো ফাঁসির হুকুম শুনিয়ে দিয়েই আপনারা খালাস। যে-কয়দিন বাঁচি কিছু খেতে দেবেন তো! না খেয়ে যদি মরে যেতাম আজ ফাঁসি হতো কি করে?

—তার মানে?

—আমাকে ভালো করে খেতে দেওয়া হয়নি।

কারাগারের কর্তৃপক্ষ থেকে সবার মুখ ফ্যাকাসে। বিচারক, অ্যাটর্নি সবাই এই বর্বরতায় চমকে ওঠে।

শেষে প্রশ্ন করা হয়—কী সাধ তবু বলো।

—কিছু খেতে চাই। পেটে বড্ড ক্ষিধে।

সবার মুখ নত হয়ে যায়। ভাবে হয়তো, তারাই এ-দেশের মানুষদের ন্যায় বিচারের পরাকাষ্ঠা দেখাতে চায়। কয়েকজন ছোটাছুটি করে। ওই ভোরবেলায় কোথায় খাবার পাবে? কী খাবার আনবে?

শেষে খুনিই তাদের উদ্ধার করে। হেসে বলে—থাক হুজুর। অত ছোটাছুটি করে দরকার নেই। এখন খাবার জোগাড় করা সোজা? এ জন্মে খালি পেটেই মরি। পরের জন্মে দেখা যাবে।

সবাই নিশ্চিন্ত হয়। জল্লাদ তার গলায় চর্বি মাখানো দড়ি পরিয়ে দিয়ে হাতল টেনে দেয়। দড়ি কিছুক্ষণ কাঁপতে থাকে—শেষে স্থির হয়ে যায়।

খুনির গল্পে শহর কয়েকদিন বেশ গরম হয়ে থাকে। সাহেবরা এসব কথা ভাঙতে চায় না। কিন্তু জল্লাদ বলেছিল তার এক বন্ধুকে। সেই বন্ধুই প্রচার করে দিয়েছিল।

আদালতে আর একদিন মামলা শুনতে গিয়ে বিপদে পড়েছিল গোপাল মুখুজ্জে। সেদিন যা অবস্থা হয়েছিল প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে ভরসা করতে পারেনি। তবে সেদিন একটা জিনিস দেখলো বটে। সাহেবরা কী কাপুরুষ! মুখে শুধু বড় বড় বুলি। আসলে ওদের মধ্যে অধিকাংশই ভীতু। তবে দু' চারজন আছে, যারা বাপের ব্যাটা বটে। ওইরকম বাপের ছেলেই ছিল ক্লাইভ সাহেব আর তার কিছু সাঙ্গোপাঙ্গো। নইলে এ-দেশ থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কবে উঠে যেত। সেদিন গোপাল মুখুজ্জে দেখলো ক্রেসী সাহেবের বুকের পাটা।

দিনটা ছিল মহরমের দিন। বিরাট শোভাযাত্রা করে মুসলমানরা ঘুরতে ঘুরতে এসে জড়ো হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের সামনে। সাহেবদের ওপর ওরা হঠাৎ ক্ষেপে গেল। সম্ভবত মীরজাফরের পুত্র মীরনের ছেলে মীর মইদুরের তরফ থেকে কেউ তাদের উস্কানি দিয়েছিল। কিংবা অন্য কারণও থাকতে পারে। শোভাযাত্রা আদালতের সামনে এসে একটার পর একটা পালকি আর ফিটন গাড়ি ভাঙতে শুরু করলো। তারপর রাস্তা থেকে ইট পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়তে লাগলো আদালতের দিকে। ঝন্‌ঝন্ করে ভেঙে পড়তে লাগলো কাচ। সাহেবরা ভেতরে ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। তাদের সঙ্গে গোপাল, দুর্গাচরণ আরও অনেকে। কিন্তু বাইরে বার হবার অন্য কোনো রাস্তা নেই। শেষে অনেক সাহেব ছাদের দিকে ছুটতে লাগলো। যারা নীচের দিকে গিয়েছিল তাদের তলোয়ার নিয়ে তাড়া করলে উঠে আসতে

থাকে ওরা। গোপাল মুখুজ্জে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। সে তখনো জানে না, তাকে ওরা মারবে না। ওদের রাগ সাহেবদের ওপর। সে ভেবেছে সবাইকে কচু-কাটা করতে এসেছে ওরা।

সেই সময় দেখা গেল ক্রেসী সাহেব অন্যান্য সাহেবকে একত্রিত করে সামনে এগিয়ে চলেছে। হয়তো সেদিন কোর্ট থেকে গোরারা এসে না পড়লে ওরা মরে যেত। তবু সাহস দেখাল বটে। গোরারা এসে দাঙ্গাবাজদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

মহরমের দিনের এই গল্প গোপাল মুখুজ্জে অনেকদিন রসিয়ে রসিয়ে বলতে পেরেছে। তবে তার সব চাইতে আনন্দ হতো হেমলতাকে বলে। যখনই বলত তখনই হেমলতা ভাবত ঘটনাটা বুঝি এখনি হচ্ছে। সে গোপালকে চেপে ধরে রাখত। কিন্তু দুর্গাচরণ অনেক সেয়ানা। সে বানিয়ে বুনিয়ে এমন একখানা গল্প খাড়া করেছিল, মনো হতো যেন বক্সারের যুদ্ধের বর্ণনা দিচ্ছে। গল্প বলার ব্যাপারেও দুর্গাচরণ তাকে পথ দেখালো। ভালো গল্প বানাতে না পারলে সাহেবরা কি এমনিতেই পটে?

হেমলতা এখন পূর্ণশশীর মতো। আর দেড় মাস বাকি দশমাস দশ দিন পূর্ণ হতে। বৈশাখ মাসের প্রথমে সে হবে মা। নীরু তার খুব সেবাযত্ন করে। নীরু বুঝে গিয়েছে এ-বাড়িতে এখন হেমলতাই কেন্দ্রীয় চরিত্র। এদিকে সুখেনের মায়ের ক্রমাগত প্ররোচনায় মানিকের প্রতি তার কঠোরতা সব জেনেশুনেও দিনের পর দিন হ্রাস পাচ্ছে। সে অনেক সময় সন্ধ্যার পরে আধা-ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখে ফেলে—কোনো এক গঙ্গার ধার একটি কুটির। কুটিরের সেই একমাত্র গৃহিণী। কত কাজ করছে সে। পাশে কোথায় যেন শিশুর কলধ্বনিও শোনা যায়। সেই সময় সে দেখলো মানিক হাতে করতাল নিয়ে গান গাইতে গাইতে ঘরে ফিরছে। ঘুম চটে যায়। বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ করতে থাকে নীরুর। নীরু অস্বীকার করতে পারে না—জেগে জেগেও স্বপ্ন দেখে ফেলেছে সে। অথচ মানিক গাঁজাখোর।

মানিক একদিন এসে বাড়ির কর্তার সামনে দু' হাত কচলে দাঁড়ায়। নীরু লক্ষ্য করে অবাক হয়। মানিকের ওই ধরনের ভঙ্গী দেখলেই বোঝা যায় সে কোনো প্রার্থনা নিয়ে এসেছে। একটু আড়ালে সরে যায় নীরু। সুখেনের মা গোবেচারীর মতো আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়—যেন সে মানিককে লক্ষ্যও করেনি। নীরুর মুখ কঠিন হয়। সে জানে এ-বাড়িতে সব চাইতে ধূর্ত এই সুখেনের মা। কিন্তু সে তার বয়স আর বার্ধক্যসুলভ ভঙ্গী দিয়ে সব চাপা দিয়ে রাখে।

—কি রে মানিক। কি চাস।

—আজ্ঞে, এবারে গাজনের সন্ন্যাসী হবো। মানত করেছি।

—গাজনের সন্ন্যাসী? তার মানে এক মাস কাজে ফাঁকি।

—কাজ আমি সব করব। একটুও ফাঁকি দেবো না।

—কি করে করবি? গাঁজা খাওয়ার এমন সুযোগ পেয়ে কত কাজই করবি।

—না বাবু। সব কাজ করব। গাঁজা তো এই পুজোর অঙ্গ।

—হ্যাঁ ওটাই সার কথা বুঝেছিস, তোর তো তাহলে নিত্যি পুজো। কবে গাঁজা খাস না সন্ধের সময় এসে বলে যাস।

মানিক হাত কচলাতে থাকে।

—কী মানত তোর? তোর আবার মানত কিসের। বউ নেই, সংসার নেই।

—এজ্ঞে, সেটা গোপন। মানতের কথা বলতে নেই।

নীরুর বুনের ভেড়াটা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। কিসের মানত মানিকের? সত্যিই তো, ওর বউ নেই, ছেলে নেই।

—ঠিক আছে, কিন্তু বেশি মাতামাতি করিস না।

নীরু ভাবে অনুমতি যখন পেয়ে গেল মানিক তখন সে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেল, তাকে আর

বেশি দেখা যাবে না একমাস। সন্ন্যাসীদের মধ্যে বসে গাঁজায় দম দিতে দিতে দিনরাত দুই-ই কাটবে। বাড়িতে খাওয়ার পাটতো চুকলো একমাস। ভিক্ষে করতে হবে তো পেটের অন্নর জন্য। দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীরু, তবু যদি বেচারার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। মানত করেছে শিবঠাকুরের কাছে। শিবঠাকুর তো আশুতোষ—অল্পেই তুষ্ট। তাই তো কিছুদিন আগে সে নিজেও শিবরাত্তির পালন করলো, সুখেনের মায়ের খুক্‌খুক্ করে কত হাসি। তার ভাবখানা যেন, ওষুধ ধরেছে। বিধবাদের ইহকাল গিয়েছে বলে পরকাল নেই? এ জন্মে সব মিটে গেলেও পরজন্ম বলে যেন কিছু নেই, তবু সে সবার সঙ্গে শিবের মাথায় জল ঢালতে যেতে পারেনি। একা একা গিয়েছিল দুরে মিত্তিরদের ঘাটে। সেখানে বটতলার শিব শালগ্রাম শিলার মতো গোল আর কালো চকচকে। জল ঢেলেও সুখ। অনেকে বলে খুব জাগ্রত। তার মতো অভাগীদের কৃপা করে থাকেন। পরে হেমলতার সঙ্গে সে পাড়ায় শিবমন্দিরেও গিয়েছিল। সেখানে শিবলিঙ্গ রূপো দিয়ে বাঁধানো। হেমলতা এবারে উপবাস করেনি, তবু গিয়েছিল পুজো দিতে। পুরোহিত একবার তার চেহারার দিকে তাকিয়ে ঢোঁক গিলে দক্ষিণার পরিমাণ দেখে পুজোর ব্যবস্থা করেছিল। কমলাকে হেমলতা কতবার সাধলো শিবরাত্তির পালন করার জন্য। কমলা খুব ধীরভাবে অস্বীকার করলো। নীরু ভাবে তার বয়স যদি কমলার সমান হতো, তাহলে দেখিয়ে দিত মহীর মতো স্বামীকে কিভাবে বশ করতে হয়। জীবনে আর বউয়ের আঁচল ছেড়ে যেতেই চাইত না। বউদের অমন আনমনা হলে চলে না। স্বামীর ওপর সব সময় তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হয়। বেচাল হবার উপায় থাকে না তাদের।

মাঘ মাস শেষ হতেই মানিককে সন্ন্যাসীর রূপে দেখা যায়। শুকনো শুকনো মুখে বেশ লাগে দেখতে। এদিকে গোপাল মুখুজ্জের মনের ভেতরেও নাড়া দেয় বোধহয়। সে যোগেশ নামে এক অর্ধ-বৃদ্ধকে চৈত্রমাসের জন্যে মানিকের কাজকর্ম করে দিতে বলে। মানিক ভয় পেয়ে গিয়েছিল প্রথমে। তারপর যখন দেখল গোপাল মুখুজ্জে তাকে এক মাসের স্বাধীনতা মঞ্জুর করে দিলো, তখন সে ভুলে গিয়ে আর একটু হলে কর্তার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ত। শেষ মুহূর্তে তার খেয়াল হয়েছিল, সে না সন্ন্যাসী, এখন সে একমাত্র শিব ঠাকুরের কাছে নত হবে। ইহলোকের মনুষ্যজন এখন তার চেয়ে নীচে, কিন্তু গোপাল মুখুজ্জে মূর্খ নয়। মানিককে প্রত্যেকদিন দু'বার এসে হাজিরা দিয়ে যেতে হবে। নইলে যোগেশই স্থায়ীভাবে বহাল হয়ে যাবে। তাতে মানিকের আপত্তি নেই।

কিন্তু ক'দিন পরে মানিক যখন বাড়িতে এলো, তখন নীরুর বুঝতে বাকি রইল না সে একটু বেশি মাত্রায় সন্ন্যাসী হয়ে পড়েছে। তার চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল। নীরুর সঙ্গে কথা বলতে এমনিতে সঙ্কোচবোধ করে। অথচ সেদিন এসে বলে—আমি এসেছি নীরু।

—তাতে কি?

—বাঃ, আমাকে আসতে হবে না দু'বার করে? এই হলো গিয়ে একবার।

—যাও, কর্তার সঙ্গে দেখা কর গে। এভাবে দেখলে আর ঢুকতে দেবেন না কখনো বাড়িতে।

—কেন? আমি সন্ন্যাসী। আমি তো এইভাবেই থাকব, আর ডুগডুগি বাজাবো।

নীরু ভাবে, ভালো ফ্যাসাদ, সন্ন্যাসীর এই ডুগডুগি বাজানো রূপ দেখলে কর্তা ক্ষেপে যাবে। কী করা যায় এখন? সে তাড়াতাড়ি গিয়ে হেমলতার কাছে বলে যে মানিক এসে দেখা করেছে। তাকে চলে যেতে বলবে কিনা?

হেমলতা বলে—হ্যাঁ। দাঁড়িয়ে থেকে আর কি করবে?

নীরু তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে মানিককে বলে—কর্তা রেগে গিয়েছেন।

—কেন?

—বড্ড বেশি গাঁজা খেয়েছ বলে।

—গাঁজা! ছিঃ ছিঃ, ওভাবে বলতে নেই। আমিই যাচ্ছি কর্তার কাছে।

—না না। যেতে হবে না। তুমি এখন যাও।

—তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ?

—আমি তাড়াব কেন? ওরা যাতে না তাড়ায় তাই চলে যেতে বলাই ভালো এখনকার মতো।

—না। তুমিই তাড়িয়ে দিচ্ছ। এই বসল্াম তবে।

মানিক ধপ্ করে শক্ত উঠোনের ওপর বসে পড়ে। নীরু দেখল মহা ঝামেলা। ভালো করতে গিয়ে উল্টো ফল। সে সরে পড়লো। তার কি? মানিক তো তার কেউ নয়। ওর চাকরি থাকলো আর গেল—বয়ে গেল।

সেই সময় কমলা ঘর থেকে বার হয়ে আসে। মানিককে ওইভাবে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে এসে বলে—কি হলো মানিক। বসে আছ কেন?

—নীরু আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

—নীরু? সে তোমাকে তাড়াবে কেন?

মানিক একটু ঝিম ধরে থেকে বলে—জানেন ছোট মা, আমি মানত করে সন্ন্যাসী হয়েছি।

—হ্যাঁ, তা তো জানি। কী মানত করেছ সে কথা তো বললে না। বলতে নেই নাকি?

—হ্যাঁ, বলতে নেই, আমি আমার জন্যে যা মানত করেছি সে কথা বলব না। সেটা আমার প্রাণের গোপন কথা। কিন্তু আর একটা মানতও করেছি।

—সেটা আবার কি জন্যে।

মানিক কেঁদে ফেলে বলে—আপনার জন্যে ছোট মা, আপনার জন্যে।

কমলা একটু কেঁপে ওঠে। তবু স্থির কণ্ঠে বলে—আমার জন্যে আবার কি মানত?

—সে কথা কি মুখ ফুটে বলতে পারি? চোখে সব দেখছি মা? আপনার কি কষ্ট।

কমলা এতক্ষণে বুঝতে পারে মানিক ভালো রকম নেশা করেছে। নইলে এভাবে তার সঙ্গে কথা বলার সাহসই হতো না। এমনিতেই তার গাম্ভীর্যের জন্যে অনেকে তার সঙ্গে কথা বলতে দ্বিধাবোধ করে। তবু মানিকের এই স্বীকৃতিতে কমলার মনে কোনো ছাপ পড়লো না। কারণ মহীর মন ঘরমুখো হলেও কতটা তৃপ্তি সে পাবে বলা কঠিন। কারণ মহী তাকে প্রথমেই বড় বেশি আঘাত দিয়ে ফেলেছে। তবু মানিকের সদিচ্ছার কথা জেনে কমলা মনে মনে তার প্রতি একটু সদয় হয়।

—ঠিক আছে মানিক। এবার তুমি যাও।

—জানেন ছোট মা, দুটো মানত করা খুব বিপদের। তার জন্যে মরণ পর্যন্ত হয়।

—কি বললে?

—না না। অন্য কারও নয়। যদি মৃত্যু হয় আমারই হবে। আর কারও নয়। দুটো মানত পালন করা বড় কঠিন। এবারে তাই আমি চড়কে উঠব।

—না। বাণ-ফোঁড়া, কাঁটা ঝাঁপের মধ্যে যেও না। বরং ঝুল সন্ন্যাসী হয়ো। আমার জন্যে তোমায় কিছু করতে হবে না।

—এখন আর ফেরাতে পারি না।

—তাহলে চড়কে উঠতে যেও না।

সেই সময় সুখেনের মা গুটি গুটি এগিয়ে আসতে থাকে। সে যেন কিছুই শুনছে না, কিছুই দেখছে না।

কমলা চলে যায়।

নীরুর আর সহ্য হয় না। সে আড়ালে দাঁড়িয়ে ঘটি থেকে এক আঁজলা জল নিয়ে ওপর দিকে ছুঁড়ে দেয়। সেই জল বৃষ্টির মতো সুখেনের মায়ের মাথায় পড়ে, মানিকের গায়ে পড়ে।

সুখেনের মা চেঁচিয়ে ওঠে—এ কি! জল পড়ল কোথা থেকে গো।

—বিষ্টি। শিব-ঠাকুর বিষ্টি দিয়েছেন। সন্ন্যাসীর শরীল পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে। শিব ঠাকুরের প্রাণে ব্যথা লেগেছে।

—চুপ করো মুখপোড়া। রোদে আকাশ ঝলসে যাচ্ছে। উনি গাঁজা খেয়ে বৃষ্টি দেখছেন।

—তবে জল আসবে কোথা থেকে শুনি?

—কোথা থেকে আবার। আকাশ দিয়ে পাখি ওড়ে না।

মানিক বলে—তাই বলে এত জল? আমার গা ভরে গিয়েছে গো।

নীরু মজা পায়। দুই বেড়ালে গোঁ গোঁ করার সময় গায়ে জল ছিটিয়ে দিলে খুব জোর ঝগড়া লেগে যায়। এও তেমনি। সুখেনের মা আর মানিকের ঝগড়া।

—তোর তো সর্বাঙ্গে গাঁজার গন। নিঃশ্বাসেও তাই। আমি পাচ্ছি। হুঁ ঠিক পাচ্ছি।

—তাহলে? আবার নাইতে যেতে হবে নাকি? না না আশুতোষের চেলার আবার কথায় কথায় নাওয়া কি? শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ায় তারা।

—থাম থাম। গঙ্গায় ডুব দিলে তোর গাঁজার নেশা কেটে যাবে, সেই ভয়। আমাকে ভড়কি দিস নাঁ। আমার উনিও খেতেন।

মিস ডানডাস্‌কে কোন্ গোরা সাহেব সঙ্গে করে মাদ্রাজের পথে পাড়ি দিয়েছে। মহী তার বউ কমলার একখানা মাকড়ি ঘুমন্ত অবস্থায় আলগোছে খুলে নিয়ে সরিয়ে রেখেছিল। সকাল হতেই হেমলতার চোখে পড়ে কমলার একটা কান খালি। সঙ্গে সঙ্গে তন্ন তন্ন করে খোঁজা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু পাওয়া যায় না। মহী লক্ষ্য করে বাড়ির সবাই এমনকি হেমলতাও তার ভারী দেহ নিয়ে যখন সর্বত্র খোঁজাখুঁজি করছিল তখন কমলা নির্বিকার। তার এই নির্বিকারত্ব অসহ্য হয়ে উঠেছিল মহীর কাছে। সে অবশ্য মহীর দিকে আড়চোখে সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে একবারও তাকায়নি। তবু তার ওই উদাস ভাব দেখে মহী অস্বস্তি অনুভব করেছে ক্রমাগত। কমলার ভাবখানা যেন সে সবই জানে—যেন সে জানে খুঁজে লাভ হবে না। এমনকি কোথায় খুঁজলে পাওয়া যাবে তাও তার অজানা নয়।

এত কষ্ট করে মাকড়ি সংগ্রহ করে কাছায় বেঁধে নিয়ে সে যখন সন্ধের মুখে চাঁদপাল ঘাটের কাছে এসে পৌঁছলো তখন জানলো পাখি উড়ে গিয়েছে। বুকের ভেতরটা কেমন ঝক করে ফাঁকা হয়ে গেল। ডানডাস্ তাকে কত ইংরেজি বলা শিখিয়েছে। 'ডারলিং' 'মাই লাভ' 'ইউ নটি'—আরও কত কি। মহীর কান্না পেল। সবার সামনে ধরা পড়ে যাবে বলে গঙ্গার জলে নেমে গিয়ে মুখ ধুয়ে এলো। এখন সে কী নিয়ে থাকবে? ফিরিঙ্গি আরও আছে। কিন্তু ওরা বড় নোংরা—বড় উগ্র। ডানডাস্ কী মিষ্টি ছিল। আসলে এখানে বেশ্যাবৃত্তি করলে কী হবে, ছিল তো একজন অফিসারের স্ত্রী। সেই অফিসার তাকে ছেড়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে এই পথে নামতে হয়েছে। কিন্তু অন্যেরা জন্মেছেই এইসব করার জন্যে, ছিঃ। কিন্তু কি করবে এখন? কমলা কেমন যেন দূরের মানুষ। ও যেন অনেক উঁচুতে। ও বাইরে থেকে উগ্র নয়—অথচ কোথায় যেন চাপা উগ্রতা লুকিয়ে রয়েছে। ওর কাছে প্রাণ খুলে যা তা বলা যায় না। মনে হয় ও অপছন্দ করে। ওকে চেনার চেষ্টা না করে বিয়ের পর-পরই জোর জুলুম করে ফেলেছে বটে। তখন অতটা বুঝতো না। কিন্তু এখন তেমন সম্ভব নয়। তাকে দেখলে কমলার মুখ সামান্য একটু কুঁচকে ওঠে। কোথায় যাবে তাহলে?

চাঁদপাল ঘাটের জাহাজগুলোতে টিম্‌টিম্ করে বাতি জ্বলছে। এদিক ওদিকে জেলে ডিঙিতে রান্না হচ্ছে। উনোনের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। মহী গঙ্গার ধার ঘেঁষে উত্তরদিকে চলতে শুরু করে। আজ আর সে মদ খাবে না। মিস ডানডাস্‌ই যখন নেই মদ খেয়ে কি হবে? কাছায় বাঁধা মাকড়িটা হাত দিয়ে অনুভব করে সে। এটিকে আর বেচতে হলো না আজকের মতো। অন্য দিন দেখা যাবে।

চলতে চলতে নিমতলায় আসে। অনেক ধুনি জ্বলছে বেতের ঝোপের আড়ালে আবডালে। সেই

ধুনিগুলোর চারপাশে আসর জমিয়ে বসেছে গাজনের সন্ন্যাসীরা। গাঁজার ধোঁয়ায় চারদিক আমোদিত। মহীর মনের ভেতরটা বেশ কিছুদিন পরে ছুঁক্‌ছুঁক্‌ করে ওঠে। ডানডাস্ তাকে গাঁজার বদলে মদ ধরিয়েছিল। কত কষ্ট হয়েছিল ছাড়তে। তবু সে ছেড়েছিল। নইলে ডানডাস্ যে তাকে ভালবাসবে না। সেই ডানডাস্‌ই তাকে ছেড়ে চলে গেল যখন, তখন আবার গাঁজা ধরতে ক্ষতি কি? মহী গুটি গুটি একটি দলের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তাদের অধিকাংশই বেহুঁশ। সারাদিন খালি পেটে গাঁজা টেনে টেনে এই অবস্থা। অনেকে আবার মড়ার খুলি নিয়েও নাচানাচিও করে সারাদিন। দেহকে কষ্ট দেবার কত অভিনব উপায় বার করে এইসব সন্ন্যাসীরা। মহী ছেলেবেলা থেকে দেখে দেখে অভ্যস্ত। তারপর চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে চড়ক। সেদিন কেউ জিভের ভেতর দিয়ে লোহার শলাকা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে বিঁধিয়ে দেবে। কেউ পিঠের মাংসের ভেতরে লোহার বঁড়শি বিঁধিয়ে চড়কে ঘুরবে।

গাঁজার কল্‌কে হাতে হাতে ঘোরে নিঃশব্দে। হাত বদল করার মতো অবস্থাও কারও নেই। কিন্তু এই সব সন্ন্যাসীদের সেবক জুটে যায় অনেক। তারাই কল্‌কে সেজে দেয়, একজনের হাত থেকে আর একজনের হাতে এগিয়ে দেয়। মহী ওদের পাশে বসে পড়ে।

একজন সন্ন্যাসী দাড়ি-গোঁফভর্তি মুখে ঢুলুঢুলু চোখে বলে ওঠে—কে? ছোট দাদাবাবু না?

মহী চমকে ওঠে। এ যে মানিক। হ্যাঁ, সে-ও এবার সন্ন্যাসী হয়েছে বটে। যাঃ, একটু গাঁজা টানাও হলো না। মানিকের ওপর তার হিংসে হয়। গাজনের সন্ন্যাসী হয়ে বিনি পয়সায় দিব্যি টেনে চলেছে। ইস্ সেও যদি সন্ন্যাসী হতে পারত।

—ছোট দাদাবাবু তুমি এখানে কি করছ?

—তুই আজকে গাঁজা টানিসনি দেখছি। আমাকে চিনতে পারলি। কথাও বলছিস বেশ।

মহী ভেবেছিল মানিক লজ্জা পেয়ে যাবে। লোকটা এমনিতেই লাজুক প্রকৃতির। কিন্তু নাঃ।

—তুমি এখনি ঘরে যাও। তোমার মতলব ভালো নয়। এত বয়স হলো তবু চোখ ফুটলো না? ঘরে বউ নেই?

মহী তাজ্জব। বলে কি মানিক! নাকি ওর দেহে অন্য কেউ ভর করেছে? তাই হবে।

তবু মহী ধমকে ওঠে—কী বলছিস?

—ঠিক বলছি। গাঁজায় দম দিতে এসেছ! তারপরে খারাপ পাড়ায় ঢুকে যাবে।

—কি বললি?

—ধমকিও না। 'আমি এখন মানিক নই। আমি সন্ন্যাসী।' আমার অনেক ক্ষমতা দেখবে?

মানিক তড়াক করে লাফ দিয়ে ওঠে। মহীও তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। একটা ত্রিশূলও কোথা থেকে যোগাড় করেছে মানিক। শেষে ছেঁদা করে না দেয়।

অন্যান্য সন্ন্যাসীরা মানিককে চেপে ধরে বলে—শান্ত হও বাবা। নটরাজ নৃত্য শুরু করো না। ধরণী কেঁপে উঠবে। পৃথিবী রসাতলে যাবে। শান্ত হও—শান্ত হও।

মহী বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে।

সবাই তাকে বলে—আপনি চলে যান তো। মূল সন্ন্যাসীকে ক্ষেপাবেন না। ইনি সাক্ষাৎ শিব। আপনার অমঙ্গল হবে।

মহী ধীরে ধীরে সরে পড়ে। সে ভাবে, যদি বাড়ির কর্তা তার দাদা না হয়ে সে হতো, তাহলে মানিককে আর বাড়িতে ঢুকতে দিত না কোনোদিন। কিন্তু বাড়ির মালিক সে নয়। সুতরাং মানিককে বিদায় করা যাবে না কখনো।

মহী আরও উত্তর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। বাড়ি আর বেশি দূর নয়। তাকে দেখে কমলা নিশ্চয় অবাক হয়ে যাবে। কমলা জানে, মাকড়ি সে-ই নিয়েছে। সুতরাং আজকের রাতে বাড়ি ফিরে যাওয়া অস্বাভাবিক ঘটনা। তাকে দেখে কমলার মুখখানা কেমন দেখতে হবে? নিশ্চয় ভয় পেয়ে যাবে।

ভাববে, আরও অলঙ্কার নিতে এসেছে। দু-একবার জোর করেও গলার হার নিয়েছে মহী।

মহী ভেবেছিল বাড়ি ঢুকতেই তার একমাত্র বংশধরের বেসুরো কান্নার আওয়াজ শুনে মেজাজ খিঁচিয়ে যাবে। কিন্তু আজ সব শান্ত। ওটা যে কেন জন্মাতে গেল সাত-তাড়াতাড়ি ভগবান জানেন। মায়ের মুখখানা মনে পড়ে মহীর। পুত্রবধূ সন্তানসম্ভবা জেনে কি বিগলিত হাসি। সেই হাসি দেখে তখন নিজেকে কৃতার্থ মনে হয়েছিল। দাদার দিকে আড়চোখে অবহেলার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল। খবরটা জানতে পেরে দাদা খুব সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল কিছুদিন। হেমলতার মুখখানা বিমর্ষ দেখাত। সাময়িকভাবে সেই কয়েকদিন নিজেকে খুব একটা উঁচু দরের পুরুষ বলে মনে হতো মহীর। তার পরেই বুদ্বুদ কেটে গিয়েছিল। ওদিকে মিস্ ডানডাসের উদয় হলো।

অন্ধকারের মধ্যে দোতলায় নীরু গালে হাত দিয়ে ভূতের মতো বসেছিল। মহীকে দেখে থতমত খেয়ে উঠে পড়ে। মহী কিছুক্ষণ অপ্রস্তুতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। মায়ের মৃত্যুর পর বাড়িটাকে তার এক একসময় মনে হয় অন্য কারও বাড়ি। সে অতিথি এ-বাড়িতে। নিজের বাড়িতে চলাফেরার যে দৃঢ় পদক্ষেপ তাও কেমন মদ-খাওয়া পদক্ষেপের মতো হয়ে যায়। নীরু মহীর হাবভাব দেখে অবাক হয়। ভাবে, হয়তো নেশা করে এসেছে। সে জানে এ-নেশা অন্য নেশা। মানিকের নেশা আলাদা জাতের।

—ছোট বউ শুয়ে পড়েছে নীরু?

—না। বড় বউদির ঘরে।

—দাদা আসেনি?

—হ্যাঁ। তিনি কালীবাড়ি গিয়েছেন।

—ও। অদু কোথায়?

—ঘুমিয়ে পড়েছে। সারা সন্ধে কেঁদে কেঁদে এই ঘুমোলো।

মহী নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়। নীরু দাঁড়িয়ে থাকে সেই দিকে চেয়ে। কমলাকে সে বশীকরণ কবচ দিয়েছিল। এতদিনে বোধ হয় ওষুধ ধরেছে। লক্ষণ হুবহু মিলে যাচ্ছে। কেমন শান্ত-শিষ্ট ভিজে বেড়ালোর মতো। আর কিছুদিন পর থেকেই কথায় কথায় শুধু 'কমলা' 'কমলা' বলে ডাকবে। পৃথিবীতে যেন অন্য কোনো জন-মনিষ্যি নেই। বেশ হয়েছে।

হেমলতা বাইরে আসে। নীরুকে বলে—কার সঙ্গে কথা বলছিলি রে?

ফিক করে হেসে নীরু বলে—এসেছেন।

—কে?

—ছোট বউদিকে ঘরে পাঠিয়ে দাও।

—ঠাকুরপো?

—হ্যাঁ।

—তাহলে আমিই আগে যাই।

—তোমাকে কি এখন পছন্দ হবে?

—ছিঃ নীরু। তোর মুখের আগল নেই? তুই জানিস না, কমলা ওকে ভয় পায়?

—আর পাবে না গো।

—তুই সব জেনে বসে আছিস। বেচারা খেয়ে এসেছে কিনা জেনে আসি।

হেমলতা মহীর ঘরের দরজায় গিয়ে ডাকে—ঠাকুরপো?

মহীর হাত থরথর করে কেঁপে ওঠে হেমলতার ডাক শুনে। সে সবে চুরিকরা মাকড়িটা কাছা থেকে খুলে হাতে নিয়ে কোথায় রাখবে ভাবছিল। সেটি মুঠো করে ধরে দরজার কাছে ফিরে আসে।

—তুমি হাত-মুখ ধুয়ে নাও। খাবে তো।

—তোমাদের খাওয়া হয়ে গিয়েছে?

—না। তোমার দাদা কালীবাড়ি গিয়েছেন। এখনি এসে পড়বেন।

—দাদার সঙ্গে খাব?

—তাতে কি?

মহী কথার উত্তর দিতে পারে না। হেমলতা ভাবে, একসঙ্গে দু'জনে খেতে বসলে নিজের কীর্তিকলাপ ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে মহী ইতস্তত করছে। ভেবেছে, হেমলতা বুঝি ইতিমধ্যে অনেক কিছুই তার কানে লাগিয়েছে। তাহলে, এতদিন কবে যে বাড়ি ছাড়তে হতো এটুকু বুদ্ধি ওই নেশাখোর মানুষটির নেই। শুধু কমলার মুখ চেয়েই মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে হয়েছে। বেচারা এখন আর একা নয়। সে এখন মা। এই বংশের সন্তানের জননী।

মহী আমতা আমতা করে বলে—আমাকে আলাদা খেতে দেবে বউদি?

—কেন?

—দাদার সামনে পেট-ভরে খেতে পারব না। এ সংসারের কিছুই তো করতে পারি না।

হেমলতার মুখ আধা অন্ধকারে কঠিন হয় কয়েক মুহূর্তের জন্যে। সে বলে—সংসারে তোমার উপার্জনের টাকার দরকার নেই ঠাকুরপো। শুধু তোমাকে নিয়ে কোনো অশান্তি না হয় এইটুকু দেখলেই বাঁচি।

হঠাৎ হাতের মুঠো খুলে হেমলতার সামনে ধরে মহী বলে—একটা মাকড়ি পেলাম ঘরের মেঝেতে। দেরাজের সামনে যেতে পায়ে ঠেকলো। এটাই হারিয়েছিল নাকি সকালে?

হেমলতা উত্তেজিতভাবে বলে ওঠে—কই দেখি-দেখি। হ্যাঁ এটাই তো। দেরাজের সামনে কি করে পেলে? সব তো খোঁজা হয়েছিল।

—দেখো গে, যার জিনিস সে-ই হয়তো ফেলেছে পরে বিছানা ছাড়তে গিয়ে।

বাইরে গোপাল মুখুজ্জের চটির আওয়াজ পাওয়া যায়। কমলা তাড়াতাড়ি ভাসুরের ঘর থেকে বার হয়ে নিজের ঘরের সামনে হেমলতা আর মহীকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্তব্ধ হয়ে যায়। হেমলতা হাত বাড়িয়ে মাকড়িটা কমলার দিকে এগিয়ে দেয়। কমলা কিছুই বুঝতে পারে না।

মহী তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতরে ঢুকে যায়।

কমলার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে হেমলতা বলে—তুই বিছানা পরিষ্কার করতে গিয়ে ফেলেছিলি দেরাজের পাশে। ঠাকুরপো পেল এখন।

কথাটা বলেই হেমলতা হেসে ফেলে।

কমলা বলে....ও কি রাতে থাকবে?

থাকবে না তো যাবে কোথায়? আমার শরীরের যা অবস্থা রান্না ঘরে আর যাব না আজ। তুই দু'জনকে খেতে দেয়। সুখেনের মা কোথায় গেল?

—কোথায় পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে হয়তো।

—যা রান্না ঘরে যা।

হেমলতা চলে যাবার পরও কমলা ঠায় দাঁড়িয় থাকে। ভাসুর ও স্বামীকে সে কখনো খেতে দেয়নি। তবে বড় জা-কে সাহায্য করেছে কালেভদ্রে। তারপরে বহুদিন মহী আর তার দাদা একসঙ্গে খেতে বসেনি। তাই ভয় হয় কমলার। হেমলতার দিকে চেয়ে কিছু বলতেও পারে না। দিন দশ-পনেরোর ভেতরেই তাকে আঁতুড় ঘরে ঢুকতে হলো। এই সময় কাজ করতে গিয়ে অসাবধান হলে অনেক অঘটন ঘটতে পারে। অদু যখন তার পেটে ছিল, তখন বড় জা তাকে ভারী কোনো কাজই করতে দেয়নি। শুধু বলেছিল, অনর্থক যেন পড়ে পড়ে না ঘুমোয়। হেমলতার নির্দেশে তাকে চলাফেরার ওপর থাকতে হতো। তখন সে ভাবত, তার ওপর হিংসেতে বুঝি হেমলতা অমন করে। কারণ শাশুড়ি তাকে কুটোটিও নাড়তে মানা করত। শাশুড়ির কাছে হেমলতা অনেক বকুনি খেয়েছে এ-জন্যে। তখন চুপি

চুপি তাকে এসে বলেছে—তোর ভালোর জন্যেই বলি কমলা। আমার সই-এর বাবা বকুলতলার বড় বদ্যি। তিনিই বলেন, পোয়াতিকে বসতে দিতে নেই।

শাশুড়ির মৃত্যুর পর কমলা বুঝেছে, তার শুভ এ-বাড়িতে একমাত্র হেমলতাই চায়। সুতরাং তার কথা না শুনে মনে দাগা দেবার কথা উঠতে পারে না। রান্নাঘরে আজ সে যাবে। খেতেও দেবে দু'জনকে। তবে লম্বা ঘোমটা নিয়ে অসুবিধায় পড়তে হবে।

রামরতন চক্রবর্তী আগে কখনো কল্পনা করতে পারেনি যে তাদের দেশে বসবাস করেও সাহেবরা অন্য এক জগতে বাস করে। এই জগতে দারিদ্র্য বলে কিছু নেই। এখানে প্রতিদিন শুধু উৎসব আর আনন্দ। ব্যর্থতা আর অনুশোচনা হয়তো আছে, কিন্তু উৎসবের জোয়ারে সেগুলো মনের মধ্যে দানা বাঁধার আগেই কোথায় ভেসে যায়। জগৎটা যে প্রপঞ্চ নয়, সেটা শুধু ভোগের সামগ্রী—এই মহাজ্ঞান রামরতনের আগে ছিল না। অ্যাটর্নি হিকি সাহেবের রাইটার হিসাবে চাকরি করলেও যে ঘরে বসে সে লেখে সেই ঘরের দরজা-জানালা দিয়ে অন্য জগতের অনেক আভাস স্বাদ-গন্ধ-শব্দ-দৃশ্য তার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সে বুঝে উঠতে পারে না এরা দুশ্চরিত্র, না মহাভারতের যুগের সূর্য ধর্ম ব্যাস বা অন্য কারও মতো দেবতা কিংবা অতিমানব, সে বুঝে উঠতে পারে না এরা বেহিসাবী নাকি এদের হিসেবের তালের আকার কিংবা মনের পরিধি তাদের চাইতে শত সহস্র গুণ বেশি। সে চঞ্চল হয়, অস্বস্তি অনুভব করে—আবার মুগ্ধও হয় কত সময়।

সে শুনেছে অভ্যাগতদের আদর-আপ্যায়নের তদ্বির-তদারক করতে করতে অতি পরিশ্রমে তার সাহেবের স্ত্রী বিয়োগ হয়েছিল। স্ত্রীর জন্য সাহেবের ছিল গভীর প্রেম। তাই সাহেব ছন্নছাড়ার মতো বহুদিন কাটিয়েছে এখানে ওখানে—কলকাতার বাইরে বন্ধুবান্ধবদের কাছে। আবার এই সাহেবই যোগাড় করল কিরণবালাকে। তার সঙ্গে বাসও করলো কতদিন। শেষে বিদায় করে দিল কিরণবালার বাড়াবাড়িতে। এখন কিছুদিন থেকে রামরতন আর একটি জিনিস লক্ষ্য করছে। হিকি সাহেবের বাড়িতে কার্টার নামে এক সাহেব ছিল। দু'জনে খুব বন্ধুত্ব। দু'জনেই মদ্যপানে বেহিসেবী। কার্টার সাহেবের পেটে ব্যথা শুরু হলো। সে ভয় পেয়ে দেশে ফিরে গেল। রামরতন মাঝে মাঝে একটি সুন্দরী মেয়েকে এ-বাড়িতে দেখতে পেত। মেয়েটি শুধু সুন্দরী নয়, বেশ চালাক চতুর—চলাফেরায় এ-দেশী হয়েও মেমসাহেবের মতো চটপটে। বাড়ির ভৃত্যদেব সঙ্গে সাহেবদের ব্যাপারে কথা বলা রামরতন অপছন্দ করে। ভৃত্যরা এতে মাথায় ওঠে। তবু কানে অনেক কথাই আসে। ভৃত্যরা শুনিয়ে শুনিয়ে বলে মজার কথা হলে। মেয়েটিকে ওরা ডাকে জমাদারনী বলে। কেন বলে সে জানে না। সে নাকি কার্টার সাহেবের আমন্ত্রণে এ-বাড়িতে আসত। এখন পাকাপোক্তভাবে থাকবে। হিকি সাহেব তাকে থাকতে বলায় সে নাকি হিকি সাহেবের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকতে রাজি হয়েছে। শুনে রামরতনের কান দুটো গরম হয়, মাথায় জল ঢালতে ইচ্ছে করে। অথচ সাহেব কত স্বাভাবিক। এ-সব যেন কিছুই নয়। এতে ওদের চরিত্রে কাদা মাখামাখি হয় না—অন্তরের কাছে জবাবদিহি দেবার প্রশ্নও ওঠে না। ওরা জগতটাকে মায়া ভেবে পরকালকে আসল ভাবে না, ওদের ধারণা উল্টো। মনে হয় ওরা পরলোক বলে কিছু মানে না। তাই বেশ আছে।

রামরতন ভাবে, সে যদি সাহেব হতো কিংবা সাহেবদের মতো ইহকালের ওপর একটা প্রাধান্য দিতে পারত তাহলে এক ছেলের মা হওয়া সত্ত্বেও কমলার একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে পারত। সে যদি সাহেব না হয়ে মুসলমানও হতো, তবু পারত। কিন্তু সে হিন্দু—সংসার মায়া অথচ সমাজ ব্যবস্থা অতিমাত্রায় কড়া। অদ্ভুত বৈপরীত্য।

সব ভাবনাতেই ঘুরে ফিরে কলমার ভাবনা। মনকে অনেক শাসন করেও কমলা—বিমুক্ত করতে পারে না রামরতন। তাই সে অআরও নিবিড়ভাবে ইংরাজি ভাষা লিখতে শুরু করে। এখানে এসে

সাহেবদের সঙ্গে কথা বলে, সাহেবী পরিবেশে এবং নানান ধরনের ইংরাজি বইয়ের সাহায্য পেয়ে তার ইংরাজি জ্ঞান দ্রুত বাড়াতে থাকে। ইংরাজিতে যে সমস্ত চিঠিপত্র এখন সে লেখে, আইনের যে সব মুসাবিদা সে করে হিকি সাহেব নিজেই তা পড়ে অবাক হয়ে যায়। কিন্তু হিকি সাহেব একটি খবর জানতে পারে না, সে জানে না তার নেটিভ রাইটার লুকিয়ে লুকিয়ে ইংরাজিতে কবিতা লেখে এবং বেশ ভালই লেখে। ভালো কবিতা সাহেবী ভাষায় লেখা সহজ কথা নয়। তার জন্য মনটাকে অনেকখানি সাহেবী করে তুলতে হয়, আর এই সাহেবী করে তোলার জন্য সে তাদের সঙ্গে ছুতোয় নাতায় বেশি করে মিশতে শুরু করে। সাহেবদের মধ্যে তার কোনো বিশিষ্ট স্থান নেই—বরং সে অতি নগণ্য। তবু তার কথায়-বার্তায় আদব-কায়দায় তারা সন্তুষ্ট হয়। অনেক সময় এগিয়ে এসে কুশল প্রশ্ন করে।

সাহেবদের আচার ব্যবহারের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে রামরতন। সে দেখেছে তার প্রভুর বাড়িতে যখন ডিনারে বহু সাহেব মেম আসে তখন এ-দেশী হুঁকো খাওয়া তাদের মধ্যে একটা প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সেটাই এখন তাদের আভিজাত্য। আর একটি কদাচার লক্ষ্য করে সে বিস্মিত হয়। খেতে বসে পাঁউরুটি হাত দিয়ে দলা করে পাকিয়ে গোল করে একজন আর একজনকে লক্ষ্য করে সজোরে ছুঁড়ে দিচ্ছে। সাহেবরা একে বলে 'পেলেটিং'। এই নিয়ে কোনো এক সাহেবের বাড়িতে নাকি ক'দিন আগে মারামারি কাটাকাটি হয়ে গিয়েছে। তবু পেলেটিং চলছে। বাঙালী পরিবারে এমন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাদের তাহলে মেঝেতে আসনে বসে ভাত দলা পাকিয়ে ছুঁড়তে হবে। এঁটো হয়ে যাবে সব। বাড়িসুদ্ধ সবাইকে স্নান করতে হবে। চূড়ান্ত অসভ্যতা বলে বিবেচিত হবে। অথচ তারা নেটিভ, আর সাহেবরা নেটিভদের বলে অসভ্য।

সাহেবদের সঙ্গে মিশে সব দেখেশুনে রামরতন কিন্তু তুলনামূলক ভাবে নিজেদের অনেক বেশি হেয় জ্ঞান করে। যত দোষই থাক সাহেবদের, তারা মুষ্টিমেয় কয়েকজন এদেশে এসে সময় কাটায় নানা স্ফূর্তির মধ্যে। সেই স্মৃতিতে যদি অসংযম থাকে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু যাদের তারা নেটিভ বলে তারা কি? নিজের দেশে থেকেও কাজ করতে তাদের শরীর চলে না। পৃথিবীর অন্য দেশে যাওয়া তো দূরের কথা। কালাপানি পার হয়েছ কি জাত গিয়েছে। অথচ সাহেবরা মাসের পর মাস ঝড়-জল-তুফানের সঙ্গে সংগ্রাম করে বিরাট সমুদ্র পার হয়ে এদেশে আসছে। তাদের সব কিছুতেই একাগ্রতা, একটা নিষ্ঠা ফুটে ওঠে। এদেশে কত ধনী লোকের বাড়িতে কত উৎসব হয়, জলের মতো টাকাও খরচ হয় অথচ ফেনউইক সাহেবের গার্ডেনরিচের বাগান বাড়িতে যে মেলা বসে তার তুলনা কোথায়? হাজার হাজার লাল নীল সবুজ বাতি দিয়ে বাগান সাজানো হয়। বাগানে পর পর তাঁবু খাটানো হয়। সেই তাঁবুর ভেতর টেবিল পাতা আর টেবিলে স্তূপীকৃত নানান ধরনের খাবার। হাজার লোকের খাবার ব্যবস্থা। লখনউ থেকে আনা হয় আতসবাজদের। বিচিত্র সব মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেউ কেউ। কোথাও হচ্ছে বাঈজীদের নাচ। এর মধ্যে আবার সাহেবদের মদের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এত বিরাটভাবে অথচ এত সুশৃঙ্খলভাবে এদেশী লোকদের কোনো উৎসব হতে দেখেনি। যেখানেই বিরাট কিছু হয় সেখানেই বিশৃঙ্খলা হুড়োহুড়ি ছোটাছুটি আর হাঁক ডাক। এদের তুলনায় তখন সত্যিই নিজেদের জংলী বলেই মনে হয় রামরতনের। তবে এই মনোভাব বাড়িতে কিংবা প্রতিবেশীদের কাছে প্রকাশ করা যায় না। কিছু বললেই বলবে সাহেবদের পা-চাটা। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ সাহেবরা আর যাই হোক, যাকে একবার বিশ্বাস করে তার উপকার করারই চেষ্টা করে। সেদিন বেনিয়ান দুর্গাচরণ মুখার্জিকে তার সামনে কী অপমানই না করলো তার হিকি সাহেব। দুর্গাচরণের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। তারপর ফিরে গিয়েই সাহেবের নামে উকিলের চিঠি। সাহেব প্যাঁচে পড়ে গেল। কিছু টাকা ধার করেছিল বেনিয়ানের কাছে। অথচ সেদিনই দুর্গাচরণ চলে যাবার পর মুহূর্তেই তাকে নিয়ে গেল সাহেব কালিঘাট পার হয়ে কিছুদূরে এক জঙ্গলাকীর্ণ গাঁয়ের মধ্যে। দিনের বেলাতেও সেখানে কেউ

ডাকে। নিজে টাকা দিয়ে দশ বিঘে জমি কিনিয়ে দিলো তার নামে সেই অজ পাড়াগাঁয়ে। ওই জমি রামরতনের কী কাজে লাগবে বুঝলো না। সাহেব বললো, জমিতে অনেক খেজুরের গাছ আছে। আপাতত খেজুরের রস আর গুড় পাওয়া যাবে। তাছাড়া কেউ যদি চাষ করতে চায় ফসলের কিছু ভাগও দেবে। রামরতন নূর মহম্মদ নামে একজনকে তখনি ঠিক করে ফেললো। হয়তো পরে সত্যিই কাজ দেবে ওই জমি। সবচেয়ে বড় কথা পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে আদি আর অকৃত্রিম গঙ্গা। সেদিন জীবনে প্রথম উপলব্ধি করলো রামরতন পৃথিবীতে তারও কিছু আছে। আর সেদিনই তার আর হিকি সাহেবের জীবনের শেষ দিনও হতে পারত। ওখান থেকে ফেরার পথে সে সাহেবের কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল একটু মা কালী দর্শন করে যাবে। সাহেব রাজি হয়ে গেল। একটা গাড়ি এনেছিল সাহেব। সেটা দূরে রাস্তার ওপর বেঁধে রেখে এসেছে ঘোড়া সমেত। গাঁয়ের মধ্যে আসতে পারেনি। ফেরার পথে একটা নাটাই-এর ঝোপ পার হয়ে আসতেই সেই ঝোপের ভেতর থেকে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে একটা বুনো শুয়োর ছুটে আসে তাদের দিকে। তারা ছুটতে শুরু করে, শুয়োরও ছোটে। গা হাত পা কেটে যায়। দম শেষ হয়ে আসে রামরতনের। সেই সময় দূর থেকে একজন চেঁচায়—"গাছে উঠুন, গাছে উঠুন।" সাহেবকে হাঁফাতে হাঁফাতে সেই কথা বলে রামরতন একটা গাছে কোনো রকমে উঠে পড়ে। ছোট গাছ ভেঙে পড়ার মতো হয়। সাহেবও জুতো সমেত লাফিয়ে একটা পেয়ারা গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ে। শুয়োর তীর বেগে ছুটে চলে যায়।

গাঁয়ের লোকটি কাছে এসে বলে—নাটাই ঝোপের ভেতরে ওর বাচ্চা হয়েছে। যাকে দেখে তাকেই তাড়া করে। সেদিন একটা ছেলেকে ও মেরে ফেলেছে।

রামরতন কালীঘাটের গঙ্গায় স্নান করে মা'কে পুজো দেয় দুই কারণে। প্রথমতঃ তার আর তার প্রভুর প্রাণ বেঁচে গিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ জীবনে প্রথম তার নিজের সম্পত্তি হলো। হিকি সাহেব মন্দিরের বাইরে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করে। এমন না হলে সাহেব?

মায়ের মন্দির থেকে বার হবার সময় রামরতন মনে মনে ভাবে, একদিন অবশ্য প্রার্থনার যে বিষয়টি বরাবর তার কাছে প্রাধান্য পেয়েছে আজ সেটিকে সে উপেক্ষা করলো। এতদিন অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে মন্দিরে মন্দিরে প্রার্থনা জানাত, কমলা যেন তার জীবনে আসে। অস্বীকার করে না সে যে তার প্রার্থনার মধ্যে তেমন বলিষ্ঠতা ছিল না। দেবতার কাছে প্রার্থনা করার সময়ও তার মনোভাব ছিল পরাজিতের মনোভাব। অন্তরে অন্তরে কখনো সে বিশ্বাস করতে পারেনি কমলা তার মতো দরিদ্রের কুটিরে এসে ঘর আলো করবে। তাই হয়তো ভগবান মুখ ফিরিয়েছেন। তবু সে একবার করে কমলাকে চেয়ে বসতো, এখন আর চায় না। কালীঘাটের মতো পীঠস্থানে এসেও চেয়ে লাভ নেই বলেই চাইতে পারলো না। কারণ জাগ্রত দেবী তার ইচ্ছা পরণ করলে সমাজ ত্যাগ করতে হবে তাকে—ধর্ম ত্যাগও। তবু দেবীকে বলে ফেলেছে সে—কমলাকে সুখ দিও। কমলার দুঃখ কিছুতেই সইতে পারে না রামরতন। আজ যদি মহী মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠে, সে সত্যিই আনন্দ পাবে।

হেমলতার ব্যথা উঠেছে ভোর রাত থেকে। গোপাল মুখুজ্জে আগে থাকতেই উঠোনের একপাশে ইটের তৈরি ছোট একটি স্থায়ী ঘর তুলে দিয়েছে। কমলা প্রসবের সময় তার বাপের বাড়িতে ছিল, হেমলতার সে সুযোগ নেই। তার বাবার মৃত্যু হয়েছে। মা থাকেন ভাইদের আশ্রয়ে। আর ভাইয়েরা মহীর মতো অতটা না হলেও, অবস্থাপন্ন বাবার আদরে তেমন মানুষ হয়নি। পেয়ারা বাগানে তাদের বেশ বড় বাড়ি রয়েছে। সেই বাড়ি এই এক পুরুষেই হতশ্রী হয়ে উঠেছে। তাছাড়া গোপাল মুখুজ্জে হেমলতাকে কখনই ছেড়ে দিত না।

হেমলতা মাঝে মাঝে চুপ করছে। কখনো মৃদু ব্যথায় কাতরোক্তি করছে। এক একসময় চিৎকার করে কাঁদছে। তার মতো ধৈর্যশীলা মেয়ে হয়েও সহ্য করতে পারছে না। গোপাল মুখুজ্জের ভেতরটা

সেই চিৎকারে কুঁকড়ে যাচ্ছে। মহীর মতো মানুষও আজ একবারও বাইরে যায়নি। ঘর-বাব করছে আর মাঝে মাঝে গোপালকে এসে জিজ্ঞাসা করছে, সে কিছু করতে পারে কিনা।

ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে বুড়ি দাই হাসে মুখ টিপে। কমলাকে বলে—অমন করছে কেন বাবুরা। ছেলে যেন কারও হয় না।

—এই কষ্ট তো দেখনি আগে।

—কে আবার দেখে আগে।

—ওদের বাড়িতে বোন নেই, বড় বড়দিও নেই।

—রাখো। তবে তোমার জায়ের কষ্ট একটু বেশি হচ্ছে। ছেলে হবে এত-বড়। পেটটা দেখেছ তো, কী রকম সামনে এগিয়ে এসেছে।

দাই-এর কথা শুনতে ভালো না লাগলেও কমলা ভয়ে ভয়ে শোনে। নীরু তার কাছে কাছে থেকে ফাইফরমায়েস খাটছে। সুখেনের মা রান্নাঘরের কাজ দেখছে। শত হলেও সে ব্রাহ্মণী। তার সুখেন যতদিন বেঁচেছিল পুরুতগিরিও করত। তারপর বসন্ত রোগে মরলো। সে আজ বহু বছর আগের কথা। সুখেনের মা তখন প্রায় নীরুর বয়সী। এ পাড়াতে ওই গঙ্গায় যাবার পথের ডানপাশে যে ডোবা রয়েছে, যেখানে রাজ্যসুদ্ধ সবাই বাসন মাজে আর গরু মোষ স্নান করায় তারই ধারে কুটির ছিল তার। নাম ছিল তার পুরুত-বাড়ি। সুখেনের বাবারও এই কাজ ছিল। কিন্তু সুখেন মরে যাবার পর তার মা অনেকদিন আপনমনে বকবক করত, কাকে যেন গালাগালি দিত—ডোবায় ঢিল ছুঁড়তো। এইভাবে তার কুঁড়ে ঘর ভেঙে পড়লো—আর নতুন করে উঠলো না। ভাসতে ভাসতে এখন সে গোপাল মুখুজ্জের বাড়িতে। তার মাথা এখন আর খারাপ নেই, বরং অনেকের চেয়েই উর্বর। সুখেনের মৃত্যুর কথা সে এখনো ভোলেনি। মাঝে মধ্যে তার ভিটের দিকে চেয়ে থাকে এখনো।

আজ রান্নাঘরের কাজ করতে পেয়ে সে সন্তুষ্ট। এমনভাবে কেউ তাকে কখনো কোনো দায়িত্ব দেয়নি। রান্নাঘরের আনাজ দেখে তার মনে পড়লো এককালে তার লাউ-এর ঘন্ট এ-পাড়ার বিখ্যাত ছিল। আর বিখ্যাত ছিল তার সুক্তো। ওই ঘোষ বাড়ির গিন্নি ওই মল্লিকদের বুড়ো কর্তা, আরও কত মানুষ তার কাছ থেকে রান্না করে নিয়ে যেত। ঘোষ বাড়ির গিন্নিও নেই, বুড়ো কর্তা তো কবে গত হয়েছেন—কে আর ওসব কথা মনে রাখে। সে নিজেই মনে রাখে না। কখনো কখনো বিদ্যুতের মতো একটু চমক দিয়ে যায় সেই সব স্মৃতি।

নীরু সুখেনের মায়ের কাছে মাঝে মাঝে এসে বলছিল, আজ তুমি আমাদের কী খাওয়াবে গো।

—তুই না বিধবা? তোর অত নোলা কেন? যা পাবি তাই খাবি।

—পুড়িয়ে ঝামা করে রেখো না যেন।

হাড় পিত্তি জ্বলে যায় সুখেনের মায়ের। ছুড়িটা বড় বেশি ফড়ং ফড়ং করছে আজ। কেন, তাকি আর বোঝে না? আজ চৈত্র সংক্রান্তি। কাল থেকে মানিক আবার কাজ করতে আসবে। এক মাসে তার উপোস করে আর গাঁজা খেয়ে যা চেহারা হয়েছে একখানা চোখে দেখা যায় না। এ-বাড়িতে আসাও ছেড়ে দিয়েছে—কত্তাই মানা করে দিয়েছেন। ছুঁড়ি মানিকের স্বপ্ন দেখছে। বলে দেবে নাকি সে কথা? না থাক। কত লোকের কত মনের কথাই তো তার চোখের সামনে, মনের সামনে চন্দ্র সূর্যের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবু তো চুপ করে থাকতে হয় তাকে। নইলে শান্তি থাকে না। লোকে হয়তো তাকে বলবে ডাইনি বুড়ি। ছেলে-খেকো, ভাতার-খেকো হওয়া সত্ত্বেও এখনো লোকের মাথায় ওসব ঢোকেনি, ভগবানের কৃপা বলতে হবে।

নীরুর মনের খবর কি আর সে রাখে না? ওর মন তো একেবারে গলে গিয়েছে। মানিক ফিরে এসে হাতটি বাড়িয়ে দিলেই জাপটে ধরবে সেই হাত। মন যেটুকু শক্ত ছিল, মানিকের মূল-সন্ন্যাসীর রূপ দেখে সব গিয়েছে। থাক। বেচারা। এখনো যৌবন রয়েছে। কী হবে মানুষের বাড়ি দাসীবৃত্তি করে?

পাশে ভালোবাসার মানুষ থাকলে ভিক্ষে করেও সুখ।

হেমলতা আবার আর্তনাদ করে ওঠে। সেই আর্তনাদ নীরুকে কিসের যেন হাতছানি দেয়। ওদিকে কমলার ছেলে ডুকরে ওঠে। এবারে চলবে কিছুক্ষণ। একবার শুরু করলে থামতে চায় না। ছেলেটাকে দেখতে পারে না নীরু। এত কম বয়স অথচ মুখে বুড়োটে ভাব। একটা শয়তানিও যেন লুকিয়ে রয়েছে মুখের মধ্যে। মহী চিৎকার করে ধমকে ওঠে। বাপগিরি ফলাচ্ছে। একবার ফলিয়েছে ছেলের জন্ম দিয়ে। ভালোবাসা না থাকলেই বোধহয় ছেলের মুখ অমন হয়। যত সুন্দরই হোক না কেন শিশুর সেই সারল্য থাকে না। নীরু ভাবে, মানিক আর ক'দিন পরে বুড়ো হবে, তবু তার মুখখানা কী সরল। এখন দেখতে সত্যিই মহাদেব। সেদিন দল বেঁধে এসেছিল ভিক্ষা চাইতে। পায়ে লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছা হয়েছিল। ও যে কোন্ মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য সন্ন্যাসী হয়েছে কে জানে হয়তো পরকালের কথাই বেশি ভাবে।

হেমলতার কষ্ট ভোগ চলতে থাকে। বাড়ির সবাইকে সুখেনের মায়ের হাতের রান্নাই খেতে হয়ে। অবাক হয় সবাই। গোপাল মুখুজ্জের মন খারাপ। তবু সে একবার বলে যে, এবার থেকে সুখেনের মা মাঝে মাঝে রান্না করবে। নীরু তো খেয়ে থ।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়েছে বাড়ির সবার। ঠিক তখন হেমলতার উঁ আঁ্যা থিতিয়ে আসে। গোপাল অস্থির হয়। সে যেতে পারে না আঁতুড় ঘরের সামনে—যেতে নেই। তাছাড়া কমলা দাঁড়িয়ে রয়েছে একেবারে সামনে কিছু জিজ্ঞাসাও করা যায় না। আর তখনই ভাসুরের উপস্থিতি দেখেও কমলা হাসিমুখে ছুটলো ঘরের দিকে। তার হাসি দেখতে পেল না ঘোমটার জন্য। সে বলে—কী হলো বে মহী? কী হলো?

মহী সেখানে দাঁড়িয়ে কমলার কথা জিজ্ঞাসা করেই চেঁচিয়ে ওঠে—শাঁখ নিতে এসেছে—বাজাবে।

—এ্যাঁ শাঁখ। কেন কেন? তার মানে—

দাই চেঁচিয়ে ওঠে—পুত্র সন্তান হয়েছে গো বাবু। কী নাদুস-নুদুস বাবুটি আমার।

গোপাল মুখুজ্জের দু'হাত তুলে ধেই ধেই করে নাচতে ইচ্ছে হয়। সে গিয়ে দেখতে পারে না। অথচ না দেখেও স্থির হতে পারে না।

কমলা এসে শাঁখ বাজাতে থাকে। আশেপাশের বাড়ির মহিলারা আসতে শুরু করে। গোপাল তার ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। ছেলে হয়েছে—নাদুস-নুদুস। বাবুটি আমার। গোপালের মনে হয় তার হৃদপিণ্ড যেন তরল হয়ে সদ্যোজাত শিশুর মাথার ওপর আশীর্বাদের মতো ঝরে পড়ছে।

কিছুক্ষণ পরে মহী এসে দাঁড়ায় দাদার সামনে। এমন সহজভাবে এই ঘরে কতদিন এসে দাঁড়ায়নি সে।

—কিরে মহী?

—ছেলের রঙ বউদির মতো।

—বলছিস্! কে বললো?

মহীর সঙ্কোচ হয় কমলার নাম বলতে। বলে—ওরা সবাই বলাবলি করছে, শুনতে পেলাম যাক, এবারে আমি একটু চড়ক দেখতে যাব ভাবছি। সকাল থেকে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ যা। ওসব দেখেও পুণ্য। আজ একটা পুণ্যের দিন।

—ভালো দিনে হয়েছে।

গোপালের এতক্ষণে খেয়াল হয় একদিন পরে জন্মালে তার পুত্রের জন্ম তারিখ হতো ১লা বৈশাখ। তা হোক চৈত্র মাস হলেও পুণ্য দিবস। পাঁজি দেখে ঠিকুজি তৈরি করতে দিতে হবে।

নীরু ভাবে কাল মানিক এসে দেখে খুব আনন্দ পাবে। শত হলেও বাড়ির বড়-বউ মনমরা হয়ে থাকলে কারও ভালো লাগে না। আজ নীরুর বারবার শুধু মানিকের কথাই মনে হয়। অথচ কয়েক মাস

আগেও তার চিন্তার মধ্যে মানিকের স্থান ছিল না বললেই হয়।

সুখেনের মা দুপুরের খাওয়া-দাওয়া মিটতেই আবার রাতের আয়োজন শুরু করে দেয়। বয়স হলেও একেবারে অসমর্থ নয় সে, প্রমাণ করে দিয়েছে আজ। সবাই তাকে নতুন করে আবিষ্কার করলো। নতুন খোকার সঙ্গে সঙ্গে নতুন এক সুখেনের মা ভূমিষ্ঠ হলো এ-বাড়িতে। গর্ব করার বয়স নেই আর, কিন্তু পরিতৃপ্ত হওয়ার বয়সের তো সীমা-পরিসীমা নেই। সে আজ পরিতৃপ্ত। নতুন বধূ রেঁধে খাওয়ালে যদি সুখ্যাতি পায় তাহলে যেমন পরিতৃপ্তি হয়, অনেকটা সেইরকম। তাই আবার সে কাজে নেমে পড়েছে। এখন থেকেই মাথার মধ্যে ঘুরঘুর করছে কোন্ ব্যঞ্জন রাঁধবে। কিসের সঙ্গে কী মিশিয়ে কোন্ মশলা দিয়ে রাঁধবে, এই চিন্তা যে স্ত্রীলোক না করে সে জীবনে কখনো কাউকে খাইয়ে আনন্দ দিতে পারবে না। প্রতিদিনের রান্নার পেছনে অনেকখানি চিন্তার প্রয়োজন হয়। সুখেনের মা ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে থাকে কবে কোথায় কোন্ জিনিস খেয়েছে বা রেঁধেছে।

বিকেলের দিকে সারা পাড়ায় নতুন অতিথির আগমনবার্তা রটে যায়। তবু এক সময় মহিলাদের আগমন বন্ধ হয়। গোপাল মুখুজ্জে অতি সঙ্কোচে গিয়ে দাইকে বলে—

—সব ঠিক আছে তো?

—হ্যাঁ।

দাই বুঝতে পারে বাবুর ছেলে দেখার সখ হয়েছে। হেসে বলে—ছেলের মুখ কি এমনি এমনি দেখতে হয়?

গোপাল হাতের মুঠো খুলে একটা মোহর দাই-এর হাতে ফেলে বলে—এইটি হলো ছেলের মুখ দেখা। আর এইটি তোমার। আঁতুড় না তোলা অবধি তোমায় থাকতে হবে।

মোহর প্রত্যাশা করেনি দাই, তবু বলে—

—আমার যদি ডাক আসে? শোভাবাজারে এক বাড়ি থেকে দু-এক দিনের মধ্যেই বোধহয় ডাক আসবে।

—বেশ। তখন গিয়ে আবার চলে এসো।

দাই হেসে স্বীকৃতি জানিয়ে ছেলেকে তুলে ধরে গোপাল মুখুজ্জের সামনে। ছেলের মুখ বিরক্তিতে ভরে যায়। সে চেঁচিয়ে ওঠে গম্ভীর কণ্ঠে।

—দেখছেন বাবু, কী গলা! খুব পেরতাপ হবে দেখে নেবেন।

গোপাল মুখুজ্জে তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকে। তারপরেই ছেলে কাঁদতে থাকায় বলে—আহা! কষ্ট হচ্ছে। শুইয়ে দাও।

—না বাবু, যত কাঁদবে ততই ভালো। এ তো আর ব্যামোর কান্না নয়। কাঁদলে গায়ে গতরে বেড়ে উঠবে।

কমলা দূরে দাঁড়িয়েছিল। গোপাল তাড়াতাড়ি সরে যায়। ওদের এখন কত কাজ। সে পুরুষ মানুষ হয়ে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে সম্মান রাখা যায় না। আজ গোপালের মন সবার ওপরই প্রসন্ন। মহীর ছেলেটাকে সে কখনো আদর করেছে কিনা মনে পড়ে না। আজ দু-একবার কোলে তুলে নিয়ে আদর করেছে। দুই ভাই একসঙ্গে পাঠশালায় যাবে সেই স্বপ্নও দেখে ফেলেছে। সে নিজে যখন পাঠশালায় যেত একা একা তখন একজন সঙ্গীর অভাব বেশি অনুভূত করতো। মহী বয়সে বেশি ছোট। তাছাড়া ক'দিনই বা পাঠশালায় গিয়েছিল। নিজের নামটা বোধহয় কোনোরকমে লিখতে জানে।

মহী চড়ক দেখতে গিয়েছে। গোপাল মুখুজ্জে মনে মনে ঠিক করে, আজ সে রাতেও মহীর সঙ্গে যাবে। কালকে মহীকে পাঠাতে হবে পেয়ারাবাগানে। জামাই হিসাবে এটা তার কর্তব্য। মানিককেও পাঠানো চলত। কিন্তু মানিক কতদিনে সুস্থ-স্বাভাবিক হবে কে জানে? আজ যদি চড়কে ঘোরে পিঠে-বিঁধিয়ে তাহলে বেশ কিছুদিন লেগে যাবে। মানিককে সে প্রথমেই একদিন মানা করেছিল। ওর

রকম-সকম দেখে মনে হয়েছে শুনবে না। ভীষণ নাকি মানত রয়েছে। অথচ সংসার বলতে তার কিছু নেই। এই বয়সে নতুন করে সংসার পাতাও তার পক্ষে বলতে গেলে অসম্ভব। তাছাড়া এ-বাড়ির এই শুভ সংবাদ ভৃত্যের মারফত শ্বশুরবাড়ি পাঠানো শোভন হবে না। মহীই উপযুক্ত ব্যক্তি। গোপাল ভাবে, তার শ্বশুরবাড়ি যদি মহীর শ্বশুরবাড়ির মতো হতো তাহলে সে নিজেই যেত। কিন্তু সেই বারো ভূতের বাড়িতে একটুও যেতে ইচ্ছে করে না।

মহীর জন্য অপেক্ষা করে গোপাল মুখুজ্জে। কিন্তু ভাই আর আসে না। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ গড়িয়ে যায়। খাওয়ার সময় হয়। সুখেনের মা রান্নাবান্না করে প্রস্তুত। কিন্তু মহীর অপেক্ষায় বাড়ির কর্তা বসে রয়েছে, তাকেও বসে থাকতে হয়। নীরুর এসব কথা ভাবার সময় নেই। আজ ক্ষিধের কথাও মনে নেই তার। এমনকি সন্ধ্যা হতে না হতেই সদ্যোজাত শিশুর কথাও সে ভুলে যায়। অথচ সর্বক্ষণ বসে রয়েছে সেই নবনির্মিত ছোট্ট ঘরটির সামনে বড-বউয়ের সুবিধে অসুবিধে দেখার জন্য। সে ভাবছে মানিকের কথা। এতক্ষণে তার গাজনের সন্ন্যাসী থাকার মেয়াদ ফুরিয়েছে। এবারে সে সভ্যভব্য বাবুটি হবে। তবে আজকে আসবে বলে মনে হয় না। যে দলটির পাণ্ডা হয়ে এতদিন ছিল, তাদের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করবে নিশ্চয়। পেট-ভরে একটু এটা-ওটা খাওয়া দাওয়া। তারপরে কাল গুটি গুটি এসে উপস্থিত হবে। সে কি আর পিঠ-বিঁধিয়ে চড়কে উঠবে? বিশ্বাস হয় না। পরের বাড়ির কাজ করে সেটা সম্ভব নয়। তাছাড়া সবাই মানা করেছে।

গোপাল মুখুজ্জে অধৈর্য হয়ে ওঠে. বেশ রাত হয়। পাড়া নিঝুম হয়ে আসে। গঙ্গা থেকে মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া এসে জানালা দরজাকে নড়িয়ে দিচ্ছে। আর অপেক্ষা করা চলে না মহীর জন্য। কিন্তু সে গেল কোথায়?

গোপাল মুখুজ্জে ছাড়া আর সবাই বুঝতে পারে। দু'দিন একটু সংযত থেকে মহী আবার তার পুরোনো পথেই ফিরে গিয়েছে। হেমলতা নীরুর মুখে শুনে ভাবে অন্তত কয়েকটা দিন সভ্যভব্য হয়ে থাকলেও পারত। এখন কে এসব চেপে-চুপে রাখবে। আজই তো জেনে যাবে তার স্বামী।

কমলার চিন্তাও হেমলতার চিত্ত থেকে অভিন্ন নয়। তাছাড়া রাত্রে একটা মানুষ থাকতো। ঘুমের মধ্যে ইংরিজির মতো কী সব উচ্চারণ করতো। শুনতে ভালই লাগত কমলার। এমন মুখ্যুসুখ্যু স্বামীও ইংরিজির মতো কথা বলে। গত জন্মে সাহেব ছিল কিনা কে জানে?

গোপাল মুখুজ্জে খাওয়া দাওয়া সেরে কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করলো। তারপর ঘোষেদের বাড়ির পঞ্চাননকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে খোঁজ করতে বার হবে ঠিক করলো। কমলা সেই খবর পেয়ে হেমলতার কাছে ছুটে এসে বলে—ওঁকে মানা কর দিদি। তোমার দেওর কোথায় আছে সে তো জানোই। রাত-বেরাতে বার হয়ে আবার একটা অমঙ্গল ডেকে এনে কি হবে? রাস্তাঘাটে তো খুন জখমের কামাই নেই।

নীরুকে দিয়ে স্বামীর কাছে খবর পাঠায় হেমলতা। গোপাল দরজার সামনে এসে দাঁড়ালে সে বলে—এত রাতে বেরুচ্ছ নাকি?

—কি করব? পেট ভরে খেয়ে দেয়ে ঘুম হবে এখন? ওর কি হলো দেখতে হবে না?

—তোমাকে বাইরে যেতে হবে না।

—ছোঁড়াটা যে নেশা-ভাঙ করে জানি। কিন্তু বউমার মুখ চেয়ে না বেরিয়ে উপায় নেই।

—তোমার বউমাই মানা করছে।

—কেন?

—মাঝে মাঝে মহী বাড়ির বাইরে কাটিয়ে আসে রাতের বেলায়।

—তার মানে? আমি তো জানি না? কোথায় কাটায়?

—ওর এক বন্ধুর বাড়ি। দু'জনের একই নেশা।

হেমলতা বোধহয় জীবনে প্রথম মিথ্যা কথা বললো স্বামীর কাছে এমন স্পষ্ট করে। মনে মনে তার বড় কষ্ট হয়। সে ভাবে সত্যি বলা কত সহজ, সত্যি বলায় কি সুখ।

—তুমি ঠিক বলছ?

—হ্যাঁ। তুমি নিশ্চিন্ত হও।

গোপাল নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে। নীরু একবার ভেবেছিল, হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবে। তারপরে সামলে নেয়। শত হলেও আজ বাড়িতে কত আনন্দ—দিনটিও কী শুভ। এর মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করা ঠিক নয়। সে ভাবে বশীকরণ কবচে বোধহয় কোনো গলদ ছিল। কিংবা কমলা নিশ্চয় অপবিত্র অবস্থায় ওটি ছুঁয়েছে। নইলে এমন তো হবার কথা নয়। সে নিজেও একটা নিয়ে রেখেছে কাছে।

সুখেনের মায়ের রান্না রাতেও ভালো হয়েছিল। কিন্তু মহী সব কিছু মাটি করে দিয়েছে। কেউ আর স্বাদ করে খেতে পারেনি। শুধু দাই খেতে বসে বলে, মোচার ঘণ্ট বড় সুন্দর করেছ তো দিদি। কী মশলা দাও এতে?

সুখেনের মা হেসে বলে—মশলা সবাই একই দেয় ভাই। কিন্তু ঘি খরচা করার ক্ষ্যামতা সবার সমান থাকে না।

—ঠিকই বলেছ।

নীরু নীরবে খেয়ে নেয়। আজ রাতটা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে পারলেই ভোরে সূর্য উঠবে। আর সেই ভোরে এক মাসের সংযমে ক্ষীণ দেহ নিয়ে মানিক এসে ঢুকবে বাড়িতে। হেমলতার ঘরের সামনে একটা পাটি বিছিয়ে গা এলিয়ে দেয় নীরু। দাই ভেতরেই শুয়েছে। প্রদীপ সারা রাত জ্বলবে। রোজই জ্বলবে। আঁতুড় ঘর রাতের বেলায় অন্ধকার রাখতে নেই। ডান পাশ ফিরে শুয়ে নীরু আকাশের একটা অংশ দেখতে পায়। একটু মেঘলা মেঘলা মনে হয় আকাশটা। গঙ্গার হাওয়া ছুটে এসে তার গায়ের কাপড়কে যতটুকু পারে ফুলিয়ে দিচ্ছে।

একটু নিদ্রা এসেছিল কি আসেনি—সেই সময় বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ। কে এলো আবার? নীরুকেই উঠতে হয়। হেমলতা জেগে আছে। নীরুকে দরজা খুলতে বলে। কমলা বাইরে আসে। কড়া নাড়ার ধরন সে চিনেছে—মানুষটাকে যদিও সে চিনতে চায়নি। সেই প্রবৃত্তিও হয়নি কখনো।

মহী নীরুকে দেখেই বলে ওঠে—সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে?

—না।

—দাদা শুয়ে পড়েছে?

—এই তো শুতে গেলেন।

মহী বুঝতে পারে না কী করবে! একটা দুঃসংবাদ ছিল। কিন্তু সেটা কি আজকের দিনে দাদা বউদিকে জানানো উচিত। না জানালেও তার এত রাত করে ফেরার কৈফিয়ৎ কি?

—দাদা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন?

—হ্যাঁ। খুঁজতে বার হচ্ছিলেন। বড়-বউদি মানা করায় শুতে গেলেন। কমলা ঠোঁট কামড়ে ধরে দাঁত দিয়ে। নীরু যেই হোক, ঝি ছাড়া তো কিছু নয়। তার সঙ্গে এতক্ষণ ফিস্‌ফিস্ করার কি দরকার? তাকে না হোক, হেমলতার কাছে গিয়ে কথা বললেও তো পারে মহী।

মহী ভাবে, কমলাকে কথাটা বলা যেতে পারে। সে ছাড়া বাড়িতে আর কাউকে এত রাতে বলা বোধহয় উচিত হবে না। তবে নীরুকেও জানানো ভালো।

—কমলা কোথায়?

—ওই তো দাঁড়িয়ে।

—ওকেই বলি। একটা দুঃসংবাদ আছে।

এতক্ষণে নীরুর ভেতরে একটা আলোড়ন শুরু হয়। বুকের ভেতরে ধুক্‌ধুক্ করে। সে

বলে—আমাকে বলুন।

—তুমি চলো আমার সঙ্গে। শুনতে পাবে।

নীরু নির্লজ্জের মতো স্বামী-স্ত্রীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কমলা ভাবে, এ আবার কি? দু'জনা মিলে আবার কী পরামর্শ করে এলো? সে নীরুকে বলে—কিছু বলবে?

—না, শুনব। ছোটবাবু দুঃসংবাদ এনেছেন।

—সে কথা আমার কাছেই শোনো।

মহী বলে—না, ও থাকুক।

কমলার চোখ মুহূর্তের জন্যে জ্বলে ওঠে। সে বলে—তাহলে নীরুকে বলো। আমি পরে ওর কাছ থেকে শুনে নেব।

মহী বলে—আমি কি আজ নেশা করেছি বলে মনে হচ্ছে কমলা?

--জানি না।

—নেশা করিনি। আমার দেরি হলো, মড়ার ব্যবস্থা করতে। দাহ শেষ করেই আসতাম। কিন্তু আজকের দিন বলেই আসতে হলো আগে।

—তুমি সত্যিই নেশা করোনি।

—নেশা করলে, এত ব্যবস্থা করতে পারতাম না। মানিক আমাদের কেউ নয়। বাড়িতে কাজ করে শুধু।

নীরু চেঁচিয়ে ওঠে—কে?

কমলা ও মহী উভয়েই নীরুর বিস্ফারিত চোখের দিকে চেয়ে ভাবে, ওদের ধরনই অমন। উত্তেজনার গন্ধ পেলেই আর রক্ষা নেই।

কমলা বলে—কার দেহ সৎকারের ব্যবস্থা করলে? মানিকের আত্মীয় আছে নাকি?

—না, আত্মীয় নয়, মানিক নিজেই, চড়ক থেকে পড়ে ছাতু ছাতু হয়ে গিয়েছে।

কমলা চমকে উঠেই দেখে নীরু অচেতন অবস্থায় সশব্দে পড়ে যায় মেঝের ওপরে।

হেমলতা ক্ষীণ কণ্ঠে বলে—কেউ পড়ে গেল নাকি!

কমলা মহীর প্রতি জীবনে প্রথম আবার অনুকম্পা অনুভব করে। লোকটা আজ সত্যিই নেশা করেনি। বরং একটা বড় রকমের দায়িত্ব পালন করেছে। নীরুর পতনকে সে প্রাধান্য দেয় না। একটু পরে ওর এমনিতেই চেতনা হবে।

স্বামীকে কমলা বলে—দিদিকে এ খবর না দেওয়াই ভালো। তবে বড় ঠাকুরকে বলতে হবে। উনি খুব রেগে আছেন। ওঁর ধারণা হয়েছে তুমি নেশা করে কোথাও পড়ে আছ।

মহী কমলার ব্যবহারে একটু অবাক। ঠিক অন্য সবার বউয়ের মতো কথা বললো আজ। ভাবছে, সে বুঝি ভালো হয়ে গেল। আরে বাবা, অত সহজ নয়। স্বয়ং শিবই নেশা ছাড়তে পারলেন না। পেট কেঁপে উঠলে মা দুর্গা সামলাতে পারতেন? তাই তো স্বামীকে নেশা-ভাঙ করার স্বাধীনতা দিয়ে মুখ বুজে থাকেন।

দাদার ঘরের দিকে এগিয়ে যায় মহী। আজ সে অনেক রাত করে বাড়ি ফিরেও মাথা উঁচু করে দাদার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ায়। তার চোখের সামনে মানিকের রক্তাক্ত দেহটা মাঝে মাঝে ভেসে উঠতে থাকে। নিমতলার কাছে মানিকের দলকে রেখে সে থেমে গিয়েছিল। চূড়ান্ত নেশা করেছিল মানিক আজকে। ও জিভে বা পিঠে লোহার শলাকা বিঁধিয়ে কিছু করেনি। অন্যের বাড়ি কাজ করে বলে সবাই মানা করেছিল। মহীকে দেখে মানিক প্রথমটা চিনতেই পারেনি এত নেশা করেছিল। তারপর মহী তার দাদার পুত্রসন্তান হবার সংবাদ দিলে হেসে উঠেছিল। বলেছিল,—এটাই সংসারের নিয়ম। আসে আর যায়—যায় আর আসে। ভগবানের কী লীলাখেলা!

এরপর মানিক পিঠে কাপড় বেঁধে চড়কে ঘুরতে ওঠে। মহী সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে! অতি কষ্টে সে গাঁজার কলকেতে টান দেবার প্রলোভন ঠেকিয়ে রাখে। কারণ জানে, বাড়িতে আজ ফিরতেই হবে। নইলে জীবনে আর কখনো ও বাড়িতে ঢুকতে পারবে না। আর আজকে বাড়িতে ফিরে চোরের মতো নিজের ঘরে গিয়ে আত্মগোপন করার সুযোগ নেই। দাদার সম্মুখীন হতেই হবে আজ।

খুব জোরে ঘুরছিল মানিক। ওকে প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না। হঠাৎ "হায় হায়" শব্দ। মহী দেখে মানিক যেন উড়তে উড়তে চলেছে চড়ক ছেড়ে। তারপর দূরে গঙ্গার ধারে যেখানে আস্‌শ্যাওড়ার গাছের কাছে একটা নতুন ঘাট তৈরি হচ্ছিল চুন-সুরকি দিয়ে—সেই শক্ত জায়গায় ঠাস্ করে গিয়ে পড়লো। সবাই ছুটে গেল সেইদিকে। মানিকের দেহটা কয়েকবার অদ্ভুতভাবে মোচড় দিল। তারপর থরথর করে একটু কেঁপেই থেমে গেল। মহী দেখলো, মানিকের দেহটা ধীরে ধীরে রক্তাক্ত হয়ে উঠলো। শেষে তার দেহ থেকে রক্তের স্রোত নতুন তৈরি ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে গঙ্গার জলের সঙ্গে মেশার জন্য চলতে লাগলো। বেচারা নিশ্চয় পুণ্যবান ছিল। ধর্মের জন্য প্রাণ দেওয়া তো আর অপঘাত নয়। তাই গঙ্গার জলে গিয়ে ওর রক্ত মিশতে চাইল। ওর নিশ্চয় অক্ষয় স্বর্গবাস হবে। ভালই হবে শিব ঠাকুরের সঙ্গে গাঁজা খেয়ে খেয়ে ঘুরতে পারবে।

কলকাতা শহরের আবহাওয়া হঠাৎ সাহেবদের প্রতি ঘৃণায় বিষিয়ে উঠলো। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড শোকে শহরবাসীর মন অভিভূত হলো। দুঃখ গোপাল মুখুজ্জে বা রামরতন চক্রবর্তীদেরও হয়েছিল। কিন্তু রাস্তাঘাটে কিছুদিন ধরে সবার কাছে কটূক্তি শুনে হজম করতে হলো তাদের। কারণ তারা হলো সাহেবদের কাছেই মানুষ।

ওয়ারেন হেস্টিংস আর জেনারেল ক্লেভারিং-এর দ্বন্দ্বকে উপলক্ষ করে ইতিমধ্যে কয়েকটা ডুয়েল হয়ে গিয়েছে। লর্ড মারা না গেলেও গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছে কয়েকজন। এই ডুয়েল লড়াইও এদেশের লোক প্রথম জানলো। আগে নাকি সাহেবরা মানসিংহ আর ঈশা খাঁয়ের মতো তলোয়ারের লড়াই করতো। এখন করে গুলির লড়াই।

হেস্টিংস গভর্ণর-জেনারেল হয়েও নিজে ফ্রান্সিসের সঙ্গে ডুয়েল লড়লো একদিন। সব কিছুর মূল কারণ জেনারেল ক্লেভারিং কাউন্সিলের মূল সদস্য আর প্রধান সেনাপতি বলে হেস্টিংসকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইছিল। পরে অবশ্য সে ব্যর্থ হয়। তবু কলকাতার মানুষেরা রোজই সকালে উঠে ভাবত ক্লেভারিং বোধহয় হেস্টিংসকে হটিয়ে দিয়েছে রাতের মধ্যে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্লেভারিং ব্যর্থ হয় এবং গোটা বিষয়টা সুপ্রিম কোর্ট মীমাংসা করে দেয়। হেস্টিংস তার নিজ-পদে বহাল থাকে। ক্লেভারিংও এটা মেনে নেয়। কিন্তু ওদের ঝগড়ার ফল গড়াতে গড়াতে এসে যে মহারাজ নন্দকুমারকে স্পর্শ করবে কেউ কল্পনা করতে পারেনি। মহারাজের অপরাধ, তিনি ক্লেভারিংকে সমর্থন করতেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা। প্রধান বিচারপতি এলিজা ইম্পে নিজেকে তো একেবারে নিরপেক্ষ বলে জাহির করার চেষ্টা করে সব সময়, কিন্তু এই মামলায় প্রমাণ হয়ে গিয়েছে সে প্রথম থেকেই মহারাজের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। কারণ সে নিজে হেস্টিংসের সমর্থক। এলিজা ইম্পে জুরিদের প্রভাবিত করে মহারাজকে দোষী প্রমাণিত করে। কিন্তু তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া দেখে জুরিরাও স্তব্ধ। তারা অনুভব করে—লোকটা আদৌ দোষী কিনা সেই বিষয়ে যখন সন্দেহ আছে তখন এত বড় দণ্ড দেওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু দণ্ডদান প্রধান বিচারপতির হাতে—জুরিরা অসহায়।

ফাঁসির দিনে কলকাতাবাসীর অধিকাংশের গৃহে ছিল অরন্ধন। অনেকে এই পাপের স্পর্শ এড়াতে শহর ছেড়ে দলে দলে বাইরে চলে যায় দু' একদিনের জন্য। পঞ্চানন ঘোষ গোপাল মুখুজ্জেকে গঙ্গার ঘাটে দেখে থু থু করে থুথু ফেলে জলে। যেন গোপাল মুখুজ্জেই মহারাজকে ফাঁসি দিয়েছে।

গোপাল বলে, মা গঙ্গা কত অপবিত্র জিনিসকে পবিত্র করে দেন। আপনার অতটুকু থুথু কী করবে পঞ্চানন দাদা?

—ঠিক বলেছ। কিন্তু অস্পৃশ্য গঙ্গাস্নানের পরেও অস্পৃশ্যই থেকে যায়। তাকে গঙ্গাস্নাত বলে জড়িয়ে ধরতে পারো না ভাই। তাই থুথু ফেললাম।

—হ্যাঁ। ওই করেই ধর্মটা গেল। এমনিতেই কি আর সাহেবরা হাসাহাসি করে?

—থুঃ থুঃ। এখনো আছেন সাহেব—

—আজ্ঞে হ্যাঁ পঞ্চাননদা। তবু সাহেব সাহেব করতেই হবে? আপনিও করবেন।

—আমি?

—হ্যাঁ, পঞ্চাননদাদা। ওরা কত বড় জাত, এখনো জানেন না। কীভাবে থাকে একবার দেখে আসবেন। আপনাদের মীরজাফরও ওভাবে থাকেননি। আপনারা মীরজাফর আর মীরকাশিমকে দেখেছেন—সাহেবদের সবাই দেখি নবাব।

পঞ্চানন দুই কানে তর্জনী ঢুকিয়ে ভুস্ ভুস্ করে ক্রমাগত ডুব দিতে থাকে। আসলে কিন্তু গোপাল মুখুজ্জে মিথ্যে কথা বলেনি। সাহেবরা যেভাবে খরচা করে বিশ্বাস করা কঠিন। রামরতন বলেছিল, ওরা নিজেদের মধ্যেই এই নিয়ে আলোচনা করে। বিলেতের ধনীরাও নাকি এভাবে থাকার কথা কল্পনা করতে পারে না। ওখান থেকে যারা এ-দেশে চাঁদপাল ঘাটে প্রথম এসে অবতীর্ণ হয় তাদের বিস্ময় বিহ্বল মুখ দেখেও কিছুটা অনুমান করা যায়। তারপর কিছুদিনের মধ্যে তারাও বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। না দিয়ে উপায় নেই তাদের। এদেশী সাহেবদের সমাজে স্থান পেতে হলে অনেক টাকার প্রয়োজন। সেই টাকা তারা নিজেদের যোগ্যতায় উপার্জন করতে পারে তো ভালই, নইলে চড়া সুদে বাঙালী বেনিয়াদের কাজ থেকে ধার করতে হয়। সেই ধার চক্রবৃদ্ধি হারে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছয় যে তা শোধ করার জন্যে তাদের অনেকেই আর জীবনে দেশে ফিরে যেতে পারে না। অনেকে অন্য জাহাজে করে পালায়। কেউ কেউ ফরাসীদের ভূমি চন্দননগরে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। আবার কেউ কেউ করে আত্মহত্যা। গোপাল মুখুজ্জে মনে মনে বাঙালীর বুদ্ধির তারিফ করে। যদি সঠিক বিচারের ব্যবস্থা থাকে, তাহলে বাঙালী বুদ্ধি হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। যদি গায়ের জোরের প্রশ্ন না থাকে যদি ফিঁচলেমি করেও সাহেবদের কোর্টে গিয়ে আত্মরক্ষা করা যায়, নবাবদের কাজীর বিচারের ভয় না থাকে, যদি সাহেবদের মতো অধিকাংশ মানুষ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এবং কিছুটা বিবেকবান হয়ে ধারের টাকা শোধ দিয়ে চলে, তাহলে বাঙালী জাতি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ হতে পারে।

সাহেবদের মধ্যে আবার এমন সব ছন্নছাড়া মানুষ রয়েছে যাদের বলা চলে বিবেকের বিবেক। তারা এত সুন্দর বিচার ব্যবস্থার মধ্যেও ফাঁকি আর অসাধুতার সন্ধান করে বেড়ায়। আর এতটুকু আঁচ পেলেই ক্ষেপে ওঠে। এই রকম একজন হলো আর এক হিকি সাহেব। এই দ্বিতীয় হিকি সাহেবের সন্ধান প্রথম পেয়েছে গোপাল হিদারাম ব্যানার্জির কাছে। লোকটা কোনো সাহেবের কীর্তি ফাঁস করে দেবার জন্য হিদারাম ব্যানার্জির বাড়িতে দু'চার দিন ঘোরাঘুরি করেছিল। এই হিকি সাহেব অধিকাংশ সময় কাটায় কারাগারে। কারণ তার একটা পত্রিকা আছে। সেই পত্রিকায় সাহেব পাড়ার যত কেচ্ছা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ছাপানো হয়। সেই কেচ্ছা থেকে স্বয়ং হেস্টিংসও বাদ যায় না। ফলে কথায় কথায় মামলা, আর কথায় কথায় কারাগার। তবু হয়তো কারাগারে যেন না যদি সুপ্রিম কোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কিছুটা সভ্যভব্য হয়ে থাকত। কিন্তু লোকটা অদ্ভুত ধাতের। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে প্রথমে নিজের পক্ষের অ্যাটর্নির বাপ-মা তুলে গালাগালি দিলে ইচ্ছা করে। তারপরে বিচারপতিকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি। এ ধরনের মানুষ কতদিন আর স্বাধীনভাবে দিন কাটাতে পারে? সাহেব বলে নন্দকুমারের মতো ফাঁসি হয়ে যায়নি এতদিনে।

নীরুর স্তব্ধতা প্রথমে নজরে না পড়লেও, আস্তে আস্তে সবাই বুঝতে পারে। এমন প্রাণ-চঞ্চল স্ত্রীলোকটির হলো কি? কী যে হলো, একমাত্র সুখেনের মা কিছুটা অনুমান করতে পারে। কিন্তু তার মুখ

বন্ধ। পেটের মধ্যে সব সময় বুদ্বুদ উঠছে, কিন্তু বলে কি করে? শত হলেও সে-ই যত নষ্টের গোড়া। নীরু বেচারার মনে যদি সত্যিই মানিক আসন জাঁকিয়ে বসে, তবে সেটা তারই জন্য। কিন্তু সুখেনের মা দিব্যি করে বলতে পারে, দু'জনের ভালোই চেয়েছিল সে। কী হবে সারা জীবন পরের বাড়িতে বাঁদিগিরি করে? কিন্তু নীরু বেচারার কপালই মন্দ। নইলে অমন অপঘাতে মরে মানিক? বেচারার বড় পছন্দ ছিল নীরুকে। বলতে সাহস পেত না। মুর্শিদাবাদে বাড়ি ছিল। ছোটবেলায় বিয়েও করেছিল একটা। সেই বউ বাপের বাড়ি থাকার সময় তার বাবা নবাবী সৈন্যের সঙ্গে চলে আসে এখানে। তাকেও সঙ্গে নিয়ে আসে। চোদ্দ বছর মাত্র বয়স ছিল। তারপর আর দেশে ফেরা হয়নি। সেই বউ কি আর আছে? তাই নতুন করে বিয়ের সাধ হয়েছিল। নীরুরও মন নিশ্চয় টলেছিল। নইলে এত মনমরা কেন? কিন্তু সে কথা তো বউদের বলা যায় না।

কমলাও মাঝে মাঝে মানিকের কথা ভাবে। সে নাকি দুটো মানত করেছিল। কমলাকে বলেছিল, বড় কঠিন। তার মৃত্যুও হতে পারে। সেইজন্যই কি লোকটা মরলো? বুঝতে পারে না কমলা। গুরুত্বও দিতে চায় না। কারণ এই পৃথিবীতে সংসারের রস আনন্দ ভোগ করার আর কোনো পথ নেই তার। কী হবে মানিকের কথা ভেবে?

হেমলতা কিন্তু অহরহই ভাবে। তার ছেলের জন্মের দিনে মৃত্যু হলো মানিকের। সে যেন পথ পরিষ্কার করে দিয়ে গেল। তাই একদিন অতি সঙ্কুচিতভাবে স্বামীকে বলে—মায়ের পিণ্ডির ব্যবস্থা করলে হয় না?

গোপাল ভ্রূ কুঁচকে বলে—হঠাৎ?

—না। এমনিতেই বলছি। সেই সঙ্গে আরও কয়েকজনের পিণ্ডি দেওয়া যেত তাহলে। এখন তো তুমি ধনী। তোমার গয়ায় লোক পাঠানোর ক্ষমতা আছে। তোমার মানও বাড়বে।

গোপাল একটু ভেবে নিয়ে বলে—মন্দ বলোনি।

হেমলতা হেসে বলে—হ্যাঁ। সেই সঙ্গে মানিকেরও একটা পিণ্ডি দিয়ে দিও।

—সে আবার কি? মানিক আমাদের কে?

—বুঝছো না? চুণীর জন্মদিনেই তো অমন ঘটলো। তোমার একটা কর্তব্য আছে।

স্ত্রীর মুখের ভাষাতে না বুঝলেও চোখের ভাষাতে বুঝলো গোপাল।

—দেখি। কাকে পাঠাবো ঠিক করতে হবে। তাছাড়া মানিকের জাত-গোত্রও তো দরকার।

—কিছুর দরকার হয় না। আমার দাদামশায় পাঠিয়েছিলেন। পাণ্ডারাই ব্যবস্থা করে দেয়। লোকে কত অনাত্মীয়ের পিণ্ডি দিয়ে আসে।

নীরু এই পিণ্ডিদানের কথা শোনে। রান্নাঘরে সুখেনের মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। হেমলতা এখন রান্নার ভার অনেকটাই সুখেনের মায়ের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। ছেলে চুণীকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে সে। ছেলের পাশে কমলার ছেলে অদ্বৈতকে বসিয়ে বক্‌বক্ করতে করতে তুলনা করে নেয় উভয়ের। দেওরের ছেলেটির রঙ বড় কালো। চুণী হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করলেও মনে হয় কত সুন্দর।

কমলা স্পষ্টই বলে ফেলে—অদু তোমার ছেলের খানসামা হবার উপযুক্ত দিদি।

—ছিঃ ছিঃ, ওকথা বলতে নেই ভাই।

—সত্যি কথা বললে ক্ষতি হয় না।

—না। সত্যি হবে কেন? অদু, তোর ছেলে। বিদ্বান হবে দেখিস। ছেলেদের রূপের দরকার হয় নাকি?

কমলা জানে, মেয়েদের যে ধরনের রূপ, সেই ধরনের রূপের দরকার হয়তো হয় না। কিন্তু ছেলেদেরও রূপ আছে—সেই রূপ থেকে জ্যোতি বার হয়—তেজ বার হয়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বুদ্ধি, তৎপরতা প্রভৃতি মিলিয়েই পুরুষের সেই রূপ। তার ছেলে সেই হিসাবেও কুৎসিত। সে বুদ্ধিমান হবে

বলে মনে হয় না—তবে চতুর হবে। এখনই তার লক্ষণ মাঝে মাঝে দেখা যায়। সে বিদ্বান কখনই হবে বলে মনে হয় না। কারণ তাকে লেখাপড়া শেখাবে কে? কমলা নিজে শেখাতে পারে না—কারণ সে সহায় সম্বলহীন। এক হতে পারে, চুণীর সঙ্গে অদুকে পড়ালে, কিছুটা সুযোগ করতে পারবে। দেখা যাক। অন্তত লেখাপড়া শিখিয়ে মায়ের কর্তব্য খানিকটা সম্পন্ন করবে সে। নইলে শুধু পাঠশালায় পাঠালে আর একটা মহী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা।

কমলার মতো হেমলতার মনেও নানা চিন্তার তরঙ্গ ওঠা-নামা করছিল। সে ভাবছিল, কমলা মিথ্যে কথা বলেনি। চুণীকে দেখলে চুমু খেতে ইচ্ছে হয়। অথচ অদুকে কোনোদিনও সে ভালোবেসে চুমু খেতে পারলো না। কেমন যেন বড় বড়। মুখের মধ্যে মিষ্টত্ব নেই। এক আধ সময় আদর করেছে, গাল টিপেছে বটে—সবই কমলাকে দেখিয়ে। নইলে বেচারা কষ্ট পাবে। শত হলেও তারই গর্ভের সন্তান তো বটেই। কমলা কি করেই বা চুণীর মতো মিষ্টি ছেলে আশা করে। সে কি প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারে যে মনে মনে সে সতী? মহী যখন তাকে আঁকড়ে ধরেছে তখন তো সে মনে মনে বিদ্বেষ পোষণ করে আর একটা মুখের কথা ভেবেছে। অমন মায়ের অদুর মতো ছেলেই হয়।

নীরু রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়ালে সুখেনের মা নম্রভাবে প্রশ্ন করে—কি রে? কিছু খাবি নাকি?

—না। শুনেছ গয়ায় পিণ্ডি দেওয়া হবে।

—হ্যাঁ। মানিকেরও হবে।

—তাই বলছি—ভালোই হলো। আমার কি মনে হয় জানো?

সুখেনের মায়ের বুকের ভেতরে ছ্যাঁৎ করে ওঠে—কি?

—মনে হয়, ও আমার ওপর ভর করার জন্যে পাশে পাশে ঘুরে বেড়ায়।

—জয় রাম! না না, সে কি? ও তো পুণ্য করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। এ মরণ তো অপঘাত মরণ নয়? জয় রাম!

—তাহলে ওর পুণ্যাত্মাই বোধহয় স্বর্গে যাওয়ার আগে পৃথিবীর মায়া কাটাতে চেষ্টা করছে।

—কি যে বলিস্! তুই পাগল হলি?

—আমিও তাই ভাবি। অনেক চেষ্টা করে পাগলামি ঠেকিয়ে রেখেছি।

—নাঃ, আমি যাই।

—কোথায়?

—আমার সুখেন মারা গেলেও এমন হতো। সেই কথা মনে পড়ছে। হাত-পা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আমি একটু গিয়ে শুয়ে থাকি।

—না না। তাহলে সবাই জেনে যাবে।

—তাহলে?

—কেউ যেন না জানে। বুঝেছ? তাহলে আমি গঙ্গায় ডুবে মরে তোমার ঘাড় মটকাবো। তুমিই এই কাণ্ড করেছ। বয়স হয়েছে, অথচ শয়তানি যায়নি।

—কি বলছিস নীরু?

—কে তোমাকে রাত্রিদিন কানের কাছে মানিক মানিক করতে বলেছিল।

—ওই মানিকেরই বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল রে ঘর বাঁধার। তোকে বড় পছন্দ ছিল ওর।

—তাতে তোমার কি? কেন আমার মনে আগুন ধরালে?

—ক্ষ্যান্ত দে নীরু—সব ঠিক হয়ে যাবে। পেটের ছেলে না হলে আর অগ্নিসাক্ষী করা স্বামী না হলে রিদয়ে আগুন জ্বলে না। যাকে তুই আগুন বলে ভাবছিস, সেটা আসলে সামান্য তাপ। আগুন কাকে বলে জানিস না তুই। তোর এ-তাপ দু'দিনেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ধিকি ধিকি জ্বলবে না।

সুখেনের মায়ের কথায় কী ছিল, তার মুখে কী ফুটে উঠেছিল কে জানে, নীরু চুপ করে গেল।

—এই নে। হাত পাত দেখি।

—কি?

—নে তো। দুটো বড়া খা।

নীরু হাত পাতে এবং খেয়েও নেয়।

—যা এবার যা। কাজ করতে দে। ঘুরে বেড়া, কথা বল্। ওসব মনের ব্যামো। কিছু না, কিছু না। তুই মানিকের কথা বলে কি করবি? সে তোর কে? তার ওপর তোর কি টান? তোর টান তোর নিজের ওপর। ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিলি—ভেঙে গেল। নিজেকে স্বার্থপর ভাবতে কষ্ট হয় রে মানুষের। তাই ওই সব মনগড়া উল্টোপাল্টা কথা ভেবে নিয়ে দুঃখ কষ্ট করে সুখ পায়। যাঃ পালা এখান থেকে।

নীরু দেখে সুখেনের মা হাসছে। ডাইনি নাকি বুড়ি? নীরুও হেসে ফেলে।

অবশেষে সেই পঞ্চাননই ভরসা। প্রতিবেশী বলতে পঞ্চানন ঘোষ। শত্রু বলতে পঞ্চানন। মিত্র বলতেও ওই পঞ্চাননই। অসময়ে ভরসা পঞ্চানন দাদা।

গঙ্গার ঘাটেই কথাটা বলে ফেলে গোপাল মুখুজ্জে। হেমলতা যখন পিণ্ডি দানের কথাটা তুলেছে তখন পাকাপোক্ত ব্যবস্থা একটা করতেই হয়। সত্যিই তো সম্মানের প্রশ্নও আছে। পাড়ায় রটতে তো এক মুহূর্তও দেরি হবে না।

হ্যাঁ, গোপাল মুখুজ্জে কাজের মতো কাজ করছে বটে।

পঞ্চানন ঘোষ গম্ভীর হয়েই অবগাহন স্নান সেরে নিচ্ছিল। মহারাজ নন্দকুমারের মৃত্যুর পর থেকে গোপাল মুখুজ্জেকে দেখলে সে একটা বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে তার হাব-ভাব কথাবার্তায়। অথচ কয়েকদিন আগে চিৎপুর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক সাহেবের রাজকীয় হাবভাব আর সেই সঙ্গে চিৎপুরের পাশের এক কুঁড়ে ঘরে বিলাপের ধ্বনি শুনে সাহেবের সেই কুটিরে প্রবেশ করে শোকার্তকে সান্ত্বনা দান এবং টাকা দান দেখে তার মনটার অবস্থা দোদুল্যমান। কোনো নবাব তো দূরের কথা নবাবের পেয়াদাদের কাছ থেকেও এ ধরনের ব্যবহার পাওয়া অসম্ভব। তবু গোপালের হু হু করে পয়সা হচ্ছে, আর ঘোষেদের ক্ষীয়মাণ অবস্থা বলে ভাবভঙ্গী একটু অন্য রকম করতেই হয়। এতদিন নবাবদের আনুকূল্যে ঘোষেরা প্রতিবেশী মুখুজ্জেদের প্রতি অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখত। এখন ঠিক বিপরীত—অন্তত পঞ্চানন তাই ভাবে। তবে গোপাল কখনো তাকে অসম্মান করেনি তেমনভাবে। টাকার গরমও দেখায়নি কখনো। ডুব দিতে দিতে আড়চোখে গোপালকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পঞ্চানন বুঝতে পারে নড়বে না গোপাল। তারই জন্য অপেক্ষা করছে। হয়তো আজ কাজের তাড়া নেই তাই একসঙ্গে বাড়ি যাবার ইচ্ছা। নাভি অবধি জলে দাঁড়িয়ে পঞ্চানন গামছা চেপে গা মুছে নেয়। তবু গোপাল দাঁড়িয়ে। তখন পঞ্চানন উঠে না এসে পারে না।

—কি, দাঁড়িয়ে আছ কেন?

—আপনার জন্যেই পঞ্চানন দাদা।

—বেশ, চলো এবার।

—আমার একটা বাসনা জেগেছে মনে। এই বাসনা একবার জাগলে নাকি পূর্ণ করতে হয়।

—বাসনাটা কি?

—পিণ্ডদান। মায়ের, বাবার আরও কয়েকজনের।

—খুব ভালো—খুব ভালো। আমারও মনের মধ্যে উঁকি দেয় ওই বাসনা। কিন্তু সম্ভব তো নয়।

—কেন?

—এ তো নবাব আমল নয়। এখন সাহেবরা এসেছে। তোমরা উঠছো। আমাদের টাকা কোথায়? অত দূরে একা যাওয়া যায় না। খরচা আছে।

—আমার একটা ইচ্ছা ছিল।

—বলে ফেল।

—আমি টাকা দেবো। ভগবানের কৃপায় কিছু টাকা হয়েছে। তাই খরচ-খরচা আমি দিতে পারব। কিন্তু কে যাবে?

—কয়জনের যাবার খরচ দেবে?

—কয়জনের দিলে হবে?

—অন্তত পাঁচজন।

—আপনি যদি যান, একজন ব্রাহ্মণকে নিয়ে তাহলে পাঁচজনের খরচা দিতে আমি রাজি।

এমন সুযোগ পঞ্চাননের কাছে অভাবনীয়। সেও তার আত্মীয়-স্বজনের পিণ্ডদান করে আসতে পারবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলে মুখুজ্জের কাছে মান থাকে না।

তাই বলে—বেশ। একটু ভেবে দেখতে দাও।

গোপাল মুখুজ্জে পঞ্চাননের মুখ দেখেই বুঝতে পারে, সে টোপ গিলেছে। তবু তাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে ভোলে না। যদিও সম্মানটা এমন ভাব দেখায় যাতে আজকালের মধ্যেই পঞ্চানন ঘোষ তার সম্মতির কথা জানিয়ে দেয়।

সে বলে—আপনি আমার গুরুজন-স্থানীয়। ছোট ভাইয়ের এই প্রার্থনা পূর্ণ করতেই হবে। আমার একটা দাবিও তো আছে। নইলে আরও দু' একজন যেতে রাজি হয়েছিল। আপনার অসুবিধা হলে অগত্যা কালই তাদের বলতে হবে। আমাকে বিমুখ করবেন না পঞ্চাননদা।

—ঠিক আছে ঠিক আছে। একটু ভাবতে দাও। আজ মিত্তিরদের মন্দির থেকে ফেরার পথে তোমাকে বলব। তুমি বাড়ি থাকবে তো?

—হ্যাঁ।

পঞ্চানন ভাবে, টাকা যখন হয়েছে মুখুজ্জেদের তখন একটু খসাতে আপত্তি কি? যে কয়মাস দেশে থাকবে না, সেই ক'মাসের সংসারের ব্যয় গোপালের ঘাড়ের ওপর দিয়েই চালাতে হবে। তাছাড়া পাঁচজনের মাথা-পিছু খরচা রয়েছে, পুজো আছে। বেশ ভালভাবে ভেবে-চিন্তে বলতে হবে। পথে ডাকাতের উপদ্রব রয়েছে। প্রাণ নিয়ে ফিরে আসা চোদ্দ-পুরুষের ভাগ্য। তবে পঞ্চানন সেজন্য ভাবে না। সে নিজে কিছুই উপায় করতে পারে না। জমি জমা থেকে যেটুকু আয়। জমি-জমা তার ছেলেই দেখতে শিখেছে—বয়স যদিও সবে আঠারো। তবু ছেলেটি কর্মী হয়েছে। পঞ্চানন ছেলের গাম্ভীর্য দেখে নিজেই অবাক হয়ে যায়। ছেলের সঙ্গে কথা বলতে কেমন বাধো বাধো ঠেকে। খাতির করে কথা বলতে হয়। ঠাকুমা নামটাও দিয়েছিল বলে। বজ্রনাথ। গোপাল মুখুজ্জেকে মুখে যাই বলুক পঞ্চানন, সে জানে তার ছেলে লালদীঘির পাড়ের কোনো সাহেবের কাছে ইংরিজি শেখে। সাহেবই তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ভাব করেছে। লালদীঘিতে কয়েকমাস আগে একটি লোক ডুবে যাচ্ছিল। সবাই হাঁ হাঁ করে ছুটে এসেছিল পাড়ে। পাশের রাইটার্স বিল্ডিং থেকে সাহেবরাও এসেছিল। কিন্তু রক্ষা করার জন্য কেউ ঝাঁপিয়ে পড়েনি। সেই সময় বজ্রনাথ সাঁতরে গিয়ে লোকটাকে বাঁচায়। ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছিল। সেই সব প্রশংসা বাক্যের মূল্য দেয়নি বজ্রনাথ। সে তার বাবাকে শৈশব থেকে দেখে দেখে বুঝেছে, শুধু কথায় চিড়ে ভেজে না। যারা কথা বেশি বলে, বেশি প্রশংসা করে বা অখ্যাতি রটায় তারা কোনো কাজের নয়। তাই লালদীঘির ধারে যারা তাকে ঘিরে রেখেছিল তাদের দু'হাতে সরিয়ে দিয়ে যখন চলে যাচ্ছিল, তখন একজন সাহেব সামনে এসে দাঁড়ায়।

সাহেবটির নাম মর্স। বজ্রনাথের ধারণা ছিল সাহেবরা সাহসী। কিন্তু তারাও পাড়ে এসে মজা দেখছিল লোকটি ডুবে যাওয়ার সময়। তাই মর্স সামনে দাঁড়ালে সে তার পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল।

সাহেব তার ভিজে হাত চেপে ধরেছিল। বজ্রনাথ জোর করতেই হেসে ফেলেছিল সাহেব। সেই

থেকে ভাব। বজ্রনাথ অবাক হয়েছিল শুনে, ডুবন্ত মানুষটি নেটিভ বলে সাহেবরা কেউ বাঁচাতে চেষ্টা করেনি। নেটিভ কথাটার অর্থ মর্সই তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। শুনে তাজ্জব বনে গিয়েছিল বজ্রনাথ।

মর্স কিন্তু বলেছিল যে সে ঝাঁপ দেবার জন্যেই ছুটে আসছিল। সে অন্য সাহেবদের মতো নয়।

ওর কথাবার্তা, ব্যবহার ইত্যাদি দেখে বজ্রনাথের বিশ্বাস হয়েছিল। তখন থেকেই তার কাছে ইংরিজি শিখছে।

পঞ্চানন ঘোষ একথা জানত না। কারণ ছেলের যত কিছু পরামর্শ তার মায়ের সঙ্গে। পঞ্চাননের সঙ্গে সাধারণ কথাবার্তা হয় শুধু। এতে প্রথম প্রথম বেশ মজা পেত। তারপর অভিমান হতো। এখন কিছুই হয় না। সে মেনে নিয়েছে সংসারে পুত্রের চেয়ে তার মূল্য অনেক কম। মেনে নিয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। তবু স্ত্রীর অসাবধানতায় জেনে ফেলেছিল পঞ্চানন, পুত্র তার ইংরিজি শেখে। স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে ধমকে বলেছিল, কাক চিলও যদি জানতে পারে একথা তাহলে বজ্রকে বলে দেবো।

সুতরাং অতি কষ্টে পঞ্চানন সারা জীবনে এই একটিমাত্র কথা কয়েকমাস হলো গোপন রেখে চলেছে। যদিও কয়েকবার মুখ ফস্‌কে গিয়েছিল আর কি।

সেইদিনই সন্ধ্যার পরে পঞ্চানন গোপাল মুখুজ্জের সঙ্গে দেখা করে। সে অনেক ভেবে চিন্তে, যাদের সঙ্গী হিসাবে নেবে, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা টাকার অঙ্ক খাড়া করে। সেই সঙ্গে তার সংসারের জন্য মাসিক খরচ। অত্যন্ত হতাশ হয়ে পঞ্চানন দেখে গোপাল এক কথায় রাজি হয়ে যায়। তবে কি সে ঠকে গেল? আরও বললে ভালো হতো।

গোপালকে বলেই ফেলে—এককথায় রাজি হলে আমি কি ভুল করে ফেললাম গোপাল?

—ভুল করবেন কেন? আপনি তো সব দিক ভেবে চিন্তেই বলেছেন।

—তবে? তুমি আপত্তি করলে না তো?

—আপনি তেমন অন্যায় কিছু বলেননি। সত্যিই তো, আপনি চলে গেলে সংসার দেখবে কে?

—তাহলে ভাই আর একটা কথা বলি।

—বলুন।

—এতে যদি কম-সম হয় তুমি পূরণ করো।

করবো। আপনি শুধু নিষ্ঠা ভরে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করবেন। আর যে ব্রাহ্মণ আপনার সঙ্গে যাবেন, তাকে আমি ঠিক করে দেবো। আপনি দু'জনকে ঠিক করুন, আমি ব্রাহ্মণ সমেত দু'জন ঠিক করবো।

সেদিন রাত্রে হেমলতার কী আনন্দ। আনন্দ নীরুরও হয়েছিল, মানিকের প্রভাব থেকে মুক্তি পাবে সে। যে যত কথাই বলুক; লোকটার তার ওপর আসক্তি ছিল। সে যে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় তার আশেপাশে এতে সন্দেহ নেই। তাই আজকাল সে সুখেনের মায়ের পাশে শুতে আরম্ভ করেছে। মানুষটা সারাদিন কাজ করে আর সারারাত ঘুমের মধ্যে বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। নীরু সেই দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনে চমকে চমকে ওঠে। এক একসময় ভাবে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দেয় সুখেনের মায়ের। এত কি জ্বালা রয়েছে মানুষটার বুকের ভেতরে। পুত্রহারা বিধবা তো পৃথিবীতে কত আছে। তবে কি এই দাসীবৃত্তির জন্য দুঃখ সুখেনের মায়ের। নীরু বুঝতে পারে না। ভাবে, মানুষকে বুঝে ওঠা কত কঠিন।

ওদিকে পিণ্ডদানের ব্যাপারে কমলা নির্বিকার। এতে তার কিছুই এসে যায় না। প্রথমতঃ ভূতের ভয় তার নেই। সব চাইতে বেশি ভয় তার মানুষকে। এ পর্যন্ত দু'জন মানুষকে সে পৃথিবীতে বাঘের মতো ভয় পেয়েছে, প্রথমজন হলো মহী। বিয়ের পর পরই মহীকে দেখলে ভয়ে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হতো। কিন্তু চিৎকার করলে বাপের বাড়ির অসম্মান, করলে শ্বশুরবাড়ির অন্য মানুষও অশান্তিতে ভুগবে। তাছড়া তার বাবা-মা আত্মীয়-পরিজন ঘোর লজ্জায় পড়বেন। তাকে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে শেষ পর্যন্ত ভাইয়ের সংসারে দাসীবৃত্তি করতে হবে—শুধু এই কথা ভেবে সে আত্মহত্যা করেছে। হ্যাঁ, আত্মহত্যা ছাড়া কি? দেহের ভেতরে বুকটুকু ধুক্‌ধুক্ করলেই কি শুধু প্রাণের স্পন্দন

বোঝা যায়? আসল প্রাণ-ভোমরা অন্তরের মণিকোঠার মধ্যে ছিল। কবে তাকে বধ করা হয়ে গিয়েছে—কেউ জানে না। তাই পিণ্ডদানে তার কি আগ্রহ থাকবে? তবু বড় জায়ের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হয়েছে।

আর একজন বাঘ হলো রামরতন চক্রবর্তী, এই বাঘ মহীর চেয়েও সাংঘাতিক। এ যদি তার জীবনে দেখা না দিত তাহলে মহীর সঙ্গে দিব্যি সংসার করতে পারতো। কিন্তু ও কিসের এক ইঙ্গিত দিয়ে বসলো। তারপর থেকেই তার মনের তন্ত্রীগুলো অতি উচ্চগ্রামে বাঁধা হয়ে গেল। কিছুতেই খাদে নামলো না। তাই মহী তাকে সুখ দিতে পারলো না। কারণ সে সংসারের সবার মতো সাদামাটা জিনিসকে মূল্য দিতে শিখলো না, এর ওপর সোনায় সোহাগা, রামরতন তাকে মা সরস্বতীর মন্দিরের চাবিকাঠিটি দিয়ে বসলো। এখন তাই রামরতনকেই তার সব চাইতে হিংস্র বাঘ বলে মনে হয়। এত হিংস্র বাঘ কালীঘাট, বেলিয়াঘাটা এবং এমনকি বেনিয়াপুকুরেও আসে না কখনো।

এমন ঝড় সাহেবরা কেন, এদেশী লোকেরাও বাপের জন্মে দেখেনি। কি সাংঘাতিক তার ধ্বংসলীলা। শহরের সম্ভবত অধিকাংশ বড় বড় গাছই ধরাশায়ী হলো। আর গঙ্গার নৌকো তো খোলামকুচি। কত লোক যে মারা পড়লো নিজের ঘর চাপা পড়ে, গাছ চাপা পড়ে, নৌকো ডুবে। গরুবাছুর মরলো অসংখ্য। তাতে রামরতনের কিছু এসে যেত না। কিন্তু এই ঝড়ের পরের দিন তার সাহেবের ছাগলের দুধ আসছে না দেখে, বাড়ির ভৃত্যরা এসে তার কাছে দাঁড়িয়ে হাঁকডাক শুরু করলো। যেন তাঁর সামনে চেঁচালেই সে বুঝে ফেলবে ছাগলের দুধ যোগাড় করায় তাদের চেষ্টার কোনো কসুর হচ্ছে না এবং এই খবর সে সাহেবকে পৌঁছে দেবে। সে ভাবে, এত অলস এই জাতি—এত নির্বোধ হয়েও নিজেদের কত বুদ্ধিমান বলে মনে করে।

সাহেবরা গরুর দুধ খায় না লক্ষ্য করেছে রামরতন এসে অবধি। গরুর দুধ ফেলে কেন যে বিস্বাদ ছাগলের দুধের ওপর মোহ সে জানে না। তবে নিশ্চয় গভীর কোনো কারণ রয়েছে—সাহেবরা বিনা কারণে কিছু করার মতো অবিবেচক নয়। সে জানে গভর্নর জেনারেল থেকে শুরু করে প্রধান সেনাপতি, কাউন্সিলের মেম্বাররা জজ-সাহেবরা এমন সকলেরই প্রায় ব্যক্তিগত ছাগল রয়েছে। যাদের নেই তাদের বাড়িতে ছাগল এনে দুইয়ে দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। অথচ গরুর দুধ কত সহজলভ্য। সুতরাং কারণ একটা রয়েছে ঠিকই। কিন্তু কারণ যাই থাক এই ভৃত্যগুলোর নরক গুলজারে সাহেবের দুধের সমস্যা মিটবে না।

রামরতন ওদের সর্দার চাঁদকে কাছে ডাকে। নবাব বিদায় নেবার পরে চাঁদই সাহেবের কৃপাধন্য।

—শোনো চাঁদ তোমাদের এখন উচিত বাইরে গিয়ে ঘুরে ছাগলের দুধের ব্যবস্থা করা। এখানে দাঁড়িয়ে চেঁচালে দুধ আসবে না।

—আমিও এদের সেই কথা বলছি। সাহেব একটু পরেই দুধ চাইবেন, না পেলে ক্ষেপে যাবেন।

—এদের বলতে হবে না। তোমরা চারজন আছো। চারজনই যাও এই মুহূর্তে। নইলে সাহেবকে বলব আমি।

ওদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। একজন বলে—আকাশের চেহারাটা দেখেছেন বাবু? আবার এলো বলে। তাইতো কেউ ঘর ছেড়ে বার হচ্ছে না।

—আমি এত ভোরে উঠে এলাম কি করে? আকাশে তখন দাপাদাপি বেশি ছিল।

—আপনি সাহেবের মুন্সী। আপনাকে তো আসতে হবেই।

রামরতনের পিত্তি জ্বলে যায়। বলে, আর তোমরা কি? সাহেবের পোষা পাখি? এই মুহূর্তে দুধ নিয়ে এসো। পাকা বাড়িতে বসে বসে ল্যাজ নাড়া হচ্ছে। গিয়ে দেখে এসো ঘরে থেকেও চাপা পড়ে মরেছে কত লোক। মড়া ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে আসতে হয়েছে আমাকে।

ওরা চুপচাপ চলে যায়। রামরতন বুঝতে পারে না দুধ আনার জন্য সত্যিই বাইরে যাবে কিনা ওদের কেউ। গেল গেল, না-গেল না-গেল, তবু ওদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে মেজাজ কেমন যেন হয়ে যায় এই সাত সকালেই। ভেবেছিল কাল রাতে ঝড়ের যে রূপ সে প্রত্যক্ষ করেছে, তারপর আজ ভোরবেলা যে বিধ্বংসী দৃশ্য দেখেছে তাই নিয়ে তিন-চার পাতার একটা কবিতা লিখে ফেলবে এখানে বসে, শুরুও করেছিল। 'অন্নদামঙ্গলে'র ভাষায় নয়, রীতিমতো সাহেবী ভাষায়। কিন্তু কয়েক ছত্র লেখার পর কবিতার উৎসমুখ এই ভৃত্যদের আবির্ভাবে রুদ্ধ হয়ে গেল। মা সরস্বতী অন্তর্হিত হলেন। শুধু সংস্কৃত কিংবা বাঙলা ভাষায় নয়, মা সরস্বতী সব ভাষারই দেবী, এটা অনুভব করেছে রামরতন। যেখানেই শিল্প, মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির ব্যাপার যেখানে সেখানেই বাণী বিদ্যাদায়িনী।

সারা দিনটা শুধু ক্রন্দনধ্বনি। আর্ত চিৎকার নয়। কোথাও বুকভাঙা ফ্যাঁসফেঁসে ধ্বনি, কোথাও গুমরে কাঁদা। আর্ত চিৎকারের মতো কলজের জোর নেই কারও। সবাই জানে, ঈশ্বর এই সব মানুষের প্রাণ নিয়েছেন। সুতরাং আক্রোশ দেখাবার সামান্য ক্ষমতা থাকলেও কেউ দেখায় না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা যায়, কাঁদা যায় কিন্তু রাগ দেখানো যায় না।

রামরতন কিন্তু দেখলো একজন সাহেবও ঝড়ে মরলো না। তারা পাকা বাড়িতে থাকে। কত নৌকো ডুবলো, কিন্তু সাহেবদের একটা জাহাজ কিংবা নৌকোও ডুবলো না। লোকে বলাবলি করতে লাগলো, সাহেবদের ওপর ভগবানের আশীর্বাদ আছে। নইলে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে এমনিতে এখানে রাজত্ব করছে? কোথায় নবাব? ভালো মানুষ গোছের সেই মানুষটাকে, কলকাতাতেও বেশি আসতে দেয় না সাহেবরা। মুর্শিদাবাদে পড়ে আছে। আর এক সুলতানের পুত্র? যে-সে সুলতান নয়। হায়দার আলির মতো নবাবের নাতি, টিপু সুলতানের বড় ছেড়ে। হায় ভগবান, সেই ময়জুদ্দিন কারাগারে বন্দী অবস্থায় হা-হুতাশ করছে। সত্যি কাঁদে সে সব সময়। কারা রক্ষীরাই এই কথা বলেছে দিব্যি কেটে। বলার সময় তাদের চোখ ছল্‌ছল্‌ করে। সেই নবাবজাদা বলে—তোমাদের পায়ে পড়ি ছেড়ে দাও আমাকে। আমি এ দেশ ছেড়ে চলে যাব। কারোও কোনো ক্ষতি করবো না। —রক্ষীরা দুই কানে হাত চাপা দিয়ে সরে পড়ে। কি করতে পারে তারা?

রামরতন বুঝতে পারে না ময়জুদ্দিনকে আটকে রেখে সাহেবদের কোন্ স্বার্থ সিদ্ধি হচ্ছে। কিন্তু সে ওসব নিয়ে অত বিচার করতে চায় না। পরিমিত জ্ঞান নিয়ে বেশি কিছু চিন্তা না করাই ভালো। তাতে মানুষের ওপর বিনা কারণে বিদ্বেষভাব সৃষ্টি হয়।

তার চিন্তার জাল নানা ক্ষেত্রে বিচরণ করতে করতে অবশেষে কেন্দ্রভূমিতে এসে মিলিতে হয় কমলা। কয়েকদিন আগে কমলাকে সে দূর থেকে দেখেছিল তার বাপের বাড়িতে। দেখে বুকের ভেতরে মুচড়ে উঠেছিল। সেই আগের রূপ তো কবেই হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবু বাইরেটা মোটামুটি ঠিকই ছিল। এখন বাইরে রূপের ওপরও মনের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। নইলে অত বিষণ্ণ অত অন্যমনস্ক কেন। রামরতন কতরকম চেষ্টা করলো দৃষ্টি আকর্ষণের। কিন্তু কমলা সেই একই দৃষ্টিতে সম্ভবত কাছের আমবাগানের দিকে সারা সময়টা চেয়ে রইলো। অবশেষে আদ্যনাথকে ধরতে হলো। আদ্যনাথ বললো, না বাঁচাই ভালো। জামাইবাবু আবার বাড়ি ফেরা বন্ধ করেছে রেতে। ছেলেটা কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। হাকিম কবিরাজ ধরতে পারছে না। ওঝা বলছে খারাপ হাওয়া লেগেছে। ঝাড়ফুঁক চলছে। কিছুই হচ্ছে না।

রামরতনের মুচড়ে ওঠা বুকের ভেতর টন্‌টন্ করছিল। সেই ব্যথা ভাব ক'দিন ধরে সারা মনের ভেতরে ছেয়ে গিয়ে তাকে বিমর্ষ করে রেখেছে। কালবৈশাখীর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কমলার মনের প্রতিচ্ছবিই তার সামনে বারবার স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। সেইজন্যই বোধহয় ভোরবেলা সাহেবের বাড়ি আসার পথে সে ইংরিজিতে কবিতা লেখার তাগিদ অনুভব করে। ভৃত্যদের প্রবেশের আগে দু-এক ছত্র লিখেও ফেলেছিল ঃ

".....When tempest not only arises to destroy every straw cottage,
Also occasions great conflagration to consume them with rage;
The daylight makes every one's face distorted,
And the eyes being ready to start from the head !"

ভৃত্যরা ছাগলের দুধের সমস্যা নিয়ে মাতামাতি করায় একটা সৃষ্টি রুদ্ধ হয়ে গেল। ঠিক সেইভাবে মা সরস্বতী তাকে আবার প্রকাশের ক্ষমতা দেবেন কিনা জানা নেই। কমলার মনের ভেতরটা আজকের শহরের বাইরের চেহারা। কমলার মনে কালবৈশাখীর ঝড় তো কবেই উঠেছিল। তবু হয়তো আর একবার লেখার চেষ্টা করত রামরতন। কিন্তু যা কখনো হয় না তাই হলো। ওই সকালে তার মালিক অ্যাটর্নি হিকি সাহেব মুখ লাল করে ঘরে ঢুকলো। ছাগলের দুধ পায়নি সাহেব। চটে গিয়েছে। সকালে উঠেই সামনে দুইয়ে দেওয়া ফেনাসুদ্ধু কাঁচা দুধ না খেলে সাহেব শক্তি পায় না। একথা একদিন বন্ধু পটকে সাহেব বলেছিল, শুনেছে রামরতন।

রামরতন লক্ষ্য করেছে যে-কোনো কারণেই হোক সাহেব তার সামনে কখনো কোনো উষ্মা প্রকাশ করেনি। বাইরে হাঁকডাক করে টকটকে মুখ নিয়ে তার ঘরে ঢুকলেও একটি কথা বললো না।

—গুড মর্নিং স্যার।

—গুড মর্নিং রাম।

রামরতন লক্ষ্য করে সাহেব যেন কী ভাবছে।

সে বলে—স্যার, আমি সবাইকে ছাগলের দুধ সংগ্রহ করতে পাঠিয়েছি। ওরা না পারলে আমি নিজেই যাব।

—সে কথা নয় রাম। দুধ না পেয়ে অসুবিধা হয়েছে ঠিকই কিন্তু এই চাকরগুলো আমাকে অস্থির করে তুললো। এতদিন মদ চুরি করে খেত; দেখেও দেখতাম না। আরও টুক্‌টাক্ সরিয়েছে জিনিসপত্র। কিন্তু আজ সকালে উঠে দেখি আমাকে উপহার দেওয়া ঘড়িটা নেই। ভাবতে পারো? সেই সঙ্গে আরও দু' চারটে জিনিস উধাও। ভাবছি কি করব। ঘড়িটা চুরি যাওয়ায় আমি অত্যন্ত দমে গিয়েছি। ওটার চেয়ে কয়েক হাজার টাকা খোয়া গেলেও ক্ষতি ছিল না!

সত্যিই তাই। ঘড়ি ছাড়া সাহেবকে একদণ্ডও দেখা যায় না। দেশে তাকে কে দিয়েছে জানে না রামরতন। তবে যে দিয়েছে, সাহেবের কাছে তার মর্যাদা অপরিসীম।

রামরতন বেশ কিছুক্ষণ ভাবে। তারপর একটা বুদ্ধি বার হয়। অতগুলো চাকরকে ধরে পেটালে কেউ স্বীকার করবে না। যদি একজনও স্বীকার করত, তাহলে সবাইকে ধরে পেটাতে ক্ষতি নেই। শেষে রামরতন সাহেবকে চাল পড়ার কথা বলে।

সাহেব জানতে চায় চাল পড়া জিনিসটা কি? রামরতন তখন ব্যাখ্যা করে বলে, ভালো আতপ চাল জলে ধুয়ে কড়া করে শুকিয়ে নিতে হয়। তারপর ওঝা আসে। সেই ওঝা বীভৎসভাবে মন্ত্র পড়তে থাকে আর সেই চাল মুখে দিলেই দেখা যায় যে দোষী তার মুখের চাল মুখের মধ্যে শুকনোই রয়েছে—লালায় ভিজে যায়নি। ওঝা তখন বুঝতে পেরে তার দিকে বিশ্রীভাবে তাকিয়ে উৎকটভাবে মন্ত্রোচ্চারণ করে আর বলে—এইবার ভূত এসে কিলোতে শুরু করবে। তখন চোর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অপরাধ স্বীকার করে ফেলে।

সাহেব বেশ উৎসাহিত হয়ে বলে—সত্যি? দোষী ধরা পড়ে?

—আমি স্যার দু' জায়গায় দেখেছি। দুই জায়গাতেই অপরাধী দোষ স্বীকার করে ফেললো, চাল পড়ার ওঝা এসে সবাইকে ডেকে বলতেই। এসেই প্রকাণ্ড এক সাপের মতো লাঠি মাটিতে ঠুকে বলে একবার চালপড়া মুখে দিলে আর রক্ষা থাকবে না। ভূতে কিলোবে কিংবা গলা দিয়ে ঝলকে ঝলকে তাজা রক্ত উঠে মারা পড়তে হবে।

হিকি সাহেবের লাল মুখ সাদা হয় খানিকটা। একটু হাসিও যেন ফুটে ওঠে। বলে—আসল রহস্যটা কি? তুমি বিশ্বাস কর ওই সব মন্তর টন্তর?

—আমি অন্য অনেক মন্ত্র বিশ্বাস করি। কিন্তু এই সব ভেলকি দেখানো মন্ত্র বিশ্বাস করতে প্রাণ চায় না।

—তুমি কোন্ মন্ত্রে বিশ্বাস কর?

—অনেক মন্ত্র আছে যা মনকে শক্তি আর সাহস যোগায়। অনেক মন্ত্র মনে শান্তি আনে।

—সত্যিই কি তাই?

—হ্যাঁ স্যার। সেই সব মন্ত্রের কথাতেই জাদু আছে। তার ছন্দেও অসাধারণ শক্তি রয়েছে।

—যা হোক, চালপড়ার মন্ত্র সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা?

—ওতে অর্থবহ কোনো কথা আছে বলে মনে হয় না। আবার অর্থ থাকলেও তাতে কাজ হয় বলে বিশ্বাস হয় না। আমার মনে হয় ওঝার ভয়ঙ্কর চালচলন, তার উদ্ভট ধরনের মন্ত্র উচ্চারণ প্রকৃত দোষীর মনে প্রচণ্ড ভয় ধরিয়ে দেয়। তাই সবার চালপড়ার মতো তার মুখের চাল ভিজে না গিয়ে শুকনো থাকে। ভয়ে মুখের লালা ঠিকমতো বার হয় না।

—তাতে কি?

—ওঝা চালপড়া প্রত্যেককে মুখে দিতে বলে, খানিক পরে ফেলতে বলে। যে দোষী তার চাল শুকনো দেখা যায়।

—অন্য কেউ যদি, এমনিতেই ভয় খেয়ে যায়? ভীতু লোকের তো অভাব নেই।

—হতে পারে। তবে আমি দুই জায়গাতেই দেখেছি অপরাধী ধরা পড়েছে। চালপড়ার কথা শুনে আগে থেকেই দোষী অপরাধ স্বীকার করে।

সাহেবের দুধ হাতে নিয়ে একটু পরে প্রবেশ করে তার প্রিয়তম ভৃত্য চাঁদ। ছেলেবেলা থেকেই সে সাহেবের কাছে কাছে রয়েছে। তার পোশাক পরিচ্ছদ সাহেবরেই মতো। অনেক খানসামার সন্দেহ চাঁদের হাতদোষ রয়েছে। নইলে অত বাবুগিরি কী করে চলে তার? রামরতনের কানেও তেমন কথা এসেছে। তবে সে এ-সব নিয়ে মাথা ঘামায় না। সাহেবের অফিসের ভার তার ওপর, সংসারের ভার নয়।

চাঁদের হাতের দুধের মধ্যে ফেনা ভাসছে। আগ্রহে হাত বাড়িয়ে সেটি মুখের সামনে ধরে হিকি বলে—কোথায় পেলে?

—ধরে নিয়ে এলাম। বাড়ি তো খাঁ খাঁ করছে। সবাই গিয়েছে ছাগল খুঁজতে। আরে ছাগল খুঁজতে কি কাশীপুরে যেতে হয়?

—হ্যাঁ, তোমার দারুণ-বুদ্ধি।

চাঁদ আনন্দে হেসে ফেলে।

—আজ বিকেলে সবাইকে বাড়ি থাকতে বলবে। এই বাবু একজন ওঝা আনবেন।

—কিসের ওঝা?

—বলো তো বাবু, কিসের ওঝা?

রামরতন বেশ বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলে—একজন দারুণ ওঝা আছে ওপারে শিবপুরে। ইয়া লম্বা ইয়া চওড়া। মুখখানা এত বড়। কী মন্ত্রের জোর। দুই ক্রোশ দূর থেকে গম্‌গম্ আওয়াজ পাওয়া যায়।

চাঁদ অধৈর্য হয়ে বলে ওঠে—কিসের ওঝা?

—চালপড়া খেতে হবে সবাইকে আজ বিকেলে।

—কেন, কেন?

সাহেব ইঙ্গিতে রামরতনকে থামতে বলে নিজে বলে—আমার মদ অনেকদিন থেকে চুরি যায়—

কিছু বলি না। আমার পকেট থেকে চাবি নিয়ে কে মোহর চুরি করে তাও জানি। সব সহ্য করেছি। কিন্তু যে আমার ঘড়ি চুরি করেছে তাকে কিছুতেই ক্ষমা করবো না। তাকে ভূত আমার সামনে কিলোবে, আর আমি মজাসে দেখব। আমি তাই প্রতিজ্ঞা করেছি।

চাঁদের গলার স্বর কেঁপে ওঠে। বলে—কে মোহর চুরি করে জানেন সাহেব?

সাহেব ধমকে ওঠে—হ্যাঁ জানি। আমি কি রোজই ঘুমিয়ে থাকি ভাব নাকি?

চাঁদ সাহেবের পা চেপে ধরে বলে—ওঝা আনবেন না সাহেব। যে মোহর চুরি করেছে সে-ই ঘড়ি চুরি করেছে।

—কে? কে মোহর চুরি করেছে।

—আপনি তো জানেন।

—আমি একা জেনে কি হবে? ওঝার সামনে সবার সামনে তাকে আমি দেখব। সবাই দেখবে।

চাঁদ কেঁদে ফেলে বলে—মোহর খরচা করে ফেলেছি। ঘড়িটা দিয়ে দেবো। সাহেব। এই বাবু ছাড়া কাউকে বলবেন না।

হিকি সাহেবের মুখ থমথমে হয়ে ওঠে। একেই আদর দিয়ে নানান শিক্ষা দিয়ে তেরো-চোদ্দ বছর বয়স থেকে মানুষ করেছে সে।

ঘড়ি ফেরত দেবার দু'দিন পরে চাঁদ পালিয়ে গেল। সাহেব তাকে তাড়িয়ে দেয়নি। তার ওপর সাহেবের একটা ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু চাঁদই কোনো রকমে মাথা হেঁট করে থেকে থেকে শেষে পালিয়ে গেল। খবর পাওয়া যায় জাহাজে কাজ নিয়ে সে চীনের দিকে গিয়েছে। চাঁদের মতো কলকাতার বুকের ওপর ঝড়ের দাপটের চিহ্নও একটু একটু করে মিলিয়ে যেতে থাকে। যে অসংখ্য গাছ উপড়ে পড়ে গিয়েছিল রাস্তার ওপর, সেগুলো আস্তে আস্তে সরিয়ে ফেলা হলো কেটে কেটে। যে কুঁড়ে ঘর ভেঙে পড়েছিল, সেগুলোও ধীরে ধীরে মেরামত করা হলো। কিন্তু যারা ঝড়ের তাণ্ডবে প্রাণ দিলো, তাদের দেহ পৃথিবী থেকে মুছে গেলেও তাদের আত্মীয়দের মনে দগ্‌দগে ঘা থেকে গেল।

রামরতন জানে কমলার মনেও জীবনে কখনো শান্তি ফিরে আসবে না। মহী মুদ্ধিহীন, নেশাখোর যাই হোক না কেন, সে যদি কমলার অনুগত হতো তাহলে কমলা হয়তো একটা সান্ত্বনার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঠাঁই খুঁজে পেত। কিন্তু মহী বেপরোয়া। সে আবার নিশাচর হয়ে উঠেছে। আদ্যনাথ একদিন বটতলায় তাকে একথা বলেছে। বলেছে আমড়াতলায় নাকি একজন ফিরিঙ্গি মেয়েকেও জুটিয়েছে। আমড়াতলার বাঁশ ঝাড় আর ডোবার মধ্যেও ফিরিঙ্গিরা বাসা বাঁধতে শুরু করেছে।

সখের কি শেষ আছে? স্বামীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানান সখ মিটাতেই তো সতীসাধ্বীদের সাধ যায়। হেমলতার অন্তত তাই বিশ্বাস। কিন্তু তাড়াতাড়ি করলে চলবে কেন? স্বামী বিরক্ত হতে পারেন। স্বামীর মনে এইটুকু ধারণার সৃষ্টি করতে হবে যে স্ত্রী হয়ে তার মনে যে সাধের উদয় হয় স্বামীর গরিমা প্রচারই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। সে স্বামীর গর্বে গরবিনী হতে চায় মাত্র।

তবু ধীরে। এই তো পিণ্ডদান করতে পাঠানো হয়েছে পাশের বাড়ির পঞ্চানন ঘোষকে। চারমাস হতে চললো। কবে ফিরে আসবে ঠিক নেই। এরই মধ্যে হিদারাম ব্যানার্জি কিংবা নিমু মল্লিকের মতো হাতি পোষার কথা কিভাবে বলে সে গোপাল মুখুজ্জেকে? রাস্তা দিয়ে যত হাতি যায় অধিকাংশই কোম্পানির কিংবা নবাব আর রাজাদের। তাই এত তাড়াতাড়ি হাতির কথা বলা যায় না। তার চেয়ে বরং এবার দুর্গা পুজোর দিকে নিমু মল্লিকের বাড়িতে বাঈজী নাচ দেখাতে নিয়ে যাবে গোপাল সেটাই ভালো হবে। বাঈজীদের কত কথা শুনেছে সে। তারা অতগুলো পুরুষের সামনে কীভাবে নাচে দেখতে হবে। লজ্জা করে না? তার ওপর আবার গান গায়। মুখে বুলি ফোটে কি করে? দেখতে হবে। শাড়ি পরে গিয়ে দাঁড়ায় কি করে? দেহের সবই তো দেখা যায়। তবে কি শাড়ি নয়? কিংবা মোটা শাড়ি?

রাতে হেমলতা চুণীকে ঘুম পাড়িয়ে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে বলে—হ্যাঁ গো, ওরা কি শাড়ি পরে?

গোপাল ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়ে বলে—কারা?

—ওই তো সেই নাচনেওলিরা।

—ও, বাঈজী? তাদের তুমি নাচনেওলি বলছ? ওদের কত গুণ জানো?

হেমলতা মনে মনে বলে, মরণ। সব পুরুষই সমান। নতুন ধরনের মেয়ে দেখলেই হলো। বউ-টউ সব কোথায় ভেগে যায়।

মুখে বলে—তা যা গুণ ওদের থাক। আমার কি?

—ওদের ওপর তোমার এত রাগ। অথচ দেখতে সাধ।

—রাগ কে বললো? তুমিই তো অন্য কথা বলছ। আমি বলছি, ওরা শাড়ি পরে কিনা।

—পরে বৈকি কেউ কেউ। আবার সালোয়ার কামিজও পরে।

—সে আবার কি জিনিস গো?

—ওসব দেখোনি। বলে কি বোঝানো যায়?

এবারে আসল কথাটা আবার ঝালিয়ে নেয় হেমলতা। বলে—দুর্গাপুজোর তো আর মাস দুয়েক বাকি। নিয়ে যাবে তো?

গোপাল মুখুজ্জে অনুভব করে হেমলতার দেহটা তার দেহের সঙ্গে লতার মতোই লেপটে আছে। হেমলতাই বটে। সার্থক নাম। স্বর্ণলতার মতো সোনার বরণ। দিনের বেলায় আরশিতে এই অবস্থায় সে দেখে নিয়েছে। তার রোদে-পোড়া দেহের সঙ্গে বেশ মানায়। চুণীর জন্মের পর আহ্লাদও বেড়েছে। বাড়ুক। স্ত্রীভাগ্যে ধন তো বটেই। এবারে বাঈজী-নাচ দেখার আকাঙ্ক্ষাটা মেটাতে হবে।

সে বলে—নিয়ে যাব এবারে। নিমু মল্লিককে বলে রেখেছি।

সেই সময় মহীর ঘর থেকে তার পুত্র অদ্বৈতের পরিত্রাহি চিৎকার শোনা যায়। হেমলতার দেহ আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। একটা শত্রু জন্মেছে বাড়িতে। যখনই স্বামীর সদাব্যস্ত মনে একটু প্রলেপ দেবার চেষ্টা করে রাতে তখনই শত্রুটা জ্বালায়। কেমন খাপছাড়া হয়ে যায় সব। সুর কেটে যায়। কমলাটাও যেন কী। এক বছর বয়স হয়ে গেল ছেলের, এখনো বশে আনতো পারলো না। আনার ইচ্ছাও যেন নেই। মহী দু'দিন বাড়িতে নেই। স্বামী জানতে পেরেছে মহী রাতে বাইরে কাটায় অনেক সময়। সে নিজে জানায়নি। কমলার শ্বশুর বাড়ি থেকেই খবর পেয়েছে গোপাল মুখুজ্জে। পেয়ে প্রথম দিনে খুব চেঁচামেচি করেছে। ঘাড় ধরে বার করে দিয়েছিল ভাইকে। অনেক কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। শেষে কমলার মুখ চেয়ে তাকেই সব দিক সামলাতে হয়।

অদ্বৈতের কান্না থামে না। হেমলতা কি করবে বুঝতে পারে না। চুণীও ঘুমের মধ্যে নড়তে শুরু করে। এবারে ঘুম ভাঙবে তারও।

গোপাল মুখুজ্জে বলে—কি হলো ওর?

—কী জানি। খেতে চায় না কিছু।

—কবরেজ দেখিয়েছ?

—কে দেখাবে?

—কেন যার ছেলে সে কি করে?

—সে কি বাড়িতে আছে?

গোপাল মুখুজ্জে লাফিয়ে ওঠে—নেই।

—তুমি উঠলে কেন?

—মহী বাড়িতে নেই?

—ক'দিন থাকে?

—বলোনি তো?

—কত বলবো? শুয়ে পড় তো? যার ছেলে সেই সামলাবে। আমি অনেক চেষ্টা করেছি।

গোপাল মুখুজ্জের মাথায় আগুন জ্বলে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায়, মহীর বিয়ের আগে তার শ্বশুরমশায়কে সে কী বলেছিল। বলেছিল, ভাই তার কিছু না করলেও এসে যাবে না। তার উপার্জনই তার ভাই-এর উপার্জন বলে ভাবতে পারেন নিশ্চিন্তে। মেয়ে দেখতে গিয়ে মহীর বউয়ের মুখখানা দেখেছিল সে। তারপরে আর দেখেনি। কিন্তু সেই বিষণ্ণ মুখখানা আজও চোখের সামনে ভাসে। মনে মনে তখন বলেছিল, মা, ভাই আমার ঠিক মানুষ না হলেও তোমার কোনো দুঃখ আমি রাখব না। তখন গোপাল জানত না ভাই তার নেশাখোর হবে, বেশ্যাসক্ত হবে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা তো তুলে নেওয়া যায় না।

গোপাল মুখুজ্জে উঠে দরজা খোলে।

—কোথায় যাচ্ছ?

—বউমার ঘরে।

—মাথা খারাপ হলো নাকি তোমার?

—না। এতদিন বোধহয় মাথাটা খারাপ ছিল।

—কি বলছ তুমি পাগলের মতো। এত রাতে কমলার ঘরে তুমি যাবে? তুমি না ভাশুর?

—হ্যাঁ। সেইজন্যেই যেতে হবে। শুধু টাকা টাকা করলে তো হবে না।

তুমিও আসতে পার আমার সঙ্গে।

—চুণী? চুণীকে একা রেখে যাব?

—তাতে কি হলো?

—অপদেবতা নেই?

—হেমলতা, ঘরে এত ঠাকুর দেবতার ছবি। পাশেই তোমার ঠাকুর ঘর। তবু অপদেবতার ভয়? অপদেবতারা কি দেবতাদের চেয়ে বেশি শক্তি ধরে?

—জানি না। আমার ভয় করছে।

—আমি একাই যাচ্ছি।

হেমলতা উঠে স্বামীকে অনুসরণ করে। তারপর এগিয়ে গিয়ে আগে মহীর ঘরের সামনে গিয়ে দরজা ঝাঁকিয়ে বলে—কমলা দরজা খোল্। ঘোমটা দিয়ে খুলবি।

কমলা দরজা খুলে ভাশুরকে দেখে চমকে যায়। ঘোমটা টেনে দেয় বেশি করে।

গোপাল মুখুজ্জে সোজা গিয়ে অদ্বৈতের সামনে দাঁড়ায়। ঘরের কোণে একটা তেলের প্রদীপ জ্বলছিল। সেই প্রদীপের আলো কাঁপছিল। গোপাল দেখে কত বিশ্রীভাবে থাকে তার ভাদ্র-বধূ! কোনো পারিপাট্য নেই—বাহুল্য তো এতটুকুও নেই। শয্যা অপরিচ্ছন্ন।

অদ্বৈতকে দু'হাত বাড়িয়ে তুলে নেয় গোপাল তার কোলে। কী হালকা। চুনীর চেয়েও হালকা। অথচ চুনীর চেয়ে বছর খানেকের বড়। চোখগুলো ঠেলে বার হয়ে আসছে যেন। তাতে আতঙ্ক। কিসের আতঙ্ক কে জানে? তবু যাকে চিরকাল দূর থেকেই দেখেছে শিশুটি, তার দেহের উষ্ণ সান্নিধ্যে হঠাৎ তার কান্না থেমে যায়।

গোপাল মুখুজ্জে কবিরাজ না হয়েও বুঝতে পারে, কোনো একটা রোগে ভুগছে এই শিশুটি। অনুতাপে পুড়তে থাকে সে। খেয়াল করে না, বাড়ির দুই বউ তার কাণ্ডকারখানা অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছে। তারা দেখছে, যে মানুষের সংসারের কোনো কিছুর দিকেই খেয়াল নেই, শুধু টাকা রোজগারই যার জীবনের একমাত্র কর্তব্য বলে মনে হয়, সে শিশুটিকে আদর করছে। আর শিশু সেই আদর উপভোগ করছে।

শিশুকে শুইয়ে দিয়ে গোপাল মুখুজ্জে তার পাশে বসে ঘুম পাড়ায়। দুই বউ দাঁড়িয়ে থাকে। শেষ

পর্যন্ত শিশু সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ে। তার মর্মকথা গোপাল অনুভব করে যেন। আমাদের অবহেলা আর ভালবাসার অভাবে তাকে এমন করেছে। নইলে হয়তো এমন হতো না। অনাদরই তার ভেতরে কোনো রোগের সৃষ্টি করেছে কিনা কে জানে।

গোপাল উঠে দাঁড়িয়ে বলে—আমি কবিরাজ নিয়ে আসব। এর অসুখ আছে। আর এবার থেকে রাতে যদি কাঁদে আমার কাছে দিয়ে এলেই হবে।

হেমলতা বলে ওঠে—তোমার কাছে?

—হ্যাঁ আমার বিছানায়।

হেমলতার মুখ শক্ত হয়। কমলা কিছু বুঝতে পারে না। সে কিছু বলতেও পারে না।

গোপাল মুখুজ্জে বলে—মহীটা অমানুষ। এতটা অমানুষ সে কথা যদি আগে জানতাম, ওর বিয়ে দিতাম না। আমার মনে হয়, আগে ও এমন ছিল না। এখন কেন হয়েছে জানি না। তবে সেটা কপাল বলে ধরতে হবে। আমি চেষ্টা করবো মহীকে শায়েস্তা করার। যদি মতি ফেরে ভালো। না ফিরলে তার স্ত্রী এবং ছেলের ভবিষ্যতের জন্য কোনো ভাবনা নেই বড় বউ। তুমিও শুনে রাখো, আমার সম্মত্তির একটা বড় অংশ অদু পাবে। আর মহীর স্ত্রী তোমার মতোই মর্যাদা যাতে পান সেটাও আমি দেখব। তিনিও এই বাড়িরই বউ।

হেমলতা যেন আজ প্রথম একজন অচেনা মানুষকে দেখছে। এই মানুষই তার পুত্রের পিতা অথচ এতটুকু চিনতে পারছে না। সে কমলার দিকে চায়—সেই মুখ ঘোমটা-ঢাকা।

গোপাল মুখুজ্জে ঘর থেকে বার হয়ে যায়।

কমলা কাঁপতে কাঁপতে মেঝেতে বসে পড়ে বলে—এ কী হলো দিদি!

—কি।

—আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

—পুরুষ মানুষ। বোধহয় একটা কিছু ভেবে নিয়েছে।

—আমি কি কোনো অন্যায় করেছি।

হেমলতা মনে মনে বলে—একশোবার করেছিস পিশাচী। তোর মনেই তো পাপ। নইলে এমন হয়? মহী ঠাকুরপো কিসের জন্যে বেশ্যাদের দরজায় ঘোরে?

—দিদি।

—অন্যয় করেছিস কিনা আমি কি করে বলব? তবে তোর ভাশুর যা বললেন তাতে মনে হয় গত জন্মে অনেক পুণ্য করে এসেছিস।

ঘোমটা ফেলে দিয়ে সোজা হেমলতার দিকে চেয়ে বলে—তুমি কি সত্যিই তাই মনে কর দিদি?

—সম্পত্তির ভাগ, চিরকাল খাওয়া-পরার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত—পুণ্যি নয়?

—আমি তা মনে করি না।

—তুই শিক্ষিত। তোর অন্য রকমের ব্যাপার। ওসব কি আমি বুঝি? যাক্, আমি যাই। দরজা বন্ধ করে দে। আর অদু কাঁদলে তো টেনে নিয়ে গিয়ে ভাশুরের কাছে ফেলে দিয়েই নিশ্চিন্ত হবি।

কমলা হেমলতার মনোভাব বুঝতে পারে। সে দোষ দিতে পারে না তাকে। স্বামীর এই বিসদৃশ আচরণ কার ভালো লাগে! তবু হেমলতা শান্ত স্বভাবের বলেই রেগে ওঠেনি। কিন্তু ভাশুরের এই আচরণের কারণ কমলাও বুঝতে পারে না। হঠাৎ এতটা কাছে টেনে নিলেন কেন? হেমলতা ঘর ছেড়ে গেলে সে দরজা বন্ধ করে।

পাশের ঘরে সুখেনের মায়ের পাশে শুয়ে নীরু এতক্ষণ এই সব অস্বাভাবিক কাণ্ড কারখানা শুনছিল। সে সবটা বুঝতে পারছিল না। অদ্বৈতের কান্না তার গা সওয়া। তাতে নীরুর ঘুমের ব্যাঘাত কোনোদিনও হয় না। তার ঘুম আসছিল না অন্য একটা কারণে। কালীমন্দিরের কাছে সে এক নতুন

হাতছানির ইঙ্গিত পেয়েছে। একবার ঘর পাতবার সাধ হলে সেই সাধ কি অপূর্ণ থাকলে শান্তি পাওয়া যায়? সুখেনের মায়ের ঘুমের মধ্যে বুক ভাঙা দীর্ঘশ্বাস তো এই পরের বাড়ি দাসীবৃত্তির জন্যই। নীরুরও হয়েছে মরণ। লোকটা মোটেও অজানা নয়, কিন্তু মানিকের মতো নির্ভরযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। মানিকের সেই বিনয়—সেই ভয় ভয় ভাব নেই এর মধ্যে। কেমন যেন বেপরোয়া। নইলে ওভাবে ডাকে? প্রথমদিন তো চমকে উঠেছিল কালীবাড়ি থেকে সন্ধ্যার সময় ফেরার পথে। পাড়ার মধ্যে এ-ভাবে কথা বলে? কেউ দেখে ফেললে কী দুর্নামই রটতো। কালীবাড়ির পাশেই মধু দাস বৈষ্ণবের আখড়া। সেখানে মাঝে মাঝে এসে থাকে লোকটা। বাড়ি কাটোয়া। মানিকের চেয়ে কম বয়স। গান গায় দরদ দিয়ে। রাধিকার বিরহে কৃষ্ণের মনের দুরবস্থার কথা যখন গায় চোখে সত্যি জল আসে। ওই গান শুনেই তো মরণ হয়েছে। ওই গান শুনত সে মানিকের মৃত্যুর আগে থেকেই। ভাবতো, মানিকও এইভাবে গান গেয়ে গেয়ে বেড়াবে। মনের কথা কখনো মানিককে বলতে পারেনি। মানিককে কোনো কথাই তার বলা হয়নি। বললে হয়তো সে অমন ভয়ঙ্কর মানত করতো না। গাজনের সন্ন্যাসীও হতো না, যাহোক, যে গিয়েছে, সে গিয়েছে। কী আর করা যায়। কিন্তু এই বোষ্টমটি অমন সুন্দর গান গাইলে কি হবে, চোখে তার অন্য ভাষা। স্বয়ং কৃষ্ণঠাকুরও বোধহয় এভাবে শ্রীরাধিকার কাছে এসে কথা বলতে পারেনি প্রথম প্রথম। বাঁশি বাজিয়ে, ছল চাতুরির মাধ্যমে কাছে টানতে হয়েছে। এ লোকটা তেমন নয়। অন্ধকারের মধ্যে একটু দূর থেকে মিষ্টি গলায় ডেকে উঠেছিল—শ্রীরাধিকে গো। চমকে উঠেছিল নীরু। কে শ্রীরাধিকা? কাব শ্রীরাধিকা? বুঝতে পারেনি। লোকটা কাছ দিয়ে যাবার সময় বলে গেল—শ্রীরাধিকা একজনই নয়—একজনারই হয়। দেখা করো। সেই থেকে নীরুর বুক কাঁপে ওকে দেখলে। এই সব চিন্তা মাথায় ঘুরছিল বলে ঘুম আসছিল না। অদ্বৈত চিৎকার করে যাচ্ছিলো। সেই সময় ছোট-বউয়ের ঘরের দরজা খোলার আওয়াজ। তারপর গোপাল মুখুজ্জের কণ্ঠস্বর।

নীরু থ' হয়ে গিয়েছিল প্রথমটা। গোপাল মুখুজ্জে অদুকে আদর করে কান্না থামালো। এসব কী হচ্ছে? পৃথিবীটা কি পালটে গেল? নিজেকে অনেকটা মুক্ত বলে মনে হয় নীরুর। সবই হয় সংসারে। সেও লোকটির সঙ্গে কাটোয়া কিংবা নবদ্বীপে চলে যেতে পারে। সে তো লোকটির শ্রীরাধিকা? ঠিক সেই মুহূর্তে হেমলতার কণ্ঠস্বরও শোনা যায়। সেই কণ্ঠস্বরে কোনো কিছু ধরে ফেলার কড়া ভাব নেই। নীরু নিস্তেজ হয়। সুখেনের মাকে ধাক্কা দিতে গিয়েও সামলে নেয়। নিরাশ হয়ে পাশ ফিরে শোয়।

কবরেজ মশায় আসেন প্রতিদিনই প্রায়, অদ্বৈতের চিকিৎসা করতে। চিকিৎসার আনুষঙ্গিক যথেষ্ট। কত রকম গাছের মূল পাতা ইত্যাদি সেদ্ধ করে তার নির্যাস খাওয়ানো। এতই বিস্বাদ সেই পদার্থ যে, অদ্বৈত ঢোক গেলার বদলে ফেলে দেয় প্রায়ই। দুধ মধু ইত্যাদি মিশিয়ে কোনোরকমে খাওয়ানো হয় তাকে। কমলার এই এক কাজ হয়েছে বটে। তবু উপায় নেই। ভাশুর রোজই এসে তার সামনে দাঁড়ান কাজ থেকে ফিরে এবং জানতে চান ওষুধ খেয়েছে কিনা। ঘোমটা-টানা ঘাড় এক পাশে হেলিয়ে কমলাকে নিজেকে জানাতে হয় যে ওষুধ খেয়েছে অদু। শরীর তার ভালো আছে কিনা জানতে চাইলেও ঘাড় কাত করে সায় দেয়। যদিও শরীর মোটেও ভালো নয় অদুর। কবিরাজী চিকিৎসায় এতটুকুও উন্নতি হয়নি। বরং অবনতিই হচ্ছে। তবু ঘোমটার আড়াল থেকে ঘাড় একপাশে হেলানোর চেয়ে অর্থাৎ ঝাঁকিয়ে 'না' বলাটা অভদ্রতা বলে মনে হয় কমলার। কারণ ওভাবে ঘোমটা-টানা ঘাড় ঝাঁকানো দেখে তার নিজেরই ভালো লাগে না—কেমন অসভ্যতা বলে মনে হয়। ঘাড় কাত করার মধ্যে তবু একটা নমনীয় ভাব আছে।

এইভাবে চিকিৎসা চলতে চলতে পুজো এসে গেল। কমলা লক্ষ্য করলো, অদ্বৈত চেঁচিয়ে কাঁদার ক্ষমতা একটু একটু করে হারিয়ে ফেলেছে। হেমলতা ভাবছে উন্নত হচ্ছে। ছেলের পেটটা ভারী ভারী মনে হয়—ঠিক যেন জল লেগেছে। নীরু বলে, মোটা হচ্ছে অদু। তার চোখ-মুখ একটু একটু রক্তশূন্য

হয়ে উঠছে। সবাই ভাবে, শরীর সারছে বলে ফরসা হচ্ছে ছেলে দিনের পর দিন। কমলা কিছু বলে না। সে ঠিকই বুঝতে পারে মহীর ছেলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। আজকাল তাই ওকে অতটা অসহ্য মনে হয় না। আহা, শত হলেও আত্মা তো। কষ্ট করেই গেল এ-জন্মটা। পরের জন্মে যেন শান্তি পায়। এতদিন যাকে শুধু মহীর ছেলে বলে মনে হতো এখন তাকে নিজের বলেও কিছুটা মনে হয়। শত অনিচ্ছাসত্ত্বে হলেও তারই গর্ভে তো ছিল দশ মাস দশ দিন। সেই দোষ তো অদূর নয়।

এরই মধ্যে পুজো এসে গেল এবং এলো সেই বাঈজী নাচের দিন। দু'দিন আগে থাকতে হেমলতার অস্থিরতা বেড়ে যায়। অলঙ্কার নির্বাচন করতে মেঝের ওপর রাশিকৃত গহনা ফেলে কমলাকে ডাকে। কমলা এসে বড় জায়ের পাশে বসে পড়ে।

—বলতো কোন্‌টা কোন্‌টা পরবো?

—ভারী পরবে, না হালকা পরবে?

—হালকা পরবো কেন? তোর সব তাতেই কেমন উড়ু উড়ু ভাব।

—না। ওখানে তো অনেকক্ষণ বসতে হবে—নাচ দেখবে। তোমার অসুবিধা হতে পারে।

—আশি পঁচাশি ভরির গয়না আমি বেনারসীর মতো স্বচ্ছন্দে পরতে পারি। কমলা কৃত্রিম আনন্দ দেখিয়ে বলে—তবে তো কথাই নেই। দাও আমি বেছে দিচ্ছি।

সেই সময় গোপাল মুখুজ্জের পাদুকার শব্দ শোনা যায়। এত অসময়ে সে কখনো বাড়ি ফেরে না। স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তনে জীবনে এই প্রথম বোধহয় হেমলতার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

কমলা পালিয়ে যায়। গোপাল মুখুজ্জে এসে বলে—সর্বনাশ। তোমার এত গয়না?

—তুমি জানো না?

—কি করে জানব? একসঙ্গে তো দেখিনি কখনো। এছাড়াও তো আমার সিন্দুকে দু'শো ভরির মতো তোলা রয়েছে।

—তাতে কি হয়েছে?

—না কিছু হয়নি। বউমা চলে গেলেন কেন?

—তুমি এলে বলে।

—হুঁ, আসাটা ঠিক হয়নি।

—না এলেই পারতে? আমার কাজ হলো না।

—কি কাজ?

—কমলাকে বলেছিলাম বেছে দিতে। বাঈজী নাচ দেখতে যেতে হবে না পরশু?

—তা তো হবেই। বউমাও তো যাবেন?

হেমলতার মাথা গরম হয়ে ওঠে। আজকাল সে প্রায়ই স্বামীর প্রতি বিরক্তি অনুভব করে। ছোট জাকেও আগের মতো ঠিক স্নেহ করে না। বরং বেশ খানিকটা বিদ্বেষভাব পোষণ করে।

—বউমা যাবেন কিনা, আমি কি করে বলব? তোমার সঙ্গে তো কথাবার্তা হয়। গিয়ে জিজ্ঞাসা করো।

গোপাল মুখুজ্জে বেশ বড় রকমের ধাক্কা খায়। এ ধরনের কথা হেমলতার মুখে এই প্রথম উচ্চারিত হলো। সে হেমলতার উষ্মার কারণ বুঝতে পারে। অথচ স্ত্রীর সম্বন্ধে তার ধারণাটা সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল। সে জানতো হেমলতা সেই ধরনের স্ত্রী, যাকে নিয়ে বিবেক বুদ্ধি বিসর্জন না দিয়ে সংসারের কর্তব্য করা যায়। আজ বুঝলো হেমলতাও অন্য সবার মতো। নিজের ভ্রাতৃবধূ এবং তার হতভাগ্য সন্তানটির প্রতি কর্তব্য করতে গিয়ে নিজের স্ত্রীর মনে হিংসার বীজ রোপণ করে ফেলেছে। এবারে গাছ ফল ইত্যাদি। অর্থাৎ হেমলতা সাধারণত্বের ঊর্ধ্বে উঠতে পারলো না। অথচ এই হেমলতাও বাতিলের পর্যায়ে পড়ে যাচ্ছিল কিছুদিন আগে। মারাঠা খালের ধারের মেয়েটি এতদিন এসে যেত এই

ঘরে—শুতো হয়তো এই শয্যাতেই। আর, একবার সে এসে গেলে হেমলতা কোনো অসংযত মুহূর্তের ফলে সন্তানসম্ভবা হলেও, আগের প্রতিষ্ঠা কখনই ফিরে পেত না।

গোপাল মুখুজ্জের মুখ হয়তো খুবই কঠিন হয়ে উঠেছিল এবং হেমলতা সেটি লক্ষ্য করে ফেলে। তাই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বলে—আমি জিজ্ঞাসা করে আসছি কমলাকে।

—না।

—কেন? আমি জিজ্ঞাসা করে আসছি। তুমি একটু স্থির হয়ে বসো তো। এত তাড়াতাড়ি ফিরলে কেন? কিছু হয়েছে?

—কিছুই হয়নি। তবে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

—কেন?

গোপাল মুখুজ্জে ভাবে, মা যতদিন বেঁচেছিল হেমলতা সযত্ন বর্ধিত গাছের মতো বেশ ছিল। এখন ওর মাথার ওপর কেউ না থাকায় অযত্নে বড় বেশি এদিক ওদিক বেড়ে উঠেছে। ছেঁটে দেবার কেউ নেই। এই মুহূর্তে ওকে ঠিকমতো ছেঁটে না দিলে কমলা এ-বাড়িতে বসবাস করতে পারবে না। শুধু বড় জায়ের মন রেখে রেখে বেশি বয়সে মর্যাদাবোধ হারিয়ে ফেলবে। এতে কোনো ক্ষতি ছিল না গোপালের। কিন্তু কমলার বাবাকে সে কথা দিয়েছিল।

—বউমার গয়নাও তো দেখে নিতে হবে, তোমার সঙ্গে যেতে হলে তোমার জায়ের যোগ্য অলঙ্কার পরেই যেতে হবে। তুমি জিজ্ঞাসা না করে ওঁর গয়নাগুলো নিয়ে এসো। আমি দেখবো।

হেমলতার মুখ লাল হয়ে ওঠে। ঠিক যেন একটা লঙ্কা, গাছে পেকে টুকটুক্ করছে। গোপাল মুখুজ্জের সন্দেহ জাগে, লঙ্কা না মাকাল ফল? এমন কোনো তুলনা স্ত্রীর সম্বন্ধে তার মনে কখনো আসেনি আগে। অথচ আজ হেমলতার মনের একটা দিকের পর্দা হঠাৎ হাওয়ায় একটু উঠে যাওয়ায়, ভেতরের যতটুকু দেখতে পেল, তাতেই কত রকমের তুলনা করতে ইচ্ছে করছে। ভাবে, যাকে মোটামুটি ভালোবাসা যায়, তার ওপর অবিশ্বাস বড় যন্ত্রণাদায়ক। আবার এও ভাবে গোপাল, হেমলতার ক্রোধ কিংবা অন্য কিছু যদি সাধারণ হতো তাহলে কিছুই মনে হতো না।

হেমলতা এক পা এক পা করে জায়ের ঘরের দিকে যায়। তারপর একটু পরে ফিরে আসে শূন্য হাতে।

—কি হলো?

—কমলা বললো, সে কিছুতেই যাবে না। ওর ওসব ভালো লাগে না।

গোপাল মুখুজ্জে হেমলতার কণ্ঠস্বরে উৎসাহ দেখতে পায়। সে বলে—বেশ তো 'বাঈজী নাচ দেখার যদি ওঁর ইচ্ছে' না থাকে যাবেন না। কিন্তু অন্য অনেক জায়গায় তো যেতে পারেন পরে তোমার সঙ্গে। তখনও গয়না চাই। তুমি নিয়ে এসো।

গোপাল মুখুজ্জে লক্ষ্য করে এবারে হেমলতার মুখ লাল হয়ে উঠলো না। সে বাধ্য মেয়ের মতো আবার গেল। মা জীবিত থাকার সময় যেমন চলন ছিল, ঠিক তেমনি চলন। মনে মনে সে ভাবে হেমলতা নিজেকে মস্ত সতী ভাবে। হয়তো লোকের সুখ্যাতি ও প্রশংসা লাভের জন্য সহমরণেও যেতে রাজি হতে পারে। অথচ স্বামীর সৎ ইচ্ছাগুলো পরিপূরণে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা যাবে না। হেমলতাকে কতবার সে বুঝিয়েছে কমলাকে কেন সে দুঃখ দিতে চায় না। সে বলেছে, মহীর সঙ্গে কমলার বিবাহ মেয়েটির পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয়। এই দুর্ভাগ্যের জন্য গোপাল নিজেও দায়ী। সে কমলার বাবাকে কী বলেছে, তাও হেমলতার অজ্ঞাত নয়। অথচ তার দিকে একটু বিশেষ দৃষ্টি দিতেই হেমলতার হিংসা মনের মধ্যে হিস্ হিস্ করে উঠলো। এমন স্ত্রীর সতী অসতীতে কী এসে যায়। এদের সতীত্বের ব্যাখ্যা কি এরাই জানে। এদের চেয়ে ওই সব সাহেবদের স্ত্রী অনেক বেশি সতী। তাদের সতীত্ব ঝড় জলে টিকে থাকা পাকাপোক্ত জিনিস। তারা স্বামীর জন্য অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে পারে। স্বামীর

সঙ্গে অপরিচিত পরিবেশে থাকতে তাদের এতটুকু দ্বিধা নেই। স্বামীর সুখ আর শান্তির জন্য সারা দুপুরটা বিছানায় গড়াগড়ি না দিয়ে চাকরদের নিয়ে পরিশ্রম করে ঘরটিকে শান্তির আবাস করে রাখে যাতে ঘরে ফিরেই স্বামীর মনটা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে, ওরা কি সতী নয়? আজ গোপাল অসময়ে ঘরে ফিরে যে অভ্যর্থনা পেল মেয়ার সাহেব কিংবা প্রাইস বা হাইড সাহেব কি তেমন অভ্যর্থনা পান ঘরে ফিরে? বরং অসময়ে ফিরলে তারা হয়তো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। খিদিরপুরে গোকুল ঘোষাল সেদিন একটা গল্প করছিলেন। সাহেবদের সঙ্গে তার মেলামেশা ডকের জমি নিয়ে মামলা করার সময় থেকে। গোকুল ঘোষাল সাহেবদের খানাপিনাতে না গেলেও তাদের পেটের কথা অনেক জানেন।

প্রধান বিচারপতি ইম্পে সাহেবের বাড়িতে একদিন খানাপিনা হচ্ছিল খুব। লেডি ইম্পের নাচ সভা উপলক্ষে এই খানাপিনা। সব গণ্যমান্য সাহেব ছিলেন উপস্থিত। বিচারপতি হাইড সাহেবও ছিলেন। তিনি খাওয়াতে যেমন ভালোবাসেন, খেতেও তেমনি ভালোবাসেন। একটা বড় মুরগির ঠ্যাং পেয়ে খুব আনন্দে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আপন মনে খাচ্ছিলেন হাইড সাহেব। তাঁর কাছাকাছি একটি অল্প বয়সী ছোকরা বসেছিল। সে হাইড সাহেবের দিকে ইঙ্গিত করে পাশের একজনকে নীচুস্বরে বলে—জজসাহেব যেভাবে দেখে শুনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খাচ্ছেন, মনে হয় স্ত্রীর চেয়ে টার্কি মুরগি অনেক বেশি ভালোবাসেন।

কথাটা দৈবাৎ হাইড সাহেবদের কানে যায়। তিনি বলে ওঠেন—মোটেই তা নয় হে ছোকরা। মোটেই তা নয়।

ছেলেটি লজ্জায় মরে গিয়েছিল।

গোপাল ভাবে, কত গভীর প্রেম থেকে হাইড সাহেবের এই উক্তি। হেমলতাকে সে অতটা ভালোবাসে কিনা জানে না। তবে খুবই তো বাসে। আর একটা বিয়ে করতে হবে ভেবে তার মন কী রকম ভেঙে গিয়েছিল। অথচ হেমলতা তার মনের মূল্য দিল না।

হেমলতা একটু ছোট্ট পুঁটলি নিয়ে ঘরে ঢোকে।

গোপাল প্রশ্ন করে—এটা কি?

—কমলার গয়না।

—সবগুলো নিয়ে এসো।

—আর তো নেই?

গোপালের মাথা গরম হয়ে ওঠে—নেই মানে? বউমার বাবা দিয়েছিলেন একশো ভরি। আমি দিয়েছি তিরিশ ভরি। এরমধ্যে বড়জোর তিরিশ পঁয়তিরিশ ভরি আছে। বাকি সব কোথায়?

হেমলতা এবারে ফেটে পড়ে—তোমার ভাই। তোমার ভাই নেশাভাং করে উড়িয়েছে।

—এত সোনা?

—হ্যাঁ। আজ থেকে নাকি? অদু জন্মাবার আগে থেকেই। এখন তো আর বাড়িতেই থাকে না। আমড়াতলায় কার বাড়িতে পড়ে থাকে শুনি।

—তাহলে তো বউমার আরও গয়নার দরকার। ওগুলো বউমা যদি রেখে দিতে ভয় পান, আমাকে দিতে পারেন। নতুন গয়না তৈরি করে আমি নিজেই রেখে দেবো। কাল স্যাকরা আসবে, উনি যেন পছন্দ করে দেন।

সেই সময় কমলা বাইরে এসে দাঁড়ায়। গোপালের অলক্ষ্যে হেমলতাকে ডাকে। হেমলতা তার কাছে গিয়ে কিছু শুনে এসে বলে—কমলার গয়নায় রুচি নেই।

—গয়নার রুচি নেই?

—হ্যাঁ।

—না না। এখন ওর মন খারাপ হয়তো। পরে শুনবো।

—না। ও বলছে গয়না ও চায় না। তুমি যদি ওর পড়ার জন্য বই এনে দাও, ওর খুব আনন্দ হবে।
—বই? পড়ার জন্য?
—হ্যাঁ, সংস্কৃত পুঁথি, ইংরিজি সব বই আছে নাকি?
গোপাল কল্পনা করতে পারে না ছোট-বউ এত জানে। বলে—বউমা পড়বেন?
—হ্যাঁ, ও পড়তে জানে।
বেশ। আমি ওঁকে সব বই এনে দেবো।
কমলা ধীরে ধীরে চলে যায়।

হেমলতা একটু সাদামাটা ধরনের স্ত্রীলোক। স্বামীর মন যে কতখানি ভেঙে গিয়েছে তার প্রতি সেটা উপলব্ধি করার মতো অতটা সূক্ষ্ম বুদ্ধি তার নেই। অথচ সে বোকা নয়। বরং বুদ্ধিমতী। তার বুদ্ধি থাকলেও মনের গভীরতা ততটা নেই যতটা থাকলে স্বামীর ভাঙা মনকে জোড়া দেবার জন্য তৎপর হতে পারে কিংবা স্বামীর মনোভাব দেখে নিজেই ম্রিয়মান হয়ে পড়তে পারে। তাই বাঈজী নাচ দেখতে যাবার জন্য তার গয়না নির্বাচন স্থগিত থাকত না, এবং কমলা যাবে না ভেবে আরও পুলকিত হয়ে উঠলো অথচ হেমলতাকে কখনোই খারাপ বলা যায় না। সে স্নেহশীলা, স্বামীর প্রতি অনুরক্ত, মনের ভেতরে তেমন প্যাঁচ নেই যা সংসারে অশান্তি আনে। প্যাঁচ আর গভীরতার অভাবের জন্যই স্বামীর ক্রোধকে তাৎক্ষণিক ভেবে নিয়ে নিশ্চিন্ত হলো।

নিমু মল্লিকের বাড়ির বাঈজী নাচ শহরের গণ্যমান্য অনেককেই আকৃষ্ট করে। দুর্গোৎসব, বাঈজী নাচ ইত্যাদি হলো টাকার গরিমা আর আভিজাত্যের বহিঃপ্রকাশ, সেই সঙ্গে হাতি পোষাও বটে। তাই নিমু মল্লিকের বাড়ির প্রধান ফটকে প্রবেশ করতে হেমলতাকে হীনমন্যতায় পেয়ে বসলো। চারদিকে ঝাড়বাতি, নানান ধরনের সজ্জা, গাড়িঘোড়া, কারুকার্যময় পালকির সমাবেশ দেখে সে বুঝতে পারলো এরা কতটা ধনী। একটা হতাশায় আচ্ছন্ন হয় তার মন। ভাবে, এদের সমান উঁচুতে উঠতে এই-জীবনে তার স্বামী পারবেন? বিশ্বাস করতে পারে না সে। এ যে রাজপ্রাসাদ। এত বড় বাড়ি হয় কখনো মানুষের! ঠাকুর দালানের ভেতরে কত সুন্দর সব কাজ করা। ঠিক যেন ইন্দ্রপুরী।

অলঙ্কারের ভারে নড়তে পারছিল না হেমলতা। মহিলাদের দিকে তার পালকি থাকে, অতি সাধারণ ভাড়া করা পালকি। অন্যান্য পালকির তুলনায় নিতান্ত অতি অকিঞ্চিৎকর। হেমলতা একবার ভাবে, স্বামীর সঙ্গে ফিরে যায় বাড়ি। কিন্তু স্বামী তখন পুরুষদের দলে গিয়ে মিশেছেন। তাকে থাকতেই হবে!

বাঈজী নাচ শুরু হলো খানিক পরেই। চিকের আড়ালে মহিলাদের মধ্যে গিয়ে বসলো হেমলতা! বসে কান্না পেতে লাগলো। কতকগুলো ভারী গয়নাই শুধু পরেছে সে। অলঙ্কার যে কত সুন্দর হতে পারে, আজ এখানে না এলে তার ধারণাই হতো না কোনোদিন। কী সূক্ষ্ম সব কাজ তার। হেমলতা লক্ষ্য করে সবাই একবার শুধু তার দিকে চাইলো, তার পরেই অনাগ্রহ স্পষ্ট ফুটে উঠলো তাদের মুখে চোখে। ফুটবেই তো। অলঙ্কার মানে তো শুধু তাল তাল সোনাই নয়। হীরে চুনী পান্না যত কিছু চাকচিক্য এই অলঙ্কারে। সে শুধু একটা হীরের আংটি আর একটা নাকছাবি পরে ভেবেছিল টেক্কা দিয়েছে সবার ওপর। লজ্জায় ঘরে যেতে ইচ্ছে হয়। এরা সোনা দিয়ে মিছিমিছি গয়না ভারী করে না। এদের জড়োয়ার গয়না। কত তার শোভা। চোখ ঝলসে যায়। হেমলতা বুঝে ফেলে এদের তুলনায় সে অতি সাধারণ ঘরের স্ত্রী ছাড়া কিছুই নয়। কাদের বউ ঝি এরা তার জানা নেই। তবে তাদের হাতের আঙুলের ডগাটি পর্যন্ত সুন্দর। নখগুলো পরিষ্কার করে কাটা। জীবনে এদের কাজ করতে হয় বলে মনে হয় না। হেমলতা একবার নিজের নখের দিকে লুকিয়ে তাকায়। ঠিকভাবে কাটা নেই। একটা নখের

ফাঁকে সমান্য একটু হলুদ ঢুকে রয়েছে। সে শাড়ির আড়ালে হাত লুকিয়ে ফেলে। কিন্তু শাড়ির আড়ালে লুকিয়েই কি নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় আছে? বেনারসী শাড়ি পরে ভেবেছিল এতে যা জরীর কাজ, সবাই তাকিয়ে দেখবে। কিন্তু এখানে কি দেখলো? আসলে সোনা আর রূপোর সুতো দিয়ে কাজ করা সমস্ত শাড়ি। যেদিকেই তাকায় হাঁ হয়ে যায়! শাড়ির সুতো এত সূক্ষ্ম যে জ়রীর কাজ না থাকলে দেহের নগ্নতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ত।

একটা বিষয়ে হেমলতা কিছুটা সান্ত্বনা পায়। নিমু মল্লিকের বাড়ির বা অতিথি অভ্যাগতদের মধ্যে তার মতো গায়ের রঙ খুব একটা চোখে পড়লো না। সবাই সুন্দরী, রঙও ফর্সা কিন্তু তার মতো কাঁচা সোনার রঙ তো একটিও চোখে পড়ে না। কিন্তু এই আত্মগরিমাও বেশিক্ষণ টিকলো না তার। সে মহিলাদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে প্রবেশ পথের দিকে তাকিয়ে 'থ' হয়ে গেল। মনে হলো স্বর্গ থেকে এক জোড়া সরস্বতী নেমে আসছেন। হাতে শুধু বীণ নেই। দুধে আলতা রঙ। কী চোখ-মুখের গড়ন—দেহের কী লীলায়িত ভঙ্গী। আর কী অপূর্ণ সুন্দর হাসি। হেমলতা নিষ্পলক চেয়ে থাকে।

ইতিমধ্যে বাঈজী নাচ শুরু হয়ে যায়। সব দিক দিয়ে চোট খেয়ে হেমলতা নিজেকে ধাতস্থ করে নেয়। সে বুঝতে পারে তার স্বামী যে ধরনের মানুষ, তাতে এদের কাছাকাছি পৌঁছানোও তার পক্ষে সম্ভব নয়। এদের স্বামীরা নিশ্চয় তার স্বামীর মতো ভাই-এর সংসার টানতে গিয়ে পিছিয়ে পড়ে না। এদের স্বামীরা শুধু এগোতে জানে। দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলতে জানে। যাক্ ভালোই হলো—তার জ্ঞান চক্ষু খুললো।

হেমলতা বাঈজী নাচ দেখতে থাকে চিকের আড়াল থেকে। স্বামী তার ঠিকই বলেছে। শাড়ি পরে নাচছে মেয়েটি। কিন্তু শাড়ির নীচে কিছু পরেছে। বুকও ঢাকা রয়েছে কিছুতে। তাই উলঙ্গ মনে হচ্ছে না। কী নাচ। পুরুষদের মধ্যে কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্রী। এতটুকুও লজ্জা নেই। মুখখানা হাসিহাসি। দেখতে দেখতে সহসা হেমলতারও ওদের মতো নাচ শেখার সাধ হয়। যদি নাচতে জানতো তাহলে স্বামীকে বাড়িতেই নাচ দেখাতে পারত। স্বামীকে বাইরে যেতে হতো না এই সব অসভ্য মেয়েদের মধ্যে। ওই পুরুষের ভীড়ের মধ্যে তার স্বামীও নিশ্চয় আছেন। তিনিও দেখছেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি সামনে উপবিষ্ট পুরুষদের মতো অমন আবিষ্ট কিনা কে জানে?

কিন্তু বড় সুন্দর গাইছে। নাচছেও সুন্দর। সত্যিই দেখবার জিনিস। কিন্তু পুরুষরা কি ওর গান শুনছে? তার স্বামী কি ওর নাচ দেখছে, না দেহ দেখছে। হেমলতার একান্ত ইচ্ছা হয় নর্তকী হবার। কিন্তু স্বামীর জন্যই তার নর্তকী হবার ব্যগ্রতা।

হেমলতা দু'জন সাহেবকে দেখতে পায় একদিকে। এতক্ষণ দেখতে পায়নি। সম্ভবত পরে এসে পৌঁছেছে সাহেব দু'জন। মেয়েদের মধ্যে ভীষণ চেঁচামেচি, হি হি করে হাসি, গায়ে ঢলে পড়া—সমানে চলেছে, ওরা নাচ দেখতে এসেছে বলে মনে হয় না। এ ওর গয়না দেখছে, শাড়ি দেখছে আর বাঈজীর আশেপাশে বিশেষ বিশেষ পুরুষদের নিয়ে উচ্চকণ্ঠে কিংবা চাপা গলায় অশ্লীল মন্তব্য করছে। এইসব মন্তব্য শুনতে নিশ্চয় খুবই ভালো লাগত হেমলতার, যদি ওরা তাকে ওদের দলে টেনে নিত। কিন্তু ওরা কেউ জানেই না সে কে? তাই দলের মধ্যে বসেও হেমলতা একাকী। বাকিরা সবাই মনে হয়, নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত। এদের এই সব কাণ্ড কারখানা দেখতে বাঈজী নাচ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছিল হেমলতা, ঠিক তখনি বোধহয় সাহেব দু'জন এসেছে। ওদের একজনের চুলের কী বাহার। পোশাকও কত সুন্দর। চিক্‌চিক্ করছে—খুব দামী মনে হয়।

হেমলতার চোখ তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে। কে দাঁড়িয়ে ওই সাহেবের পাশে। সাহেবের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলছে। নিশ্চয়ই ইংরিজিতে। সাহেব একটু হাসলও লোকটার কথা শুনে। ও যে সেই কমলার সম্পর্কে দাদা। সেই রামরতন চক্রবর্তী। সব পাপের গোড়া ওই লোকটা। বাড়িতে আসত সভ্যভব্য।

মনে মনে এত পাপ? আর বলিহারী কমলা। তুই না হিন্দু ঘরের স্ত্রী।

হেমলতা অবাক হয়ে চেয়ে দেখে রামরতন সাহেবের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে যাচ্ছে। এত ইংরিজি জানে? ওই নিশ্চয় কমলার মাথা খেয়েছে। তাই ভাশুরের কাছে আর কিছু না চেয়ে বই চায়—বাড়িতে পড়ার সুযোগ চায়।

সেই সময় আর এক বাঈজী প্রবেশ করে। কী ঝলমলে পোশাক। সমস্ত অঙ্গনে যেন আগুন ধরিয়ে দিল। রূপও বটে। তবে শরীরে মাংস বড় কম। ঝাঁপির মতো ছোটখাটো। একটু মোটা মেয়েমানুষ না হলে আবার রূপ কি? এই বাঈজী একটু ঢ্যাঙ্গা। শরীরে মেদ বলতে কিছু নেই। তবে হাস্ত দুটো দেখলে মনে হয় খুব নরম। দুই সাহেবের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। মনে হয় আগের, গোলগাল বাঈজীর চেয়ে একেই বেশি পছন্দ। রামরতন কিন্তু বাঈজীদের দিকে একবারও তাকায় না। তার হাবভাবে মনে হচ্ছে, এসবে কোনো আগ্রহই নেই। মানুষটার মধ্যে পুরুষত্ব আছে কিনা তাই বা কে জানে। সেইজন্যেই হয়তো মেয়েদের সঙ্গে মেশে। এই বয়সের ব্যাটাছেলে ওই রকম নাচ না দেখে থাকতে পারে? সবটাতেই বাড়াবাড়ি।

রামরতন একটু পরেই পেছনে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। হেমলতা নিশ্চিন্ত হয়। রামরতনের উপস্থিতি তার বাধা সৃষ্টি করছিল। ফেরার পথে স্বামীর সঙ্গে একটাও কথা বলে না হেমলতা। ভীষণ অভিমান হয়েছে তার। গোপাল মুখুজ্জে যখন রামরতনের কথা বলে, তখন কৌতূহলে ফেটে পড়তে চাইলেও সে চুপ করে থাকে।

গোপাল মুখুজ্জে নিজের মনেই বলে—ইংরিজি শিখেছে বটে রামরতন। ঠিক সাহেবদের মতো। সবাই অবাক হয়ে গিয়েছে। নিমু মল্লিক পর্যন্ত স্বীকার করেছে।

—রাখো তোমার নিমু মল্লিক। ভদ্রতা জানে?

—কেন? কত লোক এসেছে দেখলে তো? যে ভদ্রতা না জানে তার বাড়িতে কেউ আসে?

—রাখো। আমার সঙ্গে কেউ কথাই বললো না।

—তোমাকে চেনে নাকি ওরা?

—চিনিয়ে দিলে না কেন?

—আমি! আমি কি করে চিনিয়ে দেবো? চেনাতে হলে অন্য সময় মাঝে মাঝে আসতে হয়।

—আনলেই পারতে আগে। কী লজ্জা!

—কেন লজ্জা কিসের?

—লজ্জা না? ঝি-এর মতো একপাশে বসেছিলাম। একটা কথা বললো না কেউ।

—তোমার এই রূপ দেখেও বললো না?

—হু, রূপ। রূপ কাকে বলে দেখে এলাম। তাছাড়া রূপে কি সব হয়? গয়না? শাড়ি?

—বলো কি গো? এত ভারী গয়না—

—রাখো। এসব আবার গয়না নাকি? এটাকে শাড়ি বলে? গিয়ে দেখে এসো গে। হীরে ছাড়া পাবে না। শাড়িতে সোনা রূপোর জরী। আসল সোনা রুপো।

—বুঝেছি।

—এতদিন বুঝতে পারনি কেন?

—নিমু মল্লিকের মতো অতটা বুদ্ধি নেই কিনা। এবারে আস্তে আস্তে হীরে হবে—সব হবে।

এই প্রথম স্বামীর হাতের ওপর হাত রেখে বলে—সত্যি বলছো গো?

—মিথ্যে বলবো কেন?

হেমলতা ভেবেছিল, বাড়ি ফিরে রামরতনের কথা শুনিয়ে দেবে কমলাকে। কিন্তু পারলো না। *নিজের ছেলের জন্যে সারা সময়টা চিন্তা থাকলেও বাড়ি এসে ছেলেকে নিদ্রিত দেখে নিশ্চিন্ত হন। সুখেনের মা পাহারা দিচ্ছিল। নীরুকে কেন যেন চুনীলালের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। কেবলই* মনে হয় নীরুর নিশ্বাসে বিষ আছে—অপকার হবে ছেলের। নীরু আজকাল অন্যমনস্ক হয়ে যায়। মাঝে মাঝে আপন মনে লাজুক ভঙ্গিতে স্মিত হাস্যে ঘাড় কাত করে। আগে এ-সব ছিল না। এইসব দেখেই ভরসা পায় না হেমলতা। নীরুর ওপর কমলা অদুর ভার দেয় মাঝে মাঝে।

সেই অদুই পরিত্রাহি চিৎকার করছিল নাচ দেখে বাড়িতে প্রবেশের সময়। স্বামীর মুখের দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারে হেমলতা সেই মুখ ব্যথায় বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। এখুনি হয়তো ছুটবে ভাদ্র-বধুর ঘরে।

স্বামীকে সে ঘরে গিয়ে বলে—তুমি হাত-মুখ ধুয়ে নাও। অদু এখনি থামবে।

—তুমি জান না।

—কি জানি না।

—ওই কান্না! কাঁদতে কাঁদতেই একদিন স্থির হয়ে যাবে।

—কী বলছো তুমি?

—আমি বলবো কেন? কবরেজমশায় বলেছেন। ওর পেটে জল লেগেছে। সারা শরীরে জল লাগছে। বুকের ধুকধুকানি কখন বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক নেই।

হেমলতা এতটা কল্পনা করেনি। তার হাত-পা কাঁপতে থাকে। বাড়িতে মৃত্যুর ছায়া সামনে এ-যেন ভাবা যায় না। এ-মৃত্যু বৃদ্ধ বয়সের স্বাভাবিক পরিণতি নয়। এ-যেন গাছ থেকে ফুল ছিনিয়ে নেওয়া।

অদুর কান্নাকে আজকাল আর্তনাদের মতো শোনায়। দিন দিন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলেই তবে। গোপাল মুখুজ্জে স্ত্রীর অবস্থা দেখে ভাবে, এই উৎসবের দিনে কথাটা না বললেও চলতো। কিন্তু পারলো না। ওই কান্না কানে শোনা যায় না। কবরেজমশায় জবাব দিলে সে ভেবেছিল সাহেব ডাক্তারকে দেখাবে। র্যাণ্ডেল ডাক্তারের সে খুব প্রিয়পাত্র, যেমন চেহারা ডাক্তারের তেমনি নাকি আবার অভিনয় করে। কিন্তু ওই সব মানুষকে ভগবান তো পৃথিবীতে বেশিদিন রাখেন না। র্যাণ্ডেল সাহেবের হঠাৎ মৃত্যু হলো ক'দিন আগে। এই অল্প বয়সেই মারা গেল, বড়জোর তিরিশ বত্রিশ বছর বয়েস হয়েছিল। তাই অদুকে আর দেখানো গেল না। ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয় বলেই হয়তো এমন হলো।

হেমলতা নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—হাত মুখ ধোবে না।

—ও থামুক।

হেমলতা ধীরে ধীরে ঘর থেকে বার হয়ে যায়। কমলার ঘরের দিকেই যায় সে। মনে মনে ভগবানকে ডেকে বলে, হে ভগবান, আজ সবে নবমী। লক্ষ্মীপুজোটা ভালোয় ভালোয় পার হতে দাও।

কমলার ঘরে গিয়ে দেখে, ছেলেটা তখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে। আর কমলা জানালার ধারে গিয়ে অন্ধকারের দিকে চেয়ে রয়েছে—যেন ওই অন্ধকারের মধ্যে কেউ তাকে বাতি দেখালে।

—কি করছিস ওখানে দাঁড়িয়ে? ছেলেকে থামা।

—ও যখন থামার, আপনিতে থামে।

—তাই বলে, ওকে ভোলাবি না?

—কি হবে ভুলিয়ে দিদি? তোমরা সবাই বলো ও মোটা হচ্ছে, ফর্সা হচ্ছে। আমি জানি ওর দিন ঘনিয়ে এসেছে।

হেমলতা এবার আর চমকায় না। তবু চমকানোর ভাব করে বলে—যাঃ কী বলছিস আজ বছরকার দিনে?

—ঠিকই বলছি। কবরেজ মশায়ের মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারি। এখন আর বেশি ওষুধ দিতে চান না। তাছাড়া ওর গায়ের রক্ত কিসে যেন শুষে নিচ্ছে। ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে চোখ মুখ ঠোঁট।

—তাই বলে ওইভাবে একলা ফেলে রেখে দিবি?

—সেই কথাই ভাবছিলাম। আমার ছেলে না হয়ে জন্মালে ও কিছুটা আদর পেত। এ জন্মে সেটুকুও ওর জুটলো না।

—তার জন্যে তুই দায়ী রাক্ষসী।

—জানি। কিন্তু কিছু করার নেই।

—কি করে থাকবে? হিন্দু ঘরের বউ হয়ে স্বামীর ওপর টান না থাকলে এইভাবেই সব এক এক করে ধ্বংস হয়ে যায়।

হেমলতার আর কথা বলতে ইচ্ছে হয় না। মেয়েটার মন কেমন যেন কঠিন। কিছুতেই স্পর্শও করা যায় না, নোয়ানোও যায় না।

ঘর ছেড়ে বার হয়ে আসে হেমলতা।

মহীকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছে তার পীরিতের মেমসাহেব ডি সুজা। কমলার কিছু গয়না মেমসাহেবের হাতে জমা দিয়ে সে বেশ আনন্দেই দিন কাটাচ্ছিল। কত ইংরিজি শিখে ফেললো এর মধ্যে। মিস ডি সুজা নাকি খাঁটি মেম নয়। না হোক, রঙ ফর্সাই বলতে হবে। মেমদের পোশাক পরে। তাদের মতো মাঝে মাঝে তামাক টানে। বেশ লাগতো মহীর। কিন্তু ক'দিন থেকে মেমসাহেব খারাপ ব্যবহার শুরু করেছিল। বলছিল, খরচা ফুরিয়ে গিয়েছে। মহী বলেছিল একদিন বাড়ি গিয়ে আরও কিছু গয়না নিয়ে আসবে। কিন্তু এত বড় দুর্গাপুজো গেল, বাড়ি যায়নি সে। তাই ভরসা হয় না যেতে। দাদা নির্ঘাত বাড়ি থেকে বার করে দেবে। একমাত্র কমলা আর অদুর দিকে তাকিয়ে দাদা যদি তাকে ক্ষমা করে। বাড়িতে তাকে ফিরতেই হবে। নইলে না খেয়ে মারা পড়বে। ডি সুজা অন্য একজনকে জুটিয়েছে। লোকটি যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। মুর্শিদাবাদের নবাবের সঙ্গে নাকি কি সম্পর্ক রয়েছে। মহীর দিকে কট্‌মট্ করে চেয়েছিল প্রথমদিন। তারপর মেমসাহেবকে বলেছিল—ওটাকে বার করে দাও।

মহী কপর্দকহীন। তার দাড়ি-গোঁফ খুব পাতলা। তবু কয়েকদিনের ক্ষৌরকর্ম না হওয়ায় বিসদৃশ লাগছিল। এই চেহারা নিয়ে বাড়িতে যাওয়া বোধহয় ঠিক হবে না। চিৎপুরের রাস্তা ধরে হাঁটলে কিছু কিছু জানাশোনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতেও পারে। তাই খানাডোবা ঝোপঝাড় পেরিয়ে সে গঙ্গার ধারে চলে এলো। গঙ্গার ধার দিয়ে চলার সময় ফুরফুরে হাওয়া গায়ে লাগলে বেশ লাগে। গঙ্গার ধারে বাড়ি বলে ছেলেবেলা থেকে এই হাওয়ায় অভ্যস্ত সে। বড় আপন মনে হয় হাওয়াকে।

বাড়ির পাশে গঙ্গার ঘাটের অশ্বত্থ গাছের নীচে মদন ক্ষৌরকার বসে। তার কাছে গিয়ে বসলে নিশ্চয় বিনে পয়সায় কামিয়ে দেবে। কারণ তাকে যখন তখন পয়সা দেওয়া হয়। বৎসরে দু'বার ধুতি চাদর ফলমূল ইত্যাদি অনেক কিছু পায় সে।

মহীকে সামনে বসে পড়তে দেখে চমকে ওঠে মদন।

—দাও তো কামিয়ে মদন। ক'দিন সময় পাচ্ছি না।

মদন তবু চুপ। তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে। ভাবে, যা শোনে সবই সত্যি তাহলে। গোপাল মুখুজ্জের মতো মানুষের ভাইও অমানুষ হয়!

—কি হলো?

—বলছি, আপনি একবার ওই শ্মশান ঘাটটা ঘুরে আসুন। ওই যে কাল-কাশুন্দি আর নাটাইয়ের

ঝোপের আড়াল থেকে ধোঁয়া উঠছে? ওখানে যান।

—কেন? এত তাড়াতাড়ি শ্মশানে পাঠাতে চাও কেন? তোমার বেশ পোয়া বারো। এদিকে কামাচ্ছ, ওদিকে শ্মশানঘাটে যারা আসে তাদেরও কামাচ্ছ।

—না। শ্মশানঘাটে যারা আসে তারা কামায় না। কামানোর দিন আলাদা। সব ভুলে গেলেন ছোটবাবু! আপনি না বামুন?

—নিকুচি কর বামুনের। জাত হলো সাহেব। উঃ, ইউ নটি। মাই ডার্লিং, মাই ডার্লিং—শুনেছ সে সব কথা!

—কাজ নেই শুনে। বেশ আছি। এবারে যান তো ওদিকে?

—কেন? ওদিকে কেন?

—আপনার দাদাও আছেন ওখানে। জানাশোনা—

—তাই নাকি? কে?

—গিয়ে দেখুন।

—আমাদের পাড়ার বুড়ো কে ছিল? সান্যাল মশায়?

—না।

—তবে?

—আপনি যান।

দাদা রয়েছে শুনে মহীর সাহস নিঃশেষ হয়। তবু গুটি গুটি যায় সে। ভাবে বাড়িতে যাওয়ার চেয়ে শ্মশানঘাটে যাওয়াই ভালো। ওখানে দাদা অনেকের মধ্যে তাকে গালাগালি দিতে পারবে না। তারপর দুই ভাই একসঙ্গে বাড়ি ফিরবে।

মহীকে দেখে গোপাল মুখুজ্জে বোবা হয়ে যায়। অদূর দেহে তখনো ভালো করে আগুন ধরেনি।

—একটু আগে এলে তুই-ই মুখাগ্নি করতে পারতিস।

মহী কিছু বুঝতে পারে না। চিতার ওপর ছোট একটি দেহ—কালো হয়ে উঠেছে। দাদাকে জিজ্ঞাসাও করতে পারে না কে মরলো।

পঞ্চানন ঘোষকে সে দেখে একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বামুনপাড়া থেকেও তিন চারজন এসেছে। তারা সবাই মহীকে দেখছে।

পঞ্চাননের কাছে গিয়ে মহী বলে—কবে এলে পঞ্চাননদা? পিণ্ডি দিয়ে এলে?

পঞ্চানন মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তা হোক, দাদা খুব মিঠে ব্যবহার করেছে। ওতেই হবে। মুখখানা একটু হাসি হাসি করে সে দাদার কাছে ফিরে গিয়ে বসে। কে মরলো রে বাবা। দাদারই দেখছি বেশি গরজ। ভালোভাবে একবার ছোট্ট মৃতদেহটির দিকে চায়। চিনবে কি করে। জীবনে কখনো স্পর্শ করেছে বলেও মনে হয় না। পরের বাড়ির ছেলের মতো।

গোপাল মুখুজ্জে ভাইয়ের হাবভাব লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়। ভাবে, মন বলে কোনো পদার্থও কি নেই মহীর? থাকলে দু' ফোঁটা অশ্রু নিশ্চয় গড়িয়ে পড়তো। বাড়িতে ফিরেছে কতদিন পরে কে জানে? সহোদর ভাইটিকে মাস দেড়েক পরে এই প্রথম দেখলো সে। চেহারার কি ছিরি হয়েছে। মৃতের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে গোপাল, তোর সব অভাব আমি মেটাতাম। তবু বোধহয়, চলে গিয়ে ভালোই করেছিস। এমন বাপের পরিচয় দেওয়াও মুশকিল।

গুটি গুটি পাশে বসেছে বলেই গোপাল জিজ্ঞাসা করে—বাড়িতে কখন ফিরলি?

—বাড়িতে এখনো যাইনি।

—তবে? কোথায় খবর পেলি?

—গঙ্গার ধার দিয়ে আসছিলাম। মদন নাপিত বলে দিলো। বললো, তুমি এখানে আছো। পাড়ার কে মারা গিয়েছে।

—মদন বললো, পাড়ার কেউ মরেছে? তা বলতে পারে, বলতে পারে। মদন ভেবেছে, তুইও বুঝি মানুষ।

—আমি—

—চিতার ওপরটা দেখেছিস?

—দেখলাম তো।

—তোর কষ্ট হচ্ছে না? অনুশোচনা?

মহী ফ্যাল ফ্যাল করে দাদার দিকে চেয়ে থাকে। দাদা কখনো এত বুঝিয়ে সুঝিয়ে গালাগালি দেয় না। দাদার গালাগালি হলো পূর্ণিমায় গঙ্গার বান আসার মতো। হুড়মুড় করে এসে মিলিয়ে যায়। কিছুক্ষণ শুধু উথলি-পাথালি। দাদার আজকের ধরনটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মনে হয় বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় আছে। দরজার গোড়া থেকে বিদায়—মিস্ ডি সুজা যেমন বিদায় করে দিয়েছে।

মহীর বুকের ভেতরটা কেমন ব্যথা করে ওঠে। এই একমাসে চার পাঁচবার এমন একটা চাপা ব্যথা অনুভব করতে শুরু করেছে। হাত দিয়ে চেপে ধরে বুক।

গোপাল আড়চোখে লক্ষ্য করে। ভাবে শত হলেও জন্মদাতা, বুকে তো দাগা লাগবেই। বেচারার চোখ শুকনো—কাঁদতে পারছে না। সবাই কাঁদতে পারে না। তাছাড়া হঠাৎ একেবারে চিতার ওপর দেখাটা কম বড় আঘাত তো নয়। আস্তে আস্তে অনুভব করতে শুরু করেছে।

মহী জানে, এবারে কাশতে শুরু করবে সে। বড় বিশ্রী কাশি। সে উঠে একেবারে গঙ্গার কিনারায় জলের ধারে গিয়ে বসে পড়ে। জোয়ার চলছে বলে, কাদায় পা দিতে হলো না। সে কাঁপতে শুরু করে। মাঝে মাঝে থুতু ফেলে। সব শেষে খানিকটা রক্ত। মিস ডি সুজা এই রক্ত দেখার পর থেকেই তার পাশে শুতো না। বলতো গয়না বিক্রির টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে। হয়তো ফুরিয়েছে। তবু এতদিনের ভালোবাসা এক নিমেষে এমন ফিকে হয়ে যায়? বাঙালী মেয়ে হলে পারত না।

মহী মুখ হাত ভালো করে ধুয়ে আবার দাদার কাছে এসে বসে পড়ে। বুকের ভেতরটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। গোপাল ভাবে, কাশির ছুতো করে উঠে গিয়ে মহী চোখ মুখ ধুয়ে অশ্রুজল ঢেকে এলো।

—অদুকে তুই শেষ কবে দেখেছিলি?

—অদুকে? কেন?

—এমনিতে বলছি।

—তা—

এতক্ষণে খেয়াল হয় মহীর। সে তাড়াতাড়ি ছুটে যায় চিতার কাছে। এখন আর চেনা যায় না। তবু কি করে যেন সে চিনলো। হ্যাঁ, সে চিনতে পারলো। পিতা হয়েছে বলে, তার ভেতরে একটা বিরাট গর্ব ছিল। সেই হিসাবে সে তার দাদার চেয়েও বড়। সেই গর্ববোধটা সহসা চিতার ধোঁয়ার মতো শূন্যে মিলিয়ে গেল। বুকের যেখান থেকে একটু আগে সামান্য রক্ত উঠেছিল, সেইখানটা ফাঁকা হয়ে গেল। সে দেখতে থাকে। অদুর গায়ের চামড়া ফেটে ফেটে ঝুলে পড়ছে। এই অদুকে সে কখনো চিবুক স্পর্শ করেও আদর করেনি। অথচ ছেলেটা কি করে যেন বুঝে গিয়েছিল, সে তার বাবা। অদ্ভুতভাবে হেসে 'বাবা বাবা' করত। শেষের দিকে তো অনেক কথাই বলতে শিখেছিল। তাকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতে বলতো। মহী একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

গোপাল মুখুজ্জে উঠে গিয়ে পিঠে হাত রেখে বলে—এত কাছে দাঁড়াস না। সরে আয়।

—ও বেঁচে গেল দাদা। আসছে জন্মে ওর বাবার কর্তব্য করবো।

—কেন? এ জন্মেই তো পারিস। একটু ঘরমুখো হ'। ও আবার আসতে পারে।

মহী অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে চলে। মা মারা যাবার সময়ও দাদা এইখানে এইভাবে তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। মায়ের চিতার কাছে অদুর চিতা।

মহীর বুকের ভেতরটা কেমন করে। রক্ত ওঠার'পর অমন ব্যথা হয়। কিন্তু আজকের ব্যথা একটু ভিন্ন ধরনের।

সে মাথা নাড়িয়ে চলে। শেষে বলে—এ জন্মে আর হবে না।

—কেন হবে না? তুই আমার চেয়ে কত ছোট। এই বয়সে বিয়েই হয় না। পঞ্চাননদার ছেলে বজ্রনাথ তোর চেয়ে দেড় বছরের ছোট মাত্র।

—তবু হয় না। হবে না আর।

—হবে। হতেই হবে।

—ছোট-বউ হতে দেবে কেন?

—ছোট-বউ। তাকে তুই চিনিস? কত লেখাপড়া জানে জানিস?

—সেই জন্যেই তো হতে দেবে না। সে অন্য রকম।

—না, সে সবার মতো। তার মনে দুঃখ আছে মহী। তুই-ই তো অন্য রকম।

দাদার কথার জবাব দিতে ইচ্ছে করে না মহীর। একটা দুর্বলতা, একটা বমি বমি ভাব তাকে আচ্ছন্ন করে। সে গঙ্গার পাড়ের ঘাসের ওপর বসে পড়ে। মিস্ ডি সুজা ক'দিন থেকে তার দিকে কেমন করে যেন চাইতো। টাকা ফুরিয়েছে বলে? তাতে অত ভয় কেন?

অদুর অতটুকু দেহ পুড়তে বেশি সময় লাগে না। কথা উঠেছিল, এই বয়সে চিতায় ওঠানো হবে, না পুঁতে ফেলা হবে? বামুনপাড়ার বিপ্রদাস অধিকারী জন্মতারিখ দেখে বললেন, চিতায় উঠবে। তাই ছোট্ট চিতায় তুলতে হলো অদ্বৈতকে।

কমলার আজ কোনো কাজ নেই। কোনো বিরক্তি নেই। অদুর জায়গাটা ফাঁকা। আজ তাই কমলা একটানা চিন্তা করতে পারছে, কেউ কেঁদে কেঁদে তার চিন্তাসূত্রকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করছে না। তবু কেমন যেন কান্না পায়। নাড়ির টান কাকে বলে, এই প্রথম সে অনুভব করে। এতদিন অদুকে দেখতে ঠিক মহীর মতো লাগত। আজ তার নিজের মায়ের কথা মনে হয়। মা কিন্তু বরাবর বলতেন অদুকে দেখতে ঠিক তার মামার মতো। এখন কল্পনায় অদুর মুখখানা সামনে এনে কমলা দেখে মায়ের কথাই ঠিক। সে কেঁদে ফেলে।

বাড়িটা থমথম করছে। বাড়ির কাছেই শ্মশান। ফিরে আসতে আর কতক্ষণই বা লাগবে। রান্নাঘরের সামনে সুখেনের মা বসে রয়েছে। সে কি করবে বুঝতে পারছে না। আজ কি রান্নাবান্না হবে না? চুনী কি খাবে? দুধ জ্বাল দিতে হলেও তো উনুন ধরাতে হয়। বড়-বউ তার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে অনেকক্ষণ, ছোট-বউয়ের ঘরে ঢুকে একটু সময় থাকতেই বুঝতে পেরেছিল একে সান্ত্বনা দেবার প্রয়োজন নেই।

জানালা থেকে সরে কমলা রান্নাঘরের দরজায় সুখেনের মাকে দেখে। তারপর সদর দরজার দিকে চাইতেই কমলা চমকে ওঠে। সে দেখে সদর দরজায় রামরতন চক্রবর্তী এসে দাঁড়িয়েছে। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে যায়। সে ছুটতে ছুটতে হেমলতার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। চেঁচিয়ে বললো—দিদি, তুমি তো অনেক কথাই ভাবো। একবার নিজের চোখে এসে দেখে যাও।

হেমলতা ভাবে, নিশ্চয় পাগল হয়েছে কমলা। সে ছোট বউ, ছোট বউ বলতে বলতে পেছনে ছোটে। কিন্তু দরজার কাছে এসেই তার চোখ বড় বড় হয়ে যায়।

কমলা হাত-পা ছুঁড়ে রামরতনকে বলতে থাকে—তুমি ভেবেছ কি! এটা ভদ্রলোকের বাড়ি নয়?

তোমাদের মতো লোকের জন্যে মানুষ অযথা কলঙ্কিত হয়। তোমাদের বিবেক নেই, বুদ্ধি নেই। তোমরা অমানুষ। তোমরা স্বার্থপর।

হেমলতা অবধি কমলার এই উক্তিকে বাড়াবাড়ি বলে ভাবে। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলে—কি হচ্ছে ছোট বউ? তোর কি মাথা খারাপ হলো? তুই তো এভাবে কথা বলিস না।

—মাথা তোমাদের খারাপ। আমার ঠিকই আছে!

হেমলতা নিম্নস্বরে রামরতনকে বলে—অদু ভোর রাতে মারা গিয়েছে।

রামরতনের মুখ ব্যথায় ভরে ওঠে। বলে—ও।

আর একটিও কথা না বলে সে বার হয়ে যায়।

হেমলতা কমলার হাত ধরে জানায়—চল্, ঘরে চল।

—যাচ্ছি। তুমি অতটা ভদ্রতা না করলেই পারতে।

হেমলতা অনেক চেষ্টায় তার রাগ সামলায়। শত হলেও পুত্রহারা জননী। নইলে কথা শুনিয়ে দেওয়া যেত।

সেই সময় শ্মশানযাত্রীরা ফেরে। বাড়ির সবাই ওই দলে মহীকে দেখে বিস্মিত হয়। হেমলতা ভাবে, নিশ্চয় কেউ খবর পাঠিয়েছিল। নইলে দিন বুঝে এলো কি করে? বাপের সঙ্গে তো নাড়ির টান থাকে না। কিন্তু কী স্থিতি হচ্ছে চেহারার। বেবুশ্যের সঙ্গে থাকলে এমনই হয়। শুধু দিতেই হয়—পায় না কিছুই। এ তো আর বউ নয়। সেই সঙ্গে নেশা ভাঙ তো আছেই।

মহীকে দেখে কমলার মনে কোনো রকম প্রতিক্রিয়া হয় না। তার শেষ প্রতিক্রিয়া ঘটে গিয়েছে রামরতন চক্রবর্তীকে দেখে। তারপর থেকেই এই পৃথিবী হয়ে পড়েছে অর্থহীন। মহী এলেই বা কি, না এলেই বা কি? গয়না নেবে? সব দিয়ে দেবে। কিছু এসে যায় না। কোনো দাম নেই। এমনকি লেখাপড়া যে এত ভালো লাগত, তাও আর লাগবে না। কি হবে লেখাপড়া শিখে? কী লাভ? কমলার ভীষণ হাসি পায়। সে জানে, হাসলে সবাই তাকে পাগল ভাববে। ভাববে, ছেলের মৃত্যুতে শোকে পাগল হয়েছে সে। আসলে তা নয়। পৃথিবীর এই অনিত্যতা দেখে তার হাসি পাচ্ছে। কী হবে এখানে বেঁচে থেকে?

মহী চোরের মতো ঘরে ঢোকে। কমলা শূন্যদৃষ্টিতে সেইদিকে চেয়ে থাকে। মহী ঢোঁক গিয়ে বলে—তোমার কষ্ট হয়নি, আমি জানি। তুমি বেঁচে গিয়েছ।

কমলা উত্তর দেয় না। প্রয়োজন মনে করে না।

মহী বলে—ওর কিন্তু কোনো দোষ ছিল না। সব দোষ আমার।

কমলা নীরব।

—আমি জানি তুমি আমাকে ঘৃণা কর। আমি অশিক্ষিত। আমি বর্বর। তোমার ওপর জুলুম করেছি। তাই তুমি আমার সঙ্গে একটুও ভালো ব্যবহার করোনি। মিষ্টি কথাও বলোনি।

মহী কথা বলতে বলতে লজ্জা পেয়ে যায়। কমলা কি ভাবলো কে জানে। তাকিয়ে আছে ঠিক, কোনো মূর্তির মতো। চোখের পলকও পড়ছে না। এত কথা না বললেও চলতো। কিন্তু কথা বলার ঝোঁক সামলাতে পারেনি সে।

কমলার হঠাৎ খেয়াল হয়, মহী তখনো দাঁড়িয়ে আছে—চলে যাচ্ছে না। তবে বোধহয় গয়না চাইছে। সে তাড়াতাড়ি দেরাজ থেকে গয়নাগুলো নিয়ে মহীর সামনে এনে রাখে।

মহী বলে—গয়না আনলে কেন? কি হবে?

কমলা বলে—তুমি নেবে না?

—কেন?

—চাওনি তুমি?

মহীর বুকের ব্যথা সারা মনে ছড়িয়ে পড়ে। বলে—না। চাইনি।

—ঠিক আছে। দরকার হলে নিয়ে যেও।

—আমি—

মহী কথা শেষ করতে গিয়েও পারলো না। তার মনে এত জোর নেই যে বলে, আর কখনো সে বাইরে গিয়ে থাকবে না। তাই অত বড় গালভরা প্রতিজ্ঞা করতে গিয়েও পারলো না। কিন্তু এই মুহূর্তে সত্যিই ওই গয়নাগুলোর প্রতি তার কিছুমাত্র লোভ নেই। সেই চাঁদপাল ঘাটের ধারের সন্ন্যাসী ঠাকুরের মতো বলতে ইচ্ছে হয়—সব মাটি। ধন-দৌলত সোনা-দানা কিছু না।

—ছোট বউ, আমি ঘরে থাকলে তোমার অসুবিধে হবে?

ছোট-বউ ডাকটা কত সহজ। যেন ঠিক জেলে-ডিঙির মাঝিকে ডাকছে—মাছ আছে নাকি গো মাঝি? তপসে মাছ?

ছোট-বউয়ের নাম ধরে মহী একবারই ডেকেছিল—ফুলশয্যার রাতে। তখন রক্তে দোলা—বুকে তুফান। সেই একবারই ডাকার আগে তার মনে হয়েছিল 'কমলা' নামটা কী মিষ্টি কিন্তু সেই ডাকের প্রতিক্রিয়া? বুকের তুফান জমে বরফ। রক্তের দোলা থেমে গিয়েছিল। তারপরে নাম ধরে সে কতবারই ডেকেছে, কিন্তু তাতে ছিল না উচ্ছ্বাস। বরং একটা জান্তব প্রতিহিংসার ভাব। শেষে তাও রইলো না। কমলা নামটা হয়ে গেল ঘটিবাটির মতো। যদিও সে নামে খুবই কম ডেকেছে। যখন মনে হয়েছে "ছোট-বউ' বলে ডাকলে ওই মেয়েটাকে সম্মান দেখানো হচ্ছে, তখনই শুধু ডেকেছে।

আজ 'কমলা' বলে ডাকতে পারল না মহী। মনে হলো তার, অধিকার হারিয়ে ফেলেছে ও নামে ডাকার। আজ 'ছোট-বউ' ডাকের চেয়েও 'কমলা'র মূল্য বড় বেশি বেড়ে গিয়েছে।

মহী লক্ষ্য করে তার কথার জবাব দেবার পরিবর্তে কমলা আঁচল দিয়ে তার মুখ ঢেকে ফেললো এবং সে কি কাঁদছে? মহী এগিয়ে যেতে গিয়েও থেমে যায়। সে দেখে, কমলা ফুঁপিয়ে চলেছে।

কিন্তু এ কি? কমলা আঁচল সরিয়ে নেয়। তার চোখে জল কই? সে তো হাসছে।

হাসি সামলে নিয়ে কমলা বলে—তুমি ঘরে থাকলে, আমার অসুবিধে হবে কেন? সুবিধেই তো হবে। ভয় করবে না।

হতচকিত মহী চেয়ে থাকে তার বিবাহিতা স্ত্রীর দিকে। কমলা এবার প্রকাশ্যেই হাসছে।

—কি দেখছ? সত্যিই আমার অসুবিধা হবে না।

হঠাৎ কমলা থেমে যায়। সে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। মহীকে প্রশ্ন করে—আচ্ছা আমি কি হাসছিলাম? না না, কাউকে জিজ্ঞাসা করা ঠিক হয়নি। পাগল ভাববে। কিংবা ভাববে, ডাইনি।

গম্ভীর হয়ে যায় কমলা।

মহী একদৃষ্টে কমলাকে দেখে। সে বুঝতে পারে যে কারণেই হোক কমলা ঠিক সুস্থ নয়। সে যে হেসেছিল, একথা কি কাউকে বলা উচিত হবে? না। কাউকে বলবে না সে। এর পরেও যদি অন্য কারও সামনে কমলা হাসে, তাহলে কিছু করার নেই।

চারজন মানুষ কলকাতা থেকে বিদায় নিল। তিনজন বলতে গেলে সবার অজ্ঞাতে। আর একজন, অন্তত কমলা বা তার বাপের ও শ্বশুরবাড়ির অজ্ঞাতে তো বটেই।

প্রথম জন হলো নীরু। তাকে যে একবার রাধা নামে ডেকেছে, তারই সঙ্গে অদুর মৃত্যুর পরের দিন শেষ রাতে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে নৌকোয় উঠলো। গন্তব্যস্থল আপাতত শ্রীরামপুর। সেখানে চেনা জানা একজন বোষ্টম রয়েছে। তারপর শেষ পর্যন্ত নবদ্বীপ।

নীরু কল্পনাও করতে পারেনি তাদের নৌকোর ঠিক পেছনে একটা অতি সাধারণ নৌকার আরোহী হলো এককালের বিখ্যাত ব্যবসাদার এবং প্রচুর ধনদৌলতের মালিক রবার্ট গ্রাহাম। আজ সে এবং তার অংশীদার জন মুব্‌রে কপর্দকহীন প্রায়। সবাই আজ তাদের কাছে টাকা চায়—লক্ষ লক্ষ টাকা। তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বার হয়েছে। তাই তারা চোরের মতো পালিয়ে যাচ্ছে ডাচ উপনিবেশ চুঁচড়োয়। সেখানে অন্তত কেউ তাদের ধরে নিয়ে কয়েকখানায় আটকে রাখবে না। রাজার হালে থাকতে না পারলেও দু' মুঠো খেতে পাবে। তারা জানে অদ্ভুত এই দেশ। এখানে দারিদ্র্য রয়েছে, অথচ চেষ্টা করলে একেবারে না খেয়ে থাকে না কেউ।

নীরু ওই বাঁদরমুখো সাহেবদের দেখতে পায় কাশীপুর ছাড়িয়ে যাবার পর। তখন অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। জোয়ার থাকলে শ্রীরামপুরের কাছাকাছি পৌঁছে যেত এতক্ষণে। কূল ঘেঁষে চলেছে তারা। গ্রাহাম সাহেব ভেবেছিল অনেক দূর চলে এসেছে তারা। তাই একটু বাইরে বার হয়েছিল। কিন্তু বাইরেটা দেখেই বুঝতে পেরেছিল তারা কলকাতার মুঠির মধ্যেই রয়েছে। তাই তাড়াতাড়ি ছইয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কিন্তু ওরই ভেতর নীরু তাকে দেখে ফেলে। দেখেই তার শ্রীকৃষ্ণের হাত চেপে ধরে বলে—সাহেব গো।

—কোথায়?

—পেছনের নৌকোয়।

—তাতে কি? সাহেব কি যম?

—যমই তো।

নীরুর কথা তার প্রেমিকের কানে মধু বর্ষণ করছে। সে বুক চিতিয়ে বলে—আমি থাকতে যমের বাবাও কিছু করতে পারবে না।

শুধু নীরুর জন্যে—শুধুই নীরুরই জন্যে কোনো পুরুষকে এমন কথা জীবনে প্রথম বলতে শুনলো সে। তার চোখ দুটো বুজে আসে। সেই বন্ধ চোখের সামনে মানিক নামে কোনো ব্যক্তির মুখ কিন্তু একবারও ভেসে উঠলো না। অথচ এই মানিককেই সে সুখেনের মায়ের মাধ্যমে, এমনকি ছোট-বউ, বড়-বউয়ের মাধ্যমে প্রকারান্তরে গাজনের সময় ঝুল-সন্ন্যাস নিলেও বাণফোঁড়া আর কাঁটা ঝাঁপে প্রবৃত্ত হতে নিষেধ করেছিল।

নীরুর হবু-বোষ্টম বুক চিতিয়েই রইলো। ভাবখানা, যেই স্বাভাবিক হয়ে আসবে অমনি বুঝি সাহেব এসে হাঁউ মাউ খাঁউ করে নীরুকে তুলে নিয়ে যাবে।

—দেখলে রাধিকে, সাহেব ভেতরে গিয়ে লুকোলো?

—হ্যাঁগো। সত্যিই যে তাই।

—অমন কত দেখবে। এখনি কি—

ওদিকে সাহেবদের মনের মধ্যে শুধু ধরা পড়ার অস্বস্তি নয়। গ্রাহাম ভাবছিল অ্যাটর্নি হিকির কথা। মানুষটা চূড়ান্ত কেতাদুরস্ত, অত্যন্ত বাবু। অগাধ ধনের মালিক হয়েও গ্রাহামরা কখনো হিকিকে পোশাকে আশাকে টেক্কা দিতে পারেনি। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। হিকির স্ত্রীর কথা ওদের মনে পড়ে। অমন মিষ্টি স্বভাবের কর্তব্যপরায়ণ স্ত্রী সত্যিই দুর্লভ। সংসারের পরিশ্রমেই স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। স্ত্রীকে হিকি ভালোবাসত সন্দেহ নেই। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে একা থাকতে পারে না। প্রথমে একজনের সঙ্গে কিছুদিন বাস করলো। তারপর ভৃত্যের সঙ্গে তাকে শুয়ে থাকতে দেখে বিদায় করলো। এখন এক সুন্দরী স্ত্রীলোককে পেয়েছে। ডাকে তাকে 'জামদানী' বলে। সত্যিই বেশ চটপটে হাসিখুশি। গ্রাহামের ভালোই লাগে তাকে। ভারতীয় মহিলা বলে কোনো সঙ্কোচ বা সংস্কার নেই বিশেষ। কিন্তু কথা তা নয়। কথা হলো এই জামদানীর জন্যে হিকি চুঁচড়োয় একটা বাড়ি কিনে মুশকিল

করেছে। ওদের কোনো ক্ষতি করতে না পারলেও সামনা-সামনি দেখা হলে চক্ষুলজ্জা বলে একটা পদার্থ তো আছে? গ্রাহাম বসে বসে সেই কথাই ভাবছিল। আর নীরু আড়চোখে মাঝে মাঝে দেখছিল তার শ্রীকৃষ্ণ কিরকম তন্ময় হয়ে তার দিকে চেয়ে রয়েছে। সে চেষ্টা করে তার মুখের কঠিন রেখাগুলোকে যতটা পারে নরম করতে, আর ওষ্ঠদ্বয়কে একটু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়ে হাসি হাসি করে তুলতে।

বোষ্টমের কথা বাদ দিলে গ্রাহাম, মুব্রে আর নীরু কাক-চিল জাগার আগে সবার অজ্ঞাতে সরে পড়লো। আর একজন এই একই দিনে কলকাতা ছেড়ে চলে গেল সুদূর নাটোরে—রাণী ভবানীর নাটোর। তার বাড়ির সবাই সে কথা জানে। জানে অনেক বেশি টাকার বেতন পেয়ে সে কলকাতা শহর ছাড়লো। তাই দুঃখ থাকলেও সেটা অবিমিশ্র নয়। কিন্তু যে গেল সে চোখের জল সবার সামনে না ফেললেও, মনটি তার নিভৃতে কেঁদে চলেছিল। সে হলো রামরতন চক্রবর্তী। অনেকদিন থেকে সে বুঝতে পেরেছিল, এ শহরে থাকলে নিজে সে শান্তি পাবে না—কমলার শান্তির পথেও কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে। তাই চেষ্টা করেছিল কলকাতা ছেড়ে অনেক—অনেক দূরে চলে যেতে। সাহেব মহলে তার যথেষ্ট সুনাম ছিল। শেষ পর্যন্ত এক সাহেব তার কাছে প্রস্তাব করলো। হিকি সাহেবকে না বলে সে কথা দিতে পারে না। কিন্তু হিকি সাহেব তার উন্নতির পথে বাধা হলো না। বেশি বেতন পেলে যাবে না কেন?

যাবার আগে, বড় ইচ্ছা ছিল কমলার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে। সেটা কোনো অন্যায় নয়। কমলার সঙ্গে দেখা করার পরে তার বাপের বাড়ির সকলের সঙ্গেও দেখা করার ইচ্ছা ছিল রামরতনের। কিন্তু কমলাদের শ্বশুরালয়ের বহির্দ্বারে দাঁড়িয়েই যে অভ্যর্থনা পেল, তাতে আর কোথাও যাওয়া হলো না। কমলার দুর্ব্যবহারে সে এতটুকুও অপমানিত বোধ করেনি নিজেকে। সে জানে কি নিদারুণ মনোকষ্টে কমলা তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। তবু মনটা বিষণ্ন হলো শেষবারের মতো একটা দুটো কথা বলে যেতে পারলো না বলে। রামরতন আগেই মনস্থির করে ফেলেছে এই শহরে সে খুব শিগ্‌গির আর ফিরে আসবে না। হয়তো কোনোদিনই নয়। রামরতন কিন্তু চোরের মতো গেল না। বরং বলা যেতে পারে কিছুটা রাজকীয় ভাবেই সে শহর ছাড়লো। প্রথম কিছুটা পথ তার নিয়োগকর্তা সাহেবের সঙ্গে হাতির পিঠে চেপে। চিৎপুর ধরে চললো সে। তাই একসময় তার হাতির আর কমলার শ্বশুরবাড়ির দূরত্ব অর্থাৎ তার আর কমলার মধ্যে ব্যবধান খুবই কমে গিয়েছিল। সেই সময় মনটা কেমন একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তারপর মারাঠা খাল পার হয়ে সে হালকা হয়েছিল। কমলার জন্য একটা চাপা দুঃখের রেশ কিন্তু থেকেই গেল। ছেলেটি ছিল, তাও সইলো না ঈশ্বরের। স্বামী যেমনই হোক, রামরতন শুনেছে ছেলের মুখ চেয়ে অনেক স্ত্রীলোক অনেক দুঃখ ভুলে থাকার চেষ্টা করে। ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার কিছুটা সুযোগ পায়। সেই স্বপ্ন রঙিন কখনোই নয়—তবে তাতে একটা ভরসা থাকে। কমলা এই সামান্য স্বপ্নটুকু দেখার অবলম্বন হারিয়ে ফেললো।

নাটোর কেমন জায়গা রামরতন জানে না। সাহেবের কাছে সে শুনতেও চায়নি। শুধু জানে, নাটোর অনেক দূরে। রাণী ভবানীর পোষ্যপুত্র এক কালীসাধক সেখানে বাস করেন এই কথা সে শুনেছে অনেকের কাছে। কিন্তু সাহেবরা ও-ব্যাপারে আদৌ উৎসাহী নয় জেনে সে প্রশ্ন করতে চায়নি।

গঙ্গার পাড় ঘেঁষে চলতে চলতে রামরতন ক্রমেই কমলার কাছে থেকে দূরে সরে যায়। শেষে মা গঙ্গার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে মনে মনে প্রার্থনা করে, কমলা যেন নিজেকে কখনো অসহায়বোধ না করে। কখনো যেন কেউ ওকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে না দেখে। স্বামীর সৌভাগ্যে সেই ভাগ্যবতী না হলেও ও যেন সবার চোখে শ্রদ্ধেয়া হয়ে ওঠে।

মহী তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকে পথের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত। সে ভুলে যায় যাকে দেখে চোখে ধাঁধা লেগেছিল সে ঘোড়ায় টানা সুদৃশ্য গাড়িটিতে চেপে বহুক্ষণ আগে চলে গিয়েছে। তার গাড়ির চাকা, আর অশ্বের খুরের থেকে শুধু ধুলো উড়ে পথকে কিছুটা ধোঁয়াটে করে রেখেছে এখনো।

এতদিনে কানে শুনে এসেছে—আজ চোখে দেখলো। বুঝলো, যারা ভদ্রমহিলার রূপের কথা এতদিন বলেছে, তারা কিছুই বলতে পারেনি। মিস্ ডানডাস্ না হয় নিজে স্ত্রীলোক—অন্য স্ত্রীলোকের রূপের বর্ণনা তার পক্ষে ঠিকমতো দেওয়া সম্ভব না হতে পারে। কিন্তু আরও কত লোকের মুখেই তো শুনেছে। কেউ বলেছে, অনেকটা পাগলির মতো। চুলগুলো কেমন যেন। পোশাকও পরে অদ্ভুত। তবে মুখখানা মিষ্টি। কিন্তু হলে কি হবে, অমন সাদা রঙ ঠিক যেন মনে ধরে না। রঙ হবে বাঙালী রূপসীদের মতো কাঁচা সোনার। চোখ হবে ভ্রমর কালো। চুল হবে কালবৈশাখীর মেঘের মতো—তবে না রূপ?

মহীর মুখ বিরক্তিতে ভরে যায়। সবাই বোকা। রূপ যেন ছাঁচে ফেলা জিনিস। এই যে যিনি এইমাত্র চলে গেলেন—তিনি তো অসামান্যা রূপসী। অথচ বাঙালীর মতো রূপসী নন। দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষের যোগ্য স্ত্রী বটে। হেস্টিংস সাহেবের মেম। লোকে বুঝতে পারে না। ওই যে গোলগাল সোনালি চুল সারা মাথায় ছড়িয়ে আছে—ওর সত্যিই তুলনা নেই। পোশাকের মধ্যেও স্বাতন্ত্র্য। অন্য মেমসাহেবরা এ ধরনের পোশাক পরতে সাহসই পাবে না।

মহী ভাবে, এমন একজন মহিলা মুর্শিদাবাদের হারেমে কোনোদিনও পাবে না। পেতে হলে কালাপানি ডিঙিয়ে ওদেশের রাস্তার ওপর হা-পিত্যেশ হয়ে বসে থাকতে হবে। মিস্ ডানডাস্ কবে চলে গিয়েছে। তবু এই মহিলার রূপের স্তুতি তার মুখেই প্রথম শুনেছিল মহী। ভাঙা ভাঙা বাংলা, হিন্দি ইংরিজি মিশিয়ে কথা বলতো ডানডাস্ তার সঙ্গে। কিন্তু হেস্টিংস সাহেবের মেম সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই খাঁটি ইংরিজিতে বলে ফেলতো। পাঁচ মিশেলি ভাষায় বোধহয় ঠিকমতো প্রকাশ করা সম্ভব হতো না তার পক্ষে। তবে শত হলেও মিস্ ডানডাস নারী। তাই অন্য নারীর প্রতি প্রচ্ছন্ন হিংসা একটু থাকবেই। সে বলতো এই রূপসী মহিলা নাকি অত্যন্ত দাম্ভিক। তার মাথার চুল আর পোশাক যে অদ্ভুত ধরনের। তার মূলেও এই দাম্ভিকতা। লোকে যাতে বুঝতে পারে, সে সন্ধ্যার সময় ঘোড়া কিংবা গাড়ি চেপে বেড়াতে বার হওয়া এবং এর ওর বাড়িতে ভোজ খেতে যাওয়া অন্যান্য মেমসাহেবদের মতো নয়। সে অনেক উঁচু দরের। ডানডাস্ বলেছিল, কোথাও কোনো উৎসবে হেস্টিংসের স্ত্রী উপস্থিত থাকলে স্বভাবতই মহিলারা তার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করার সজন্য ব্যাকুল হয়। নইলে তাদের স্বামীরা অসুবিধায় পড়তে পারে। এই মহিলা সেখানে গিয়ে এককোণে বসবে। কোনোদিকে চাইবে না। মহিলারা যদি যেচে তার সঙ্গে আলাপ না করে তবে বিরক্ত হবে।

আজ স্বচক্ষে একে দেখে এর শত সহস্র দোষ মহী এক মুহূর্তে ক্ষমা করে দেয়। কিন্তু তার পরেই সে বাস্তব জগতে ফিরে আসে। বুক ব্যথা করছে। ঝোঁকের মাথায় সে আবার পুরোনো কেল্লার কাছে চলে এসেছে অনেক দিন পরে। বাড়িতে তো ছিলই সে। কারণ কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করেনি। বরং ছেলেটি মারা যাওয়ায় কমলার ওপর তার সহানুভূতি জেগেছিল। কিন্তু কমলা তাকে চায় না—চায় না। যদি রাগ করতো, ঘৃণা করতো তবু মহী বুঝতে পারত সে একজন মানুষ। কিন্তু কমলা তার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। সে যেন কোনো জীবিত প্রাণীই নয়। দু' চারদিন কথা বলার চেষ্টা করেছে মহী। কমলা নিজে থেকে কথা বলে না একটাও। সে যদি কিছু বলে, তবে একটা দায়সারা জবাব দেয়। যদি একটাও কথা না বলতো, তার একটা অর্থ ছিল। কিন্তু এ যেন আরও অসহ্য। দাদাকে কিংবা বড়-বউকে বলতে পারে না মহী। কেউ বিশ্বাস করবে না তার কথা। সে তো খারাপ। কত কষ্ট করেই না একটি মাস বাড়িতে বসে কাটালো সে। দিনে রাতে বুকে ব্যথা উঠেছে। কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে এসেছে। তবু কমলা একটা কথাও বলেনি—এতটুকু ব্যস্ত হয়নি। ও হয়তো ভেবেছে তার কোনো কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু

কী যে কষ্ট। আর ওই রক্ত? ওই রক্ত কেন যে বার হয়। দিন দিনই বাড়ছে। খুব তাড়াতাড়ি বাড়ছে। ওই রক্তের কথা বাড়ির কেউ জানতো না এতদিন। কাশির আওয়াজ শুনে দাদা বলেছে কবরেজ ডাকবে। মহী মানা করে দিয়েছিল, কবরেজকে তাহলে রক্তের কথাও বলতে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গিয়েছে দাদার কাছে। ধুতির একদিকে অতটা রক্ত লেগেছিল কে জানতো? দাদার চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যি কথাই শেষ পর্যন্ত বলে দিতে হয়েছিল। আজ কবরেজ আসার কথা। তাই পালিয়ে এসেছে। খালি হাতে আসেনি। কমলার এক ছড়া হার নিয়ে এসেছে। ইচ্ছে হয়, আমড়াতলার ডি সুজার কাছে একবার যায়। কিন্তু সে ঢুকতে দেবে বলে মনে হয় না। তবে?

এই তবের উত্তর পেয়ে গেল মহী মধুসূদনের কাছে। বহুদিন পরে যেন দৈব প্রেরিত হয়েই মধুসূদন তার সামনে আবির্ভূত হলো। এই মধুসূদন বিচারক স্যার উইলিয়াম জোন্সের বাড়ির ভৃত্য। তার আগে সে ছিল বিচারক লা মেতরের ভৃত্য। লা মেতর মারা গিয়েছে ক' বছর হলো। তার জায়গায় জোন্স সাহেব এলো কয়েক বছর বাদে। লা মেতর মারা যাবার পর মধুসূদনের কোনো কাজ ছিল না। অথচ সে দিব্যি খরচা করত। মহীর সঙ্গে একত্রে বসে বহু মদ খেয়েছে। তারপর মহী মিস্ ডানডাসকে নিয়ে বার হয়ে গেলে সেও কোনো দিশি স্ত্রীলোককে নিয়ে বার হয়ে গিয়েছে। লোকে বলে, লা মেতরের টাকা রাখার কোনো গুপ্তস্থানের সন্ধান জানতো মধুসূদন। সেই টাকাই হাতিয়ে নিয়েছে মনিবের মৃত্যু হলে। নইলে এমনভাবে খরচ করতে পারত না। এই মধুসূদন জোন্স সাহেব আসার সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে 'সেলাম' দিয়ে দাঁড়ায় এবং লা মেতরের নাম উল্লেখ করে বলে, জোন্স সাহেবের বাড়ির ভৃত্য হবার অধিকার তারই সবচেয়ে বেশি। অন্যান্য সাহেবরা মধুসূদনকে চিনতো। জোন্সের সামনে সে কথা তারা বললে, সহজেই মধুসূদন কাজটি পেয়ে যায়।

মধুসূদন কোন্ জাতের সেটা একটা রহস্য। সে অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে গোরুর এবং শূয়োরের মাংস খায়, প্রকাশ্যেই খায়। এমন নামের মানুষটির এই অনাচার অনেকে ঠিক সহ্য করতে পারে না। তারা রেগে গেলে সে হেসে ফেলে বলে—আমি হিন্দুও না, মুসলমানও নই।

—তবে তুই কি রে শালা?

—আমি সাহেব। মধুসূদন হিহি করে হাসে।

—ইস্ সাহেব। রঙটা তো জাহাজের খোল।

—আহা, সাহেব মানে বিলেতের সাহেব না। দিশি সাহেব।

—তাই হয় নাকি?

—হয় না? দিশি মেয়েছেলের পেটে সাহেবদের যে বাচ্চা আসছে, তারা তবে কি?

হিকি সাহেবের পেয়ারের ভৃত্য চাঁদ খুব ওস্তাদ। সে মধুসূদনকে বকুলতলার হাটে কিনে তালতলার হাটে বেচতে পারে। দিশি সাহেব যদি বলতে হয় কাউকে, তবে সে চাঁদ। হিকি সাহেবের আস্কারায় সে তাদের মতো পোশাক পরে, ঘোড়ায় চড়ে ফিটন চালায়। সেই চাঁদ মধুসূদনের চেয়ে অনেক ছোট। তবু ফিক্ ফিক্ করে হেসে বলে—তোর বাবা তবে কে?

—কি বললি?

—তুই তো দিশি সাহেব। কোন্ সাহেব তোর বাবা? এলিজা ইম্পে তো নয়। কেল্লার কোন্ গোরাটা? তোর মা জানে তো ঠিক?

মধুসূদনের চোখ মুখ লাল হয়ে যায়। নিজের ফাঁদে নিজে পড়েছে। কিছু বলতে পারে না চাঁদকে। যারা তাকে ঘিরে হো হো হোক করে হাসছিল, তাদেরও কিছু বলতে পারে না। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।

ধীর কণ্ঠে বলে—অল্প বয়সে বেশি বুঝে ফেলেছিস চাঁদ? আমি আসলে কিরিশ্চান। যীশুর ভজনা

করি।

চাঁদও ছাড়বার পাত্র নয়। বলে—কোন্ চার্চে ভজনা কর? কোন্ বিশপ কিরিশ্চান করলেন?

চাঁদ সাহেবদের সব কিছু জানে। মধুসূদন একেবারে বোকা বনে যায়। শেষে বলে—তুইও সাহেবের বাড়ির লোক, আমিও তাই। তুই আমাকে ছোট করছিস?

—না। ছোট করবো কেন? তুমি স্বীকার কর।

—করবো না। যা।

মধুসূদনের চেহারাটা দশাসই। রীতিমতো শক্তিশালী সে। তাই সে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই চাঁদ চুপ করে যায়। সে জানে মধুসূদনের একটা দলও আছে গঙ্গার ধারে। তারা খুব ভালো কাজ করে না। তাছাড়া তার মনিব যেমন অ্যাটর্নি সাহেব, মধুসূদনেরও মনিব তেমনি জাস্টিস সাহেব। সেইদিক দিয়ে সুবিধা করা সম্ভব নয়।

এহেন মধুসূদন মহীর সামনে দেবদূতের মতো আবির্ভূত হয়। দেবদূতই বা বলি কেন? অসহায়ের সম্বল, অন্ধের যষ্ঠির মতো পরিত্রাতা শ্রীমধুসূদন। মহীকে দেখে চলতে চলতে থেমে যায় মধুসূদন।

—একি বাবু। রাস্তার ধারে বসে।

—এমনি—

—বুকে কি হয়েছে? চেপে ধরে আছেন কেন?

—কিছু হয়নি মধু।

—চেহারা ভীষণ খারাপ হয়েছে। অসুখ করেছে নাকি?

—না—এই একটি জ্বর হয়েছিল।

—তাই বলুন। চোখ মুখ সব বসে গিয়েছে। বাড়ি যাবেন কেমন করে?

—বাড়ি আর যাব না।

—এ্যাঁ। তার মানে—

—সেই ডি সুজা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

—জানি। খুব শাঁসালো লোক পেয়েছে। লোকটা জাহাজে মাল দেয়। আমি ভেবেছিলাম সেই দুঃখে আপনি ঘরমুখো হয়েছেন।

—না।

—জানি জানি। বাইরের স্বাদ একবার পেলে কি ঘরে মন যায়? একটু সেরে উঠতেই তাই ছুটে এসেছেন।

—কিন্তু কোথায় যাব?

—কড়ি ফেললে, অভাব আছে নাকি?

—সেকথা নয়। ওই সব মেমসাহেবদের কাছে আর যাব না মধু।

—কেন? এর মধ্যেই অরুচি?

—না। কিন্তু ওরা বড্ড স্বার্থপর। ওদের প্রাণে মায়া নেই।

—মায়া? কার ওপর?

—কেন? যার সঙ্গে থাকবে?

—বাবু আপনার শরীর সত্যিই খারাপ। আপনার মতো মানুষ এই কথা বললেন? এ পথে ফেলো কড়ি মাখো তেল।

—না না। সবাই কি তাই?

—হ্যাঁ।

—আমাকে একটা দিশি মেয়ে যোগাড় করে দিতে পার মধু?

—নিশ্চয়ই। এ তো সহজ?

—একটু নরম-গরম হয় যেন। জোরে কথা বলবে না, ঝগড়া করবে না—

—বাব্বা—

—কেন?

মধুসূদন ভাবে মহী নিশ্চয় খুব অসুস্থ। তাই থেমে যায়। বেনিয়ান গোপাল মুখুজ্জের সাক্ষাৎ ভাই। এর সঙ্গে রসিকতা করা ঠিক নয়। বরং একটু উপকার করাই ভালো?

সে বলে—শান্তিবালার কাছে যান তবে সত্যিই শান্তি পেতে পারেন।

—আমাকে নিয়ে চল।

—আমার যে অন্য কাজ আছে।

—কোথায় থাকে সে?

—আগে চাঁদপাল ঘাটের কাছেই থাকতো। এখন একটু ভেতরে গিয়েছে।

—কোথায়?

—চৌরঙ্গীপাড়ায় যেখানে বাজার বসে, তার পেছনে।

—সে তো অনেক দূর। আমি যেতে পারব এখন?

—আস্তে আস্তে চলে যান।

মধুসূদন একটু এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসে। বলে—শান্তিবালা খুব ভালো মেয়ে। ফলতা থেকে এসেছে ছয় মাস হলো। ও আপনার ডি সুজার মতো নয়। গেরস্থ মেয়ে।

—তবে এলো কেন?

—ওর স্বামী মরে গিয়েছে গাছ থেকে পড়ে। নিজেদের অনেক জমিজমা। নারকেল গাছ আছে দু'শো। সেই গাছে উঠেই পড়ে যায়। ওর দেওর তখন রটিয়ে দেয় আত্মহত্যা করেছে তার ভাই। ভাই-বউয়ের স্বভাব ভালো নয়—সেই দুঃখে। গাঁয়ের লোকেরা বলে শান্তিবালাকে সহমরণে যেতে হবে। প্রমাণ করতে হবে সে সতী। সেই দিনই পালিয়ে আসে শান্তিবালা। দেওরের বরাবর লোভ ছিল দাদার জমিজমার ওপর।

—আহা, বড় কষ্ট তো। মেয়েদের আবার স্বভাব খারাপ হয় নাকি? তারা কি ব্যাটাছেলে? গাঁয়ের লোক বুঝলো না?

—এটা কেমন কথা বললেন বাপু? মেয়েদের স্বভাব খারাপ হয় না?

—যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের কথা বলছি।

মধুসূদনের বুকের ভেতরের স্পন্দন যেন থেমে যায়। হয়তো সে বলেই ফেলতো তার নিজের জীবনের কথা। বললো না। মহীকে খুবই অসুস্থ মনে হচ্ছে দেখে। সে বলে—আজ আপনি বাড়ি চলে যান। একটা পালকি ভাড়া করে নিন। পরে আসবেন। আমি শান্তিবালার কাছে নিয়ে যাব।

—নাঃ। বাড়ি যাব না মধু। শান্তিবালার কাছেই যাব। তাড়িয়ে তো দেবে না। মিষ্টি ব্যবহার করবে বলছো তুমি।

মধু মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চলে যায়। তার আজ সত্যিই অপেক্ষা করার সময় নেই। তার সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েছে ক'দিন থেকে।

গোপাল মুখুজ্জের মন কিছুদিন থেকে খারাপ। আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবারের ওপর যেন কিসের দৃষ্টি পড়েছে। প্রথমে মহীর ছেলে অদু মরলো। তারপরেই নীরুর অন্তর্ধান। নীরু এ বাড়ির

কেউ না। অথচ পাড়ার সবাই সেই প্রসঙ্গ তুলে বাঁকা কথা শোনায়। যেন নীরুর সঙ্গে তাদের রক্তের সম্পর্ক। সে কার সঙ্গে পালিয়েছে, একথা এখন সবাই জানে। অনেকে নীরুর সঙ্গে তাকে আখড়ার অদূরে গোপনে কথাবার্তা বলতেও নাকি শুনেছে। অথচ তখন কেউ বলেনি। যেন চূড়ান্ত দিনটির জন্যে অপেক্ষা করেছে, গোপাল মুখুজ্জেকে টেনে ধরে কিছুটা নীচে নামানোর মতলবে। বয়ে গেল গোপাল মুখুজ্জের। দু'হাতে যতদিন টাকা লুটতে পারছে, ততদিন এসব গ্রাহ্য করে না। কিন্তু নিজের সহোদর ভাইটির কথা ভেবে তার মাথায় আগুন জ্বলে।

কবরেজ মশায় মহীকে পরীক্ষা করতে পারেনি। নাড়িও দেখেনি। তবু গোপালের মুখে রোগের লক্ষণের কথা শুনে গম্ভীরভাবে মাথা দুলিয়েছে। বলেছে যে কত রোগেই রক্ত বমন হয়। তার মধ্যে রাজযক্ষ্মাও একটি। কবরেজ অনেক কিছু জানতে চেয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল সায়াহ্নে নাড়ি চঞ্চল হয় কিনা। খাদ্যে রুচি আছে কিনা ইত্যাদি। উত্তর দিতে পারেনি গোপাল মুখুজ্জে। মহী জানিয়েছে। পালিয়েছে বলাটা ভুল। প্রথমে তাই ভেবেছিল গোপাল। পরে হেমলতার মুখে সব শুনে বুঝেছে, অভ্যস্ত পথেই গিয়েছে মহী।

ছোট-বউয়ের দিকে তাকানো যায় না। স্বামী-পুত্র সবই ছিল। পুত্র গেল। স্বামী থেকেও নেই। অথচ কত বড় আশ্বাস সে দিয়েছিল মহীর শ্বশুরমশায়কে। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। তবে ছোট-বউকে সে পুঁথি এনে দেয়। ইংরিজি বইও এনে দিয়েছে। তাছাড়া ভাগ্যক্রমে ইংরিজি বই এনে দেবার একজন লোক পেয়ে গিয়েছে। দৈবাৎ বজ্রনাথের সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে গিয়েছিল রাইটার্স বিল্ডিংস-এর পাশে। হাতে একখানা ইংরিজি বই। দেখে অবাক গোপাল মুখুজ্জে। পঞ্চানন ঘোষের ছেলের হাতে ইংরিজি বই? এ যে জলে ভাসে শিলা? খুব আনন্দ হয়েছিল। জ্ঞানের কথা দু' চারটে বলে শেষে বলেছিল ছোট-বউয়ের জন্য ইংরিজি বই সংগ্রহ করে দেবার জন্য। বলেছিল, বজ্রনাথ তার নিজের জন্যে বই কিনলেও টাকা দিয়ে দেওয়া হবে। সহজেই রাজি হয়েছিল বজ্রনাথ। যাক ঘোষ বাড়ির একজন অন্তত নবাবদের মোহ ছাড়তে পেরেছে। বজ্রনাথের চালচলন দেখে আগেই সন্দেহ হতো গোপাল মুখুজ্জের যে ছেলেটা সাহেবদের সঙ্গে মেশে। এখন নিঃসন্দেহ হলো। পঞ্চানন ঘোষের অনেক কথা হজম করেছে। একবার বলুক দেখি এবারে?

কিন্তু ছোট-বউয়ের কথা। তাকানো যায় না। হেমলতা বলে ছোট-বউয়ের মুখ চোখ নাকি ভাবলেশহীন। মহীর জন্যে কাতরতা প্রকাশ পায় না। অদুর জন্যেও কখনো নিরিবিলিতে কাঁদতে দেখা যায় না। হেমলতা ছোট-বউয়ের এই ধরন মেনে নিতে পারে না। প্রকারান্তরে সে কথা বোঝাতে চায়। সে আরও যে পাথর হয়ে গিয়েছে শোকে তাপে। এই তো আঠারোতে পা দেবে কি দেবে না। এর মধ্যে কত শোক তাপ পাচ্ছে। কয়জন সইতে পারে? গোপাল মুখুজ্জের হৃদয়টা আরও উদ্বেলিত হয়। সে ঠিক করে যেভাবে হোক মহীকে খুঁজে ঘরে আনতে হবে। এর জন্যে খারাপ মেয়ে মানুষের ঘরে ঘরে ঘুরতে হয় ক্ষতি নেই।

হেমলতাকে দৃঢ়ভাবে সেই কথা জানাতেই স্ত্রী জ্বলে ওঠে। তাকে এমনভাবে রেগে উঠতে জীবনে প্রথম দেখলো। ভাবে, মেয়েরা নাকি কল্যাণময়ী? এই কি তার রূপ? এত রূপসী হওয়া সত্ত্বেও বড়-বউকে এই মুহূর্তে অমন বিশ্রী দেখতে লাগছে কেন? স্বামীর কাছে রামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠাবার আবদার করার সময় রামায়ণের কৈকেয়ীকে কি এইরকম দেখতে লেগেছিল?

গোপাল মুখুজ্জে শক্ত চোয়ালে ভাবে, সে রাজা দশরথ নয়। মুখে বলে—মহীকে খুঁজে বার করতেই হবে।

—তুমি নিজে যাবে?

—হ্যাঁ নিজেই যাব। ওকে ঘরে না এনে আমার শান্তি নেই।

—জোর করে ধরে রাখতে পারবে?

—জোর করে ধরে রাখা যায় বৈকি? কিন্তু তাতে লাভ নেই। বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাখতে হবে। ওর চিকিৎসা করতে হবে।

—পাড়ায় যে ঢিঢি পড়বে? লোকে বলবে, অমুক মুখুজ্জের টাকা হয়েছে, তাই। ভাইয়ের মতো ওই সব জায়গায়—

—বড় বউ।

হেমলতা চমকে ওঠে। এ কী তেজ স্বামীর। এত তেজ তো দেখেনি কখনো। তার বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে। তারপর তার খেয়াল হয় কাঁদলে স্বামী নরম হয়ে যায়। এমন কি আদরও করে। তাই কান্না থামতে চায় না। অদুর মতো চ্যাঁচাতে থাকে।

—কিন্তু গোপাল মুখুজ্জে নীরব। এক পা এগিয়েও এলো না। তাই আঁচলে চোখ মুছে সে বলে—আমাকে স্বার্থপর ভাবলে?

—হ্যাঁ।

—স্ত্রী হয়ে স্বামী-পুত্রের মঙ্গল দেখা স্বার্থপরতা?

—স্বামী পুত্রের মঙ্গল কি শুধু স্বামী-পুত্রের দিকে চাইলেই হয়?

হেমলতা বুঝতে না পেরে চেয়ে থাকে।

গোপাল বলে—স্বামীর যাতে সুখ, যাতে শান্তি সেটাও দেখতে হয়। স্বামীর বংশের যাতে ভালো হয়, সেটাও বাদ দিতে নেই। অত অল্প নিয়ে থাকতে নেই বড়-বউ। গণ্ডী কেটে দিয়ে সীতাকে রক্ষা করা যায়নি। গণ্ডী যত ছোট হবে, তোমার ক্ষমতা ততই কমে যাবে। মনটা উদার কর, দেখবে কত শান্তি।

হেমলতা স্বামীর কথা শুধু শুনেই যায়। তার অন্তরে প্রবেশ করে না। কারণ সে সত্যিই স্বামী ছাড়া কিছু বুঝতে পারে না। তবে এটুকু সে বুঝলো মহী সম্বন্ধে কোনোরকম প্রতিবাদ করা আর চলবে না। কমলার ওপর কেন যেন তার নরম ভাবটা বেশ হ্রাস পেয়ে গেল।

স্বামী বাইরে চলে যেতেই সে ধীরে ধীরে কমলার ঘরের দরজায় চৌকাঠের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। যেটুকু শ্রী ছিল ঘরখানাতে, তাও নেই। মেয়েটিই অলক্ষ্মী—নইলে একটু গোছগাছ করে রাখতে পারে না?

কমলা একমনে বই পড়ছিল। মেঝেতে মাদুর পাতা। জানালার দিকে মুখ করে বসেছে সে। হেমলতাকে দেখার প্রশ্ন ওঠে না। তবে তার মুখের এক পাশটা দেখা যায়। তন্ময় হয়ে পড়ছে কমলা। তার এই তন্ময়তাকে হিংসা করে হেমলতা। কী এমন পায়, ওই পুঁথির মধ্যে যার ফলে সংসারের সব কিছুর ওপর এত অনীহা? আর কেউ না বুঝুক, হেমলতা তো বুঝতে পারে যে স্বামী পুত্র কারও ওপর ওই মেয়েটির টান ছিল না কখনো। যে লোকটি নাটোরে পালিয়েছে, তার ওপরও তো টান নেই দেখা গেল। কী পায় ওই বইয়ের মধ্যে? মেয়ে হয়ে সোনার গয়নার ওপরও এতটুকু লোভ নেই। সোনার ওপর লোভ নেই বলে বোধহয় মেয়েটি অলক্ষ্মী।

ওমা এ কি! হেমলতা দেখতে পায়, কমলার মুখে হাসির তরঙ্গ খেলা করছে। অথচ অন্য সময় হাসতেই দেখা যায় না বলতে গেলে। সবই তাহলে অভিনয়। এ কি! খুক্ খুক্ করে মুখে আঁচল চেপে হাসছে কমলা! তারপর লুটিয়ে পড়ে মাদুরের ওপর।

—ছোট-বউ।

ধড়মড় করে উঠে বসে কমলা। আঁচল-চাপা হাসি কোথায় মিলিয়ে যায়। সেই ভাবলেশহীন মুখে বলে—দিদি।

—ঢং। এই তো হাসছিলি বিয়ের কনের মতো। কোথায় গেল সেই হাসি। কমলা মাথা নত করে।

—তুই কি তাহলে আমাদের সঙ্গে খেলা করিস!

—খেলা। কী বলছো দিদি?

—ঠিকই বলছি। তোর ভাশুর তোদের ভাবনায় অস্থির। ঠাকুরপো কোথায় পড়ে আছে ঠিক নেই। এদিকে তুই গম্ভীর হয়ে আছিস। তোর ভাশুরের শান্তিটুকু কেড়ে তোর কি লাভ?

—ছিঃ ছিঃ দিদি। তুমি এ কি বলছো? ওঁর শান্তির জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি। শুধু ওঁরই জন্য আমি একটু ভুলে থাকতে পারি।

—কি ভুলে থাকতে পারিস?

—সব কিছু। উনি বই এনে দেবার ব্যবস্থা করে আমাকে বাঁচিয়েছেন। ভুলে যাই আমি ঘোষালদের বাড়ির মেয়ে—ভুলে যাই আমি মুখুজ্জেদের বাড়ির বউ। আমি ছেলের মা তাও ভুলে যাই।

হেমলতা বলে—কি বলছিস তুই? এ তো সাংঘাতিক কথা। পুঁথি পড়লে লোকে পাগল হয়ে যায় নাকি? তা অমন পাগলামি এমনিতে মাঝে মাঝে করলে পারিস। সবাইকে দেখিয়ে মাঝে মাঝে অমন করে একটু হাসিস তো ছোট-বউ। নইলে তোর বুকের আগুন থেকে আমার বুকেও আগুন লাগতে শুরু করেছে।

—এ সব কি বলছো তুমি দিদি?

এতক্ষণে হেমলতার চোখ ছলছল্ করে ওঠে। তার ঠোঁট ফুলে ওঠে। কমলা তাই দেখে কাছে এগিয়ে আসে। হেমলতা কেঁদে ফেলে। কমলা তাকে জড়িয়ে ধরে।

—দিদি কেঁদো না, বলো আমাকে কী করতে হবে। আমি তাই করবো। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে? তুমি তো জানো, অদু চলে যাবার পর বাবার কাছে বেশি যাই না। এবার থেকে একেবারেই যাব না। তোমার জন্যে সব করবো দিদি। যা বলবে সব।

হেমলতা তখন তার স্বামীর সঙ্কল্পের কথা বলে কমলাকে। বলে—ঠাকুরপোর জন্যে ওঁরও দুর্নাম হবে। বল্‌তো, কী করে সহ্য করি?

—তাই তো। এটা ঠিক হলো না।

—কি করে ফেরাই বল্ তো? বলছেন রোজ ঘুরে ঘুরে দেখবেন ওই সব পাড়ায়। ওঁর সন্দেহ ঠাকুরপো লুকিয়ে রয়েছে। নইলে খুঁজে বার করা এমন কিছু অসুবিধা হতো না। তুই যদি একটু ধরে রাখতে পারতিস ঠাকুরপোকে তাহলে এটা হতো না। কেন পারিস না রাক্ষসী—কেন পারিস না। তুই না ওর বিয়ে করা বউ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কমলা ধীরে ধীরে বলে—এবারে একবার ধরে এনে দাও। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো।

—পারবি!

—হ্যাঁ। মনে হচ্ছে পারবো! কেন পারবো না?

হেমলতা অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে, কমলা ভাবে কেন পারবে না সে। নিজের মনটাকে হত্যা করে সব কিছুই পারা যায়। সেও ঠিক পারবে। মহীর মতো শুধু সাধারণ কথা বলতে হবে। মহী আগে যেমন স্থূল রসিকতা করতো, সেই রসিকতার উপযুক্ত জবাব দিতে না পারলেও অন্ততঃ হাসতে পারবে। মহীর সব ইচ্ছার যূপকাষ্ঠে নিজেকে বলি দিতে হবে। দেবে সে—তাই দেবে। বড়-ঠাকুরের বংশের মর্যাদা সে রাখবে। বাবার মুখে ভাশুরের অনেক প্রশংসা শুনেছে কমলা। সে জানে অন্য কেউ হলে তাদের কবে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হতো। তারই প্রতিদান দিতে হবে। দেবে সে।

রামরতন চক্রবর্তী ভেবেছিল নাটোরে পালিয়ে গিয়ে সে কমলাকে ভুলে থাকতে পারবে। বেশ কিছুদিন অনেক চেষ্টা করলো। শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হলো। তবু সে বুঝলো, কমলাকে ভুলতে না পারলেও নাটোরেই তাকে থাকতে হবে। হয়তো চিরকাল। এইভাবে এখানে প্রথম যৌবন পার হবে। মধ্যম যৌবনও অস্তমিত হবে। শোকে প্রৌঢ়ত্ব থেকে বার্ধক্য—যদি অতদিন না বাঁচে?

নাটোরে যাবার পর তার আর একজনের কথা প্রায়ই মনে হয়। সে হলো তার পূর্ববর্তী প্রভু অ্যাটর্নি হিকি। হিকি জানতো যে রামরতন বেশ ভালো ইংরাজি বলে। লেখেও ভালো। তার লেখা চিঠিপত্র অনেক সময় সংশোধন না করলেও চলতো। কিন্তু হিকি জানে না তার রাইটারটি একজন কবি—ইংরাজিতেও যে কবিতা লিখতে পারে। এখানে এসে হিকির কাছে নিজের মন খুলে একটা চিঠি লিখতে ইচ্ছা হলো রামরতনের। আর হৃদয়কে উদ্ঘাটিত করার জন্য কবিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে তো কিছুই নেই। তবু রামরতনের দ্বিধা হলো সাহেব কী ভাববে! শেষে সে লিখলো। কারণ সে জানে যে হিকি সাহেবের সঙ্গে জীবনে তার দেখা হবার আর সম্ভাবনা নেই। সে লেখে—

I have sat down with great regret to begin Nattore treatise,
The reader must be arrested in concern and surpirse!
Natural quality of Spring is in a far distance,
Never freshes our temper southern breeze and flowers' fragrance
Or reception of parrots, nightingales, and warbling magpies
Here we meat agony by screeching of owl and pariah dog's cries!

দীর্ঘ কবিতা। হিকি সাহেব প্রথমে চমকে উঠেছিল। বিস্ময়ের অন্ত রইলো না। তারই ঘরে বসে যে মানুষটি নীরবে কাজ করে গিয়েছে সে একজন কবি? আপশোষের অন্ত রইলো না। উপযুক্ত মর্যাদা পেল না রামরতন। হিকি সাহেব সাধারণ গোরা পল্টন নয়। সে একজন অতি সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। শিল্পকে সে মূল্য দিতে জানে, শিল্পীকে জানে সম্মান জানাতে। নইলে তার কাছে ফেনিস্কির মতো একজন উচ্চশ্রেণীর নরসুন্দর অত আদর পেত না। ড্যানিয়েলের মতো শিল্পী অতটা সমীহ পেত না।

হিকি সাহেব বারবার করে কবিতাটি পড়ে। সে অ্যাটর্নি হলেও হৃদয়ের ব্যাপারীও বটে। নইলে স্ত্রী বিয়োগের পর একাকীত্ব দুঃসহ হয়ে ওঠায় প্রথমে কিরণবালা আর পরে জামদানীর আবির্ভাব ঘটন না জীবনে। লোকে বলবে দুঃশ্চরিত্র কিংবা সংযমহীন। আসলে হলো, জীবনকে খোলা চোখে দেখা আর উপভোগ করা। নইলে ওয়ারেন হেস্টিংস, উইলিয়াম জোন্স, জাস্টিস ইম্পে আর হাইড থেকে শুরু করে খিদিরপুরে ভূ-কৈলাশ রাজবাড়ির গোকুল ঘোষাল মল্লিক বংশের নিমাই মল্লিক সবার সঙ্গেই তার দহরম-মহরম হতো না। সে রীতিমতো আলাপী—মিষ্টভাষী। তেমনি সাধারণ কেরাণী বেনিয়ানদের সঙ্গেও তার সমান আলাপ। আবার চাঁদ মুন্নু আর নবাবের মতো ভৃত্যরাও তার আস্কারায় মাথায় ওঠে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হিকি সাহেব। কবিতাটির ছত্রে ছত্রে যে সুর ধ্বনিত হয়ে উঠছে, তা শুধুই প্রবাসের বেদনা নয়। মনে হয় নরম হাতের গোল্ড বেঙ্গল-এর ধাক্কা খেয়ে ছিটকে চলে গিয়েছে অতদূর। অদ্ভুত এই বাঙালী জাতি। এত বুদ্ধি এত সাহস অথচ লড়িয়ে মনোভাব নেই। সব সময় কিসের ওপর যেন নির্ভর করে থাকে। বোধহয় নিয়তি—যাকে এরা বলে ঈশ্বর। এদের ঈশ্বর কি এতই দয়াময় যে কোনোরকম চেষ্টা বা সাধনা না করেও তার দয়া পাওয়া যায়? এদের আর একটা কথা আছে যার কোনো ইংরাজি প্রতিশব্দ নেই। অনেকের সঙ্গে মিলে মিশে সেই কথাটা উদ্ধার করেছে হিকি সাহেব। কিন্তু তার আসল মর্মবাণী উপলব্ধি করতে পারে না। কথাটা হলো 'অভিমান'।

ক'দিন পরে নিমু মল্লিকের সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টে দেখা হতেই হিকি সাহেব বলে—জানো মল্লিক, রামরতন একজন পোয়েট।

—রামরতন! কোন্ রামরতন!

—ওই যে আমার রাইটার ছিল?

—নাটোর চলে গিয়েছে সে?

—হ্যাঁ।

কেন? আপনার খাতায় কালীকীর্তন লিখে রেখেছে জানি।

—কালীকীর্তন? সেটা আবার কি জিনিস? আমার খাতায় লিখবে কেন?

—আমাদের একজন সাধক লিখতেন। দেহ রেখেছেন সম্প্রতি, তিনি হিসাবের খাতায় লিখতেন।

—কে! কবিতা লিখতেন তিনি?

কপালে হাত ঠেকিয়ে নিমু মল্লিক বলে—রামপ্রসাদ। তার নাম। কবিতা বৈকি। ওগুলো কবিতা—অনেক উঁচুদরের।

—কালীকীর্তন কি জিনিস?

—হিম্‌ন্ টু গডেস্ কালী।

—ও। না না, সে জিনিস নয়। কবিতা লিখেছে—ইংরাজিতে।

—ইংরাজিতে কবিতা? মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে ছেলেটার। কেন অতদূর গেল।

—না না। খুব ভালো লিখেছে। সুন্দর হয়েছে।

—এত ভালো ইংরাজি জেনে ওখানে পড়ে রইলো? চলে আসতে লিখে দিন সাহেব। ভালো চাকরি পেয়ে যাবে। আপনি যখন প্রশংসা করছেন—হিকি সাহেব গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে বলে—ও আর আসবে না।

—কেন? আপনি আশা দিলে পত্রপাঠ চলে আসবে।

—আচ্ছা, ওকি কাউকে ভালোবাসত। কোনো মেয়েকে?

—ছিঃ ছিঃ, আমাদের সমাজে অমন কথা কেউ কল্পনা করে না। তাছাড়া ওকে তো দেখেছি। মাথা উঁচু করে চলতে পারে না। ওকি গোপাল মুখুজ্জের বয়ে যাওয়া ভাইটা?

হিকি সাহেব অন্যমনস্ক হয়ে যায়। এইসব বাঙালীদের কাছে প্রকৃত গুণের দাম নেই। দেশে হলে সবাই কবিতাটা দেখার জন্য একটা আগ্রহ প্রকাশ করতো। এখানে ও ইংরাজ সমাজে কথাটা বললে, সেই উপলক্ষে তার বাড়িতে একটা ডিনারের ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। কিন্তু হিকি সাহেব সেটা চায় না। সে জানে, রামরতন শুধুই তাকে জানাতে চেয়েছে মনের কথা। জানাতে গিয়ে অনেক বেশি জানিয়ে ফেলেছে। প্রতিটি ছত্রের ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে একটা ব্যথিত হৃদয়ের অনুরণন। কবিতাটি গোপনই থাক।

নিমু মল্লিকের অনাগ্রহ দেখে সাহেব বিচারক হাইড সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করে। সে জানে, এই কক্ষে প্রবেশ করলে অনেক সময় অনেক চমকপ্রদ ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়। সেই সঙ্গে হাইড সাহেবের মানবিক গুণগুলো অনেক সময়ে প্রকট হয়ে ওঠে।

এইদিনও একটি ঘটনা দেখলো অ্যাটর্নি হিকি। অ্যাটর্নি হ্যামিলটন হাগিন্স নামে তার এক মক্কেলকে নিয়ে উপস্থিত। এই হাগিন্স তার কাকার বিপুল সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হয়েছে। তাই এসেছে, সেই সম্পত্তি দখল করে দেখাশোনার অনুমতি পত্র নিতে কোর্ট থেকে। হিকি সাহেব লক্ষ্য করে হাগিন্স মদ্যপান করে টং হয়ে আছে। চোখগুলো অবধি কেমন ঘোলা ঘোলা দেখাচ্ছে। তবে হাইডের অত নজর নেই। সে তখন নানান্ আইন-কানুনের মোটা মোটা বই ঘাঁটতে ব্যস্ত। একসময় হিকি লক্ষ্য করে মাতাল হাগিন্স একটু যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। শেষে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে হাইডের সামনে গিয়ে বলে—আপনি এই সব বড় বড় অপাঠ্য বই নিয়ে পাতার পর পাতা ওল্টাবেন, আর আমি

পুতুলের মতো হাত জোড় করে থাকব নাকি?

হাইড এতক্ষণে বুঝলো লোকটা মাতাল। আদালতে এই ধরনের জিনিস তার অসহ্য। অ্যাটর্নি হ্যামিলটনকে কড়া করে বলে—আপনার একটি মক্কেল দেখছি একটা বাঁদর। একে বার করে নিয়ে যান এখনি।

তাকে টানতে টানতে বাইরে বার করে দিয়ে হ্যামিলটন দুঃখ প্রকাশ করতে ফিরে এলে হাইড বলে—লোকটা যে পরিমাণে মদ খায় তাতে ওই সম্পত্তি পেলে কাকার ছেলেমেয়েদের দেখবে বলে ভরসা হয় না। আপনি কি বলেন মিঃ হ্যামিলটন?

হ্যামিলটনের অবস্থা দেখে হিকির দুঃখ হয়। বেচারা। অ্যাটর্নি হিসাবে তীব্র প্রতিবাদ করবে নিশ্চয়। কিন্তু মানুষ হিসাবে হাইডের হৃদয় নিতে মন্তব্যের কোনো উত্তর দিতে পারবে না।

হ্যামিলটন ধীরে ধীরে বলে—ওকে জব্দ করার জন্য কোনো শত্রু নিশ্চয় বেশি করে পান করিয়ে দিয়েছে। আমি তো আগেও দেখেছি। বিশিষ্ট ভদ্রলোক।

সাপও মরলো লাঠিও ভাঙলো না।

তবে হাইড ঠোঁট উল্টে হতাশা প্রকাশ করে।

এদিক-ওদিক তাকাতে এক কোণে গোপাল মুখুজ্জেকে শুক্‌নো মুখে বসে থাকতে দেখে হিকি। গোপাল আর দুর্গাচরণের আদালতের ঘটনাবলী আস্বাদন করার নেশা রয়েছে। ওদের প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় কোনো না কোনো বিচারকের কক্ষে। গোপালকে তার বিনয়ের জন্য পছন্দ করে হিকি। আজ মনে পড়ে এই গোপালের তদ্বিরেই সে রামরতনকে তার রাইটার হিসাবে নিয়েছিল। নিয়ে ঠকেনি। রামরতনের গুণের কথা গোপালকে বললে কেমন হয়? না দরকার নেই। তার চেয়ে নিমু মল্লিক গোপালের ভাই সম্বন্ধে যেন কি বলেছিল ওই ভাইটা নাকি বেয়াড়া ধরনের। চাঁদ এসে বলে, ছেলেটির কথা প্রায়ই। কিন্তু এ-সব জিনিস হিকি গ্রাহ্যে আনে না। কম বয়সে যা করে করুক। তবে দেশটা ভারতবর্ষ। এদের সম্বন্ধে ওই সব জিনিস সাধারণ পরিবারে খুব নাকি দুর্নাম রটায়। অথচ বড় বড় ধনীদের বেলায়? নবাবদের বেলায়? সাতখুন মাপ। অদ্ভুত এইসব সংস্কার আর নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে অভ্যস্ত হয়ে গেলেও হিকি এ সবের অর্থ বুঝে উঠতে পারে না আজও।

তাই নিমু মল্লিক নাক কুঁচকে বলেছিল গোপালের ভাইয়ের খুব খারাপ দশা। তার মানে কি? খারাপ অবস্থা? এই বাঙালীরা এক একসময় অদ্ভুত ইংরিজি ব্যবহার করে। বোধহয় বাংলা থেকে ইংরাজি করে। মাথা মুণ্ডু নেই। তবু নিমু মল্লিক ভালই বলে। কিন্তু গোপাল আরও কম। জিভের আড় ভাঙতে চায় না। তবে মোটামুটি বুঝিয়ে দিতে পারে। যেখানে ইংরাজি আসে না সেখানে বাংলা বলে দেয়। দু' চারটে বাংলা শিখে ফেলার জন্যে হিকিরও তেমন অসুবিধা হয় না।

গোপালকে ডেকে হিকি হেসে প্রশ্ন করে—কেমন দেখলে হাগিঙ্গের ব্যাপারটা?

—ভেরি টেস্টফুল।

—এ্যাঁ।

—ভেরি গুড।

—তোমার মুখ এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

—অনেক দুর থেকে এলাম এইমাত্র সাহেব।

—আচ্ছা, তোমার একটা ভাই আছে না?

—হ্যাঁ।

—সে কিছু করে না কেন?

হিকি লক্ষ্য করে গোপাল অতি কষ্টে কী যেন চাপতে চাইছে, চোখের জল হতে পারে—আবেগ

হতে পারে। বুঝতে পারে প্রশ্ন করে ভুল হয়ে গিয়েছে।

—সাহেব, সে মরতে বসেছে।

চমকে উঠে হিকি বলে—কেন? মরতে বসেছে মানে?

—সত্যিই মরতে বসেছে। কবরেজ বলেছে কোনো আশা নেই।

—কি হয়েছে, হতাশ হচ্ছো কেন? কত বড় বড় ডাক্তার আশা ছেড়ে দেবার পর সেই রোগী ভালো হয়ে ওঠে। আমার বেলায় কি হয়েছিল? তুমিও তো জানো।

হিকির কথা গোপালের মনে এতটুকুও আশা সঞ্চার করতে পারে না।

সে বলে—এ রোগের চিকিৎসা নেই।

—কি জিনিস? কি রোগ?

গোপাল জানে না, এ রোগের ইংরাজি নাম। সে অসহায় দৃষ্টিতে সাহেবের দিকে চেয়ে থাকে।

- বলো? রোগের কি নাম?

—সাহেব, নেম আই ডোণ্ট নো। বেঙ্গলি নেম—রাজযক্ষ্মা?

—রাজযক্ষ্মা? সেটা আবার কি?

—সাহেব, সে কথা বলতে পারবো না? তোমরা কি বলো আমার জানা নেই। তুমি নিমাই মল্লিককে জিজ্ঞাসা করতে পার। সে ইংরিজি ভালো জানে। তবে এ-রোগের চিকিৎসা নেই সাহেব।

—সব রোগেরই চিকিৎসা আছে গোপাল। অন্তত চেষ্টা সব সময় করতে হয়। তোমরা বড্ড বেশি অদৃষ্টবাদী। তোমরা কথায় কথায় ভগবানের শরণাপন্ন হও, কথায় কথায় অদৃষ্টকে মেনে নাও।

—সাহেব, আমাদের কবরেজরা যে সব নিদান দেয়—সেগুলো অব্যর্থ।

—আমি একজন সাহেব ডাক্তার দেখাতে বলি তোমাকে। তুমি রাজি হবে?

গোপাল একটু দ্বিধাবোধ করে প্রথমে। একেবারে শোবার ঘরে সাহেবকে নিয়ে যাবার প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবে। ঘরের অনেক কিছু হয়তো ফেলে দিতে হবে। হেমলতা হয়তো রান্নাঘরের জিনিস ফেলতে শুরু করবে। তাছাড়া ছোট-বউয়ের মনোভাব কিরকম হবে তাই বা কে জানে। কিন্তু একবার সাহেব ডাক্তার দেখিয়ে নেওয়া ভালো। ওদের চিকিৎসা অন্য ধরনের। ওই ওষুধ সম্পূর্ণ আলাদা।

হিকি সাহেবকে গোপাল বলে—আমি একবার বাড়িতে গিয়ে বলে দেখি। এত কষ্ট করে ভাইকে এক বারাঙ্গনার বাড়ি থেকে উদ্ধার করে এনেছে গোপাল নিজে। তাকে মরে যেতে দিতে উদ্ধার করেনি। তাই সাহেব ডাক্তার দেখাতে রাস্তা করাতেই হবে হেমলতাদের। সেই বারাঙ্গনার ঘরে ঢুকতে তার ঘৃণা হয়েছে—সঙ্কোচ হয়েছে। কিন্তু ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে গিয়েছে। ওই দারিদ্র্যের মধ্যেও মহী একটা পরিচ্ছন্ন শয্যায় শুয়েছিল। দাদাকে দেখে সে চমকে উঠেছিল।

—দাদা—

—হ্যাঁ। তোকে নিতে এলাম।

—দাদা—

—চলো। আমি দাঁড়াতে পারছি না। অনেক চেষ্টায় তিনদিন পরে তোকে খুঁজে পেয়েছি।

—কিন্তু কি করে যাব? আমার চলতে কষ্ট হয়। প্রায়ই রক্ত ওঠে।

গোপাল মুখুজ্জের বুকের ভেতর ধক্ করে ওঠে। কবরেজের মন্তব্য মনে পড়ে যায়।

সেই সময় একজন স্ত্রীলোক ঘোমটা টেনে এসে দাঁড়ায়। সে ভেবেছে মহীর কোনো বন্ধু কিংবা চেনা লোক এসেছে।

—ওঁকে নিয়ে যান বাবু। উনি খুব অসুস্থ।

গোপালের মুখ কুঁচকে ওঠে। স্ত্রীলোকটির মুখ দেখে ফেলে আপশোষ হয়। কিন্তু মুখটা সরল তো

বেশ।

মহী অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বলে—আমার দাদা।

মেয়েটি মাটিতে বসে প্রণাম করতে যেতেই গোপাল মুখুজ্জে লাফিয়ে উঠে পেছনে সরে যায়।

শান্তিবালা লজ্জিতভাবে বলে—আমি ছোঁবো না। জানি ছুঁতে নেই।

গোপাল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলে—আমি পালকি আনতে চললাম।

তুই পালিয়ে যাবি না তো?

—না দাদা। পালাতে আর পারবো না। কিন্তু তোমার গাড়ি কি হলো?

—আনিনি। গাড়ি করে এদিকে আসতে ঘেন্না হয়।

মহী মাথা নীচু করে থাকে।

সেদিন মহী গোপালকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, এবারে সে ভোগের জন্য বেশ্যা বাড়িতে আশ্রয় নেয়নি। সে শান্তি চেয়েছিল। শান্তিবালা বারবণিতা হলেও, একবারও তাকে তেমন ভাবতে পারেনি মহী।

পালকিতে চেপে বাড়ির দিকে দুই ভাই চলতে চলতে মহী যখন কথাগুলো বলছিল, তখন গোপাল মুখুজ্জের দুই কান গরম হয়ে উঠেছিল। এই সেই মহী, যাকে কয়েক বছর আগেও সে কাঁধে চাপিয়ে গঙ্গায় স্নান করাতে নিয়ে যেত। হ্যাঁ সেই মহীই রয়েছে এখনো! ওই ঘন কালো দাড়ি গোঁফের মধ্যেও এখনো ওই চোখ দুটোই তার প্রমাণ। মহী কেমন আচ্ছন্ন অবস্থায় কথা বলে চলেছে। যেন হুঁশ নেই। তাই হবে। সেইজন্যেই অসঙ্কোচে তাকে এসব কথা বলতে পারছে।

গোপাল ভাবে, মহী যখন সব কথা বলছে, তখন তারও জেনে নিতে ক্ষতি কি? মহী তো রোগী।

—তুই শান্তি খুঁজতে শেষে ওখানে গেলি? বাড়িতে পেতিস না? ছোট-বউয়ের মতো মেয়ে কোথায় পাবি?

—হ্যাঁ। ও খুব উঁচুদরের। ওর কাছে পৌঁছোতে পারিনি। আমি কত নীচু, লেখাপড়া জানি না—।

—তুই পাগল নাকি রে? তুই না ওঁর স্বামী? পতি হলো সতীর দেবতা। তোর কুষ্ঠ হলেও ছোট-বউ এতটুকু ঘৃণা না করে তোর সেবা করতেন।

—কি জানি। কিন্তু ও আমাকে ঠিক মানুষ বলে গণ্য করে না।

—তোর নিজের ভুল। ছোট-বউকে অমন ভাবিস না।

মহীর আর কথা বলতে ইচ্ছা হয় না। সে ভাবে, আবার যদি সেই কাশি আরম্ভ হয়? তাহলেই তো রক্ত। মধু তাকে সত্যিই এক সুন্দর আশ্রয়ের কথা বলে দিয়েছিল। শান্তিবালার মতো মেয়েছেলে হয় না। শান্তিবালা যদি তার বউ হতো, বেশ হতো।

গোপাল মুখুজ্জের চোখের সামনেও শান্তিবালার মুখখানা বার বার ভেসে ওঠে। সরিয়ে দিতে চাইলেও পারে না। ওদের সম্বন্ধে তার অন্য রকমের ধারণা ছিল। দেখতে একটু রুক্ষ হবে। পানের রসের ছোপ থাকবে পুরু ঠোঁটে। মুখের হাসি হবে অশ্লীল। কথাবার্তাতেও শালীনতা থাকবে না। এই ধারণা কেমন করে তার মনে ছাপ ফেলেছিল বলতে পারে না। হয়তো কখনো এমন একজনকে দেখেছে সে। ফিরিঙ্গি বেশ্যাদের সে পথেঘাটে দেখে। তারাও কেমন যেন বেপরোয়া আর অসভ্য। কিন্তু মহী যার কাছে থাকত, কয়েক মুহূর্ত তাকে দেখেই গোপালের এতদিনের ধারণায় ঘা পড়েছে। এ যেন কারও গৃহবধূ। সামনে এসে দাঁড়াবার ভঙ্গী তেমনি নমনীয়। বেশ লজ্জাশীলা। কথা মার্জিত। সবচেয়ে অবাক হয়েছে গোপাল, মহীর প্রতি তার যত্ন দেখে। কী সেবাপরায়ণা রূপ। মহী পালকিতে ওঠার সময় মেয়েটার মুখে অদ্ভুত এক উদ্বেগ ফুটে উঠেছিল। তার সতত ভয় মহী বুঝি পারবে না। গোপাল মুখুজ্জের উপস্থিতি ভুলে গিয়ে সে কয়েকবার মহীকে ধরতে হাত বাড়িয়েও সরিয়ে নিয়েছে। সত্যিই বোধহয় তার ছোট ভাই এখানে শান্তি পেয়েছিল।

মুদিত আঁখি ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে বহুদিন পরে তার বুকের ভেতরটা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। চোখ দুটো সজল হয়ে ওঠে।

পালকির বেয়ারারা তখন গাইছে—সামনে খাল হেঁ আরে। খালরে ভাই হেঁ আরে, আরেক খাল হেঁ আরে, জোড় খাল হেঁ আরে।

গোপাল মুখুজ্জে চমকে ওঠে। জোড়াসাঁকোর পাশ দিয়ে যাচ্ছে তারা। মহীর শ্বশুরবাড়ি। এই বাড়িরই মেয়েকে ঘরে এনেছিল। কত আশা কত কল্পনা নিয়ে মেয়েকে স্বামীর ঘব করতে ওরা পাঠিয়েছিল, শুধু তারই কথার ওপর ভরসা রেখে।

পঞ্চানন ঘোষ ছুটতে ছুটতে গঙ্গার ঘাটের দিকে যাচ্ছিল। বাড়ি গিয়ে দুটো মুখে দিয়ে তাকে যেতে হবে ওই বরানগরে। ছেলে বজ্রনাথের এক সম্বন্ধ এসেছে। বরানগরের মিত্তির বাড়ি। ভালো বংশ। তার চেয়ে বড় কথা হলো বেশ শাঁসালো পরিবার! বীরেশ্বর ঘটক সম্বন্ধ এনেছে। লোকটা ধাপ্পা দেয় না। তাছাড়া বজ্রনাথ তো আর ফেলনা নয়। রীতিমতো ইংরিজি জানা। সেদিন পুরোনো কেল্লার রাস্তার ওপর কোন্ এক ম্যাকার্থী সাহেবের সঙ্গে কী ফটাফট করে কথা—বাব্বা। দেখে বিশ্বাসই হচ্ছিল না ওর নিজের ছেলে। সুতরাং মিত্তিররা কেনই বা দেবে না? পঞ্চাননের বাড়িটা মেরামত না হলে কি হবে—বেশ বড়। দর্শনধারী।

পঞ্চাননের আসল আনন্দ, এতদিন যে-কথা পেটের মধ্যে ভুটভাট করছিল, বউ আর ছেলের ভয়ে কাউকে তেমনভাবে বলতে পারছিল না। মিত্তির বাড়িতে গিয়ে বেশ ফলাও করে বলে আসবে। ছেলে তার ইংরিজি জানে। সাহেব বন্ধু আছে। গোপাল মুখুজ্জে ধরে ফেলেছে যে বজ্রনাথ ইংরিজি বই পড়ে। সেকথা স্ত্রীকে বলা সত্ত্বেও কড়া নিষেধ এ-ব্যাপারে রাস্তাঘাটে কিছু বলতে। এত ঘোর প্যাঁচ, এত ঢাক ঢাক গুড়ু গুড়ু কেন, বুঝতে পারে না। আর গোপালটাও তেমনি। এমন একটা সংবাদ দিব্যি চেপে রেখেছে? তবে ওর একটা ভয় আছে। মেয়েছেলে ইংরিজি পড়ে শুনলে পাড়ার লোকে হয়তো বদনাম দেবে। ঠিক তাই। তাই বজ্রনাথকে বই এনে দিতে বললেও, পঞ্চাননকে কিছুই জানায়নি।

গঙ্গার জলে নামতে গিয়ে হঠাৎ মদন নাপিতের দিকে নজর পড়ে। দেখেই গালটা ডান হাত দিয়ে ঘষতে থাকে। বেশ বড় হয়েছে দাড়ি। খড়খড় করছে। উঁহু, ভালো দেখাবে না। ভাবী-বেয়াইয়ের কাছে প্রথম যাচ্ছে সে।

ছুটে গিয়ে মদনের সামনে বসে পড়ে বলে—দে তো মদনা একটু চেঁচে চুচে। বেয়াই বাড়ি যাব।

মদন বলে, ভক্কি দেবেন না। আপনার আবার বেয়াই কে?

—আরে নেই তো কি হলো? হবু-বেয়াই। বজ্রর সম্বন্ধ এসেছে। বরানগরের মিত্তির বাড়ি যাব আজ। এই তো চান সেরে দুটো মুখে দিয়েই রওনা হবো। দে বাবা একটু বানিয়ে।

—না। অনেক বাকি পড়েছে। তাতেও কিছু না। কিন্তু পুজোর সময় দু' চার জোড়া নারকেল আর খই মোয়া—তাও দিলেন না। দুই বছর ধুতি দেননি।

দুই কানে আঙুল দিয়ে পঞ্চানন বলে, ওরে বাবা, এই শুভদিনে তুই কি সব কথা শোনাতে বসলি।

—কি করবো? ওই যে দেখুন ঠাকুরদের গুদোম ঘরের পাশে ছেলেটা তীর্থের কাকের মতো বসে রয়েছে।

—কার ছেলে? তোর ছেলে বলে মনে হচ্ছে যে—

—তবে কার?

—অতটুকু ছেলেকে একটা ঘাটের পাশে বসিয়ে রেখেছিস। ধন্যি বাপ বটে তুই।

—কেন?

—যদি ডুবে যায়?

—ওর বয়স পাঁচ কিংবা ছয়। কিন্তু সাঁতার কাটে ধান-পোকার মতো।

—তা ওখানে বসে কেন? বসিয়ে যদি রাখবি, পাশে বসিয়ে রাখ। কাজকর্ম দেখুক এখন থেকেই। দেখে দেখে পেকে উঠুক।

—কাজকর্ম দেখার জন্যে বসতে বয়ে গিয়েছে। আজ শনিবার, দত্তবাড়ির বুড়িমা আসবেন। ও সেই অপেক্ষায় আছে। কী সব শনির দান করেন। মাসকলাই, লোহার টুকরো, এটা-ওটা দিতে হয়। ছেলেটাকে প্রথমদিন দিতে গেলে ও নিতে চায়নি। তাই সঙ্গে অনেকখানি খই বাতাসা দেন, খেয়ে ওর পেট ভরে যায়।

—তুই জেনেশুনে তোর ছেলেকে শনির দান নিতে দিস্।

—আমরা তো সব দানই নিই! আমাদের আবার বাছ-বিচার।

—ওহো। আজ শনিবার। তার মানে তো বারবেলা শুরু হয়ে যাবে।

দে মদনা। তুই তো আমাদের জীবন-সাথীরে।

—সেটা কি বলছেন?

—সাথী না? নেহাৎ সহধর্মিণী বলা যায় না তাই। নইলে আমাদের এ-পাড়ার জীবনের সঙ্গে তো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছিস তুই। জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে—কোথায় নেই তুই বল্? এই তো বজ্রনাথের বিয়ে আসছে। যাবি না তুই? বল? তুই তো সবচেয়ে বড় বরযাত্রীরে—হেঁ হেঁ—

পঞ্চানন গালটা বাড়িয়ে দিয়ে আবার বলে—তাছাড়া এই তো ক'দিন বাদেই আর একটা কাজ পাচ্ছিস।

খুর শান দিতে দিতে মদন বলে—কোন্ কাজ!

—কেন মহী!

—গোপাল মুখুজ্জের ভাই?

—হ্যাঁ।

—সে আবার বিয়ে করবে নাকি। সে তো খুব অসুস্থ।

—তুই কোনো খবরই রাখিস না দেখছি। সে মরতে বসেছে। দলা দলা রক্ত উঠছে। গোপাল সাহেব ডাক্তার এনেছিল। পয়সার গরম হলে যা হয়। পারলো সারাতে? আরে এ হলো রাজযক্ষ্মা। শিবেরও অসাধ্য।

মদনের হাত এমনিতে থেমে যায়। মহী নষ্ট হয়ে গিয়েছিল জানে সে। কিন্তু গোপাল মুখুজ্জেকে সে শ্রদ্ধা করে। তার একটা বড় রকমের আঘাত আসছে। ওই তো এক ফোঁটা বউ। ক' বছর আগেই গিয়েছিল জোড়াসাঁকোয় মহীর বিয়েতে।

চোখের সামনে স্পষ্ট ভাসে সব। পঞ্চাননের বলার ধরনে মন বিষিয়ে ওঠে তার ওপর। লোকটা চিরকাল এইভাবেই চললো। ছেলেটা বোধহয় মানুষ হবে। বেশ গম্ভীর-সম্ভীর আছে।

পঞ্চানন স্নান সেরে উঠে চলে যায় ধরন-ধারণ দেখে মনে হলো সত্যিই তাড়া আছে আজ। অন্যদিন হলে আর কারও সঙ্গে গল্প জমিয়ে বসতো।

ঠাকুরদের গুদামের দিকে চেয়ে দেখে মদন, ছেলে তার কোঁচড়ে খই নিয়ে দিব্যি চিবোচ্ছে। কখন যে দত্তবাড়ির বুড়িমা ঢেলে দিয়ে গিয়েছেন খেয়াল করেনি মদন। অতটুক ছেলে, শনিবার দিন ভোরবেলা উঠেই তাড়া লেগে যায়। মাকে বলে গামছাটা পরিয়ে দিতে ধুতির মতো করে। নইলে খই নিতে পারে না। এই সময়টুকু ছাড়া অন্য সব সময় সে দিগম্বর।

মহীর কথা ভেবে মন খারাপ হয়ে যায়। বয়ে গেলেও, ওকে খারাপ লাগতো না মদনের। এই তো

কিছুদিন আগে তার সামনে এসে বসেছিল, বেচারা জানতো না অদূরেই আগুনে তার ছেলে পুড়ছে। মহী যে এতটা অসুস্থ মদন জানতে পারেনি। দলা দলা রক্ত উঠছে। অথচ পনেরো দিন আগেও তাকে বাড়িতে কামিয়ে এসেছে। শরীর রক্তশূন্য, খুবই নির্জীব দেখাচ্ছিল, তাই বলে পঞ্চানন যা বললো, তেমন মনে হলো না। হয়তো ভালোভাবে চেয়ে দেখেনি মহীর দিকে। তবে দিন পাঁচেক আগে মুখুজ্জে বাড়িতে গেলে গোবিন্দ মুখুজ্জে মহীকে কামাতে দেয়নি। মদন মনে মনে ভাবে, তার বউকে আজই পাঠাবে ও-বাড়িতে। তার বউ মাসে একবার যায় বাড়ির বউদের নখ কেটে আলতা পরিয়ে দিতে। ঘন ঘন তিনটে ছেলে হয়ে যাওয়ায় একদিনের বেশি পারে না। অথচ আগে রোজই যেত আলতা পরিয়ে দিয়ে আসতে। এখন আলতা পরাতে নতুন একজন বউ যায় রোজ মুখুজ্জে বাড়িতে। মদনের বউয়ের সেজন্যে আপশোষের সীমা নেই। কারণ ও-বাড়িতে রোজ গেলে লাভ ছাড়া লোকসান নেই। এটা-ওটা পাওয়া যায়। বুড়ি সুখেনের মা খ্যাচ্‌খ্যাচ্ করলে কি হবে, দুই বউয়েরই দরাজ হাত।

গোপাল মুখুজ্জে ভেতরে ভেতরে ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু বাইরে শান্ত এবং ধীর স্থির। কেউ বুঝতেও পারে না অহরহ তার অন্তর পুড়ে যাচ্ছে। পারে শুধু হেমলতা রাতের বেলা। ভাইয়ের প্রতি কী অসীম মমত্ববোধ গোপালের। হবেই বা না কেন? বাড়িতে বউ আসার আগে ভাই ছাড়া আর কে ছিল তার? ভাইয়ের যখন ছেলে হলো, তখন নিজে সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেও আনন্দ হয়েছিল খুব। সেই মহী বাপ্ হলো! ভাবা যায়!

কিন্তু তারপরই সব যেন কেমন ছাড়া ছাড়া হয়ে গেল। মহী যে বিপথে চলতে শুরু করেছে, সে কোনোদিন তেমনভাবে বুঝতে পাবেনি। হেমলতা বুঝেও তাকে বলেনি। শুধু ভয়ে নয়, মহীর প্রতি অন্তরের টানে। ঠাকুরপোকে হেমলতা সত্যিই স্নেহ করে। কিন্তু এই স্নেহ যে মহীর কু-প্রবৃত্তিতে ধৃতাহুতি দিলো। তাই তার আজ এই পরিণতি।

গোপাল মুখুজ্জে জেনে গিয়েছে মহী শিগ্‌গিরই তাদের ছেড়ে অল্পবয়সী বউকে ছেড়ে চলে যাবে। নিশ্চয়ই স্বর্গে যাবে সে। এতটুকু বয়সে মানুষ আর কত অপরাধ করতে পারে? বড়জোর কিছুক্ষণের জন্য নরক দর্শন করতে হবে। হোক। পাপ ক্ষয়ে গিয়ে অক্ষয় স্বর্গবাস। হে ভগবান, মহী যেন স্বর্গেই থাকে। তাকে আর পৃথিবীতে এনো না। সাধ হয়, সে যদি হেমলতার গর্ভে এসে জন্ম নিত। কিন্তু যদি তাকে ঠিকমতো না চেনা যায়। যদি আবার সে কষ্ট পায়? তার চেয়ে স্বর্গেই থাকুক। গোপাল নিজের কানে শুনেছে, জ্বরের ঘোরে মহী কখনো কমলার নাম বলে না। আচ্ছন্ন অবস্থায় দু'-একবার শান্তিবালার নাম উচ্চারণ করে অস্ফুট স্বরে। ছোট-বউ কান পেতে নামটা জানার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। গোপাল ঠিক বুঝতে পারে। জীবনে বোধহয় বেচারা ওই নারীর কাছেই প্রথম সহজ হতে পেরেছিল। আর যদি সত্যিই ভোগের ইচ্ছা শেষ না হয়ে থাকে, তবে স্বর্গে আছে উর্বশী, মেনকা।

ধন্য ছোট-বউ। সাহেব ডাক্তার বলে গেল রোগটা ছোঁয়াচে, তবু ছোট-বউ জিদ ধরে বসেছে একই বিছানায় শোবে। সেবা যত্ন সবই সে করে। রক্ত পরিষ্কার করে মুখ মুছিয়ে দেওয়া সবই এক হাতে করে চলেছে। এতটুকু বিরক্তি নেই। সতী সাধ্বী বউ। মহী মর্ম বুঝতে পারেনি। গোপাল ভাবে দোষ তার। মহীকে যদি জোর করেও একটু লেখাপড়া শেখাতে পারতো তাহলে তা অমনটি হতো না।

হেমলতা নিজে নারী। সে গোপাল মুখুজ্জে না। তবু কমলার সেবা দেখে সে অতিমাত্রায় বিস্মিত না হয়ে পারে না। প্রথমে ভেবেছিল, লোক দেখানো। তারপরে ভাবলো, বিধবা হওয়ার অপরিসীম লজ্জা সব স্ত্রীলোকরেই রয়েছে। সেই লজ্জা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য কমলার আপ্রাণ প্রয়াস সেবার আকারে পরিস্ফুট। কিন্তু এখন? এখন বাড়ির আর পাড়ার সবাই জেনে গিয়েছে মহী বাঁচবে না। শুধু তার প্রাণটুকু ধুক্‌ধুক্ করছে। তা তো করবেই। যে সময় লেখা রয়েছে, তার আগে যমদূতরা কাছে

ভিড়তেই পারবে না। আশেপাশে অপেক্ষা করতে হবে। হেমলতা নিজে না দেখতে পেলেও, সুখেনের মা দেখেছে। ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে তারা। ছায়া ছায়া—লম্বা লম্বা পা সরু সরু হাত—। ছুটে ছুটে আসছে আর ফিরে ফিরে যাচ্ছে। হেমলতা সন্ধ্যার পরে তাই ওদিকটা যায় না। তার চুনী রয়েছে। যদি কিছু হয়ে যায়! ওঁদের বিরক্ত করতে নেই। হেমলতা তাই নিজের ঘরে বসে মাঝে মাঝে চোখের জল ফেলে। এ-বাড়িতে হেমলতার বিয়ের পর পরই মহীই ছিল তার একমাত্র সাথী। শাশুড়ির প্রতাপের মধ্যেও মহী তাকে ভালোবেসে ফেলেছিল। তারও টান ছিল মহীর ওপর। সেই সব দিনের এক একটি ঘটনার কথা ভেবে মাঝে মাঝে কান্না পায় হেমলতার।

আর একটা অনুশোচনা ধীরে ধীরে পেয়ে বসেছে হেমলতাকে। রামরতনের সঙ্গে কমলাকে জড়িয়ে তার সন্দেহ। অদুর মৃত্যুর দিনে রামরতনের সঙ্গে কমলার দুর্ব্যবহারে প্রথম তার সন্দেহের ওপর আঘাত পড়ে। তবু পরে সে ভেবেছে, পুত্রের শোকে ওটা কমলার মুহূর্তের বিচ্যুতি। কিন্তু এখন? কথাটা ভেবে হেমলতা কিছুতেই শান্তি পায় না। কালীবাড়ি গিয়ে মায়ের সামনে একাকী বসে সে অকপটে নিজের অপরাধ স্বীকার করে এসেছে। মায়ের চোখের দিকে মুখের দিকে চাইতেই সাহস হয়নি প্রথমে। যখন চাইলো, দেখলো কী ভীষণ মূর্তি! যেন বলছেন, এতদিনে বলতে এসেছিস? আগে বলিসনি কেন? ভেবেছিস, চেপে থেকে আমার কাছেও গোপন রাখবি? নাকে খৎ দে, নাকে খৎ দে? কাঁদতে কাঁদতে হেমলতা একবার দেখে নেয় মন্দিরের দরজাটা ভেজানো রয়েছে কিনা ভালোভাবে। বাইরে সুখেনের মা দাঁড়িয়ে। সে আবার মাঝে মাঝে পরিষ্কার দেখতে পায়, কখনো সখনো পরিষ্কার কানে শুনতে পায়।

নাকে খৎ দেয় হেমলতা উপুড় হয়ে। এই একবার দিলাম না। এই দুইবার। এই তিনবার। দেখ, আমার দোষ হয়েছে—একশোবার বলছি দোষ হয়েছে। কান্নাভেজা চোখে হেমলতা মায়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখে মা যেন হাসছেন একটু একটু। নিশ্চিন্ত হয় সে।

বাড়িতে ফিরে সে সোজা কমলার কাছে গিয়ে বলে—নে ছোট-বউ। মায়ের পায়ের ফুল নে। জাগ্রত মা।

কমলা কাঁপা হাতে ফুল নেয়। মুখে বলে—সত্যিই কি মা জাগ্রত দিদি।

—হ্যাঁ। আমি নিজে চোখে দেখলাম, তিনি হাসছেন। মনে হয় ঠাকুরপো ভালো হয়ে যাবে রে।

কথাটা বলেই হেমলতার খেয়াল হয়, সে তো মহীর আরোগ্য লাভের জন্য একবারও প্রার্থনা জানায়নি। সে কমলাকে ফাঁকি দিলো। এই অপরাধে যদি তার স্বামীর তার পুত্রের কোনো অমঙ্গল হয়? তখনই আবার সে গা-হাত-পা ধুয়ে নেয়। গরদের শাড়ি পরে ফেলে।

সুখেনের মা অবাক হয়ে বলে—আবার গরদের শাড়ি কেন! কোথায় যাবে এবারে?

—কালীবাড়িতেই যাব। চল্‌তো আর একবার।

—তোমার মাথা খারাপ হলো নাকি?

—না, মাথা ঠিক আছে। মাকে সব কথা বলা হয়নি।

সুখেনের মা বড়-বউয়ের ভাবগতিক ভালোই জানে। এমনিতে কোনো দাপট নেই। কিন্তু একটা গোঁ ধরলে কিছুতেই ছাড়ে না।

তাই বলে—পালকি তো ছেড়ে দিলে।

—পালকি? বলছিস কি! লোকে দণ্ডী কাটতে কাটতে জগন্নাথ ধাম যাচ্ছে, বৃন্দাবন যাচ্ছে। আর এইটুকু পথের জন্যে পালকি?

—আগেরবার গেলে কেন তবে? মনুষ্য জনের কথা কি ভুলে গেলে? তুমি না ঘরের বউ?

—তুই বড্ড বেশি বক্‌বক্ করিস। গঙ্গার ঘাটে যেতে পারি আর মায়ের মন্দিরে যেতে পারি না

পায়ে হেঁটে? তাতেও বদনাম!

গঙ্গার ঘাটে চিরকাল সবাই যায়। তোমার বাড়িই তো ঘাটের পাড়ে। মন্দির অত কাছে নয়। তাছাড়া এখন বাপু তোমার পায়ে হেঁটে গঙ্গায় যাওয়াও তেমন মানায় না। ঘরে মা-লক্ষ্মী বাঁধা পড়েছেন। অত হাঁটাহাঁটি কেন? তোমরা কি মেমসাহেব? দেখলাম বটে সেদিন মুর্শিদাবাদের কোনো বেগমের পালকি। কোনোদিকে এতটুকু ফাঁক নেই। এই না হলে বেগম?

—থাম্। পালকিতে মায়ের কাছে গিয়েছিলাম বলেই সব কথা বলতে ভুলে গিয়েছি তাঁকে। দেখিয়ে দিলেন মা, তাঁর কাছে কষ্ট করে যেতে হয়। নইলে ফাঁকে পড়তে হয়। তাছাড়া তুই তো সঙ্গে আছিস। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলে দিবি, মানত আছে পায়ে হেঁটে যাবার। জাম তলা দিয়ে গেলে দেখাও হবে না কারও সঙ্গে। মনে নেই জাম গাছের ডাল ভেঙে অক্রুর মারা গিয়েছিল?

—রাম রাম রাম। ওসব অলুক্ষণে কথা কেন? যাস তো চল্। অন্য পথেই চল্।

—না। ওই পথেই যাব। আমার ওসব ভয় ডর নেই। আমার একজনের ওপর ভয় ছিল। চুনী পেটে আসার পর সেই ভয় কেটে গিয়েছে।

—অত সাহস না হওয়াই ভালো বউ মানুষের। তিনি এখনো আছেন। তেনাকে দেখেছি আমি। যমদূতদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন।

—তুই কার কথা বলছিস।

—যাঁর কথা তুমি বলছো। শত হলেও পেটের সন্তান তো। নাড়ির টান যাবে কোথায়?

হেমলতার গা ছম্‌ছম্ করে।

ওদিকে কমলা একবার ভাবে হাতের জবা ফুল ফেলে দেবে। তারপর দ্বিতীয়বার ভেবে মহীর বালিশের নীচে রেখে দেয়। বলা যায় না হেমলতা এসে আবার খোঁজ করতে পারে। অভিনয় যখন শুরু করেছে, তখন সেটা সর্বাঙ্গসুন্দর হওয়া উচিত। সে জানে তার অভিনয় সে নিছক অভিনয়ই সেটা একমাত্র বুঝতে পারে তার বিবাহিত স্বামী। মহী তেমন বুদ্ধিমান নয় ঠিকই। কিন্তু প্রেমের উত্তাপ বুঝতে পারার ক্ষমতা নারী-পুরুষের সহজাত। তাছাড়া কিছুদিন আগে হলে, মহী সুস্থ থাকা অবস্থায় এই অভিনয় সে নিজেও হয়তো বুঝতে পারতো না। কিন্তু এখন জীবনের শেষ লগ্নে তার অনুভূতি, তার বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এমনই হয হয়তো প্রতিটি মানুষের শেষবেলায়।

মহীর বুদ্ধি এখন এমন ভয়াবহ রকমের তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে যে সেদিন কমলা তার একটা মন্তব্য শুনে শিউরে উঠেছিল। তখন রাত গভীর। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ঘরে শুধু তারা দু'জন। সেই সময় মহী কাশতে শুরু করলো। সেই বিশ্রী কাশি। মনে হয় এই শেষ বার। কিন্তু তা হয় না। বারবার সামলে ওঠে সে। ঝলকে ঝলকে সেদিনও রক্ত উঠেছিল। অভ্যাস বশে কমলা সেই রক্ত পরিষ্কার করেছিল। মুখ মুছিয়ে দিয়েছিল। চোখে-মুখে জলের হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। তারপরে অস্থির মহীকে সুস্থির করার জন্য পাখার বাতাস দিয়ে বসেছিল।

একটু পরে মহী হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিল—এত রাতে এসব না করলেই হয়। এখন তো কেউ দেখতে আসবে না।

—কি বললে?

—বলছি, এখন কষ্ট না করে শুয়ে পড়লেই হয়। ওসব দিনের বেলা করাই ভালো।

শান্তিবালার ঘর থেকে মহীকে বাড়িতে নিয়ে আসার পর থেকে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মহী প্রায়ই সোজাসুজি কথা বলে না, এটা কমলা লক্ষ্য করেছে।

—বিছানায় রক্ত লাগত। সকালে দেখে সবাই কি বলত?

—তা ঠিক। ভালোই হয়েছে। নিশ্চিন্ত হয়েছি।

—কিসের নিশ্চিন্ত।

—এসব দেখে দাদা নিজে যাকে দেখেশুনে ঘরে এনেছে, তাকে ফেলতে পারবে না। খুব ভালো বুদ্ধি। তবে তার জন্যে কী কষ্ট, সে কথা ভাবি।

—এত কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে না!

—হ্যাঁ। তাতে কি হলো? আমি তো আর বাঁচবো না। তাছাড়া আমার কষ্ট আমার নিজের জন্য। রোগীকে নিয়ে দিনের পর দিন এক ঘরে পড়ে থাকার কষ্ট নয়। আবার বড় খারাপ লাগে—খুব লজ্জা হয়। তবু এসব না করলে তো চলে না। ছোট বউয়ের বদনাম হবে। ,

—এত বুদ্ধি কোথায় ছিল? ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলে?

মহী হেসে ওঠে। এমন জোরে সে হাসেনি এবারে ফিরে এসে। সে বলে—আমি না, আমার মা।

—তোমার মা!

—হ্যাঁ, ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। এখন মায়ের কী আপশোষ।

—সে আবার কি। কি করে বুঝলে?

—আসে যে রোজ। মাথার কাছে বসে বলে, আমার ক্ষতি করে ফেলেছে। আজও তো এসেছিল। আর একজন তখন ঢুলছিল।

—কে ঢুলছিল?

—আর একজন। ওই মাদুরের ওপর ইংরিজি বই বিছিয়ে নিয়ে ঘুমে ঢুলছিল আর একজন। তখন মা এসেছিল। রোজই আসে। নিতে আসে। পারে না।

কমলার বুকের ভেতরটা কেমন করে যেন। তবু শক্ত হয়ে সে বলে—শান্তিবালা থাকলে হয়তো শাশুড়ি ঠাক্‌রুণ আসতে পারতেন না।

—কি জানি! হতেও পারে। ওর সেবা কেমন অদ্ভুত ধরনের। মনে হয় যেন একটা গান।

—তার মানে?

—কি জানি। মানে জানি না। মনে হলো তাই বললাম। আমি তো লেখাপড়া জানি না। জানলে বলতে পারতাম।

কমলার বুক আরও জোরে ধুক্‌ধুক্ করে। সে বুঝতে পারে, লেখাপড়া জেনেও এত সুন্দরভাবে শান্তিবালার সেবার কথা কেউ বলতে পারতো কিনা সন্দেহ, সে জানে তার নিজের সেবার মধ্যে কোনো ছন্দ কোনো প্রাণের স্পর্শ অনুভব করতে পারে না মহী। খুবই স্বাভাবিক। প্রাণের স্পর্শ না থাকলে কেমন করে আর অনুভব করবে? এ তো আর গোপাল মুখুজ্জে নয় যে ওপর ওপর ছোট-বউয়ের কার্যকলাপ দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। এমনকি হেমলতার চোখের ভাষা দেখে সে বুঝতে পারে, এতদিনে তাকেও ফাঁকি দিতে পেরেছে। হেমলতা ভেবেছিল সে নিজে খুব বুদ্ধিমতী। হয়তো বুদ্ধিমতী কিন্তু যার নিজের জীবনের ওপর বিন্দুমাত্র মায়া নেই তার কাছে সব বুদ্ধির কলাকৌশল ব্যর্থ হয়ে যায়। সাহেব ডাক্তার এসে বলে গিয়েছে, এ রোগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে। একজনের থেকে আর একজনের সহজেই হতে দেখা যায়। অনেকটা নাকি ওলাওঠার মতো। তবে অমন দু' একদিনের ব্যাপার নয়। সেইরকম একজন রোগী সঙ্গে একই শয্যায় রাত্রিবাস করতে দেখে তার সব কিছু সেবা একহাতে করতে দেখে সব বুদ্ধিমানই বোকা হয়ে যাবে। কারণ তারা বিচার করছে এমন এক বধূকে যে নিজের জীবন এবং জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। মহী ভাবছে তার মৃত্যুর পর একটা নির্ভরযোগ্য আশ্রয় লাভের আশায় কমলা দাঁতে দাঁত চেপে নাকের শ্বাস বন্ধ করে তার সেবা করে যাচ্ছে। যমের দণ্ডের স্পর্শে যত বুদ্ধিই খুলুক মহীর, কমলাকে চেনবার সাধ্য তার নেই। সে জানে না, কমলা তারই চিতার আগুনে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। গোপাল মুখুজ্জের প্রতি অনুকম্পা বশে কমলা এই পরিবারকে

দশের কাছে তুলে ধরে চলে যাবে। কারণ তার স্বামী অর্থের দিক দিয়ে কিছুই দিতে পারেনি এই পরিবারকে। লোকে কত রটাবে—একই রথে চেপে ঐ স্বামীর সঙ্গে তাকে স্বর্গের দিকে ধেয়ে যেতে দেখেছে ও-পাড়ার অমুক, সে-পাড়ার তমুক। মাথায় সোনার মুকুট, ললাটে আর সীমন্তে রাঙা টক্‌টকে সিঁদুর। পা দু'খানা আলতারাঙা, মহীও সেই মহী নয়, অন্য মানুষ!

মহীর চেয়েও জোরে হেসে ওঠে কমলা। তারপর স্বামীর দিকে চেয়ে বলে—জিজ্ঞাসা করলে না—হাসলাম কেন?

—কি হবে? আনন্দ হয়েছে হয়তো।

—হ্যাঁ। মৃত্যুর পরেও তোমার সেবা করবো ভাবছি। তখন তো শান্তিবালা থাকবে না। সেবার মধ্যে একটু গান-টান মিশিয়ে দিতে হবে।

মহী কমলার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে না। কাশির পরে তার তখন আচ্ছন্ন-ভাব। সে জানে তার বুকের ভেতরে সব খালি হয়ে গিয়েছে। সেই শূন্যস্থানে তীব্র ব্যথা আর দাহ ছিল ক'দিন আগেও। এখন অতটা নেই। শরীর একেবারে শীতল না হওয়া অবধি এমন থাকবে। বেশি হবে না। সে জানে, আর ক'টা দিন অপেক্ষা করতে হবে। মা এসে ঠিক বলে যাবে আগে-ভাগে। মা আসার আগে আরও কত লোক আসে। ছোটবেলায় দেখা মায়ের সেই গেরুয়াধারী গুরুদেব হাসিমুখে আসেন। আর আসেন বিরিঞ্চিদের বাড়ির কেষ্ট-ঠাকুর। ছোটবেলায় বিরিঞ্চির সঙ্গে ওদের এই ঠাকুরঘরে লুকোচুরি খেলতো সে। সেই সময় কতবার তারা দু'জনে ঠাকুরের প্রসাদ খাব্‌লা মেরে নিয়ে মুখে পুরেছে। ঠাকুর কিন্তু হেসেই চলেছে। মজা দেখত। সেই ঠাকুর আসেন মাঝে মাঝে। তিনি আসার আগে মহী বুঝতে পারে। কারণ চারদিকে একটা নীল আলোয় ভরে যায়। রক্তের এই পচা দুর্গন্ধ আর থাকে না তখন। খুব আনন্দ হয় তখন মহীর। সুগন্ধে ভরে ওঠে চারদিক। মহীর তখন একটুও ব্যথা থাকে না, কষ্ট থাকে না। ঠাকুর একদিন তাকে একটা সন্দেশ দিয়েছিলেন। ঠিক সেই ছেলেবেলার সন্দেশের মতো—রাখালের দোকানে যেমনটি তৈরি হতো। রাখাল তো কবে মরেই গিয়েছে—ওই সন্দেশও আর হয় না। মহী সন্দেহ হাত পেতে নিতেই ঠাকুর অদৃশ্য হলেন। তখন সেই সন্দেহ ভেঙে ভেঙে খেলো সে। মা তারপরে এসে বসে—এবারে ব্যথা আর তেমন টের পাবি না। মা অদৃশ্য হতে কমলা কাছে এসে ঝুঁকে বলে—কি খাচ্ছ?

—এ্যাঁ। কিছু না তো?

—ওই তো মুখে লেগে রয়েছে। ওই তো হাতে। দেখি দেখি—। এ যে দেখছি সন্দেশ। কোথায় পেলে? কে দিলো?

মহী চুপ করে থাকে। কেষ্ট ঠাকুরের কথা তো বলা যায় না। তাছাড়া কেনই বা বলবে? দাদা কিংবা বউদির কাছেও না হয় বলা যেতো। তারা বিশ্বাস করতো।

কমলা ভাবে, হেমলতা দিয়েছে নিশ্চয়। এই ঘরে হেমলতা আর ভাশুর ছাড়া তো কেউ ঢোকে না। হেমলতাও আলগা আলগা ভাবে ঢোকে। অনেকটা আঁতুড় ঘরে উঁকি দেবার মতো।

বিচারপতি স্যার রবার্ট চেম্বার্সের বৃদ্ধা মা নাতির শোক সামলাতে পারল না। অথচ ব্যাপারটা কিছুই নয়। নাতি বড় হয়েছে এই সময়ে বিলেতে না পাঠালে লেখাপড়া হবে না কিছুই। সবাই তাই করে। স্যার চেম্বার্সের মা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। কিন্তু তার বয়স হয়েছিল। ভালোভাবেই জানতো জীবনে তার ওই নাতির মুখ আর কখনো দেখতে পাবে না। অত্যন্ত স্নেহশীলা রমণী। স্নেহশীলা বলেই ছেলে আর তার বউ-এর সঙ্গে এই বয়সে এত দূর দেশে চলে এসেছিল। নাতির শোকে শেষ পর্যন্ত এই বিদেশের মাটিতেই চিরকালের মতো থেকে যেতে হলো।

সাহেব মহলে ভালোরকম আলোড়ন সৃষ্টি হলো এই বিদুষী মহিলার মৃত্যুতে। স্যার রবার্ট চেম্বার্সের বাড়ির প্রায় প্রতিটি ডিনার পার্টি আর প্রতিটি পাবলিক ব্রেকফাস্টে এই মহিলার সাহচর্য পেয়ে সবাই ধন্য হতো। তাই তার কফিন যখন ঘর থেকে বাইরে বার করা হলো, তখন সেখানে চিফ জাস্টিস, এলিজা ইম্পে থেকে শুরু করে শহরের প্রায় সব গণ্যমান্য ব্যক্তিই উপস্থিত। এলিজা ইম্পে মাত্র দু'দিন আগে চাঁদপাল ঘাটের কাছে তার ওল্ড কোর্টের বাড়ি থেকে বেরিয়াল গ্রাউণ্ড স্ট্রিটের নতুন বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। সেই বেরিয়াল গ্রাউণ্ড স্ট্রিট ধরেই এই শবযাত্রা গেল সমাধিস্থলে।

কোনো সাহেব কিংবা মেম মবলে তাদের শবযাত্রা দেখার জন্য রাস্তার দু'পাশে বেশ ভিড় হয়। ঠিক যেমন হাতির পিঠে চেপে নবাব আসার সময় হতো। এখনো নবাব এলে একেবারে যে ভিড় না হয়, তা নয়। তবু সবাই ভালোভাবে জানে এই নবাবের বিষদাঁত নেই। ছোবল মারলেও কোনো ক্ষতি হবে না। শেষ বিষদাঁত দেখা গিয়েছিল মীরকাশেমের। সে তো পথের ধারে ভিখারীর মতো মরেছে।

স্যার রবার্ট চেম্বার্সের মায়ের দেহ নিয়ে যাবার সময় ভিড় আরও বেশি হয়েছিল। সেটা কফিনে ঢাকা মৃতদেহ দেখবার জন্য ততটা না হোক যতটা নাম-ডাকওলা সাহেবদের দেখবার জন্য। সুপ্রিম কোর্টের অত সব জাঁদরেল বিচারপতি—ওই সমস্ত অ্যাটর্নি। তাছাড়া কেল্লার সব ডাকসাইটে সেনাপতিরা। টিপু সুলতানের মতো মানুষকে যারা টিট করেছে। সবার প্রতি পথের মানুষের সম্ভ্রমবোধ রয়েছে বটে, কিন্তু একজনকে যখন চিনিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তখন সম্ভ্রমের সঙ্গে রীতিমতো শ্রদ্ধাও ফুটে উঠছে তাদের চোখে-মুখে।

—ইনিই হাইড সাহেব। আহা মানুষ তো নন—দেবতা!

এই হাইড সাহেব কিন্তু সমাধিস্থলে বেশিক্ষণ থাকতে পারলেন না। তাঁর কাছে নিয়ে আসা হবে একজন সদ্য বিধবাকে যে সতী হবার জন্য জেদ ধরেছে। বিচারপতি হাইড পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানেন শতকরা একজনও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বামীর চিতায় উঠে প্রাণ বিসর্জন দেয় না, পেছনে অনেক কারণ থাকে। কোথাও থাকে ভীতি প্রদর্শন, কোথাও উচ্ছ্বাস—আবার কোথাও আশ্রয়হারা হবার আশঙ্কা। তাই হাইড সাহেব কয়েকটি নির্দিষ্ট সূত্র অনুযায়ী এই সমস্ত ব্যাপারে কাজ করেন। ফল হয় আশাতীত।

হাইড সাহেব স্যার চেম্বার্সের কাছ থেকে গম্ভীরভাবে বিদায় নিয়ে তাঁর ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে ওঠেন। সমাধিস্থলে আসবার সময় সবাই পদব্রজেই এসেছিল। কিন্তু তার গাড়ি বা পাল্কি পেছনে পেছনে এসেছিল। কারণ শবদেহ সমাধিস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সবাইকে কর্মস্থলে ছুটতে হবে।

হাইড সাহেব কোর্টে তাঁর ঘরে গিয়ে বসে শুনলেন, মহিলা এবং তাঁর আত্মীয়স্বজন একটু আগেই এসে উপস্থিত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে হাইড সাহেব সহমরণে প্রস্তুত বিধবাদের কাছে নিজেই গিয়ে দাঁড়ান। আজও তিনি পার্শ্ববর্তী বারান্দায় গিয়ে উপস্থিত হলেন।

স্থির হয়ে বসে রয়েছে অবগুণ্ঠিতা সতী। তার মুখ না দেখেও শুধু হাতের সামান্য যেটুকু অংশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তাতেই সাহেব বুঝতে পারলেন রমণী অতি অল্পবয়সী। বুকের ভেতর কেমন যেন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। সংযত করেন নিজেকে।

প্রশ্ন করেন—মা, আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন?

মহিলা ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানায়।

—আপনি কি এখানে সবার সামনে কথা বলবেন? না কি আমার ঘরে গিয়ে বলবেন?

যুবতীর পাশে দণ্ডায়মান একজন যুবক তার মুখের কাছে কান নিয়ে যায়। যুবককে ফিসফিস্ করে কি যেন বলে যুবতী।

যুবক তখন বিচারপতিকে বলে—ইনি আমার ভগিনী। শুধু আমি এঁর সঙ্গে থাকব।

—বেশ তাই আসুন।

হাইড সাহেব সোজা তাঁর ঘরে গিয়ে বসেন। একটু পরে তারা দু'জন বিচারপতির কাছে এসে দাঁড়ায়।

—আপন বসুন মা। আমি জানি, আপনি স্বামীর নাম বলবেন না। তাই আপনার ভাইকে জিজ্ঞাসা করছি। তিনি সত্যি বললে আপনি জানিয়ে দেবেন।

যুবকটি বলে—৺মহীধর মুখোপাধ্যায় আমার ভগিনীর স্বামীর নাম।

যুবতী বলে—ঠিক।

—আপনার স্বামীর কোনো ভাই আছে?

—হ্যাঁ।

—তাঁর নাম?

—আমি তো বলতে পারবে না। আমার দাদা বলবেন।

যুবক বলে—তাঁর নাম গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তবে তিনি মুখোপাধ্যায় বলা পছন্দ করেন না। তিনি মুখার্জি লেখেন। তিনি একজন বেনিয়ান।

হাইড সাহেবের মনে কথাটা ছ্যাঁৎ করে গিয়ে স্পর্শ করে। বেনিয়ানরা বড় লোভী। তারা কুচক্রী এবং অনেক ক্ষেত্রে ভীষণ নিষ্ঠুর। বেনিয়ান গোপাল মুখুজ্জের নামটা বেশ চেনা মনে হচ্ছে। তবে সে যদি কুখ্যাত হতো, তাহলে তাকে তিনি ভালোভাবেই চিনতেন। কারণ গ্রিফিথরা চাঁদপাল ঘাটে এসে প্রথম পদার্পণ করার পর বেনিয়ানরা তাদের সরলতা আর অনভিজ্ঞতাকে যেভাবে কাজে লাগায় তা অমানবিকতার পর্যায়ে পড়ে। সবাই এদেশে এসে অর্থের মুখ দেখে না। অথচ সামাজিক ঠাঁট বজায় রাখার জন্য অর্থের প্রয়োজন। নইলে সাহেবদের মধ্যে তো নয়ই, এদেশী নেটিভদের মধ্যেও সম্মান বজায় রেখে চলা যায় না। সেই সুযোগ গ্রহণ করে এই বেনিয়ানরা। শতকরা বারো টাকা সুদে ধার দিতে শুরু করে সাহেবদের। তারপর আসল ছেড়ে দিয়ে সুদ শোধ করতেই ওষ্ঠাগত হয় প্রাণ। সেই সব সময়ে বেনিয়ানরা বহু গ্রিফিথ কিংবা অন্য সাহেবদের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেয় কোর্টে। হাইড সাহেব তাই অনেক বেনিয়ানকেই চেনেন। কিন্তু গোপাল মুখুজ্জে নামে কেউ এই ধরনের কোনো মামলা করেছে বলে মনে পড়ে না।

তবু বেনিয়ানরা যত ভালোই হোক, তাদের অর্থলোলুপতা যাবে কোথায়? সেই লোলুপতা বাইরে থেকে ঘরেও এসে সংক্রামিত হয়। সুতরাং ছোট ভাই-এর সম্পত্তির লোভে গোপাল মুখুজ্জে নামে এক বাঙালী তার ভাইয়ের স্ত্রীকে সহমরণে যেতে প্ররোচিত করবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে?

সোজা সদ্য বিধবাকে প্রশ্ন করেন হাইড সাহেব—আপনার কিংবা আপনার স্বামীর কতটা সম্পত্তি আছে?

—একটুও নেই। টাকাও নেই।

হাইড মেয়েটির সোজা স্পষ্ট এবং বাষ্পহীন জবাব শুনে একটু চমকে ওঠেন।

—নেই কেন? আপনার স্বামীর বড় ভাই নিশ্চয় অবস্থাপন্ন।

—হ্যাঁ। তিনি যথেষ্ট অর্থ করেছেন। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে অনেক পরিশ্রমে সংসারের দারিদ্রতা ঘুচিয়েছেন। আমার স্বামী কিছুই উপায় করতেন না। দাদার স্নেহে, তাঁরই আশ্রয়ে থাকতেন।

হাইড সাহেব থ' হয়ে যান। আর বলার কিছু নেই। তবু মেয়েটির কথার ধরন শুনে প্রশ্ন করেন—আপনি কি শিক্ষিত?

মহিলা বলে—ওসব কথা এখন শুনে কি হবে? আপনি আমাকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিন।

যুবকটি এত তাড়াতাড়ি তার ভগিনীকে যেতে দিতে চায় না। সে তখনো আশায় রয়েছে হয়তো শেষ পর্যন্ত সহমরণের হাত থেকে ভগিনীকে উদ্ধার করতে পারবে।

সে বলে—আমার বোন শিক্ষিত। সে সংস্কৃত খুব ভালোই জানে আর ইংরাজিও শিখেছে।

সেই সময় হঠাৎ বিচারপতির ঘরে একজন যুবক ছুটে আসে। বিচারপতির পায়ের কাছে বসে পড়ে বলে—সাহেব, ইনি আমার ভ্রাতৃবধূ। আমার নাম গোপাল মুখুজ্জে। আপনার নির্দেশ অমান্য করে ঘরে ঢুকেছি বাধ্য হয়ে। আমি প্রার্থনা করছি, আমার ভ্রাতৃবধূকে আপনি বাঁচান। একথা বাইরে বললে সবাই ছিঃ ছিঃ করবে। তাই একান্তে আপনার কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করছি। বাইরে বললে সবাই আমাকে একঘরে করবে।

হাইড বিচলিত হন। তিনি গোপালকে বলেন—আমি আমার যথাসাধ্য করবো। আপনি বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন। গোপাল মুখুজ্জে বাইরে চলে যায় আশান্বিত হয়ে।

বিধবা এবার মুখের ঘোমটা সরিয়ে সোজা হাইড সাহেবের দিকে চায়। সেই চাহনিতে কোনো জেদ নেই কোনো আবেগ নেই। দেখে একটুও বুঝতে পারা যায় না, মহিলা আত্মবিসর্জনের কঠিন শপথ নিয়ে বসে আছে।

বিধবা বলে—সাহেব, আপনি শুধু শুধু আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করবেন না। আমি কৃতসঙ্কল্প। আমি শুনেছি আপনি দু' তিনদিন অনেক সময় সতীদের আটকে রাখেন। পরীক্ষা করে দেখেন তাদের সহমরণের ইচ্ছা সত্যিই কিনা—তাদের ততখানি মনের জোর আছে কিনা। স্বামীর মৃত্যুর পর সতীদের আর জলস্পর্শ করতে নেই। শুনেছি অনেক মেয়ে অনাহারে থাকতে না পেরে কিংবা তৃষ্ণা সহ্য করতে না পেরে জলপান করে ফেলে। তখন তাদের আপনি বাড়ি পাঠিয়ে দেন। কারণ সে তো সতী রইলো না। বাড়িতে কিংবা সমাজে সে হেয় হলেও প্রাণে যে বাঁচলো তাতেই আপনি খুশি। আপনি ইচ্ছে করলে আমাকেও আটকে রাখতে পারেন। কোনো লাভ হবে না। তৃষ্ণার্ত অবস্থায় বড়জোর মৃত্যু হবে আমার। তাই আমি অনুরোধ করছি আমাকে চলে যেতে অনুমতি দিন। স্বামীর শব পড়ে রয়েছে। কতক্ষণ ওইভাবে রেখে দেবেন? সেটা আপনার উচিত হবে না।

হাইডের বুকের ভেতর কেঁপে ওঠে। সতীদাহ তিনি একটি দেখেছেন। দেখে বড় মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হয়েছে। চিতায় অগ্নিসংযোগ করার পর অনেক ক্ষেত্রেই সতী সইতে না পেরে ছুটে পালাতে চায়। সেই সময় তারই আত্মীয়-স্বজন এমনকি দর্শকরাও তার মাথায় বাঁশ দিয়ে আঘাত করে চিতার ওপর শুইয়ে দেয়।

কয়েকজন বিধবাকে আটকে রেখেও সফল হয়েছেন তিনি। কিন্তু এই নারী সম্পূর্ণ অন্য ধাতুে গড়া। মরণকে এ-নারী অতি সহজভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। এর মধ্যে কোনো ভাবাবেগ নেই, স্বামীর প্রতি ভালোবাসার কোনো কুসংস্কারও নেই। আর ভীতি প্রদর্শনের কোনো ঘটনা যে নেই তা তো স্পষ্ট প্রমাণিত। তবে? মনের সেই অসীম বল এতটুকু মেয়ে পেল কোথা থেকে? বয়স বড়জোর আঠারো। বলা যেতে পারে প্রায় কিশোরী। এই বয়সে সংসার সম্বন্ধে কতটুকু অভিজ্ঞতা থাকে? তাছাড়া মেয়েটি শিক্ষিতা। সংস্কৃতে কি সতীদাহের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে কোথাও?

হাইড বলেন—সংস্কৃতের কোথাও কি সতীদাহ সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে।

আশ্চর্য! মেয়েটি হেসে ফেলে। বলে—ওসব কথা মিছিমিছি উত্থাপন করবেন না। আমাকে যেতে দিন। কিংবা যদি আমাকে কয়েদ করে রেখে পরীক্ষা করার ইচ্ছা হয় করতে পারেন। কিন্তু আমার স্বামীর দেহ যেন কোনোমতেই বিকৃত না হয়। আপনি যদি এভাবে কৌশলে আমার প্রাণ বাঁচাতে না পারেন, তাহলে সব দায়িত্ব আপনার।

মেয়েটা হাসছে? সহজ হাসি। যেন কিছুই হয়নি। তবে কি এতদিনে এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা লাভ হলো? এতদিনে হিন্দুধর্মের এক প্রকৃত সতীকে দেখতে পেলেন তিনি? হিন্দুরা বলে, এই সংসার মায়া প্রপঞ্চ। এখানে দু'দিনের অভিনয় করা শুধু। আসল জায়গা হলো পরপারে—ঈশ্বরের কাছে।

দেহের ভেতরের প্রাণটুকুই যা বাধা। সেই প্রাণ আবার ঈশ্বরপ্রদত্ত। তাই সেই প্রাণ নিজের হাতে নেওয়া যায় না। নিজে নিজে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া মহাপাপ। কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনার জন্য কৃচ্ছ্রসাধনে, কিংবা এই ধরনের সহমরণে তো পাপ নেই। তাই ধর্মের নামে কত আত্মনিপীড়ন। চড়কের সময় দেখা যায়, কত সন্ন্যাসীর অদ্ভুত ধরনের সাধনার মধ্যে। কিন্তু সতীদাহ সব চাইতে মর্মস্পর্শী। কিন্তু যে প্রকৃত সতী সে তো এই সংসারকে ভাবে স্বপ্ন। তাই সে কত সহজে হাসে। তাই তার মনে কোনো ভয় নেই, উল্লাস নেই। বরং একটা আনন্দানুভূতি রয়েছে তার। সেইজন্যই বোধহয় অমন ক্ষমাপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে।

হাইড সাহেবের মাথা নত হয়।

সতীর ভ্রাতা বিচারপতির মুখের দিকে এতক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিল। এবার সে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে, সেই কান্নার শব্দ শুনে বাইরে থেকে গোপাল মুখুজ্জে ছুটে আসে।

গোপাল মুখুজ্জেকে জড়িয়ে ধরে যুবক বলে—সাহেব পারলেন না। কমলাকে রাজি করাতে পারলেন না।

গোপাল মুখুজ্জে ভগ্নকণ্ঠে ডেকে ওঠে—সাহেব?

—না। আমি পারলাম না। আপনার ভ্রাতার স্ত্রী প্রকৃত সতী।

গোপাল মুখুজ্জে ভাদ্র-বধূর দিকে ফিরে বলে ওঠে—মা।

কমলা ঘোমটা টেনে মাথা নত করে।

যুবক আর্তনাদ করে ওঠে—কমলা।

কমলা যেন নিষ্কম্প প্রদীপশিখা।

হাইড সাহেব একটু বসে থেকে অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়েন। তিনি থাকবেন সতীদাহের সময়। সঙ্গে নিয়ে যাবেন ফোর্ট উইলিয়ম থেকে কিছু সৈন্য। চিতার পাশে প্রথমে তিনি কাউকে ভিড়তে দেবেন না। কিন্তু—কিন্তু এই অষ্টাদশী মেয়েটি যদি শেষ পর্যন্ত এমনি অবিচল থেকে চিতায় অগ্নিশিখাকে আহ্বান জানিয়ে আত্মাহুতি দেয়, তাহলে সেই মুহূর্তেই তিনি চলে আসবেন সৈন্যদের নিয়ে।

কমলা ভাবে, কোথায় তুমি? নাটোর কেমন জায়গা? সুখে আছ তো? আমার শেষ ব্যবহার তোমাকে খুবই আহত করেছে জানি। ধর্ম বলে, পরজন্ম নাকি আছে। যদি থাকে, অপেক্ষা করবো। আর যাই হও গরীব হয়ো না। এবারে দেখ তো কি হলো? তোমার কী রূপ—কত শিক্ষিত তুমি। তোমার মন আকাশের মতো উদার। তোমার বংশ কৌলীন্যও কি কম? তুমি নিজেই শুনিয়েছ তোমার জ্ঞানীগুণী পূর্বপুরুষের কথা। অথচ তোমার অর্থ ছিল না। তাই তোমাকে পেলাম না। কিন্তু কি অদ্ভুত দেখ। ধনবান বলে যার হাতে আমাকে সমর্পণ করা হলো, সে পথের ভিখারী। তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখতে, তার সেটুকুও নেই। তাই ভাই-এর অর্থের জৌলুষে আমার হিতাকাঙ্ক্ষীদের চোখ আর মন দুই-ই ঝলসে গেল। তাই ভালোই হলো। যদি তার নিজের অর্থ থাকতো, তাহলে কি এত তাড়াতাড়ি নিশ্চিন্ত হতে পারতাম? জ্বলতে হতো, কতদিন কে জানে। একদিনের জ্বলুনিতে সব শেষ হয়ে যেত না। আশীর্বাদ করো, সেই জ্বলুনি যেন সহ্য করতে পারি। কত কথা শুনেছি সতীদাহ নিয়ে। কত ভালো ঘরের বউ বাধ্য হয়ে আত্মহত্যা করেছে। সমাজে স্থান হয়নি। কত বউ সাহেবের ঘরণী হয়েছে। তুমিও শুনিয়েছ কত গল্প। আজ যেন আমি সফল হই।

আজ আমার কাছে সব কিছু স্বপ্নের মতো বলে মনে হচ্ছে। আমার বড় জা-এর চোখে জলের ধারা। হয়তো অনুশোচনা হচ্ছে। খুবই সন্দেহ করতো তোমাকে আর আমাকে নিয়ে। আজ ভাবছে সে নিজেও আমার মতো সতী কিনা। আচ্ছা আমি কি সতী? তুমি কি বলো?

গঙ্গার ধারে বিপুল জনতা। ওপারেও জনতার ভিড়। নৌকো করে ওপার থেকে এখনো কত লোক

আসছে। হাইড সাহেবের সৈন্যরা চিতার চারপাশে একটা গণ্ডী তৈরি করেছে হাতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। সেই গণ্ডীর ভেতরে রয়েছে শুধু পুরোহিত, গোপাল মুখুজ্জে আর কমলা। হেমলতা শেষ পর্যন্ত পারল না। সে পালিয়ে গেল গণ্ডীর বাইরে। এ-দৃশ্য চাযুষ করার মতো মনের জোর তার নেই।

পঞ্চানন ঘোষ গণ্ডীর বাইরে খুব লম্ফঝম্ফ করে। মুখোপাধ্যায় পরিবারের গুণাবলী একে একে বলে চলে সবার কাছে। এই বংশের সঙ্গে তারই ঘনিষ্ঠতম পরিচয়। সে এত বেশি কথা বলছিল যে শেষ পর্যন্ত তার পুত্র বজ্রনাথ তার হাত শক্ত করে চেপে ধরে এক সাহেবের কানে কানে কি ব'লে তাকে গণ্ডীর ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়।

—একি! একি করলি বজ্র? এসব দৃশ্য—। না না আমি বাইরে যাব।

—তাহলে একেবারে বাড়ি যেতে হবে তোমাকে বাবা।

—এ্যাঁ বাড়ি যাব? দেখব না? লোকে বলবে কি? মহী যে আমার ছোট ভাই-এর মতো।

বজ্রনাথ পিতাকে আবার গণ্ডীর বাইরে এনে বলে—সবাই তোমার কথা শুনে ভাবছে, খুব আনন্দ হয়েছে তোমার। আমিও তাই ভাবছি।

—এ্যাঁ তুই-ও তাই ভাবছিস্। তুই না আমার ছেলে? একমাত্র বংশধর? তুইও তাই ভাবছিস্।

পঞ্চানন ঘোষ হাপুস নয়নে কেঁদে ওঠে।

সেই সময় ঢাক ঢোল বেজে ওঠে। কমলা গঙ্গাস্নান সেরে এসে চিতায় শায়িত মৃত স্বামীর চিতা প্রদক্ষিণ-রত অবস্থায় মুখাগ্নি করে।

তারপর চিতার ওপর অবিচল পদে উঠে স্বামীর মস্তক কোলে তুলে নিয়ে বসে। এই সময় তার মাথার অবগুণ্ঠন খসে পড়ে। সে একবার গোপাল মুখুজ্জের দিকে চকিত দৃষ্টি ফেলে। এই মানুষটিকে সে একমাত্র শ্রদ্ধা করে। পিতৃকুলে কিংবা শ্বশুরকুলে আর কোনো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি তার নেই। এই মানুষটির বংশ তার স্বামী কলঙ্কিত করেছিল হয়তো, তারই দোষে সেই কলঙ্ক মোচন করবে আজ সে।

চিতার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। কমলা স্থির। আগুনের শিখা ধীরে ধীরে লেলিহান জিহ্বা বার করে চারদিক ছড়িয়ে পড়ে। কমলা তবু স্থির। আগুন হু হু শব্দ তোলে গঙ্গার হাওয়ার আনুকূল্যে। চিতায় প্রচুর পরিমাণে ঘৃত এবং তৈল দেওয়া হয়েছে। কমলাকে ঘিরে আগুনের শিখা নৃত্য করছে, কমলা তবু স্থির। কমলার দেহে আগুন লেগেছে। তার শাড়ি জ্বলছে দাউ দাউ করে। সে একটুও কেঁপে উঠলো যেন? না না—সে কাঁপেনি, সে স্থির। তার মাথার সব চুল পুড়ে গেল। তার দেহের চামড়া পুড়ে গেল। সে স্থির। সে চিরকালের জন্য স্থির। এখন যদি সে কেঁপে ওঠে—সেই কাঁপায় কোনো দোষ নেই।

শঙ্খধ্বনিতে আকাশ মুখরিত হয়।

হাইড সাহেবের সহসা খেয়াল হয় সব তো কবে শেষ হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি সৈন্যদের নিয়ে তিনি রওনা হন। অদূরেই তাঁর পালকি অপেক্ষা করছে। এতদিনে তিনি সতীদাহ দেখলেন, সেই সঙ্গে দেখলে'ন একজন প্রকৃত সতীকে। তাঁর আজন্মের শিক্ষা আর বিশ্বাসের মধ্যে কোথায় যেন একটা বিপ্লব ঘটে গেল।

সন্ধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ামে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছেন। যেতেই হবে—তবে সবার মতো উৎফুল্ল না থাকার কারণ নিশ্চয় দর্শাতে পারবেন গভর্নর জেনারেলকে।

এদিকে সুখেনের মা দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত কমলাকে নিশ্চয় দেখবে কোনো না কোনো একদিন। গঙ্গার ঘাটের পুণ্যবতী আখ্যাপ্রাপ্তা কোনো মহিলা নিশ্চয় কমলার সহমরণের কোনো ঐশ্বরিক কিছু দেখেছে, যা দু-একদিনের মধ্যেই সারা নগরীতে ছড়িয়ে পড়বে।

রামরতন চক্রবর্তীর কাছে এ-খবর কবে পৌঁছাবে জানা নেই।

রাজপুত নন্দিনী

স্তব্ধ মহিষীর চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ল।

তারই সামনে দিয়ে একে একে অন্যান্য রাণীরা চিতায় গিয়ে আরোহণ করে। নয়ন তাদের শুষ্ক। মুখে তাদের প্রত্যাশার পরিতৃপ্তি। স্বামী মৃত। কিন্তু মৃত্যুতেই তো সব কিছু নিঃশেষ হয়ে যায় না। আছে পরকাল—আছে স্বর্গ। স্বামী তাদের অপেক্ষা করছেন সেখানে। তাঁর সাধ্বী পত্নীরা চলেছে এক নতুন অভিসারে। ক্ষণেক বিরহের পর অগ্নির সাহচর্যে পবিত্র আত্মা নিয়ে চিরমিলনের পথে এই অভিসার।

শুধু একজন ছাড়া। তাই তার নয়নে আজ তপ্ত অশ্রুর ধারা। শেষ মহিষী চন্দ্রাবতী এগিয়ে এলো কাছে। ওড়নায় তার চোখের জল মুছিয়ে বিদায় নেবার বেলায় বলে গেল,—কেঁদো না ভাই। কর্তব্য তোমায় আরও কিছুদিন এই পৃথিবীতে রাখতে বাধ্য করল। বড় পবিত্র এই কর্তব্য। তোমার গর্ভে যে রয়েছে সে ছাড়া আর তো কেউ রইল না রাজার বংশে।

—কিন্তু কী করে থাকব আমি। উনি আমায় যেতে না দেখে কি ভাববেন? ভাববেন, আমি সতী নই।

—ছিঃ ছিঃ। ওকথা মুখে এনো না। তুমিই শ্রেষ্ঠ সতী। তোমার জন্য রাজা অপেক্ষা করবেন। নিশ্চিন্তে থেকো। আর মাত্র কয়েকটি বছর। মহাকালের তুলনায় পৃথিবীর এই সময়ের দৈর্ঘ্য কতটুকুই বা।

ওই তো স্বামীর শবদেহ। সজ্জিত চিতার ওপর শান্তভাবে নিদ্রিত রয়েছেন যেন। বয়সে প্রবীণ, অথচ যৌবনের দীপ্তি এখনও সুস্পষ্টভাবে লেগে রয়েছে সর্ব অবয়বে। সবাই তাঁর সঙ্গিনী। শুধু সে পড়ে রইল। পড়ে রইল রাজার প্রেমের শেষ ফুল ফোটবার অপেক্ষায়।

রাজা যশোবন্ত কি জানতেন না তাঁকে এই বৃদ্ধ বয়সে হিন্দুস্থানের সীমান্তে অরণ্যসঙ্কুল পার্বত্য অঞ্চলে কেন পাঠানো হয়েছে? জানতেন ঠিকই। কিন্তু জেনেও কিছু বলতে পারেননি। কারণ বাদশাহ আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে তাঁকে বেশ কয়েকবার অস্ত্রধারণ করতে হয়েছিল তিনি তখত্‌তাউসে বসবার আগে। এবং পরেও কযেকবার বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। তিনি ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁদের উভয়ের মধ্যে রয়েছে ধাতুগত পার্থক্য যা কখনো মিশ খাবে না। তেলে আর জলে কখনো কি মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতে পারে?

অথচ শাহানশাহ সাজাহানের সময়ে তাঁর দিন কত সুখে কেটেছে। শাহানশাহের জন্যে একবার নয়, অসংখ্যবার তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবন বিপন্ন করেছেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দারাশুকোর প্রতিও যশোবন্তের সহানুভূতির অভাব ছিল না। দারাশুকো যদি একটুখানি বাস্তব-বুদ্ধিসম্পন্ন হতো, কল্পলোকে বিচরণ করা কিছুটা হ্রাস করত তাহলে হয়তো বৃদ্ধ সাজাহানকে শেষ জীবনে বন্দী জীবন যাপন করতে হতো না।

আওরঙ্গজেব ভালোভাবেই জানতেন যশোবন্তের মনোভাব। তিনি জানতেন বিধর্মীর প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণাকে যশোবন্ত মনে মনে কখনো বরদাস্ত করতে পারবেন না।

কত সময়ে যশোবন্ত বলেছেন,—বাদশাহ, এই দেশের সবাইকে কখনো আপনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাতে পারবেন না। শুধু শুধু কেন এতটা অধৈর্য হয়ে ওঠেন।

—দেখা যাক পারি কি না।

—একটা জিনিস শুধু লক্ষ্য করবেন বাদশাহ, কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ আর কোন ধর্ম নিকৃষ্ট এ প্রশ্ন না তুলেও আপনি দেখতে পারেন মানুষ তার শৈশবের ধর্মকে সহসা ছাড়তে চায় না।

—কেন মহারাজা, আপনাদের প্রিয়তম দারাশুকো তো ছেড়েছিল।

—ছিঃ ছিঃ বাদশাহ, ওকথা বলবেন না। ইসলাম ধর্মের প্রতি তার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। শুধু তার অদম্য জ্ঞানতৃষ্ণা অন্য ধর্মের ভেতর থেকে রত্ন খুঁজে দেখতে উৎসাহী হয়েছিল।

—রত্ন! আপনি কি বিশ্বাস করেন মহারাজ অন্য ধর্মে রত্ন বলে কিছু আছে?

—জানি না।

—আপনার জবাবটা ক্রোধের নামান্তর।

—আপনার সম্মুখে ক্রোধ প্রকাশ অমার্জনীয় অপরাধ।

—আমিও তাই মনে করি।

এর কিছুদিন পরেই বাদশাহ যশোবন্তকে আবার ডেকে পাঠালেন। তিনি হুকুম দিলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধযাত্রা করতে।

যশোবন্ত সেই আদেশ শিরোধার্য করে নিলেন। না নিয়ে উপায় ছিল না। ঘাতকের হস্তে প্রাণ বিসর্জনের সমূহ সম্ভাবনা ছিল। তাঁর গগনচুম্বী প্রতিষ্ঠা আওরঙ্গজেবকে এই কাজ থেকে নিবৃত্ত করেছিল। কারণ তাঁর মতো চতুর শাসনকর্তা বুঝতে পেরেছিলেন সবাইকে যেভাবে অনায়াসে পৃথিবী থেকে সরিয়েছেন, যশোবন্তকে ঠিক সেভাবে সরানো যাবে না। তাঁর পেছনে রয়েছে রাজস্থানের অনেক নৃপতি। এইসব নৃপতিরা আর কিছু না পারুক, দিল্লিকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে পারে। এটা তিনি চান না।

এতদিনে আওরঙ্গজেবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। ওই তো শায়িত রয়েছেন বৃদ্ধ মহারাজ। নয়নদ্বয় নিমীলিত। মুখে বিন্দুমাত্র ক্ষোভের চিহ্ন নেই। চিতার উপর যেন তিনি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছেন।

দেখে যাও আওরঙ্গজেব। তোমার চিরশত্রু আর তোমার পথের কাঁটা হয়ে দেখা দেবেন না। তুমি নিশ্চিন্তে এগিয়ে চল, সম্মুখে রয়েছে তোমার জয়যাত্রার সুদীর্ঘ পথ। তুমি তোমার পিতাকে ক্ষমা করনি। ভ্রাতাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অনুকম্পা জাগেনি তোমার মনে। তাদের রক্ত তোমায় আনন্দ দিয়েছে। নিজের পুত্রকেও তুমি ভয় পাও। ঘুমের মধ্যে কেঁপে ওঠো। ভাবো, তুমিও বুঝি হবে দ্বিতীয় সাজাহান—বন্দীশালায় বন্দী অবস্থায়।

ভয় নেই বাদশাহ। তোমার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি কেউ এড়িয়ে যেতে পারবে না। তুমি অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলবে। শুধু ভয় হয়, তোমার প্রভাব যদি পরবর্তীকালের অপর কোনো বাদশাহের ওপর গিয়ে পড়ে।

মহিষী একাকী মৃত স্বামীর দিকে অপলকদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে আর হাজার চিন্তা তার মাথার ভেতরে তালগোল পাকাতে থাকে।

আওরঙ্গজেব কবে এই মৃত্যু সংবাদ পাবেন? পেয়ে নিশ্চয়ই আনন্দে চিৎকার করে উঠবেন। দারার হত্যার পরও তিনি নাকি সব সংযমকে বিসর্জন দিয়ে চিৎকার করে উঠেছিলেন।

সহসা মহিষীর চিন্তাস্রোত স্তব্ধ হয়। চিতার পাশের রাজপুতরা সবাই একটি করে মশাল জ্বালিয়ে হাতে নিয়ে দাঁড়ায়। এইবার—এইবার তার স্বামীর নশ্বর দেহ চিরকালের জন্যে বিলুপ্ত হবে। ওই দেহকে কতভাবে যে সে সেবা করেছে। হায় ভগবান। ওই দেহ নশ্বর জেনেও এত মোহ কেন?

ওই যে রাণী চন্দ্রাবতী এগিয়ে চলেছেন। তাঁরই জন্যে এতক্ষণ সবাই অপেক্ষা করছিল। অন্যান্য নারীরা চিতার পাশে গিয়ে বসে রয়েছে। সবাই একসঙ্গে ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

রাণী চন্দ্রাবতী সবশেষে চিতায় গিয়ে ওঠেন। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলো। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন ধূম উদ্গীরণ করতে করতে তার লেলিহান শিখায় গগন স্পর্শ করতে চাইল। চারদিকে জয়ধ্বনি। সতীদের কারও এতটুকু চিৎকার, ক্ষীণ আর্তনাদও শোনা গেল না। তারা করজোড়ে যেভাবে বসেছিল,

সেইভাবেই দগ্ধ হলো। আর একমাত্র জীবিত মহিষীর মনে হলো ইহসংসারে সে একেবারে একা—নিঃসঙ্গ।

তার গর্ভে রয়েছে বটে স্বামীর একমাত্র বংশধর। কিন্তু কতদিন—কতদিন পরে ডাক পড়বে তার? কবে শেষ হবে সুকঠিন কর্তব্য?

জানে না সে। গর্ভের সন্তানের চাঞ্চল্য তার মাতৃহৃদয়কে কী মধুর আবেশে এতদিন ভরিয়ে তুলত। এই মুহূর্তেও সেই চাঞ্চল্য অনুভূত হচ্ছে। অথচ সেই আকর্ষণ আর নেই যেন। মহিষী চন্দ্রাবতী শেষ বিদায় নেবার বেলায় ঠিক কথাই বলে গেল। কর্তব্য। কর্তব্য বৈকি। আজ যে রয়েছে ভ্রূণাবস্থায়, পরাক্রান্ত দিল্লির বাদশাহের কাছে এককালে সে বিষাক্ত কাঁটা হয়ে দেখা দিতে পারে। কথাটা ভাবতেই বুক কেঁপে ওঠে। দু'হাতে দেহাভ্যন্তরস্থ শিশুকে চেপে ধরে সে অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে,—না, না ওকে রক্ষা করতেই হবে। মহারাজ যশোবন্ত সিংহের ধমনীর উষ্ণ রক্তস্রোত পৃথিবী থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হতে দেবে না। কিছুতেই দেবে না।

—মহারাণী।

—কে?

—আমি রত্না।

—ও। আমি কি প্রলাপ বকছিলাম রত্না?

—না মহারাণী। যাকে আপনি প্রলাপ বলে ভাবছেন, তার চাইতে যুক্তিপূর্ণ কিছু এই মুহূর্তে কেউ বলতে পারে না।

—আমার ভয় হচ্ছে রত্না। ভীষণ ভয়।

—জানি রাণী এ ভয় শুধু আপনার নয়। এ ভয় সমস্ত রাঠোরের আর মাড়োয়ারের। এ ভয় হয়তো সমগ্র রাজপুতনার।

আরও বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে দু'জনে। কারও মুখে কথা নেই। দু'জনেই চিন্তায় বিভোর। রাণী ভাবে রাজার কথা, আর নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা। রত্নাও সেকথা ভাবে—সেই সঙ্গে তার মনে ভেসে ওঠে এক তরুণ বীরের ছবি। খাইবার গিরিপথে হয়তো এখন সে যুদ্ধে লিপ্ত।

চিতার আগুন স্তিমিত হয়ে আসে ধীরে ধীরে। তারপর একসময় নিভে যায় একেবারে। রাজা আর রাণীদের দেহের ভস্মাবশিষ্ট কাঠের ছাই-এর সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

—মহারাণী।

—কে? ও রত্না।

—চলুন মহারাণী, ওরা চলে যাচ্ছে। আগুন নিভে গিয়েছে।

—নিভে গিয়েছে? ও, তাই তো। আমায় ফেলে উনি সত্যিই চলে গেলেন। ওঁকে আর খুঁজে পাবে না পৃথিবীর মানুষের মধ্যে।

—আপনি সহমরণে গেলে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ কি স্বর্গে বসেও ক্ষমা করতে পারতেন আপনাকে?

রত্নার কথায় রাণী চিন্তান্বিত হয়। শেষে বলে,—ঠিক। ক্ষমা করতেন না। তুমি ঠিক কথা বলেছ রত্না। আজ থেকে আমি পাষাণ। আমি আর কাঁদব না।

সে রাতে রত্না নানান কথায় রাণীর শোক সংযত রাখতে চেষ্টা করে। সফলও হয় কিছুটা।

বাইরে মসীলিপ্ত অন্ধকার। চারদিকে স্তব্ধতা বিরাজমান। মাঝে মাঝে শুধু প্রহরারত বীরদের অস্পষ্ট পদশব্দ ও বর্মের অতি মৃদু আওয়াজ কানে ভেসে আসে।

ঘরের ভেতরে একটি দীর্ঘ মোমবাতি জ্বলছে শুধু। রাত দ্বিপ্রহর পার হয়ে গিয়েছে। রাণী বসে

রয়েছেন। চোখে জল নেই। পার্শ্বে উপবিষ্টা রত্না।

একসময় রাণী বলে,—এত বুদ্ধিমতী তুমি, অথচ সামান্য একজন পরিচারিকা হয়ে রয়েছ কেন রত্না? তোমার কি কোনোই উচ্চাশা নেই?

—মহারাজ যশোবন্তের মহিষীর সেবা করায় অপার আনন্দ রাণী।

—কিন্তু ইচ্ছে করলে কি তুমি মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতে না? হতে পারতে না তাঁর মহিষীদের একজন?

—তিনি পিতৃতুল্য।

—আমার বয়স তোমার চেয়ে কতই বা বেশি। অথচ তাঁকেই তো আমি জন্ম জন্ম ধরে স্বামীরূপে পেতে চাই। বীরের আবার বয়স রত্না?

—সে কথা নয়। কিন্তু তাঁকে যে পিতার মতোই দেখে এসেছি শৈশব থেকে। চিরকাল সেইভাবে শ্রদ্ধা করেছি।

—কিন্তু পৃথ্বীসিংহ? মহারাজের বড় ছেলে? আজ সেও জীবিত নেই যদিও। চেষ্টা করলে কি তার অনুগ্রহ লাভ করতে পারতে না? তোমার মতো সুযোগ সবাই পায় না রত্না।

—রাণী, হয়তো আমি বুদ্ধিমতী, হয়তো আমি সুন্দরীও। তাই বলে রাজার দৃষ্টিতে পড়বার জন্যে লালায়িত হতে যাবো কেন? রাজপুতনায় কি বীরের এতই অভাব? রাঠোররা কবে বীরশূন্য হয়েছে রাণী?

—সত্যি—খুবই সত্যি। কিন্তু আমার বরাবর একটা গোপন ইচ্ছা ছিল, তোমায় মহিষীর বেশে দেখি। কেন, বলতে পারি না।

—যে ঘরে যাব, সেই ঘরের মহিষী হবো আমি। দরিদ্রের ঘরের দরিদ্র মহিষী। আমার স্বামীও বীর হবেন। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে তিনিও অসি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। তাঁর বক্ষে আর বাহুতে অলঙ্কারের মতো শোভা পাবে শতযুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন। পৃষ্ঠে তাঁর অস্ত্রাঘাতের চিহ্নমাত্র থাকবে না।

—আমায় ক্ষমা করো রত্না। মাথার ঠিক নেই।

—এ আপনি কী বলছেন? ভালবাসেন বলেই আমার সম্বন্ধে আপনার এই কল্পনা। এ তো আমার সৌভাগ্য। তাছাড়া আপনার এই কথাবার্তা প্রমাণ করছে কত দৃঢ়চেতা আপনি। মহারাজের মৃত্যু হলে ভাবতেও পারিনি এভাবে সামলে উঠতে পারবেন আপনি। হয়তো পারতেন না। যদি এই সুকঠিন কর্তব্যভার আপনার ওপর ন্যস্ত না হতো।

মাড়োয়ারের ঘোর দুর্দিন। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ মৃত। শুধু তিনি নন তাঁর পুত্রগণও কেউ জীবিত নেই। থাকবার মধ্যে রয়েছে একটি সন্তান—মাতৃগর্ভে রয়েছে বলে এখনো সে পৃথিবীর আলো দেখবার অবকাশ পায়নি। ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ জানে না, সে সন্তান পুত্র না কন্যা।

মহারাজ যশোবন্তকে বাদশাহ আওরঙ্গজেব তাঁর রাজ্য থেকে বহুদূরে আফগানিস্তান সীমান্তে পাঠিয়েছিলেন যুদ্ধে। এর পশ্চাতে ছিল একটি গূঢ় উদ্দেশ্য।

যশোবন্তের প্রতি তীব্র প্রতিহিংসার জ্বালায় তিনি চিরকাল জ্বলেছেন। এখনও জ্বলছেন। কারণ যশোবন্ত তাঁর মৃত পিতার অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ছিলেন। মহারাজকে বধ করবার জন্য অনেক বিনিদ্র রজনীর চিন্তাপ্রসূত ষড়যন্ত্র-জাল বারবার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। সুচতুর এবং বীর যশোবন্তের গায়ে আঁচ পর্যন্ত লাগেনি। বাদশাহ গোপনে দন্তঘর্ষণ করেছেন। এই যশোবন্ত এমনই এক চরিত্র যাঁর বিরুদ্ধে সর্বসমক্ষে কিংবা খোলাখুলিভাবে কিছু করায় বিপদের সম্ভাবনা প্রচুর। তাই সবার অজ্ঞাতে বারবার তিনি আউড়েছেন—খুতান, খুতান আমার সর্বনাশ করবে। সে বেঁচে থাকতে আমি বিন্দুমাত্র নিশ্চিন্ত হতে পারি না।

যশোবন্তকে আওরঙ্গজেব 'খুতান' বলেই ডাকতেন। তাই শেষবার তাঁকে তিনি পাঠালেন রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে। ভাবলেন মহারাজ তাঁর পুত্রদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবেন এবং সেই সুযোগে তিনি মাড়োয়ার অধিকার করে নেবেন।

কিন্তু যশোবন্ত মূর্খ নন। বিশেষতঃ আওরঙ্গজেবকে তিনি যতটা চিনেছিলেন ভারতের আর কেউ ততটা চিনতে পারেনি। বাদশাহ চরিত্র তাঁর নখদর্পণে বলেই যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনি তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। সম্রাট সাজাহান এবং দারাশুকোর মতো উদারচেতা পুরুষদের সংস্পর্শে এসে আওরঙ্গজেবকে কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। সবাই সবাইকে সহ্য করতে পারে না। আওরঙ্গজেব যেমন পারেননি যশোবন্তকে।

আওরঙ্গজেবের বীরত্ব আর রণকৌশল যশোবন্তকে মুগ্ধ করত। কতবার ভেবেছেন দারাশুকোর চেয়ে সাজাহানের তৃতীয় পুত্র অনেক বেশি যোগ্য। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে হয়েছে এত যে পরিশ্রম করলেন মুঘল সম্রাটের জন্য সারা জীবন, এর প্রতিদানে তাঁর রাজ্যটুকু স্বাধীনভাবে পরিচালিত করতে দেবার ঔদার্য নেই কেন আওরঙ্গজেবের? তাঁর কুটিলতা বারবার পীড়া দিত মহারাজকে। তাই বাদশাইজাদা মোয়াজ্জেমকে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার উস্কানি দিতেও তিনি পরাঙ্মুখ হননি। কিন্তু তাঁদের উভয়েরই জন্মতিথি রাশি নক্ষত্র ইত্যাদির অবস্থান এমনই যে সর্বনাশ কারও ঘটেনি।

যশোবন্ত বাদশাহের আদেশ মতো যুদ্ধযাত্রায় গেলেন। যাবার সময় জ্যেষ্ঠপুত্র পৃথ্বীসিংহকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে গেলেন। পিতার যোগ্য পুত্র পৃথ্বীসিংহ।

সংবাদ শুনে আওরঙ্গজেব মনে মনে চটলেন। কিন্তু তিনিও আওরঙ্গজেব—যে আওরঙ্গজেব কূটবুদ্ধিতে অতুলনীয়—যে আওরঙ্গজেব যুদ্ধবিদ্যায় ভারতের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের সঙ্গে তুলনীয়। তবু একটি জিনিস বারবার তাঁর মনের মধ্যে সাপের মতো পাক দেয়। সেটি হলো তাঁর পিতা, পিতামহের অথবা প্রপিতামহের মতো চিত্তের প্রসারতার দৈন্য। সেই দৈন্য তাঁকে পিতৃপুরুষের উদার পথ নিতে প্রশ্রয় না দিয়ে বারবার কূটনীতির সর্পিল পথের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। তাই যশোবন্ত যখন তাঁরই সৈন্যদলের অধিকর্তা হিসাবে, খাইবার গিরিপথে শত্রুসৈন্যদের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত, যখন তাঁর রণকৌশল আর সাহসিকতায় বিরুদ্ধপক্ষ নাজেহাল, সেই সময় তিনি মাড়োয়ারের নতুন নৃপতি যশোবন্ত-পুত্র পৃথ্বীকে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন দিল্লিতে।

পৃথ্বীসিংহ বিনা দ্বিধায় নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য চলে এলো। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যশোবন্তের পুত্রের কোনো ক্ষতি করা ভারতের বাদশাহের সাধ্য নেই। কিন্তু তার বিশ্বাস তার পিতার মতো অভিজ্ঞতা-জাত নয়।

আওরঙ্গজেব তখত্‌তাউস ত্যাগ করে এগিয়ে এসে পৃথ্বীকে অভ্যর্থনা জানালেন। দরবার কক্ষে তার জন্য সম্মানের আসন নির্দিষ্ট হলো। পরদিন দরবারে শত আমির ওমরাহের মধ্যে মাড়োয়ার রাজের প্রতিই বাদশাহের দৃষ্টি বারবার আকৃষ্ট হলো। তিনি ভাবলেন পিতার মতোই বলিষ্ঠ বটে। চোখের দৃষ্টিও তেমনি তীক্ষ্ণ। কিন্তু সাহসকিতায় কি পিতার সমতুল্য হবে? সম্ভবতঃ নয়। পরখ করতে ইচ্ছে হলো বাদশাহের। কারণ পৃথ্বীসিংহ যদি কাপুরুষ হয় তবে যোধপুর রাজ্যকে নিজের অধিকারে আনা আদৌ কষ্টসাধ্য হবে না। কিন্তু যদি না হয় তবে অন্য কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

দরবার কক্ষে ময়ূর সিংহাসনে বসেও আওরঙ্গজেবের মন চলে যায় অন্য এক বিচিত্র রাজ্যে, যে-রাজ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাটরা মনে মনে যুগ যুগ ধরে বিচরণ করেছেন। সাধারণ মানুষ অনেক শাহানশাহ অনেক সম্রাটকে ধার্মিক এবং আদর্শবান বলে জানলেও, যোগ্য শাসনকর্তা এবং সেনাপতি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, এ রাজ্যে না গিয়ে উপায় নেই।

দরবার কক্ষের সবাই একদিন যখন চলে গেল, আওরঙ্গজেব পৃথ্বী সিংহকে অপেক্ষা করতে বললেন। তারপর সিংহাসন থেকে নেমে এলেন।

—চলুন রাজা আমরা একসঙ্গে যাই। ভালোভাবে আলাপই করতে পারছি না আপনার সঙ্গে। কতটা ব্যস্ত থাকতে হয় নিজের চোখেই দেখছেন।

—খুবই স্বাভাবিক বাদশাহ। এত বড় সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের বিশ্রামের অবকাশ পাওয়া কঠিন।

আওরঙ্গজেব একটু হেসে বলেন,—আপনার পিতা দীর্ঘদিন দেশে ফিরতে পারবেন না।

—তিনি আগে থেকেই জানতেন সেকথা। তিনি জানতেন, কোনোদিনই হয়তো দেশে ফিরতে পারবেন না। সেইভাবে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছেন তিনি।

আওরঙ্গজেব কথাটা শুনে মনে মনে চমকে উঠলেন। ভাবলেন, খুতান সত্যই অতুলনীয়। তার বীরত্বের মতো বুদ্ধিরও পরিমাপ করা যায় না। কিন্তু মনের ভাব গোপন রেখে তিনি বললেন,—চলুন সামনের ওই বাগে। আমার পিতার সৃষ্টি। আপনার পিতা তো আমার পিতার প্রশংসায় সর্বদাই পঞ্চমুখ। সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে ওখানে। আপনার সঙ্গে আলাপ করার যোগ্য পরিবেশ।

পৃথ্বীসিংহ বাদশাহকে সামনে এগিয়ে যাবার জন্যে সরে দাঁড়ায়।

—না না, আপনি আগে চলুন রাজা। আপনি আমার মহামান্য অতিথি।

পৃথ্বীসিংহ এগিয়ে যেতেই বাদশাহ সহসা পেছন থেকে তার হাত দুটো চেপে ধরেন। বিস্মিত পৃথ্বী পেছন ফিরে চাইতে আওরঙ্গজেব মুচকি হেসে বলে ওঠেন,—শুনেছি আপনার হাত দুটো আপনার পিতার মতোই স্নায়ুপীড়িত।

অপমানে মাড়োয়ার রাজের মুখ রক্তিম হয়ে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে ক্রোধ সংবরণ করে গম্ভীর কণ্ঠে সে বলে,—ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন। বাদশাহের হাত যখন রক্ষা কবচের মতো দরিদ্রকে স্পর্শ করে, তখন সে নতুন জীবন পায়। কিন্তু সেই হাতই যখন আমার হাত দুটোকে নেবার চেষ্টা করে, তখন এমন এক অসীম শক্তি অনুভব করি যে মনে হয় যেন দশজন পৃথিবীর অধীশ্বরকে আমি এক লহমায় পরাজিত করতে পারি।

আওরঙ্গজেবের হাত থেকে পৃথ্বীসিংহের হাত দুটো স্খলিত হয়ে পড়ে। তাঁর মুখ দিয়ে অজ্ঞাতে অস্ফুটস্বরে উচ্চারিত হয়,—ঠিক খুতান—হুবহু।

—না বাদশাহ। তাঁর সঙ্গে আমার তুলনা করবেন না। তাঁর পায়ের যোগ্যও আমি নই, একথা এখন মর্মে মর্মে অনুভব করছি। তাঁর যোগ্য হলে এবারে অন্ততঃ দিল্লিতে আসতাম না।

কপট আনন্দে পৃথ্বীসিংহকে জড়িয়ে ধরে বাদশাহ বলেন,—বড়ই আনন্দ পেলাম আপনার পরিচয় পেয়ে।

তিনি তখনি রাজার জন্যে বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রস্তুতের আদেশ দিলেন। কোনো নৃপতিকে দিল্লির শাহানশাহ কর্তৃক বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের সময় এই রকমের পোশাক উপহারের প্রথা নতুন নয়।

মুগল বাগ থেকে ফেরার সময় পৃথ্বীসিংহের মন অস্থির হয়ে ওঠে। বাদশাহের বিচিত্র ব্যবহারের কথা বারবার তোলপাড় করতে থাকে তার মস্তিষ্কের ভেতরে।

তার জন্যে নির্দিষ্ট আলয়ে পৌঁছে সে বহুক্ষণ আনমনা থাকে। বুঝতে পারে জীবনের সব চাইতে মারাত্মক ভুল সে করেছে রাজধানীতে পদার্পণ করে।

আচ্ছা! সে তো পালিয়ে যেতে পারে। তাকে কি বন্দী করে রেখেছেন আওরঙ্গজেব?

পরীক্ষা করে দেখতে ইচ্ছা হয় পৃথ্বীসিংহের। কেউ যদি তাকে বাধা না দেয়, বুঝতে হবে আওরঙ্গজের খেয়ালের বশে অমন ব্যবহার করে ফেলেছেন। কাজের অস্বাভাবিক চাপে অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তিও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে অদ্ভুত ব্যবহার করে ফেলে অনেক সময়ে।

আপন কক্ষে প্রবেশ করে পৃথ্বীসিংহ পোশাক পরিবর্তন করে। সামান্য এক রাজপুতের বেশ পরিধান করে সে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়।

আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। তার পরিচর্যার জন্য যে ব্যক্তিটি এখানে রয়েছে সে শুধু একবার

তার দিকে চেয়ে অভিবাদন জানায়।

পৃথ্বীসিংহ রাজপথে নামে। সে একজন ভিক্ষুক ছাড়া আর কাউকে দেখতে পায় না।

এগিয়ে চলে পৃথ্বীসিংহ! রাজধানীতে দেখবার এবং সওদা করবার জায়গার অভাব নেই।

কিছুদুর এগিয়ে যাবার পর পৃথ্বীসিংহ লক্ষ্য করে ভিক্ষুকটি তখনও তার পেছনে। সে দ্রুত একটি ছোট্ট রাস্তায় বেঁকে যায়। সর্পিল গতিতে এগিয়ে চললেও কিন্তু ভিক্ষুক তেমনি রয়েছে।

পৃথ্বীসিংহ ক্রোধে উন্মত্ত হয়। আর এগিয়ে যাবার চেষ্টা না করে সোজা ভিক্ষুককে লক্ষ্য করে চলতে থাকে। চিৎকার করে সে তখন ভিক্ষা চাইছে।

পৃথ্বীসিংহ তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়—ভিক্ষা চাও?

—হ্যাঁ, হুজুর। তিনদিন পেটে কিছু পড়েনি।

—পেট তো ভর্তি বলেই মনে হচ্ছে।

—হুজুর, আপনি রসিকতা করছেন। অন্যের কষ্টে রসিকতা করতে নেই হুজুর।

—না ছিঃ। তাই কি কেউ করে? সে তো মানুষই নয়।

—তবে? আপনি সব জানেন। আপনি মহৎ ব্যক্তি।

—তা যা বলেছ।

পৃথ্বীসিংহ একটি মুদ্রা বের করে সেটি ভিক্ষুকের সামনে তুলে ধরে।

ভিক্ষুকটি তার থলির মুখ খোলে।

পৃথ্বীসিংহ মুচকি হেসে বলে,—অনেক তো পেয়েছ আজ। আর কেন?

—কাল যদি বের হতে না পারি? যদি অসুখ হয়?

—তা বটে। দেখি কি পেলে আজ?

ভিক্ষুক ভয় পেয়ে তার থলি দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে।

পৃথ্বীসিংহ গায়ের জোরে সেটি ছিনিয়ে নিয়ে রাস্তার ওপর উপুড় করে ফেলে। সে যা অনুমান করেছিল হুবহু সত্যি। পাথরের টুকরো ছাড়া থলিতে আর কিছুই নেই। রয়েছে শুধু একটি মূল্যবান ছোরা।

—অনেক পেয়েছ আজ—তাই না?

ভিক্ষুক বলে,—তাই বলে আমাকে মেরে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না পৃথ্বীসিংহ। আশেপাশে অনেক চোখ রয়েছে আপনাকে পাহারা দেবার।

—অর্থাৎ আমি বাদশাহের বন্দী। তাই তো?

—আপাতত বন্দী তো বটেই। ভবিষ্যতে কি হবে জানি না।

ভিক্ষুকের মুখে রহস্যের হাসি ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

পৃথ্বীসিংহ আবার ফিরে চলে নিজের আলয়ে। মনস্তাপে দগ্ধ হতে থাকে সে। কীভাবে আওরঙ্গজেবের থাবা থেকে নিজেকে বাঁচাবে ভেবে পায় না।

নিজের কক্ষে প্রবেশ করে সে গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়। বাদশাহ তাকে কার্যত বন্দী করে রেখেছেন। অথচ তাকে সম্মান প্রদর্শনে কোনো ত্রুটি দেখাচ্ছেন না। কী মতলব তাঁর? তার জন্যে তিনি দরবার কক্ষে উপস্থিত হবার যোগ্য নতুন পোশাক তৈরি করার বন্দোবস্ত করেছেন। দু'দিন পরে সেই পোশাক তৈরি হয়ে যাবে।

পরিচারক খাবার নিয়ে আসে—সেই সঙ্গে সরবৎ।

পৃথ্বীসিংহ হঠাৎ বলে ওঠে,—এতে কি বিষ আছে?

পরিচারক আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে,—না মহারাজ। আমার আনা খাবারে বিষ থাকে না। আমি নিজে খেয়ে দেখি।

—বিশ্বাস নেই।

—হয়তো নেই। কিন্তু আমি আনলে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। আমি ধর্ম মানি।

—তুমি তো হিন্দু—তাই না?

—আমাকে দেখে কি আপনার সন্দেহ হয়?

—না। কিন্তু তুমি রাজপুত নও।

—না। আমি মারাঠী।

—এখানে কতদিন আছ?

—বাদশাহ, যখন বাদশাহজাদা ছিলেন তখন আমায় নিয়ে এসেছেন। তিনি আমাকে ভালোবাসেন।

—হিন্দুকে তিনি ভালবাসেন?

—আমি মানুষটাকে তিনি ভালোবাসেন। আপনারা বাদশাহকে যতটা গোঁড়া ভাবেন তিনি বোধহয় ততটা নন। কিন্তু কাজী মহম্মদ জালান তাঁকে ইন্ধন জুগিয়ে এইরকম করে তোলে।

—লোকটি কে?

—একজন মৌলবী।

—আচ্ছা তুমি যাও।

—আপনার সঙ্গে দু'জন নর্তকী দেখা করার জন্যে অপেক্ষা করছে।

—নর্তকী? কে পাঠালো?

—জানি না।

—এই অবেলায়? অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। এখন তো তাদের এখানে এলে ক্ষতি।

—পাঠিয়ে দেবো?

—দাও। হয়তো চেনে। হয়তো আমার দেশের মানুষ। কিংবা—

পরিচারক চলে গেলে পৃথ্বীসিংহ ভাবে, কিংবা হয়তো পিতাকে ওরা চিনত। তাই কোনো গুপ্ত সংবাদ বহন করে এনেছে।

একটু পরেই পায়ের মলের ঝম্‌ঝম্ শব্দ শোনা যায়। ওরা আসছে। ওরা কি সারাক্ষণই পায়ে মল বেঁধে থাকে? বোধহয় না। মনে নেই পৃথ্বীসিংহের। ছেলেবেলায় সে পিতার সঙ্গে একবার নওরোজের দিনে শাহানশাহ সাজাহানের কাছাকাছি এসেছিল। সেই সময়ে অনেক নর্তকীকে দেখেছিল। তারপরে নর্তকীদের সঙ্গে আর সংশ্রব নেই। তার নিজের রাজধানীতে নর্তকী রয়েছে। কিন্তু তারা মহারাজের তুষ্টি বিধানের জন্যে নিয়োজিত হয় না। তাদের আলাদা এলাকা রয়েছে।

নর্তকীরা প্রবেশ করে নৃত্যের তালে অভিবাদন করে দাঁড়ায়। অপূর্ব পরিচ্ছদ তাদের। মাথা থেকে ওড়না নেমে এসেছে। সেই ওড়নার মধ্য দিয়ে তাদের মুখ দেখা যায়। মুখে তাদের অতি মিষ্টি হাসি।

পৃথ্বীরাজ স্তম্ভিত হয়ে যায় ওদের রূপলাবণ্যে। এরা কি নর্তকী? হারেমে কি তবে এদের চেয়েও রূপসী রয়েছে?

—মহারাজ।

কী সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। পৃথ্বীরাজ মুহূর্তের জন্যে ভুলে যায় যে সে কার্যত আওরঙ্গজেবের বন্দী।

—তোমরা আমায় চেনো?

—পরাক্রান্ত মহারাজ যশোবন্ত সিংহের পুত্রকে কে না চেনে মহারাজ?

—ও। তোমরা কি জন্যে আমার কাছে এসেছ?

এবারে দ্বিতীয়জন বলে,—আমরা আপনার নাম শুনে আসছি কতদূর থেকে। আপনার বীরত্বে আমরা মুগ্ধ। তাই এসেছি দেখা করতে।

—বেশ তো। আমার খুব ভাল লাগল। তোমাদের নাম কি?

—আমার নাম চঞ্চলবাঈ। আর ওর নাম—

দ্বিতীয়জন বলে, —আমার নাম সুন্দরবাঈ।

—চমৎকার। তোমাদের নাম সত্যিই সার্থক।

চঞ্চলবাঈ বলে—আপনার প্রশংসা শুনে নিজেদের ধন্য মনে করছি।

—কিন্তু সত্যিই তোমরা অপরূপ রূপসী। তোমাদের মতো রূপসী তো আমি দেখিনি।

সুন্দরবাঈ হেসে বলে,—কেন, মহারাণী সাহেবা?

পৃথ্বীসিংহ একটু চুপ করে থাকে। শেষে সামান্য হাসে। সে বলে,—তোমরা কি কোনো বিশেষ সংবাদ দিতে এসেছ? কারণ আমি ভাবছিলাম, এই সময়ে এখানে না এসে প্রাসাদে গেলে তোমাদের লাভ হতো। তোমাদের সন্তুষ্ট করার মতো অর্থও আমি সঙ্গে আনিনি।

চঞ্চলবাঈ দ্রুত পৃথ্বীসিংহের কাছে গিয়ে তার হাত ধরে বলে,—আমরা লাভের আশায় আসিনি মহারাজ।

—তবে?

—শুনতে পেলাম আপনি একা রয়েছেন। আমাদের দু'জনের মন কেঁদে উঠল। তাই পালিয়ে এলাম।

—তোমাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তোমাদের নাচবার কিংবা গাইবার কোনো আয়োজন যে এখানে নেই।

—প্রয়োজন নেই।

—তবে?

—আপনি অনুমতি করলে, আপনি যতদিন দিল্লিতে থাকবেন আমরা দু'জনে আপনার সঙ্গে থাকব। কিংবা ইচ্ছা করলে আমাদের একজনকে পছন্দ করে নিন। যতদিন দিল্লিতে রয়েছেন আপনাকে নিয়ত সঙ্গ দেবো। রাণী নেই এখানে। আপনার কষ্ট হচ্ছে। রাতে আপনার সেবা করব।

চঞ্চলবাঈ পৃথ্বীসিংহের মাথায় হাত বোলাতে থাকে।

একটা আচ্ছন্নভাব পৃথ্বীসিংহকে গ্রাস করতে থাকে। সে অনুভব করে সুন্দরবাঈ তার পায়ের কাছে বসে তার কোলের ওপর মাথা রেখেছে।

কিন্তু এটা কি আওরঙ্গজেবের চক্রান্ত?

ছিটকে উঠে দাঁড়ায় পৃথ্বীসিংহ। নর্তকী দু'জন দু'পাশে গড়িয়ে পড়ে।

—কেন এসেছ তোমরা সত্যি বলো।

—আমরা তো বলেছি। চঞ্চলবাঈ কম্পিতকণ্ঠে বলে।

—বিশ্বাস করি না। বাদশাহ পাঠিয়েছেন?

—না।

—তবে আমার ওপর এত সদয় হলে কেন? রাজধানীতে অনেক রাজা মহারাজ আমির নবাব রয়েছেন।

—সেকথাও জানি। আপনার পিতাকে আমরা শ্রদ্ধা করি। আপনার বীরত্বে আমরা মুগ্ধ। আপনার রূপে আকৃষ্ট।

সুন্দরবাঈ ফুঁপিয়ে কেঁদে বলে,—নারীকে কি শুধু ছলনাময়ী বলেই জানতে হয় মহারাজ? মমতাময়ী কি তাদের হতে নেই? অন্ততঃ রাতের বেলাটুকু আপনার মনের দুঃসহ জ্বালাকে কি আমরা ভুলিয়ে দিতে পারি না?

—না। প্রয়োজন নেই। মনের জ্বালা নিভিয়ে দিলে আমি ভেড়া হয়ে যাব।

সহসা চঞ্চলবাঈ খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে। সে বলে,—চলরে সুন্দর। আমাদের কাজ ফুরিয়েছে।

তখনই বলেছিলাম, এরা সব একরোখা। ওসব মেয়েলি জিনিস দিয়ে এদের কাবু করা যায় না। বিশ্বাস করল না সালামৎ। খোজার বুদ্ধি আর কত হবে?

পৃথ্বীসিংহের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে ওরা মল বাজিয়ে ঝম্‌ঝম্ করতে করতে মিলিয়ে যায়।

দু'দিন পরে পরিচারক এসে খবর দেয় বাদ্‌শাহের আদেশক্রমে দুই ব্যক্তি মহারাজের পোশাক নিয়ে এসেছে।

—হ্যাঁ, আজই আসবার কথা ছিল বটে। ওই পোশাক পরে আজ দেওয়ান-ই-খাসে যেতে হবে। পাঠিয়ে দাও।

দু'জন প্রবেশ করে। একজনের হাতে বহুমূল্য পরিচ্ছদ। অত্যন্ত মনোরম। সমস্ত পোশাক জুড়ে সোনার কাজ। চোখ ফেরানো অসম্ভব।

—বাদশাহ পাঠিয়েছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—রেখে যান।

—বাদশাহ বলেছেন, আমাদের সামনে পরতে। যদি ছোট-বড় হয় ঠিক করে দেবো এখনি।

—আপনার নাম কি?

—হাকিম-ই-মোমিন।

—হাকিম! পোশাক পরাতে হাকিম কেন?

—বাদশাহ বললেন, যদি এই পোশাকে আপনার অসুবিধা হয়, তাহলে কী ধরনের পোশাকে সুবিধা হবে আমি জানতে পারব। এই পোশাক পরার পর নাড়ির গতি দেখে বুঝব। যদি নাড়ির গতি স্বাভাবিক থাকে তাহলে এতেই হবে।

—ও। বেশ দিন।

ওরা দু'জনে মিলে পৃথ্বীসিংহকে পোশাক পরিয়ে দেয়। পৃথ্বীসিংহ পোশাক পরে উপবেশন করে। একটু পরেই তার অস্বস্তি হতে থাকে। হাকিম নাড়ি ধরে থাকে।

বলে,—গতি একটু দ্রুত। অসুবিধা হচ্ছে?

—হ্যাঁ।

—আর একটু অপেক্ষা করুন।

সহসা পৃথ্বীসিংহের সর্বাঙ্গ যেন জ্বলতে থাকে। সে চিৎকার করে ওঠে,—উঃ জ্বলে গেল। খুলে দিন—খুলে দিন।

হাকিম এবং অপর ব্যক্তি তাকে চেপে ধরে রাখে। সে ছট্‌ফট্ করে পাগলের মতো তাদের হাত ছাড়িয়ে নিতে চায়। পারে না।

—উঃ, মরে গেলাম। আওরঙ্গজেব আমাকে শেষে বিষ দিয়ে মারল?

হাকিম শান্তকণ্ঠে বলে,—এখনি সব ঠিক হয়ে যাবে। ধৈর্য ধরুন।

পৃথ্বীসিংহ নিস্তেজ কণ্ঠে বলে,—হ্যাঁ ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক তো হবেই। তোমরাও পুরস্কার পাবে হাকিম।

আরও কিছুক্ষণ হাকিম পৃথ্বীসিংহকে চেপে ধরে রাখে।

স্থির হয়ে যায় রাজপুত বীর।

অবশেষে হাকিম নাড়ি দেখে বলে—গতি থেমে গিয়েছে।

এতক্ষণে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে—ঠিক তো?

—হ্যাঁ। কোনো সন্দেহ নেই। চল। বেচারা অন্তত দুটো দিন চঞ্চল আর সুন্দরকে নিয়ে ভোগ

করতে পারত। কপালে নেই।

পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে যশোবন্ত সিংহ জীবনের প্রচণ্ডতম আঘাত পেলেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। এতটা পথ অতিক্রম করে দিল্লি তছনছ করবার মতো শক্তিও অবশিষ্ট রইল না তাঁর। তবু আঘাতের আরও বাকি ছিল। তাঁর অপর পুত্র জগৎসিংহ, যে তাঁর সঙ্গী হয়ে এসেছিল রণক্ষেত্রে তারও মৃত্যু ঘটল একদিন। যশোবন্ত বুঝলেন আওরঙ্গজেবের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো এতদিনে। তাঁর মায়ের রাজ্য তাঁর মাতৃভূমি মুঘল আওতায় চলে যাবে। শুষ্ক চোখে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে বিদেশবিভুঁই-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৈনিক-পুরুষ।

শুধু রাণী নয়। উপপত্নীরাও সেদিন চিতার আগুনে আত্মবিসর্জন দিয়েছিল। উপপত্নীও পত্নী। পত্নীর কর্তব্য তারাও পালন করে কিছুটা। তবে কেন স্বামীর সহযাত্রী হবে না? অগ্নিদেবকে ধর্মসাক্ষী করেনি বলে? হয়তো করেনি। সে সৌভাগ্য করে তারা আসেনি। কিন্তু শেষবেলায় অগ্নিকে সাক্ষী রেখে স্বামীর সঙ্গে পরলোকে যাত্রা করার কি বাধা আছে? না নেই। বাস্তবকে মেনে নেওয়াই সঙ্গত। তাই মহিষীদের কেউ বাধা দিল না তাদের একই চিতার সঙ্গিনী করে নিতে। এই জন্মের পুণ্যফলে পরের জন্মে তারা নিশ্চয় পত্নীর মর্যাদা পাবে!

সংবাদ পৌঁছলো দিল্লিতে। যে পাষাণ ভার চিরকাল আওরঙ্গজেবের বুককে চেপে রাখত, এতদিনে তা নেমে গেল। সেই কবেকার সম্রাট সাজাহানের অতি প্রিয় সেনানায়ক যশোবন্ত সিংহ এতদিনে তাঁকে নিষ্কণ্টক করলেন। অবশ্য তিনি তাঁকে নিষ্কণ্টক করতেনই একদিন না একদিন। কারণ অক্ষয় আয়ু নিয়ে পৃথিবীতে আসে না কেউ। তবু এতদিন প্রতিটি মুহূর্ত বিপদের ছায়া দেখে চমকে উঠতেন। সেই অনভিপ্রেত ছায়া কেটে গেল এতদিনে। এই অতি সুনিপুণ সেনাপতি তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারাশুকোকে বড়ই ভালবাসতেন। ফলে তখ্‌ততাউস দখলের সংগ্রামে বেগ পেতে হয়েছিল যথেষ্ট। সেদিন বিপরীত কিছু ঘটে যাবার সম্ভাবনাই বেশি ছিল। তেমন ঘটলে, ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হতো। সেই ইতিহাস শাহানশাহ সাজাহানের এক অখ্যাত পুত্র হিসাবে আওরঙ্গজেবকে চিহ্নিত করত—যেমন করবে দারাশুকো, সুজা আর মুরাদকে।

কিন্তু আওরঙ্গজেবের এই আত্মসন্তুষ্টি দেখে যুগ যুগ ধরে বিধাতা যেমন সবার অগোচরে হেসে থাকেন, বোধহয় তেমনি হেসেছিলেন। তিনি বাদশাহের ললাটে নতুন করে লিখে দিয়েছিলেন, —কুটিলতার দ্বারা সাময়িক সাফল্য লাভ করা যায়—দীর্ঘস্থায়ী সমাধান অসম্ভব। তাই তিনি ভগ্ন-হৃদয় যশোবন্তের মহিষীর গর্ভে এনে দিলেন তাঁর বৃদ্ধ বয়সের সর্বশেষ ফলটি, ইতিহাসে যে অজিত সিংহ নামে খ্যাত।

কিন্তু অজিত সিংহের চরিত্র বর্ণনা করা এক্ষেত্রে মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তার মা কিংবা অন্য কোনো চরিত্র, যাদের মূল্য ঐতিহাসিকদের কাছে অসাধারণ এবং যাদের জন্য বহু চরিত্র উপেক্ষিত এবং অবহেলিত তাদের দু'-একজনের জীবনের খণ্ডাংশ মাত্র ধরে রাখবার চেষ্টা করা হবে এই স্বল্প পরিসরের কাহিনীটিতে। একে ঐতিহাসিক আখ্যা দিলে ইতিহাস প্রণেতারা রুখে উঠতে পারেন; কিন্তু ইতিহাস-আশ্রয়ী আখ্যা দিলে তাঁদের শাণিত যুক্তি অব্যবহৃত থেকে যেতে বাধ্য।

রাণীকে সান্ত্বনা দিয়ে রত্না ফিরে আসে আপন প্রকোষ্ঠে। ভেবেছিল, একান্তে বসে মহারাজের জন্যে চোখের জল ফেলে একটু হালকা হয়ে নেবে। কিছুদিনের মধ্যে যেন প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেল। পৃথ্বীসিংহের মৃত্যু সংবাদ, জগৎ সিংহের মৃত্যু এবং সর্বশেষে মহারাজের তিরোধান। সমগ্র মাড়োয়ার অতি দ্রুত অনাথ হয়ে পড়ল। সৌন্দর্যমণ্ডিত যোধপুর যেন প্রচণ্ড ভূমিকম্পে মুহূর্তের মধ্যে ধুলোয় মিশে

গেল। অথচ এমন ছিল না। ছিল না বলেই এই সুদূর দেশকে পরভূমি বলে মনে হয়নি। এখানকার অজানা অচেনা বৃক্ষগুলি ফুল ও ফলভারে নুয়ে পড়লে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছে এতদিন। আর সেই সঙ্গে একটা অভাববোধ সারা মন এবং শরীরকে বিষাদে ভরিয়ে তুলেছে। এক বহুশ্রুত অথচ অদেখা গিরিপথের বিপদসঙ্কুল অন্ধকারের ছায়া তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সেখানে যুদ্ধরত সহস্র সহস্র মুঘল এবং রাজপুত সেনানীর মধ্যে রয়েছে তার বীরসিংহ।

এই বীরসিংহকে ঘিরে তার বর্তমানের চিন্তার রোমন্থন এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন। বীরসিংহ। বলিষ্ঠ দীর্ঘদেহী তরুণ বীরসিংহ। যুদ্ধক্ষেত্রে সে নাকি শত্রুর ত্রাস সৃষ্টি করে। অথচ দেখলে মনে হয় না। ওই কোমল মুখ, ওই সরল আয়ত চোখ দেখে কল্পনাতেও আসে না অসিহাতে সে অমন ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে।

শেষবার এসেছিল মাসখানেক আগে। এসে বলেছিল—আর বেশিদিন নয় রত্না। ওরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। এবারে ঘরে ফেরার পালা।

কথাটার মধ্যে কত রঙিন স্বপ্ন মিশেছিল। সেই স্বপ্নের ছোঁয়া রত্নার মনে লেগে তাকে লাজে রাঙিয়ে তুলেছিল। উপযুক্ত উত্তরও দিতে পারেনি সেদিন, যে উত্তর বীরসিংহকে খুশিতে চঞ্চল করে তুলতে পারত। অথচ মহিষী বলেন, সে নাকি বুদ্ধিমতী। ধিক অমন বুদ্ধিতে—যে বুদ্ধি জীবনের সুন্দরতম মুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে থাকে।

সেই ঘরে ফেরার পালা সত্যিই এগিয়ে এলো। অথচ কত পার্থক্য। যুদ্ধক্লান্ত রাঠোর সেনারা নেতাহীন অবস্থায় ভগ্নহৃদয় ধীরে ধীরে ঘরে ফিরবে—যে ঘর এখন মুঘলদের অধীন। সেখানে স্বেচ্ছায় ঘোরাফেরা করবার স্বাধীনতাটুকুও সম্ভবত অবশিষ্ট থাকবে না।

যশোবন্ত সিংহের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করে রত্না। গাল বেয়ে তার অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে। বীরসিংহকে ঘিরে কল্পনার যে অপরিসীম সুখের সৌধ তিল তিল করে গড়ে তুলেছিল, তা যেন ভেঙে যেতে বসেছে। বার বার মন থেকে কে যেন ডেকে বলতে লাগল—না না, অত সুখ সইবে না, অত সুখ সইবে না। দুঃখ—পোড়া কপালে তোর রয়েছে শুধু দুঃখ।

বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে রত্নার। করজোড়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলে,—আমি ধন দৌলত চাই না ভগবান। রাণী হতেও চাই না। আমি চেয়ে এসেছি শুধু বীরসিংহকে আর তার ভালোবাসাকে। আর— আর আমিও যেন ভালোবাসায় তাকে ঘিরে রাখতে পারি। হোক সে দরিদ্র। ক্ষতি নেই। মরুভূমির বাসিন্দারা কবে ক'জন ধনী হয়? তার বীরত্বটুকু শুধু নিয়ে সে একজন পরিপূর্ণ পুরুষ। সেই বীরপুরুষের বীরাঙ্গনা আমায় হতে দাও।

ঘরের কোণে একটা শব্দ হয়। চমকে ফিরে চায় রত্না। দু'চোখে তার আতঙ্ক ফুটে ওঠে। এ কী দেখছে! চেয়ে দেখে বেদীর ওপর স্থাপিত শিবের পটটি নীচে গড়িয়ে পড়েছে।

সে কেঁদে ওঠে।

দিল্লির বাদশাহের আদেশ এসে পৌঁছায়। যশোবন্ত সিংহের যে সমস্ত মহিষী জীবিত রয়েছে তাদের এবং তার পরিবারবর্গের সবাইকে অবিলম্বে দিল্লিতে প্রেরণ করা হোক। আদেশ শুনে মহারাজার বিশ্বস্ত অনুচর দুর্গাদাসের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে চিন্তায়। বাদশাহ কি মহারাণীর ভাবী সন্তানের বিষয় অবগত হয়েছেন? কিন্তু তা কি করে সম্ভব? সে সংবাদ তো কেউ জানে না এ পর্যন্ত। জানে শুধু কয়েকজন অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তি। অনেক চিন্তার পর দুর্গাদাস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে বাদশাহের সন্দেহপ্রবণ চিত্ত যাচাই করে নিতে চায় মহারাজের পরিবারে এমন কেউ রয়েছে কিনা ভবিষ্যতে যে তাঁর পথের কাঁটা হয়ে উঠতে পারে। থাকলে নিশ্চয় তাকে ধ্বংস করবেন তিনি। এতে সমূহ বিপদ রয়েছে। কারণ দিল্লিতে পৌঁছাবার আগেই রাণীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে এবং সে কথা গোপন রাখা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে। রাজপুতদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকের সংখ্যা বিরল বটে, তবে বিপুল অর্থের বিনিময়ে কোনো

দুর্বল চিত্তের ব্যক্তি প্রলোভনে পড়ে আসল সত্য বলে দিতে পারে যে কোনো মুহূর্তে।

দুর্গাদাসের চিন্তার সূত্রপাত এইখানেই। মহারাজের সন্তান কন্যা হলে কিছু করবার নেই। কিন্তু সে যদি পুত্র হয় তবে তাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। মাড়োয়ার এখন মুঘলের করতলগত। যে মাড়োয়ারের প্রতিটি ধূলিকণার জন্যে বীরেরা প্রাণ দিতে পারে সেই পবিত্র এবং অতি প্রিয় মাতৃভূমি শৃঙ্খলিত। এই শৃঙ্খল ছিন্ন করবার একটি মাত্র পথই রয়েছে। তা হলো মহারাজের বংশধরকে বাঁচিয়ে রেখে তাকে সাবালক করে তোলা। ভবিষ্যতে কোনো একদিন সেই তরুণ রাজা যদি রাঠোরদের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে বলে—আমার জন্যে তোমরা আত্মবিসর্জন দাও, তোমাদের মাতৃভূমি আমি উদ্ধার করব। সেদিন বীরের পদভরে সমগ্র রাজস্থান প্রকম্পিত হয়ে উঠবে।

ভাবতে ভাবতে দুর্গাদাস দৃঢ়হস্তে তাব তলোয়ার কোষমুক্ত করে। সম্মুখে উপবিষ্ট চন্দ্রভান কৌতূহলের দৃষ্টিতে চেয়ে বলে,—কি হলো?

দুর্গাদাস যথাস্থানে তলোয়ার রেখে ধীরে ধীরে বলে,—হলো অনেক কিছুই।

চন্দ্রভান একটু সময় নিয়ে বলে,—আমি জানি।

—কী?

—বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

—ঠিক। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে বাঁচাতে হবে। রাজি?

—আমায় প্রশ্ন করছ?

—হ্যাঁ চন্দ্রভান, তোমাকে দিয়েই শুরু করছি।

—দুর্গাদাস রাঠোরদের বড় ছোট করে দেখছ তুমি। চলে যাও দেশে। দিনের পর দিন অনাহারে থেকে যে মানুষটি কঙ্কালসার হয়েছে, তাকে যদি গিয়ে এই একই প্রশ্ন কর—সেও রাজি।

দুর্গাদাসের চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়। কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলে,—জানি ভাই। কিন্তু এত ব্যাপকভাবে সবাইকে জানালে তো চলবে না এখন। গোপন রাখতে হবে। অতি বিশ্বস্ত কয়েকশত রাঠোর যাদের কাছে টাকা পয়সা ধনদৌলত তৃণবৎ, শুধু তাদেরই জানাতে হবে। কারণ তারাই হবে আজ থেকে অন্ততঃ ষোলো বছরের জন্য ভাবী মহারাজের রক্ষক। জানি না তিনি সত্যিই মহারাজা হিসাবে ভূমিষ্ট হবেন কিনা।

—ভগবান আমাদের নিরাশ করতে পারেন না দুর্গাদাস।

—আমারও মনে সেই বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে।

উভয়ের আলোচনা চলছিল—যশোবন্ত সিংহের অস্থায়ী আবাসে যেখানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের সেই অপ্রসিদ্ধ গ্রামে তখন সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসছিল। দূরে মসজিদে মসজিদে আজানের ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। অন্যদিন হলে মহারাজের আবাসেও চাপা শঙ্খধ্বনি শ্রুত হতো। কিন্তু কিছুদিন থেকে সেই পরিচিত মঙ্গলধ্বনি কর্ণগোচর হয় না। মহারাজের মৃত্যু শঙ্খের কণ্ঠরোধ করেছে।

দ্বারদেশে রত্না এসে উপস্থিত হয়। মহিষীর পরিচারিকাকে ওরা চেনে। অন্ততঃ এ-কয়েকদিনে খুব ভালভাবেই চিনেছে। কারণ মহিষীর সেবাযত্ন সব কিছুই সে করছে। তাঁর সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্রও বলতে গেলে সে। মেয়েটির নম্র স্বভাব তাদের আকৃষ্ট করে—পছন্দ করে তাকে।

—কাকা।

—কি মা।

—মহারাণী জানতে চাইলেন কবে নাগাদ আমাদের রওনা হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

—যত শিগগির সম্ভব। হয়তো দু'তিন দিনের মধ্যেই।

রত্নার বুকের ভেতর কেমন করে ওঠে। এত তাড়াতাড়ি? কিন্তু সে যে এলো না এখনো। তাকে

মুঘল সৈন্যের মধ্যে ফেলে রেখেই কি এরা দিল্লি অভিমুখে রওনা হবে? এরা গেলে যে আমাকেও যেতে হবে।

সে অতি শান্তকণ্ঠে বলে,—যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সব রাঠোরই কি চলে এসেছে?

—তুমি কি বলতে চাইছ বুঝলাম না।

রত্না লজ্জিত হয়। তার সারা মন জুড়ে রয়েছে আশঙ্কা। তাই বেফাঁস কথা বলে ফেলেছে। উচিত হয়নি এভাবে বলা। ব্যক্তিগত স্বার্থ দেশের স্বার্থের চেয়ে বড় হতে পারে না। তাড়াতাড়ি বলে,—রাণীমা কি অরক্ষিত অবস্থায় রওনা হবেন?

—উপযুক্ত ব্যবস্থা একটা করতে হবেই। রাণীমার কোনো রকম দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

রত্না চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সে জানে মহাবীর দুর্গাদাসকে অবান্তর প্রশ্ন করা সম্ভব নয়। মহিষীর নাম করেও নয়। একটি প্রশ্ন করেই বুঝতে পেরেছে কতখানি মূর্খ হলে অমন কথা মুখ থেকে বের হতে পারে। কারণ যার গর্ভে ভবিষ্যতের রাঠোর-নৃপতি রয়েছে, তাকে অরক্ষিত অবস্থায় দুর্গাদাস কখনোই নিয়ে যেতে পারে না। তবু সে দাঁড়িয়ে থাকে।

—আর কিছু জানবার আছে মা?

—সবাই কবে নাগাদ ফিরবে কাকাবাবু?

—কোথা থেকে?

—যুদ্ধক্ষেত্র থেকে।

—সেখানে মুঘল সেনারা থাকবে কিছুদিন। নতুন সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছেন। প্রয়োজন হলে তিনি তাদের চালিত করবেন।

—আমি রাজপুতদের কথা বলছি।

দুর্গাদাস কঠিন স্বরে বলে ওঠে—যারা যুদ্ধক্ষেত্রে ভূমি নেয় তারা কখনও ফিরে আসে না! বাকি সবাই ফিরেছে।

রত্না ছুটে বের হয়ে যায়। তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সমস্ত পৃথিবী তার চোখের সামনে বন্ বন্ করে ঘুরতে থাকে। সে দু'হাতে বুক চেপে ধরে। খুব স্পষ্ট আর সোজা উত্তর সে পেয়ে গিয়েছে। দুর্গাদাস জানল না ওই উত্তর রত্নার বুকের পাঁজর ভেঙে দিয়ে, তার জীবনের সব সাধ, সব কল্পনা, সব আশাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

অন্তরে হাহাকার, চোখে উদ্যত অশ্রু—হয়তো এখনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়বে রত্না। এই অবস্থায় ছুটতে ছুটতে সে মহারাজের বাসস্থানের অনতিদূরে এক নির্জন স্থানে গিয়ে ধুলোর ওপর লুটিয়ে পড়ে দুই হাত দিয়ে প্রাণপণে মাটি আঁকড়ে ধরে। তার চোখে অশ্রুর বন্যা।

বীরসিংহ নেই? সবাই ফিরে এসেছে। শুধু তারাই আসেনি যারা খাইবার গিরিপথের অপ্রশস্ত স্থানে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। বীরসিংহ আসেনি। সে ফিরে আসেনি। পড়ে রয়েছে অন্যান্য বীরের সঙ্গে রাক্ষসী খাইবারে।

হায় বীরসিংহ! কেন তুমি এমন করলে! মুক্ত অসি হস্তে যখন উন্মত্তের মতো শত্রুর দিকে ধাবিত হলে একবারও কেন তখন তোমার অভাগীর কথা মনে পড়ল না? তাহলে তো অমনভাবে ধেয়ে যেতে না। তুমি বলতে, বাইরের শত্রুরা যখন আক্রমণ করতে আসে তখন গোটা ভারতবর্ষকেই দেশ বলে মনে হয়। মুঘল-রাজপুত ভেদ থাকে না। কিন্তু তবু নিজের মাতৃভূমির জন্যে যুদ্ধের মতো তীব্র প্রেরণা পাওয়া যায় না। তবে কেন এমন করলে? কেন এতটুকু সংযত হলে না। আমি তো জানি, তুমি যদি একটু সাবধান হতে তবে তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করবার মতো ক্ষমতাবান পুরুষ বিরল। তোমার এই নিপুণতার জন্যেই তুমি শেষ পর্যন্ত মহারাজের মুষ্টিমেয় পার্শ্বচরদের মধ্যে এত অল্প বয়সে স্থান পেয়েছিলে। তুমি বলতে, মাড়োয়ারের জন্যে না হলেও মহারাজের সম্মানের জন্য এ যুদ্ধ। কিন্তু

মহারাজ যখন অসুস্থ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এলেন, সঙ্গে যখন দুর্গাদাস, চন্দ্রভান, শঙ্কর সিংহ, বরমল, যোধা সিংহ প্রভৃতি বীরেরা ফিরে এলেন তখন তুমিও কেন চলে এলে না তাঁদের সঙ্গে। আমি যে প্রতিটি দিন, প্রতিটি পল তোমারই অপেক্ষায় বসেছিলাম। আমার হৃদয় প্রতিটি মুহূর্ত তোমারই বিরহে কেঁদেছে। তুমি কি সেই ক্রন্দন শুনতে পাওনি? নিশ্চয়ই পেয়েছিলে। তবে?

রত্নার ক্রন্দনধ্বনি সন্ধ্যার নৈঃশব্দের মধ্যেও বেশিদূর যায় না। বড় চাপা সেই ক্রন্দন—তারই স্বভাবের মতো চাপা।

বীরসিংহ! জানি না, হয়তো মহারাজ তোমারই ওপর সৈন্যদলের ভার দিয়ে এসেছিলেন। কিংবা—কিংবা তুমি কি স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন দিলে? বন্দিনী মাতৃভূমিতে ফিরে যাবার কথা চিন্তা করতে তোমার বক্ষ কি বিদীর্ণ হতো? জানি না। এখন তুমি বহু উর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের স্নেহচ্ছায়ায় বসে রয়েছ। রত্না নামে ধরিত্রীর এক অখ্যাতা অভাগিনীর স্মৃতি এর মধ্যেই তোমার কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সত্যিই যদি স্বেচ্ছায় মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে থাকো, তবে কার ওপর মাতৃভূমি উদ্ধারের ভার সঁপে গেলে? তোমার ভূমিকা এ ব্যাপারে নেহাৎ নগণ্য হতো না। দুর্গাদাস, শঙ্কর সিংহ, চন্দ্রভান—এঁরা বীর হলেও তোমার মতো তরুণ নন। কতদিন এঁরা সক্ষম থাকবেন?

আলো জ্বলে ওঠে অল্প দূরে মহারাজার অস্থায়ী আবাসের প্রকোষ্ঠগুলিতে। রাজমহিষী নিশ্চয়ই এতক্ষণে তাঁকে খুঁজছেন। সে ছাড়া তাঁকে তেমনভাবে আর কেউ প্রবোধ দিতে পারে না। অথচ রত্নার খেয়াল নেই। তার অশ্রুর প্লাবন শুষ্ক ভূমি শুষে নিতে থাকে। তার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস হাওয়ায় গিয়ে মেশে। তার বক্ষের উত্থান-পতন বিন্দুমাত্র কম্পন জাগাতে পারে না সীমান্তের ভূমিতে। সে নিজেও জানে, সব বৃথা—যে যায় সে আর ফেরে না। যে ফুল একবার ঝরে পড়ে তা আর ফোটে না। তবু যতদিন বেঁচে থাকবে এইভাবেই কাটাতে হবে তাকে।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় রত্না। কর্তব্য: মহিষী যেমন কর্তব্যের খাতিরে জীবিত রয়েছেন তাকেও তেমনি বাঁচতে হবে। তার কর্তব্য মহিষীর কর্তব্যের তুলনায় কিছুই নয়—তবু বেঁচে থাকতে হবে। যতদিন রাণী তাকে তার পাশে চাইবেন থাকতেই হবে তাকে। কারণ এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে মাতৃভূমির ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষার সব কিছু।

রত্না চলতে শুরু করে। সে বুঝতে পারে তার পদক্ষেপ নিয়মিত নয়—তার সমস্ত শরীর অবশ। তবু জোর করে সে এগিয়ে যায়। সে দেখতে পায় দুর্গাদাস যে-ঘরে চন্দ্রভানের সঙ্গে আলোচনায় রত ছিলেন সেখানে বাতি জ্বলছে। অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শেষ হয়নি। বাদশাহের আদেশ অবিলম্বে দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সেই আদেশ সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করতে অনেক কিছু ব্যবস্থার প্রয়োজন।

রত্না আর একটু সেদিকে এগিয়ে যায়। সে বাতায়ন পথে দেখতে পায় কম্পিত প্রদীপ শিখা দেওয়ালে ছায়া ফেলেছে একটি মনুষ্য-মূর্তির। দুর্গাদাসের অথবা চন্দ্রভানের? কিন্তু না—তা তো নয়। দণ্ডায়মান ছায়াটির আকৃতি অন্য ধরনের। দীর্ঘদেহী, ঋজু, পেশীবহুল—অথচ আদৌ স্থূল নয়।

না, না এভাবে অলীক কল্পনা করে বারবার আঘাত পেয়ে লাভ নেই। দীর্ঘদেহী পুরুষের অভাব নেই রাজপুতানায়। তবু দাঁড়িয়ে থাকে রত্না। সরে যেতে পারে না। ইচ্ছে হয় আর একটু এগিয়ে যেতে—কণ্ঠস্বর যদি শোনা যায়। হে ঈশ্বর! পৃথিবীতে অনেক কিছু অসম্ভবই তো তুমি সম্ভব করাও। তেমন কিছু কি ঘটাতে পার না যার ফলে বীরসিংহ আবার জীবন পায়?

দীর্ঘ ছায়াটি সরে যায়। এদিকে দরজা খুলে যায়। অন্ধকারের মধ্যে পুরুষটি এগিয়ে আসে। রত্না তাড়াতাড়ি পাশে সরে যাবার চেষ্টা করে। এই স্থানে, এ অবস্থায়, এই সময়ে তাকে দেখে নিশ্চয়ই ভাববে পুরুষটি, মহিষীর পরিচারিকা দুশ্চরিত্রা।

দ্রুত এগিয়ে আসে পুরুষ। রত্না ওড়নায় মুখ ঢেকে ঘুরে দাঁড়ায়।

পুরুষ থেমে যায় তার পাশে। রত্নার বুক কাঁপে—যদি চিনতে পারে?

পুরুষ প্রশ্ন করে—কে তুমি?

রত্নার মুখের ওড়না খসে পড়ে। সেও কোনোমতে মানুষটির দিকে ঘুরে বলে—কে?

—রত্না!

পুরুষটি দেখতে পায় রত্নার দেহ ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। তৎপরতার সঙ্গে দু'হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলে। অন্ধকারের মধ্যেও সে বুঝতে পারে রত্না জ্ঞান হারিয়েছে।

—রত্না—রত্না! তুমি কি অসুস্থ? রত্না একবার চেয়ে দেখো, আমি বীরসিংহ। আমি ফিরে এসেছি রত্না।

বীরসিংহ একদৃষ্টে রত্নার মুখের দিকে চেয়ে থাকে অস্পষ্ট অন্ধকারে। রত্নার দেহ মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে। অনেক যুদ্ধের রক্ত-ঝরানো বীরের বক্ষও দুরুদুরু করে। রত্না কি অসুস্থ? সে কি মৃত্যু-পথ -যাত্রিণী?

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রত্না। তার চোখ উন্মীলিত হয়।

বীরসিংহ দু'হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরে ডাকে,—রত্না কথা বল। আমি বীরসিংহ। আমাকে তুমি ভুলে গিয়েছ রত্না?

রত্না তার দুর্বল হাত তুলে বীরসিংহের মুখের ওপর বুলিয়ে চলে—তার সর্বাঙ্গে হাত দিয়ে দেখে। অবশেষে কেঁদে উঠে বলে,—তবে যে ওরা বলল তুমি নেই।

—আমি নেই? কোথায় যাব আমি তোমাকে ছেড়ে? দেশে?

—না না, তা নয়। আমি ঠিক উচ্চারণ করতে পারছি না।

—ও বুঝেছি। কিন্তু একথা কে বলল তোমায়?

—না না, কেউ বলেনি। শুধু বলল, সবাই ফিরে এসেছে গিরিপথ থেকে—সব রাজপুত। কিন্তু তোমায় যে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

—আমি সবার শেষে এসেছি রত্না। দুর্গাদাস আমাকে একটা বিশেষ কাজে সেখানে রেখেছিলেন।

অন্ধকার আরও ঘনীভূত হয়। শুধু দুই তরুণ-তরুণী নগ্ন প্রকৃতির বুকে বহুক্ষণ একইভাবে থাকে। রত্নার উঠে বসতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। তখনো তার মনে মনে ভয় হয়তো স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন টুটলেই নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুখীন হতে হবে। এই মধুর স্বপ্ন তবু ভাল। উঠে বসলে যদি ঘুম ভেঙে যায়?

তাছাড়া বীরের প্রেয়সীদের বড় জ্বালা। তাদের কোন মিলন যে শেষ মিলন কেউ বলতে পারে না। স্বয়ং বিধাতাও কি পারেন? তার চেয়ে এই ভাল—যতক্ষণ বীরসিংহের নিকটতম সান্নিধ্যে থাকা যায় ততক্ষণই সুখ।

—রত্না। এবারে যে আমাদের উঠতে হবে। রাত অনেক হতে চলল।

—হ্যাঁ। উঠতে হবে। কিন্তু উঠতে যে ইচ্ছে হয় না বীরসিংহ।

—জানি রত্না। অথচ উপায় নেই। আজ রাতের মধ্যে আমাকে অনেক কিছু করতে হবে। আমাদের রওনা হতে আর দেরি নেই বেশিদিন।

—কবে যাব আমরা?

—জানি না। দুর্গাদাস বলতে পারেন।

রত্না এবারে উঠে বসে। অন্ধকারের মধ্যে বীরসিংহের গ্রীবাদেশ দু'হাতে বেষ্টন করে তার মুখের ভেতর কি দেখতে চায় সে-ই শুধু বলতে পারে।

তারপর সহসা উঠে দাঁড়ায়। বলে ওঠে,—আমার খুব অন্যায় হয়ে গিয়েছে। মহিষী এতক্ষণ একা রয়েছেন। হয়তো খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়েছেন। আমি স্বার্থপর। মহিষীর দুঃখের চেয়ে আমার সুখই বড় হলো?

—তুমি যাও রত্না। অন্যায় কিছু করোনি। তুমি সুস্থ ছিলে না। কাল আবার দেখা হবে।

রত্না ধীরে ধীরে চলে যায়। বীরসিংহ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। রত্নাকে নিয়ে নিজের দেশে গিয়ে ঘর বাঁধার কল্পনা চিরকাল কল্পনাই থেকে যাবে হয়তো। এর মধ্যে কত বিপদ রয়েছে, কত রক্তক্ষয়। তারপরেও কি দু'জনা একসাথে গ্রামে ফিরতে পারবে? বিধাতা জানেন। তবে আশা নিয়েই তো বেঁচে থাকে সবাই। সেও বাঁচবে। আশাই তার প্রেরণা।

বাইরে পদশব্দ। সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন—কে ওখানে?

—আমি।

—আমি কে?

—আমি বীরসিংহ।

—বীরসিংহ? অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? দুর্গাদাস কাছে আসেন।

—ভাবছিলাম।

—সেটা অপরাধ। চিন্তার ভারটা আপাতত আমিই নিয়েছি। তোমরা শুধু কাজ করে যাও। চিন্তা মানুষকে ক্লিষ্ট করে, দুর্বল করে। যাও।

অবশেষে যাত্রা শুরু হয়। দিল্লি অনেক দূরের পথ। মুঘল সৈন্য নবনিযুক্ত সেনাপতির অধীনে থেকে যায়। শুধু রাজপুতেরা যশোবন্ত সিংহের পরিবারের সঙ্গে রওনা হয়।

শকটের ব্যবস্থা হয়েছে রমণী শিশু আর আহত ব্যক্তিদের জন্য। অবশিষ্ট সবাই পায়ে হেঁটে চলেছে। পায়ে হাঁটায় তারা অভ্যস্ত। এইভাবে কতবার তারা সারা ভারতবর্ষের দিকে দিকে অসি হাতে ছুটে গিয়েছে শাহনশাহ সাজাহানের আমলে। তখন তাদের ধমণীর শোণিতস্রোত ছিল উষ্ণ, অন্তরে ছিল প্রবল প্রেরণা, কারণ যশোবন্ত সিংহ তখন ছিলেন যুবক।

তারপর দিল্লির মসনদে বসেছেন নতুন বাদশা। তাঁর কূটনীতি, দৃষ্টিভঙ্গী সব কিছুই অন্য ধরনের। তাছাড়া মহারাজাও আর যুবক ছিলেন না। তাই তাঁর চিরকালের সাথী এখনকার প্রবীণ যোদ্ধারা আর আগের মতো উৎসাহভরে পথ চলতে পারে না। দেশে প্রত্যাবর্তনের মোহও নেই। দেশ পরাধীন।

তবু মাঝে মাঝে তারা তরুণ সৈন্যদের উৎসাহের বাণী শোনায়। বলে, এ্যাইসা দিন নেহি রহেগা। দিন কখনো সমান যায় না। উত্থান-পতনই সংসারের নিয়ম—পৃথিবীর নিয়ম। সেই নিয়মকে সংযতভাবে স্থিরচিত্তে মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। রাজ্য বা সাম্রাজ্যও সে নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। তাই ভগ্নোদ্যম হওয়া কাজের কথা নয়। ভগ্নোদ্যম হওয়ার অর্থই হলো নিশ্চিত পরাজয়ের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া।

—বীরসিংহ। দুর্গাদাস ডাকে।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে বীরসিংহ।

—মহারাণীর শকটের পেছনে পেছনে চলবার প্রয়োজন নেই তোমার। তুমি বরং আরও একটু পেছনে থাকো।

রৌদ্রতপ্ত বীরসিংহের গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল এমনিতেই রক্তবর্ণ ছিল তাই তার লজ্জা দৃষ্টিগোচর হলো না কারও। মহারাণীর শকটের একেবারে পেছনে বসে রয়েছে রত্না। রত্নার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করতে করতে বিনা আয়াসে সে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসেছে—এতটুকু ক্লান্তি অনুভব করেনি। খাবার কথাও মনে পড়েনি। গতকাল রত্নাই ইশারায় তাকে খেয়ে নিতে বলেছিল। নইলে খাওয়াই হতো না। রত্নার নিজেরও কি মনে পড়ত? রাণীমার খাবার সময় হয়েছিল বলেই মনে পড়ে গিয়েছিল।

দুর্গাদাসের আদেশে রত্নার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করতে করতে পথ চলবার উপায় রইল না। বিষণ্ণ হলো বীরসিংহ। কিন্তু কর্তব্য সবার আগে। দুর্গাদাস সব কিছু ভেবেচিন্তে স্থির করে। হয়তো সে

ভেবেছে, দিল্লিতে ডেকে পাঠালেও মনে মনে অন্য মতলব রয়েছে বাদশাহের। পথিমধ্যে যশোবন্ত পরিবারকে নির্মূল করে দেবার প্রচেষ্টাও বিচিত্র নয়। তাই এত সাবধানতা। তাছাড়া নবজাতকের ভূমিষ্ঠ হবার সংবাদ যতটা সম্ভব গোপন রাখবার চেষ্টা করতে হবে। লোক জানাজানি হলে, তখ্‌তাউসের সামনে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে সেই বার্তা সর্বপ্রথম ঘোষণা করবার বাহাদুরি নেবার মানুষের অভাব নেই। অর্থলোভ সাংঘাতিক জিনিস।

পেছনে চলে যাবার সময় রাণীর শকটের দিকে দৃষ্টি পড়ে বীরসিংহের। দেখতে পায় রত্না উদ্বেগাকুল চোখে চেয়ে রয়েছে তার দিকে। হাত উল্টে ইশারায় বীরসিংহ বলে, সবার পেছনে চলে যাচ্ছে সে—দেখা হবার সুযোগ রইবে না আপাততঃ। তবে প্রথম যেখানে বিশ্রাম নেবে সবাই, শকটের বলদ এবং অশ্বদের যেখানে দীর্ঘ বিশ্রাম দেওয়া হবে, সেখানে তারা মিলিত হবে।

এত কথা ইশারায় বলা সম্ভব নয় বলে মনে হতে পারে অনেকের কাছে। কিন্তু একই সুরে যদি বাঁধা থাকে দুটি প্রাণ, তবে এর চেয়ে আরও অনেক গভীর এবং বেশি কথা শুধু চোখের ভাষায় বোঝানো যায়।

বীরসিংহ ভাবতে ভাবতে পেছনের দিকে সরে যায়। ক'দিন আগের সন্ধ্যার ঘটনা কিছুতেই ভুলতে পারে না সে। সে-দৃশ্য জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সজীব রইবে। রত্না ঢলে পড়েছিল মাটিতে—তার অচেতন দেহ বুকে নিয়ে সেইখানেই বসে পড়েছিল সে। বহুক্ষণ পরে চোখ মেলেছিল রত্না। তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল। তার বিচিত্র আচরণের কারণ কিছুতেই অনুমান করতে পারেনি বীরসিংহ। কারণ এতদিন অনেক কথা, অনেক ইশারার মধ্যে এভাবে ধরা দেয়নি সে। বীরসিংহ জানত না মুহূর্তকাল পূর্বেও রত্নার কাছে সে ছিল মৃত।

দীর্ঘ পথ। যাত্রার শেষ নেই। শেষ যেন হবে না কোনোদিন। বড়ই মন্থর গতি। পদাতিক বাহিনী এত ধীরগতিতে কখনো যায় না কোনো অভিযানে। কিন্তু এটি অভিযান নয়। এ হলো প্রত্যাবর্তন—যে প্রত্যাবর্তনে আশা নেই, আনন্দ নেই, আছে শুধু আশঙ্কা। সেই আশঙ্কা বাস্তব রূপ নেওয়া অসম্ভব নয়। তাই ইচ্ছাকৃত শ্লথগতি। দুর্গাদাসের পরামর্শে এভাবে গুটি গুটি এগিয়ে চলেছে মাড়োয়ার বাহিনী দিল্লি অভিমুখে। তাছাড়া গর্ভবতী রাজমহিষীর শরীর কয়েকদিন ঠিক সুস্থ নয়। তাঁর অসুস্থতায় দলপতিরা চিন্তাক্লিষ্ট। তারই ওপর নির্ভর করছে বিরাট এক সম্ভাবনা—রাজপুতদের ভবিষ্যৎ যে সম্ভাবনার মধ্যে নিহিত।

দুর্গাদাসের একান্ত বাসনা পথের মধ্যে রাণীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হোক। কারণ দিল্লিতে সন্তানের জন্ম হলে তাকে জীবিত পাওয়া কঠিন হতে পারে। বাদশাহের কাছে সন্তান-সম্ভবা রাণীর কথা গোপন রইবে না। তিনি হাকিম অথবা বৈদ্য পাঠাবেন। বাধা দেওয়া সম্ভব হবে না। সেই বৈদ্য শিশুর ক্ষতি করতে পারে বাদশাহের চাপে পড়ে কিংবা বিপুল অর্থের প্রলোভনে। তার চাইতে পথেই ভালো। ঝুঁকি থাকলেও ভালো। এখানে অন্ততঃ বাদশাহের রক্তলোলুপ হস্ত প্রসারিত হবে না।

শকটের মধ্যে রাণী মৃদুকণ্ঠে ডাকে—রত্না।

—রাণীমা।

—এখন থেকেই ব্যথা হচ্ছে মাঝে মাঝে।

—এ ব্যাপারে আমি একেবারে অনভিজ্ঞ। দাইকে ডাকব? কিংবা দলপতিদের কারও বর্ষীয়ান স্ত্রীকে সঙ্গে রাখুন। সবাই তো রয়েছে পেছনের শকটগুলিতে।

—না না, তুমিই থাকো। অনভিজ্ঞ আমিও। তবু আর কাউকে কাছে রাখব না। রাখতে ভাল লাগে না।

—কিন্তু এই ব্যথা ভাল কি মন্দ, আমি যে বুঝি না একটুও।

—ভগবান যখন একে দিয়েছেন, তখন তিনিই দেখবেন।

—তিনি দিয়েছেন বটে। আমাদেরও তো চেষ্টা করতে হবে যাতে সে সুস্থ থাকে।

—সুস্থ রয়েছে রত্না। মা হলে সেটুকু অন্ততঃ বোঝা যায়।

—কিন্তু ব্যথা—

—আমার মনে হয় পথযাত্রার জন্যে। কয়েকদিন বিশ্রাম নিলে হতো। একদিন কিংবা দু'দিন বিশ্রাম নিলে ক্লান্তিই কাটে না। তুমি ওঁদের বলো, সামনে কোনো নদী কিংবা সরোবর দেখে কিছুদিন যেন বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়।

রত্না শকট থেকে নেমে পড়ে তখনি। মন তার নেচে ওঠে। এবারে বীরসিংহের সঙ্গে ভালভাবে মিলিত হতে পারবে। এ পর্যন্ত চোখের দেখা ছাড়া আর কিছুই সম্ভব হয়নি। দুটো মুখের কথাও বলতে পারেনি তাকে। তার দুটো মিষ্টি কথা শুনতে পায়নি—স্পর্শ করা তো দূরে থাক।

সে দুর্গাদাসের খোঁজে রওনা হয়।

—রত্না, শুনে যাও। রাণীমা ডাকে।

সে কাছে এলে রাণীমা বলে,—তুমি দুর্গাদাসকে বরং আমার এখানে আসতে অনুরোধ কর। আমি নিজেই দু' একটা কথা বলতে চাই।

একটু পরে দুর্গাদাস রত্নার সঙ্গে শকটের কাছে এলে শকট থেমে যায়।

মহিষী আড়াল থেকে বলে,—দিল্লিতে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে যখন, তখন অন্য কোথাও চলুন।

—কোথায় যাবো রাণীমা? সারা ভারতে তেমন স্থান কোথায় আছে যেখানে শিশুর জীবন নিরাপদ? তার চেয়ে দিল্লি বরং ভাল। প্রদীপের নীচে অন্ধকার থাকে। বাদশাহের চোখের সামনে শিশুর পরিচয় কৌশলে গোপন রাখা যেতে পারে।

—কিন্তু নিরাপদ স্থান কি সত্যিই নেই?

—আছে। আপনি কী ভেবেছেন আমি জানি। মেবারের মহান রাণা রাজসিংহ কিছুতেই আপনাকে আশ্রয় দিতে কার্পণ্য করবেন না। কিন্তু শুধু শুধু কেন তাঁর বিপদ ডেকে আনি। তেমন দিন এলে রাণীর সাহায্য আমাদের নিতেই হবে। সেই সাহায্য হবে অনেক বেশি মূল্যবান।

মহিষীর তরফ থেকে আর কোনো কথা শোনা যায় না।

দুর্গাদাস বলে,—আপনি আদেশ করলে আপনার কথামতো কাজ করতে আমি বাধ্য রাণীমা। আপনার অভিলাষ কখনো অপূর্ণ থাকতে পারে না।

—না, আপনি প্রধান, আপনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। আমি শুধু পরামর্শ করবার জন্য আপনাকে ডেকেছিলাম। আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। আমার স্বামী আপনার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারতেন, আমিও পারব।

—আমি দিনরাত্রি ভেবে ভেবে কয়েকটি পন্থা ঠিক করে রেখেছি রাণীমা। সেগুলির মধ্যে একটি অন্ততঃ নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

এবারে রত্না বলে,—রাণীমা বলেছিলেন সামনে কোনো নদী বা সরোবর দেখে বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে।

দুর্গাদাস চিন্তিতভাবে বলে,—রাণীমা কি বেশি অসুস্থতা বোধ করছেন?

—হ্যাঁ, কাকাবাবু।

—তাই হবে। আর কিছুটা পথ গিয়ে জলাশয় পাওয়া যাবে। ওই যে পাহাড় দেখা যাচ্ছে—জোড়া পাহাড় ধোঁয়ার মতো দেখাচ্ছে—ওরই মাঝে রয়েছে সুন্দর সরোবর। ওখানে বিশ্রামের ব্যবস্থা করব।

দুর্গাদাস চলে যায়।

দুর্গাদাস ঠিকই বলেছে। পাহাড়ের ঠিক নীচেই সরোবরটি। পাহাড় দুটিও একেবারে ছোট নয়। সরোবরের দৃশ্য মনোরম।

সারি সারি শিবির পড়ে। রাজমহিষীর শিবির পৃথকভাবে স্থাপন করা হয়। ঠিক কেন্দ্রস্থলে। অন্যান্য দলনেতা, যারা পরিবারবর্গ সমেত সীমান্তে গিয়েছিল তাদের শিবিরও পৃথকভাবে স্থাপিত হলেও, মহিষীর শিবির থেকে অনেক দূরে। কয়েকজন সাধারণ সেনাও রয়েছে, যাদের সঙ্গে স্ত্রী রয়েছে। দলনেতাদের কন্যারা যুদ্ধকালে সীমান্তে তাদের পতিত্বে বরণ করেছে।

অশ্ব ও বলদরা সাময়িক মুক্তিলাভ করে সরোবরের অগাধ জলরাশির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চায়।

রত্না শিবিরের বাইরে এসে চারিদিকে দৃষ্টি ফেলে। হতাশায় মন তার ভরে ওঠে। শিবির পরিবেষ্টিত স্থানটিতে নির্জন জায়গা বলতে তেমন কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না যেখানে বীরসিংহকে একান্তে পাওয়া যায় কিছু গাছপালা, সামান্য জঙ্গল, দু' এক স্থানে একটু নির্জনতার সৃষ্টি করলেও যথেষ্ট নয়। অথচ সারাটা পথ শুধু একটি বিশ্রামের দিনের জন্যেই সে অপেক্ষা করেছে সাগ্রহে। সেই কবে বাক্যালাপ হয়েছিল বীরসিংহের সঙ্গে—যেন গতজন্মে। সেই কবে তাকে স্পর্শ করেছিল—যেন তারও আগের জন্মে। সেই কবে—যেন শত শত জন্ম আগে। যেটুকু চোখের দেখা হয়েছে কদাচিৎ, শুধু হৃদয়ের ব্যগ্রতাই প্রকাশ পেয়েছে উভয়ের আভাসে আর ইঙ্গিতে। কী করবে সে ভেবে পায় না। রাণীমার অতিরিক্ত আগ্রহে তার জন্য পৃথক শিবির স্থাপিত হয়নি। একই শিবিরের একটি ক্ষুদ্র ঘরে তার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ে রত্নার। ভগবান হয়তো চান না, সে সুখী হোক! সারা জীবন শুধু বিরহের যাতনাই সয়ে বেড়াতে হবে তাকে।

—রত্না। রাণীমার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

তাড়াতাড়ি চোখ মুছে সে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

—একি! তুমি কাঁদছিলে?

আপশোষ হয় রত্নার; ভালভাবে চোখের জলও মুছে ফেলতে পারেনি বলে।

—হঠাৎ কান্না পেয়ে গেল রাণীমা। মেয়েদের কান্নার কোনো মাথামুণ্ডু নেই।

—এক্ষেত্রে তোমার কথা অন্ততঃ সত্যি নয়। এখন কান্না না পাওয়াই অস্বাভাবিক। জানো রত্না, আমার চোখে জল দেখছ না অথচ ভেতরে ভেতরে সব সময় আমি কেঁদে চলেছি। এই যে পৃথিবী, এত আলো, এত সৌন্দর্য—এসব কিছুই অনুভব করতে পারি না। এসব থেকেও যেন নেই। আমার হৃদয় রয়েছে, কিন্তু তার আলো নিভে গিয়েছে রত্না।

—রাণীমা আপনি উতলা হবেন না। আপনি তো একেবারে নিঃস্ব নন। সেদিক দিয়ে বিচার করলে আপনি ভাগ্যবতী। রমণী পুত্রের মধ্যে স্বামীর প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়—দেখে তার মনে ভরে ওঠে। হৃদয়ের যে আলো নিভে গিয়েছে বলে মনে হয় সে আলো আবার জ্বলে ওঠে। পৃথিবী আবার সুন্দর হয়ে ওঠে।

—তোমার কথায় জাদু আছে রত্না। তোমার কথায় আমি আশ্চর্য রকমের সান্ত্বনা পাই। জানি না এত সব কোথা থেকে শিখলে। হয়তো তোমার তীব্র অনুভূতি তোমায় শিখিয়ে দিয়েছে এসব। কিন্তু একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি। পৃথিবী সুন্দর হয়ে উঠলেও কি আগের মতোই সুন্দর দেখায়? স্বামী-সোহাগিনী পৃথিবীর আলোয় যে রঙ, যে রূপ দেখে, স্বামীহারার পক্ষে শত পুত্রের জননী হওয়া সত্ত্বেও কি সেই রঙ সেই রূপ দেখা সম্ভব রত্না?

রত্না চিন্তা করে। একটা জবাব দিতেই হবে। কিন্তু কী জবাব সে দেবে? তার নিজের মনই যে অস্থির। তাকে কে সান্ত্বনা দেবে? অতি ধীরে ধীরে সে বলে—এতদিন জায়ার মনোভাব নিয়ে সুন্দর দেখেছেন, এবারে মায়ের মনোভাব নিয়ে তাই দেখবেন। পার্থক্য শুধু এইটুকুই। সবই মন রাণীমা। মনই

আমাদের চালায়।

বাইরে কর্মব্যস্ত সেনাদলের চাঞ্চল্য নানান আওয়াজের মধ্যে ভেসে আসে। কেউ বিশ্রামের সময় পেয়ে গান শুরু করে দিয়েছে। চারণ কবিদের বীরত্বব্যঞ্জক গান। এরা দেশাত্মবোধক কিংবা ভক্তি-রসাত্মক সঙ্গীত ভিন্ন কিছু জানে না।

—আচ্ছা রত্না, তোমার সাধ-আহ্লাদ বলে কি কিছুই নেই। এত যার তীক্ষ্ণ অনুভূতি, সে তো পাষাণ হতে পারে না।

—আছে বৈকি রাণীমা। সবই আছে। সব মানুষেরই কিছু না কিছু থাকে। নইলে কিসের আনন্দে বাঁচবে? তবে আপনাদের মতো অত উঁচু ধরনের নয়। আমাদের সাধ-আহ্লাদ আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী।

—একদিন তুমি বলেছিলে দরিদ্র ঘরের মহিষী হতে তোমার সাধ। সেই দরিদ্রের ঘর কি কখনো খুঁজে পাবে—যে ঘরের কর্তা-ব্যক্তিটি একজন বীরপুরুষ?

—ভাগ্য। ভাগ্য সে কথা বলতে পারে। কত মেয়ে পেয়েও হারায়। রত্নার ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে। সে অশ্রু সংবরণ করতে মুখ ঘোরায়।

—রত্না।

—হ্যাঁ, রাণীমা। আপনি তো পেয়েছিলেন—

—রত্না।

—আপনি কি পেয়েও—

—সে কথা নয় রত্না। এদিকে মুখ ফেরাও।

রাণীমার চোখে চোখ রাখতে চেষ্টা করে রত্না। পারে না।

—রত্না, তোমার মতো বুদ্ধিমতী হয়তো নই, কিন্তু আমিও নারী। বলো।

—কি বলব রাণীমা? রত্না ঘন ঘন শ্বাস ফেলে।

—লুকোবার চেষ্টা করো না। বলো, কে সে? নিশ্চয়ই রয়েছে। কারণ তুমি যখন দেশ ছাড়ো তখন কৈশোর অতিক্রম করেছ মাত্র। কৈশোরের প্রেম এত দীর্ঘ হয় না।

রত্না নীরব। কথা বলার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলে।

—বলো রত্না। কোনো ভয় নেই। একথা ভুলো না, আমি তোমার হিতৈষী।

ঢোক গিলে রত্না বলে,—জানি রাণীমা।

—চুপ করে থেকো না তাহলে।

—তাকে—তাকে আপনি তো চিনতে পারবেন না। সে এখনো প্রসিদ্ধ হয়নি।

—কখনো কি দেখেছি তাকে?

—দেখেছেন, কয়েকবার।

—আজকে দেখিয়ে দিতে পার?

—কিন্তু সে কি এদিকে আসবে?

—দূর থেকে—

—আপনি শিবিরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে চেষ্টা করতে পারি।

ওরা দু'জনে শিবিরের বাইরে যায়।

কিন্তু দেখা যায় না তাকে। সে তখন মনের দুঃখে দুটো ঘোড়াকে সঙ্গে নিয়ে সরোবরের ধারে গিয়ে ভালোভাবে তাদের গাত্র মর্দনে ব্যস্ত। এতদিনের পথ চলায় ওদের গায়ে অনেক ধুলো পড়েছে। পরিশ্রমের ঘামে সেই ধুলো লোমের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

ঘোড়া বড় ভালোবাসে বীরসিংহ। তার আশা মাড়োয়ার সৈন্যদলে একটি শক্তিশালী অশ্বারোহী

বাহিনী গড়ে তুলবে। সেই বাহিনীর অধিনায়ক হবার স্বপ্ন দেখে সে।

কাজের মধ্যে মাঝে মাঝে হাত দুটো কখন নিশ্চল হয়ে পড়ছিল বীরসিংহের—নিজেও বুঝতে পারে না। রাণীর শিবির অত্যন্ত সুরক্ষিত স্থানে—সেখানে এগিয়ে গিয়ে রত্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বাতুলতা। রাণীমা রয়েছেন। এতে তাঁর অপমান হবে। তবে সে যেতে পারে সেখানে প্রকাশ্য দিবালোকে উন্নত শিরে রাণীমার খোঁজ খবর নেবার জন্যে! কারণ দলের মধ্যে বয়স অল্প হলেও দায়িত্ব তার কম নয়। আজই সে ভাবে একবার যাবে। রত্নার সঙ্গে দুটো কাটা কাটা কথা বলে, চোখ দিয়ে হৃদয়ের কথা বিনিময় করে চলে আসবে। বুঝিয়ে দিয়ে আসবে দিল্লি পৌঁছবার আগে তেমনভাবে তারা নির্জনে বসে স্থান-কাল ভুলে উভয়ের মধ্যে ডুবে থাকবার অবকাশ আর পাবে না।

একটা ঘোড়া ছট্‌ফট্ করে ওঠে জলের স্পর্শে। চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয় বীরসিংহের। ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখে ঘোড়াটির গায়ে ছোট অথচ গভীর ক্ষত। অবহেলা করলে খারাপ হবে।

ওদিকে রাণীমা আর রত্না বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। শেষে রাণীমা বলেন,—আমি তো আর দাঁড়াতে পারছি না।

—শোবেন চলুন। আমারই ভুল হয়েছে এভাবে অসুস্থ শরীরে আপনাকে বাইরে আনা।

—কিন্তু তাকে আমার দেখা প্রয়োজন।

—কী হবে দেখে রাণীমা। শত সহস্র সৈন্যের মধ্যে সেও একজন মাত্র।

—সে বীরপুরুষ এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ রত্না। তার অনেক গুণ রয়েছে আরও। নইলে তোমার মতো মেয়ে তাকে দেখে ভুলতো না। ঠিক বলিনি?

রত্না একটু হেসে উত্তর দেয়,—কোন গুণে কে ভোলে কেউ কি তা বলতে পারে রাণীমা? তার গুণ না থাকলেও হয়তো ভুলতাম। তবে সে সাহসী এবং ভাল যোদ্ধা। এর মধ্যে তার যথেষ্ট পদোন্নতি হয়েছে।

শিবিরের ভেতরে প্রবেশ করে শয্যার ওপর ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে মহিষী বলে,—তার দেখা পেলে আমাকে ডেকো। আমার এই কৌতূহলকে নারীসুলভ ভেবো না।

রত্না রাজি হয়। রাজি হতে কোনো বাধা ছিল না। রাণীমার সহানুভূতিসূচক আচরণে বীরসিংহ সম্বন্ধে তার দ্বিধা কেটে গিয়েছিল।

সূর্য পাহাড়ের আড়ালে চলে গিয়েছে বেশ কিছুক্ষণ। অস্ত যাবার আগে গা ঢাকা দিয়েছে। বীরসিংহ জলের কিনারায় সুকোমল তৃণশয্যায় চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আকাশ-পাতাল ভেবেছে। কূলকিনারা পায়নি কোনো। শেষে বিরক্ত হয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। চিন্তা যখন নিষ্ফল হয়, তখন কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়া শ্রেয়। সে এগিয়ে যায় বহু শিবিরের পাশ দিয়ে কেন্দ্রস্থলের দিকে। ভেতরটা ফাঁকা। মহিষীর শিবির দু-চারটে বড় বড় গাছ এবং ঝোপ-ঝাড়ের একটু আড়ালে—প্রাকৃতিক পর্দা-প্রথা। এটুকু না রইলে মহিষীর পক্ষে বাইরে আসা একেবারেই সম্ভব নয়—বিশেষ করে এখন তার যে অবস্থা। এ অবস্থা না হলেও সর্বসাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে অতি সাধারণভাবে আসা কোনো কালেই অভ্যাস থাকে না রাণীদের।

বীরসিংহ ভেবে নেয়, একটা অজুহাত বের করতে হবে রাণীর শিবিরের দিকে যাবার জন্য। যাক্‌গে শেষ মুহূর্তে মাথায় যা আসবে, তাই বললেই হবে।

এগোতে থাকে সে। সহসা রাণীর শিবিরের সম্মুখভাগে দৃষ্টি পড়ায় সে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। দেখে রত্না দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। তাকে দেখে স্পষ্ট ইশারায় এগিয়ে আসতে বলছে। রত্নার মুখ হাসি হাসি কিনা অতটা বুঝতে পারে না। তবে তার আহ্বানের মধ্যে হাসি ঝরে পড়ছে।

ব্যাপারখানা কি? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি রত্নার? তার মতো লজ্জাশীলা তরুণীর পক্ষে এ

ধরনের স্পষ্ট আহ্বান অস্বাভাবিক। তাছাড়া ডাকছে সে রাজমহিষীর শিবিরে। কেউ দেখতে পেলে সাংঘাতিক পরিণতি হবে।

কিন্তু রত্না মূর্খ নয়। তার মাথা যদি ঠিক থাকে তাহলে বুঝতে হবে রাণীমার শিবিরে গেলে তারও কোনো অনিষ্ট হবে না।

সৈন্যদলের অধিকাংশই শিবির ছেড়ে সরোবরের তীরে চলে গিয়েছে। সেখানে কেউ জলের মধ্যে সাঁতার কাটছে, কেউ মাছ ধরতে বসে গিয়েছে। কেউ বা মোটা কাঠের ভেলা তৈরি করে তাতে চেপে সরোবর পারাপার করার কষ্ট-কল্পনা করছে।

বীরসিংহ এগিয়ে যেতে থাকে রত্নার দিকে। প্রতি মুহূর্তেই সে আশঙ্কা করে, এবারে রত্না ভয় পেয়ে তাকে চলে যাবার জন্যে হাত নাড়াবে। কিন্তু আশ্চর্য, তা তো নয়। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে সে আগের মতো।

সত্যিই পাগল হয়নি তো সে? পাগল অবশ্য দু'জনেই হয়েছে। দু'জনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য পাগল। কিন্তু সেই পাগলামি, অন্যান্য কর্তব্যকর্মে ছাপ না ফেলা পর্যন্ত কেউ ধরতে পারে না।

বীরসিংহ শিবিরের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই রত্না ফিস্‌ফিস্ করে বলে, —তুমি একটু দাঁড়াও আমি আসছি।

—অনেকে দেখতে পাবেন। রাণীমা রয়েছেন ভুলে যেও না।

--জানি। তুমি দাঁড়াও।

রত্না ছুটে চলে যায় শিবিরের অভ্যন্তরে। বীরসিংহ নিদারুণ বিস্মিত হয়। তবু সে স্থানটি পরিত্যাগ করতে পারে না। স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে সে। ধারণাও করতে পারে না আড়াল থেকে স্বয়ং রাণীমা এতক্ষণে তাকে দেখছেন।

একটু পরে রত্না বাইরে আসে।

বীরসিংহ বলে,—কি ব্যাপার বলতো? তোমার চাল-চলনে একটু বিদকুটে ধরনের মনে হচ্ছে। ভরসা পাচ্ছি না ঠিক। মাথা ঠিক আছে তো তোমার?

রত্না হেসে বলে,—হ্যাঁ, খুব ঠিক আছে। শোনো, রাণীমা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

—রাণীমা!

—হ্যাঁ।

পর্দার আড়াল থেকে রাজমহিষী বলেন,—বীরসিংহ তোমার বীরত্ব আর সাহসের কথা আমি শুনেছি। আজ তোমায় দেখে সন্তুষ্ট। শোনো, কী কঠিন কর্তব্য তোমার ওপর ন্যস্ত তুমি জানো। অনাগত শিশুটির জীবন প্রতিটি মুহূর্তে বিপন্ন। আমার ইচ্ছা, যতদিন পর্যন্ত দিল্লিতে না পৌঁছোই ততদিন দিনে এবং রাতে আমার শিবিরের নিরাপত্তা তুমি দেখবে।

বীরসিংহ অন্তরালে দণ্ডায়মানা মহিষীকে অভিবাদন জানিয়ে বলে,—আপনার আদেশ আমি মাথা পেতে নিলাম। কিন্তু দুর্গাদাসের অনুমতি ব্যতীত আমার পক্ষে কিছু করা একটু অসুবিধাজনক। আপনার আদেশ তাঁর মুখ থেকে পেলে আমি নিশ্চিন্ত হতাম।

—দুর্গাদাসকে আমি আজকেই বলে দেবো।

সে রাতে মহারাণীর শিবিরের অনতিদূরে পিপুল গাছের নীচে দুই তরুণ-তরুণী মিলিত হলো। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মিলন—ফলে অনেকটা সময় বাক্যহারা হয়ে পরস্পরের হৃদয়স্পন্দন অনুভব করতেই কেটে গেল। তারপর মিলনের প্রথম ঢেউ অতিক্রান্ত হয়ে বিচ্ছেদের আশঙ্কায় পরবর্তী লগ্ন হয়ে উঠল অশ্রুসজল।

—কেঁদো না রত্না। দিল্লিতে আর কতদিন? আমাদের রাজা জন্মালে দুর্গাদাস কখনোই তাঁকে দিল্লির বাদশাহের দয়ার উপর ফেলে রাখবেন না। আমার বিশ্বাস যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁকে তিনি

রাজপুতানার ভূমিতে নিয়ে যাবেন। মরুভূমির উষ্ণ আবহাওয়ায় মানুষ না হলে মরুরাজার বীরত্বের স্ফুরণ হয় না। দিল্লিতে মানুষ হয়ে রাজপুতানার অনেক রাজপুত্র অপদার্থে পরিণত হয়েছে। তারা বাদসাজাদাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে আলস্যপরায়ণ হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারে না, বাদসাজাদাদের ঠিকভাবে শিক্ষিত করে তোলবার অনেক ব্যবস্থা রয়েছে।

রত্না বীরসিংহের বুকে মাথা রেখে বলে,—আমি অতশত ভাবি না। আমার শুধু একটা ভয়, তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে। তোমায় আমি কিছুতেই ফিরে পাবো না।

—কেন এ ভয় রত্না? এসব ভাব কেন?

—ভাবি না। স্বপ্ন দেখি। অন্ততঃ চারটি রাতে আমি এই একই স্বপ্ন দেখে কাঁদতে কাঁদতে জেগে উঠেছি।

—কী সেই স্বপ্ন?

—কে যেন আমায় সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—দূরে-বহুদূরে—যেখান থেকে তোমার কাছে ফিরে আসা অসম্ভব। আমি তোমায় ডাকতে চেষ্টা করি—কণ্ঠস্বর কে যেন রোধ করে রাখে। কিছুতেই ডাকতে পারি না। আমি ধীরে ধীরে দূরে সরে যাই। আমার চোখে অশ্রুর প্লাবন। তোমার মূর্তি অস্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই প্লাবনে। তবু তারই মধ্যে দেখতে পাই, তুমি একা অসংখ্য মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করছ। আমার দিকে তোমার লক্ষ্য নেই। তাদের বিনাশ করতে তুমি ব্যস্ত। একজনের পর একজনকে হত্যা করে রক্তাক্ত তরবারি নিয়ে তুমি চিৎকার করে উঠছ। তোমার অসি চালনায় বিদ্যুতের স্পর্শ। আমাকে দেখছ না তুমি কিছুতেই। আমি যে আরও দূরে চলে যাচ্ছি। একবার দেখো। তুমি বুঝতেও পারছ না তোমার রত্না চলে গেল। ওরা জন্মের মতো নিয়ে গেল আমায়।

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে রত্না।

বীরসিংহ তার মাথায় হাত বুলিয়ে বারবার বলে,—এ শুধু স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন রত্না। স্বপ্ন কখনো সত্যি হয় না।

—তা যদি না হয়, তবে আমার মতো সৌভাগ্যবতী নারী পৃথিবীতে নেই। কিন্তু কেন যেন মনে হয় সত্যি হবে। সেইজন্যেই মনে হয় ভগবান আমার মনকে দৃঢ় করে তোলবার জন্যে একবার মিথ্যে ভয় দেখিয়েছিলেন। তুমি যদি সেদিন সত্যিই না ফিরতে গিরিপথ থেকে, তবু তো আজ এই মুহূর্তে আমি বেঁচে থাকতাম।

ভাবতেই থরথর করে কেঁপে ওঠে তার সর্বশরীর। তারপর আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে।

কেঁদেও কত সুখ—যদি বীরসিংহের বুকে মাথা রাখা যায়। কিন্তু না—আর সে কাঁদবে না। এই সুন্দর রাতটা ব্যর্থ হয়ে যেতে সে দেবে না। অনাগত ভাগ্যলিপিতে যা লেখা থাকে থাক, এই দুর্লভ সময়টুকুর অপব্যয় হতে দেবে না। যে জীবনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে নিহিত তার বর্তমানটুকু বহুমূল্য। নারীত্বের দুর্বলতায় সেই বর্তমানকে ব্যর্থ হতে কিছুতেই দেবে না।

পাহাড়ের ওপর থেকে চাঁদ উঁকি দেয়। সেই চাঁদের আলো সরোবরের জলে অস্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত হয়। পিপুল গাছের পাতায়, ডালে রূপোলী আলোর আবছা স্পর্শ।

রত্না ঘুরে বসে দু'হাতে বীরসিংহের গাল দুটো চেপে ধরে বলে,—বলো, এ ক'দিন তোমার কষ্ট হয়নি? আমার জন্যে?

—খুব।

—এত অল্প কথায় নয়। একটু বেশি করে বলো।

—খুব কষ্ট হয়েছে রত্না।

—উহুঁ এর চেয়েও বেশি করে বলো। আমার শুনতে ইচ্ছে করছে।

—এর চেয়ে বেশি আমি বলতে পারিনে রত্না। বীরসিংহের মুখে অসহায়তার ছাপ ফুটে ওঠে।

রত্না হেসে বীরসিংহের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে বলে,—ও, তুমি বীরপুরুষ। ভুলে গিয়েছিলাম! যুদ্ধ করতে পার খালি। তাই না?

—তা পারি। তবু, এখনো অনেক কিছু শিখতে বাকি। মহারাজ যশোবন্ত সিংহের প্রবীণ বয়সের অসি চালনাও দেখেছি—দেখেছি তাঁর অশ্ব চালনা। নিজেকে নগণ্য বলে মনে হয়।

—তোমার কত কম বয়স সেটা ভুলে যেও না। অভিজ্ঞ হতে হলে সময়ের প্রয়োজন। তুমি পুরুষসিংহ। তুমি আমার গর্ব।

বীরসিংহ চুপ করে থাকে।

রত্না বলে,—দিল্লিতে গিয়ে তুমি কি করবে?

—জানি না রত্না।

—কবে আমাকে দেশে নিয়ে যাবে?

— যেদিন তুমি বলবে।

—তোমার ইচ্ছে নেই কোনো?

—আমার? হ্যাঁ—

—কী?

—আমার ইচ্ছে আছে।

—কী ইচ্ছে।

—আমার—

বীরসিংহ আমতা আমতা করে।

রত্না খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে। বলে—

—তুমি কী সুন্দর।

—আমি? ধ্যেৎ। আমি সুন্দর হতে যাব কেন?

—তুমি জানো না। তাই। তুমি সুন্দর বীরসিংহ।

চারদিক স্তব্ধ। শুধু দূরে প্রহরীরা সজাগ। পথশ্রান্ত সেনারা নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া নিদ্রায় অচেতন। সরোবরের ঝিরঝিরে হাওয়ায় গাছের পাতায় কাঁপন লাগায়।

—রত্না।

—বলো।

—রাণীমা, কী করে আমার কথা জানতে পেলেন?

—আমার চোখে জল দেখে সন্দেহ করলেন। তারপর চেপে ধরলেন।

—তুমি বলে দিলে?

—তাঁর কাছে মিথ্যে বলা যায়? তিনি আমায় ভালোবাসেন।

—জানি। নইলে এভাবে সুযোগ করে দিতেন না। রাণীমার মঙ্গল হোক। তিনি যেন তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখেন।

—তা দেখবার বাসনা তো সবারই।

—হ্যাঁ। তবু তিনি মা। স্বয়ং মুঘল বাদশাহ তাঁর পুত্রের শত্রু। আমার এই প্রার্থনার চাইতে বড় প্রার্থনা মাড়োয়ারের কেউ করতে পারে না রত্না।

—জানি।

—রত্না।

—বলো।

—তোমার চোখে এত জল আসে কেন?

—তোমার জন্য।

বীরসিংহ চুপ করে যায়।

—কি কিছু বললে না তো?

—না। কাঁদতে তোমার ভাল লাগে?

—কখনো কখনো—হ্যাঁ, খু—ব।

—আমার কান্না পায় না।

—তুমি যে পুরুষ! তুমি কাঁদলে আমার কান্না কে দেখবে!

দূরে প্রহরীর চিৎকার—হেই, হুঁশিয়ার।

বীরসিংহ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। মুহূর্তের মধ্যে প্রেমিক বীরসিংহ পরিণত হয় যোদ্ধা বীরসিংহে।

—আমি চলি রত্না। ওরা কিছু একটা দেখতে পেয়েছে। রত্নার জবাবের অপেক্ষা না করে সে ছুটতে থাকে। রাতের নীরবতায় তার পদশব্দ বেশ কিছুক্ষণ কর্ণগোচর হয়। তারপর দূরে মিলিয়ে যায়।

বীরসিংহ হুঁশিয়ারি শব্দ লক্ষ্য করে সরোবরের ধারে এসে উপস্থিত হয়। দেখতে পায় দু'জন প্রহরী দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে তাদের কাছে এগিয়ে যায়। তাদের দৃষ্টি সরোবরের জলের দিকে। বীরসিংহ সেদিকে তাকায়।

ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। কে যেন সাঁতরে আসছে পাড়ের দিকে। এই নিশীথে সরোবরের অগাধ জলে কেউ সখ করে সাঁতার দিতে নামে না। এটি নদীও নয় যে, ওপার থেকে অন্য শত্রু এগিয়ে আসবে অলক্ষ্যে, কিংবা আসবে নিজেদের কোনো গুপ্তচর জরুরি সংবাদ বহন করে। ইচ্ছে করলে সরোবরের পাশ কাটিয়ে তারা যেতে-আসতে পারে।

তীব্র কৌতূহল নিয়ে তিনজন চেয়ে থাকে। জলের মানুষটিকে চাঁদের আবছা আলোয় ভালোভাবে দেখা যায় না। বোঝা যায় না সে শত্রু অথবা মিত্র। তবে দুশ্চিন্তা নেই এদের, কারণ সংখ্যায় এরা গরিষ্ঠ।

লোকটি অবশেষে পাড়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়। কিছুক্ষণ জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দম নিয়ে ধীরে সুস্থে জল থেকে ওপরে উঠে আসে। সে ক্লান্ত। নিঃশ্বাস তখনো স্বাভাবিক নয়।

বীরসিংহ প্রহরী দু'জনকে ডেকে নিয়ে তার দিকে এগিয়ে যায়। তারপর বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠে,—ভীমসিংহ, তুমি!

—হ্যাঁ।

এই ভীমসিংহের পাশাপাশি সে কত যুদ্ধ করেছে। এর যুদ্ধকৌশল এবং বীরত্বে কত সময় মুগ্ধ না হয়ে সে পারেনি। বয়সে তার চেয়ে কিছুটা বড় হলেও ভীমের সঙ্গে একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল গিরিপথে। সেই ভীম কি কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে?

—এই রাতে—জলে?

—হ্যাঁ! শেষ করে দিয়ে এলাম।

ভীমসিংহ হাঁপাতে হাঁপাতে বলে।

দূরে ফেউ ডাকছে। বাঘ বেরিয়েছে শিকারের খোঁজে। পাশের গাছের ঘুমন্ত বানরের দল কিচির মিচির করে জেগে ওঠে সেই ডাকে।

সেদিকে খেয়াল নেই কারও।

বীরসিংহের দৃষ্টি তীব্র হয়ে ওঠে। তার মনের সন্দেহ বিন্দুমাত্র অপসারিত হয় না। লৌহ কঠিন কণ্ঠে বলে—তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে ভীমসিংহ।

ভীমসিংহ ঘুরে দাঁড়ায়। চাঁদের আলোয় তার চোখের তারা চক্‌চক্ করে ওঠে। বলে,—কৈফিয়ৎ? তুমি কৈফিয়ৎ চাও। বীরসিংহ? ও হ্যাঁ, দেবো বৈকি। একজন রাজপুতকে হত্যা করেছি যখন, কৈফিয়ৎ

দিতে হবে বৈকি।

—চলো, দুর্গাদাসের কাছে।

এতক্ষণে ভীমের সিক্ত মুখে হাসি ফোটে। বলে,—এত রাতে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে লাভ নেই বীরসিংহ। যদিও জানি তুমি উপযুক্ত কথাই বলেছ। বাকি রাতটুকু আমায় বরং বন্দী করে রাখো।

ভীমের যুক্তি অস্বীকার করা যায় না।

—তোমার কোমরে ছোরা দেখছি।

—হ্যাঁ, জলে ধুয়ে না গেলে রক্ত দেখতে পেতে; মানুষের বুকের টাটকা রক্ত।

—ঘটনাটা খুলে বলো ভীম।

—বলেছি তো, শেষ করে দিয়ে এলাম একজনকে। কিছুদিন থেকে তার ওপর আমার সন্দেহ হয়। নজর রাখি, আলাপ জমাই। বুঝতে পারি, মাড়োয়ারের এই কুলাঙ্গার বাদশাহের হয়ে কাজ করছে। এখানকার গোপন খবর লোক মারফৎ বাদশাহের কাছে পাচার করে। কয়েকজন অচেনা ব্যক্তি কিছুদিন পর পর তার সঙ্গে দেখা করে। আজ ধরা পড়ে গেল হাতে-নাতে। সে পালাতে চেষ্টা করছিল। পিছু ধাওয়া করলাম। ইচ্ছে করলে সে আমাকে হত্যা করতে পারত, কারণ তার কাছে তলোয়ার ছিল। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের বোধহয় মনের বল বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাই আমি ধাওয়া করতেই সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মস্ত ভুল করে বসল সে। তবু জলের মধ্যেও বোধহয় আমাকে মেরে ফেলতে পারত। কিন্তু তার পোশাক ছিল অনেক ভারী। নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ডুবে যাবার ভয়। তবু কতকটা সাঁতরে গিয়েছিল।

—কে সে?

—তাকে কি চিনবে? এত সেনার মধ্যে তার নাম জানা সম্ভব নয়।

—তবু বলো শুনি।

—চেতন সিংহ।

বীরসিংহ চমকে ওঠে। তার সঙ্গেও কিছুদিন থেকে লোকটা ঘনিষ্ঠতা করছিল। বোধহয় কোনো অসতর্ক মুহূর্তে তার কাছ থেকে জেনে নিয়েছে কোনো খবর। আপশোষ হয়।

—তুমি ঠিক করেছ ভীম। সকালে ঘটনাটা আমিই বলব দুর্গাদাসকে। তুমি ক্লান্ত—বিশ্রাম করগে।

প্রহরীরা আরও সজাগ হয়। বীরসিংহ টহল দিয়ে বেড়ায়। রত্নার কাছে আর যাওয়া হয় না। চেতনসিংহের মতো আরও কতজন বিশ্বাসঘাতক রয়েছে কে জানে—রাতের অন্ধকারে সবার অলক্ষ্যে শিবির ছেড়ে দিল্লীর পথে যাবার সুযোগ খুঁজছে। এই বিশ্বাসঘাতকদের জাত নেই, দেশ নেই, বিবেক নেই—কিছু নেই। সে স্বচক্ষে দেখেছে কত মুঘল সৈন্য এসে দুর্গাদাসের সঙ্গে দেখা করে। ফিস্‌ফিস্ করে কত কথা বলে চলে যায়। সে আরও দেখেছে গিরিপথে যুদ্ধের সময় শত্রু সেনাদের অনেকে মহারাজা যশোবন্ত সিংহকে গোপন খবর বলে দিয়ে কৃতার্থ হয়েছে। ওদের দিকে চাইলে নাসিকা কুঞ্চিত হয়। ওদের কথা ভাবলে গা ঘিন্‌ঘিন্ করে।

দুর্গাদাসের মুখে সে শুনেছে গুপ্তচর নিয়োগের কলা কৌশল আওরঙ্গজেবের মতো আর কেউ জানে না ভারতবর্ষে। দুর্গাদাস মনে মনে আওরঙ্গজেবকে শ্রদ্ধা করে। শুধু যশোবন্ত সিংহের প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর প্রকৃতির মিল হলো না বলে এই সংঘর্ষের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে মাড়োয়ার।

দিল্লি আর দূরের পথ নয়। পঁচিশ দিন—বড় জোর একমাস।

সেই সরোবরের ধারে যেভাবে বিশ্রাম নিয়েছিল দলটি, তেমন বিশ্রাম আরও অনেকবার নিয়েছে। কালক্ষেপ করেছে দুর্গাদাস। তবু রাণীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়নি। সবাই ভেবেছিল পথের পরিশ্রমে নির্ধারিত সময়ের আগেই হয়তো সন্তান জন্মগ্রহণ করবে! তাদের প্রত্যাশা ভুল প্রমাণিত হলো। ঠিক

সময়ে দিল্লির কাছাকাছি এসে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো।

প্রতি সন্ধ্যাতেই শঙ্খধ্বনি শোনা যায় রাণীর শিবিরে। সবাই সে শব্দ শুনে কপালে হাত ঠেকায়। সেদিন তারা দেখল তাদের দলনেতা ব্যস্ত এবং চিন্তান্বিত মুখে দ্বিপ্রহরের আগেই সহসা যাত্রা স্থগিত রাখল। সৈন্যদের হুকুম দিল বিশ্রাম নিতে। তাড়াতাড়ি শিবির স্থাপিত হলো।

সন্ধ্যার অনেক আগেই সেদিন শাঁখ বেজে উঠল। প্রশ্নের উদয় হলো সাধারণ সৈনিকদের মনে—রাণী কি বিশেষ কোনো ব্রত উদ্‌যাপন করছেন? সম্ভবত তাই। নইলে অমসয়ে শিবির স্থাপন এবং শঙ্খধ্বনি হবে কেন?

এদিকে দুর্গাদাস রাণীর শিবির থেকে কিছুটা দূরে অস্থিরভাবে পদচারণা করছিল। সঙ্গে ছিল তার চন্দ্রভান, বরমল, রঘুনাথ ইত্যাদি। আজ বিধাতার রায় প্রকাশিত হবে। জানা যাবে, মাড়োয়ারের প্রতি তিনি মুখ তুলে চেয়েছেন কিনা। শুধু একটি পুত্র-সন্তান চাই। একটি শিশু—যাকে রাজা বলে ঘোষণা করা যাবে। তারপর বাকি সব দুর্গাদাস দেখবে। তার পার্শ্ববর্তী বীরদের দিকে শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে ভাবে, এরা যাঁর জন্যে রক্ত দিতে প্রস্তুত তাঁকে সহসা নাগালের মধ্যে পাওয়া দিল্লির বাদশাহের পক্ষেও সম্ভব নয়। হয়তো একেবারেই অসম্ভব।

কিন্তু অদূরবর্তী শিবিরে কি ঘটতে চলেছে কে জানে। মহারাণীর কাতরধ্বনি কর্ণগোচর হয়। লজ্জিত হয়ে পড়ে দুর্গাদাস। একটা অপরাধবোধ তাকে পীড়া দেয়। সে সবাইকে নিয়ে আরও কিছুটা দূরে সরে যায়। রমণীর এই পবিত্রতম মুহূর্তে তাঁর সমস্ত গোপনীয়তা অটুট থাকাই বাঞ্ছনীয়।

সেই সময় শঙ্খধ্বনি।

দুর্গাদাসের পদচারণা স্তব্ধ হয়ে যায়। অন্যান্য দলনেতারাও দুর্গাদাসের পাশে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়েও যাদের বুক কাঁপে না, সেই সন্ধিক্ষণে তাদের বুক ধক্‌ধক্ করে কাঁপতে থাকে। ওরা চেয়ে থাকে শিবিরের দিকে। কিন্তু কেউ বাইরে আসে না। অনেকেই রয়েছে সেখানে। সেনাপতি গোবিন্দের স্ত্রী রয়েছে এবং ভগিনী রয়েছে, ধ্রুব সিংহের মা রয়েছে। অথচ সবাই যেন স্থবির।

দুর্গাদাস চেঁচিয়ে ওঠে,—কী করছে ওরা! বাইরে আসতে পারছে না কেউ! খবরটা জানাতে পারছে না?

চন্দ্রভান ঘোরতম বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে বলে,—একেই বলে স্ত্রী জাত। ছেলে হয়েছে দেখে নিজেরাই আনন্দে পাগল হয়ে হৈ চৈ করছে। আমাদের কথা ভুলে বসে আছে। কিংবা—কিংবা মেয়ে হয়েছে দেখে ভয়ে এদিকে এসে জানাতে সাহস পাচ্ছে না হয়তো। যেন ওদেরই মস্ত অপরাধ। স্ত্রীলোক আর কাকে বলে?

বীরসিংহ খুব আস্তে বলে,—শাঁখ বাজানো উচিত হয়নি।

সবার দৃষ্টি একসঙ্গে তার দিকে পড়ে। দুর্গাদাস বলে,—হুঁ, কথাটা ঠিক বলেছো। এত ঢাক পেটাবার দরকার ছিল না। আমারই ভুল হয়েছে। নির্দেশটা ভালোভাবে জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

সেই সময় ওরা দেখতে পায় মহারাণীর পরিচারিকা মাথায় ওড়না দিয়ে ধীরে ধীরে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এতক্ষণে ব্যগ্র প্রতীক্ষার অবসান হবে।

ওরা সংবাদের কথাই ভাবে। কিন্তু বীরসিংহের মনে আর এক চিন্তা। রত্নাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে। চলবার ভঙ্গী কী চমৎকার। রাণীর শিবিরে মহিলাদের মধ্যে রত্নাই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমতী। তাই আর কারও মনে না থাকুক, তার ঠিক মনে রয়েছে, বাইরে প্রতীক্ষারত রাঠোর বীরগণের কথা, যাদের কাছে সংবাদটি সর্বাগ্রে পৌঁছানো উচিত—সুখের সংবাদ হোক বা না হোক।

রত্না দুর্গাদাসের সামনে এসে দাঁড়ায়। বীরসিংহ লক্ষ্য করে, তার দিকে ভুলেও একবার দৃষ্টি ফেলে না। বুকের ভেতরটা টন্‌টন্ করে উঠলেও মনে মনে ওর সংযম ও কর্তব্যবোধের প্রশংসা না করে পারে না।

—কী সংবাদ।

মুখে মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে পড়ে রত্নার। সুমধুর অথচ সংযত কণ্ঠে বলে,—আজ রাতে আকাশে চাঁদ উঠবে না। সেই চাঁদ ঝরে পড়েছে রাণীর কোলে।

—সত্যি?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু মেয়ে না ছেলে!

সবার দৃষ্টি রত্নার মুখের দিকে। ওর কথার ওপর মাড়োয়ারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সুতোয় ঝুলছে সেই ভবিষ্যৎ।

—আমি হাসছি কাকাবাবু। মেয়ে হলে কি হাসতাম?

বীরেরা একসঙ্গে জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে। সৈন্যেরা সেই জয়ধ্বনি শুনে সব কাজ ফেলে রেখে ছুটে এসে জড়ো হতে থাকে।

বীরসিংহ ধীর কণ্ঠে বলে,—জয়ধ্বনি না দিলেই ভালো হতো।

দুর্গাদাস চারদিকে সচকিতে চেয়ে বলে,—ঠিক। আমারই ভুল।

রত্না এতক্ষণে বীরসিংহের দিকে অপাঙ্গে চেয়েই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। সেই মুহূর্তটুকুতেই তার কপোল রাঙা হয়ে ওঠে। সে বলে, —এ সংবাদ কখনো চাপা থাকে না। কথাটা আমিও চিন্তা করেছিলাম। শেষে নিরর্থক ভেবে শাঁখ বাজাই। রাজপুত্রের জন্মক্ষণে শাঁখ বাজবে না?

বরমল বলে ওঠে,—তাঁর জন্মলগ্নে জয়ধ্বনি হবে না?

অন্যান্য বীরেরা বলে,—ঠিক ঠিক।

এবারে তারা আরও জোরে চিৎকার করে ওঠে। দূরের সৈন্যরা বুঝে না বুঝে জয়ধ্বনি দেয়। তারপর নিকটে এসে সব জেনেশুনে নাচতে শুরু করে।

বীরসিংহ হাল-চাল দেখে শুনে গম্ভীর কণ্ঠে বলে—তাহলে আমারই হয়তো ভুল। সবাই যখন বলছে ঠিক।

রত্না ওড়নার প্রান্ত দিয়ে নিজের মুখ চেপে ধরে হাসি সামলাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে দ্রুতপদে ফিরতে থাকে শিবিরের দিকে।

সে রাতে প্রহরীর সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেলেও সৌভাগ্যক্রমে বীরসিংহ রত্নার সঙ্গে মিলিত হবার উপযুক্ত নির্জন স্থান খুঁজে পেল। রত্নাকে একটা নতুন খবর জানাবার ছিল। দুর্গাদাসকে বীরসিংহ সুনিপুণ যোদ্ধা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ হিসাবে শ্রদ্ধা করত। কিন্তু জানত না, কতখানি দূরদর্শী সে। কিছুদিন আগে সেনাবাহিনীর একজনের স্ত্রী সন্তান প্রসবের ঠিক পরেই মৃত্যু হয়। দুর্গাদাস সেই সৈনিকের কাছে গিয়ে বলে,—তোমার পুত্রটিকে আমায় দান কর।

স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত ব্যক্তিটি শিশুসন্তান নিয়ে মহা দুর্ভাবনায় পড়েছিল। দলনেতার প্রার্থনায় কৃতার্থ হয়ে বলল,—আমার পরম সৌভাগ্য যে একজন নগণ্য সৈনিকের পুত্রকে আপনি অযাচিতভাবে গ্রহণ করছেন।

—কিন্তু তোমার যেন কোনোরকম আশা না থাকে যে একে আমি পুত্র হিসাবে গ্রহণ করছি।

—আপনার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না সর্দার।

—দেশের মঙ্গলের জন্য একে যদি আমি উৎসর্গ করি তাহলে তোমার আপত্তি আছে?

সৈনিকটির সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে। অস্ফুট স্বরে বলে,—একে আপনি বলি দেবেন?

—যে অর্থে তুমি 'বলি' কথাটা ব্যবহার করছ, সে অর্থে না হলেও 'বলি' বৈকি। তুমি কি দেশের জন্যে নিজেকে বলি দিতে চাও না?

—চাই সর্দার।

—তবে? আমি কাপালিক নই। কাপালিকের আচরণেও আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু 'বলি' কথাটাকে আমি বিশ্বাস করি। তোমার ছেলেকে আমি দেশের জন্যে 'বলি' হিসাবেই নিলাম। হয়তো, ওকে প্রয়োজন নাও হতে পারে। যদি না হয়, তবে কথা দিচ্ছি আমি আমার নিজের পুত্রের মতন ওকে গড়ে তুলব। সত্যি কথা বলতে কি এই শিশুর বয়সী আমার কোনো পুত্র থাকলে, এভাবে তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতাম না।

সৈনিক পুরুষটি লজ্জিত কণ্ঠে বলে—আমি জানি সর্দার। ওকে আপনি গ্রহণ করুন। আমি জানি ওকে আপনি ক্ষুদ্র স্বার্থে ব্যবহার করবেন না।

—তুমি তো দেশপ্রেমিক। তাই আর একটা নির্মম সত্য জেনে রাখো। দেশের স্বার্থে একদিন একে হয়তো ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে হতে পারে।

সৈনিকটি দাঁতে দাঁত চেপে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর সহসা ছুটে গিয়ে তার পুত্রটিকে তুলে এনে দুর্গাদাসের হাতে সমর্পণ করে বলে,—দেশের চাইতে বড় কিছুই নেই আমার কাছে। থাকলে আমার স্ত্রীর এই স্মৃতিটুকুকে কখনোই দিতাম না আপনাকে। তাছাড়া ধর্মের কথা বলছেন? শৈশব থেকে যে যেই ধর্মের আবেষ্টনীতে মানুষ হয়, সেই ধর্ম তার কাছে শ্রেষ্ঠ। আমি জানি সবই এক।

সৈনিকের চোখ শুকনো। দুর্গাদাসের চক্ষুদ্বয় কিন্তু অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। তার পাশে দণ্ডায়মান বীরসিংহ নিজেকে শক্ত রাখতে পারেনি।

মাত্র কয়েকদিন আগের এই ঘটনাটি। বীরসিংহ বুঝতে পারছে, দুর্গাদাস কোনো গভীর কৌশল অবলম্বন করতে চলেছে। আজ রত্নাকে কথাটা বলতে হবে।

রত্না বসেছিল নির্দিষ্ট স্থানটিতেই। বীরসিংহের স্পর্শে সে কিন্তু বিগলিত হলো না। তার মুখেও হাসি ফুটে উঠল না।

—সম্রাজ্ঞী আজ এত গম্ভীর যে! এতদিন থাকতে, এই বিশেষ দিনটিতে? যেদিন সমস্ত বাহিনী আনন্দে মাতোয়ারা!

রত্না তবুও অনড়।

বীরসিংহ তার পাশে বসে দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে বলে,—ইস্, কী সুন্দর দেখতে যে লাগছিল তোমায়, যখন তুমি রাজার জন্মের সংবাদটি দিতে গেলে। ইচ্ছে হচ্ছিল; তখুনি সবার সামনে—

বীরসিংহ তবু কোনোরকম সাড়া না পেয়ে রত্নার মুখখানা দু'হাতে তুলে ধরে। ধরেই বুঝতে পারে সে কাঁদছে।

—কাঁদছ?

অতি কষ্টে রত্না বলে,—হ্যাঁ। আজকের দিনেও কাঁদছি। আমি নারী। তাই বোধহয় নিজের স্বার্থটা বড় হয়ে ওঠে।

—এমন কী হয়েছে যে এতটা উতলা হলে?

—তোমাকে আমি অনেকবার বলেছি যে আমাদের মিলন সম্ভব না। ঈশ্বর চান না যে আমরা দু'জনে সুখে ঘর করি। তিনি চান না, তোমার সন্তানের জননী হয়ে, তাদের মানুষ করে তুলে পরম তৃপ্তি পাই।

—তোমায় তো বলেছি রত্না, স্বপ্ন—স্বপ্নই। কচিৎ কখনো দু' একটা সত্যি হয়ে যায়। অনেক অবাস্তব কল্পনাও তেমনি কত সময় সত্যি হতে দেখা গিয়েছে।

রত্না ভাঙা গলায় বলে,—এবারে আর স্বপ্ন নয়।

—তার মানে?

—আজ রাতে কাকাবাবু আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

—তোমাকে? ও রাজার দেখাশোনার ভার তোমায় দিতে বুঝি? তাই ভয় পেয়েছ। ভাবছ বুঝি,

সারা জীবন সে ভার বইতে হবে? এ তো সৌভাগ্য। এর জন্যে আমাদের মিলনের বাধা কোথায়? মহারাণী তো তোমায় স্নেহ করেন।

বীরসিংহ ভেবেছিল, অনেক কথা একসঙ্গে বলে রত্নার সমস্ত দুশ্চিন্তা ভাসিয়ে দিয়ে এই মুহূর্তের মিলনকে মধুর করে তুলবে। কিন্তু তার কথা রত্নার মনে এতটুকু রেখাপাত করতে পারল না।

বীরসিংহ ভেবেছিল, অনেক কথা একসঙ্গে বলে রত্নার সমস্ত দুশ্চিন্তা ভাসিয়ে দিয়ে এই মুহূর্তের মিলনকে মধুর করে তুলবে কিন্তু তার কথা রত্নার মনে এতটুকু রেখাপাত করতে পারল না।

বীরসিংহ চুপ করলে সে বলল—তা নয়গো। রাজপুত্র নয়। অন্য একটি ভার।

—ও, এবারে বুঝেছি। সেই শিশুটি—।

—তুমি জানো?

—জানি বৈকি। আমিও তো গিয়েছিলাম দুর্গাদাসের সঙ্গে তাকে আনতে। আহা, বেচারা মাতৃহারা! তোমার যত্নে যদি বেঁচে যায়। দুর্গাদাসের হাবভাবে মনে হয় তাকে বাঁচানো খুবই প্রয়োজন।

রত্না উত্তেজিত হয়ে বলে,—হ্যাঁ, প্রয়োজন। এত বেশি প্রয়োজন যে তার একজন মায়ের দরকার। সত্যিকারের মা—যে মা বরাবর তার সঙ্গে থাকবে। সেই মা হবো আমি।

বীরসিংহ হেসে বলে,—বাঃ সুন্দর। বেশ তো তোমার সঙ্গে ওটিকে ঘরে নিতেও আমার আপত্তি নেই।

—তুমি হাসছ, কারণ এখনো সবটা শোনোনি। কাকাবাবু আমায় যা বলেছেন আর কেউ তা' জানে না। তুমি নিশ্চয় জানতে পাবে তাঁর কাছ থেকে, তাই তোমায় বলছি। নইলে জিনিসটা এত গোপনীয় যে এই গাছের নীচেও মুখ খোলা নিরাপদ নয়।

কথাটা শুনে বীরসিংহ একবার গাছের প্রতিটি ডাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যাচাই করে নেয়। বলা যায় না, গুপ্তচরের গতি সর্বত্র। সেই সরোবরে ভীম সিংহ যাকে শেষ করে দিয়ে এসেছিল, তেমন আরও কত রয়েছে কে জানে। রাজার জন্মের খবর হয়তো দিল্লির পথে এতক্ষণ অনেকটা দূর এগিয়ে গিয়েছে।

—বলো রত্না, সবটা বলো। আমি অধৈর্য হয়ে উঠেছি।

—আমি মহারাণী, আর ওই শিশুটি হলো মহারাজা যশোবন্ত সিংহের পুত্র।

—সে কি! বলছ কি তুমি!

—হ্যাঁ। আসল রাজপুত্রের নিরাপত্তার জন্য এই ব্যবস্থা। কাল থেকে মহারাণীর চেয়েও আমার বেশভূষা মূল্যবান হবে।

তবু সবটা বোধগম্য হয় না বীরসিংহের। সে এ সম্বন্ধে তলিয়ে ভাবতে চেষ্টা করেনি। যুদ্ধ করাটাই তার পেশা, আর রত্নাকে ভালোবাসা তার নেশা। এই দুই পেশা আর নেশা নিয়ে জীবন কাটাতে পারলে সে সবচেয়ে সুখী হবে। চিন্তা করতে সেও পারে। কিন্তু দুর্গাদাস থাকতে চিন্তা করবার প্রয়োজন হয় না। সব চিন্তার সূত্রপাত ওই একটি মস্তিষ্কে। তাছাড়া দুর্গাদাসের কঠোর আদেশ কেউ যেন চিন্তা না করে। কাজ—শুধু কাজ।

—আমি এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না রত্না। বুঝিয়ে বলো।

—কাকাবাবু আশঙ্কা করছেন, রাজপুত্রের ওপর আক্রমণ হতে পারে। তেমন কিছু সত্যিই ঘটলে নকল রাজপুত্রই যেন ফলভোগ করে এবং সেই সঙ্গে তার মা। আর আসল রাজমাতা এবং রাজা সেই সুযোগে বহুদূরে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে পারবেন।

—বুঝেছি। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু তবু কাঁদবার কী রয়েছে জানি না। তেমন কিছু ঘটবার সম্ভাবনা আদৌ আছে কিনা তাই বা কে জানে।

—কাকাবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস এমন ঘটনা ঘটবেই। তাই তিনি আমাকে এই বলে প্রস্তুত থাকতে বলেছেন যে বন্দিনী অবস্থায় বাদশাহী হারেমেও সারাটা জীবন কাটাতে হতে পারে। উঃ! তুমি তখন কত দূরে। ভাবতে পারি না। হয়তো জীবিত থেকেও তোমার কাছে আমি রইব মৃত।

রত্না কেঁদে ফেলে বলে, তার চাইতে ওরা যখন আক্রমণ করবে তখনি যদি আমার মৃত্যু হয়, খুব ভাল হবে। সবাই ভাববে মহারাণীর মৃত্যু হয়েছে।

—তুমি বড্ড বেশি ভেবে ফেলেছ রত্না। সম্ভাবনার কথাই শুধু বলা হয়েছে। আসলে তো নাও হতে পারে।

—দেখে নিও, ঠিক হবে। আমার মন ডেকে বলছে। আমি দেখতে পাচ্ছি রক্তাক্ত তরবারি। আমি দেখতে পাচ্ছি মুঘল হারেমের দৃশ্য। আমায় তুমি এখনই মেরে ফেলো।

বীরসিংহ গম্ভীর স্বরে বলে,—ফেলতাম হয়তো। কিন্তু কর্তব্য? তুমি কর্তব্য দেখে ভয় পাও রত্না?

—না। আমায় ভুল বুঝো না। আমি জানি বীর দুর্গাদাসের আমার ওপর কতখানি বিশ্বাস, যার ফলে এই কঠিন কর্তব্যভার আমার ওপর অর্পণ করেছেন। মুঘলদের আওতায় পড়ে ওদের অমানুষিক অত্যাচারের মুখেও আমি সত্য গোপন রাখব এ কথা বিশ্বাস করেই তিনি আমার ওপর নির্ভর করেছেন। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবতী বলে মনে করি। কিন্তু যখনই তোমার কথা মনে পড়ে—

রত্না ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

বীরসিংহ তাকে চেপে ধরে রাখে। সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পায় না। তার নিজের বুকের ভেতরও একটা অব্যক্ত ব্যথা ঠেলে উঠছে।

দূরের কোনো গাছে রাতের শিকারী পাখি ডেকে ওঠে। বিকট শব্দে নিস্তব্ধতা খান্ খান্ হয়ে ভেঙে যায়।

ওরা এগিয়ে চলে। দিল্লি ক্রমশঃ নিকটবর্তী হচ্ছে। বিপদও ততই ঘনীভূত হচ্ছে। কারণ সমস্ত কিছু জেনেশুনে বাদশাহের কব্জার মধ্যে গিয়ে পড়েছে ওরা। পরিত্রাণের দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

মহুয়া বনের ধারে ওদের শিবির পড়ে। মহুয়া ফুলের মাতাল গন্ধে যেন চারদিক আমোদিত।

দুর্গাদাস হাসতে হাসতে সবাইকে বলে,—দেখো, নেশা করে তোমরা বুঁদ হয়ে থেকো না। এখন চারদিকে শুধু শত্রুচর।

পরিহাসচ্ছলে সে কথাটা বললেও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে কারও অসুবিধা হলো না। ফলে মহুয়া-আসক্ত ব্যক্তিরাও মনে মনে সংযত হলো।

রাত্রিতে যথারীতি বীরসিংহ পাহারায় নিযুক্ত হলো। রাণীমায়ের শিবির শ্রেণীর দিকে সে লক্ষ্য রাখছিল। অন্যদিকে রয়েছে মাধব, ভীমসিংহ ও আরও অনেকে।

এ-রাতে রত্নার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। দুর্গাদাস সাবধান করে দিয়েছেন, ভালুকের আবির্ভাবের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। মহুয়ার গন্ধে ওরা পাগল হয়। সেই সময় কোনোরকম বাধা বিপত্তি ঘটলে হিংস্র হয়ে ওঠে।

সুতরাং রত্নার শিবিরে অবস্থানই শ্রেয়। তবু বীরসিংহ বারবার সেদিকটা টহল দেয়। বলা যায় না, যদি কোনো কারণে রত্নার প্রয়োজন হয়। শিশুপুত্র নিয়ে রাণীমা একা রয়েছেন। রত্না ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ নেই তাঁকে দেখবার। যদিও সে এখন থেকেই মূল্যবান পোশাক পরে দিবালোকে মহারাণীর মহড়া দিচ্ছে রাতের বেলায় এখনো সে রাণীমার একনিষ্ঠ সেবিকা। কারণ আসল রাজপুত্র তারই হেফাজতে—যে রাজপুত্রকে জীবিত রাখতে পারলে মাড়োয়ারের স্বপ্ন সার্থক হয়ে উঠতে পারে ভবিষ্যতের কোনো একদিনে।

শিশুর ক্রন্দন রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে।

বীরসিংহ তড়িৎ-পদে শিবিরের কাছে এসে দাঁড়ায়।

এ কোন শিশুর কান্না? সেই অতি সাধারণ রাজপুত সৈনিকের মাতৃহারা সন্তান? অথবা অতি অসাধারণ পিতৃহারা পুত্রসন্তান? ক্রন্দন শুনে জানা মুশকিল। বিধাতা সবাইকে একইভাবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। কে রাজা আর কে প্রজা সেটা তার নিয়তি। রাজগৃহে জন্মালে রাজা হবার সম্ভাবনা প্রচুর।

কিন্তু না-ও হতে পারে। আবার দরিদ্রের সংসারে জন্ম নিয়েও মস্তকে রাজমুকুট ধারণের সৌভাগ্য হতে পারে কারও।

দুই শিশু এখন রয়েছে একই শিবিরে। মাঝখানে হয়তো শুধু পর্দার ব্যবধান। কার ভাগ্যে কি রয়েছে কেউ কি বলতে পারে এখন? ওই মাতৃহারা শিশুটি হয়তো যশোবন্ত সিংহের পুত্র হিসাবে মুঘল হারেমে যথেষ্ট সমাদরের সঙ্গে দিন কাটাবে। আবার ওই যে শিশুপুত্র, যার নাম ঠিক হয়েছে অজিত সিংহ, সে হয়তো—। না না। কিছুতেই না। তাকে দেশে ফিরিয়ে নিতেই হবে।

ধপ্।

একটা সন্দেহজনক শব্দ। শিবিরের ঠিক বিপরীত দিকে মনে হলো।

বীরসিংহ ছুটে অন্যদিকে যায়। একটি ছায়া মূর্তি চোরের মতো এগিয়ে আসছে অন্ধকারে। ভালুক? না। যদিও ভালুকের মতোই গুটিগুটি আসছে। কিন্তু ভালুকের পায়ের শব্দ হয় না। কেউ নিশ্চয় পাশের মহুয়া গাছে আত্মগোপন করে বসেছিল। রাত গভীর হতেই কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ হাসিল করতে আসছে।

আততায়ী! শিশুপুত্রকে হত্যা করতে আসছে? বীরসিংহের শরীরের শিরা উপশিরার রক্ত দ্রুত চলতে থাকে। সে নিজেকে যথাসম্ভব লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে।

লোকটি আরও এগিয়ে আসছে। দু'পা এগিয়ে থেমে থেমে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আবার দু'পা আসছে।

বীরসিংহ ধীরে ধীরে কোষ থেকে তলোয়ার বের করে অপেক্ষা করতে থাকে।

লোকটি শিবিরের একেবারে পাশে এসে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

শিশুটি তখনো ফুঁপিয়ে চলেছে। খুব নীচু কণ্ঠে কে যেন তাকে শান্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত। রত্না নিশ্চয়ই। তবে কণ্ঠস্বর চেনার উপায় নেই। খুবই চাপা। এই সময় অধিকাংশ নারীর গলা একই রকম মনে হয়।

লোকটির কোমরে কোনো অস্ত্র নেই। বীরসিংহ নিশ্চিন্ত হয়। কারণ তলোয়ার থাকলে এখনই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হতো।

লোকটি আরও একটু এগিয়ে শিবিরের গায়ে কান লাগিয়ে শোনে। শিশুর কান্না থেমে গিয়েছে। নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে যে তাকে শান্ত করতে ব্যস্ত ছিল, সেও ঘুমিয়ে পড়েছে।

আশ্চর্য! আজই এখানে এসে তারা পৌঁছেছে, অথচ এরই ভেতরে শত্রুপক্ষ জেনে ফেলেছে কোন শিবিরে মহারাজ যশোবন্ত সিংহের একমাত্র জীবিত পুত্র রয়েছে। ভীমসিংহ ঠিকই বলেছিল। চেতন সিংহের মতো আরও কিছু নিমকহারাম রাজপুতদের ভেতরে রয়েছে যারা গুপ্ত সংবাদ শত্রুপক্ষকে নিয়মিতভাবে পাচার করে চলেছে। একবার তাদের মুখোশ খুলতে পারলে শাস্তি দেওয়া যেত।

লোকটি হঠাৎ আস্তিনের ভেতর থেকে একটি ছুরিকা বের করে শিবির কাটতে শুরু করে।

এক মুহূর্তও দেরি না করে বীরসিংহ ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। লোকটি অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় দু'হাত পিছিয়ে যায়। বীরসিংহ তলোয়ার চালায়। বুঝতে পারে লোকটির বাঁ হাতের কয়েকটি আঙুল কেটে মাটিতে পড়ল।

কিন্তু সেই একই সময়ে ডান হাতে সে একটি ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র বের করে বীরসিংহকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে।

বারুদের শব্দ হয়। অস্ফুট আর্তনাদ হয় বীরসিংহের মুখ দিয়ে।

লোকটি চোখের পলকে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

শিবিরের ভেতর থেকে রত্না ছুটে বেরিয়ে আসে। অন্ধকারেও বীরসিংহকে চিনতে তার এতটুকুও ভুল হয় না।

ছুটে কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় আকুল হয়।

—চুপ চুপ রত্না। আমি মরিনি।

যেন জাদু স্পর্শে মূক হয়ে যায় রত্না।

—আমি আহত হয়েছি। সরে যাও, কেউ দেখে ফেলবে। শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে যেতে পারে কারও।

রত্না সরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে,—কোথায় লেগেছে তোমার?

—কাঁধে। অল্প। হাত থেকে তলোয়ারটা খসে গেল।

সেই সময় দূরে আবার আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে ওঠে। বীরসিংহ বাঁ হাতে কাঁধ চেপে ধরে উঠে দাঁড়ায়। তারপর রত্নার অবরোধকে অস্বীকার করে সেদিকে ছুটতে থাকে।

আরও কিছু রাজপুত ছুটে চলে সেদিকে। এবারে অনেকের ঘুম ভেঙেছে।

বীরসিংহ কাছে গিয়ে দেখতে পায়, একজন নয়, দু'জন পড়ে রয়েছে ভূতলে। সে আততীয়কে চিনতে পারে। বাঁ হাতের একটি আঙুলও নেই। তারই তলোয়ারের আঘাতে শিবিরের পাশে ফেলে রেখে এসেছে। কিন্তু এবারে নিজেকেই ফেলে রাখতে হয়েছে। এবারে তলোয়ারের আঘাত পড়ছে তার মস্তকে।

অপর ব্যক্তি ছট্‌ফট্‌ করছে। আততায়ীর হত্যাকারী। নিজেও বীরসিংহের মতো আহত আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে। আরও মারাত্মকভাবে আহত মনে হচ্ছে।

বীরসিংহ তার কাছে যায়। সে দেখে ভীমসিংহ আহত।

—ভীম?

—কে? বীর?

—হ্যাঁ ভাই।

—ও মরেছে?

—হ্যাঁ। রাজপুত্রকে হত্যা করতে এসেছিল।

—আরও আসবে। সাবধান বীরসিংহ।

বীরসিংহ ভীমের ওপর ঝুঁকে পড়ে। ভীম হাত দিয়ে তার নিজের বুক চেপে ধরে রেখেছিল।

—আমাকে ধরে উঠতে পারবে ভীম?

—নাঃ আর আমি কোনোদিন উঠব না বীর। গুলি আমার বুকে লেগেছে।

কথাটা শুনেই দু'জন রাজপুত ছুটে যায় শিবিরের দিকে। দুর্গাদাসকে ডেকে আনতে হবে। বাতি আনতে হবে।

—বীরসিংহ, আমি চলি ভাই। বড় দুঃখ রইল, সবটা দেখে যেতে পারলাম না। শেষে এক গুপ্তঘাতকের—

—লজ্জা নেই ভাই। আমিও মরতে পারতাম। গুলি আমার বুকে না গেলে কাঁধ ছুঁয়ে চলে গিয়েছে। তবে একটা কথা বলতে পারি, এই গুপ্তঘাতক সাধারণ মানুষ নয়। তার ক্ষিপ্রতা অসাধারণ।

—আমিও দেখেছি।

কথা বলতে বলতে ভীমসিংহ যেন ঘুমিয়ে পড়ল ধীরে ধীরে। একবার যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদও করল না। অথচ সে অসহ্য বেদনা অনুভব করছিল। তার হৃদপিণ্ড ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে আসছিল। ভেতরে রক্তক্ষরণের ফলে কথা বলার সময় তার গলা দিয়ে অদ্ভুত এক ঘর্‌ঘর্‌ আওয়াজ বার করছিল। তবু সে থামেনি। একবারও বলেনি তাকে সাহায্য করতে।

চেতন সিংহকে জলের ভেতরে হত্যা করে পাড়ে উঠেও সে কোনোরকম চাঞ্চল্য প্রকাশ করেনি। এবারও করল না। সেবারে সে ছিল বিজয়ী। এবারেও বিজয়ী। সে দেখে গেল শত্রু তার হাতে নিহত। সেই পরিতৃপ্তিতে সে ধীরে ধীরে চিরনিদ্রার কোলে ঢলে পড়ল।

দুর্গাদাস এসে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ভীমসিংহের দিকে। বাতির আলোয় তার চোখ দুটো একটু চিক্‌চিক্‌ করে উঠল। তারপর নতজানু হয়ে সে ভীমসিংহের কপালে চুম্বন রেখা এঁকে দিল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুর্গাদাস বলে,—রাজপুতরা তো সবাই যোদ্ধা, সবাই বলতে গেলে বীর। কিন্তু ভীমসিংহের ভেতরে আমি যা দেখেছি তাতে মাঝে মাঝে চমকে উঠতে হয়েছে। আমি যে অভিজ্ঞতা এতদিনে সঞ্চয় করেছি সেই অভিজ্ঞতা শুধু ওর ছিল না। থাকলে ওর ওপর নিশ্চিন্তে সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে আমি ওর অনুগত সৈনিক হয়ে কাজ করতে পারলে গর্ব অনুভব করতে পারতাম।

রাজপুতরাও কাঁদে। দুর্গাদাস থামলে সবাই কেঁদে ফেলল। এতবড় কথা একজন সৈনিক সম্বন্ধে কোনো সেনাপতিকে বলতে শোনা যায়নি।

বীরসিংহ মনে মনে ভাবে, সে অন্তত ভীমসিংহকে ঠিকই চিনেছিল।

সেই রাতেই চিতা প্রজ্জ্বলিত করা হলো। ভীমসিংহের দেহ ভস্মীভূত হলো। পৃথিবীতে তাকে আর সশরীরে কখনো দেখা যাবে না। দুর্গাদাস সম্ভবত আগের মতো অতটা নিশ্চিন্তে রাত্রিতে নিদ্রা যেতে পারবে না।

এখন রয়েছে শুধু বীরসিংহ। ভীমসিংহের চেয়েও বয়সে ছোট। সুতরাং অভিজ্ঞতা আরও কম। তবে বীরসিংহ এটাই বুঝল যে রত্নার আকর্ষণে নয়, রাজপুতকে রক্ষা করার তাগিদেই এবার থেকে তাকে রাণীমার শিবিরের পাশে রাতের পর রাত বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হবে।

অবশেষে দিল্লি।

দিল্লি তাদের অপরিচিত নয়। তবু এ-দিল্লি সে-দিল্লি নয়। এ দিল্লিতে মহারাজ যশোবন্তের অস্তিত্ব নেই। তাই মুঘল রাজধানীর প্রতি বিন্দুমাত্র মোহ আর তাদের অবশিষ্ট নেই।

রাজধানী যত নিকটবর্তী হচ্ছিল, দুর্গাদাসের দৃষ্টি ততই তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠছিল। দিল্লিতে এসে সেই দৃষ্টি আরও সজাগ। দু-চোখে এক লহমায় সে অনেক কিছু দেখে নিচ্ছিল। চন্দ্রভান, যোধসিং এবং বরমল প্রমুখকে ডেকে বলে,—খুব সাবধান। শত্রুপুরী এটা।

—জানি। আমরা প্রতি মুহূর্ত প্রস্তুত দুর্গাদাস।

মহারাজ যশোবন্তের পুরোনো অট্টালিকার সামনে এসে তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়। প্রাসাদ অন্যের অধিকারে। কোনো আমীর সে প্রাসাদে বসবাস শুরু করেছে।

দুর্গাদাসের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

সেই প্রাসাদের সামনে বাদশাহের একজন লোক দাঁড়িয়েছিল। সে দুর্গাদাসের কাছে এসে বিনীতভাবে বলে,—বাদশাহ মহারাণী এবং তাঁর শিশুপুত্রকে নিজ প্রাসাদে বসবাস করবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

দুর্গাদাসের মাথায় রক্ত ওঠে। আওরঙ্গজেবের মতলব রাজধানীর ভূমিতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়। উঃ কি চতুর এই বাদশাহ। এই সঙ্গে অন্যান্য বাদশাহদের মতো রাজপুতদের প্রতি যদি সমবেদনা থাকত কত কিছু হতে পারত। মৃদু স্বরে সে লোকটিকে বলে,—তা সম্ভব নয়। মহারাণী হিন্দু রমণী। তাঁর পুজো-অর্চনা, ব্রত-তর্পণ ইত্যাদি অনেক কিছুই রয়েছে যা বাদশাহী প্রাসাদে সম্ভব হয়ে উঠবে না।

লোকটি মৃদু হেসে বলে,—বাদশাহ বিবেকবান। এমন হতে পারে তিনি দূরদৃষ্টি দ্বারা সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে তিনি অন্য একটি ক্ষুদ্র অট্টালিকাও খালি রেখেছেন। আপনারা আমার সঙ্গে চলুন।

দুর্গাদাস বীরসিংহকে কাছে ডাকে। খুবই গোপনে বলে,—তুমি আর শঙ্কর সিংহ সৈন্য দিয়ে সবার অলক্ষ্যে ব্যূহ রচনা কর রত্নার শকটকে ঘিরে। প্রতিটি মানুষের দৃষ্টি যেন সেদিকে আকৃষ্ট হয়। মহারাণীকে অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে অরক্ষিত রাখো। আমি জানি না কোথায় চলেছি আমরা। হয়তো মৃত্যুর গহ্বরে।

বীরসিংহ সরে যায় দুর্গাদাসের পাশ থেকে। সে খুব তৎপরতার সঙ্গে ব্যূহ তৈরি করে। রত্না পর্দার আড়াল থেকে বীরসিংহকে দেখে। সে তাকে ঘিরে রাজপুত সৈন্যদলকেও দেখতে পায়। বুঝতে পারে আসল অভিনয় শুরু হয়ে গেল নকল রাণী আর রাজপুত্রকে কেন্দ্র করে।

এগিয়ে চলে মাড়োয়ার বাহিনী।

লোকটি বলে,—বাড়িটা ক্ষুদ্র। এত লোকের স্থান হবে না। ওদের রাজপুত সেনানিবাসে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

দুর্গাদাস বলে,—দেবো! এখন পাঠিয়ে দিলে মহারাণীকে অসম্মান করা হবে। তাকে পৌঁছে দেবার পর, তাঁর অনুমতি নিয়ে ওদের পাঠিয়ে দেবো।

একটা বাড়ির সামনে এসে লোকটি থামে। দুর্গাদাসের দৃষ্টি নিমেষে চারদিকটা পর্যবেক্ষণ করে নেয়। না, আক্রমণের কোনো আয়োজন নেই। এমনকি অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনাও কম। কারণ বাড়িটির চারদিকে ফাঁকা। হয়তো বাদশা ভেবে নিশ্চিন্ত আছেন যে সামান্য কয়েকজন রাঠোরকে দিল্লির ভেতরে শায়েস্তা করতে বেগ পেতে হবে না।

রত্নার শকট বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে। অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে মহারাণীও প্রবেশ করে। বীরসিংহ দূর থেকে রত্নাকে দেখে ভাবে, রাণীর বেশে রাণীর মতোই মানিয়েছে তাকে। রাণী হবার জন্যই জন্ম তার এই পৃথিবীতে। বহু ভাগ্যগুণে সে রত্নার সঙ্গে মিশতে পেরেছিল। আর হয়তো পাবে না। তার সঙ্গে দেখা হবে কিনা কে বলতে পারে? দিল্লির চরিত্র বড় দুর্বোধ্য। এখানে সব কিছুরই দ্রুত পরিবর্তন হয়। আজকের রাণীবেশী রত্না আগামীকাল সত্যিই রাণী হবে কিনা কেউ বলতে পারে না। যদি সত্যিই তা হয় তবে কি রত্না তাকে ভুলে যাবে? বীরসিংহ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

কিংবা রত্না যা আশঙ্কা করেছে, তাই যদি সত্য হয়? যদি তাকে জোর করে হারেমে নিয়ে যাওয়া হয়? বাদশা অথবা বাদসাজাদার লালসার আগুনে যদি তাকে আহুতি দেওয়া হয়?

ভাবতে পারে না বীরসিংহ। কারণ একবার রত্না হারেমের অন্তরালে চলে গেলে সে কিছু করতে অক্ষম। নিষ্ফল ক্রোধ দেখিয়ে বা হা-হুতাশ করে কোনো লাভ নেই। হারেম থেকে তাকে উদ্ধার করবার জন্যে জীবনপণ করা যেতে পারে। কৌশলে হারেম থেকেও হয়তো মুক্ত করা যায়।

বাদশাহের লোকটি দুর্গাদাসের কাছে বিদায় নেবার জন্য এগিয়ে আসে। তার একটা হাত চেপে ধরে একটু একান্তে নিয়ে গিয়ে বলে,—আমি নোকর। কাজের বদলে অর্থ পাই। আমি মুসলমান, কিন্তু বাদশাহ নই। আপনার মতোই মানুষ। মানুষের সুখ দুঃখ মানুষই বোঝে শুধু—বাদশাহ নয়। একথা কখনো ভাববেন না, বাদশাহ আপনাদের খাতির করবার জন্য এনেছেন। বিপদ ঘনিয়ে আসছে। জানি একথা প্রকাশ করে নিমকহারামি করলাম। তবু না বলে পারলাম না।

লোকটি দ্রুত প্রস্থান করে।

দুর্গাদাস সেদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে বলে,—মানুষই বটে। মানুষের জাত ধর্ম নেই। সে যখন ভুলে যায় যে সে মানুষ, তখনই তার মধ্যে বিভেদের প্রাচীর গড়ে ওঠে।

লোকটি বলে গেল,—বিপদ ঘনিয়ে আসছে। দুর্গাদাসও জানে সে-কথা। কিন্তু সেই বহু আশঙ্কিত বিপদের রূপ যে কেমন হবে সে এখনো জানে না। সেটা আকস্মিক হতে পারে—এই মুহূর্তেও ঘটতে পারে। আবার ধীরে ধীরে ফাঁস পরাতে পারেন বাদশা। দুর্গাদাস স্থির করে সৈন্যরা সবাই রাণীর প্রাসাদের পাশে শিবিরে থাকবে। অন্যত্র তাদের সরিয়ে দেওয়া আত্মহত্যার সামিল।

স্পষ্টভাবে দলপতিদের সব কিছু বুঝিয়ে বলে সে। প্রতিটি মুহূর্ত তৈরি থাকতে হবে। দিল্লিতে প্রবেশের আগে থেকেই সৈন্যবাহিনীতে গুপ্তচরের অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলেছে। তবে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। প্রতিটি রাজপুত তাদের মধ্যে অচেনা মুখের আবির্ভাব সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। যার ফলে এ পর্যন্ত পাঁচজন বাদশাহী গুপ্তচর প্রাণ হারিয়েছে। তবু বলা যায় না কার মনে কি আছে। তাই অতি বিশ্বস্ত

পাঁচশো রাঠোর বীরকে বেছে নিয়ে তাদের ঠিকভাবে নির্দেশ দিয়ে রাখে দুর্গাদাস। পাঁচশো রাজপুতের অসি যদি সূর্যকিরণে ঠিকমতো ঝলসে ওঠে, তাহলে মুঘল রাজধানী থেকেও শিশুরাজকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব. এ দৃঢ় বিশ্বাস দুর্গাদাসের আছে।

বিশ্রামের পর দুর্গাদাস অন্তঃপুরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে মহারাণীর দর্শনপ্রার্থী হয়। পর্দার আড়ালে মহারাণী উপস্থিত হলে রত্না মহিষীর বেশে এসে বলে,—কাকাবাবু, রাণীমা আপনার কথা শুনতে প্রস্তুত।

দুর্গাদাস মহারাণীকে অবস্থার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে বলে,—আপনাকে পুরুষের বেশে দিল্লি নগরী ছাড়তে হতে পারে। আপনি কি প্রস্তুত?

মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে যশোবন্তের সহধর্মিণী বলে,—হ্যাঁ। রাজপুত বীরাঙ্গনা সব সময়ে সব কিছুতে প্রস্তুত, একথা আপনার চাইতে আমি কি ভাল জানি দুর্গাদাস? তাছাড়া সহমরণে যখন যেতে পারিনি, তখন পুত্রকে জীবিত রাখতে আমি সব করতে পারি।

—আমি জানতাম রাণীমা। তবু একবার অনুমতি চাইতে আমি বাধ্য। আমি জানি রাজপুত রমণীর পুরুষের পরিধান এই প্রথম নয়—শেষও নয়।

—কিন্তু আমার পুত্রকে কিভাবে উদ্ধার করবেন?

—মিষ্টান্নের ঝুড়িতে কিংবা অন্য কোনো উপায়ে তাঁকে আমরা নিয়ে যাব। তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। আপনাকে চিনতে না পারলে শিশু রাজাকেও ওরা চিনবে না। তবে সব কিছু নির্ভর করছে একজনের ওপর।

দুর্গাদাস রত্নার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে। রত্নার চোখে মুখে কর্তব্যবোধের দৃঢ়তা। নিজেকে উৎসর্গ করে একটা গোটা জাতিকে রক্ষা করবার প্রেরণায় সে উদ্বুদ্ধ। তবু—তবু তার সমস্ত দৃঢ়তার অন্তরালে অতি সংগোপনে ব্যথিত অশ্রুধারা ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ছে। দুর্গাদাস সেই বেদনার ইতিহাস জানে না; পৃথিবীতে একজন শুধু জানেন—তিনি রাণীমা।

দুর্গাদাসের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে রত্না বলে,—আমার কর্তব্য জীবন দিয়েও যথাযথ পালন করব কাকাবাবু।

—জানি মা। তোমার পিতৃ-পরিচয় আমার জানা নেই। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় বেশিদিনের নয়। কিন্তু যে মুহূর্তে প্রথম তোমায় দেখেছি, সেই মুহূর্তে বুঝতে পেরেছি কোনো বীর বংশের ললনা তুমি। আমার ধারণা, অতি অল্পবয়সে, খ্যাতি লাভের আগেই তোমার পিতার মৃত্যু হয়েছে। তা যদি না হতো, তবে তাঁর পরিচয় এতদিন অজানা থাকত না—তোমার পরিচয়ও না।

—মহারাজা যশোবন্ত সিংহের সেনা হিসাবে তরুণ বয়সে আমার বাবার মৃত্যু হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। আমিই তাঁর প্রথম এবং শেষ সন্তান। মা, বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়েই আগুনে আত্মাহুতি দেন।

—আমার অনুমান নির্ভুল। নইলে দুর্গাদাসের স্নেহ আদায় করা সহজসাধ্য নয়। এই যে হৃদয় দেখছ আমার, এ বড় কঠিন হৃদয়। স্নেহ আর মমতার স্থান এখানে বড় একটা নেই। ঈশ্বর এইভাবেই সৃষ্টি করেছেন আমায় কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। তোমাকে দেখেও প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়েছিল আমার কোনো মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হবে তোমাকে দিয়ে। সেদিন বুঝতে পারিনি কী সেই উদ্দেশ্য। আজ বুঝছি।

রাণীর মুখে নিজের প্রশংসা শুনেছে রত্না। কিন্তু দুর্গাদাসের মতো বীরের মুখে শুনে মস্তক আনত হয়ে পড়ে তার। সেই অবস্থাতে একটি অদেখা মানুষের কল্পনা করতে চেষ্টা করে সে—তার শিশু বয়সে যে মানুষটি তাকে কোলে করেছে, আদর করেছে—যে মানুষটা বেঁচে থাকলে সে শৈশবের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হতো না। অস্পষ্টও মনে পড়ে না সেই মানুষের মুখ। ছয় মাসের শিশু কি পিতার মুখকে মনের ভেতর বেঁধে রাখতে পারে?

পর্দার আড়াল থেকে মহারাণী বলে,—বীরসিংহ সারা পথটা আমাদের নিরাপদে নিয়ে আসতে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে।

—হ্যাঁ, সে প্রকৃতই একজন উচ্চশ্রেণীর সৈনিক।

—তাকে একটু পাঠিয়ে দেবেন।

দুর্গাদাস প্রশ্ন না করে পারে না—আপনি কি তাকে ভালোভাবে চেনেন?

—চিনি না তেমন। দু-একবার দেখেছি। তবে রত্না চেনে।

—কীভাবে?

রত্নার কান্না পায়।

মহারাণী গম্ভীর হয়ে বলেন,—তেমন যদি কিছু ঘটেই, তবে তার কাছ থেকে রত্নার বিদায় নেওয়া উচিত।

দুর্গাদাস কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রথমতঃ ব্যাপার বুঝতে তার একটু বিলম্ব হয়। দ্বিতীয়তঃ বোঝবার পর রাণীর সম্মুখে কী জবাব দেবে সহসা ভেবে পায় না।

শেষে রত্নার আনত মস্তকের দিকে চেয়ে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলে,—ও, আচ্ছা আমি তাকে পাঠিয়ে দেবো। নিশ্চয় দেবো।

শিবিরের দিকে চলতে শুরু করে দুর্গাদাস। তার মাথা সামনে ঝুঁকে পড়ে। অজ্ঞাতে একটা প্রস্ফুটিত ফুলকে সে দলে পিষে ফেলেছে। তার কঠোর হৃদয়ও একটু যেন দ্রবীভূত হয়। সে বুঝতে পারে একটা অনভিপ্রেত দুর্বলতা ধীরে ধীরে তার মধ্যে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে তার মনকে আচ্ছন্ন করে দিতে চাইছে। সঙ্গে সঙ্গে মাথা উঁচু করে সে আপন মনে বলে ওঠে,—এমন কতশত ফুল পদদলিত হচ্ছে, আর ঝরে পড়েছে তার ইয়ত্তা নেই। শিশু রাজাকে রক্ষা করতে না পারলে আরও কত ঝরবে। তার চাইতে শ্রেষ্ঠ ফুলটি যদি তার নিংড়ে নেওয়া রক্তবর্ণ রসের পরিবর্তে দেশমাতৃকার নিরাপত্তা এনে দেয় তাহলে ভবিষ্যতে রাজস্থানের উদ্যানে সহস্র ফুল আপন খেয়ালে ফুটে উঠবে, সৌরভ ছড়াবে।

এদিকে রাণীর পাশে দাঁড়িয়ে রত্না। দু'চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু। সে কোনোমতে বলে,—আপনি আমায় রাণীর বেশে দেখতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বর আপনার সে ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন মহারাণী। আসল না হতে পারি, নকল তো হলাম। আজ বুঝলাম আপনি কত ভালোবাসেন আমায়।

মহারাণী রত্নাকে বুকে নিয়ে বলে,—এই ঘোর বিপদের দিনে আমি আর মহারাণী নই। আমি তোমার বড় বোন।

দিল্লির আকাশে সেদিন চাঁদ ওঠেনি। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। নিকটের মীনার বা গম্বুজের অস্তিত্বও চোখে পড়ে না। রাজপথ জনশূন্য। মাঝে মাঝে শুধু রক্ষীদের পদশব্দ আলস্য-ভরা মন্থর গতিতে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে মিলিয়ে যাচ্ছে।

মহারাজ যশোবন্ত সিংহের মহারাণীর নতুন প্রাসাদে সবাই নিদ্রামগ্ন। শুধু পার্শ্ববর্তী শিবিরে জনা পঁচিশেক সৈন্য জাগরিত। তারা দুর্গাদাসের নির্দেশে শুধু রাজপথ নয়, সব দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন অশ্বারূঢ় অবস্থায় মুঘল রক্ষীদের দৃষ্টির অলক্ষ্যে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে শহরের মধ্যে। নিদ্রিত সৈনিক পুরুষরাও যুদ্ধসাজে সজ্জিত। আক্রান্ত হলে জাগরিত হয়েই যা'তে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

আর জেগে রয়েছে রাণীর প্রাসাদের ছাদের ওপর দু'টি প্রাণী। আজ তাদের উভয়ের চোখই অশ্রু ভারাক্রান্ত। আজ আর কেউ কাউকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। কারণ তাদের ভাগ্য দুর্গাদাস শক্ত হাতে নির্ধারিত করে দিয়েছে।

ভোর হতে আর বাকি নেই বেশি। সারারাত ওরা ওইভাবে বসে থেকেছে। ভেবেছিল অনেক কথা

বলবে পরস্পর পরস্পরকে। কিন্তু কিছুই বলা হলো না। তবু উভয়ে উভয়েরই বক্ষের স্পন্দন অনুভব করে মনের কথা জেনে নিয়েছে।

রত্না শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,—আমার এই যৌবন তোমার। তোমায় যখন উৎসর্গ করতে পারলাম না, জীবনে তখন আর কেউ ভোগ করতে পারবে না। হারেমে যে মুহূর্তে তেমন কিছু ঘটবার সম্ভাবনা হবে, সে মুহূর্তে শুধু আমার দেহই পড়ে রইবে—প্রাণ থাকবে না।

—না না, রত্না। তা কেন হবে? হয়তো বাদশা তোমায় ছেড়ে দেবেন। হয়তো আবার তুমি দেশে ফিরে যেতে পারবে।

—কিন্তু কেন যাব? কিসের আশায়? কার কাছে?

বীরসিংহ অতিকষ্টে মিথ্যে কথা বলে,—আমি—আমি তোমার পথ চেয়ে থাকব।

—এ শুধু আশার ছলনা। তুমি আমার প্রাণ বাঁচাতে চাও। কেন এত নিষ্ঠুর হচ্ছো। আমি কি জানি না ভাবছ যে, তোমার দেহ দিল্লির মাটিতে পড়ে রইবে? আমি কি জানি না, তুমি ততক্ষণ শত্রুসেনা ধ্বংস করবে, যতক্ষণ তাদের বল্লম, তলোয়ার কিংবা আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি তোমার বক্ষ না ভেদ করবে? আমি কি জানি না, তুমি উপায় থাকলেও, আমায় ছেড়ে কিছুতেই দিল্লি ত্যাগ করবে না?

বীরসিংহ স্তম্ভিত হয়। সে ভেবে পায় না কিভাবে রত্নার কাছে তার মন এমন উদ্ঘাটিত হলো। কখন হলো? সে নিজে থেকে তো কিছুই বলেনি কখনো। হতাশ কণ্ঠে অস্ফুট স্বরে বলে,—তোমার কাছে আমি কিছুই লকোতে পারি না রত্না।

—কি করে পারবে গো। তুমি যে আমার।

বীরসিংহ জানে, এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে সে একান্ত রত্নার। যদি সন্দেহ থাকে, তবে কিছুক্ষণ পরেই রাতের শেষ প্রহরে পুবের আকাশে রক্তিমাভা দেখা দেবে না। যদি সন্দেহ থাকে তবে দিল্লির মানুষ নিঃশ্বাস নেবার হাওয়ার অভাবে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে। যদি সন্দেহ থাকে, তবে যমুনার জল শুষ্ক হয়ে যাবে রাত না পোহাতেই। যদি সন্দেহ থাকে দেখা যাবে আগামীকাল লালকেল্লা গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

—বীরসিংহ।

রত্নার ডাকে সে সজাগ হয়। এ পর্যন্ত কখনো এভাবে নাম ধরে তাকে ডাকেনি সে।

—তুমি তো এভাবে কখনো নাম ধরে আমায় ডাকো না রত্না।

—ডাকি। মনে মনে শত সহস্রবার ডাকি। কিন্তু মুখ ফুটে ডাকতে বড় লজ্জা হয়। তোমার নাম আমার ইষ্টনাম। তবু আজ ডাকলাম। ডেকে মনটাকে ভরিয়ে নিলাম। তোমার সামনে ওভাবে ডেকে যে কী সুখ—নারী হয়ে জন্মালে বুঝতে। তবে নারী হতে তোমায় বলি না। তুমি পুরুষই হও আবার। মাড়োয়ারের মাটিতে আবার তোমার জন্ম হোক। দেশের যেখানেই তুমি থাকো না কেন, পরজন্মে ঠিক তোমায় খুঁজে নেবো। আমি সেদিন তোমায় দেখতে পেলে কৈশোরের সঙ্কোচ নিয়ে দূরে সরে যাবো না। যৌবনের অহঙ্কার নিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেবার ছলনা করবো না। তোমাকে দেখতে পেয়েই আমি ছুটে যাব—আমি সমস্ত শরীর মন নিয়ে ছুটে গিয়ে তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমায় তখন প্রত্যাখ্যান করো না বীরসিংহ।

—আমি সেই মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করবো রত্না। সেই মুহূর্তের জন্যে এই জীবনের বাকি প্রহরগুলি প্রার্থনা করব কায়মনোবাক্যে—সেই মুহূর্তের জন্যে পরজন্মে তপস্যা করবো।

পুবের আকাশ ফিকে হয়। দুর্গাদাসের কড়া নির্দেশ অন্ধকার থাকতে থাকতেই শিবিরে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। বীরসিংহ উঠে দাঁড়ায়। রত্না দুই বাহুদ্বারা তার কণ্ঠদেশ জড়িয়ে ধরে কেঁদে অস্ফুটস্বরে বলে ওঠে,—না না, যেও না তুমি।

স্তব্ধ বীরসিংহ কিছুই বলতে পারে না প্রথমে। শেষে অতি ধীরে অশ্রু সংবরণ করে বলে,—আর

ক'টা দিনই বা।

—জানি। তারপরে আবার আমাদের মিলন হবে। কিন্তু কত বছর—কত বছর অপেক্ষা করতে হবে।

—হ্যাঁ। অনেক বছর। আমাদের মতন এমন অনেকেই অনেকের জন্যে অপেক্ষা করবে। তাদের আমি চিনি না, তুমিও চেনো না। কিন্তু তারাও রয়েছে। ওই যে শিবির-শ্রেণী দেখছো, ওর ভেতরে এবং বাইরেও কত যুবক রয়েছে যারা এই মুহূর্তে দেশের কুটিরের মিষ্টি স্বপ্ন দেখছে নিদ্রিত অবস্থায়। তাদেরও রত্না রয়েছে সেইসব কুটিরে। তবু তাদের মধ্যে অধিকাংশই বোধহয় ফিরতে পারবে না দেশে। ওইসব বীরসিংহের সঙ্গেও রত্নাদের আর দেখা হবে না। তোমার আর আমার ভাগ্য ওদের চেয়ে অনেক ভাল। তাই ওরা যখন শুধু স্বপ্ন দেখছে আমরা তখন জীবনের শেষক্ষণে উভয়ের উষ্ণ সান্নিধ্য অনুভব করছি। ওদের জন্যেও একটু চোখের জল ফেলো রত্না।

বীরসিংহের কণ্ঠ ছেড়ে দেয় রত্না। কোমর থেকে একটা তীক্ষ্ণ অস্ত্র বের করে বলে,—দেখ তো এটা ঠিক আছে কিনা?

বীরসিংহ সেটা হাতে নিয়ে সযত্নে পরীক্ষা করে বলে,—সুন্দর।

সে রত্নাকে দেখিয়ে দেয় বুকের কোন জায়গাটায় বিঁধলে অবশ্যম্ভাবী ফল পাওয়া যায়।

—চলি রত্না।

—এসো বীর—

রত্না লুটিয়ে পড়ে বীরসিংহের পায়ের কাছে। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলে দেখে তার বীর অন্তর্হিত হয়েছে।

বাদশাহ আওরঙ্গজেব দুর্গাদাসকে দরবারে ডেকে পাঠান একদিন। এই দিনটির জন্যে অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল দুর্গাদাস। সে তার বহু চিন্তিত জবাব পাঠায় লোক মারফৎ বাদশাহের কাছে। জবাবে বলা হয়,—মহারাজ যশোবন্ত সিংহের শিশুপুত্রকে মাড়োয়ারের অধীশ্বররূপে বাদশাহ অনুগ্রহপূর্বক ঘোষণা করলে, সে গর্বের সঙ্গে বাদশাহ সমীপে উপস্থিত হতে পারে।

এ যে কতখানি ধৃষ্টতা দুর্গাদাস জানতো। স্বয়ং বাদশাহের ইচ্ছাই যেখানে আদেশ সেখানে স্পষ্ট আদেশকে লঙ্ঘনের কোনো মার্জনা নেই, এ কথা অতি নির্বোধ দেশবাসীরও অজানা নয়। তবু দুর্গাদাসকে ঝুঁকি নিতে হলো। কারণ দরবারে উপস্থিত হবার পর তাকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করলে শিশু-রাজাকে উদ্ধারের সব আশা বিসর্জন দিতে হতে পারে। তাকে বন্দী করার চেয়ে সম্মুখ সমর অনেক গুণে ভাল।

আওরঙ্গজেব ক্রোধে কম্পিত হন। তাঁর গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল আগুনের মতো দেখায়। ওই সুন্দর রঙ বড়ই প্রসিদ্ধ। বাদশাহ সাজাহান যখন দিল্লির তখত্‌তাউসে তখন একজন ভবিষ্যদ্বক্তা বলেছিল,—তাঁর সব চাইতে গৌরবর্ণ পুত্রই তাঁর সর্বনাশের কারণ হবে।

ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে ফলেছিল। কিন্তু দুর্গাদাসের সঙ্গে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর কোনো সম্পর্ক নেই। তবু দুর্গাদাস কল্পনার চোখে একবার তার জবাবের প্রতিক্রিয়ায় বাদশাহের মুখখানা দেখে নিল।

খবর এলো বাদশাহের কাছ থেকে,—যশোবন্তের পুত্র শুধুমাত্র একটি শর্তে পিতৃসিংহাসন লাভ করতে পারেন। শর্তটি হলো তাঁকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে হবে।

দুর্গাদাস এত বিপদের মধ্যেও একটু না হেসে পারে না। মহারাজের পাশে থেকে থেকে বাদশাহ চরিত্র সেও ভালরকম জেনে ফেলেছে। এমনটি হতে পারে কত আগে থেকে সে ভেবে রেখেছে। মনে মনে বাদশাহ আকবর থেকে শুরু করে সাজাহান পর্যন্ত সমস্ত মুঘল সম্রাটের কথা ভাবে। তাঁরা কত মহান ছিলেন—কত উদার। আওরঙ্গজেব এত বড় বীর ও তীক্ষ্ণধী হয়েও উদারতার অভাবে দেশটাকে

ভেঙে দিতে বসেছেন।

বাদশাহ বড়ই অবহেলাভরে প্রস্তাবটি ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন মুঘল রাজধানীর বুকে বসে মুষ্টিমেয় রাজপুতের পক্ষে সাহস হবে না তাঁর প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করার। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন আওরঙ্গজেব মনুষ্য চরিত্র সবিশেষ চিনতেন। শুধু রাজপুতদের চিনতে তাঁর বারবার ভুল হয়েছে। সেই ভুল না হলে কত শান্তিতে তিনি অসামুদ্রহিমাচলের মালিক হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারতেন।

দুর্গাদাস বিনীতভাবে সংবাদ পাঠালো যে, বাদশাহের প্রস্তাব তার পক্ষে মেনে নেওয়া দুঃসাধ্য। কারণ ধর্মকে অধিকাংশ রাজপুত যখের ধনের মতো আঁকড়ে রাখে। ধর্ম চলে গেলে জগৎ তাদের কাছে শূন্য হয়ে যায়। সুতরাং সহৃদয় বাদশাহ আর একবার বিবেচনা করুন এবং তাঁর আশ্রিত শিশুকে স্বদেশ-যাত্রার অনুমতি দান করুন।

স্তম্ভিত আওরঙ্গজেব কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর তাঁর মুখে ফুটে উঠল ফিকে হাসি। সে হাসির পরিচয় দরবারের অনেকেই জানতো। যারা যশোবন্তের পুত্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন সেই হাসি তাদের হৃৎকম্পের সৃষ্টি করল। আর যারা তার প্রতি বৈরী-ভাবাপন্ন তারা মনে মনে আনন্দিত হয়ে উঠল। বুঝল সর্বনাশ কিছু ঘটতে চলেছে। কিন্তু তেমন লোকের সংখ্যা দরবারে খুব কম। কারণ যশোবন্ত সিংহের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এদের অনেকেই যুদ্ধ করেছে—দেখেছে কতখানি বীরত্ব সাহসিকতা ও আনুগত্য দিয়ে তিনি এককালে লড়েছেন। কিন্তু মুখ ফুটে সহানুভূতি প্রকাশের উপায় নেই। বাদশাহের খড়্গহস্ত নেমে আসবে।

বাদশাহ দুর্গাদাসের দূতকে শান্তকণ্ঠে বললেন,—ইসলামধর্ম গ্রহণ করতেই হবে যশোবন্ত সিংহের পুত্রকে এবং আমার প্রথম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার শাস্তিস্বরূপ শিশুর মাকেও মুঘল প্রাসাদে এসে থাকতে হবে। এর অন্যথা যেন না হয়।

বাদশাহের আমীর ওমরাহের মনে যাই থাকুক মুখে একবাক্যে বলে উঠল,—বাদশাহ মহানুভব। নইলে দাম্ভিক দুর্গাদাসের বেঁচে থাকবার কোনো অধিকার নেই।

আওরঙ্গজেবের মুখে আবার হাসি ফুটল। এই হাসির জাত আলাদা। তিনি বুঝলেন আমীর ওমরাহরা মুখে যে কথাই উচ্চারিত করুক না কেন তাদের অধিকাংশ তাঁর এ জাতীয় কার্যকে মনে মনে চায় না। তারা বিরক্ত হয়। দারাশুকো তাদের মাথাগুলো খেয়ে রেখেছে।

দুর্গাদাসের বুদ্ধিমান দূত ছুটে গিয়ে আওরঙ্গজেবের চরম প্রস্তাব জানালো তাকে। সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাদাস প্রধানদের ডেকে বললো,—প্রস্তুত হও। সবাইকে প্রস্তুত রাখো। আক্রমণ শুরু হবে।

রাণীর প্রাসাদে প্রবেশ করে দুর্গাদাস বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে সোজা কাছে গিয়ে বলে,—আপনার যাত্রার সময় উপস্থিত।

—এখনি?

—হ্যাঁ মা। এই মুহূর্তেই। আপনি পুরুষের বেশ পরিধান করুন।

—আমার পুত্র? অজিত?

—তিনিও সঙ্গে যাবেন আপনার। মিষ্টির ঝুড়ি কিনে রেখেছি। সেটি বয়ে নিয়ে যাবে আমার বিশ্বস্ত দু'জন কর্মচারী। আপনাদের পেছনে ছায়ার মতো অনুসরণ করবে পঞ্চাশজন যুদ্ধনিপুণ প্রবীণ যোদ্ধা। তাদের পেছনে যাবে দু'শো জন যোদ্ধা। কখনো ভাববেন না আপনি নিঃসঙ্গ—অসহায়। আপনার সহায় মাড়োয়ারের প্রতিটি মানুষ। শিশুরাজা অজিত সিংহের জন্যে রক্ত দিতে শুধু মাড়োয়ার নয়—মেবারও প্রস্তুত।

—আমি নিশ্চিন্ত দুর্গাদাস। এখনি প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছি।

দুর্গাদাস রাণীর কক্ষ থেকে বাইরে আসবার সময় পেছনে ডাক শোনে,—কাকাবাবু।

—ও, রত্না। তোমায় তো নির্দেশ দেওয়াই আছে। কিন্তু এ কী বেশ? এত মলিন? না না, রাণীর উপযুক্ত এ বেশ মোটেই নয়। পাল্‌টে ফেল। তোমার চোখে জল! ছিঃ রত্না। দেশকে ভুলে যেও না। বীরসিংহের চোখে নিশ্চয়ই জল নেই এখন। তুমি বীরসিংহের উপযুক্ত নারী। ওই যে দেখছ নীল আকাশ ওপরে—ওই আকাশও ছাড়িয়ে বহু যোজন দূরে রয়েছে একটি স্থান। সেখানে যায়, যারা দেশের জন্যে প্রাণ দেয়, যারা পাপবিদ্ধ নয়। ওখানে তোমার স্থান নির্দিষ্ট—বীরসিংহও সেখানে যাবে ভুলে যেও না! ওখানে দুঃখ নেই, দৈন্য নেই, হতাশা নেই, বিরহ নেই—চির-আনন্দের দেশ, ভুলে যেও না রত্না।

—আমি চোখের জল মুছে ফেলেছি কাকাবাবু।

—ঠিক করেছ মা। তবে ওরা তোমায় নিয়ে যাবার সময় কাঁদলে ক্ষতি নেই। সেটাই স্বাভাবিক হবে। দুর্বলতার অশ্রুকে প্রশ্রয় দিও না রত্না।

—আপনার আদেশ আমি মানব কাকাবাবু।

—শিশুটি ঠিক আছে?

—হ্যাঁ। সেও রাজপুত।

—ঠিক। কিন্তু সে রাজার প্রাণ বাঁচাচ্ছে। তাই তার আত্মোৎসর্গ মহৎ।

—ভবিষ্যতে সে রাজপুতদের পরম শত্রু হয়ে উঠতে পারে। কারণ সে কখনো নিজেকে রাজপুত বলে জানবে না। জানলে নতুন ধর্মের প্রতি তার আকর্ষণ বেশি হবে।

—তোমার কথা সত্যি। তুমি বুদ্ধিমতী। তবে তখন মহারাজা অজিত সিংহও শিশু থাকবেন না।

রত্না নীরব থাকে।

—শিশুটির জন্যে তোমার সমবেদনা আমি অনুভব করছি রত্না। কিন্তু উপায় নেই।

দুর্গাদাস দ্রুতপদে চলে যায়। অনেক কাজ বাকি পড়ে রয়েছে বাইরে। কীভাবে মুঘলদের ঠেকিয়ে রাখলে শিশুরাজা রাজধানী থেকে দূরে নিরাপদ ব্যবধানে চলে যাবার সুযোগ পাবেন সবাই সে চিন্তা করে রেখেছে। এবারে গিয়ে ছক কেটে বুঝিয়ে দিতে হবে সবাইকে।

বাইরে সৈন্যদল কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পেল মিষ্টান্নের ঝুড়ি নিয়ে তিনজন কর্মচারী রাণীর প্রাসাদ ছেড়ে বের হয়ে আসে। হয়তো রাজধানীর কোনো রাজপুত মহিলাকে পাঠানো হচ্ছে ভেবে তারা অন্য কাজে মন দিল। ধারণাও করতে পারল না তারা, তাদেরই ভেতর থেকে একজন দু'জন করে পঞ্চাশ জন বীর নানান অছিলায় ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। তারা লক্ষ্য করল না সকাল থেকে পথের ধারে যে অন্ধ ভিক্ষুকটি বসেছিল, সে ভিস্তিওয়ালা বারবার জল এনে দিচ্ছিল, যে নাচ্‌নেওয়ালি নেচে সৈন্যদের মন ভোলাচ্ছিল, তাদের মৃতদেহ রাণীর প্রাসাদের একপাশে পুঁতে ফেলা হলো। বাদশাহের গুপ্তচর তারা।

দুর্গাদাস সবই দেখল। ঠিক ঠিক কাজ হয়ে গেল। সে আলোচনায় রত। তাকে ঘিরে রাঠোর সেনাপতিগণ। এরা প্রত্যেকেই বিপক্ষের কাছে বিভীষিকা স্বরূপ। তবে অসংখ্য মুঘল সৈন্যের বিরুদ্ধে তাদের বীরত্ব এবং নিপুণতা কতটা স্থায়ী হবে, কে বলতে পারে?

তখত্‌তাউসের সামনে দাঁড়িয়ে একা বাদশাহ আওরঙ্গজেব। একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন ময়ূর সিংহাসনের দিকে। অপূর্ব! সত্যিই অপূর্ব।

মৃত পিতার সমঝদারির সুখ্যাতি না করে উপায় নেই। কিন্তু বড় বাজে খরচ। তিনি হলে কখনই এত বিপুল পরিমাণ অর্থ এভাবে জলে ফেলতেন না। এর বদলে যদি ব্রহ্মদেশ দখল করার তোড়জোড় করা যেত তাও ছিল ভাল। এর পরিবর্তে রাজস্থানকে ভস্মীভূত করতে পারলেও লাভ হতো।

তখত্‌তাউস! সত্যিই কথাটার মধ্যে উন্মাদনা রয়েছে। অথচ কাউকে বুঝতে দিলে চলবে না। ওরা

জানে আওরঙ্গজেব নিজের জন্যে কিছুই করে না। ওরা ঠিকই জানে। আওরঙ্গজেব বিলাসিতা পছন্দ করে না। কিন্তু ওরা কি জানে না আওরঙ্গজেব ক্ষমতাকে কতটা ভালোবাসে?

না জানে না। ওরা শুধু একটি জিনিসই সঠিকভাবে জানে যে বাদশাহ ইসলাম ধর্মকে মনেপ্রাণে ভালোবাসে। হ্যাঁ, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাই নিঃসন্দেহে ওরা আওরঙ্গজেবের নাম দিয়েছে পীর-ই-দস্তগীর অর্থাৎ সেই পবিত্র মানব যিনি জগতের সমস্ত দুঃখদুর্দশার অবসান ঘটান।

হ্যাঁ, তাই তিনি ঘটাবেন। কিন্তু এত বাধা বিপত্তি থাকলে সেই প্রার্থিত দিন সুদুর পরাহত। বিবেক বলে জিনিস কিছুটা ঠিকই আছে আওরঙ্গজেবের। না থাকলে দারাশুকোর কনিষ্ঠ পুত্রটিকে বাঁচিয়ে রাখলেন কেন? কেন তাঁর কন্যা জানি বেগমকে সস্নেহে মানুষ করেছিলেন?

কিন্তু মানুষ আওরঙ্গজেব আর বাদশাহ আওরঙ্গজেব এক নয়। এক হতে পারে না।

মনুষ্যত্ব যেখানে বাদশাহীকে ছাপিয়ে ওঠে সেখানে বাদশাহীর অপমৃত্যু ঘটে। সেই দোষে অত বড় শাহানশাহ সাজাহানকে শেষ জীবনে বন্দী হয়ে থাকতে হলো এবং দারাশুকোকে মৃত্যুবরণ করতে হলো। মুরাদকে তাই গোয়ালিয়র কিল্লায় দিনেব পর দিন আফিমের বিষে জর্জরিত হয়ে মৃত্যুর দিন গুনতে হলো। সুজার কথা থাক।

হ্যাঁ, বাদশাহীগিরি করতে হলে, ওইসব ঠুনকো আবেগকে প্রশ্রয় দিলে চলে না। লোকে বলে আওরঙ্গজেব বড় নিষ্ঠুর! মুখে বলে না, মনে মনে বলে। মুখে বলতে ভয় পায়। মজা মন্দ নয়। তবু অট্টহাসি হাসা যায় না। মনে মনে উপভোগ করতে হয় মজাটুকু।

ওমরাহদের মুখের দিকে চাইলেই বোঝা যায়, অতি সহজেই বোঝা যায় ওরা সব সময় অন্তরে থর থর করে কাঁপে। সেটাই দরকার।

হিন্দু বিদ্বেষ? বলুক ওরা। দেখাতেই হবে। নইলে রাজস্থান ঠাণ্ডা হবে না। ওদের জন্য বড় ভয়। ওরা সাংঘাতিক। হিন্দু বিদ্বেষের নামেই ওদের সায়েস্তা রাখতে হবে। ক্ষমতা বজায় রাখতে হলে একটা ধুয়ো তুলতে হয়।

তাই বলে কি হিন্দু রমণীর ক্রন্দন প্রাণ স্পর্শ করে না? কোথায় তফাৎ হিন্দু-মুসলমানের ক্রন্দনে? কিন্তু স্বীকার করলেই মুশকিল। চেপে থাকতে হয়। চেপে থাকার মতো এই স্নায়ুর জোর রয়েছে বলেই আওরঙ্গজেব আজ আলমগীর হতে পেরেছে। নইলে দারাশুকোর মতো মরুপ্রান্তরে, গিরিপথে বিতাড়িত শৃগালের মতো এতদিনে ছুটে বেড়াতে হতো।

মানুষ হচ্ছে আওরঙ্গজেব, আর বাদশাহ হলো আলমগীর। আশমান জমিন্ ফারাক! নইলে হিন্দুস্তান যে আওরঙ্গজেবের জন্মভূমি একথা তার চেয়ে দারাশুকোও বেশি জানত না। তাই মরতে হয়েছে তাকে। আর আওরঙ্গজেব আজ আলমগীর বলেই তখত্তাউসের পাশে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখতে পারছে। অথচ সে জানে তার নিজের ঔরসজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ এই মুহূর্তে মুরাদের মতোই গোয়ালিয়রে বন্দীদশায় অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করছে। তাই বলে আলমগীর বিচলিত নয়। আওরঙ্গজেব বিচলিত হলেও আলমগীর তাকে অস্বীকার করার হিম্মত রাখে।

আওরঙ্গজেব একবার তখত্তাউস-এর চারদিকটা ঘুরে সামনে এসে দাঁড়িয়ে তির্যক দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে মনে মনে বলেন,—তোমার রক্ততৃষার শেষ নেই আমি জানি। মানুষের লোভ, শোক, প্রেম, কামনা, হাসি কান্নার মতো তোমার তৃষ্ণারও পরিমাপ করা বৃথা। তুমি অনেক রক্তক্ষয়ের কারণ হয়েছো। আরও হবে। তুমি রক্তাক্ত। আবার তুমি অফুরন্ত শক্তির উৎস। আমি শেষেরটির জন্যে তোমাকে দখলে রাখতে চাই। তার জন্যে যদি প্রথমটি ঘটে তবে আমি নাচার। শক্তি আর রক্ত ভাই-ভাই। না না, বাদশাহ-বেগম।

আওরঙ্গজেব তখত্তাউসের ওপর বসেন। তিনি আপন মনে বলে চলেন,—তাই আমি যশোবন্ত সিংহের শেষ দেখতে চাই। আমি জানি, যে শিশু জন্মগ্রহণ করেছে সে একটি স্ফুলিঙ্গ। একদিন এই

স্ফুলিঙ্গই আগুন ছড়াবে। আমি চাই না—চাই না।

আওরঙ্গজেব তখ্‌ততাউস ছেড়ে লাফিয়ে ওঠেন।

—কৌন হ্যায়?

নেক-দিল এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ায়।

—মীরজা সুলতান।

নেক-দিল ছুটে চলে যায়।

কালই দুর্গাদাসের আত্মগরিমাকে ধুলিসাৎ করতে হবে। বেশি সময় দেওয়া চলবে না।

ওকে একবিন্দুও বিশ্বাস নেই। বিপজ্জনক মানুষ। সময় দিলে ও অঘটন ঘটাতে পারে। বাদশাহ আলমগীর মানুষ আওরঙ্গজেবের মতো শত্রুকে দিল্লিতে পেয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারে না। আওরঙ্গজেব তুমি বারবার আলমগীরের পথের কাঁটা হতে চেও না।

মীরজা সুলতান অভিবাদন করে এসে দাঁড়ায়।

—কালই।

—জো হুকুম।

—দরকার হলে কামান দাগাবে। শিশুকে বন্দী করতে না পারলে সমস্ত বাড়িটা মাটিতে মিশিয়ে দেবে।

—জো হুকুম।

—দাঁড়াও। বলতো কাল কখন?

—সকালে।

—বেওয়াকুফ। সকাল নয় সন্ধ্যায়।

—জো হুকুম।

—যাও। কাল রাত্রে খবর দেবে আমায়। দুর্গাদাস আর সেই ছেলেটাকে বন্দী অবস্থায় দেখতে চাই। কিংবা তাদের মৃতদেহ।

—জো হুকুম জাঁহাপনা।

মীরজা সুলতান উত্তেজনায়, আবেগে, ভয়ে আর কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগ লাভে থর থর করে কাঁপতে থাকে।

—যাও। চিৎকার করে ওঠেন আওরঙ্গজেব।

মীরজা সুলতান বাদশাহের দিকে মুখ রেখে কুর্নিশ করতে করতে পিছু হটতে থাকে। সে ভুলে যায় দেওয়ান-ই-খাসের প্রান্ত শেষ হয়ে গিয়েছে।

সশব্দে নীচে পড়ে যায় সে।

নেক-দিল দাঁত বের করে হাসতে থাকে।

আক্রমণ আসে সন্ধ্যার প্রাক্কালে। এই আক্রমণের ব্যাপারে বাদশাহ কোনোরকম হীনতা দেখাননি। তিনি দুর্গাদাসকে শেষবারের মতো—তলব করেছিলেন দুপুরের দিকে কিংবা শিশু ও মাকে প্রেরণ করতে বলেছিলেন। দুর্গাদাস প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং আক্রান্ত হওয়া ছাড়া গতি ছিল না। অসীম ক্ষমতার অধিকারী যে সম্রাট তিনি যত শান্তই হোন না কেন তাঁরই রাজধানীর বুকে বসে তিন তিনবার তাঁর আদেশ অমান্য করবে এমন ব্যক্তিকে কিছুতেই সহ্য করবেন না। এই বেয়াদপি সহ্য করেন যে সম্রাট, বুঝতে হবে তাঁর সাম্রাজ্যের পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে। সুতরাং আওরঙ্গজেবের আক্রমণ যুক্তিযুক্ত। দুর্গাদাস নিজেও মনে মনে সেকথা একশোবার স্বীকার করে। সাম্রাজ্য অটুট রাখতে হলে এইসব বেয়াদপি সহ্য করা যায় না। বাদশাহও সহ্য করলেন না।

যশোবন্তের পুত্র অজিত সিংহ ততক্ষণে রাজধানী থেকে বহুদূরে চলে গিয়েছেন। কারণ তাঁদের জন্য অশ্ব মজুত ছিল নানা জায়গায়। সেই অশ্বে মহারাণী সৈন্যদের নিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছেন রাজপুতানার দিকে। কতদিনে মাড়োয়ার আসবে—কতদিনে সেখানকার মরুভূমি সেখানকার পর্বত কন্দর ওই ক্ষুদ্র রাজপুত্রকে আশ্রয় দেবে! মাড়োয়ারের রাজধানী মুঘলের করতলগত—সেখানকার সব কিছুই মুঘলদের তত্ত্বাবধানে। তবু মরুদেশের সীমানার ভেতরে একবার প্রবেশ করতে পারলে নিরাপত্তার অভাব নেই। কারণ রাঠোররা সেখানকার পথ-ঘাট, প্রতিটি গুপ্ত গহ্বরের খবর রাখে। মুঘলের সাধ্য নেই রাজপুত্রকে খুঁজে বার করবে।

এদিকে মুঘল সৈন্য দিল্লিতে যশোবন্তের মহারাণীর প্রাসাদ-সংলগ্ন ক্ষুদ্র প্রান্তরে প্রবল বাধা পেয়ে মুহ্যমান। সংখ্যায় তারা অনেক ভারী। অবহেলা ভরে এগিয়ে এসে প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলো। দিল্লির বাদশাহ সে-সংবাদ শুনে ক্রুদ্ধ হলেন। মীরজা সুলতানকে সেই মুহূর্তে পদচ্যুত করলেন। আগের দিনের পতনের ফলে তার গায়ে ব্যথা হয়েছিল। এবারে সে মূর্চ্ছা গেল। নতুন সেনানায়কের অধীনে আরও শক্তিশালী সৈন্যদল পাঠালেন বাদশাহ। বাদশাহের মনে খুশির জোয়ার বইল। বাইরে ক্রোধ প্রকাশ করলেও রাজপুতদের কার্যে মনে মনে তিনি আনন্দিত। কারণ সহজ জয়ে কোনোদিনই তাঁর সন্তুষ্টি নেই। রাজপুত-বীরত্বে তিনি প্রফুল্ল। খাঁচার ভেতরে আবদ্ধ হিংস্র ব্যাঘ্র যত বীরত্বই দেখাক না কেন—সেটা তামাসা ছাড়া আর কিছু নয়। খাঁচার বাঘ আর বনের বাঘ এক নয়।

দ্বিতীয় আক্রমণ সেই রাতে না হয়ে শুরু হয় পরদিন সকালে। প্রথমে ঠিক ছিল দুর্গাদাস এখানে যুদ্ধ করে অন্যান্য বীরদের সঙ্গে প্রাণ দেবে। কিন্তু মুঘলদের প্রথম আক্রমণ প্রতিহত করে সবাই বললো যে দুর্গাদাসের চলে যেতে হবে দেশে। তার মৃত্যু হলে মাড়োয়ারের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। শিশু অজিত কোনোদিনও আর সিংহাসনে বসবার সুযোগ পাবেন না। দলপতিরা সবাই মিলে দুর্গাদাসকে স্থানত্যাগ করবার জন্য চাপ দিতে শুরু করল।

রাজি না হয়ে উপায় ছিল না। কারণ কথাটা যুক্তিসঙ্গত। সে নিজেও জানে, তার সাহায্য ব্যতীত মহারাণীর পক্ষে পুত্রকে মানুষ করে তোলা অসম্ভব। তাই সঙ্গী হিসাবে আরও একশো জনকে সে নির্বাচিত করল। লোকবল থাকা চাই রাজপুতের। নইলে অনেক বিপদ ঘটতে পারে।

যুদ্ধের মোহ অসীম। তবু ছেড়ে যেতে হয় দুর্গাদাসকে। প্রতিজ্ঞা করে গেল, প্রতিশোধ সে নেবেই নেবে। যে সমস্ত বীর এখানে আত্মবিসর্জন দেবে, তাদের প্রতিজনের জন্য ফলভোগ করতে হবে বাদশাহকে।

বীরসিংহকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দুর্গাদাস তাকে কাছে ডেকে বলে,—তুমিও চল।

—না। অসম্ভব। আপনি তো জানেন।

—জানি। তবু তোমায় অনুরোধ করছি।

—আপনার আদেশ সব সময়ই আমার শিরোধার্য। তাতেই আমি অভ্যস্ত। তাই আজ আপনার কাছে আমার একান্ত প্রার্থনা এ আদেশ করবেন না। শুধু শুধু কেন যন্ত্রণা দেবেন?

দুর্গাদাস চলে যায়। যাবার সময় দেখতে পায় মুঘল সেনারা দ্বিতীয়বার এগিয়ে আসবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। এবারে তাদের সঙ্গে হাতিও রয়েছে। ছত্রভঙ্গ করে দেবে রাজপুতদের। কিন্তু ক্ষতি নেই। রাজপুত্র প্রতি মুহূর্তেই স্বদেশের নিকটবর্তী হচ্ছেন। চলতে চলতে দুর্গাদাস মনে মনে আওরঙ্গজেবকে সম্বোধন করে বলে,—আমরা তোমার সাম্রাজ্য অধিকার করতে চাইনি বাদশাহ। আমরা শুধু চেয়েছিলাম স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে অস্তিত্ব অটুট রাখতে। আত্মসম্মান আমাদের বড় প্রবল। তুমি তাও দিলে না। ভবিষ্যতে এর জন্য হয়তো তোমাকে আপশোষ করতে হবে।

দুর্গ নয়—ছোট্ট একটি অট্টালিকা। সেটা অধিকার করবার জন্যে এত বড় আয়োজন বাদশাহকে

আর কখনো করতে হয়নি। আর সেই অট্টালিকা তাঁরই রাজধানী দিল্লি নগরীতে।

বাদশাহের বিরুদ্ধ-দল মুখ টিপে হাসল। বুঝল, বাইরে প্রবল প্রতাপান্বিত হলেও, ভেতরে কোথাও ঘুণ ধরেছে—যে ঘুণ এত বড় সাম্রাজ্যের গোড়াকে অশক্ত করে তুলেছে দিনের পর দিন। একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে সাম্রাজ্যের ভিত্তি টলে উঠবে—মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়বে। মুঘল সাম্রাজ্যের এই পরিণতিতে মনে মনে বিষণ্ণ না হয়েও পারে না তারা। কারণ মুঘলরাই ভারতবর্ষকে বহু যুগ পরে পৃথিবীর কাছে গৌরবান্বিত করেছে।

রাজপুতদের অসি ঝলসে উঠল প্রভাতের প্রথম সূর্যকিরণে। তাদের আগ্নেয়াস্ত্র বিপক্ষের আগ্নেয়াস্ত্রের জবাবে গর্জে উঠল। তাদের বল্লম হাতী ঘায়েল করতে শুরু করল।

যুদ্ধ চলল বহুক্ষণ ধরে। মুঘল সেনাপতির বুক কেঁপে ওঠে। সে দেশের জন্যে যুদ্ধ করছে না—করছে পদোন্নতির মোহে। অসম সাহসিক রাজপুতদের বীরত্ব দেখে তারও ভয় হয়, মীরজা সুলতানের মতো তার চাকরিটিও বুঝি যাবে। মরিয়া হয়ে এগিয়ে আসে সে। সৈন্যদের উৎসাহ দেয়—এগিয়ে যাও। চূর্ণ কর ওদের প্রতিরোধ শক্তি।

সে দেখতে পায় না একটি তরুণ রাজপুত এসে দাঁড়িয়েছে তার কাছাকাছি। সর্বাঙ্গ দিয়ে তার রক্ত ঝরছে, ঘর্মাক্ত কলেবর—অনেক মুঘলকে হত্যা করে এতটা পথ আসতে পেরেছে। তরুণটি তার বর্শা তুলে সেনাপতির বুকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেয়। অব্যর্থ লক্ষ্য। মুঘল সেনাপতি লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। পদোন্নতি তার হলো না এ-জীবনে।

কিন্তু তরুণটিকে ঘিরে ধরেছে তখন দশ বারোজন মুঘল সৈন্য। তাদের হাতে অসি। তরুণের তলোয়ার ঘুরে চলেছে সমানে। কিছুদিন আগে এদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে এসেছে সে গিরিপথে। আজ এরা তার শত্রু। তাই এদের রক্তে তার তলোয়ার রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে একা। তাকে উদ্ধার করবার জন্যে আশেপাশে একটি রাজপুতও নেই। সে জানে সে কথা, নিজেকে শত্রুমুক্ত করবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই তার। বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হয়েও তাই নির্বিকার—যেন মৃত্যুকে বরণ করবার অতি-আগ্রহে একা এগিয়ে এসেছে শত্রুব্যূহের মধ্যে। ব্যূহ ভেদ করে কেউ এসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে, মহাভারতের অভিমন্যুর মতো এ-আশা তার নেই। উদ্ধার লাভের আশা নেই দেখে সে অতিমাত্রায় উল্লসিত। তার বিক্রম অতিমানবীয় এক পর্যায়ে এসে পৌঁছায়। একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় মুঘল ব্যূহে। তাই দেখে বীরসিংহ হাসতে থাকে।

বন্দুকের একটিমাত্র গুলির আওয়াজ। তরুণের তলোয়ার হাত থেকে খসে পড়ে। তার হৃদ্‌পিণ্ডের কাছের পোশাক লাল হয়ে ওঠে। একবার শুধু চোখ ফিরিয়ে দেখতে চেষ্টা করে মহারাণীর প্রাসাদ কতটা দূরে—পরমুহূর্তেই লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। মুখ দিয়ে অস্ফুটস্বরে কী যেন বলতে থাকে।

একে একে অধিকাংশ রাজপুত বীরের মৃত্যু হয়। বহুক্ষণ যুদ্ধের ফলে সমস্ত প্রতিরোধ শক্তি চূর্ণ হয়ে যায় রাঠোরদের। এবারে মুঘল সেনা এগিয়ে আসে প্রাসাদের দিকে। তাদের উল্লাসধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়। সেনাপতি তাদের হত হলেও বিন্দুমাত্র তাতে পরিতাপ নেই। বৃহৎ যুদ্ধে সেনাপতি হত হলে সৈন্যদলে ত্রাসের সঞ্চার হয়। এখানে তা হয়নি। কারণ এটি যুদ্ধক্ষেত্র নয়। তাছাড়া রাজপুতদের সৈন্যসংখ্যা কত—এ খবর তাদের অজানা ছিল না।

তবু প্রাসাদের চারপাশটা দেখে তারা বিস্মিত না হয়ে পারল না। রাজপুত এবং মুঘল মিলিয়ে অসংখ্য হত এবং আহত সৈনিকে ক্ষুদ্র প্রান্তর পরিপূর্ণ! অসম যুদ্ধের এমন ফলাফল তারা জীবনে দেখেনি।

মহারাণীর প্রাসাদ থেকে বের হয়ে এলো একটি শিবিকা। সেই শিবিকায় যশোবন্ত সিংহের বিধবা পত্নী এবং তাঁর পুত্র। শিবিকাটিকে ঘিরে রেখেছে বিরাট মুঘল বাহিনী। বলা যায় না কিছুই। রাজপুতদের এতটুকু বিশ্বাস নেই। আকস্মিকভাবে হানা দিয়ে হয়তো মহারাণীকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে।

শিবিকার পর্দার আড়াল থেকে দুটি অশ্রুভারাক্রান্ত নয়ন নিহত রাজপুত শবদেহ একটি একটি করে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অস্ফুট স্বরে শুধু বলে,—বীরসিংহ! আমার বীর! কোথায় তুমি? একবার শেষ দেখাও হবে না? ওরা কি তোমায় পদদলিত করে চলে যাচ্ছে? আমার শিবিকা কি তোমার দেহের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে?

শিশুটি কেঁদে ওঠে। এতক্ষণ নিদ্রিত ছিল। ঘুম ভেঙেছে তার।

সেই সময় বারুদের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয় পশ্চাতে। সেই ভীষণ শব্দে বাদশাহের তখত্‌তাউসও কেঁপে ওঠে। মুঘল সৈন্যরা চমকিত হয়। কান বধির হয়ে যায় ক্ষণকালের জন্য। রত্না বুঝতে পারে রাজপুত বীরদের সতী সাধ্বী পত্নীরা আত্মাহুতি দিলেন। তাঁরাও চললেন স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে। কাঠের প্রাচুর্য নেই দিল্লিতে। বয়ে আনাও নিরাপদ নয়। তাই দুর্গাদাসের নির্দেশে এই ব্যবস্থা হয়েছিল।

রত্না যেতে পারল না ওদের সঙ্গে। তার ভাগ্য শিশুরাজের মায়ের মতো। কর্তব্য পালনের জন্যে বেঁচে থাকতে হবে। বেঁচে থাকতে হবে শত্রুপুরীতে অনেক বিপদের হাতছানির মধ্যে। কোমরের ক্ষুরধার অস্ত্রটি একবার দেখে নেয় সে। ঠিক আছে। বীরসিংহ শিখিয়ে দিয়েছে বুকের কোথায় বিঁধলে সে এই জীবনের মতো নিশ্চিত হবে।

চলি বীরসিংহ। কর্তব্য যতদিন জীবিত রাখবে ঠিক ততদিনই এই হৃদ্‌পিণ্ডের কম্পন থাকবে। যেই মুহূর্তে কর্তব্য শেষ হবে, তোমার কাছে চলে যাব। আমার জন্যে অপেক্ষা করো। যদি মাড়োয়ারের ভূমিতে জন্মাও আমার আগে, তোমার রত্নার জন্যে চোখ মেলে থেকো। আমাকে চিনে নিও।

শিশুটি আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

শকট এগিয়ে চলে।

শকটবাহীদের চরণ রক্ত-পিচ্ছিল হয়ে ওঠে।

বীর মুঘলসেনারা এগিয়ে চলে জয়ের গান গাইতে গাইতে।

তারা সাধারণ নাগরিক। তারা রাজনীতি বোঝে না। তারা জানে, যুদ্ধ জয় করেছে তারা। বাদশাহ খুশি হবেন।

উপসংহার

ইতিহাস বলে, নকল শিশুকে সত্যি ভেবে বাদশাহ আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি তাকে হারেমে মানুষ করবার আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর কন্যা জেবুন্নেসা শিশুটির নামকরণ করেছিলেন 'মহম্মদীরাজ'। এই মহম্মদীরাজ পরিণত বয়স অবধি বেঁচে থাকেনি। তরুণ বয়সেই তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর কিছু আগে বাদশাহ রাঠোরদের কৌশল ধরে ফেলেন এবং বুঝতে পারেন প্রকৃত যশোবন্ত-পুত্র তাঁর নাগালের বাইরে।

ইতিহাস থেকে আরও অনেক কিছুই জানা যায়। শুধু জানা যায় না রত্নার অবশিষ্ট জীবনের কথা। কারণ সে তো ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। তাকে নিয়ে ইতিহাস-রচয়িতাদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। সে হারেমের কোন প্রকোষ্ঠে মাথা ঠুকেছে—কিংবা অনশনে প্রাণত্যাগ করেছে, কেউ বলতে পারে না। সে বাদসাজাদাদের প্রথম যৌবনের কামবহ্নির আহুতি হবার প্রাক্কালে সেই ক্ষুদ্র ছুরিকা বীরসিংহের নির্দেশ মতো হৃদ্‌পিণ্ডের ঠিক জায়গায় বিদ্ধ করেছিল কিনা তাও জানা নেই! ইতিহাস এক্ষেত্রে নিষ্করুণ রূপে স্তব্ধ-মৃতের মতো মূক।

আমি সিরাজের বেগম

আমি জারিয়া—ক্রীতদাসী। শুধু এইটুকুই জানি নিজের সম্বন্ধে। নবাব আলিবর্দির বিরাট মহলের অসংখ্য জারিয়াদের মধ্যে আমি একজন। কোথা থেকে এলাম, কে আমার মা, কে আমার বাবা, তাও জানি না। স্বপ্নের মতো শুধু একটা ছবি মনের মধ্যে মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে। সে-ছবি ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতো। গ্রামে খড়ে-ছাওয়া এক শান্তির নীড় দানবীয় আক্রমণে দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল একদিন। আর্তনাদ করে আমাকে কোলে তুলে নিয়ে কুটির থেকে ছুটতে ছুটতে বার হয়ে এলো এক নারী। বাইরে সারি সারি ঝক্‌ঝকে পোশাকে দাঁড়িয়ে রয়েছে অসুরের দল—মুখে তাদের পৈশাচিক হাসি। তাদের সম্মুখে এক গ্রাম্য-যুবকের সুঠাম নগ্নদেহ রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে রয়েছে উপুড় হয়ে। সে-দৃশ্য দেখে আমাকে কোলে নিয়ে ওই নারী চিৎকার করে আছড়ে পড়ে। তারপর তার কি হয়েছিল স্পষ্ট মনে নেই। অসুররা তার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল। গৃহদাহের আগুনের সামনে বসে আমি কাঁদছিলাম। গায়ে লাগছিল তাপ, আর মাথায় যন্ত্রণা। নারীটি পড়ে যাবার সময় আঘাত লেগেছিল আমার মাথায়। সেই সময় এক মলিনবেশী পুরুষ চোরের মতো চুপিচুপি এসে আমাকে কোলে তুলে নিয়ে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে পালিয়েছিল।

ব্যস্, এইটুকুই। আর কিছু মনে নেই। কিন্তু এ হয়তো শুধু স্বপ্নই। কোথা থেকে এলাম—এ কথা বয়স্ক জারিয়াদের জিজ্ঞাসা করলে তারা রেগে ওঠে। বেগমসায়েবাকে প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। যদিও তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করেন। আমি চৌদ্দ বছরের বালিকা বলেই যে আমার প্রতি তাঁর স্নেহ, তা নয়। আমার নাকি অসাধারণ রূপ! অনেক সময় কাছে ডেকে নিয়ে এমনভাবে আমার দিকে চেয়ে থাকেন বেগমসায়েবা, যে লজ্জা হয়। চারিদিকের বড় বড় আরশিতে নিজের রক্তিম মুখখানা ভেসে উঠতে দেখে মাথা নিচু করি।

বেগমসায়েবা আমার সে অবস্থা দেখে হেসে ওঠেন। আমাকে টেনে নিয়ে আমার বুকের দু'পাশে তাঁর দুই হাত চেপে ধরে বলেন, 'না, তুই এখনো ছোট আছিস্।' গা শিরশির করে ওঠে। তিনি হেসে তাকিয়ার ওপর গড়াগড়ি যান। আমি পালিয়ে আসি।

কিন্তু পালিয়ে যাবোই বা কোথায়? জারিয়াদের মধ্যে আমার স্থান নেই। আমি ওদের দু'চোখের বিষ। তাদের এই ব্যবহারে আমার চোখ ছলছল করে ওঠে। হামিদা তাই দেখে মুখ ভেঙচিয়ে বলে, 'কাঁদলে আমাদের মন ভিজবে না। রূপের দেমাকে তো মাটিতে পা পড়ে না। সব সময় শুধু বেগমসায়েবার কাছেই থাকিস্। এখন আবার এখানে কেন? সেখানে যা।'

হামিদারা সবাই যেন আমাকে হিংসা করে। আমার কি দোষ বুঝি না। বেগমসায়েবা যে মাঝে মাঝে আমাকে ডেকে কথা বলেন, সে কি আমার অপরাধ? তাঁর কাছে যেতে আমারও তো ভয় করে। সে-কথা হামিদারা বুঝবে? বললেও বিশ্বাস করবে না।

তাই নির্জন এক গবাক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে আমার দিন কাটে। এ গবাক্ষের পাশ দিয়ে লোক চলাচল করে না। বেগম মহলের একেবারে নির্জন কোণে এটা। এখানে আমি নিশ্চিন্ত। নিজেকে খুঁজে পাই এখানে। সামনের বাগিচা পার হয়ে দূরের রাস্তা নজরে পড়ে এখান থেকে। সেখানে কত লোকের

মিছিল। কাটরার মসজিদের আজানধ্বনি এখানে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনি। কিরীটকণা গ্রামে কিরীটেশ্বরীর মেলায় যেতে নানা দেশ থেকে হিন্দুরা এই পথে নদীতে খেয়া পার হয়। আমি চেয়ে দেখি আর ভাবি, এদের সবারই আত্মীয়স্বজন, বাবা-মা রয়েছে। আমার তো কেউ নেই। আমার মতো কি একজনও এদের মধ্যে নেই?

এই গবাক্ষই আমার সান্ত্বনা, আশ্রয়ও। এখানে হাত রেখে বছরের পর বছর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে জায়গাটা হয়েছে মসৃণ। অজ্ঞাতে চোখের নোনা জল পড়ে পড়ে এর ধার হয়েছে বিবর্ণ। সেই মসৃণ বিবর্ণতাই যেন একে টেনে এনেছে আমার আরও কাছে, আমার পরম আত্মীয় করে তুলেছে। প্রাসাদের চাকচিক্য আর হৃদয়হীনতা যেন গবাক্ষ থেকে কিছুদুরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে, আর এগোতে পারে না। স্মৃতির অস্পষ্টতা যেদিন প্রথম দানা বেঁধে স্পষ্ট হয়েছে, সেদিন থেকেই আমার এই গবাক্ষ।

মনে আছে, যখন ছোট ছিলাম, এখানে দাঁড়িয়ে আমি বাইরের দৃশ্য দেখতে পেতাম না। আমার মাথা অত উঁচুতে পৌঁছতো না। নবাবের জুতো রাখার একটা ছোট চৌকি লুকিয়ে এনে রেখে দিয়েছিলাম এখানে। তার ওপর দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকতাম বাইরের দিকে। এখন আর সে চৌকির প্রয়োজন হয় না। বেশ বড় হয়েছি।

সবসময় ভয় হয়, এখান থেকেও একদিন সবাই মিলে আমাকে সরিয়ে দেবে। এখনো কারও নজর পড়েনি, তাই। মহলের এই জায়গাটার গুরুত্ব এত কম যে নজরে পড়ার কথাও নয়।

তবু একদিন ঘসেটি বেগমকে এদিকে আসতে দেখে বুকের ভেতরে ছ্যাঁৎ করে উঠল। তাকে সব জারিয়ারাই ভয় করে। তাকে দেখলেই সবার পা কাঁপে। জারিয়াদের দেখে দেখে আমার মনেও তার সম্বন্ধে একটা অজ্ঞাত ভীতিভাব জন্মেছিল। অথচ তার ওই রূপ, অমন টানা টানা চোখের দিকে চাইলে মনে হয় না যে তাতে ভয় পাবার মতো কিছু রয়েছে। অমন রূপ হয় শুধু বেহেস্তের পরীদের।

জারিয়াদের দেখাদেখি আমার মনে ভয় জন্মালেও তাদের মতো থরথর করে আগে কখনো কাঁপতাম না আমি। কিন্তু যেদিন দেখলাম, অমন অপরূপ চোখও আগুনের মতো জ্বলে ওঠে, অমন সুন্দর নাসারন্ধ্র রাগে বীভৎস দেখায়, যেদিন দেখলাম, নবাব নিজে এবং বেগমসায়েবা কন্যার প্রতাপের কাছে অসহায়ের মতো বোবা হয়ে গেলেন, সেদিন থেকে অন্যান্য জারিয়াদের মতো আমিও তার নামে কাঁপতে শুরু করলাম।

সেদিনের কথা আজও আমার মনে মধ্যে জ্বলজ্বল করছে। মহলের পঞ্চাশটা আরশি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল ঘসেটি। আর সেই ভাঙা কাচ আমরা সবাই মিলে পরিষ্কার করেছিলাম। আমাদের কারও মুখে বিরক্তির মৃদু গুঞ্জনও শোনা যায়নি। কাচে অনেকের হাত ক্ষতবিক্ষত হলো, কিন্তু কেউ দাওয়াই-এর জন্যে হাকিম ডাকতে সাহস পায়নি। আরশির কাচে বিষ থাকে জেনেও টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি কেউ।

অথচ সেদিন ঘসেটিকে অন্যায় কিছু বলেননি বেগমসায়েবা। নওয়াজিস মহম্মদ খাঁর সঙ্গে শাদি হয়েছে তার, কিন্তু তাঁর কাছে ঢাকায় যাবে না ঘসেটি, এ কেমন কথা? নওয়াজিস খাঁ মুর্শিদাবাদে এলে সে-কথা বেগমসায়েবা বলেছিলেন কন্যাকে। তাতেই এত কাণ্ড। যে-নবাবের রাজ্যে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়, সেই নবাবের চোখের সামনে ঘসেটি উন্মাদের মতো একটার পর একটা আরশি ভেঙে ফেললো। চোরের মতো দাঁড়িয়ে দেখলেন নবাব আলিবর্দি স্বয়ং।

আরশি ভেঙে নবাবের সামনে ছুটে এসে ঘাড় বেঁকিয়ে উদ্ধত ভঙ্গীতে ঘসেটি বলল, 'নওয়াজিস যদি কখনো নবাব হয়, তবেই আমি তার কাছে যাবো, নইলে নয়।'

তার কথা শুনে নবাব আলিবর্দির মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠে আবার তখনই মিলিয়ে

গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'তাহলে তুমি এখানেই থাকো।'

সেই ঘসেটিকে গবাক্ষের কাছে এগিয়ে আসতে দেখে আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠাই স্বাভাবিক। পালিয়ে যাবার উপায় নেই। আবার না গেলেও যে ভাগ্যে কি আছে কে জানে? পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। ঘসেটি বেগম অন্যমনস্ক হয়ে হাসতে হাসতে আসছিল। নিজের মনে কি ভেবে নিজেই হাসছিল।

আসতে আসতে হঠাৎ থেমে গেল সে। তারপর যেদিক থেকে এসেছিল, সেইদিকে কিছুদূর দ্রুত চলে গেল। সেই সুযোগে গবাক্ষ থেকে চট্ করে সরে এসে আমি একটা কোণে আশ্রয় নিলাম। রাত্রি না হলেও সূর্য ডুবে গিয়েছে তখন। যেখানে আশ্রয় নিলাম, সে জায়গাটা বেশ অন্ধকার, সহসা কারও চোখে পড়ার ভয় নেই।

সেখানে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকি পদশব্দের অপেক্ষায়। কিন্তু অনেকক্ষণ কিছু শুনতে পেলাম না। ভাবলাম, হয়তো আর আসবে না সে। খেয়ালী বেগম আপন খেয়ালে এদিকে চলে এসেছিল, আবার চলে গিয়েছে। সামনে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াবো কিনা ভাবছি, এমন সময়ই সেই পদশব্দ। আমার বুকের ভেতর ধুক্‌ধুক্ শব্দ, তার তালে-তালে সর্বাঙ্গ নড়তে থাকে। ঘসেটির কানে সে শব্দ যাবে, ভয়ে দু'হাত দিয়ে বুক চেপে ধরি।

কিন্তু একি! গবাক্ষের সামনে তো ঘসেটি বেগম নয়। এক অপরিচিত দীর্ঘদেহ পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে। বেগম মহলে কিভাবে প্রবেশ করলো? এত লোকের চোখে ফাঁকি দিয়ে এখানে এলোই বা কি করে? নবাব বংশের কেউ নয়, সবাইকে তো আমি চিনি। তবে কে এই পুরুষ? একবার ভাবি, ছুটে গিয়ে বেগমসায়েবাকে খবর দিই। কিন্তু লোকটির কোমরে দীর্ঘ খরশাণ ঝুলতে দেখে ভরসা হলো না। কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে কে জানে? অমন সুন্দর বীরত্বব্যঞ্জক যার চেহারা, সে কি কখনো খারাপ কিছু করতে পারে? এ চেহারার দিকে যে দু'দণ্ড তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। তবু বলা যায় না। চেহারা মাপকাঠি হলে ঘসেটিও অমন পিশাচী হতো না।

নবাবের কোনো অমঙ্গল হবে না তো? ভাবতেই গায়ের মধ্যে ছম্‌ছম্ করে। বেগমসায়েবাকে খবরটা দিতেই হবে। কিন্তু পুরুষটির পাশ দিয়ে যেতে গেলেই মাথা কাটা পড়বে। একদিকে মৃত্যুভয়, অপরদিকে নবাবের কথা ভেবে মনের ভেতর খচ্‌খচ্ করতে লাগল। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি ভয়কে জয় করবার উদ্দেশ্যে, তারপর চোখ খুলি। এবার ছুটতে হবে। মাথার ওড়নাকে কোমরে জড়াই। একবার লোকটিকে দেখতে হবে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে রয়েছে কিনা। বাইরের দিকে সে যদি চেয়ে থাকে তবেই ছুটে যাবার সুযোগ পাবো।

উঁকি দিতেই স্তম্ভিত হলাম। অপরিচিত পুরুষটির সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় ঘসেটি বেগম, —ঘসেটির চোখ বাঘের মতো জ্বলজ্বল করে, তার নাক সাপের মতো ফোঁস্‌ফোঁস্ করে। আমার হাত-পা অসাড় হয়ে এলো। পুরুষটির আলিঙ্গনে ঘসেটির সারা দেহ নিষ্পেষিত হচ্ছে, যেন এখনই তার হাড়গুলো সব গুঁড়ো হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পরে পুরুষটি ছেড়ে দেয় তাকে, কিন্তু ঘসেটি ছাড়তে চায় না। সে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে চায় আরও নিষ্পেষণ।

আমার মাথা ঘুরে ওঠে। মনে হলো, একটা ঘোর অন্যায় ঘটে চলেছে বেগমমহলের মধ্যে। পুরুষটির চোখে-মুখেও তারই ছাপ। সে সংশয়চিত্তে এদিকে ওদিকে বারবার দৃষ্টি ফেলে—ধরা পড়ে যাবার ভয়, যেন পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু ঘসেটি উন্মত্ত। আরশি ভাঙার দিনে তাকে যেমন উন্মত্ত দেখা গিয়েছিল, এ তার চেয়েও বেশি। সেদিন তার চোখ-মুখ আজকের মতো রক্তিম হয়নি।

এ নিশ্চয়ই অন্যায়। বেগমসায়েবা আমার বুকের দু'পাশে দু'হাত রেখে চাপ দিলে সেটা যেমন অন্যায়, এ তার চেয়েও হাজার হাজার লক্ষগুণ অন্যায়।

চোখ বন্ধ করে কাঁপতে থাকি। হঠাৎ ঘসেটির আর্তনাদে চমক ভাঙল। চেয়ে দেখি, ছিন্নভিন্ন

পোশাক নিয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে সে, আর পুরুষটি অদৃশ্য হয়েছে।

খুন করে রেখে পালিয়ে গেল না তো? ছুটে ঘসেটির সামনে গিয়ে দাঁড়াই।

আমাকে দেখে চিৎকার করে ওঠে সে, 'কেন এসেছিস্ এখানে?'

'আপনাকে তুলবো?'

'না-না-না। কে তোকে তুলতে বলেছে?' ঘসেটি তাড়াতাড়ি পোশাক-পরিচ্ছদ সামলে উঠে দাঁড়ায়।

আমি মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকি।

'কোথায় ছিলি তুই?' তার চোখে আগুন।

আঙুল দিয়ে বিপরীত দিক দেখিয়ে দিই। কথা বলার শক্তি ছিল না আমার।

'আর কাউকে দেখেছিস্?'

'না তো!'

'ঠিক আছে। চলে যা আমার সামনে থেকে। দূর হ'.....

আমি তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাই।

একেবারে বেগমসায়েবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হই। নবাব আলিবর্দির বেগম তখন আলবোলায় তামাক সেবন করছিলেন। বাইরের ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের দিকে চেয়ে তিনি যেন কিসের চিন্তায় মশগুল। নবাবের জন্যে হয়তো ভাবনা হয়েছে। বর্গীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত আছেন নবাব।

জারিয়ারা বলাবলি করে যে, নবাব তো শুধু যুদ্ধ করেন, রাজ্যের বাকি চিন্তা সবই বেগমসায়েবার। তাঁর পরামর্শেই নাকি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়। আমি অতশত বুঝি না, তবে এটুকু জানি যে, নবাব তাঁর সব কথাই শোনেন। তাঁর কপালে আজ যেমন রেখা ফুটে উঠেছে, নবাবের সঙ্গে আলোচনার সময়ও ঠিক এমনি রেখাই ফুটে ওঠে।

বেগমসায়েবার ঘরে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে পড়ে বুঝলাম মস্ত ভুল করেছি। তিনি যদি প্রশ্ন করেন, কি জন্যে এসেছি তাহলে তো ঘসেটি বেগমের কথা বলা যাবে না। সে শুনতে পেলে আমার প্রাণ থাকবে না। হামিদার বোনের মতো দশা হবে। সামান্য দোষে তাকে বেগম মহলের ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দেবার হুকুম দিয়েছিল ঘসেটি। শুধু হুকুম দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। সমস্ত জারিয়াদের ছাদের ওপর দাঁড় করিয়ে বলেছিল যে, অবাধ্য হলে জারিয়াদের কি দশা হয় স্বচক্ষে দেখতে। হামিদার বোন তার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল, কিন্তু ফল হয়নি। নিজের হাতে ঘসেটি নাকি তাকে ঠেলে দিয়েছিল ওপর থেকে।

আমি হামিদার বোনকে দেখিনি। অন্তত স্মৃতিকে তন্নতন্ন করে খুঁজলেও তার কোনো হদিশ পাই না। তবু সে-দৃশ্য আমার চোখে স্পষ্ট ভাসে।

বেগমসায়েবাকে অন্যমনস্ক দেখে চুপিচুপি পালিয়ে আসবো ভাবলাম। কিন্তু দরজা পর্যন্ত যেতেই তাঁর কণ্ঠস্বরে থামতে হলো।

'শোন্।'

আমি তাঁর দিকে ঘুরে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

'এদিকে আয়।' গম্ভীর আদেশ। এক-পা এক-পা করে তাঁর কাছে এগিয়ে যাই।

'কি চাস্?'

'কিছু না।'

'কেন এসেছিলি তবে?'

'পা টিপে দেবো?' আমার গলা কেঁপে ওঠে।

'তুই তো কোনোদিন পা টিপিস না।'

'না টিপলে যে শিখতে পারবো না।' শেষ চেষ্টা করি সহজ হবার।

আমার কথায় বেগমসায়েবার মুখে মৃদু হাসির তরঙ্গ খেলে যায়। তিনি বলেন, 'তোর এতটুকু হাতে কি আমার আরাম হবে?'

'তবে থাক্, আমি যাই বেগমসায়েবা।' যেন পালাতে পারলে বাঁচি। দরজার দিকে এগিয়ে যাই আবার।

'শুনে যা।' বেগমসায়েবার মুখে বিরক্তি দেখে ভয় পেলাম। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে দাঁড়াই।

'কি বলতে এসেছিলি বল্?' তাঁর চোখে ঔৎসুক্য।

'কিছু বলতে আসিনি, বেগমসায়েবা।' জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিই।

'মিথ্যে কথা বলছিস্। ঠিক করে বল্।' তাঁর স্বর বজ্রকঠিন।

আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠি। তিনি স্থির হয়ে বসে থাকেন। তাঁর চোখ আমার দিকে নিবদ্ধ। আপ্রাণ চেষ্টায় তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিই।

'এবার বল্। কি দেখে ভয় পেয়েছিলি, কেন ছুটে এসেছিলি এখানে?'

আমি স্তম্ভিত হলাম। বাইরের দিকে অন্যমনস্কের মতো চেয়ে থাকলেও তিনি আমার সব হাবভাবই লক্ষ্য করছিলেন প্রথম থেকে। বুঝলাম, ফাঁকি দিতে পারবো না। জারিয়াদের কথা এতদিনে বিশ্বাস হলো যে, কোনো জিনিসই বেগমসায়েবার দৃষ্টি এড়ায় না।

কিন্তু আমি কি বলবো তাঁকে? সত্যি বললে কালই হয়তো ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হবে। মিথ্যে বললে নবাবের আদেশে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। পৃথিবীতে আমার যে কেউ নেই। কোথায় আশ্রয় পাবো? তার চেয়ে মৃত্যুই ভালো। কার ওপর অভিমানে জানি না, চোখ ফেটে জল বার হয়ে আসতে চাইল।

বললাম, 'বেগমমহলে কে যেন এসেছিল।'

'কি বল্লি!' তিনি বিস্মিত হন।

'একজন পুরুষকে দেখলাম।'

'কে সে?'

'চিনি না।'

'কেমন দেখতে?'

যেমন দেখছি, আমি বর্ণনা করে গেলাম।

'হুঁ, আর কেউ ছিল?'

'না।'

'ঠিক করে বল্ বাঁদরী।' তিনি রীতিমতো উত্তেজিত হন। পালঙ্ক ছেড়ে ছুটে এসে আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকান।

'আর কাউকে আমি দেখিনি, বেগমসায়েবা।'

'ঘসেটিকে দেখিসনি?'

মনে হলো, প্রচণ্ড আঘাতে আমার মন এবং শরীর দুই-ই গুঁড়িয়ে গেল। নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

'বল্ বল্ বল্। চুপ করে আছিস কেন? ঘসেটিকে দেখিস্নি?'

'না-না, খোদার কসম।' বেগমসায়েবার পায়ের কাছে আমি ভেঙে পড়ি। পা দিয়ে তিনি যদি আমার গলা টিপে ধরেন সেও ভালো। তাতে মিথ্যাবাদীর শাস্তি হবে, কিন্তু ঘসেটির হাত থেকে তো বাঁচবো।

বেগমসায়েবা কিছুই করলেন না। তিনি সেইভাবে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে

গিয়ে তাকিয়ার ওপর মাথা রাখেন। আমি নিচেই বসে থাকি।

খানিক পরে তিনি বলেন, 'তুই এখন যা।' আমি উঠে দাঁড়াতে আবার বলেন, 'যদি তাকে আর কখনো দেখিস্, সঙ্গে সঙ্গে এসে বলবি। নইলে তোকেই মেরে ফেলা হবে।'

কুর্নিশ করে চলে আসি।

দু'দিন পরে দলবল নিয়ে বেগমসায়েবা ভোরবেলা গিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সারাদিন তিনি না খেয়ে সেখানে থাকবেন, সন্ধে হলে ফিরে আসবেন। প্রতি বছরই এইদিনে তিনি যান গিরিয়ার প্রান্তরে। এইদিনে সেখানে নবাব আলিবর্দি সফররাজকে পরাজিত করে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মসনদ পেয়েছিলেন। বেগমসায়েবা দিনটিকে পবিত্রভাবে পালন করেন।

বেগমমহল প্রায় ফাঁকা। নবাব আলিবর্দিও মুর্শিদাবাদে নেই। বর্গীদের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। আমার অতি প্রিয় গবাক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়াবো ভাবছি, এমন সময় সোফিয়া তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে আমার হাত ধরে।

জারিয়াদের মধ্যে আমি সর্বকনিষ্ঠ। তারপরই সোফিয়া। তার বয়স ষোলো। শরীরে তার স্বাস্থ্য আছে, দেহের গঠনও সুন্দর, কিন্তু রঙটা বড় কালো। কালো রঙের জন্যে তার দুঃখের সীমা নেই। তার দুঃখ দেখে আমার হাসি পায়। সে আমাকে চুপি চুপি একদিন বলেছিল যে, রঙ যদি তার আমার মতো হতো, তাহলে সে কোনো নবাবজাদাকে শাদি করতে পারতো।

নবাবজাদাদের শাদি করার জন্যে এদের এত লোভ কেন বুঝি না। চুনি-পান্নার অলঙ্কারে নিজেকে সজ্জিত করা যায় বটে, মসলিন দিয়ে শুভ্র দেহকে ঢেকেও রাখা যায়, কিন্তু তাতে কি সুখ আছে? আমার ধারণা, বেগমদের সুখ নেই। সবাই ঘসেটি বেগমের মতো ভেতরে ভেতরে জ্বলে মরছে। ঘসেটি শুধু প্রকাশ করে, অন্য সবাই মনের মধ্যে চেপে রাখে। সত্যি কিনা জানি না, কতটুকুই বা আমার অভিজ্ঞতা, তবু বুঝতে পারি, বেগমদের মন বড় নীচু, বড় কুৎসিত। নিজেদের সাজিয়ে রাখলেও এদের নাসারন্ধ্র দিয়ে পচা মনের দুর্গন্ধযুক্ত দীর্ঘশ্বাসই শুধু বার হয়। সেদিন গবাক্ষের সামনে ঘসেটির নাক দিয়েও হয়তো তেমনি শ্বাস নির্গত হয়েছিল, যা সহ্য করতে না পেরে সেই বিরাট পুরুষটিও পালিয়ে যায়।

নবাব আলিবর্দির মতো মানুষ আর কয়জন হয়? তাঁর মতো একজন মাত্র বেগম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে কয়জন নবাব পারে? নিজের প্রতিভায় নবাব হয়েও তাঁর মনে আর বাইরে কোনো জাঁকজমক নেই। তিনি যেন বাংলাদেশের সাধারণ একজন মানুষ, একটি মাত্র স্ত্রীকে নিয়ে সংসার পেতেছেন। হাজার বেগমের হীন প্রতিযোগিতায় তাঁর মন দ্বিধাবিভক্ত নয়।

বেগমসায়েবাও তেমনি নবাব ছাড়া কিছু জানেন না। তাঁর মনে সর্বদা একই চিন্তা। সে-চিন্তা নবাবের দেহের জন্যে, তাঁর জন্যে, আর রাজ্যের জন্যে। বেগমসায়েবাকে তাই আমার বড় ভালো লাগে। তিনি যখন তখন আমার বুকে হাত দিয়ে ছোট আছি বলে ঠাট্টা করলেও তাঁর ওপর আমার শ্রদ্ধাও রয়েছে।

কিন্তু সবাই আলিবর্দি আর তাঁর বেগম নন। নবাবের দৌলতে নবাব-পরিবারভুক্ত হয়ে, তাঁর আত্মীয়স্বজনদের বেগমের ছড়াছড়ি। বেগমরা যেন মাটির পুতুল। তাদের যেন প্রাণ নেই, মন নেই, সুখ নেই, সাধ নেই। অবসর মতো এক-আধ দিন পুরুষ এসে একটু নাড়া দিয়ে গেলে তারই স্মৃতি নিয়ে তারা আনন্দে জাবর কাটবে বাকি দিনগুলি। তবু যদি বোঝা যেত পুরুষদের মন বাঁধা রয়েছে তাদের কাছে।

অথচ আশ্চর্য, বেগমরা ঠিক সেইভাবেই জাবর কাটে। একদিন এসে পুরুষ যদি দু'দণ্ড কারও ঘরে কাটিয়ে যায়, তবে দেমাকে সেই বেগমের একমাস মাটিতে পা পড়ে না। জাফরাগঞ্জ প্রাসাদে যখন

কিছুদিনের জন্যে ছিলাম, তখন সেখানেও ওই রকমই দেখেছি।

তাই সোফিয়ার বেগম হবার সখ দেখে আমার কষ্ট হয়। মনে হয়, যদি সম্ভব হতো, আমার গায়ের রঙ তাকে দিয়ে, তার গায়ের রঙ নিয়ে আমি কোনো সিপাহীকে বিয়ে করে চলে যেতাম তার কুটিরে। কত সুন্দর সুন্দর সিপাহীদের রাস্তা দিয়ে যেতে দেখি, কত রকম বয়স তাদের। তাদের নিশ্চয়ই ঘর আছে, ঘরে মা আছে, ভাই-বোন রয়েছে। সেখানে দশটা বেগমের প্রতিযোগিতা নেই। আমি গেলে আমিই সব।

সোফিয়া এসে আমার হাত ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'শিগ্‌গির চল্, ছাদে পালাই।'

দেখলাম, সব জারিয়ারাই দুর্‌দার্ করে ছাদে উঠে যাচ্ছে। বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি, 'কেন?'

'হোসেন কুলিখাঁ আসছেন।'

'তাতে কি হয়েছে?'

'ন্যাকা, কিছুই জানে না যেন। বেগমসায়েবা নেই, ঘসেটি যদি আমাদের এখানে দেখে, তাহলে কি আস্ত রাখবে?'

'কেন?'

'যাবি তো চল্। অত বুঝিয়ে বলার সময় নেই!'

'আমি যাবো না।'

'তবে মর্।' সোফিয়া আমাকে ছেড়ে ছুটে পালায়।

হোসেন কুলিখাঁকে চোখে দেখিনি কখনো, নাম শুনেছি। ঢাকায় নওয়াজিস খাঁর ডান হাত তিনি। তাঁর বুদ্ধি আর বীরত্বের কথা সকলে জানে। স্বয়ং নবাবকেও অনেক সময় তাঁর সম্বন্ধে বেগমসায়েবার কাছে প্রশংসা করতে শুনেছি। সেই হোসেন কুলিখাঁকে দেখে জারিয়াদের এত ভয় কেন, বুঝলাম না। আর ঘসেটি বেগমই বা কেন এতে বিরক্ত হবে?

হোসেন কুলিখাঁকে দেখার অদম্য কৌতূহল হলো। ছুটে গিয়ে বেগম মহলের বাইরের সিঁড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াই। সেই পথেই তিনি আসবেন ঘসেটি বেগমের সঙ্গে দেখা করতে। নওয়াজিস খাঁ কোনো সংবাদ পাঠিয়েছেন বোধহয়?

ভারী পায়ের শব্দে চোখ তুলে তাকাতেই স্তম্ভিত হই, সর্বাঙ্গ পাষাণ হয়ে যায়। মনে হয়, একটু পরেই বুঝি পড়ে যাবো। ডান হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি দেয়াল চেপে ধরি। মুহূর্তে বুঝতে পারি, জারিয়ারা কেন সরে পড়েছে।

সেদিনের গবাক্ষের সামনের সেই অচেনা পুরুষ। সেই পুরুষই তবে হোসেন কুলিখাঁ! কাজের তাগিদে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে আসে, আর প্রভুর বেগমের বার্তা নিয়ে যাবার অছিলায় প্রভুর সর্বনাশ করেন। সরল ভালো মানুষ নওয়াজিস মহম্মদ খাঁ। ভৃত্য আর বেগমের ওপর তাঁর অবিচল আস্থা। পৃথিবীতে কি ভালো মানুষেরা শুধু প্রতারিতই হয়?

হোসেন কুলিখাঁ আমার সামনে এসে থম্‌কে দাঁড়ালেন। সংযত হয়ে তাঁকে কুর্নিশ করি। তাঁর মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

তিনি বলেন, 'তুমি জারিয়া?'

ঘাড় নাড়ি।

'খুবসুরৎ। কিন্তু বড় ছোট।' আপন মনে শিস্ দিতে দিতে তিনি এগিয়ে যান। আমি তাঁকে অনুসরণ করি।

ঘসেটি বেগম আগেই ঘর থেকে বার হয়ে এসেছিল। হোসেন কুলিখাঁর পেছনে আমাকে দেখে সে

রাগে ফেটে পড়ে। চিৎকার করে ওঠে, 'এখানে কি করছিস্ হতভাগী?'

আমি চুপ করে থাকি। ঘসেটি ছুটে আসে আমার দিকে। হোসেন কুলিখাঁ নিমেষে আমাকে আড়াল করে দাঁড়ান।

'সরে যাও। ওকে আমি শেষ করবো। মিটমিটে শয়তান কোথাকার।'

গম্ভীর স্বরে হোসেন কুলিখাঁ বলেন, 'থাক্ বেগমসায়েবা, এতটুকু মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে কোনো লাভ নেই। তাছাড়া কোনো অপরাধ তো সে করেনি।'

'ওকে চেনো না তুমি। আমিই কি চিনতাম? এখন বুঝছি।'

'মুখ দেখেই চেনা যায়। একটি সরল সুন্দরী পরী। শুধু ছোট। কিছুদিন পরেই মাথা ঘুরিয়ে দেবে অনেক পুরুষের।' তিনি হো-হো করে হেসে ওঠেন।

'তোমারও মাথা ঘুরিয়েছে নাকি?' ঘসেটি ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে। তার ঠোঁট বিকৃত হয়।

'হ্যাঁ, দূর থেকে দেখে ঘুরেছিল বৈকি। তখন বয়সের তো আন্দাজ করতে পারিনি।'

ঘসেটি আচমকা হোসেন কুলিখাঁর পাশ কাটিয়ে আমার পেটে পদাঘাত করে। অসহ্য যন্ত্রণায় সেখানেই বসে পড়ি। চোখের সামনে সব কিছু ঘুরতে থাকে। তারপর ঝাপসা হতে হতে সব অন্ধকার হয়ে যায়। মরার আগে বুঝি এমনই হয়।

কতক্ষণ পড়েছিলাম জানি না। যখন জ্ঞান হলো, দেখলাম, তারা দু'জনেই চলে গিয়েছে। বিরাট মহলের বাইরে আমি একা। চোখে জল এলো। মনের মধ্যে আবছা একটা নারী-মুখ ভেসে উঠল—যে নারী আমাকে কোলে নিয়ে আগুনলাগা কুটির থেকে ছিট্‌কে বার হয়ে এসেছিল। একি শুধু স্বপ্ন? স্বপ্ন হলে এত ঘনঘন ভেসে ওঠে কেন মনের মধ্যে? সেদিন ওই রমণী আমাকে নিয়ে আঙিনায় আছড়ে পড়লে আমার মাথায় যে আঘাত লেগেছিল, সেই আঘাতেরই চিহ্ন কি মাথার পেছনের ওই কাটা দাগ? জানি না। বলে দেবার কেউ নেই। যে বৃদ্ধা জারিয়া আমাকে মানুষ করেছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো কিছুটা বলতে পারতো।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াই। কাউকে দেখতে পাই না। সবাই ছাদে লুকিয়ে রয়েছে। গবাক্ষের সামনে গেলে হয়, কিন্তু সাহস হয় না। আজও যদি ওরা সেখানে গিয়ে থাকে।

বেগমসায়েবা এলে তাঁকে বলবো নাকি, যে পুরুষটিকে আমি সেদিন দেখেছি সে হোসেন কুলিখাঁ। আর হ্যাঁ, ঘসেটি বেগমকেও দেখেছি তাঁর সঙ্গে—দেখেছি, আলবৎ দেখেছি। কিন্তু তাহলে যে হোসেন কুলিখাঁর প্রাণ যাবে। তাঁর মৃত্যু আমি চাই না। অমন বীরের মতো চেহারা যাঁর, তাঁর মৃত্যু যুদ্ধক্ষেত্রেই হওয়া উচিত। তাছাড়া লোকটা খারাপ নয়। তাঁর মিষ্টি কথার মধ্যে সহানুভূতি ঝরে পড়ে।

ভাবতে ভাবতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাই। কিন্তু আবার বসে পড়তে হলো। পেটের ভেতরে ভীষণ ব্যথা করে ওঠে।

কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না। মাথায় কার হস্তস্পর্শে চমকে উঠি। চেয়ে দেখি হোসেন কুলিখাঁ।

'খুব লেগেছে?'

'না।'

'নিশ্চয় লেগেছে।'

কথা বলি না।

'আমার সঙ্গে ঢাকায় যাবে?'

'না।'

'এখানে তবে অত্যাচার সহ্য কর।'

'আমরা যে জারিয়া। আমাদের অত্যাচার সহ্য করতে হয়।'

'ও।' চিন্তাকুল অবস্থায় তাঁকে নেমে যেতে দেখি। সুন্দর তাঁর চলার ভঙ্গী। নবাব আলিবর্দির চেয়েও

সুন্দর। কী চমৎকার দেহের গঠন। একদৃষ্টে চেয়ে থাকি। পেটের ব্যথার কথাও ভুলে যাই কিছু সময়ের জন্যে।

নাকাড়াধ্বনিতে একদিন খুব ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যায়। মহলের এত বড় প্রাঙ্গণ পার হয়েও পথের নাকাড়াধ্বনি সকলকে জাগিয়ে তুলল। ছুটতে ছুটতে এসে একজন খবর দিয়ে যায় যে, নবাব বর্গীদের বিতাড়িত করে ফিরছেন। বেগমসায়েবার কাছে খবর পৌঁছল। তিনি উঠে এসে বেগম মহলের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়ালেন, হোসেন কুলিখাঁ এলে আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম। বেগমসায়েবা জানেন যে, নবাব এসে চেহেল-সেতুনে যাবেন না, অন্য কোথাও যাবেন না, প্রথম তাঁর কাছেই আসবেন। নবাবের সঙ্গে তাঁর আদুরে নাতিটিও আসবে। সেও যুদ্ধে গিয়েছিল। তাকে আমি এড়িয়ে চলি। আমার চেয়ে আর কতটুকু বা বড় হবে সে। অথচ তার প্রতাপে নবাব পর্যন্ত কম্পিত। ঘসেটি বেগমের ওপর সে আর এক-কাঠি। কখন যে কি চেয়ে বসে ঠিক নেই। অথচ যা চাইবে, না দিলে প্রলয়কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। ঘসেটি বেগম শুধু আরশি ভাঙে, এ হয়তো মানুষের মাথা ভাঙবে। নবাবের মুখ দেখে বোঝা যায়, নাতিটিকে ভালোবাসলেও তার জন্যে তিনি সর্বদা তটস্থ। তাকে যুদ্ধে নিয়ে গিয়ে তিনি ভালোই করেছিলেন। নইলে তাঁর অনুপস্থিতিতে নিশ্চয়ই একটা কাণ্ড করে বসে থাকতো।

ছেলেটার সুন্দর কচি মুখ। দু'দণ্ড চেয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়। অথচ সে যদি দেখতে পায় যে, তার মুখের দিকে আমরা কেউ চেয়ে আছি, তাহলে রেগে উঠে বলবে, হাঁ করে দেখছিস্ কি বাঁদী? মুখে কি মধু আছে?

মধুই আছে। কিন্তু মুখ ফুটে কি বলতে পারি? কেন জানি না, ওকে দেখলে মায়া হয়। একলা দাদুর কাছে পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবে। হয়তো পাটনার কথাই ভাবে। সেখানে তার বাবা-মা রয়েছেন। সবাই তো আমার মতো নয়।

ও যখন চিন্তা করে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি। ভাবতে ভাবতে কখনো ওর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কখনো বা একটা বিষাদের ছায়া সারা মুখখানাকে অন্ধকার করে দেয়। তখন কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু ভরসা পাই না। মাথার মধ্যে ওর দুষ্টু বুদ্ধির তো অন্ত নেই। আমার ঔদ্ধত্য দেখে কি আদেশ করবে কে জানে? বয়স কম হলে কি হবে, কারও তো জানতে বাকি নেই যে, বাংলার মসনদে আলিবর্দির পরে ওই ছেলেই বসবে। আর সে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সচেতন ও নিজে।

আমার প্রিয় গবাক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তার দু'ধারে। নবাবকে তারা অভ্যর্থনা জানাবে।

হর্ষধ্বনির মধ্যে নবাব তাঁর নাতিকে নিয়ে প্রবেশ করলেন। মহলের প্রধান ফটক বন্ধ হলো। বাইরের জনতার চাপে সে-ফটক ভেঙে যায় আর কি? দু'জন সিপাহীকে ছুটে যেতে দেখলাম খরশাণ হাতে জনতার দিকে। নবাব সেদিকে চেয়ে থেমে গেলেন। হস্তীপৃষ্ঠ থেকে মাটিতে নামলেন। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন বন্ধ ফটকের দিকে। জনতাকে সম্বোধন করে কি যেন বললেন। আবার একটা আকাশ ফাটানো চিৎকার। মহলের সামনের রাস্তা ফাঁকা হয়ে যায় ধীরে ধীরে। প্রজাদের আনন্দে নবাবও আনন্দিত। আনন্দ তাদের উচ্ছৃঙ্খল করে তুলেছিল। তাতে সিপাহীরা রাগলেও নবাব রাগেননি। তিনি ধীরভাবে তাদের বুঝিয়ে ফিরে এলেন।

এবার আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে বেগমসায়েবার ঘরের সামনে দাঁড়াই। জানি নবাব সেখানেই আসবেন। একটা ঝাড়ন জোগাড় করে নিই। তাঁদের কথাবার্তার সময়ে নিজেকে কোনো কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে। বয়স কম বলে সুবিধে আছে। অন্য জারিয়ারা ঘরে কিংবা আশেপাশে থাকলে তিনি তাদের চলে যেতে বলেন, কিন্তু আমাকে কিছু বলেন না। ফলে তাঁদের অনেক কথাই আমি শুনতে

পাই।

নাতিকে নিয়ে নবাব আর বেগমসায়েবা ঘরে ঢুকলেন। আমি বাইরের আসবাবপত্রে ঝাড়ন বুলিয়ে চলি। ঘরের মধ্যে যাওয়া ঠিক হবে না। এখানে দাঁড়িয়েই শুনতে হবে যতটুকু শোনা যায়।

শুনতে পেলাম, বেগমসায়েবা বলছেন, 'অনেকবারই তাড়ালে ওদের, কিন্তু শেষ তো হয়নি। এবারে কি শেষ করে দিয়ে এলে?'

'না, পণ্ডিত না মরলে ওরা শেষ হবে না।'

'তাহলে পণ্ডিতকে মারো।'

'পারছি কই?' নবাবের স্বরে হতাশা।

'কৌশলে চেষ্টা করে দেখো।'

'পরের বার এলে তাই করতে হবে। অত বড় বীরকে কৌশলে মারতে লজ্জা হয়।'

'বীর! বলছো কি তুমি? বীরেরা নিরীহ লোকদের ওপর অত্যাচার করে? তারা সামনা সামনি যুদ্ধ করে। তারা লুঠ করে না। সাধারণ লোককে নির্মমভাবে হত্যাও করে না।

'ওরা বাধ্য হয়ে লুঠ করে। ওদের টাকার প্রয়োজন।'

'তাতে আমাদের কি? আমরা বাধ্য হয়ে পণ্ডিতকে বধ করবো, আমাদের শান্তি প্রয়োজন।'

শ্রান্ত নবাব আর কোনো কথা বলেন না।

বেগমসায়েবা বলেন, 'শুনেছি ওরা হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সামর্থ্য থাকলে তা করুক। কিন্তু নিরীহ লোকদের ধন-প্রাণের বিনিময়ে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ওদের যদি সেটাই আদর্শ হয়, তবে তার পথও হওয়া চাই পাপবর্জিত!'

'হু।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। আমার হাতের ঝাড়নটা হাতেই রয়েছে। কিছুই পরিষ্কার করা হয়নি। এবারে দরজার আর একটু কাছে এগিয়ে এসে এটা-ওটা যা সামনে পাই পরিষ্কার করি। ভেবেছিলাম, যুদ্ধ সম্বন্ধে বিচিত্র কাহিনী শুনতে পাবো। কিন্তু কোনোরকম আলোচনা হলো না দেখে একটু হতাশ হয়ে পড়লাম। যুদ্ধ জিনিসটাও নবাব-বেগমদের কাছে যেন সাধারণ ব্যাপার।

হঠাৎ একসময় বেগমসায়েবার গলা শুনি, 'আমাদের দাদুর খবর কি?'

বুঝলাম, এবার নাতিকে একচোট আদর জানানো হবে। এতক্ষণের গম্ভীর আলোচনার সুর হঠাৎ পাল্টে গেল। আমি কান খাড়া করি।

'আমার খবর এই যে, সিরাজ একটা কিছু দেখাল বলে মনে হয়।' তেমনি উদ্ধত গলা। এতদিনের অবর্তমানেও একটু বদলায়নি। যুদ্ধক্ষেত্রের পরিশ্রম আর কাঠিন্য ভোগ করে এসেও বেগমসায়েবার স্নেহসিক্ত কথার জবাবে এতটুকু নমনীয়তা প্রকাশ পেল না। তবু কত মিষ্টি। যেমন চেহারা, তেমনি কণ্ঠস্বর। স্বভাবটা আল্লা অমন করে গড়লেন কেন? নবাবজাদাদের কি অমনই হতে হয়? এতটুকু দয়া, এতটুকু মমতা কি থাকতে নেই? তা যদি না থাকে, তবে লক্ষ লক্ষ প্রজার পুঞ্জীভূত ব্যথার কথা কিভাবে জানতে পারবে? প্রজারা যে নবাবের মুখ চেয়েই বেঁচে থাকে। প্রজাদের দুঃখ নিজের বলে অনুভব না করলে নবাব কিসের? নবাব আলিবর্দি তো অমন নন। এই তো একটু আগে হাতি থেকে নেমে নিজে এগিয়ে গেলেন ফটকের দিকে। প্রজাদের মনের খবর তিনি রাখেন বলেই কিভাবে শান্ত করতে হয়, সে কৌশলও তাঁর জানা। একজন সামান্য সিপাহী যা বুঝতে পারল না, তিনি তা বুঝলেন।

সিপাহী হয়তো বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু নবাবের চোখের সামনে কাজ দেখাবার সৌভাগ্য বড় একটা হয় না তাদের। তাই অতি উৎসাহে খরশাণ হাতে ছুটে গিয়েছিল প্রজাদের দিকে। নবাব বাধা না দিলে সে কি করতো কে জানে? বীরকে অভিনন্দন জানাতে এসে দু'একজনের হয়তো মাথাই কাটা পড়তো আজ। তাতে তাঁর সুনাম বৃদ্ধি পেত না।

আলিবর্দি শুধু প্রজাদের মনের কথাই জানেন, তা নয়। সিপাহীর মনের খবরও তিনি রাখেন। তাই তার অতি উৎসাহে তিনি মনে মনে হয়তো হেসেছিলেন। কোনো শাস্তি দেননি তাকে। একেই বলে নবাব। তাঁর নাতিটি কি অমন হবে?

বেগমসায়েবার ভীতিবিহ্বল কণ্ঠস্বর শুনলাম, 'উঃ এতখানি কেটে গিয়েছে?'

'যুদ্ধে গেলে অমন হয়েই থাকে। তোমাদের মতো বেগম মহলে বসে থাকা তো আমাদের কাজ নয়।' গর্ব ঝরে পড়ে সিরাজের কথায়।

নবাব আলিবর্দির হাস্যধ্বনি শোনা গেল।

বেগমসায়েবা বলেন, 'তুমি হাসছো? ঘা যে এখনো শুকোয়নি। তখনই বলেছিলাম, একে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই। এতটুকু বয়সে কেউ যুদ্ধে যায়?'

'যায় বৈকি। গিরিয়ার যুদ্ধে জালিম সিং-এর কথা মনে নেই তোমার? সে তো সিরাজের চেয়েও ছোট ছিল। তার মুখের দিকে চেয়ে তুমিই না একদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলে। আজ ভুলে যাচ্ছো কেন?'

'জালিম সিং-এর কথা জীবনেও ভুলবো না, নবাব। তার মুখে যা দেখেছি তোমার মুখেও তা দেখিনি।'

'এবার বর্গীর যুদ্ধে আমি সিরাজের মুখে কিন্তু তা দেখেছি। প্রথমে আমারও মনে হয়েছিল, ওকে নিয়ে গিয়ে হয়তো ভুল করেছি। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে ওর দিকে চেয়ে আনন্দে আমার বুক ভরে উঠতো। সিরাজকে এত ভালোবাসি, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যদি সে ফিরে না আসতো তবু আপশোষ হতো না।'

'তুমি পরিশ্রান্ত নবাব। হিসেব করে কথা বলার মতো অবস্থা তোমার নেই। তাই যা-তা বকে চলেছো।' মনে হলো, বেগমসায়েবা নবাবের ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। সিরাজ যে তাঁর নয়নের মণি।

সিরাজ হেসে ওঠে।

'হাসলি যে?' বেগমসায়েবা প্রশ্ন করেন।

'দাদু সারা রাত্রি ঘুমিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় কালও একথা বলেছিল।'

'সত্যি! নবাব কি পাগল হয়েছে?'

'না বেগমসায়েবা, পাগল হলে ওকথা বলতে পারতাম না। সিরাজের হাতের ক্ষতচিহ্ন দেখে তুমি দুর্ভাবনায় মরছো, আর আমার গর্ব হচ্ছে। সিরাজেরও হচ্ছে, জিজ্ঞাসা করে দেখো।'

'হচ্ছেই তো। এবার ওরা এলে আমি একা যুদ্ধ যাবো। তোমাকে যেতে দেবো না, দাদু। তুমি বুড়ো হয়ে পড়েছো।'

নবাব মৃদু হেসে বলেন, 'থাক্, খুব বাহাদুরি হয়েছে। এবারে পোশাকগুলো ছেড়ে এসো তো। আমি হাকিম ডাকতে পাঠাচ্ছি।'

তাড়াতাড়ি চলে যেতে চেষ্টা করি, কিন্তু তার আগেই ছুটতে ছুটতে বাইরে বার হয়ে আসে সিরাজ।

'এই, এখানে কি করছো?'

একটা আরশির ওপর ঝাড়ন বুলিয়ে চলেছিলাম, বললাম, 'এটা পরিষ্কার করছি, নবাবজাদা।'

'উহুঁ, মিথ্যে কথা। এখানে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনছিলে।'

তার কথায় স্তম্ভিত হই। বেগমসায়েবা কোনোদিন সন্দেহ করেননি, অথচ সিরাজ ঠিক ধরে ফেললো। নবাব হতে হলে এমন বুদ্ধিমান বুঝি হতে হয়।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। জানি, শাস্তি একটা পাবোই। কিন্তু সেটা কতখানি গুরুতর হবে ভেবে উঠতে চেষ্টা করি।

সিরাজ এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে বলে, 'চলো'।

'কোথায় নবাবজাদা?' ভয়ে কেঁপে উঠি। কার মুখ দেখে যে উঠেছিলাম। সোফিয়া! হ্যাঁ,

সোফিয়াকেই দেখেছিলাম প্রথমে। ছুটতে ছুটতে সে ছাদে উঠছিল নবাবকে দেখার জন্যে। মনে মনে তার মুণ্ডপাত করি।

'আমার ঘরে চলো।'

'আপনার বেগমসায়েবারা যে অসন্তুষ্ট হবে।'

'বেগমসায়েবাদের কাছে যাচ্ছি নাকি আমি!'

'তাঁরা হয়তো বসে আছেন আপনার ঘরে। আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। এতদিন পরে ফিরলেন তো।'

'তারা বসে থাকে না। আমার জন্য তাদের মাথাব্যথা নেই। তারা নিজেদের নিয়েই মশগুল।' কথাটা সাধারণভাবে বললেও তাঁর কচি কণ্ঠস্বরে একটা ব্যথা ফুটে উঠল। বুঝলাম, নবাব আর তাঁর বেগমের বুকভরা ভালোবাসা পেয়েও এই কিশোর-হৃদয় তৃপ্ত নয়। কোথায় যেন ফাঁক রয়ে গিয়েছে, যে-ফাঁক এর বেহিসাবী মনকেও ব্যথিত করে তুলেছে। প্রথম যৌবনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বেগমদের ধরন-ধারণ আর তাদের মন যেন চিনে ফেলেছে সিরাজ। তবু সামান্য জারিয়ার কাছে এমনভাবে নিজেকে প্রকাশ করে ফেলল কেন সে? অল্প বয়স বলেই কি মাঝে মাঝে নিজের মর্যাদা বজায় রেখে চলতে ভুলে যায়? আল্লার কাছে প্রার্থনা করি, সে যেন হামেশাই এমন ভুল করে।

তার ওপর সহানুভূতিতে মন ভরে উঠল। এতদিন তাকে বাংলার নবাবের উদ্ধত আদুরে নাতি বলেই জানতাম। জানতাম, সিরাজের কোনো বাসনাই অপূর্ণ থাকে না। আজ জানলাম, তার মনের নিভৃত কোণে এমনি কোনো কামনা রয়েছে যা আজও অপূর্ণ। ভবিষ্যৎ বাংলার নবাব সেখানে ভিখারী। আমার বুকের ভেতরটা টন্‌টন্ করে উঠল। যদি পারতাম, বুকের রক্ত দিয়েও পূর্ণ করতাম সিরাজের মনের বাসনা। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। আমি যে জারিয়া। ভালোবাসা আমার পক্ষে পাপ। ভালোবাসলেও সে ভালোবাসার প্রকাশ অমার্জনীয় অপরাধ।

আমি কি সত্যিই সিরাজকে ভালোবেসে ফেললাম? এত সহজে কি করে তা সম্ভব? আমি যে কোনো নাম-না-জানা সিপাহীর ঘরে যেতে চাই। কিন্তু এই মুহূর্তে যেতে ইচ্ছে করছে না কেন? সিরাজের বলিষ্ঠ হাত আমার বাঁ-হাতখানাকে ধরে রয়েছে বলেই কি?

'অমন বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছো কেন? চলো, আমার জুতো খুলে দেবে।'

'চলুন, নবাবজাদা।'

সিরাজের ঘরে গিয়ে দেখলাম, সত্যি কোনো বেগম নেই সেখানে। তারা নিজেদের মহলে তখনো নিদ্রা যাচ্ছে নিশ্চয়। অথচ স্বামী ফিরছেন শুনে আলিবর্দির বেগম এই বয়সেও ভোরবেলা উঠে কেমন সিঁড়ির কাছে গিয়ে একা দাঁড়িয়েছিলেন। কত তফাৎ? আলিবর্দি সত্যিই ভাগ্যবান। তাই তাঁর ভাগ্যাকাশের সূর্য কখনো অস্ত যাবে না—যেতে পারে না। বেগমসায়েবাও ভাগ্যবতী। নবাবের গৃহিণী হয়েও কোনো ভাগ না দিয়ে সব সুখ উপভোগ করছেন।

মুখে সিরাজ যাই বলুক, মনে মনে সে অন্তত একজন বেগমকেও আশা করেছিল তার ঘরে। ভেবেছিল, এতদিন পরে ফিরে আসার আনন্দে অভিভূত হয়ে কোনো বেগম ঘরে ঢোকার আগেই ছুটতে ছুটতে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে অভ্যর্থনা জানাবে। কিন্তু কেউ নেই। সিরাজের আশাহত দৃষ্টিতেও ফুটে উঠল সেই একই কথা—কেউ নেই। তার বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসে সে আমার কাছে ধরা পড়ে গেল।

কিন্তু সামান্য জারিয়ার সামনে সে নিজেকে প্রকাশ করে না। তাই আবোল-তাবোল বকতে শুরু করে। এত কথা তাকে কোনোদিন বলতে শুনিনি। দুঃখের মধ্যেও হাসি পেল। মনে মনে বলি, যতই তুমি চালাক হও না কেন সিরাজ, আমি যে নারী। তোমার এত কথা কোন্ জিনিসকে চাপা দেবার জন্যে তা কি বুঝি না?

সিরাজ বলে, 'বুঝলে, এই মুর্শিদাবাদে থাকতে আমার মোটেই ভালো লাগে না। যুদ্ধ করতে কষ্ট আছে ঠিক, কিন্তু আনন্দও আছে।'

'যুদ্ধটা তো সব সময়ের জন্য নয়, নবাবজাদা।' হঠাৎ সাহস পেয়ে যাই।

'নয় কেন?'

'বর্গীরা চিরদিন থাকবে না।'

'সাদা মুখগুলো আছে।'

'ওরা আর ক'জন?'

সিরাজ হেসে বলে, 'ওদেরকে কেউ চিনতে পারেনি। দাদু কিন্তু ঠিক চিনেছে। সামান্য ক'জন হলে কি হবে, ভীষণ শক্তি ওদের।'

'তবু আপনার কাছে কিছুই নয়। ইচ্ছে করলে ওদের দু'দিনেই তাড়িয়ে দিতে পারেন।'

'আমি!' সিরাজ অবাক হয়। বুঝতে পারি, তাকে এতখানি প্রাধান্য কেউ দেয়নি কখনো। তার বেগমরাও নয়। সে যেন এই প্রথম বুঝল যে, সে সাবালক।

'হ্যাঁ, আপনি নবাবজাদা।'

'দাদুই তো আছে।' তার কথা শেষ হয় না।

'তাঁর বয়স হয়েছে। এখন আপনার ওপরই ভরসা। আপনাদের কথা আমি সত্যিই লুকিয়ে শুনছিলাম। আপনার বীরত্বের কথাও শুনলাম।'

'ও!' সিরাজ অন্যমনস্ক হয়। সে আপন মনে ভেবে চলে।

'নবাবজাদা।'

'উঁ।'

'আপনার জুতো খুলে দিই। হাকিম আসবে যে।'

'ও, হ্যাঁ দাও।' সিরাজ তার পা বাড়িয়ে দেয়। বলিষ্ঠ পা, সুন্দর পরিপূর্ণ গড়ন, কোথাও খুঁত নেই। আস্তে আস্তে তার একখানা পা আমার কোলের ওপর তুলে নিই। দেরি করবো, যত খুশি দেরি করবো তার জুতো খুলতে। এইভাবেই আমার কোলের ওপর পড়ে থাক্ তার পা। এই ভারটুকু বহন করার জন্যেই বোধহয় এতদিন উদগ্রীব হয়েছিলাম।

হয়তো তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিলাম। অনেকক্ষণ চেয়েছিলাম। নইলে এতক্ষণে শুধু বাঁ পায়ের জুতো খোলা হবে কেন?

হঠাৎ সে চীৎকার করে ওঠে, 'আবার ওভাবে চেয়ে আছো? মানা করেছি না কত!'

কেন যে দুর্মতি হলো জানি না। বলে ফেললাম, 'ক্ষতি কি, নবাবজাদা?'

'এই দেখো ক্ষতি।' সে ডান পা দিয়ে আমার হাঁটুর ওপর আঘাত করে। অসহ্য ব্যথায় কুঁকড়ে যাই। জুতোর নীচে লোহা আছে নিশ্চয়।

কিন্তু সিরাজের মুখের দিকে চেয়ে নিজের যন্ত্রণার কথা ভুলে যেতে হয়। সেও চীৎকার করে পালঙ্কের ওপর গড়িয়ে পড়ে।

'কি হলো নবাবজাদা, কোথায় লাগল?'

'পা-টা আবার মুচকে গেল।' কাতরাতে কাতরাতে সে বলে।

তাড়াতাড়ি তার ডান পায়ের জুতো খুলে ফেলি। দেখি, গোড়ালির কাছে অনেকখানি ফুলে উঠেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে কখন লেগেছিল হয়তো।

খালি পা আবার কোলে তুলে নিই। কি করবো ভেবে না পেয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিই। কিছুক্ষণ পরে সিরাজ শান্ত হয়। সে বলে, 'তোমার কি খুব লেগেছিল?'

'না, নবাবজাদা।'

'একি, রক্ত এলো কোথা থেকে!' সিরাজ তার পায়ের গোড়ালির দিকে চেয়ে বলে ওঠে।

'কই না তো?'

'এই যে! আমার পা তো কাটা ছিল না।'

নিজের হাঁটুর দিকে আমার নজর পড়ে। সেখানকার পোশাক রক্তে ভিজে উঠেছে। সিরাজের পদাঘাতের ফল।

'রক্তটা আমার নবাবজাদা।' শান্তভাবে বলি। অপরিসীম তৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে। আমার রক্ত নবাবজাদার পায়ে।

'তোমার কি করে হলো?'

আমি চুপ করে থাকি।

'ও, এত লেগেছে! কই দেখি?'

'না-না, থাক্। বেগম মহলে যদি এভাবে যুদ্ধ করতে পারেন, তাহলে মুর্শিদাবাদে থাকতে আপনার ইচ্ছে হবে, নবাবজাদা।

'কি বলছো!' সিরাজের চোখে বিস্ময়।

'যদি মুর্শিদাবাদে থাকেন, তাহলে প্রতিদিন এভাবে আমাকে পদাঘাত করে রক্ত দেখতে পারেন। আমি আনন্দের সঙ্গে সহ্য করবো। আপনারও যুদ্ধের সাধ মিটবে। মুর্শিদাবাদকেও আর একঘেয়ে বলে মনে হবে না।'

সিরাজ বিদ্যুৎগতিতে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরে, হোসেন কুলিখাঁ যেখাবে ঘসেটি বেগমকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। এত আনন্দ, এত শিহরণ এতে! বিহ্বল হয়ে পড়ি। বেগমসায়েবার হাত যেখানে লাগলে আমার ঘৃণা হতো, এখন কতবার সিরাজের হাত সেখানে লাগল। কই, ঘৃণা হচ্ছে না তো, আনন্দ হচ্ছে। অথচ সিরাজ পুরুষ।

'তুমি আমায় ভালোবাসো?' সিরাজ বলে।

'অপরাধ না নিলে হ্যাঁ।'

'চিরকাল বাসবে?'

'যতদিন বাঁচবো।'

'আমি মরার আগে তুমি মরো না।' সিরাজের স্বরে কাকুতি।

'আল্লা যেন আপনার কথা শোনেন, নবাবজাদা।'

'তোমার নাম কি?'

'তেমন নাম তো আমার নেই।'

'তোমার নাম লুৎফা—ভালোবাসা।'

'নবাবজাদার অশেষ দয়া।'

দূরের ফররাবাগের হাজার ফুলের গন্ধ বাতাসে ভেসে আসে। সে-গন্ধ আমার মনকে মাতিয়ে তোলে। ফুলের গন্ধের সঙ্গে মনের এ সম্পর্ক আগে কখনো অনুভব করিনি। ঘরের ঝুলন্ত বাতিতে দিনের আলো পড়ে বিচিত্র বর্ণের দ্যুতি ঠিক্‌রে বার হচ্ছে। তারই নানান প্রকাশ চারিদিকের আরশিতে।

সিরাজ আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলে, 'তুমি এমন পোশাক পরো কেন?'

'আমাদের যে ভালো পোশাক পরতে নেই নবাবজাদা।'

'কেন?'

'আমি যে জারিয়া।'

'কে বললো তুমি জারিয়া? তুমি আমার বেগম। আজই মসলিন আনিয়ে দিচ্ছি তোমার জন্যে।'

সোফিয়ার কথা মনে হলো। কষ্ট হলো তার জন্যে। তার বেগম হবার শখ। রঙটা ময়লা না হলে

আজ আমার জায়গায় হয়তো সে থাকতো। কিন্তু সিরাজ কি রঙে ভুলল? রঙ তো অনেক দেখেছে সে। আমার চেয়েও রূপসী বেগম তার রয়েছে। সিরাজ যদি রঙে ভুলে থাকে, তাহলে আজ আমিই সবচেয়ে বেশি প্রতারিত হলাম।

পরদিন বেগমসায়েবা ডেকে পাঠালেন। ভয়ে ভয়ে যাই। কারণ তিনি কোনদিনই ডেকে পাঠান না। ডেকে পাঠাবার অর্থ তাই এখানে খুব সুস্পষ্ট। বেগমসায়েবা সম্ভবত জারিয়ার ধৃষ্টতার জন্যে শাস্তি দিতে প্রস্তুত হয়ে বসে রয়েছেন। ভবিষ্যৎ নবাবকে ছলনা করেছি বলে আমার শাস্তি। কিন্তু আল্লা তো জানেন, ছলনা আমি করিনি। সিরাজ যদি আজ বলে, তার দুর্বল মুহূর্তে কৌশলে তার মুখ দিয়ে বেগম হবার স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছি, তাহলে মরতেও আপত্তি নেই, সে-মৃত্যু যত ভয়ঙ্করই হোক না কেন? কিন্তু সে কি সে-কথা বলতে পারে? কাল তার চোখ-মুখ দেখে তো সে রকম মনে হয়নি।

ধীরে ধীরে বেগমসায়েবার ঘরে প্রবেশ করি।

'এই যে লুৎফা, এসো।' তাঁর আহ্বান আমাকে নাড়া দেয়। এ নাম তিনি কি করে জানলেন? সিরাজের দেওয়া নাম সে ছাড়া তো আর কেউ জানে না। কেউ শোনেওনি। তবে কি সত্যিই সে সব কিছু বলে দিয়েছে? বেগমসায়েবা কি বিদ্রূপ করছেন? দুরাশাকে মনে স্থান দিয়েছি বলে ব্যঙ্গ করছেন? একদিনের বেগমগিরি আজই তিনি খতম করবেন?

আমার গতি থেমে যায়। মাথাটা আপনা হতে নুয়ে আসে।

'ওকি, থামলে কেন? আমার সিরাজের বেগমসায়েবাকে যে দেখতে সাধ হয়েছে। কাছে এসো, চোখ ভরে দেখি।'

মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে হয়। কী কুক্ষণে যে কাল আড়ি পেতেছিলাম। অমন দুঃসাহস কেন যে হয়েছিল? সোফিয়ার মুখ দেখে ওঠার ফল যে এত সুদূরপ্রসারী হতে পারে কল্পনা করিনি। আমি কেঁদে ফেলি।

'ওকি! ছিঃ, কাঁদছো কেন লুৎফা? কাছে এসো, তোমাকে একটু ভালো করে দেখবো যে। এমন দিনে কি কাঁদতে হয়?'

এ স্বর তো ঠাট্টা-বিদ্রূপের নয়। এতে যে সত্যিই আগ্রহ আর মমতা মাখানো। ধীরে ধীরে চোখ তুলি। চোখের জলে বেগমসায়েবার মুখ ঝাপসা দেখা যায়। ওড়না দিয়ে জল মুছে ফেলি। দেখি, বেগমসায়েবা অধীর আগ্রহে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন।

তাঁর কাছে গেলে তিনি পালঙ্কের একপাশে বসতে বলেন। এতখানি সম্মান জারিয়াকে তিনি কখনো দেন না। ঠাট্টা করেও নয়। বুঝলাম, আমার জীবনের এক মহা সন্ধিক্ষণ আজ। আমি সত্যিই বেগম।

বেগমসায়েবার পাশে এসে বসি।

'এতদনে সত্যিই বড় হয়েছো তাহলে?' তিনি আমাকে দু' বাহু দিয়ে বেষ্টন করেন।

ভীষণ লজ্জিত হই। বেগমসায়েবার দিকে চাইতে পারি না।

'অত লজ্জা কেন? সিরাজের বেগমের সঙ্গে একটু তামাশাও করতে পারবো না? তবে কার সঙ্গে করবো? সিরাজ যে আমার নাতি।'

সাহস হলো তাঁর কথায়। বললাম, 'এ রকম ঠাট্টা তো আগেও করতেন বেগমসায়েবা।'

'আগে থেকে যে জানতাম, তুমি সিরাজের বেগম।'

'সে কি!'

'হ্যাঁ লুৎফা, হারেমে বেগম অনেক দেখেছি। সিরাজের তো এমন বেগম হলে চলবে না। তার

এমন একজন দরকার, যে তার জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে থাকবে, নইলে সিরাজের যে মঙ্গল নেই। ও বড় জেদী, বড় দুঃসাহসী, বড় অবুঝ। তুমি ওর ভার নাও। হারেমের বেগমের মতো করে নয়, ওর জীবনের সঙ্গে তুমি মিশে এক হয়ে যাও।' বেগমসায়েবার গলা ভারী হয়ে ওঠে। চোখ দুটো চকচক করে।

আনন্দে আমার মনের দু'-কুল প্লাবিত হয়ে যাচ্ছিল। বললাম, 'তাই হবে বেগমসায়েবা। আমিও হারেমের বেগম হতে চাই না।'

'লোক চিনতে আমার ভুল হয় না, লুৎফা। আমি তোমাকে চিনি।'

আজ বুঝলাম, কেন তাঁর আমার ওপর অহেতুক পক্ষপাতিত্ব ছিল। আমার রূপের জন্যে নয়, আমার বয়সের জন্যেও নয়। আগে থেকেই আমি তাঁর আদুরে নাতির বেগম হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলাম। তাই তাঁর নিজের কক্ষের আশেপাশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমাকে ঘোরাফেরা করতে দেখেও তিনি কোনোদিন কিছু বলেননি।

'সিরাজ যে তোমাকে চিনে নিতে পেরেছে, এতেই আজ আমার সব চাইতে বেশি আনন্দ। আমি বললে সে হয়তো শুনতো না। তাকে যা বলা হয়, করে ঠিক তার বিপরীত। কিন্তু এখন বুঝলাম, সেও মানুষ চেনে।'

আমার জন্য স্বতন্ত্র কক্ষ নির্দিষ্ট হলো। সেখানে গিয়ে দেখি, থরে থরে সাজানো রয়েছে বহুমূল্য পোশাক। এতদিনের জারিয়ার বেশ ছেড়ে ফেলি। সিরাজের পছন্দ হতে পারে এমন একটা পরিচ্ছদ বেছে নিয়ে পরি। আনন্দে কক্ষের চারিদিকে ঘুরে বেড়াই। আরশির সামনে নানাভাবে দাঁড়িয়ে নিজের রূপ যাচাই করি। মেহেন্দি রঙে আঙুল রাঙিয়ে তুলি। চোখে এঁকে দিই সুর্মা।

কে বলে আমি জারিয়া! নিজের রূপ দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাই। কিন্তু আমি যে বড় ছোট। হোসেন কুলিখাঁ ঠিকই বলেছিলেন, আমি ছোট। বেগমসায়েবাও যখন-তখন সে-কথা বলতেন। এখনো হয়তো মনে মনে বলেন।

দরজার কাছে এগিয়ে যাই। উঁকি দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখি, আশপাশে কেউ আছে কিনা। দরজা বন্ধ করে দিয়ে আবার আরশির সামনে গিয়ে দাঁড়াই। সমস্ত পোশাক খুলে ফেলি। আরশির ভেতরে আমার প্রতিবিম্বের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকি। আমি ছোট, সত্যিই ছোট। আমি হামিদার মতো নই। আমি ঘসেটির মতো নই। এমনকি সোফিয়ার মতোও আমি নই।

কি করে তাড়াতাড়ি বড় হবো কে বলে দেবে? সোফিয়াকে জিজ্ঞাসা করবো কি? কিন্তু সে যদি বিদ্রূপ করে? তার চোখের সামনে বেগম হয়েছি বলে মনে মনে সে নিশ্চয়ই আমাকে হিংসে করবে। যদি এমন কোনো পথ বলে দেয় যাতে আমার ক্ষতি হয়? কিন্তু সে তো এখনো জানে না। প্রাসাদের কেউই জানে না।

মনে মনে ভয় হয়, আমি ছোট বলে সিরাজ হয়তো আমাকে অবহেলা করবে। পরিত্যাগও করতে পারে।

শেষে সোফিয়ার কাছে যাওয়াই স্থির করলাম।

কিন্তু তার কাছে যেতে হলে জারিয়া সেজে যেতে হবে। ঘরের একপাশে ছেড়ে রাখা পোশাক পড়ে রয়েছে। সেগুলো তুলে নিলাম। বড় তুচ্ছ বলে এখন মনে হয় এ পোশাককে। পরতে ইচ্ছে হয় না, তবু পরতে হবে। নিজের স্বার্থের জন্যে আবার জারিয়া সাজাতে হবে।

দরজায় ধাক্কা শুনি, সিরাজ এসেছে বোধহয়। জারিয়ার পোশাক একপাশে লুকিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি আবার নতুন পরিচ্ছদ পরে নিই।

দরজা খুলি।

ঘসেটি বেগম দাঁড়িয়ে। আশ্চর্য, ঠিক আমারই পোশাকের মতো রঙের মসলিনে তার অঙ্গ আবৃত।

আমার দিকে চেয়ে তার চোখ জ্বলে ওঠে। আমি মনে মনে হাসি। এতদিনের অত্যাচারের উচিত প্রতিফল পাবে সে। সে জানে না, আমি সিরাজের বেগম। তার মুখ রাগে লাল হয়ে ওঠে। চীৎকার করে, 'বেগম সাজার শখ হয়েছে? লুকিয়ে লুকিয়ে বেগম সাজা হচ্ছে?' চপেটাঘাত করে সে আমার গালে।

গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেলেও কিছু বলি না তাকে। দেখা যাক্ আজ কতদূর ওঠে। এতদিন ঘরখানা মাঝে মাঝে ঘসেটিই ব্যবহার করতো। কেন ব্যবহার করতো, সে খবরও জানতে আর বাকি নেই। ঘরখানা একটু নিরিবিলিতে বলে সে হোসেন কুলিখাঁর সেবা করতো এখানে। সোফিয়া নিজে আমাকে বলেছে সেদিন।

'কি করছিলি এখানে?'

'একটু সাজগোজ করছিলাম।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। আমার পোশাক কেন পরেছিস্? এত স্পর্ধা?' আর এক চপেটাঘাত।

বুঝলাম, সহজে ছাড়বে না। আমার মাথায় আগুন জ্বলছিল, তবু সহ্য করলাম। যদি লাথি দিতে আসে পালাতে হবে। নইলে বেগমগিরি আমার আজই শেষ হবে।

ঘরের রাশিকৃত পরিচ্ছদ দেখিয়ে বলি, 'ওগুলো সবই কি আপনার বেগমসায়েবা?'

বিস্মিত হয়ে ঘসেটি ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে সব নাড়াচাড়া করে। আপন মনে বিড়বিড় করে কি যেন বলে। তারপর আমাকে প্রশ্ন করে, 'এসব কোথা থেকে পেলি?'

'সব বেগমের ঘর থেকে একখানা করে চেয়ে এনেছি।'

'তারা দিলে?'

'দেবে না কেন? আমাকে সবাই স্নেহ করেন যে।'

ঘসেটি যেন বোবা হয়ে যায়। সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। আমার গাল জ্বলে যাচ্ছিল, বোধহয় রক্ত ফুটে বার হচ্ছে। তবু ঘসেটির মুখ দেখে কৌতুক অনুভব করছিলাম।

হঠাৎ সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'কিন্তু আমার এই ঘরে কেন এসেছিস?'

'এ ঘর আপনার? তা তো জানা ছিল না। আমি জানতাম, দক্ষিণ-পশ্চিমের ঘরখানাই আপনার।'

'তর্ক হচ্ছে? আমার সঙ্গে তর্ক? দূর হয়ে যা এখান থেকে।' সে এসে আমার চুল চেপে ধরে।

'যাচ্ছি বেগমসায়েবা! হোসেন কুলিখাঁ কি আবার এসেছেন?'

'কি বললি?'

'বলছি হোসেন কুলিখাঁ কি ঢাকা থেকে আবার মুর্শিদাবাদে এসেছেন?'

ঘসেটি থ' হয়ে যায়। কি বলবে ভেবে পায় না। তার দৃষ্টি দেখে মনে হয় যেন আমাকে সে গিলে খাবে।

আমি বলি, 'অমন করে তাকাবেন না বেগমসাযেবা, ভীষণ ভয় পাই আমি। কিন্তু এমন ঘন ঘন যাতায়াতে অর্থেরই অপচয় হয়, কোনো কাজ হয় না।'

এবারে ঘসেটি উন্মত্ত হয়ে ওঠে। বুঝলাম, পালাতে না পারলে এখানেই আমার জীবন শেষ। সে যেভাবে আমার মাথার চুল ধরে রয়েছে, ছাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বেশিক্ষণ দেরি করাও উচিত নয়।

মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। সুড়সুড়িতে ঘসেটির বড্ড ভয় আছে বলে জানি। বাঁ হাত দিয়ে তাকে সুড়সুড়ি দিই।

ছিটকে দূরে সরে যায় সে। একমুহূর্ত বিলম্ব না করে বেগমসায়েবার ঘরের দিকে ছুটতে থাকি।

তিনি ছাড়া আমাকে রক্ষা করার দ্বিতীয় কোনো লোক নেই এখন। আর একজন যে পারে সে এখনো নবাব মহলের বাইরে রয়েছে। বাইরে না থাকলে এতক্ষণে অন্তত আমার কাছে একবার আসতো।

ঘসেটি আমার পেছনে পেছনে বেগমসায়েবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়। সে ফেটে পড়ে। বলে, 'অনুগ্রহ দেখিয়ে জারিয়াদের মাথায় তুলেছো তুমি। পায়ের তলায় না রাখলে ওরা কখনো ঠিক থাকে? এদের কিভাবে সিধে রাখতে হয় আজ তোমাকে দেখাবো। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবের বেগম হয়েও এতদিনে এটুকু শিখলে না? কি করেই বা শিখবে! সাধারণ লোকের বিবি ছিলে, হঠাৎ বেগম হয়েছো তো।'

'বাজে কথা থাক্। কি হয়েছে বলো?'

'কি হয়েছে? ওর দিকে চেয়ে দেখো কেমন অপ্সরী সেজেছে।'

'ও অপ্সরী সাজায় তোমার কি এসে যায়?'

'তা তো বলবেই। দাসী-বাঁদী সব বেগম সেজে বসে থাকবে। চমৎকার, এই না হলে বাংলার বেগম।'

'উপদেশ দিও না ঘসেটি।' বেগমসায়েবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে বোঝা গেল।

'তোমার পেয়ারের জারিয়া আমার গায়ে হাত তুলেছে।'

'সত্যি লুৎফা?'

'না বেগমসায়েবা, ওঁকে সুড়সুড়ি দিয়ে পালিয়ে এসেছি। নইলে উনি আমাকে মেরে ফেলতেন।'

'কেন?'

'উনি আমার ঘরে গিয়ে আমাকে দূর হয়ে যেতে বলেন। আমি কেন তা যাবো? তাতেই ওঁর রাগ।' হোসেন কুলিখাঁর কথা ইচ্ছে করেই উল্লেখ করলাম না। বিপদে পড়লে সেটাকে শেষ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের জন্যে তুলে রাখলাম।

'তাই নাকি! আর তুমি তা সহ্য করলে লুৎফা? কাউকে হুকুম করলে না কেন, যাতে ঘসেটিকে বার করে দেয় ঘর থেকে।' বেগমসায়েবা রীতিমতো উত্তেজিত।

'তুমি বলছো কি মা?' ঘসেটির চোখ বিস্ফারিত।

'ঠিকই বলছি। ভবিষ্যৎ বাংলার বেগমের ঘরে ঢোকা তোমার পক্ষে ধৃষ্টতা। লুৎফা তোমাকে অপমান না করে দয়া দেখিয়েছে।'

ঘসেটির মুখের অবস্থা দেখে আমারই লজ্জা হলো। সে কি করবে, কি বলবে, কিছুই বুঝতে পারে না। কেমন যেন একটা অসহায় ভাব। আমি গিয়ে তার হাত ধরি।

'থাক্! ঢের হয়েছে, ছেড়ে দাও।' সে ঝট্‌কা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'একটা কথা বলি মা, ভবিষ্যৎ বাংলার নবাব এত সহজে ঠিক হয় না।'

'ঘসেটি।' বেগমসায়েবা অস্বাভাবিক জোরে চেঁচিয়ে ওঠেন।

'তোমার ধমকে বাংলাদেশ কাঁপতে পারে, কিন্তু ঘসেটি কাঁপবে না।'

তার ঔদ্ধত্যে আমার রাগ হয়। বলি, 'বেগমসায়েবার ধমকে না কাঁপতে পারেন, কিন্তু আমি আপনাকে কাঁপিয়ে ছেড়ে দিতে পারি ঘসেটি বেগম।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে চলে যায়।

বেগমসায়েবা আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে বলেন, 'ব্যাপার কি লুৎফা? তোমার কথায় ও এমনভাবে পালিয়ে গেল কেন?'

'আজ আমাকে কিছু বলতে আদেশ করবেন না, বেগমসায়েবা। যদি কোনোদিন প্রয়োজন হয় আমি নিজে থেকেই বলবো।'

'বেশ, তাই বলবে।'

বেগম হয়েছি বলে আমার প্রিয় গবাক্ষ পরিত্যাগ করিনি। বেগম হয়ে ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে থাকা আমার ধাতে নেই। তাই দিনের মধ্যে কতবার যে মহলের নির্জন স্থানে গিয়ে দাঁড়াই তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

সিরাজ আবার যুদ্ধে গিয়েছে। এবারে বর্গীদের একেবারে শেষ করে আসবেন প্রতিজ্ঞা করে নবাব যাত্রা করেছেন তাঁর নাতিকে সঙ্গে নিয়ে।

বর্গীদের দুঃসাহস সীমা ছাড়িয়েছে। জগৎ শেঠের মধুগড়ের অগাধ জলরাশি না থাকলে বাংলার ধনদৌলত রক্ষা পেতো না। নবাবের সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে বর্গীরা কাশিমবাজার অবধি চলে এসেছিল। মধুগড়ের জলের মধ্যে ফেলা হলো দেশের যত মণিমুক্তা হীরে জহরত আর সোনাদানা। তাতে নিঃস্ব হলো না বাঙালী বণিকেরা। তবু শোনা যায়, অনেকের ধনরত্ন আর উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না, অতল জলরাশির কোথায় গিয়ে যে লুকিয়েছে তার হদিশ নেই।

বর্গীরা যে একেবারে খালি হাতে ফিরে গিয়েছে তাও নয়। সামনে যা কিছু পেয়েছে তুলে নিয়ে গিয়েছে।

সিরাজ নেই। শূন্য মনে দাঁড়িয়ে আছি। চেয়ে থাকি দূরে এমতাজমহলের গম্বুজের চূড়ার অস্তমিত সূর্যের রক্তবর্ণ রশ্মির দিকে।

হঠাৎ নীচে বাগিচার দিকে আমার দৃষ্টি পড়ে। চামেলি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সোফিয়া আর মহম্মদের প্রেমালাপ চলেছে।

সোফিয়া বেগম হবার দুরাশা ছেড়েছে দেখছি। বেচারা!

নিরাশ্রয় মহম্মদকে বেগমসায়েবাই আশ্রয় দিয়েছেন। লোকটিকে আমার ভালো লাগে না। স্পষ্ট করে বলতে গেলে তাকে দেখে আমার ভয় হয়। কেমন একটা ক্রুর দৃষ্টি তার চোখে। কেন যে বেগমসায়েবা একে আশ্রয় দিয়েছেন জানি না।

সোফিয়া শেষে মহম্মদকে হৃদয় দিল, আর লোক পেল না? বেগমসায়েবাকে বলতে হবে সব ঘটনা। দু'জনার শাদি দিয়ে দেবো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। শাদি হলে আর তারা মহলে থাকতে পারবে না। সোফিয়ার জন্য একটু কষ্ট হবে, কিন্তু মহম্মদ তো বিদায় নেবে। সিরাজ মহম্মদকে বড় বেশি পছন্দ করে। সে অসন্তুষ্ট হবে ভেবে আমি কিছু বলতে পারি না। হয়তো ভাববে, তার সব ব্যাপারেই নাক গলাতে চেষ্টা করি।

সিরাজের কোনো দোষ নেই। সে তোষামোদ পছন্দ করে। তোষামোদের ক্ষমতা মহম্মদের অদ্ভুত। অমন যে কর্কশ স্বভাব, কিন্তু বেগমসায়েবা আর সিরাজের কাছে একেবারে ভিজে বেড়ালটি। কেমন গলে পড়া ভাব। যে মানুষ এত সহজে তার ভোল পাল্টাতে পারে, সে কখনো ভালো হয় না, হতে পারে না।

সন্ধে হয়ে আসে। এমতাজমহলের গম্বুজ ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। মহলের চারিদিকে বাতি জ্বলে উঠেছে। নিজের ঘরে ফিরে যাবো। নরম বিছানার ওপর গা এলিয়ে দেবো এখন।

সিরাজ এ সময় হয়তো যুদ্ধ করছে। কিংবা শিবিরের মধ্যে বসে দাদুর সঙ্গে সারা দিনের যুদ্ধ সম্বন্ধে তার আলোচনা চলছে। কিংবা বোধহয় আহত, কিংবা....

আমার সারা দেহ শিউরে ওঠে। এমন অশুভ চিন্তা মাথায় আসে কেন? বাংলার ভবিষ্যৎ নবাব যুদ্ধক্ষেত্রে থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক, এটাই তো গৌরবের। যুদ্ধ করে দেশের শত্রুকে বিতাড়িত করবে, প্রজাদের মঙ্গলের জন্যে জীবনপণ করবে, তবেই তো আদর্শ নবাব। তবে কেন নানা আশঙ্কায়

মনটা ভরে ওঠে? যত ভাবি কোনো চিন্তা করবো না, ততই যেন হাজার চিন্তা এসে মাথার মধ্যে জট পাকায়।

একা থাকবো না। তার চেয়ে কোনো জারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে আমার ঘরে যাই। তার সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলে সময় কাটাই। এখন তারা আর আমায় অবহেলা করে না। আমাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে তাদের মধ্যে এখন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে। ঘসেটির প্রতিপত্তি এই কয়দিনেই অনেকটা কমে গিয়েছে।

'বেগমসায়েবা।'

পেছন ফিরে দেখি হামিদা দাঁড়িয়ে।

'কি হামিদা?'

'ঘসেটি বেগমের ঘরে যাবার কি সময় হবে আপনার?'

'তিনি ডাকছেন?'

হামিদা ঘাড় নাড়ে।

'চলো।'

ঘসেটি ছুটে এসে আমার হাত ধরে অভ্যর্থনা জানায়। বুঝলাম, সে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু কেন? তার এ পরিবর্তন একটু অস্বাভাবিক নয় কি?

'ঘরে এসো লুৎফা। তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি বলে কিছু মনে করোনি তো?'

'না।' জবাবটা সংক্ষিপ্ত। এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারলাম না। কারণ, মনের মধ্যে তখন হাজার জিজ্ঞাসা।

পালঙ্কের ওপর বসিয়ে ঘসেটি নিজের হাতে একপাত্র শরবত এনে দেয়। এতটা সৌজন্যের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তাড়াতাড়ি হাত থেকে পাত্রটি নিয়ে বলি. 'কেন মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছেন?'

'গরম পড়েছে, তাই ওটুকু তোমার জন্য আনিয়েছি।'

'শরবত আমি খাই না।' ঘসেটির পক্ষে কিছুই অস্বাভাবিক নয়। পানীয়ের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিতে পারে। কৌশলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি।

'তবে থাক্।' তার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। সে অপমানিত বোধ করছে। দু'দিন আগে যে সবচেয়ে অবহেলিত একজন ক্রীতদাসী মাত্র ছিল, আজ সিরাজের অনুগ্রহে সে ঘসেটিকে নিজের হাতে দেওয়া শরবত পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করে, একি কম বেয়াদবি!

'আমাকে কেন ডাকছিলেন?' শরবতের পাত্রটা একপাশে রেখে বলি।

'এমনি, গল্প করার জন্যে। তোমার কি সময় নেই?'

'আছে।' মনে মনে ভাবি, শুধু গল্প করার জন্যে ডেকে আনার পাত্রী তুমি তো নয়। নিশ্চয়ই কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে, তবে সে উদ্দেশ্য সহসা প্রকাশ করবে না ঘসেটি। ধীরে ধীরে ভাঙবে। আমি অপেক্ষা করি।

সে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। নিজের গলা থেকে একটা বহুমূল্য মুক্তার মালা খুলে নিয়ে আমার গলায় পরিয়ে দেয়।

'একি করলেন!' আমি আপত্তি করি।

'তোমায় দিলাম। সিরাজ আমার স্নেহের পাত্র লুৎফা। তোমাকে তাই স্নেহ করি। সেদিন তোমার পরিচয় পাইনি, তাই অমন ব্যবহার করেছিলাম। কিছু মনে কোরো না।'

'আমি কিছু মনে করিনি, বেগমসায়েবা।'

'সে তোমার মহত্ত্ব। এই মালা তোমার প্রতি আমার স্নেহের নিশানী হয়ে থাক্।'

'বেগমসায়েবার অশেষ দয়া।' মুখে বললেও মনে মনে দস্তুরমতো চঞ্চল হয়ে উঠি। ভাবি, কতক্ষণে উঠতে পারবো।

ঘসেটি অনেক কথাই বলে চলে। বুঝতে কষ্ট হয় না, সব কিছুর উদ্দেশ্য একটাই, আমাকে তোয়াজ করা। ছোট ছোট কথায় আমিও সাধ্যমত জবাব দিয়ে যাই।

'সেদিন তুমি ওকথা বললে কেন লুৎফা? আমার মনে বড় লেগেছে।'

বুঝতে পারি এতক্ষণে আসল কথায় আসছে।

'কি কথা?' অবাক হবার ভান করি।

'বেগমসায়েবাকে আপনি ওভাবে বললেন বলে আমার রাগ হয়েছিল। সেজন্যে আজ ক্ষমা চাইছি।'

'না-না, ক্ষমা কেন? কাঁপাতে তো পারোই আমাকে। ভবিষ্যৎ বাংলার খাস বেগমের সেটুকু ক্ষমতা থাকবে না!'

'অত ভেবে বলিনি।'

'তবে কেন বলেছিলে?'

কথার প্যাঁচে হাঁপিয়ে উঠি। স্পষ্ট করে বলাই স্থির করলাম। ঘসেটির ঘরে যেন বাতাস বয় না। পুঞ্জীভূত পাপ আর অনাচার বহুকাল ধরে বাসা বেঁধে এ ঘরের বাতাসকে দূষিত করে দিয়েছে। তার সুন্দর মুখেও অনাচারের ছাপ। তার ছন্দায়িত দেহে উচ্ছৃঙ্খলতার শ্লথতা।

বলি, 'হোসেন কুলিখাঁর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি তা আমার অজানা নয়, বেগমসায়েবা। আমার চোখই আমার সাক্ষী। যেদিন আপনাকে মহলের সেই নির্জন জায়গায় গড়াগড়ি যেতে দেখে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম, সেদিন দু'হাত দূরের এক অন্ধকার কোণ থেকেই সবই দেখেছিলাম। কাউকে একথা বলিনি, বলবো না। কিন্তু আপনাকে এই প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, সিরাজের অমঙ্গল চিন্তা আপনি করবেন না।'

ঘসেটির মুখ সাদা হয়ে যায়। সে ভেতরে ভেতরে ভীত হয়ে পড়ে। আমার হাত দুটো তার দু'হাতে তুলে নিয়ে বলে, 'বেশ, তাই হবে।'

বর্গী-সেনাপতি এতদিনে নিহত হয়েছে। কৌশলে তাকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু কোন্ কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল, সে-কথা নবাব বললেন না। বেগমসায়েবার শত অনুরোধেও তিনি চুপ করে থাকলেন। তাঁর মুখ ব্যথায় থম্‌থম্ করে। যুদ্ধ জয় করেও জয়ের আনন্দ নেই মুখে। প্রতিবার যুদ্ধের পর এসে পুরো একটা দিন বেগমসায়েবার সঙ্গে অতিবাহিত করেন তিনি। এবারে ফিরে এসে সোজাসুজি চেহেন-সেতুনে চলে যান।

বেগমসায়েবা আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'সিরাজকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবে লুৎফা?'

'আমি জিজ্ঞাসা করেছি, বেগমসায়েবা। তিনিও কিছু বললেন না।'

'ও, তুমি জানো দেখছি।' তিনি চিন্তায় ডুবে যান।

নবাব আলিবর্দির এমন পরিবর্তন নাকি বহুদিন হয়নি। বেগমসায়েবা বললেন, 'গিরিয়ার যুদ্ধের পর যখন তিনি মসনদ দখল করেন, তখন একবার এমন হয়েছিল। সরফরাজ ছিলেন ওঁর প্রভু। তাঁর অধীনে উনি সামান্য একজন কর্মচারী ছিলেন মাত্র। তাই প্রজাদের সমর্থন পেয়েও প্রভু হত্যার 'অপরাধবোধ' ওর ঘাড়ে ভূতের বোঝার মতো বহুদিন চেপেছিল। আমি অনেক বুঝিয়ে সে বোঝা ঘাড় থেকে নামিয়েছিলাম।

নবাব আলিবর্দি খুব ধর্মভীরু। তাই বর্গী-সেনাপতিকে হত্যা করে আবার আগের মতো তিনি মন-মরা হয়ে পড়েছেন।

সিরাজও কিছু বলতে অস্বীকার করেছে শুনে বেগমসায়েবা একেবারে ভেঙে পড়েন। আতঙ্কগ্রস্ত হন তিনি।

'সিরাজও তার দাদুর রোগ পেয়েছে। এ ভালো নয়, লুৎফা। ওকে তুমি শক্ত করে তোলো। এই বয়সে অমন ভাবপ্রবণ হলে তো চলবে না।'

'আমি চেষ্টা করবো, বেগমসায়েবা।'

'শুধু চেষ্টা নয়, এ কাজ তোমাকে করতেই হবে।'

'আচ্ছা।' মুখে তাঁর কথায় সায় দিলেও মনে মনে আমি সিরাজকেই সমর্থন করি। যুদ্ধে মানুষ মারা এক কথা, কিন্তু হীন ষড়যন্ত্রকে আমিও যে ঘৃণা করি। কি করে সিরাজকে আমি শক্ত করবো? তার চেয়ে সে নবাব আলিবর্দির মতো উপযুক্ত হোক। আল্লার কাছে প্রার্থনা করি, দাদুর রোগই যেন সিরাজ পায়। এ রোগ যার আছে সেই তো প্রকৃত বীর। আলিবর্দি বীর বলেই তাঁর মুখ আজ এত বিষণ্ণ।

বর্গীদের মাজা ভেঙে দিয়েও তাঁর মনে আজ বিন্দুমাত্র আনন্দ নেই। সিরাজও যেন অমন হয়। নইলে আল্লা নিজেই যে লানত করবেন তাকে। তিনি তো অন্যায় অবিচার সহ্য করেন না।

নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে দেখি সিরাজ সেখানে বসে রয়েছে। তার স্বাভাবিক স্ফূর্তিভাব নেই। কাছে এগিয়ে গেলেও সে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল না। আমার মুখের দিকে কেমন ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে চেয়ে রইল।

'কি হলো তোমার?'

'না, কিছু না।' ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জিত হয়েছে। একে পুরুষ মানুষ, তার ওপর নবাবের উত্তরাধিকারী। তার কি কোনো দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়া উচিত? নিজের বেগমের সামনেও নয়। তবু মাঝে মাঝে তার মনকে অরক্ষিত অবস্থায় এনে আমার কাছে হাজির করে। তাতেই আমার সুখ, আনন্দ। সে নবাবজাদা হয়ে আমার কাছে আসে না। আসে সিরাজ হয়ে—শুধু সিরাজ।

'তোমার সেই সহচরটি কোথায়?' প্রশ্ন করি আমি।

'কার কথা বলছো?'

'মহম্মদ।'

'সহচরই বটে! কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়ে না। তাড়িয়ে তো দিতে পারি না। একটু ধমক দিলেই চোখ ছলছল করে ওঠে।'

'কুমীরের অশ্রু।' অস্ফুট স্বরে বলি।

'কি বলছো?'

'না, কিছু না। তোমাকে বড় মন-মরা দেখাচ্ছে।'

'কই, না তো!'

'মন-মরা হওয়াই স্বাভাবিক। তুমি বীর, তাই এমন হয়েছে।'

'কি বললে লুৎফা?' সে আমার কথায় চমকে ওঠে।

'বর্গী সেনাপতিকে কৌশলে হত্যা করে তুমি আর তোমার দাদু দু'জনেই কষ্ট পাচ্ছো। কষ্ট তো পাবেই। শত অন্যায় করলেও সে বীর ছিল। বীরকে যুদ্ধে আহ্বান করে হত্যা করাই উচিত ছিল।' একটু থেমে ভেবে নিয়ে আবার বলি, 'কিন্তু এতে তো তোমার হাত নেই, নবাবজাদা। নবাবের হাত কিছুটা ছিল, তার জন্যে তিনি যথেষ্ট অনুতপ্ত। অবশ্য তোমার মন খারাপ হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু এখন তোমার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সময়। নিজে যখন ক্ষমতা পাবে তখন যাতে এমন না হয় তাই দেখো।'

সিরাজ ছুটে এসে আমাকে শূন্যে তুলে নিয়ে নাচতে শুরু করে। একেবারে পাগল, সেইজন্যেই

তো এত ভালোবাসি।

'তুমি আমার লুৎফাউন্নেসা। তুমি না হলে এভাবে কে আমাকে সান্ত্বনা দিত!'

'এবার নামিয়ে দাও। হাত ফস্‌কে গেলে ভবিষ্যতে কে সান্ত্বনা দেবে?'

'আমার হাত থেকে পড়ে যাবে?'

'কেন, তোমার হাত থেকে কি কেউ পড়ে না?'

'না, দেখবে?' সিরাজ তার কাবা-চাপকান সব খুলে ফেলে। খালি গায়ে শুধু একটা অন্তর্বাস পরে দাঁড়ায়। এভাবে সিরাজকে এই প্রথম দেখলাম। বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। কী সুন্দর! বলিষ্ঠ দেহের স্থানে স্থানে ক্ষতচিহ্ন এক বীরত্বব্যঞ্জক সুষমা দান করেছে তাকে।

'কি দেখছো অমন করে?' সিরাজ বলে।

'তোমাকে।'

'ও! আর দেখো না, ফুরিয়ে যাবো।' সিরাজ হেসে তার পোশাক পরে ফেলে।

'এবারে বিশ্বাস হলো লুৎফা যে, আমার হাত থেকে কেউ ফসকে যায় না।'

'হুঁ।' তৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে। সিরাজের ক্ষণপূর্বের বিষণ্নমুখে এখন যে আনন্দের জোয়ার এসেছে এ তো আমারই দান।

মহম্মদের সঙ্গে সোফিয়ার শাদি হয়ে গেল। নবাব মহল থেকে তারা বিদায় নিয়ে অদূরে এক জায়গায় বাসা বাঁধল।

সোফিয়া তবু মাঝে মাঝে এসে দেখা দিয়ে যায়। আমিই তাকে আসতে বলেছিলাম। মহলের বাইরে কিছু খবর জানার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। শুনতে পাওয়া যায়, সিরাজের সহচরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। শুনে বড় ভয় হয়। সে সরল বলেই আমার এত ভয়। খারাপ সহচরের হাতে পড়লে খারাপ হতে তার বেশি সময় লাগবে না। সে যে বাংলার পরবর্তী নবাব, এ বিষয়ে বড় বেশি সচেতন সে। তাই সেইরকম মর্যাদা দেখিয়ে তাকে দিয়ে সব কিছু করিয়ে নেওয়া সম্ভব। তার তোষামোদকারীরা হয়তো সেই সুযোগই নিচ্ছে।

সোফিয়া একদিন এসে মেহেদি নেশার খাঁ নামে একজনের কথা বললো। তার নামে সে অনেক কিছু বলে গেল। শুধু তার নামে নয়, আভাসে সিরাজের সম্বন্ধেও এমন কতকগুলি কথা বললো, যা কখনো কল্পনা করিনি। এ কথাও বুঝলাম, মেহেদি নেশার খাঁ যেই হোক না কেন, তোষামোদের ব্যাপারে মহম্মদের চেয়েও শক্তিমান। মহম্মদকে সে কোণঠাসা করেছে বলেই সোফিয়ার সব আক্রোশ তার ওপর।

প্রস্তুত হই। সিরাজকে সামলাতে হবে। নবাব বংশের চিরাচরিত দোষগুলি তার মধ্যে ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। এখন সাবধান না হলে পরে আমাকেই আপশোষ করতে হবে। শরাব সে কোনোদিন পান করতো না। আজকাল তার মুখে গন্ধ পাই। ভেবেছিলাম, শখ করে মাঝে মাঝে একটু আধটু খায়। কিন্তু সোফিয়ার কথা শুনে বুঝলাম, ভালো রকম অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে সিরাজের।

কতটুকুইবা ক্ষমতা আমার? হারেমে বসে কি করে সামলাবো? অস্থির হয়ে উঠি।

শুধু শরাব হলেও কথা ছিল। হারেমে তো বেগমের অভাব নেই। তবে কেন বাইরের দিকে নজর পড়ল সিরাজের। তার সরল মুখের দিকে চেয়ে কখনো তো মনে হয় না যে, সে অমন হবে। কুসংসর্গ এভাবে তাকে দিনের পর দিন নীচে টেনে নিয়ে যাবে, আর আমি তাই অসহায়ভাবে চেয়ে চেয়ে দেখবো?

বেগমসায়েবাকে বলে লাভ নেই। তিনি কোনো গুরুত্বই দেবেন না। স্নেহের নাতিকে ছেলেবেলা থেকে সংযম শিক্ষা না দিয়ে তিনিই এমন করে তুলেছেন। এখন তাঁকে কিছু বললে তিনি তাঁর গাফিলতিকে ঢাকার জন্যে দু' পাঁচটা উপদেশ দিয়ে বসবেন। এ আমার অনুমান নয়। আর একদিন

সামান্য একটা কথা বলতে গিয়ে আমি বুঝে ফেলেছি। অথচ তিনিই আমাকে তাঁর নাতির ভার দিয়েছিলেন সার্থক নবাব করে তুলতে।

তাই যা-কিছু করার আমাকেই করতে হবে। না পারলে নিজেকেই মাথা কুটতে হবে। কেউ সহায়তা করবে না।

সিরাজকে স্পষ্টভাবে বলতে পারি, কিন্তু তাতে ফল অন্যরকম হবে। তাকে বাধা দেবার সামান্য চেষ্টা করলে সে আরও দুর্দান্ত হয়ে উঠবে। কারণ, জীবনে সে কোনো কাজে বাধা পায়নি। রয়ে-সয়ে ভেবে-চিন্তে কিছু করতে না পারলে সব গোলমাল হয়ে যাবে।

সিরাজের কথা ভেবে সে সময় নিদ্রাহীন রজনী অতিবাহিত করছি, সে সময় হঠাৎ এক নিদারুণ দুঃসংবাদ সমস্ত নবাব-পরিবারকে ভেঙেচুরে দুমড়ে দিয়ে গেল। বেগমসায়েবা রুদ্ধ কক্ষে অনাহারে দিন কাটাতে লাগলেন। মহলের কারও মুখে হাসি নেই। নবাব আলিবর্দি হঠাৎ অতিমাত্রায় বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন। শুধু ঘসেটি বেগমের ঘরে কখনো কখনো হাসির আওয়াজ শোনা যেতে লাগল।

সিরাজের পিতা জৈনুদ্দিন হত হয়েছেন। পাটনার আফগানেরা তাঁকে কৌশলে হত্যা করেছে। খবরটা মুর্শিদাবাদে পৌঁছানোর পর থেকেই মহলের এই অবস্থা।

সিরাজকে খুঁজে পাচ্ছি না। জানি না সে এখন কোথায় আছে। এ সময়ে তাকে আমার বড্ড প্রয়োজন। পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে পাগলের মতো একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে হয়তো। এ সময় তাকে যদি সান্ত্বনা না দিতে পারি, তবে আমি কিসের বেগম? আমার লুৎফা নামই মিথ্যে।

খবর আসার পর দু'দিন কেটে গেল। সন্ধ্যার সময় বেগমসায়েবা তাঁর দরজা খুললেন। জারিয়ারা ছুটে গেল তাঁর কাছে। ঘসেটি বেগমকেও যেতে দেখলাম সেদিকে। ভিড় দেখে আমি আর গেলাম না। ফিরে এলাম নিজের ঘরে।

ঠিক সেই সময় সিরাজ এলো। শিথিল দেহখানা কোনোরকমে টানতে টানতে এনে পালঙ্কের ওপর ছড়িয়ে দিল। তার চোখ রক্তবর্ণ। ভাবলাম, শরাব পান করে এসেছে। হয়তো পিতার মৃত্যুসংবাদ শোনবারও অবসর হয়নি তার।

ভীষণ রাগ হলো। প্রশ্ন করি, 'কোথায় ছিলে দু'দিন?' জবাব পাই না।

'আমার কথা শুনতে পেয়েছো?'

'পেয়েছি লুৎফা।' অবসন্ন কণ্ঠস্বর।

'শরাব নিয়ে পড়েছিলে তো? এ দিকের খবর জানো?'

'জানি। শরাব আমি খাইনি লুৎফা।'

আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। শরাব খায়নি অথচ এমন ভাঙা ভাঙা গলা কেন সিরাজের? তবে কি শোকে এমন হয়েছে? এত বড় ভুল হলো আমার? তার মুখের দিকে ভালোভাবে চেয়ে দেখি। সে মুখে দুঃখ শোক আর বিষাদের ছায়া। নিজের টুঁটি চেপে ধরতে ইচ্ছে হলো। এ আমি কি করলাম? একবার ভালোভাবে চেয়ে দেখলাম না পর্যন্ত।

সিরাজের কোলের মধ্যে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠি।

'কেঁদো না লুৎফা।' সে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়।

'আমাকে শাস্তি দাও।'

'তুমি তো কোনো অন্যায় করোনি লুৎফা। যে যেরকম, তাকে সেরকম ভাবাই স্বাভাবিক।'

'কিন্তু আমার এত বড় ভুল কেন হবে? তোমাকে চিনতেও আমার ভুল হবে?'

'ক্ষতি কি? আমাকে তুমি ভালোবাসো বলেই ভুল হয়েছে। অন্য বেগমদের ভুল হবার বালাই নেই। কিন্তু এখন কি করি লুৎফা? আমার যে কিছুই ভালো লাগছে না।'

'ছিঃ নবাবজাদা, ভেঙে পড়ছো কেন? যে-আঘাত তুমি পেলে, নবাবরাই সে আঘাত পায়। তুমি

তো সাধারণ মানুষ নও। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখও সাধারণ। তোমার সুখ যেমন অসাধারণ, দুঃখও তেমনি অসাধারণই তো হবে। তোমার বুক যেমন বিরাট, মন যেমন বিরাট, সহ্য শক্তিও তেমনি বিরাট হওয়া চাই। নইলে তুমি সিরাজদ্দৌলা কিসে?'

সিরাজের কোল থেকে মুখ তুলে দেখি, সে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। তার চোখে জল টলমল করছে।

'লুৎফা!' তার বলার হয়তো অনেক কিছুই ছিল। কিন্তু আমার নামটুকু ছাড়া আর কিছুই সে উচ্চারণ করতে পারল না। বুঝলাম, পৃথিবীতে আমার সব চাইতে প্রিয়জনকে কিছুটা সান্ত্বনা দিতে পেরেছি।

'এ দু'দিন কোথায় ছিলে নবাবজাদা? তোমাকে আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান।

'রোশনীবাগে।'

'একা ছিলে সেখানে?'

'হ্যাঁ'।

'রোশনীবাগে কি কোনো ঘর রয়েছে নবাবজাদা?'

'একটা ছোটমতো আছে। কিন্তু আমি তো সেখানে ছিলাম না।'

'তবে কোথায় ছিলে?'

'একটা আমগাছের গোড়ায়।'

'দু'দিন আমগাছের গোড়ায় বসেছিলে?'

'হ্যাঁ লুৎফা।'

'তুমি কি আমাকে পাগল করবে?'

'ওতে আমাদের কষ্ট হয় না, লুৎফা। আমরা যে যুদ্ধ করি। বরং ভালোই হয়েছে ওতে। শরীরের কষ্ট যতটা হয়েছে, তাতে মনের কষ্ট কিছুটা কমেছে।'

'কিছু খাওনি তো দু'দিন?'

'পাবো কোথায়?'

'তুমি শুয়ে থাকো, আমি এখন আসছি।'

কিমা-সুরুয়া সিরাজের প্রিয় খাদ্য। নিজের হাতে নিয়ে এলাম। এসে দেখি, সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আহা! দু'দিন ঘুমোয়নি, ঘুমোক একটু।

কিন্তু একটু পরেই হঠাৎ সে জেগে উঠল। পেটে খিদে থাকলে ঘুমও হয় না।

'খানা এনেছো?'

'এনেছি।'

'দাও।' সে সাগ্রহে খেতে শুরু করে।

'একটা কথা বলবো নবাবজাদা?' খাওয়া শেষ হয়ে আসার সময় প্রশ্ন করি।

'বলো।'

'একটা প্রার্থনা আছে।'

'কি প্রার্থনা?'

'পূর্ণ হবে তো?'

'শুনিই না।'

'এবার থেকে দু'বেলা আমার কাছেই খাবে, কেমন?'

সিরাজ খাওয়া থামিয়ে কি যেন ভাবে। তার মুখে মৃদু হাসির তরঙ্গ খেলে যায়। বলে, 'আমাকে বন্দী করতে চাও লুৎফাউন্নেসা।'

'যদি বলি তাই, ক্ষতি আছে?'

'না, লুৎফাউন্নেসা সাধারণ বেগম নয়। সে আমার প্রাণের আধখানা। তার হাতে বন্দী হবো এতে ক্ষতি কি, বরং লাভ।'

'প্রার্থনা মঞ্জুর হলো তো?' আমার চোখের পাতা ভিজে ওঠে।

'হুঁ। কিন্তু একেবারে রাশ টেনে ধরো না বেগমসায়েবা, ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনা।'

'আমি জানি নবাবজাদা। একেবারে রাশ টেনে ধরার মতো মূর্খ আমি নই। তাহলে এখুনি মেহেদি নেশার খাঁয়ের সঙ্গে মিশতে মানা করে দিতাম।'

সে চমকে আমার দিকে দৃষ্টি ফেলে। তারপর হঠাৎ হেসে ওঠে, 'তুমি বুদ্ধিমতী লুৎফা।'

আমি সে কথার জবাব না দিয়ে শুধু হাসি।

সিরাজের মা আমিনা বেগম মুর্শিদাবাদে চলে এলেন। সিরাজের ভাই এক্রামউদ্দৌলাকে নওয়াজিস মহম্মদ খাঁ পুত্র হিসেবে গ্রহণ করলেন। নিঃসন্তান নওয়াজিসের বুভুক্ষু-প্রাণ শীতল হলো এতদিনে। জীবনে এই প্রথম তিনি ঘসেটি বেগমের মতের বিরুদ্ধে গেলেন। এক্রামকে পুত্র হিসাবে নেবার ইচ্ছা ঘসেটির আদৌ ছিল না। সে নারী, কিন্তু নারীর সব কয়টি গুণ তার মধ্যে স্ফুটিত হয়নি। তার নারীত্বে মাতৃত্বের স্থান নেই, বধূত্বের স্থান নেই, সে শুধু প্রিয়া হতে চায়।

প্রথমে সে নওয়াজিস খাঁর প্রিয়া ছিল। এখন নওয়াজিস পুরোনো হয়ে গিয়েছে। অতি পরিচিত পুরুষের কাছে প্রিয়া হবার রোমাঞ্চ থাকে না। তাই বেগম হয়েও সে খাঁ সাহেবকে এড়িয়ে চলে।

এখন সে হোসেন কুলিখাঁর প্রিয়া। সম্ভবত হোসেন কুলিখাঁও পুরোনোর দলে যেতে বসেছে। হাবভাব দেখে তাই-ই মনে হয়। সেদিন আর একজনকে দেখলাম। মীর নজরালি তার নাম। সঠিক না জেনে বলতে ভরসা হয় না, তবু মনে হয়, ঘসেটি নতুন টোপ ফেলেছে। মীর নজরালি ঘসেটির চারের নতুন মাছ। দেখতে হবে কতদূর গড়ায়।

কিন্তু তার আগে একটা ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হতে দেখে আমি স্তম্ভিত হলাম। কি করবো ভেবে পেলাম না। অথচ আমি আর জারিয়া নই, আমি বেগম। নবাব বংশের মঙ্গল, নবাব মহলের পবিত্রতা রক্ষার এক বিরাট দায়িত্ব আমার রয়েছে। ঘসেটি বেগম হলেও না হয় এড়িয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু ও যে ঘসেটি নয়। এ এমন একজন, যার কথা বলতে লজ্জায় আমার মুখ বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু কি করবো? কর্তব্য বড় কঠিন জিনিস।

মাঝে মাঝে এখনো গিয়ে দাঁড়াই সেই গবাক্ষের সামনে। কাটরার আজানধ্বনি শুনি। বেশ লাগে। সেদিনও দাঁড়িয়ে ছিলাম। বাইরে থেকে ফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল। একটু অন্যমনস্কই ছিলাম। হঠাৎ পদশব্দ কানে এলো। কে যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে। জারিয়া-সুলভ ভীতি আমার আর নেই। তাই নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলাম।

হোসেন কুলিখাঁ! হ্যাঁ, তিনিই আসছেন। সরে যেতে হলো। আমি বেগম, পর্দানশীন। পরপুরুষের সামনে মুখ দেখানো বাধা। বেগম মহলে সঙ্গে বোরখা থাকে না, এখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। তাই আড়ালে গেলাম। হোসেন কুলিখাঁর ওপর মনে মনে ভীষণ রাগ হলো। তাঁর এই চৌর্যবৃত্তিই বোধহয় তাঁর চরিত্রের একমাত্র দুর্বলতা।

কিন্তু তিনি আবার এখানে কেন? তিনি না জানলেও ঘসেটি বেগম তো জানে, তাদের নোংরামি আমার চোখের সামনেই ঘটেছে। ঘসেটি আর যাই হোক, মূর্খ নয়। বরং সে ভীষণ চতুর। সে কখনো আর এদিকে আসবে না। কৌতূহলে উদগ্রীব হয়ে সেই অন্ধকার গোপন জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে থাকি।

হোসেন খুলিখাঁ গবাক্ষের সামনে এসে থেমে গেলেন। চোরের মতো এদিকে ওদিনকে তাকান। তাঁর মতো পুরুষের এই রকম চাহনি দেখে আমার কষ্ট হয়। একটু কৌতূহলও যে অনুভব না করি তা নয়।

মনে মনে প্রস্তুত হই। ঘসেটি আসার আগেই সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তার পশুত্ব বোধহয় চতুরতাকে জয় করেছে। তাই একই জিনিস আবার ঘটতে চলেছে।

লঘু পদশব্দ ভেসে আসে। আসুক, একেবারে কাছে আসুক। হোসেন কুলিখাঁর সামনে দাঁড়াক, তারপরে আত্মপ্রকাশ করবো। ভেবেছে বেগম হয়ে আমি বুঝি ঘর ছাড়ি না। কিন্তু আমি শুধু বেগম নই, আমি লুৎফা। আজ একটা চূড়ান্ত পরিণতি দেখে আমি নিশ্চিন্ত হবো। ঘসেটি মুক্তার মালা দিয়ে আমার ভেতরের মানুষটাকে কিনতে পারবে না। ওর কাছে আমার দেওয়া কথারও কোনো দাম নেই। কিন্তু একি! ঘসেটি তো নয়। আমি কি স্বপ্ন দেখছি? চোখের ভুল নয় তো? বার বার চোখ রগড়াই। না, ভুল নয়। সিরাজ জননী আমিনা বেগম এগিয়ে আসছেন। তাঁকে দেখে হোসেন কুলিখাঁর মুখে হাসি ফোটে। আমিনা বিবির মুখেও হাসি। ছি-ছি, তাঁর এই জঘন্য মনোবৃত্তি! আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হলো—চোখ বন্ধ করি। না-না, কিছুতেই দেখতে পারবো না। মরে গেলেও নয়।

'এই মুহূর্তটুকুর জন্যেই বোধহয় এতদিন বেঁচেছিলাম আমিনা।' পুরুষের গম্ভীর স্বর।

'ঘসেটিকেও এই কথা বলতে নিশ্চয়?'

'ছি-ছি, কি যে বলো তুমি!'

'ঠিকই বলছি। পুরুষদের আমি চিনি।'

'আমাকে তুমি চেনোনি এখনো। ঘসেটি বেগম আমার প্রভুপত্নী। তাঁর সঙ্গে এ সম্পর্ক হবে কেন?'

'আমার সঙ্গেও তোমার সম্পর্ক সমানে সমানে নয় হোসেন কুলিখাঁ।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। হোসেন কুলিখাঁ নিশ্চয় আহত হয়েছে আমিনা বিবির কথায়।

'দিলটাই আদত জিনিস আমিনা। ভালোবাসা কখনো সম্পর্ক বাছে না।'

'শুধু ঘসেটি বেগম ছাড়া, তাই না?' তিন সন্তানের জননী আমিনা বেগমের গলায় কিশোরীর খিলখিল হাসি। শুনে আমার গায়ে জ্বালা ধবে। আর শুনতে ইচ্ছে হয় না। এরপর যে কোনো শব্দ কানে এলে আমি মূর্চ্ছা যাবো—আমি ধরা পড়ে যাবো। দু'হাত দিয়ে দু'কান চেপে ধরে বসে পড়ি। চোখ বন্ধ করি।

বহুক্ষণ কেটে যায়। ধীরে ধীরে চোখ মেলি। কেউ নেই, দু'জনে চলেই গিয়েছে।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, বেগমসায়েবাকে আজই সব বলতে হবে। এরপরেও মুখ বুজে বসে থাকার অর্থ সর্বনাশ ডেকে আনা এবং এই সর্বনাশের জন্যে মূলত আমিই দায়ী হবো।

বেগমসায়েবার ঘরে প্রবেশের আগে একবার আমিনা বিবির ঘরে যেতে ইচ্ছে হলো। সিরাজ-জননীর কাছে আমি প্রায়ই যাই। তিনি আমাকে স্নেহের চোখে দেখেন। এ সময় তাঁর কাছে গেলেও কোনো সন্দেহের ছায়াপাত হবে না তাঁর মনে।

কিন্তু ঘরের সামনে গিয়ে থেমে যেতে হলো। ভেতরে তিনি একা নেই। ঘসেটি বেগমের গলা ভেসে আসছে। মনে হলো, চড়া গলায় ঘসেটি কি যেন বলছে আমিনা বিবিকে। বেগম হয়েও লুকিয়ে শোনার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

'এসেই খেলা শুরু করেছিস্ আমিনা। ছেলেবেলার অভ্যাস এখনো যায়নি দেখছি।'

'কি করে যাবে, তোর কাছেই যে হাতেখড়ি।'

'মুখ সামলে কথা বল্। তোর মতো বংশের মুখে চুনকালি দিইনি কোনোদিন।'

'কানে তো অনেক কিছুই ভেসে যেতো। মুর্শিদাবাদ থেকে পাটনা বড় কম দূর নয়। অত দূরে

ভাসতে ভাসতে গিয়ে খাঁটি সংবাদই পৌঁছতো। মিথ্যেটুকু হাওয়ায় মিলিয়ে যেতো।'

'চুপ কর্।' ঘসেটি চেঁচিয়ে ওঠে।

'ভয় দেখাচ্ছিস্ কাকে? নবাব আলিবর্দির মেয়েকে? বাংলার ভবিষ্যৎ নবাবের মাকে?' আমিনা বিবি হি-হি করে হাসেন।

'পরবর্তী নবাব সিরাজ নয়, নওয়াজিস।'

'ও, তাই নাকি? তবু তো নওয়াজিস মরলে এক্রাম নবাব হবে। এক্রাম তোর ছেলে নয়, আমার!'

'ঘসেটিকে তুই চিনিস্ না আমিনা। কি রকম ভয়ঙ্কর হতে পারি, সে ধারণা তোর নেই।'

'হাজার ভয়ঙ্কর হলেও আমার পা অবধি পৌঁছতে পারবি না ঘসেটি।'

'বেশ, দেখা যাবে। আজই নবাবকে বলবো তোর সঙ্গে হোসেন কুলিখাঁর সম্বন্ধ।'

'আমিও বলবো যে, এতদিন সে আমার টানে বেগম মহলে ঘোরাফেরা করতো না।'

'নবাব সে-কথা বিশ্বাস করবেন না।'

এবার আমি ভেতের ঢুকি। দু'জনাই অপ্রস্তুত হয় আমার আকস্মিক প্রবেশে।

আমিনা বিবি স্বাভাবিক গলায় বলেন, 'কি খবর লুৎফা, হঠাৎ এ সময় যে?'

'বাইরে দিয়ে যাচ্ছিলাম। আপনাদের ঝগড়া শুনে চলে এলাম।'

'ঝগড়া শুনতে পেয়েছো?' ঘসেটি বেগম উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করে।

'সামান্য শুনেছি।'

'কি শুনেছো?' আমিনা বেগম তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়ান।

'আপনার শেষ কথাটুকু শুনেছি—'হোসেন কুলিখাঁ এতদিন আমার টানে বেগম মহলে ঘোরাঘুরি করতো না।'

আমিনা বেগমের মুখ মৃতের মতো রক্তশূন্য হয়ে যায়। তিনি মাটিতে বসে পড়েন। ঘসেটির চোখে নিদারুণ আতঙ্ক। ঘরে বিন্দুমাত্র শব্দ নেই। জাদুবিদ্যায় সব কিছু স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে যেন—হৃদ্‌কম্পন পর্যন্ত। শুধু বাতিগুলো নিঃশব্দে পুড়ে চলেছে। বাতির ওপর পতঙ্গ উড়ে এসে পড়ছে। তারা মৃত অবস্থায় নীচে গালিচার ওপর ঝরে পড়ে। দু' চারটে আমিনা বিবির কোলের ওপর গিয়ে পড়ছে।

আমি স্তব্ধতা ভঙ্গ করি। সোজা ঘসেটি বেগমের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কণ্ঠস্বরে বজ্রকঠিন দৃঢ়তা এনে বলি, 'হোসেন কুলিখাঁ যে চোরের মতো বেগম মহলে বহুদিন থেকে ঘোরাফেরা করেন তার প্রধান সাক্ষী আমি। একথা আপনি জানেন ঘসেটি বেগম। শুধু ঘোরাফেরা নয়, আরও অনেক কিছু তিনি করেন, যার একটা কথা নবাবের কানে গেলে হোসেন কুলিখাঁর মৃত্যুদণ্ড অবধারিত। কিন্তু আজ যা নিয়ে আপনাদের ঝগড়া আর মন কষাকষি, তারও প্রধান সাক্ষী আমিই আবার হলাম, এ আমার দুর্ভাগ্য। ঘসেটি বেগম, সেদিন আপনাকে যেখানে ছিন্নভিন্ন পোশাকে পড়ে থাকতে দেখে আমি তুলতে গিয়েছিলাম, ঠিক সেইখানেই আর এক নাটকের অভিনয় হয়ে গেল কিছুক্ষণ আগে। এর গোড়াপত্তন হয়তো কিছুদিন আগে থেকেই হয়েছে, যার জন্যে আপনি অস্থির হয়ে উঠেছেন। কিন্তু আজ ঠিক কি ঘটেছে, তা আপনি জানেন না। আজ খাঁ সাহেবকে আবার সেখানে দেখে প্রথমে আমি অবাক হয়েছিলাম। আপনার চতুরতা সম্বন্ধে মনে মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু সংশয় দূর হলো আমিনা বিবিকে দেখে। আমিনা বিবি বহুদিন এখানে ছিলেন না, তাই ওই নির্জন স্থানে যে আমার রীতিমতো যাতায়াত আছে একথা তিনি জানতেন না। কিন্তু হোসেন কুলিখাঁকে অন্তত আপনার বলে দেওয়া উচিত ছিল।'

কথা শেষ হতে দেখি, ঘসেটি বেগম হিংস্র দৃষ্টিতে আমিনা বিবির দিকে চেয়ে রয়েছে। আর আমিনা বিবি ধীরে ধীরে গালিচার ওপর গড়িয়ে পড়েন। অপরিসীম লজ্জা আর আঘাতে তিনি মূর্চ্ছা গিয়েছেন।

সব কথা না বলে আমার উপায় ছিল না। শুধু এখানেই নয়, বেগমাসায়েবাকেও বলতে হবে। প্রতিকার চাই। দুই বোনই মরিয়া। ছেলেবেলা থেকে পাকানো অভ্যাস আবার পথ খুঁজে পেয়েছে।

'আমিনা বিবিকে ধরে তুলুন ঘসেটি বেগম।' আমি বলি।

'আমি পারবো না।' সে রাগে ফুলতে থাকে।

'আপনিই আমিনা বিবিকে সুযোগ দিয়েছেন। হোসেন কুলিখাঁ এখানে এমনিতে আসতেন না কখনো।'

'বেশ, বেশ।'

'আমি বেগমসায়েবার ঘরে যাচ্ছি।'

'মাকে এসব কথা বলবে?'

'নিশ্চয়ই বলবো।'

'প্রতিজ্ঞার কথা তোমার মনে নেই?'

'সে প্রতিজ্ঞা এখানে খাটে না। তাছাড়া আমিনা বিবি আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করাননি।'

'কিন্তু আমিনার কথা উঠলে আমার কথাও কি উঠবে না?'

'তা উঠবে বৈকি!'

'লুৎফা, তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো।'

'না, আপনাদের স্পর্ধা সীমা ছাড়িয়েছে। সেটা বন্ধ করতে আমি বদ্ধ পরিকর।'

আমিনা বিবি ধীরে ধীরে উঠে বসেন। আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলেন, 'তুমি এসব কি বলছো লুৎফা!'

'আমি বেগমসায়েবার কাছে যাচ্ছি, হোসেন কুলিখাঁ সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করতে।'

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন তিনি। ঘসেটির মতো দৃঢ়তা তাঁর নেই। উঠে এসে আমার হাত দুটো চেপে ধরে বলেন, 'আমার ছেলের বেগম তুমি। তবু তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। মাকে এসব কথা বলো না। একে তো লজ্জায় তোমার কাছে মুখ দেখাতে পারছি না, এরপর মায়ের কানে গেলে আমায় আত্মহত্যা করতে হবে।'

তাঁর কথায় আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি। মুহূর্তে আমার সমস্ত দৃঢ়তা কোথায় ভেসে যায়। তিনি যে সিরাজের মা।

'বলো লুৎফা, বলবে না মাকে? বলো, কথা দাও।'

'বেশ, কথা দিলাম।' আমি ছুটে বার হয়ে যাই। পেছনে চাইতে পারি না। জানি, তাহলে ঘসেটির বিদ্রূপের হাসি আমার চোখে পড়বে।

তবু বেগমসায়েবার ঘরের দিকে যাই। মনে মনে ভাবি, আমার প্রিয় অতি পরিচিত জায়গাটিতে আর কখনো দাঁড়াবো না। একসময় যা আমার একমাত্র আশ্রয় আর সান্ত্বনার স্থল ছিল, আজ তা আমার মন আর জীবনকে এক জটিল ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে।

বেগমসায়েবা তেমনি বসে রয়েছেন। তাকিয়ায় ভর দেওয়া বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপর রাখা সমস্ত শরীরের ভার। কপালে সেই চিরপরিচিত চিন্তার রেখা। বয়সের জন্যে সে রেখা আরও গভীর, আরও প্রকট।

আমাকে দেখে তিনি বলে উঠলেন, 'এত তাড়াতাড়ি তুমি কি করে এলে লুৎফা?'

'কেন বেগমসায়েবা!' তাঁর কথায় অবাক হই।

'হামিদাকে তো এখুনি পাঠালাম।'

'সে আমার কাছে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ, দেখা হয়নি?'

'আমি ঘরে ছিলাম না।'

'ঘসেটির ঘরে ছিলে বুঝি?'

'না, আমিনা বেগমের ঘরে।'

'আমিনার ঘরে! কখন গিয়েছিলে?'

'কিছুক্ষণ আগে। ঘসেটি বেগমও সেই ঘরে আছেন।'

'তা কি করে হবে! তার তো সেখানে থাকার কথা নয়।' বেগমসায়েবার উক্তিতে শ্লেষ। এভাবে এই প্রথম তাঁকে কথা বলতে শুনলাম।

আমি চুপ করে থাকি। এমন কিছু ঘটেছে, যা তাঁর মতো স্থির বুদ্ধিসম্পন্না নারীকেও বিচলিত করে তুলেছে। কি বলবো ভেবে পাই না।

'লুৎফা, একদিন যে পুরুষটির কথা তুমি আমাকে বলেছিলে, এতদিনে তার পরিচয় পেলাম। যদিও আগে আন্দাজ করেছিলাম, আজ নিঃসংশয় হলাম।'

আমি কেঁপে উঠি। নিজেকে যতটা সম্ভব সংযত করে বলি, 'কোন্ পুরুষ বেগমসায়েবা?'

'যাকে হারেমে ঘোরাফেরা করতে দেখে আমার কাছে ছুটতে ছুটতে এসে কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারোনি একদিন।'

'কে সে?'

'হোসেন কুলিখাঁ। কার লোভে আসে জানো? দাসী-বাঁদীদের লোভে নয়, অন্য কোনো বেগমের লোভেও নয়। আসে আমারই গর্ভের এক কলঙ্কিনীর আদেশে তার মনোরঞ্জন করতে। ঘসেটি এখন আমিনার ঘরে? তা তো হতে পারে না। আমার হিসেবে কি তবে ভুল হলো?'

হিসেবে তাঁর মস্ত ভুল হয়েছে, কিন্তু সে-কথা বলি কি করে? এই মুহূর্তে যে কথা দিয়ে এলাম আমিনা বেগমকে। বেগমসায়েবা আর কতটুকুই বা জানেন। আসল ঘটনা শুনলে তিনি কি করবেন ভাবতেও ভয় করে।

'আপনি কি করে জানলেন বেগমসায়েবা?'

'তুমি কি ভেবেছো তুমি না বললে আমি জানতে পারবো না?' আমাকে যেন ধমক দেন তিনি।

'আমি তো জানতে পারিনি।'

'মিথ্যে কথা। অনেক আগেই তুমি জানতে পেরেছিলে। সঙ্কোচে বলতে পারোনি। এই সর্বনাশা সঙ্কোচ ভালো নয় লুৎফা। বেগমদের কাছে সঙ্কোচের স্থান নেই।'

বেগমসায়েবার দুই হাঁটু ধরে আমি কেঁদে ফেলি।

'কেঁদো না। তোমার অসুবিধে আমি জানি। কিন্তু যারা খারাপ, তারা খারাপই। তাদের জন্যে কোনো দ্বিধা মনে স্থান দেওয়া অন্তত সিরাজের বেগমের শোভা পায় না, যে সিরাজ একদিন মসনদে বসবে।'

'বেগমসায়েবা।' মুখ তুলে বলি।

'হ্যাঁ, বলো। আরও অনেক কিছু জানো তো?'

'জানি। কিন্তু আমার একটা প্রার্থনা আছে।'

'বলো।'

'যাঁর সম্বন্ধে আজকে আপনাকে বলবো, তিনি যেন কোনোদিন টের না পান যে তাঁর কথা আপনি জানেন।'

'বেশ, তাই হবে।'

আমিনা বেগমকে কথা দিলেও সে কথার মূল্য রাখতে পারলাম না। আমি যে সিরাজের বেগম।

মহলের মঙ্গল, রাজ্যের মঙ্গল, সবার মঙ্গল দেখাই যে আমার কর্তব্য। যা-যা দেখেছি একে-একে সব বলে গেলাম। আজকের আমিনা বেগমের ঘটনাও বাদ দিলাম না।

আমার কথা শুনে বেগমসায়েবা অস্থির হয়ে পায়চারি শুরু করলেন। মাঝে মাঝে দুই হাত মুঠো করে শূন্যে তুলে আস্ফালন করেন, আবার কখনো আপন মনেই চেঁচিয়ে ওঠেন। স্তব্ধ আতঙ্কে আমি ঘরের এককোণে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকি।

'তুমি আমাকে দিয়ে বড় কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছো লুৎফা। এ তোমার উচিত হয়নি।' তিনি দাঁতে দাঁত ঘসে বলেন, যেন তাঁর সমস্ত আক্রোশ আমার ওপর।'

'কি করবো, উনি যে নবাবজাদার মা।'

চিৎকার করে ওঠেন তিনি, 'মা, মা, মা। কে মা? কার মা? এককালে গর্ভে ধরেছিল বলেই মা! খাসা।' অতিমাত্রায় উত্তেজিত হবার পর বেগমসায়েবা কেমন ঝিমিয়ে পড়েন। ধপাস্ করে পালঙ্কের ওপর বসে পড়েন।

আমি ধীরে ধীরে নিজের ঘরে চলে আসি। সবার অজ্ঞাতে বারুদের স্তূপে আগুন দিয়ে এলাম।

কয়দিন ধরে সিরাজ বড্ড বেশি শরাব খাচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিলাম, নবাব আলিবর্দি তাকে পাটনার শাসনভার দিয়েছেন বলে সে আনন্দ করছে। এই বয়সে এত বড় মর্যাদা তো যার-তার ভাগ্যে হয় না। তার ওপর সহকারী হিসাবে সে পেয়েছে রাজা জানকীরামের মতো লোককে। জানকীরাম ইতিমধ্যেই পাটনা রওনা হয়ে গিয়েছেন। সিরাজকে নবাব ছাড়েননি। কবে ছাড়বেন জানি না।

আজও মাতালের মতো টলতে টলতে সে আমার ঘরে এলো। তবু যা হোক সে তার কথা রাখছে। দু'বেলা আমার কাছে এসে খানা খেয়ে যাচ্ছে। তবু যেভাবে শরাবের পরিমাণ বেড়ে চলেছে, তাতে কতদিন সে তার কথা রাখতে পারবে জানি না। সে যতক্ষণ আমার কাছে থাকে, মনের দুঃখ মনে চেপে রেখে সব কিছু করে যাই। কিন্তু সে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আর থাকতে পারি না, কান্নায় ভেঙে পড়ি। নবাবের বেগমদের ভাগ্য কি একরকম হতেই হবে? আলিবর্দির বেগম কি তাহলে সৃষ্টিছাড়া?

সিরাজ গম্ভীর হয়ে বসে থাকে। তার দুটো চোখ সব সময় কিসের চিন্তায় যেন মশগুল। শরাবের শক্তি তার চিন্তাকে এতটুকু বিভ্রান্ত করতে পারছে বলে বোধ হলো না। এ কয়দিনে সে ভীষণ শুকিয়ে উঠেছে।

তার সামনে খাবার রাখতে সে জিজ্ঞাসা করে, 'কি এনেছো?'

'দমপোক্ত।'

'খাবো না।'

'তুমি তো ভালোবাসো।'

'আঃ, বাজে কথা বলো না! খাবো না, ব্যস্!'

'কি খাবে বলো, আমি এনে দিচ্ছি?'

'কিস্‌সু খাবো না। কিস্‌সু ভালো লাগে না।'

'তাহলে যে শরীর টিকবে না, নবাবজাদা।'

'কি লাভ বেঁচে থেকে?'

ভাবলাম, শরাবের নেশায় আবোল-তাবোল বকছে নিশ্চয়। চুপ করে বসে থাকি। আগে নেশা কাটুক, তারপর কথা বলা যাবে।

কিন্তু কোনো লাভ হলো না। সিরাজের চিন্তার যেন আদিঅন্ত নেই। ভেবেই চলেছে সে। দেওয়ালের দিকে তার দৃষ্টি স্থির, নিবদ্ধ। শেষে কি পাগল হয়ে যাবে? কেউ কিছু খাইয়ে দেয়নি তো?

শরাবের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে দেওয়া বিচিত্র নয়। শত্রুর অভাব নেই ভবিষ্যৎ নবাবের—ঘরে-বাইরে শত্রু!

'তোমার কি হয়েছে, নবাবজাদা?'

'কিস্‌সু হয়নি।'

'না, বলতেই হবে তোমাকে। দিনের পর দিন মুখ শুকনো করে থাকবে তা হবে না।' সিরাজের হাত চেপে ধরি।

'আমি উঠে যাচ্ছি।' সে সত্যিই উঠে দাঁড়ায়।

এবার তার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ি। সে পা দিয়ে আমাকে ঠেলে দেয়। কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে নিজেই আমার গায়ের ওপর এসে পড়ে।

'ফেলে দিলে, লুৎফা?'

'আমি ফেলিনি, নবাবজাদা। তোমার শরীর দুর্বল, তাই আমাকে লাথি দিয়ে সামলাতে পারোনি নিজেকে।'

'ও, তাই হবে।' সে এমনিভাবেই আমার গায়ের ওপর পড়ে থাকে। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টাও করে না। তার সমস্ত শরীরের ভার আমার ওপর। তাই নিজেও উঠতে পারি না। মনে হলো, সিরাজ শুয়ে পড়েও ভাবছে। তার চিন্তাসূত্র এতটুকু বিচ্ছিন্ন হয়নি। বাইরের ঘটনাগুলো তার মনে এতটুকু রেখাপাত করেনি।

'উঠবে না?'

'ও হ্যাঁ, উঠতে হবে। তোমার কষ্ট হচ্ছে, লুৎফা?'

'না।'

'তাহলে একটু শুয়ে থাকি।'

'এভাবে শুয়ে থাকবে কেন? ওঠো ভালোভাবে শোও।'

'না, এই বেশ।'

'কেউ এলে দেখে ফেলবে যে।'

'ও, দেখে ফেলবে? তাহলে তো উঠতে হয়, তাই না লুৎফা?'

'তোমার কি হয়েছে? এভাবে কথা বলছো কেন? ভয় হয় আমার।'

'কিভাবে বলছি? ঠিক বলছি না?'

'না, মোটেই না।'

সিরাজ চুপ করে থাকে। সে তখনও ভেবে চলে।

'চলো খাবে।'

'তোমার রাগ হয়নি, লুৎফা?'

'কেন?'

'তোমাকে লাথি মেরেছি বলে।'

'সেজন্যে তোমার অনুতাপ হয়েছে?'

'হুঁ।'

'তাহলে আর রাগ নেই।'

'অন্য বেগম হলে কিন্তু আমার সঙ্গে কথাই বলতো না।'

'তারা যে বেগম।'

'আর তুমি?'

'আমি? আমি তোমার প্রাণের আধখানা। তুমিই তো বলেছিলে।'

সিরাজ আমাকে জড়িয়ে ধরে।

'তুমি কি পাটনায় যেতে চাও, নবাবজাদা?'

'কেন?' সে অবাক হয় আমার কথায়।

'নবাব যেতে দিচ্ছেন না বলে তোমার দুঃখ হয়েছে?'

'তা একটু হয়েছে বৈকি।'

বুঝলাম, ঠিক ধরতে পারিনি। সিরাজের আসল কষ্ট পাটনার জন্যে নয়। সহসা একটা কথা ভেবে চমকে উঠি। তবে কি সে হোসেন কুলিখাঁর কথা শুনেছে? বেগমসায়েবা কি তাকে সব খুলে বলেছেন?

'তুমি বেগমসায়েবার কাছে গিয়েছিলে, নবাবজাদা?'

'ও কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?'

'এমনি।'

'আজ যাইনি।'

'কবে গিয়েছিলে?'

'পাঁচদিন আগে।'

আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়। ঘটনাটা ঘটেছিল ঠিক পাঁচদিন আগে, যেদিন সন্ধ্যাবেলা আমি বেগমসায়েবাকে সব খুলে বলি।

'সেদিন কখন গিয়েছিলে তাঁর কাছে?' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করি।

'রাত্রে।'

আর ভুল নেই। বেগমসায়েবা তাঁর কথা রাখতে পারেননি। সিরাজকে তার মায়ের কেলেঙ্কারির কথা বলে দিয়েছেন। সমালোচনা করা আমার শোভা পায় না। তবু বলবো তিনি অন্যায় করেছেন। সিরাজকে না জানিয়ে তিনি অন্য কোনো ব্যবস্থা করতে পারতেন। তার মনকে ওভাবে ভেঙে দেবার প্রয়োজন ছিল না তাঁর।

সিরাজ ধীরে ধীরে উঠে বসে। সে আমার হাত ধরে তুলে বলে, 'চুপ করে আছো কেন, লুৎফা?'

'বেগমসায়েবার কাছে কিছু শুনেই কি তোমার মন খারাপ?'

'হ্যাঁ। তুমি জানলে কি করে?' সে শক্ত করে আমার হাত চেপে ধরে।

'অনুমান।'

'কখনো নয়। তুমি সব জানো। বলো, সত্যি কিনা? বলো....'

'সত্যি।' মিথ্যে বলার শক্তি ছিল না।

সে স্থির হয়ে বসে থাকে, যেন মাটির পুতুল—জীবনের কোনো স্পন্দন নেই। আমিও দাঁড়িয়ে থাকি, বলার কিছু নেই। এখন সান্ত্বনার বাক্য বিদ্রূপের মতো শোনাবে।

বহুক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলে, 'ভালোই হলো লুৎফা, তোমাকে আগেই বলা উচিত ছিল। মনের মধ্যে চেপে রেখে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম বুঝি পাগল হবো। কিন্তু কই, তুমি তো আমাকে বলোনি? তুমি বলতে পারতে।'

'ক্ষমা করো আমাকে। আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি।'

'স্বাভাবিক। যাক্, ভালোই হলো।'

'বেগমসায়েবা কি তোমাকে আর কিছু বলেছেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু যা বলেছেন, আমার দ্বারা তা সম্ভব নয়। দাদি আরও কয়েকবার আমাকে ডাকতে পাঠিয়েছেন, আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি।'

'কি বলেছেন তিনি?'

'হোসেন কুলিখাঁকে হত্যা করতে, কিন্তু একি সম্ভব? তুমিই বলো লুৎফা, এমন একজন লোককে হত্যা করা যায়? সে কৌশলী, কর্মঠ আর রাজকার্যে বিশ্বস্ত। দোষ তার যতই থাকুক, তার চেয়েও সহস্রগুণ দোষ এ পক্ষের। হোসেন কুলিখাঁ কখনো প্রথমে এগিয়ে আসেনি, আসতে পারে না। তাই বলছি, ব্যবস্থা যদি কিছু করতে হয়, তাহলে মাতৃহন্তা হতে হয়।'

'না-না।' আমার মুখ দিয়ে আর্তনাদ বার হয়ে আসে। সিরাজের চোখের দিকে তাকাতে পারি না।

'ভয় নেই লুৎফা, মাতৃহন্তা হবো না, কিন্তু হোসেন কুলিখাঁকে মারতেও পারবো না। সে এমন একজন লোক, যাকে হত্যা করলে দাদুর নবাবীও বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠতে পারে। শত্রুরা এ হত্যার পুরোপুরি সুযোগ নেবে।'

'তবে তাঁকে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দাও। রাজা জানকীরামকে পাটনা থেকে ফিরিয়ে এনে তাঁকেই সেখানে পাঠাও।'

'ঠিক। একথা আমার আগে মনে হয়নি। কালই নবাবকে বলবো।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি আমি।

চারদিন পর।

সিরাজের জন্যে বসে রয়েছি। আসতে বড় দেরি হচ্ছে তার। দুপুর গড়িয়ে গিয়ে বিকেল হলো, তবু দেখা নেই। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে।

সোফিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। তার উত্তেজিত মুখের দিকে চেয়ে আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। একটা ঘোর অমঙ্গলের বার্তা লেখা রয়েছে সে-মুখে। সিরাজের কি তবে কিছু হলো?

'চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন? বলো কি হয়েছে?' চীৎকার করে উঠি।

'আপনি শোনেননি এখনো?'

'না, বলো।' চোখে জল এসে যায় আমার।

'আপনি কাঁদছেন কেন?'

'না শুনে কি কাঁদা যায় না? মন বলে কি কোনো জিনিস নেই?'

'কিন্তু এতে আপনার কাঁদার তো কথা নয়। আমি ভেবেছিলাম, আপনি বোধহয় শুনেছেন সব। তাই বলতে এসেছিলাম যে কাজটা খুব ভালো হলো না।'

'কোন্ কাজ? বলেই ফ্যাল্ না শয়তানী।' ছুটে গিয়ে সোফিয়ার চুল চেপে ধরি।

'ছাড়ুন বেগমসায়েবা, বলছি।'

চুল ছেড়ে দিয়ে তার মুখের দিকে তাকাই।

সে ঢোক গিলে বলে, 'বলছিলাম, হোসেন কুলিখাঁকে এভাবে মেরে ফেলা উচিত হয়নি।'

'কি বললে? হোসেন কুলিখাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে? কে মারলে?'

'নবাবজাদা সিরাজদ্দৌলা।'

'মিথ্যে কথা! আমি বিশ্বাস করি না।'

'মিথ্যে নয়। বাজারের মধ্যে নবাবজাদার সামনে হোসেন কুলিখাঁর মাথা কাটা হয়েছে। সেখানে তাঁর দেহ এখনো ঝুলছে একটা বাঁশের মাথায়।'

'না-না, এ কখনো হতে পারে না। তুমি ভুল শুনেছো সোফিয়া।'

'মহম্মদ সেখানে ছিল।'

'মহম্মদ সত্যবাদী নয়।'

'তবে যাকে খুশি জিজ্ঞাসা করুন, সত্য জানতে পারবেন।' সোফিয়া রাগ করে চলে যায়। তার সামনে মহম্মদ সম্বন্ধে আজই প্রথম বিরূপ মন্তব্য করলাম।

পাথরের মতো বসে থাকি। বেগম, বেগম, বেগম। বেগম হওয়ার সুখ মর্মে মর্মে অনুভব করছি। হতে চাই না বেগম। সিরাজকে নিয়ে যদি কোথাও পালাতে পারতাম কোনো নির্জন গাঁয়ের কোলে, তাহলে বেঁচে যেতাম। কি হবে ঐশ্বর্যে, কি হবে নবাবীতে? সাধারণ মানুষের সুখদুঃখই ভালো। তাতে এত খুনোখুনির ব্যাপার নেই, এত ব্যাভিচারও নেই।

কিন্তু সিরাজ তো যাবে না। নবাবীর রক্ত যে তার শরীরের প্রতিটি ধমনীতে ছোটাছুটি করছে। সে চায় উত্তেজনা, উন্মাদনা, আর উচ্ছৃঙ্খলতা। সে চায় যুদ্ধ আর মৃত্যু।

সোফিয়ার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। মহম্মদ বোধহয় তার মুখোশ খুলতে শুরু করেছে। যেমন মহম্মদ, তেমনি মেহেদি নেশারখাঁ—দু'জনেই সমান। দু'জনের আওতা থেকে সিরাজকে মুক্ত করতে হবে।

হোসেন কুলিখাঁকে যে হত্যা করা হয়েছে একথা মিথ্যে হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সিরাজের আদেশে তিনি হত হতে পারেন না। যে সিরাজ তাঁর পক্ষ নিয়ে সেদিন অত কথা বললো, এরই মধ্যে তার মনোভাবের এমন আকস্মিক পরিবর্তন অসম্ভব। তবু মনটা চঞ্চল হলো। সিরাজ না এলে কিছুই বুঝে ওঠা যাবে না।

অবশেষে সিরাজ এলো। রক্তরাঙা চোখ নিয়ে ঢুলতে ঢুলতে এলো। তবে তার জ্ঞান রয়েছে পুরোমাত্রায়। আমাকে দেখে অস্বাভাবিক ভাবে হেসে উঠল। বললো, 'রাগ হলো, তাই না? কি করবো, একটু খেয়ে এলাম। উপায় ছিল না।'

'উপায় তোমার কোনোদিনই হবে না, নবাবজাদা।'

'তুমি অমনভাবে বলো না লুৎফা, তাহলে দাঁড়াবো কোথায়?'

'আমার মৃতদেহের ওপর। নিজের পায়ে তুমি বেশ ভালোই দাঁড়াতে পারো, অন্যের প্রত্যাশা করো না। ওটা শুধু মুখের কথা।'

'তুমিও একথা বললে?' সিরাজ আশাহত চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল।

'কথাটা সত্যি বলিনি?'

'না লুৎফা। মিথ্যে, একেবারে মিথ্যে।'

'শরাব খেয়েছো তাই মিথ্যে বলে মনে হচ্ছে এখন। শরাব খাবার আগে একবার ভেবে দেখো, দেখবে আমার কথাই সত্যি।'

সে ধীরে ধীরে দরজার দিকে ফিরে যায়।

'কোথায় যাচ্ছো?'

'জানি না।'

'এখন যাওয়া হবে না।'

সে হেসে ওঠে। কেমন ভাঙা-ভাঙা হাসি। আরও দু' পা অগ্রসর হয়। আমি গিয়ে তাকে ধরে ফেলি।

'ধরলে কেন? যেতে দেবে না? আমি তো শুধু ছলনা করি।'

'আমার কর্তব্য রয়েছে।'

'কর্তব্য? কর্তব্য তো জারিয়াদেরও আছে। আমি আদেশ করলে একশো জারিয়া ছুটে এসে আমার সেবা করবে, যেমন আজ আমার ছোট্ট আদেশে হোসেন কুলিখাঁর মাথা দেহ থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ল।'

'সত্যি?'

হ্যাঁ সত্যি। নির্মম সত্যি। মুর্শিদাবাদের যে-কেউ জানে। সবাই যা জানে, তুমি জানো না? আশ্চর্য!'

'না-না, তা হতে পারে না। তুমি কখনো একাজ করতে পারো না। তুমি ভুল বকছো, শরাবের নেশায় যা-তা বলছো।'

'না লুৎফা, ভুল নয়। আমি নিজেই জানতাম না যে, একাজ আমি করতে পারি, কিন্তু করলামও তো।'

'কেন করলে নবাবজাদা? সেদিন যে তুমি অন্য কথা বললে।' অবাধ্য জল আমার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে।

'এখনো আমার নিজের মতও তাই, কিন্তু আমি অক্ষম লুৎফা। আমাকে দিয়ে করানো হয়েছে। অনুশোচনায় তাই শরাব খেয়েছি। খুব বেশি করেই খেয়েছি। তবু শান্তি পাচ্ছি কই? তাই তোমার কাছে ছুটে এলাম লুৎফা। তুমি তো শান্তি দিয়েছো কতবার, কিন্তু এবার তাও হলো না। আমি ছলনা করি।'

'ক্ষমা করো, আমাকে ক্ষমা করো। অভিমান হয়েছিল—অভিমানও কি করতে নেই?'

'অভিমান করা আমি পছন্দ করি লুৎফা। কিন্তু বড় অসময়ে করেছিলে।'

'কেন তুমি এই সাংঘাতিক আদেশ দিলে সিরাজ?'

'দাদি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে না পেয়ে নিজে গিয়েছিলেন। হাজার কথা বলে আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন। এ হত্যার জন্যে দাদি দায়ী, আমি নই। কিন্তু লোকে তো জানবে না। বদনাম আমারই হলো। নবাব হবার আগেই আমার নামের সঙ্গে কলঙ্ক জুড়ে দিলাম। বড় আপশোষ হয় লুৎফা।'

আমি চুপ করে শুনি। সে বলে, 'হোসেন কুলিখাঁ সবার প্রিয় ছিল। সে আমারও প্রিয় ছিল। আমি যখন তাকে হত্যা করার আদেশ দিলাম সে বিশ্বাস করতে পারেনি। অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়েছিল। কিন্তু অবাকের রেশ না কাটতেই তার মাথা মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। কেয়ামতের দিনে এজন্যে আমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হবে।'

সিরাজকে শুইয়ে দিয়ে তার পাশে বসি। মনের ভেতরের সংঘাতে সে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে—সে চায় সান্তনা। আমি সান্ত্বনা দিতে যাই, কিন্তু পারি না। মুখে কথা আসে না। ভাবি, সিরাজের কথায় অত বড় একজন লোক হত হলেন। তার মুখের সামান্য একটা কথায় হোসেন কুলিখাঁ জগৎ থেকে চিরবিদায় নিলেন। তাঁর অপরাধ এই যে, তিনি দু'জন বিকারগ্রস্ত নারীর প্রেমে পড়েছিলেন। হয়তো তাঁর নিজের কোনো দুর্বলতাই ছিল না। নারীরা তাঁকে বাধ্য করেছে নিজেদের লালসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়ে নিতে।

সিরাজ ঘুমিয়ে পড়ে।

আমি উঠি। বেগমসায়েবার ঘরে যেতে হবে। তাঁকে সোজা প্রশ্ন করবো, কেন তিনি সিরাজকে দিয়ে এ কাজ করালেন? তাঁর হাতে অগাধ ক্ষমতা। একটা লোকের দেহ বিচ্ছিন্ন করতে তিনি সহস্র লোককে পেতে পারতেন। তবে কেন একজন ছেলেমানুষকে প্ররোচিত করে হীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিলেন তিনি!

বেগমসায়েবার ঘরে তখন অন্য কেউ ছিল না। আমাকে দেখে উঠে বসেন তিনি।

'এসো লুৎফা।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম।'

'জিজ্ঞাসা করার কিছু নেই। সিরাজ ঠিক কাজই করেছে।'

'কিন্তু....'

'কোনো কিন্তু নয়। নবাব হলে এর চেয়ে আরও অপ্রিয় কাজ তাকে করতে হবে। এখন থেকে

অভ্যাস করুক। শক্ত হয়ে উঠুক।'

'অসহায় লোককে হত্যা করা শক্ত হবার একমাত্র পথ নয়। বরং তাতে অন্য ফল ফলতে পারে।'

'বেশ কথা বলতে শিখেছো তো এর মধ্যেই।'

'বাধ্য হচ্ছি বেগমসায়েবা। নবাবজাদার ভার নিতে আপনিই বলেছিলেন। তাঁর মঙ্গল-অমঙ্গলের দিকে তাকাতে হবে বৈকি। এ যে আপনারই আদেশ।' তাঁকে এভাবে বলা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার যে কোনো লোকের পক্ষে ধৃষ্টতা। কিন্তু আমি তখন মরিয়া।

'হুঁ। এতে তার অমঙ্গল কোথায় দেখছো?'

'শত্রুপক্ষ তাঁর নামে কি রটায় আপনি জানেন? এতে সেটা ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো। প্রজারা জানলো, রটনাটা মিথ্যে নয়।'

'সেক্ষেত্রে শত্রুপক্ষকে নির্মূল করতে হবে।'

'তাহলে মহলের ভেতর থেকেই যে শুরু করতে হয়।'

'বুঝলাম না তোমার কথা।' বেগমসায়েবার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়।

'শত্রুপক্ষ মহলেও রয়েছে বেগমসায়েবা।'

'কে সে?'

'ঘসেটি বেগম। নবাবজাদার যেসব দুর্নাম রটে তার জন্যে তিনিই দায়ী।'

'প্রমাণ আছে?'

'আছে। আমি যোগাড় করেছি। তবে আমি আপনার সামনে সে-প্রমাণ উপস্থিত করতে পারবো না।'

'কেন?'

'দু' চারজন নিরপরাধী তাতে শাস্তি পাবে।'

'হুঁ। তোমার কথা মেনে নিলেও ঘসেটির বিরুদ্ধে আমি কিছু করতে দেবো না। মনে রেখো লুৎফা, সে আমার মেয়ে। একটা বেগম মরলে সিরাজ হাজারটা বেগম এনে শূন্যস্থান পূরণ করতে পারবে, কিন্তু একটা মেয়ে মরলে মেয়ে ফিরে পাওয়া যাবে না।'

'সব আমি জানি, বেগমসায়েবা। প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সেজন্যে আপনাকে এতদিন কোনো কথা বলিনি।'

'সিরাজ কোথায়?'

'আমার ঘরে।'

'সে তোমার ঘরে কি রোজই যায়?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা যাও।'

তাড়াতাড়ি চলে আসি নিজের কক্ষে। বেগমসায়েবার কথার গূঢ় অর্থ আমি বুঝেছি। তিনি আমার কাছ থেকে সিরাজকে সরিয়ে নিতে চান। কিন্তু কিছুতেই আমি দেবো না সিরাজকে। কিছুতেই নয়। বাংলার বেগম বুঝুক লুৎফাও কম নয়, তারও শক্তি রয়েছে।

নিদ্রিত সিরাজকে ঠেলে তুলি। তার কোলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করি। কান্না ছাড়া গতি নেই।

'কি হলো লুৎফা।'

'তুমি আমাকে একটা দাও।'

'হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়ে এমন কি কথার প্রয়োজন হলো?'

'বলো দেবে? না দিলে আমি আত্মহত্যা করবো।'

'দেবো, বলো।'

'তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারবে না—কোনোদিনও না।'

'আমি তো দূরে যাইনি।'

'ভীষণ ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আমার কাছে তারা তোমাকে থাকতে দেবে না।'

'সে-ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে।'

'যদি বেগমসায়েবা নিজে থাকেন সে-ষড়যন্ত্রে?'

'তুমি বলছো কি লুৎফা?'

'ঠিকই বলছি।' বেগমসায়েবার সঙ্গে আমার কথোপকথনের সবটুকুই বলি তাকে।

'ঘসেটি বেগম যে এর মধ্যে আছে, সে প্রমাণ তুমি পেলে কি করে?'

'ভাগ্যক্রমে।'

'কি সে প্রমাণ?' তার কথায় আগ্রহ।

'রাজবল্লভের কাছে মীর নজরালি মারফত এক টুকরো চিঠি যাবার কথা ছিল। সেটা আমার হস্তগত হয়েছে।'

'ঘসেটি বেগম লিখেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার হাতে এলো কিভাবে?'

'তোমার দিকে চেয়ে মহলের কিছু লোককে হাতে রেখেছি। অন্যায় হয়েছে নবাবজাদা?'

সিরাজ কিছু বলে না। আমি উঠে গিয়ে ঘসেটির হস্তাক্ষর নিয়ে এসে তার সামনে মেলে ধরি :

'নবাব আলিবর্দি আর কতদিন বাঁচবেন। এরপর কি ওই উদ্ধত বালকের অধীন হতে মনস্থ করেছেন?

সিরাজ চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে বলে, 'আমার ভালো করতে গিয়ে মস্ত ভুল করে বসে আছো লুৎফা। চিঠিখানা যে ঠিক জায়গায় পৌঁছায়নি, সেটা বুঝতে ঘসেটি বেগমের বেশি দেরি হবে না। ফলে কয়েকজন হতভাগ্য শাস্তি পাবে। ঘসেটি বেগম আরও অনেক সাবধান হবে। তার পরবর্তী কার্যকলাপ জানতে পারবো না।'

'এতক্ষণে রাজবল্লভের কাছে চিঠি পৌঁছে গিয়েছে, নবাবজাদা।'

'কি করে?'

'এর নকল করে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। ঘসেটি বেগমের আসল হস্তাক্ষর রেখে দিয়েছি নিজের কাছে।'

সিরাজ আমাকে চুমু খায়। হোসেন কুলিখাঁকে হত্যা করে অবসাদে তার মন ভেঙে গিয়েছিল। সে অবসাদ বিন্দুমাত্রও দেখা গেল না তার মধ্যে। সে আমাকে শূন্যে তুলে বলে, 'তুমি আমার লুৎফাউন্নেসা।'

হঠাৎ তার আনন্দে ভাটা পড়ে। সে আমাকে নামিয়ে দিয়ে দরজার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চায়। মীর্জা ইরাজ খাঁর কন্যা সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে আগুন জ্বলছে, মুখ রক্তাভ। হিংস্র জন্তুর মতো সে সিরাজের দিকে চেয়ে রয়েছে। ভাবি, বেগমসায়েবার ষড়যন্ত্র কি এর মধ্যে শুরু হয়ে গেল?

সিরাজ বলে, 'এ তোমার অনধিকার প্রবেশ জেবউন্নেসা।'

'না।' ইরাজ-দুহিতার কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

'কেন নয়?'

'লুৎফাকে তুমি শাদি করোনি, আমাকে শাদি করেছিলে। দিনের পর দিন একা থেকে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। পঞ্চাশবার লোক পাঠিয়েছি তোমার খোঁজে, তবু পাইনি। তাই আজ নিজেই এসেছি ঘর ছেড়ে। তোমার জন্য যেখানেই যাই না কেন, সেটা অনধিকার হতে পারে না।'

জেবউন্নেসার জন্যে দুঃখ হলো। সত্যিই তো, তার মনেও সাধ আছে, আহ্লাদ আছে। তাছাড়া আমার মতো জারিয়া থেকে সিরাজের এক কথায় বেগম হয়নি সে। ভালো বংশের মেয়ে। রীতিমতো জাঁকজমক আর অনুষ্ঠানের মধ্যেই তার শাদি হয়েছিল। সে কেন অবহেলা সহ্য করবে?

আমি গিয়ে তার হাত ধরি। সে হাত ছাড়িয়ে নেয়।, বলে, 'ছুঁয়ো না। তোমার হাত আমার দেহ স্পর্শ করবার উপযুক্ত নয়। ও হাতে আমার পা টিপতে পারো।'

লজ্জায় অপমানে মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে আমার। সিরাজ হো-হো করে হেসে বলে, 'কিন্তু ও হাতের স্পর্শ যে আমার সর্বাঙ্গে। আমার দেহ কি তুমি ছুঁতে পারবে, জেবউন্নেসা?'

সে কোনো কথা বলে না।

আমি বলি, 'নবাবজাদাকে তোমার ঘরেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'থাক দয়া দেখাবার প্রয়োজন নেই। আমার কাজ আমি নিজেই করে নিতে জানি। কেউ যদি তাতে বাধা সৃষ্টি করে তাকে কিভাবে সরিয়ে দিতে হয় তাও আমার জানা আছে।'

'ও, জানো নাকি?' সিরাজের মুখে বিদ্রূপের তারল্য। আমি দু'হাতে তার মুখ চেপে ধরি।

সিরাজ এগিয়ে যায় জেবউন্নেসার কাছে। দুই হাতে তার হাত দুটো তুলে নিয়ে নিজের গলায় মালার মতো রেখে বলে, 'শুধু শুধু রাগ করছো তুমি। লুৎফাকে শাদি করিনি যখন, তখন সে তোমার অধিকার কি করে ছিনিয়ে নেবে?'

'থাক, আর মন ভোলাতে হবে না।' জেবউন্নেসা সিরাজের কাছ থেকে দূরে সরে যায়।

'বিশ্বাস করলে না? এই দেখো।' সিরাজ নিজের গলা থেকে একটা বহুমূল্য হার খুলে নিয়ে বলে, 'এর মূল্য নবাবের অর্থভাণ্ডারের প্রায় অর্ধেক অর্থের সমান। লুৎফা কোনোদিন এ-হার পেতো না, অন্য কোনো বেগমও নয়, কিন্তু তুমি পেলে। তুমি যে আমার শাদি করা বেগম, জেবউন্নেসা।'

সিরাজ সযত্নে সে-হার পরিয়ে দেয় তার গলায়।

জেবউন্নেসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে চঞ্চল হয়। এ যেন তার কল্পনার অতীত। বিস্মিত হয়ে বলে, 'আমাকে একেবারে দিয়ে দিলে!'

'হ্যাঁ, এতে যে শুধু তোমারই অধিকার। হাজারটা লুৎফা এসে শতবর্ষ ধরে চেষ্টা করলেও এ জিনিস পেতো না।'

সিরাজ তাকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু সে সিরাজের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে হাসতে হাসতে ছুটে চলে যায়।

হো-হো করে হেসে ওঠে নবাবজাদা। আর আমি বিহ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকি। এই বয়সে এত বুদ্ধি বুঝি শুধু নবাবদেরই হয়। নারী-চরিত্র চিনতেও তার বাকি নেই। নিজে নারী বলে লজ্জিত হই।

সিরাজ বলে, 'জেবউন্নেসা তার অধিকার বুঝে পেয়েছে, লুৎফা। তোমাকে দিলাম না বলে কষ্ট হলো না তো?'

'কিছুমাত্র নয়। আমার বহুমূল্য হার আমার সামনে দাঁড়িয়ে। জেবউন্নেসা নকল হার নিয়েই ভুলল। সে মূর্খ।' সিরাজের হাত দুটো তুলে নিয়ে নিজের গলায় জড়িয়ে দিই।

যে অসন্তোষ সিরাজের মনে অল্প-অল্প ধূমায়িত হচ্ছিল, সেটা প্রচণ্ড আকারে দেখা দিল একদিন।

মেহেদি নেশারখাঁ দিনের পর দিন ইন্ধন যুগিয়ে এ দশা করলো। গোড়া থেকে জেনেও আমি বাধা দিতে পারলাম না।

বহুদিন থেকে সিরাজ জেদ ধরেছিল, সে পাটনায় গিয়ে থাকবে। কিন্তু নবাব আলিবর্দি বার বার বুঝিয়ে তাকে শান্ত করেছেন। এখন নবাব মুর্শিদাবাদে নেই। ছোটখাটো একটা যুদ্ধ বেধেছে রাজ্যের সীমান্তে, তিনি সেখানে গিয়েছেন।

নবাবের অনুপস্থিতিতে মেহেদি নেশারখাঁ পরিপূর্ণ সুযোগ পেলো। সিরাজের মনে সে ধারণা এনে দিল যে, নবাব সিরাজকে তুষ্ট রাখার জন্যে নামে শুধু তাকে পাটনার শাসনকর্তা করেছেন, আসলে প্রকৃত শাসনকর্তা রাজা জানকীরাম।

কথাটা সিরাজ অনেকবার আমাকে বলেছে, আমি কোনো গুরুত্ব দিইনি। বরং আকারে, ইঙ্গিতে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে, সে বাংলার মসনদে বসবে বলেই নবাব তাকে দূরে না পাঠিয়ে নিজের কাছে রাখতে চান। এতে অভিজ্ঞতা লাভ হবে। পাটনায় গিয়ে বসে থাকলে মুর্শিদাবাদের রাজনীতি সম্বন্ধে সে অজ্ঞ থেকে যাবে। তাছাড়া সেখানে বিপদও আছে অনেক। তার পিতা জীবন দিয়ে সে প্রমাণ দিয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু সিরাজ নাছোড়বান্দা।

হঠাৎ একদিন আমার কাছে তার আদেশ এলো, শিগ্‌গির প্রস্তুত হয়ে নিতে। কেন প্রস্তুত হবো, কোথায় যাবো, কিছুই না বুঝে যখন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি, আমিনা বিবি তখন কাঁদতে কাঁদতে এসে বলেন, 'শুনলে সিরাজের কাণ্ড!'

'কিছুই বুঝছি না।'

'ওর সঙ্গে যেতে হবে পাটনায়।' পাটনা আক্রমণ করবে।

'সে কি!'

'আর বলো কেন? কে কি বুঝিয়েছে জানি না, গোঁ ধরে বসেছে।'

'আপনিও যাবেন নাকি?'

'নইলে আর বলছি কি!'

'ভালোই হলো। আমি ভেবেছিলাম আমাকেই বুঝি একা যেতে হবে।'

'আমি মা'র কাছে চললাম। অতদূরে আমি আর যেতে পারবো না। সে কি কম দূর?'

'বেগমসায়েবার কাছে গেলে কি কোনো ফল হবে?'

'দেখি, মা যদি ওকে বুঝিয়ে শান্ত করতে পারেন।' আমিনা বিবি চলে যান।

আমি জানি, কারো কথাতেই কিছু হবে না। আমাদের দুজনকেই যেতে হবে সিরাজের সঙ্গে। গোছগাছ করে নিই।

সামনে আর পেছনে সৈন্যের দল। তারই মাঝে চলেছে বলদদের গাড়ির সারি। মেহেদি নেশারখাঁ সামনের গাড়িতে রয়েছে। পরের গাড়িতে আমি আর সিরাজ। তার পরের গাড়িতে আমিনা বিবি। বেগমসায়েবার কাছে ধর্না দিয়েও তিনি মুর্শিদাবাদে থাকতে পারেননি।

আমিনা বিবির পরে আরও দু'খানা গাড়িতে রয়েছে জিনিসপত্র।

পথ আর শেষ হতে চায় না। একটু পরেই গলা শুকিয়ে ওঠে। জল খেয়েও তৃষ্ণা মেটে না।

'কোথায় নিয়ে চললে, নবাবজাদা? পৃথিবী যে শেষ হয়ে এলো।'

'এখনো কষ্ট শুরু হয়নি, লুৎফা। প্রকৃতির শ্যামল রং দেখতে পাচ্ছো এখনো। এরপর শুরু হবে শুধু পাহাড় আর শক্ত মাটি।'

'আমি মরে যাবো, নবাবজাদা।'

'এত অল্পেই? যুদ্ধ শুরু হলে কি করবে?'

'যুদ্ধে কাজ নেই। এ তুমি জোর করে যুদ্ধ বাধাচ্ছো। চলো, ফিরে যাই।'

'চুপ। বাজে কথা শুনতে চাই না। আত্মসম্মান কি জিনিস তা বোঝবার ক্ষমতা তোমার নেই।'

'এ আত্মসম্মান-বোধের ভিত্তিটা মিথ্যের ওপর।'

'আর কথা হলো না, গাড়ি থেকে ফেলে দেবো।' সিরাজের মুখের দিকে চেয়ে ভয় হলো। তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। যে ভূত ঘাড়ে চেপেছে, সেটা না নামা অবধি একটু সাবধানে কথা বলতে হবে। অন্তত তার পাটনা অভিযান সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করা চলবে না আর।

শেষে পথ ফুরোলো।

দূর থেকে দেখা যায় আজমবাগের দুর্গ। কিন্তু ও-পক্ষের যুদ্ধের কোনো আয়োজন তো দেখা যাচ্ছে না। সিরাজ খুবই বিস্মিত হলো। সে গাড়ি থেকে মাটিতে নামে। পর্দা সরিয়ে দেখলাম, মেহেদি নেশারখাঁ গাড়ি থেকে নেমেছে। কোনো গভীর পরামর্শ করতে করতে দু'জনে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে।

পাটনার প্রধান দরজার সামনে আমাদের সমস্ত সৈন্য দাঁড়িয়ে গেল। দরজা বন্ধ। একজন লোক শুধু একটা চিঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার বাইরে। রাজা জানকীরামের চিঠি।

ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সিরাজ মত্ত হাতির মতো ঘুরে বেড়াতে থাকে। জানকীরাম তাকে অপমান করেছে। লিখেছে যে, সিরাজ পাটনার শাসনকর্তা। সে একা এলে জানকীরাম তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে। যথাযথ সম্মান দেখিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে নগরীর ভেতরে। কিন্তু সৈন্যসামন্তকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। সৈন্যরা যেন ফিরে যায় মুর্শিদাবাদে।

সিরাজ ক্রোধে চীৎকার করে উঠল। সৈন্যদের ডেকে আক্রমণ চালাতে বললো। কিন্তু আক্রমণ করবে কাদের ওপর? বিপক্ষের তো কোনো সৈন্য নেই।

শেষে নগরীর দরজা ভেঙে ফেলার হুকুম দিল সে। সেই সময় সর্বপ্রথম বাধা পেল অপর পক্ষ থেকে। যারা দরজা ভাঙতে গিয়েছিল, তাদের কিছু লোক তীরের আঘাতে ধরাশায়ী হলো।

এবার মেহেদি নেশারখাঁ এগিয়ে যায় অর্ধেক সৈন্য নিয়ে। দরজা ভাঙতেই হবে, এই হলো সিরাজের পণ। তার মুখে হাসির আভাস দেখা গেল। ভাবখানা এই যে, জানকীরামের ওপর টেক্কা দিয়েছে সে। তীরের আঘাতে দু'চারজনকে মেরে ফেলে ভাবে, এবারে আর জানকীরাম পাটনা নগরী রক্ষা করতে পারবেন না।

কিন্তু মেহেদি নেশারখাঁ দরজার কাছে এগিয়ে যাবার আগেই হঠাৎ দেখা গেল, অজ্ঞাত স্থান থেকে একদল সৈন্য এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপর। বহুক্ষণ কিছু বুঝতে পারলাম না—শুধু অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি আর ঝলকানি! আমি আর আমিনা বেগম শিবির থেকে এই ভয়াবহ কাণ্ড দেখি, আর ভেবে মরি। আর সিরাজ আমাদেরই সামনে অস্থিরভাবে পায়চারি করে। কি যেন ভুল হয়ে গিয়েছে তার—মস্ত ভুল।

একজন ছুটে এসে বলে, 'মেহেদি নেশারখাঁ হত হয়েছে।' মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে সিরাজ। আর আমার বুক থেকে পাষাণভার নেমে যায়। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, রাজা জানকীরামের যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছাই নেই। শুধু নগরী রক্ষার জন্যে যেটুকু না করলে নয়, সেটুকু করতে তিনি আদেশ দিয়েছেন তাঁর সৈন্যদের। অজ্ঞাতস্থান থেকে তাঁর সৈন্যদল যেভাবে মেহেদি নেশারখাঁর সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না যে, ইচ্ছে করলে ওভাবে আমাদের ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতো। কিন্তু পড়েনি। কারণ জানকীরামের আদেশ নেই। সিরাজ যাতে নিরাপদে থাকে, সেদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে।

মেহেদি হত হবার পর সেদিনের মতো যুদ্ধ বন্ধ হলো। সিরাজ রীতিমতো চিন্তিত হয়েছে। সে অন্য কোনো কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টায় রয়েছে।

পরদিন একজন অশ্বারোহী আমাদের শিবিরের সামনে এসে হাজির হয়। নবাব আলিবর্দির ঘোড়সওয়ারকে দেখে বিস্মিত হলাম। লোকটি সোজা এসে সেলাম দিয়ে সিরাজের সামনে দাঁড়াল।

'কোথা থেকে আসছো?' সিরাজ প্রশ্ন করে।

'নবাব পাঠিয়েছেন।'

'তিনি জানলেন কি করে যে, আমি এখানে এসেছি?'

'রাজা জানকীরাম তাঁর কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন।'

'হুঁ, স্পর্ধা বটে জানকীরামের।'

লোকটাকে সিরাজ মেরে না ফেলে।

'নবাব কি জন্যে তোমাকে পাঠিয়েছেন?' কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে থেকে সিরাজ প্রশ্ন করে।

লোকটি একখানা চিঠি দেয়।

সিরাজ বার বার সেটা পড়ে। তার মুখে আস্তে আস্তে একটা শান্ত ভাব ফুটে ওঠে। শেষে সারা মুখ জুড়ে হাসির রেখা দেখা দেয়। আমি স্বস্তি পাই। নবাব তাঁর নাতির মন ভালোভাবেই জানেন। সেই মন বুঝে তিনি কিছু লিখেছেন নিশ্চয়। নইলে সিরাজের মুখে এই পরিস্থিতিতে হাসি ফোটানো বড় সহজ কথা নয়। বৃদ্ধ হলেও নবাব আলিবর্দির তুলনা নেই।

সিরাজ চিঠিখানা নিজের সামনে রেখে লোকটির দিকে চেয়ে বলে, 'নবাবকে নিশ্চিন্ত হতে বলো। তাঁর ইচ্ছেমতোই কাজ হবে।'

লোকটি বিদায় নিতেই আমি সিরাজের সামনে আসি। আমাকে দেখে সে বলে, 'দেখছো লুৎফা, দাদুর কাণ্ড।'

'কি কাণ্ড হলো আবার?'

'দাদুর জন্যে আমার কোনো কিছু করবার উপায় নেই। তিনি ভাবেন, যেন চিরকাল বেঁচে থেকে আমাকে বুকে করে নিয়ে বেড়াবেন।'

'অমন দাদু পাওয়া ভাগ্য, নবাবজাদা।

'সে আমি জানি। কিন্তু আমার সব কাজকে ছেলেমানুষী বলে উড়িয়ে দেওয়া তাঁর অন্যায়। এবারে মুর্শিদাবাদে গিয়ে আমি ঝগড়া করবো—ভীষণ ঝগড়া করবো, তুমি দেখে নিও।'

'যাক্, তাহলে আর আমাদের পাটনায় থাকতে হবে না তো?'

সিরাজ ঘাড় নাড়ে।

অভিমান হয়েছে নাতির। মুখে বলি, 'নবাব তোমাকে কি লিখেছেন?'

'এই দেখো।'

চিঠিখানা খুলি। লেখা রয়েছে ঃ 'যুদ্ধ করে সবাই বীরত্ব দেখাতে পারে, কিন্তু দাদুর ভালোবাসার অত্যাচার যে সহ্য করতে পারে, সেই তো প্রকৃত বীর। আমার সিরাজ সে রকম বীর কিনা তারই পরীক্ষা আজ। জানকীরাম তোমার শুভাকাঙ্খী। সে তোমাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে প্রস্তুত। শুধু তোমার আদেশের অপেক্ষায় বসে রয়েছে। নিজের সৈন্যের সঙ্গে আবার যুদ্ধ করে নাকি? জানকীরাম তো তোমারই অধীনস্থ কর্মচারী। তাকে শুধু হুকুম করো।'

আমি বলি, 'নবাব তো ঠিকই লিখেছেন। রাজার কাছে লোক পাঠাও এখুনি।'

কিছুক্ষণ পরেই জানকীরাম স্বশরীরে এসে উপস্থিত। সঙ্গে হাতি, ঘোড়া, পালকি আর বাদ্যযন্ত্র।

সিরাজ হাসতে হাসতে উঠে গিয়ে রাজাকে জড়িয়ে ধরে। রাজাও হেসে দু' বাহু বাড়িয়ে দেন। সে দৃশ্য দেখে আমার চোখ আনন্দে সজল হয়ে ওঠে। এমন সৌম্য চেহারার লোকের বিরুদ্ধে সিরাজ অভিযান চালিয়েছিল ভেবে লজ্জা হয়। তাঁর মতো এলেমওয়ালা লোক নবাবের অধীনে হয়তো দু'জনও নেই।

নবাব আলিবর্দির স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। তাঁর ঋজু বলিষ্ঠ চেহারা নুইয়ে পড়ল। বেগমসায়েবা রীতিমতো চিন্তিত হন। হাকিমদের মতামত শুনে তাঁর মতো মহিলার মুখও শুকিয়ে যায়।

কিন্তু নবাব শুনে হেসে বলেন, 'এতে এত মনমরা হবার কি আছে? এই তো নিয়ম। স্বাস্থ্য একদিন সবারই ভেঙে যায়। তারপর ধীরে ধীরে শেষ সময় ঘনিয়ে আসে। এর জন্যে কান্নাকাটি করা বাতুলতা। বরং মনকে শক্ত করে প্রস্তুত থাকাই ভালো।'

বেগমসায়েবা বলেন, 'এমন কথা বলো না, তোমার বয়স এমন কিছু বেশি নয়।'

নবাব হেসে বলেন, 'তোমার কাছে আমি কি কখনো বুড়ো হই? বাইরের লোককে জিজ্ঞাসা করো তাহলে বুঝবে।'

তাঁর কথার ধরণে আমি গোপনে হেসে ফেলি। সে হাসি বেগমসায়েবা দেখে ফেলেন। বুঝতে পারি তিনি রেগেছেন। ভয়ে আমি পালিয়ে যাই। মনে মনে ভাবি মেয়েরা বড় অবুঝ হয়। সিরাজ যখন বুড়ো হবে, তখন আমিও হয়তো বেগমসায়েবার মতোই ভাববো।

এখন সিরাজই সব কাজ চালায়। নবাব শুধু পরামর্শ দেন। সিরাজকে তিনি বলেন, 'ভালোই হলো রে দাদু, হাতেনাতে শিখে নে। এমন সুযোগ আর ক'জন পায়?'

'এমন শেখায় আমার কাজ নেই।' সিরাজের চোখ ছলছল করে।

'সেকি রে, তুইও কাঁদছিস? হা আল্লা! এমন নরম মন নিয়ে নবাব হবি?'

'আমি কাঁদছি কে বললে? রাগলে আমার চোখে জল আসে।'

'আবার রাগ হলো কেন?'

'হবে না? স্বাস্থ্য তোমার একটু খারাপ হয়েছে। এমন হয়েই থাকে। তাতে অত মরার কথা কেন? ঘুরেফিরেই তো বেড়াচ্ছো। শয্যাশায়ী হলেও না হয় কথা ছিল।'

'রোগটা বড় খারাপ রে! এই যে পা দেখছিস, কেমন ফোলা-ফোলা ভাব, হাকিমরা বলে, এই পা পচে উঠবে।'

'সে কি!'

'হ্যাঁ। বর্গীর সঙ্গে যুদ্ধের ফল। হাঁটুর নিচেটা কেটে গিয়েছিল। একজন অচেনা হাকিম এসে কতকগুলো লতাপাতা দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল জায়গাটা। তারপর থেকেই মাঝে মাঝে ব্যথা হয় আর ফুলে যায়।'

'ভালো করে চিকিৎসা করাও।'

'চিকিৎসা গোড়া থেকেই হচ্ছে। এখন চিকিৎসার বাইরে চলে যাচ্ছে যে। তাই তো বলি, শিখে নে।'

সিরাজ গম্ভীর হয়ে বসে থাকে।

ঘসেটি হঠাৎ একদিন নবাব মহল ছেড়ে চলে যায়। সে মতিঝিলে গিয়ে ওঠে। সেখানেই বসবাস করবে।

মুর্শিদাবাদের বেহেস্ত মতিঝিল। একবার শুধু গিয়েছিলাম সেখানে। কিন্তু সে-ছবি এখনো আমার

মনের মধ্যে তেমনি স্পষ্ট, তেমনি উজ্জ্বল হয়ে আছে। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি মতিঝিলকে। তার সাজানো বাগিচা আর অশ্বপদক্ষুরাকৃতি ঝিল যেন বেহেস্তের মায়া রচনা করে স্বপ্নের মধ্যে। আবার দেখবার ইচ্ছা হয়েছে কতবার, কিন্তু সুযোগ হয়ে ওঠেনি। ঘসেটি বেগম সেই মতিঝিলকে নিজের করে নিলো।

ইরাজ খাঁর কন্যা ভীষণ চটে গেল একথা শুনে। সবাইকে বলে বেড়াতে লাগল, ঘসেটির অধিকার নেই মতিঝিলে বাস করবার। ওটা নবাবের প্রমোদ উদ্যান—খাস নবাবের অধীনে। ইরাজ খাঁর কন্যা হয়তো ভুলে গিয়েছিল যে, সিরাজ সবকিছু করলেও বাংলার মসনদে এখনো নবাব আলিবর্দিই রয়েছেন। তিনি যদি তাঁর কন্যাকে মতিঝিল দান করেন, কারও ক্ষমতা নেই কিছু বলার।

সিরাজ এসে বলে, 'আমি এ রকমই অনুমান করেছিলাম, লুৎফা।'

'কিসের অনুমান?'

'নওয়াজিস আর ঢাকায় থাকতে পারবে না।'

'কেন?'

'সে হয়তো থাকতো সেখানে, কিন্তু ঘসেটি বেগম তাকে থাকতে দেয়নি। টেনে নিয়ে এসেছে মুর্শিদাবাদে।'

'এখানে টেনে নিয়ে এসে লাভ?'

'তুমি বড় অল্প বোঝো, লুৎফা।'

'আমাকে বুঝিয়ে দেবে না?'

'দেবো। দাদু অসুস্থ। ভালোমন্দ একটা কিছু যখন তখন হতে পারে। শেষ চেষ্টা করতে হবে না?'

'কিসের চেষ্টা, নবাবজাদা?'

'নাঃ, তোমাকে খুলে না বললে হবে না দেখছি।'

'খুলেই বলো।'

'ঘসেটি বেগম নওয়াজিসকে নবাব করার শেষ চেষ্টা করবে একবার।'

'কি সর্বনাশ!' আমার গলা কেঁপে ওঠে।

'এতে আর সর্বনাশের কি হলো? সবাই এমন করে থাকে। আমি নবাব না হতে পারলে আমিও করতাম। ঘসেটির দোষ কি হবে? সব দেশের মসনদের সঙ্গেই এ রকম ইতিহাস জড়িত। নতুনত্ব কিছু নেই। তবে ঘসেটি একটু বাড়াবাড়ি করছে। রাজবল্লভ আর জগৎশেঠকে দলে টানার চেষ্টা করছে। রাজবল্লভ বড় চতুর লোক। ঢাকায় নওয়াজিসের সমস্ত ক্ষমতা সে নিজের মুঠোয় নিয়েছে। নওয়াজিসকে নবাব করতে পারলে, সেই হবে প্রকৃত নবাব। কিন্তু তবু তাকে আমি এতটা ভয় পাইনে, যতটা পাই জগৎশেঠকে। ও লোকটা যদি ঘসেটির দলে যায়, তাহলে টাকা পয়সা দিয়ে অনেক কিছু ঘটনা ঘটাতে পারে।'

'সে রকম ঘটনা যাতে না ঘটে এখন থেকে সেই চেষ্টা করো।' আমি উৎকণ্ঠিত হই।

'চেষ্টা করে কোনো লাভ হবে না। ওরা ভোলবার পাত্র নয়।'

'মীর বক্সীকুলের খবর কি?' তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা আমার কানে আসছিল।

সিরাজ বিস্মিত হয়ে বলে, 'তুমি কি করে জানলে!'

'হারেমে থাকলে কি কিছুই জানতে নেই?'

'সেটাই তো স্বাভাবিক।'

'বেগমসায়েবা তো সব জানেন।'

'দাদি অন্য ধাতুতে গড়া।'

'আমিও সেই ধাতুতে নিজেকে ডুবিয়ে নেবার চেষ্টা করছি।'

সিরাজ হেসে বলে, 'ভালো। পারলে সত্যিই ভালো। জাফর আলি খাঁর ওপর আমার নজর আছে, লুৎফা।'

'কিন্তু.....'

'ওসব কথা থাক্। এখন একটা কাজের কথা বলি। মতিঝিল তো নওয়াজিস খাঁ নিয়ে নিল। আমার ও রকম একটা ঝিল না হলে যে চলবে না।'

'কি করে নেবে ওটা?'

'ওটা নেবার দরকার নেই। আমি নতুন ঝিল তৈরি করবো নদীর ওপারে।'

'টাকা?'

'সে ব্যবস্থা করতে হবে। আদত কথা হলো দাদুর সম্মতি আদায় করা। সেটা হয়ে গেলে টাকার জন্যে ভাবতে হবে না। এই পুরোনো জায়গায় থাকতে ইচ্ছা হয় না, লুৎফা। নতুন জায়গায় গিয়ে থাকবো শুধু তুমি আর আমি।'

'কবিত্বটা কি ঘসেটি বেগমের ওপর ঈর্ষাবশে?'

'না, অনেকদিন থেকেই মনের মধ্যে সাধ ছিল। মতিঝিল বেদখল হওয়ায় মনের সেই সাধ তাড়াতাড়ি বাস্তব রূপ নেবে।'

'তোমার ঝিলের নাম কি রাখবে?'

'লুৎফা-ঝিল।' সিরাজ হেসে ওঠে।

'না-না, আমি ঝিল হতে চাই না। আমি নির্জলা লুৎফাই থাকতে চাই।'

'সম্রাট সাজাহান মমতাজকে কেমন অমর করে রেখে গিয়েছেন।'

'সাজাহানের পুরুষোচিত বীরত্ব ছিল না বলে ওই পথ ধরেছিলেন।'

সিরাজ আমার কাছ থেকে ঠিক এ জাতীয় জবাব আশা করেনি। তাই কেমন একটা থতমত ভাব দেখলাম তার আচরণে।

আমি এগিয়ে গিয়ে তার বুকে মাথা রেখে বলি, 'আমি চাই না, তুমি আর আমি লুৎফা-ঝিলের মধ্যে বেঁচে থাকি। তার চেয়ে তুমি এমন একজন নবাব হও, যাতে তোমাকে কেউ কোনোদিন না ভোলে। তুমি যদি সেভাবে অমর হও, তাহলে আমি তো তোমার সঙ্গেই বেঁচে থাকবো। আমি যে তোমার প্রাণের আধখানা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিরাজ বলে, 'সেই ভালো লুৎফা, আমি সেইভাবেই অমর হবার চেষ্টা করবো। কিন্তু ঝিলের একটা নাম তো রাখতে হবে।'

'এপারে রয়েছে মতিঝিল, তোমারটা হবে হীরাঝিল।'

'হীরাঝিল! হীরাঝিল! বাঃ, সুন্দর! কী সুন্দর নাম দিলে তুমি! তাই হবে—হীরাঝিল।'

সিরাজ ছুটতে ছুটতে চলে যায়। যেন এখনই তৈরি হয়ে যাবে হীরাঝিল। পাগলের দিকে চেয়ে তৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে।

হীরাঝিল তৈরি হয়ে গেল। মতিঝিলের চেয়েও নাকি সুন্দর হয়েছে দেখতে।

মতিঝিলের গর্ব খর্ব করার জন্যেই যেন তারই অপর পারে উদ্ধত সৌন্দর্য নিয়ে গড়ে উঠল হীরাঝিল।

নবাব আলিবর্দিকে সিরাজ একদিন বললো, 'দাদু, একটা কথা আছে।'

'কি হলো আবার?'

'না, হয়নি কিছু। কিন্তু যা বলবো তা কি তুমি মেনে নেবে?'

'অসঙ্গত না হলে মেনে নেবো বৈকি।'

'সেই ভরসাতেই তো এসেছি।'

'ঢের হয়েছে। এখন কথাটা বলেই ফেলো তো ধন।' নবাবের মুখে হাসি।

আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনি। আমি জানি, সিরাজ কি বলতে এসেছে। যা বলতে এসেছে তাতে আমার মত নেই। তবে ওর উৎসাহ দেখে বাধা দিতে পারিনি। বলেছিলাম, নবাবের সম্মতির প্রয়োজন। তাই সিরাজ এসেছে নবাবের কাছে। আমার ধারণা, নবাব কখনোই সম্মত হবেন না সিরাজের এই আবদারে।

সিরাজ বলে,'হীরাঝিল তৈরি হয়ে গিয়েছে।'

'শুনলাম। ঘসেটি তো রেগেই আগুন।'

'অনেকেই রাগবে, তার জন্যে কিছু এসে যায় না। আমার দাদু না রাগলেই হলো।'

'এত ভেজা-ভেজা কথা কেন? শুনে যে বড় ভয় হচ্ছে। কি মতলবে এসেছো বলেই ফেলো?'

'আমি হীরাঝিলে থাকবে।'

নবাবের মুখ এতটুকু হয়ে যায়। তাঁর দৃষ্টিতে অসহায় ভাব। কি করবেন বুঝে উঠতে পারেন না, যেন তাঁর বুক শূন্য হয়ে যেতে বসেছে। সিরাজের কথার কোনো জবাব দিতে পারেন না তিনি।

সিরাজ তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে বলে, 'দাদু, হীরাঝিলে থাকতে আমারও খুব ভালো লাগবে না। কিন্তু এত কষ্ট করে তৈরি করলাম থাকতে সাধ হয়।'

নবাব আরও অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নড়েচড়ে বসেন। বলেন, 'হুঁ, বুঝলাম। বেশ, তুমি হীরাঝিলে থাকো, কিন্তু বুড়োর কথাটা মনে রেখো।'

কাজ হাসিল করে নিলেও দাদুর কথা শুনে সিরাজের চোখ সজল হয়ে ওঠে। সে বলে, 'তোমাকে কষ্ট করে মনে রাখতে হয় না, দাদু। তোমার কথা মনের মধ্যে সব সময়ই গেঁথে থাকে।'

আলিবর্দির মুখে হাসি ফোটে। তিনি বলেন, 'তাই নাকি? আমি জানতাম, বুড়োদের কথা কেউ মনে রাখে না। বুড়োদের স্নেহও লোকে বিদ্রূপের চোখে দেখে। তোমার কথা শুনে যেন বল পাচ্ছি মনে। আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে সাধ হচ্ছে।'

'কথায় কথায় অত মৃত্যুর কথা ভাবো কেন? বেশ তো আছো, ভেবে-ভেবেই তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

'না ভেবে করি কি? পায়ের অবস্থা দেখেছো?' আলিবর্দি পায়ের ওপর থেকে একটা আলগা কাপড় তুলে নেন। চমকে উঠি দূর থেকে। কী বীভৎস চেহারা হয়েছে পায়ের! সিরাজ চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে।

'দেখলে তো? এরপরেও বলবে আমি বেঁচে থাকবো?'

সিরাজ নিশ্চুপ। বলার কিছু নেই তার। দাদুর আয়ু সম্বন্ধে এতদিনে সে প্রথম সচেতন হলো। আরও কিছুক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সে ধীরে ধীরে চলে আসে।

শুধু আমাকেই সিরাজ হীরাঝিলে নিয়ে এলো। অন্যান্য বেগমরা পড়ে থাকলো পুরোনো মহলে। ভেবে সঙ্কুচিত হই আমি। সিরাজকে বলেছিলাম, ওদেরও নিয়ে আসতে। অন্তত ইরাজ খাঁর কন্যাকে। সে শোনেনি।

মাস দুয়েক না যেতেই আর এক সমস্যা দেখা দিল সিরাজের মনে। হীরাঝিল তৈরি করতে জলের মতো টাকা খরচ হয়েছিল। কিন্তু তার তত্ত্বাবধানের জন্যেও যে মোটা অঙ্কের টাকার প্রয়োজন, এ ধারণা তার ছিল না। অসংখ্য ঘরের অপূর্ব মহল তৈরি করে সিরাজ যে-আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল, সে এখন

আর-এক গোলকধাঁধায় পড়ে ঘুরতে লাগলো।

'কি করি লুৎফা?'

'আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।'

'এ যে জলের মতো টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। কি ব্যবস্থা করি?' সে অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে থাকে। শেষে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলে, 'ঠিক, পেয়ে গিয়েছি।'

'কি পেলে আবার?'

'উপায়।'

'কিসের উপায়?'

'হীরাঝিলকে টিকিয়ে রাখার উপায়।'

'তাই নাকি? শুনতে পাবো কি?'

'উঁহু, এখন না। কালকে নিজের চোখে দেখো। হীরাঝিলের গোলকধাঁধা আমার টাকার উপায় করবে।'

'সে আবার কি কথা? একটা গোলকধাঁধা তৈরি হয়েছে বটে। কিন্তু তাতে অর্থের সমাধান কি করে হবে?'

'এখন কিছুতেই ভাঙছি না। শোনো, কালই দাদুকে নিয়ে আসবো এখানে। সেই সঙ্গে জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ সবাই আসবেন। আমার হীরাঝিল দর্শনের আমন্ত্রণ জানাবো তাঁদের।'

'হঠাৎ?'

'বাঃ, কেউ তো দেখেনি এখনো। তাঁদের দেখাতে হবে তো।'

'কিন্তু শুধু কি দেখানোর জন্যে তাঁদের ডেকে আনছো? তোমার চোখে কিসের এক অভিসন্ধি খেলে বেড়াচ্ছে যে।'

সিরাজ হেসে ওঠে, 'ঠিক ধরেছো, লুৎফা। কিন্তু এমন কিছু দুরভিসন্ধি নয়, সামান্য কৌশলমাত্র। কালই জানতে পারবে।'

পরদিন সবাই এলেন। সিরাজ ঘুরে ঘুরে তাঁদের সব দেখাতে লাগলো। ছাদের গুপ্তপ্রকোষ্ঠে বসে আমি দেখতে থাকি। তাঁদের হাবভাব আর হাত নাড়া দেখে বুঝলাম, সবাই খুব বিস্মিত হয়েছেন। নবাব আলিবর্দি খুঁড়িয়ে চলতে চলতেই যেভাবে হাসছেন আর সিরাজের পিঠ চাপড়াচ্ছেন তাতে অনুমান করলাম, তিনি খুশি হয়েছেন। ঝিল দেখার পর বাগিচার মধ্যে অনেকক্ষণ বেড়ালেন তাঁরা। তারপর সিরাজ তাঁদের মহল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সেখানে নিয়ে আসে।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে গিয়ে একটা থামের আড়ালে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে থাকি। সিরাজ কি কৌশল প্রয়োগ করে দেখার জন্যে উদগ্রীব হই।

সবাইকে সিরাজ গোলকধাঁধার সামনে এনে হাজির করে। সবাই একসঙ্গে যেতে চাইলে সিরাজ বলে, 'আপনারা অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। একে-একে ভেতরে যাবেন। নবাব থেকে শুরু হোক।'

'বেশ, তাই হোক।' নবাব হাসতে হাসতে প্রবেশ করলেন। সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন। সিরাজও। অনেকক্ষণ কেটে যায়, কিন্তু নবাব আর ফেরেন না। ওরা সবাই চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

রাজবল্লভ প্রশ্ন করেন, 'নবাব ফিরছেন না যে?'

সিরাজ বলে, 'ধাঁধায় পড়েছেন বোধহয়।'

জগৎশেঠ মুখ গম্ভীর করে বলেন, 'তাঁকে বাইরে নিয়ে আসা উচিত। এটা গোলকধাঁধা জানলে আমি কিছুতেই তাঁকে প্রবেশ করতে দিতাম না।'

'উনি নাতির কাছে এসেছেন আনন্দ করতে', সিরাজ বলে।

'তবু বুড়ো মানুষ। পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন, সেটাও তো ভাবা উচিত।'

'দেখাই যাক না, একা উনি বাইরে আসতে পারেন কিনা। যদি বাইরে আসেন তাহলে এ ঘর আবার ভেঙে ফেলে নতুন করে তৈরি করা হবে।'

ইতিমধ্যে নবাবের উচ্চকণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে কানে ভেসে আসে, 'কই দাদু, আর তো পারি না। এবার বার করে দাও আমাকে। ঘুরতে ঘুরতে যে তেষ্টা পেয়ে গেল।'

'আর একটু চেষ্টা করো।' বাইরে থেকে সিরাজ চেঁচায়।

'অনেক চেষ্টা করেছি, এখন বসে পড়েছি। চেষ্টা করার আগে নবাব আলিবর্দি কথা বলে না।'

'তাহলে তুমি আমার কাছে বন্দী, একথা স্বীকার কর।'

জগৎশেঠ, উমিচাঁদ আর রাজবল্লভ সবাই চমকে ওঠেন। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নেন। রাজবল্লভের কোমরে খরশানণ ঝন্‌ঝন্‌ করে ওঠে। সিরাজ সে-শব্দ শুনে একবার বাঁকা চোখে সেদিকে চেয়ে হেসে ফেলে।

ভেতর থেকে নবাবের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'তোমার কাছে তো আমি চিরদিনই বন্দী।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বন্দী।'

'মুক্তিপণ দিলে মুক্তি পাবে।'

'কি মুক্তিপণ চাও?'

'হীরাঝিলের আশেপাশের গঞ্জ থেকে যে নজরানা আদায় হবে, সেই নজরানায় হীরাঝিলের খরচ চলবে।'

'বেশ, তাই হবে। এবার ছেড়ে দাও।'

'অত সহজে কি ছাড়া যায়, দাদু। ভবিষ্যতের ব্যবস্থা তো করলে, কিন্তু এখন কি দেবে?'

'এখন আবার কি চাও?'

'বাঃ! এত বড় যোদ্ধা হয়ে যুদ্ধের নিয়মকানুন ভুলে গেলে?'

'তোমার মতলবটা তাড়াতাড়ি বলো, আমার পায়ে বড় যন্ত্রণা হচ্ছে।'

সিরাজের ওপর আমার ভীষণ রাগ হচ্ছিল। কিছুদিন আগে নবাবের পায়ের যে ভয়াবহ অবস্থা দেখেছিলাম, এখন নিশ্চয়ই তার চেয়ে আরও অবনতি হয়েছে। এই অসুস্থ বৃদ্ধের সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর খেলায় কেন যে সে মত্ত হলো?'

সিরাজ বলে, 'যুদ্ধশাস্ত্রে নগদ অর্থই একমাত্র মুক্তিপণ, দাদু।'

'আমার কাছে কিছুই নেই।' নবাবের কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মতো শোনায়।

বাইরে যাঁরা ছিলেন তাঁর রাগে কাঁপতে থাকেন। তবু সিরাজ অবিচল।

সে বলে, 'তোমার সঙ্গে যাঁরা এসেছেন তাঁদের সঙ্গে কিছু অর্থ রয়েছে নিশ্চয়। তাঁদের বলো।'

'আচ্ছা, তাই বলো তাঁদের।'

যাঁর কাছে যা ছিল, সবাই বার করে দিলেন সিরাজের সামনে। জগৎশেঠ তাঁর হাতের বহুমূল্য অঙ্গুরীয়টি পর্যন্ত খুলে দেন।

সিরাজের মুখে তৃপ্তির হাসি ফোটে। সে ছুটে গিয়ে দাদুকে বার করে নিয়ে আসে। নবাব সিরাজকে জড়িয়ে ধরে হাসতে থাকেন। এতক্ষণ যেন মজার খেলা হচ্ছিল, হেরে গিয়েছেন তিনি নাতির কাছে।

নবাব বলেন, 'তুমি আজ জিতে গেলে। তাই যে গঞ্জের নজরানায় হীরাঝিলের খরচ চলবে তার নাম থাকবে মনসুরগঞ্জ।'

সিরাজ হাসে—খুব হাসে। তার কৌশল সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আমার কিন্তু এ কৌশল ভালো বলে মনে হলো না। এতে উপস্থিত যাঁরা আছেন, তাঁরা সবাই অসন্তুষ্ট হয়েছে। এঁরা সবাই বাংলার

এক-একটি দিক্‌পাল। নবাব হবার আগেই তাঁদের এভাবে চটিয়ে দেওয়া সিরাজের পক্ষে উচিত হলো না।

সিরাজ তাঁদেরও বলে গোলকধাঁধায় প্রবেশ করতে। কিন্তু তাঁরা সম্মত হলেন না। তাঁরা নবাবকে নিয়ে হীরাঝিল ছেড়ে চলে গেলেন।

থামের আড়াল থেকে সিরাজের সামনে গিয়ে হাজির হই। সহসা আমাকে দেখে সে চমকে ওঠে, 'একি! কোথায় ছিলে তুমি?'

আঙুল দিয়ে থামটা দেখিয়ে দিই।

'ও, তুমি সব দেখেছো। কেমন মজা দেখলে তো?'

'দেখলাম। তোমার বুদ্ধি আছে বটে, কিন্তু কাজটা কি ঠিক হলো?'

'কেন? দাদু তো খুশি হয়েছেন।'

'দাদু খুশি হয়েছেন জানি, কিন্তু সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা তো দাদু নন। তোমার কৌশলকে দাদুর দৃষ্টিতে তাঁরা দেখেননি।'

'না দেখলে তো বয়ে গেল।'

'না নবাবজাদা, বয়ে যাবে না। ওঁরাই তোমার আশা-ভরসা। এখন থেকে ওঁদের হাতে রাখো।'

'তুমি মাঝে মাঝে কি যে বলো আমি বুঝতে পারি না, লুৎফা। ওরা বিরুদ্ধতা করলে ভয় পাবার কি আছে?'

'সে আমি জানি না, কিন্তু নবাব যখন তাঁদের অত সম্মান করেন, তখন নিশ্চয়ই কোনো কারণ রয়েছে। নবাব মূর্খ নন। অপরিণামদর্শী তো ননই।'

আমার কথায় সিরাজ একটু গম্ভীর হলো। আমার পিঠের ওপর আলগোছে একটি হাত রেখে বলে, 'তোমার কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে ওসব ভাবনা পরে হবে। এখন এসো, একটু আনন্দ করা যাক্। আজকে হীরাঝিলের বরাত খুলেছে।'

সে আমাকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে আসে। ঝিলের পাশে ফুলগাছের শোভা। ঝিলের জলে ছোট্ট একখানা রঙিন বজরা ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে। সে আমাকে নিয়ে সেই বজরায় ওঠে।

স্বপ্নের ঘোরে সময় কাটে। তীরে গিয়ে যখন উঠলাম, তখন রাত অনেক। হীরাঝিলের মহলে তখন হাজার বাতির শোভা। কত বিচিত্র রং সে-আলোর। হীরাঝিলের স্রষ্টার মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি।

কিন্তু বেশিদিন নয়।

নিদারুণভাবে ভেঙে যেতে শুরু হলো হীরাঝিলের সুখস্বপ্ন। ঘসেটি বেগমের ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করায় বেগমসায়েবা সিরাজকে আমার কাছ থেকে একবার ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। তিনি ব্যর্থও হয়েছিলেন। কিন্তু হীরাঝিলের তুষারধবল মহল, তার শ্যামল বাগিচা আর স্বচ্ছ জল, এক কুহকিনীর মায়া বিস্তার করে সিরাজকে বিপথে চালিত করল। হীরাঝিল শুধু নির্জীব পাষাণ নয়, তার মধ্যে আমি শুনতে লাগলাম ডাইনির অট্টহাসি।

আমার সিরাজ দূরে সরে যেতে থাকে। দূরে, অনেক দূরে.....আমি নাগাল পাই না। এখানে আমি ছাড়া অন্য কেউ নেই। অথচ সিরাজ কতদিন আমার কাছে আসেনি। আমাকে সে ভুলে গিয়েছে।

পাষাণের ওপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদি, মাথা কুটি, কিন্তু কোনো ফল হয় না। নবাব আলিবর্দির প্রভাব থেকে বাইরে চলে এসে সে এখন বেপরোয়া। সারা দিনরাত সে শুধু শরাব খায়, বন্ধুদের নিয়ে ফূর্তি করে, নর্তকী নিয়ে এসে নাচ দেখে। আবার সেই নর্তকীর সঙ্গে রাতও কাটায়। প্রতিদিনের প্রতীক্ষা শুধু

ব্যর্থ হয় আমার।

সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে হয়। বেগমগিরি আর ভালো লাগে না। আমি জারিয়া ছিলাম, আবার জারিয়া হবো। আমি ঘসেটি বেগমের পদাঘাত সহ্য করবো। আমি হামিদার অবহেলায় কিছু মনে করবো না। আল্লা, আমাকে আবার জারিয়া করে দাও'। আমি আর পারি না। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব আর আমার নেই, এখন শুধু নিরাশার অন্ধকার।

তবু একদিন সিরাজ এলো আমার কাছে। চোখ লাল, মুখে অনাচারের ছাপ, অঙ্গ শিথিল। আমি তার মুখের দিকে চাইতে না পেরে মাথা নীচু করি। সে বোধহয় আমাকে আজ তাড়িয়ে দেবে হীরাঝিল থেকে। আমি এখানে থাকায় তার অসুবিধা হচ্ছে। সে চায় নিশ্চিন্ত হতে। আমি বাধা সৃষ্টি না করলেও, ওর অবশিষ্ট বিবেকটুকুর জন্যে মনের মধ্যে সম্ভবত খচ্‌খচ্ করছে, আমার চোখের সামনে অনাচারের স্রোতে এভাবে গা ভাসিয়ে দিতে।

হীরাঝিল থেকে বিদায় নেবো। 'হীরাঝিল' নামটা আমিই দিয়েছিলাম না? সিরাজকে বলবো নাকি সেটা পালটে দিতে? তাহলে বিবেকের আর কোনো দংশনই থাকবে না তার। ও নাম মুখে যা'ক মুর্শিদাবাদের বুক থেকে—বাংলার ইতিহাস থেকে। সেই সঙ্গে বেগম লুৎফার নামও মুছে যাক।

'নবাবের ওখানে যেতে হবে, লুৎফা।' গম্ভীর স্বর সিরাজের। গলাটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত। শত হলেও সঙ্কোচ বলে একটা জিনিস আছে তো। এতদিন কত কথাই শুনিয়েছে—কত মধুর কথা।

নবাব মহলে যাবার জন্যে অনেকদিন থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু সিরাজের মুখ থেকে স্পষ্ট শোনার পর আমার চোখের জল কিছুতেই বাধা মানল না। শত চেষ্টাতেও বন্ধ করতে পারলাম না সেই অবাধ্য জলরাশি। সে আমাকে চায় না, তার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদা বিড়ম্বনা। সিরাজ হয়তো ভাবছে, তার মন গলানোর জন্যে আমি চিরাচরিত পথ ধরেছি। কিন্তু আমি তো জানি তা নয়—কিছুতেই নয়। আমি চলে যেতেই চাই, বুক আমার ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। এখন আমার কাছে হীরাঝিলও যা, নবাব মহলও তাই। আমি তো তার মতো নিত্য নতুন লোক নিয়ে বুক ভরাতে পারবো না। আমার বুকে যে শুধু একজনই রয়েছে, যার কাছে আজ আমার আর বিন্দুমাত্র মূল্য নেই। আগে কেন আমি মরে যাইনি?

সিরাজ আবার বলে, 'নবাব মহলে যেতে হবে, লুৎফা।'

'আমি তা জানি।'

'জানো! কোথায় শুনলে?'

এত দুঃখেও হাসি পেলো। এ জানতে কি আর মুখের স্পষ্ট কথা শুনতে হয়? অনেক কিছুই বলতে পারতাম। কিন্তু বলে কি লাভ? চুপ করে থাকি।

'এখনই যেতে হবে, লুৎফা।'

'এখনই? এত তাড়াতাড়ি? সমস্ত জিনিস এখানেই থাকলো, নবাবজাদা। সামান্য দু' একটা পোশাক নিয়ে যাচ্ছি।'

'কিছুই নিতে হবে না।' সে অধৈর্য হয়।

'চলুন তাহলে, আমি তৈরি।'

তার সঙ্গে ঘর থেকে বাইরে আসি। আবার তাহলে জারিয়াই হতে চলেছি। মন্দ কি?

'তুমি কার কাছে শুনলে, লুৎফা? খবরটা তো আমিই প্রথম পাই।'

'আমি.....আমি কোনো খবর পাইনি, নবাবজাদা।'

'একটু আগেই যে বললে শুনেছো।'

'কোনো খবরের কথা তো আমি বলিনি?'

'দাদুর অবস্থা খারাপ, তুমি শোনোনি।'

আমি চককে উঠি, বলি, 'শুনিনি তো!'

'ও বুঝেছি।' কি বুঝলো সেই জানে। ক্লান্ত পা ফেলে সে এগিয়ে চলে।

নবাবের ঘরের আবহাওয়া থমথমে। বেগমসায়েবা একপাশে বসে রয়েছেন। তিনজন হাকিম নবাবের শিয়রে। আট-দশজন জারিয়া ব্যস্তভাবে ঘোরাফেরা করছে। হামিদাকে দেখলাম তাদের মধ্যে। সে দূর থেকে আমাকে দেখে একটু হেসে নত হলো। আমিও হাসলাম। ভাবলাম, এরা কত সুখী!

সিরাজ ঘরে ঢুকেই ছুটে গিয়ে নবাবের শয্যার সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়ে। নবাব তার পিঠে হাত রেখে অল্প একটু হাসেন।

সিরাজ বলে, 'এখন ভালো আছো, দাদু?'

'হ্যাঁ।' তিনি হাকিমদের দেখিয়ে বলেন, 'এঁরা বলছেন, আমি এত তাড়াতাড়ি মরবো না, আরও কিছুদিন ভুগবো। তোমার নবাবী পেতে একটু দেরি হবে।'

'এমন কথা বলো না, দাদু, আমি নবাবী চাই না, যাকে ইচ্ছে দাও। শুধু তুমি ভালো হয়ে ওঠো।'

নবাব আলিবর্দির চোখে জল দেখলাম। তিনি বললেন, 'ঠাট্টাও বুঝতে শেখোনি পাগল।'

'তোমার জীবন নিয়ে ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না। অন্য কথা বলো।'

'বেশ, কি কথা বলবো?'

'তোমার যা ইচ্ছে।'

'কাল ফোর্থ সায়েব এসে পরীক্ষা করে যখন বললো যে, আমি আর বাঁচবো না, তখন সত্যিই ভয় হয়েছিল। মরতে যে এত ভয় হয় জানতাম না।'

'ফোর্থ সায়েব হঠাৎ এলো কেন?'

'কেন, সে তো রোজই আসে। অনেকক্ষণ বসে থাকে। খুব ভালো হাকিম যে।'

'সেইজন্যেই বললো বুঝি, তুমি মরে যাবে?' সিরাজের স্বরে বিদ্রূপ। সে নবাবের শিয়রে উপবিষ্ট হাকিমদের বলে, 'আপনাদের কি মত?'

একজন বলে, 'আমরা তো বলেছি আরো কিছুদিন নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'তবে ফোর্থ সায়েব একথা বলে কেন? তার সঙ্গে কি নবাবের রোগ সম্বন্ধে আপনাদের কোনো আলোচনা হয়েছে?'

'না। সে কখন ও-কথা বলেছে তাও আমরা জানি না।'

'বুঝলে দাদু?' সিরাজ ঘুরে নবাবের দিকে চেয়ে বলে।

'কি?'

'ফোর্থ সায়েবের কোনো উদ্দেশ্য আছে।'

'নবাবীটা তুমি ঠিক চালাতে পারবে সিরাজ।'

'এতদিন সন্দেহ ছিল নাকি?'

'সন্দেহ এখানো সামান্য রয়েছে। তবে তোমার বুদ্ধি আর চতুরতার প্রমাণ এমন ছোটখাটো ঘটনায় প্রায়ই প্রকাশ পায়।'

'ফোর্থ সায়েবকে আর আসতে দিও না, দাদু। এখানে এসে হাকিমি করার অছিলায় নানান কথাবার্তা শোনার সুযোগ পায় সে। তুমি শয্যাশায়ী হলেও বাংলার নবাব। দেশের যাবতীয় আলোচনা এখানেই হয়।'

'সাবাস!' আলিবর্দি একটু জোর গলাতেই বলে ওঠেন।

'এখনই এতটা প্রশংসা করো না। আর একটা কথা বলে নিতে দাও। তাতে তুমি যে সম্মতি দেবে

না, তা আমি জানি। তবু বলা উচিত বলেই বলছি।

'বলো।'

'ইংরেজরা যে সোজা লোক নয়, সে-কথা তুমি বার বার বলেছো। তারা একদিন বাংলার বিপদ আনবে একথা তোমারই মুখে শোনা। আমারও বিশ্বাস তাই। ওদের বসতে দিলে ওরা শুতে চায়। তুমি বেঁচে থাকতেই তাই ওদের খতম করতে চাই। হুকুম দাও, আর পরামর্শ দাও।'

'তোমার মত খুবই সুচিন্তিত সিরাজ, কিন্তু আমি সম্মতি জানাতে পারছি না। পারছি না বলে আমার দুঃখ তোমার চেয়েও বেশি। কিন্তু কি করবো বলো। বর্গীদের মাথা ভেঙে দিলেও ওদের অত্যাচারের আগুন এখনো সম্পূর্ণ নিভে যায়নি। এর মধ্যে আবার সমুদ্রের জাহাজ থেকে অগ্নিবৃষ্টি হলে আর এক অশান্তি। তার চেয়ে বলি কি দেশটা একটু সামলে উঠুক। কিছুদিন শান্তি ভোগ করুক সবাই। তাহলে শত্রুর ওপর নতুন শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারা যাবে। ততদিন আমি বাঁচবো না, কিন্তু তুমি তো থাকবে।'

সিরাজ চুপ করে বসে থাকে। সে যেন নবাবের কথায় প্রতিবাদ করতে চায়। কিন্তু নবাবের যুক্তি একেবারে উড়িয়েও দিতে পারে না। শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'বেশ, তাই হবে।'

'চললে কোথায়?'

সিরাজ থতমত খেয়ে আবার বসে পড়ে। বোকার মতো বলে, 'না, এই একটু বাইরে যাচ্ছিলাম।'

নবাব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে তন্নতন্ন করে দেখেন। তারপর গম্ভীর স্বরে বলেন, 'আমি জানি, তুমি কেন উঠেছিলে।'

'জানো!' সিরাজ অবাক হয়।

'হ্যাঁ!' শোনো দাদু, বুদ্ধি আর সাহস অনেক নবাবের থাকে। আমার আগের নবাব সরফরাজের সাহসের অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁর সময়ে দেশে কেন অশান্তি দেখা দিল? কেন প্রজারা তাঁকে চাইল না?'

'কেন?'

'বলছি।' নবাব সকলকে ঘরের বাইরে যেতে ইঙ্গিত করলেন। সেখানে শুধু বসে থাকলাম আমি. বেগমসায়েবা, আর সিরাজ।'

নবাব বললেন, 'সরফরাজ বিলাসিতায় বড্ড বেশি গা ভাসিয়েছিলেন। বেগমদের তুষ্ট করতেই তাঁর সময় চলে যেতো। দেশের দিকে তাকাবার অবসর থাকতো না।'

'আমাকে তুমি সেরকম ভাবো নাকি?' অভিমান করে সিরাজ।

'আমার ভাবায় কি আসে যায়? তবে এ সবের মূলে একটা জিনিসই রয়েছে, সেটা হলো শরাব। একবার যদি শরাব ধরা যায়, যদি তোমার ভেতরের আসল মানুষটিকে শরাব একবার কিনে নিতে পারে, তাহলে কোনো কিছুতেই আর ভেতরের সেই মানুষটিকে উদ্ধার করতে পারে না। তখন নানা দোষ এসে দেখা দেয়। সরফরাজের মধ্যেও সেই দোষগুলো প্রকট হয়ে উঠেছিল।

আলিবর্দি হাঁপাতে থাকেন। তিনি দম নেন। ঘরে কোনো শব্দ নেই। সিরাজের মুখ ছাইয়ের মতো সাদা। সে কপালে হাত রেখে চুপ করে বসে থাকে।

নবাব আবার বলেন, 'আমার একটা অনুরোধ আছে তোমার কাছে।'

'বলো।'

'হীরাঝিলে তুমি কি করো, সে খবর আমি পাই। তোমাকে আজ একটা ভীষণ প্রতিজ্ঞা করতে হবে।'

'আমি প্রস্তুত দাদু।' সিরাজের কথায় দৃঢ়তা।

নবাব তাঁর মাথার কাছ থেকে কোরানখানা সিরাজের হাতে দিয়ে বলেন, 'এবারে বলো আর

কোনোদিন শরাব স্পর্শ করবে না।'

'পবিত্র কোরান ছুঁয়ে বলছি আর কোনোদিন শরাব স্পর্শ করবো না।' একটু হেসে সে আবার বলে, 'কিন্তু দাদু, কোরানের প্রয়োজন ছিল না। তোমাকে কথা দেওয়া কি কোরান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞার চেয়ে কম?'

নবাবের চোখে আনন্দাশ্রু দেখা যায়। তিনি কোনো কথা বলতে পারেন না। শুধু দু'হাতে সিরাজকে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে আনেন। ছোট্ট ছেলের মতো সিরাজও তাঁর বুকের ওপর মাথা রেখে স্থির হয়ে থাকে।

আমার মাথাটা কেমন ঘুরে ওঠে। গা বমিবমি করে। ঘামে আমার কপাল ভিজে যায়। বেগমসায়েবা বসেছিলেন। শক্ত করে তাঁর হাত চেপে ধরি।

'একি লুৎফা, অমন করছো কেন?' তাঁর স্বরে বিরক্তি।

'আমার শরীর কেমন করছে।'

'সে কি! আমাকে ছাড়ো দেখি, কাউকে ডেকে আনি। তোমাকে বেগম মহলে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেবে।'

'হামিদাকে ডাকুন', কোনো রকমে বলি। আগে হামিদা আমাকে হিংসে করলেও সে ভালো। তার ভেতরে স্নেহ আছে।

হামিদার সঙ্গে বেগম মহলে গিয়ে বমি করে ফেলি, 'আমি আর বাঁচবো না, হামিদা।'

'অমন কথা মুখে আনতে নেই। অসুখ-হয়েছে সেরে যাবে।'

'না-না, আমার যেন কেমন লাগছে।' বুঝলাম, সিরাজের অবহেলায় অভিমানে অনেকদিন অর্ধাহারে থাকার ফল। শরীর ভেঙে পড়েছে।

'আপনি স্থির হয়ে শুয়ে থাকুন, আমি একজন হাকিম ডেকে আনি। তাঁরা তো রয়েছেনই।'

হামিদা ঘর ছেড়ে চলে যায়। একদিন মৃত্যু কামনা করতাম, অথচ আজ সামান্য অসুখে মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে উঠলাম কেন? এতদিন কি তবে নিজেকে চিনতে পারিনি? কিংবা মৃত্যু হবে না জেনেই নিশ্চিন্ত মনে কামনা করতাম?

আজ হয়তো সিরাজের প্রতিজ্ঞা শুনে নতুন করে বাঁচবার সাধ হয়েছে আমার। সিরাজ আর শরাব খাবে না। শরাব না খেলে তার বন্ধুরাও আর এসে জুটবে না। বন্ধুরা না এলে সে আমার কাছে আসবে, আমার সাথে কথা বলবে, আমাকে আদর করবে। আমি মরতে চাই না। না, না....

হাকিম আসেন। বেগমসায়েবাও আসেন সেই সঙ্গে। উঠতে চেষ্টা করি আমি। বেগমসায়েবার সামনে শুয়ে থাকতে সঙ্কোচ বোধ হলো।

'উঠো না। তুমি এখন অসুস্থ।' বেগমসায়েবা বলেন।

হাকিম অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষা শেষ হলে উঠে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসেন।

'হাসলেন কেন, হাকিম সায়েব?' বেগমসায়েবার প্রশ্ন।

'ব্যাপারটা একটু হাসির বৈকি।! বেগমসায়েবার সামনে হাকিমের উক্তি একটু বিসদৃশ। রোগ নির্ণয় করতে পারেনি বলে সে হয়তো উড়িয়ে দিতে চায়। নবাবের ব্যাপারেও এমন করছে না তো? আসলে ফোর্থ সায়েবের কথাই হয়তো ঠিক।

'হাসির ব্যাপার!' বেগমসায়েবা চমকে ওঠেন। তিনি সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকেন। আমার অসুখটা নিশ্চয় ভাঁওতা বলে মনে হয়েছে তাঁর কাছে। আমার কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য রয়েছে ভেবে তিনি হয়তো চিন্তিত হয়েছেন।

'কি হয়েছে খুলে বলুন?' আমি চেঁচিয়ে উঠি।

'আপনি কিছু খেতে পারছেন না, তাই না?' হাকিমের উক্তিতে ভয়ে কেঁপে উঠি। ঠিকই ধরেছে সে। কিন্তু আমার মতো যার মনের অবস্থা, খাওয়ার প্রতি তার কি কোনো রুচি থাকে?

মরিয়া হয়ে বলি, 'হ্যাঁ।'

'খুব স্বাভাবিক। এ সময়ে অমন হয়।'

'কোন্ সময়?' এবারে বেগমসায়েবা অধৈর্য হয়ে ওঠেন।

'মা হবার আগে।'

ভয়ে আর আনন্দে আমি কেঁদে ফেলি। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর রং যেন পাল্‌টে যায়। সিরাজের সন্তান আমার গর্ভে! কবে এসেছিল আমার গর্ভে? ঝিলের মধ্যে সেই বজরাতে কি? বুঝে উঠতে পারি না। ঠিক সিরাজের মতো মুখ, তার মতো চোখ, হাত-পা। তিলে তিলে বড় হচ্ছে সে। আমার দেহ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে সিরাজের সন্তান বড় হচ্ছে—যে সিরাজ আমাকে চায় না।

চোখের জলে বিছানা ভিজে যায়।

বেগমসায়েবা বলেন, 'কাঁদছো কেন? এ তো আনন্দের কথা।'

'আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে।'

'ভয়ের কিছু নেই। চুপ করে শুয়ে থাকো।' হামিদা ছাড়া সবাই চলে যায়। হামিদা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

'হামিদা, এ কি ভালো হলো?'

'সেকি! এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে? বাংলার আর এক নবাব আপনার গর্ভে। আজ আপনার চেয়ে সুখী কেউ আছে?'

'না হামিদা, আমার বড় ভয় হচ্ছে।'

'অমন হয়। শরীর খারাপ তো? একটু সুস্থ হলে দেখবেন মনটা কেমন আনন্দে ভরে উঠবে।' হামিদার চোখে-মুখে একটা মাতৃত্বের ভাব ফুটে ওঠে। বড় ভালো লাগে আমার।

'তোমাকে আমার কাছে নিয়ে যাবো, হামিদা।'

'বেশ তো, ভালোই হবে।'

সিরাজ শরাব ছেড়ে দিয়েছে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। অবশ্য নিশ্চিন্ত হবার জন্যে কোনো খোঁজ নিইনি। লুকিয়ে কিছু করতে আমার মন চায় না, বিশেষ করে সিরাজের ব্যাপারে। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক লুকোচুরির নয়।

ওর মন বড় দুর্বল। শরাব ছাড়ার পরে পানপাত্রগুলোকে দেখে হয়তো দুর্বলতা উঁকি দিয়েছিল, তাই অতিরিক্ত শক্তিপ্রয়োগের নিজের হাতেই সে সেগুলোকে একটার পর একটা ভেঙে চুরমার করেছে। শুনলাম, শরাবপায়ী বন্ধুদেরকেও হীরাঝিলে আসতে মানা করে দিয়েছে। শরাববাহীদের কাজ গিয়েছে।

তবু সে আর আগের সিরাজ নেই। আমার কাছে আসে না। ভুলে কখনো এলেও তেমন করে আর কথা বলে না। আমি আর তার 'প্রাণের আধখানা' নই, তার প্রাণ এখন আমি ছাড়াই পরিপূর্ণ। আমি সেখান থেকে নির্বাসিত।

একদিন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই।

'কি লুৎফা?'

কথা খুঁজে পাই না। কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে যাই। তাড়াতাড়ি বলি, 'কিছু না, নবাবজাদা।'

'তোমার শরীর ভালো তো?'

'হ্যাঁ, নবাবজাদা।'

ব্যস্, কথা ফুরিয়ে যায় আমার আর সিরাজ, দু'জনারই। তবু দাঁড়িয়ে থাকি।

'কিছু বলবে?'

বলবো বলেই তো এসেছি, কিন্তু বলতে গিয়ে যে ঠোঁট ফুলে ওঠে, চোখ জ্বালা করে। শেষে বলে ফেলি, 'জেবউন্নেসা বেগমকে হীরাঝিলে নিয়ে আসুন।' সিরাজকে, 'তুমি' বলতে বাধো-বাধো লাগে আজকাল।

'কেন?' কথাটা সে একটু বেশি জোর দিয়ে বলে।

'আমার তো এই অবস্থা।'

'আমার জন্যে আমার চেয়েও তোমার ভাবনা বেশি দেখছি।' তার কথায় এতটুকু মিষ্টতা নেই, এতটুকু দয়া নেই। তার জন্যে আমার ভাবনা না হলে কার হবে? কারও সে-ভাবনা হতো না বলেই তো একদিন আমাকে জারিয়ার আসন থেকে তুলে বুকে টেনে নিয়ে বেগমের আসনে বসিয়েছিল। আজ সে-কথা কে বলকে ওকে?

সিরাজ আবার বলে, 'কি বলতে চাও তুমি?'

'কিছু না নবাবজাদা, কিছু না। দয়া করে আমাকে রেখেছেন, দু'টো খেতে পাচ্ছি। তাই ভেবেছিলাম, আপনার অসুবিধের দিকে আমার তাকানো উচিত।'

'এটা কি অভিমান?'

'না-না, অভিমান নয়। আমি সত্যি ভেবেই বলছি।' ছুটে পালাতে যাই।

সিরাজ আমার হাত ধরে ফেলে বলে, 'শোনো লুৎফা। শরাব ছেড়েছি, কোনোদিন ছোঁবো না আর। কিন্তু শুধু ছাড়লেই তো হলো না। এতদিনের অভ্যাস ছাড়তে কষ্ট হয়। তাই শরাবের বদলে আর কিছুর প্রয়োজন। তুমি ঠিকই ধরেছো, কিন্তু জেবউন্নেসা নয়। সে শরাবের নেশা ছাড়াতে পারবে না। সে সুন্দরী, কিন্তু তার স্বভাব আর কথাবার্তা আমাকে মাতিয়ে তুলবে না, বরং বিরক্তির সৃষ্টি করবে। আর তোমার কথা তুমি নিজেই জানো। তাই একটা কাউকে চাই তো!'

'এত বেগম রয়েছে আপনার, আর কাউকে নিয়ে আসুন।'

'কেউ না, কেউ পারবে না। তারা সব পুতুল। সেজে-গুজে ঘরের মধ্যে বসে থাকতে তাদের মধ্যে প্রাণ নেই।'

'তবে.....'

'তবে কি করবো সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না, আমিই ব্যবস্থা করেছি।'

তার কথায় আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। আবার কোন্ আগুনের খেলায় মাততে চাইছে সে কে জানে? তার মতলব জানবার জন্যে মন ছটফট্ করে। কিন্তু প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। আগের লুৎফা আর আমি নেই। আমার শারীরিক গঠন আর সৌন্দর্য কিছুদিনের জন্যে বিলুপ্ত হতে বসেছে। এখন আমি ভ্রূণবাহী-জীবমাত্র। আমার কটাক্ষে আগে যদিও বা কিছু চঞ্চলতা ছিল, এখন তা অদৃশ্য হয়েছে। এখন সে কটাক্ষ ভারী, গভীর, আর মমতাময়।

'তোমার বোধহয় মন খারাপ হলো।' সিরাজের মুখে হাসি।

ঠাট্টা করছে নাকি?

'না নবাবজাদা, আপনি যা বলেছেন তা ঠিক। আপনার সুখের জন্য যদি আমি কোনোরকম সাহায্য করতে পারি তাহলে নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করবো।'

'তুমি কিছুটা সাহায্য করতে পারো।'

'আদেশ করুন।'

'আমার বন্ধু মোহনলালকে নিশ্চয়ই চেনো?'

'এখানে তাকে আসতে দেখেছি।'

'তার এক বোন রয়েছে দিল্লিতে। অপূর্ব সুন্দরী—স্বর্গের অপ্সরী বললেও চলে। সেখানে সে

নর্তকী। সে সুগায়িকা। আমি তাকে বেগম করে হীরাঝিলে রাখবো। সে নাচ-গান আর ভালোবাসায় আমাকে মাতিয়ে তুলবে। শরাবের নেশার কথা আমার আর মনে থাকবে না। প্রতিদিন নতুন উৎসাহ নিয়ে আমি কাজ করতে পারবো! তুমি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করো।'

আমার মাথা ঘুরছিল। নর্তকী হবে বাংলার বেগম! সিরাজের কি মাথা খারাপ হলো? পড়েই যেতাম, কিন্তু আত্মহত্যা করার এক অবিচল প্রতিজ্ঞা আমাকে পড়তে দিল না। সিরাজের কথার জবাবে দৃঢ়ভাবে বললাম, 'কি সাহায্য আমার কাছে আপনি চান, নবাবজাদা?'

'সাহায্য এমন কিছু নয়। শুধু তুমি কেঁদে ভাসিও না। আর দাদিরা যেন কিছু শুনতে না পায়। তোমাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় করি। কারণ, তোমারই সব চাইতে বেশি হিংসে হবে।'

হীরাঝিলের মহলের কোনো নির্জন জায়গায় গলায় দড়ি দিতে সুবিধে হবে, অথবা ছাদের কোনো জায়গা থেকে নীচে লাফিয়ে পড়লে সহসা কারও চোখে পড়বে না, এই কথা ভাবতে ভাবতে আমার ভীষণ হাসি পেয়ে যায়। শত চেষ্টাতেও না চাপতে পেরে হেসে উঠলাম।

হাসিটা নিশ্চয়ই জোরে হয়েছিল। কারণ, সিরাজ দু'পা পিছিয়ে গেল।

আমি বলি, 'আমার হিংসে হচ্ছে না, নবাবজাদা, আনন্দ হচ্ছে। আপনি সুখী হবেন, একি কম কথা? আপনার সুখ নবাব আলিবর্দি থেকে শুরু করে বাংলার সবাই চায়। আমি কেন হিংসে করবো? অমন সুন্দরী নর্তকী আসছেন বেগম হয়ে, তাঁকে দেখবার সুযোগ মেলা কতখানি ভাগ্যের কথা। আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন, নবাবজাদা। একটা কুকুর পুষলেও তার ধরন-ধারণ চেনা যায়। আমাকে এতদিন দেখেও চিনলেন না?'

'না-না, তা নয়। আচ্ছা, চলি।'

শরাব না খেলেও, শরাব খাওয়ার মতো টলতে টলতে সে চলে যায়। মোহনলালের বোনের রূপের কথা শুনেই তার নেশা ধরেছে—চোখে দেখলে হয়তো ঢলে পড়বে।

ঘটা করে একদিন নিয়ে আসা হলো মোহনলালের বোনকে। হীরাঝিলের মাথায় উঠে লুকিয়ে দেখলাম সব। দূর থেকে মনে হচ্ছিল আট-দশ বছরের এক বালিকা। তেমনি রোগা আর ছোট। তবে গায়ের রং যেন ফেটে পড়ছিল। সকালের রোদ্দুর পড়ে অপূর্ব দেখাচ্ছিল মেয়েটিকে। নেশা ধরাবার মতোই রূপ বটে। সিরাজের কল্পনা নিশ্চয় আহত হয়নি মেয়েটিকে দেখে। ঝিলের ধারে তার হাসি-হাসি মুখের দিকে চেয়ে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম সে-কথা।

কাল সন্ধ্যার সময় মেয়েটির আগমনবার্তা যখন আগে পৌঁছে দিয়ে গেল একজন ঘোড়সওয়ার, তখন থেকেই সিরাজ ছট্‌ফট্ করছিল। তার মনে হয়েতো হয়েছিল, ঘোড়ার পিঠেই কেন এলো না সুন্দরী, তাহলে তো একদিন আগে এসে পৌঁছতে পারতো।

ভোরবেলা থেকে উঠে সিরাজ বাগিচার মধ্যে বসে রয়েছে। রাতে ভালোভাবে ঘুমোতেও পারেনি। আহা, বেচারা! এখন থেকে শুধু দিনেই ঘুমোতে হবে তাকে, রাতে আর সময় পাবে না।

ঝিলের ধারে মেয়েটি সিরাজকে কুর্নিশ করে দাঁড়াতেই, সে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে, ঠিক প্রথম দিন আমাকে যেভাবে জড়িয়ে ধরেছিল। সিরাজের সুগঠিত দুই বাহুর মধ্যে মোহনলালের বোন অদৃশ্য হয়। এত ছোট কেন সে? ছোট বলেই বোধহয় এত সুন্দর!

এখনই আত্মহত্যা করবো কি? ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়বো? না থাক্, দু'দিন যাক্। নয়নভরে একটু দেখে নি, সিরাজ কিরকম মেতে ওঠে। আমাকে নিয়েও সে মেতেছিল কিছুদিন। কিন্তু আমি তো তার নেশা ধরাতে পারলাম না।

আমি নাচতে জানি না, গাইতে জানি না। ভালোভাবে কথা বলতেও জানি না আমি। আমি যা

জানি, সেটা অপরাধ। আমি শুধু ভালোবাসতে জানি। ভালোবাসলে যে ভালোবাসার পাত্রকে উচ্ছৃঙ্খল হতে দেওয়া যায় না। আমার কাছে সিরাজ প্রতি পদে বাধা পেতো। যদিও জোর করে বাধা দিইনি কখনো, কিন্তু আভাসে-ইঙ্গিতে, কথায়-বার্তায় তাকে সংযত রাখতাম।

সে হাঁপিয়ে উঠেছিল। তাই মনে মনে মুক্তি চেয়েছিল। মুক্তির আশাতেই তার হীরাঝিল তৈরির পরিকল্পনা। তখন অতোটা বুঝিনি। বোকার মতো তাই আমিই নামকরণ করে দিয়েছিলাম। সিরাজ মনে মনে কত হেসেছিল।

ছাদ থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসি। আজকাল ওঠা-নামা করতে কষ্ট হয়। শরীরটা বড় ভারী। নিজের ঘরে গিয়ে শয্যায় শুয়ে পড়ি। একজন বাঁদী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে সামনে দাঁড়ায়। তাকে চলে যেতে ইঙ্গিত করি। কথা বলতে ইচ্ছে হয় না। এইভাবে চুপচাপ শুয়ে থাকতে থাকতে যদি মৃত্যু আসে কত আরামের হয়। ঘুমোতে গিয়ে সে ঘুম আর ভাঙে না, এমন তো কত হয়? আমার বেলাতেও কি তা হতে পারে না? হলে হীরাঝিলকে আর দেখতে হতো না। গঙ্গার জলের স্রোত আর দেখতাম না। দূরে ঐ পারে মুর্শিদাবাদের রাস্তায় ধুলো আর কখনো দেখতে হতো না। বিষ, সব বিষ; জলে স্থলে বাতাসে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে এই বিষ। আমার গর্ভেও বিষ।

ভারী পায়ের শব্দে চেয়ে দেখি, সিরাজ আমার দরজায় দাঁড়িয়ে। বিস্মিত হই। এমন দিনে সে আমার ঘরে। মোহনলালের বোনকে ছেড়ে আকারবিহীন এক স্ত্রীলোকের ঘরে বাংলার নবাবের আদুরে নাতি!

উঠে বসতে কষ্ট হয়। তবু যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব উঠে বসি। মুখে হাসি আনি। হাসতে হবে যে—আমার যে আনন্দ হচ্ছে সিরাজের মুখ দেখে। সে-মুখ পার্থিব, চরম পাওয়ার আনন্দে ভরপুর।

সে বলে, ‘সে এসেছে লুৎফা। বেহেস্তের পরী। দেখবে?’

‘নিশ্চয়ই দেখবো, নবাবাজাদা। কিন্তু এখন তো পারবো না। পরে দেখলে অপরাধ নেবেন কি?

‘তাকেই এখানে নিয়ে আসি। কি বলো?’

রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে হতে পারে সিরাজ বাংলার ভবিষ্যৎ নবাবা, কিন্তু মানুষের মধ্যে যে সম্মানবোধ রয়েছে, সে সম্মানও কি দেবার প্রয়োজন বোধ করে না এরা? ক্ষমতা কি মানুষকে এত উন্মত্ত করে?

ধীরে ধীরে বলি, ‘তাকে কেন আনবেন, নবাবজাদা? আর কেনই বা সে আসবে? তার সম্মান নেই? এতে সে হয়তো অপমানিত বোধ করবে।’

‘কিছু মনে করবে না, আমি নিয়ে আসি।’ সিরাজ চলে যেতে চায় আর কি।

‘না না না, আনবেন না। আমিই যাচ্ছি।’

‘তুমি তো উঠতেই পারছো না। কি করে যাবে?’

‘আমি বেশ উঠতে পারছি, আপনি চলুন।’

সিরাজের পেছনে গিয়ে হাজির হই বড় ঘরটার মধ্যে। গা এলিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় বসেছিল বেহেস্তের পরী। পরীই বটে! এত কাছ থেকে দেখেও আমার চোখের পলক পড়ে না।

আমাকে দেখে হেসে ওঠে সে—খিল্‌খিল্‌ করে হাসে। সে-হাসি আর থামতে চায় না।

সিরাজ বলে, ‘অত হাসছো কেন ফৈজী?’

ফৈজী আমাকে দেখিয়ে আবার হেসে গড়াগড়ি যায়। আমি অসহায়ভাবে সিরাজের দিকে চেয়ে থাকি.।

'ওকে দেখে অত হাসির কি হলো তোমার?' সিরাজ প্রশ্ন করে।

'কে এ?' এতক্ষণে ফৈজী কথা বলে।

'লুৎফা।' সিরাজ আমতা আমতা করে।

'লুৎফা? বাঃ, নামখানা তো সুন্দর! এ দশা কে করলো? আপনিই বুঝি?' সে আবার হেসে ওঠে।

আমার কান গরম হয়ে ওঠে। ইচ্ছে হয়, ছুটে বার হয়ে যাই, কিন্তু পারি না। শরীর আরও ভারী হয়ে যায়। বুঝলাম, বেশিক্ষণ আর দাঁড়াতে পারবো না।

সিরাজকে বলি, 'আমাকে যেতে আদেশ করুন, নবাবজাদা।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুমি যাও।'

ফৈজী বলে, 'সে কি! এত তাড়াতাড়ি? আলাপই যে হলো না। আর আপনি তো আমার কথার জবাব দিলেন না।'

'আমারই সন্তান রয়েছে লুৎফার গর্ভে।' সিরাজ স্পষ্ট বলে।

'ভালো। তা, এখন আর কেন রেখেছেন? কাজ তো মিটেছে, এবার বিদায় করুন। নাকি, ওই সন্তান বাংলার নবাব হবে?'

আমি চীৎকার করে উঠি, 'নবাবজাদা, আমাকে একটু ধরবেন?'

সিরাজ ছুটে এসে আমাকে ধরে বলে, 'কি হয়েছে?'

'আমি বোধহয় পড়ে যাবো। দয়া করে এই ঘরের বাইরে দিয়ে আসবেন?'

সিরাজ আমাকে বাইয়ে নিয়ে আসে। ফৈজীর কথা শুনে সে যে আমাকে থাকতে বলেনি, এজন্যে মৃত্যুর আগের কয়দিন তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।

'এখানেই বসি, নবাবজাদা, আপনি যান।'

'সে কি! এখানে বসার জায়গা কই?'

'মেঝেতেই বসবো। আপনি যান নবাবজাদা। উনি অপেক্ষা করছেন।'

'তা কি করে হয়? কেউ এসে আগে তোমাকে নিয়ে যাক্।'

'না-না, এতেই হবে। আপনি কিছু ভাববেন না।'

সিরাজ আমাকে বসিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

'আপনি যান, নবাবজাদা।'

সে চলে যায়।

ফৈজীর ওজন নাকি মাত্র বাইশ শের!

একজন বাঁদী এসে খবর দিল, ফৈজীর ওজন করা হয়েছে। সিরাজ খুব হাসাহাসি করেছে শুনলাম। হাসাহাসি সে সব সময়ই করছে। হীরাঝিলের গাছে, ছাদে, ঘরে তাদের হাসির তরঙ্গ সামান্য সময়ের জন্যেও থামছে না। ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকলে এসব শুনতে পেতাম না। কিন্তু তা সম্ভব নয়। ওদের দাপাদাপি আর লুকোচুরি খেলার জন্য আমি নির্জনতা খুঁজে পাই না। নির্জনতা আমার খুবই প্রয়োজন। অন্তত ছাদটুকু নিরিবিলি হওয়া দরকার। অথচ নিশ্চিন্ত মনে সেখানে যাবারও উপায় নেই। কখন ওরা দু'জনে ছুটতে ছুটতে এসে পড়ে তার স্থিরতা নেই। বাঁদীদের সরিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু ওদের তো তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। বরং ওরাই এখন আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারে।

এরই মধ্যে একসময় ছুটে গিয়ে ওপর থেকে লাফিয়ে পড়া যায়। সে চেষ্টাও করেছি, কিন্তু পারিনি। ভয় করে। মনকে শক্ত করার জন্যে সময়ের প্রয়োজন। সেই জন্যেই চাই নির্জনতা।

কাল একবার ছুটে গিয়েছিলাম ছাদে। ভেবেছিলাম, কোনোরকম চিন্তা না করেই ঝাঁপিয়ে পড়বো। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে গর্ভের শত্রুটা নড়েচড়ে উঠল। এক অনাস্বাদিত মায়ায় আচ্ছন্ন হলো আমার মন। মরা হলো না।

শরাব ছাড়ার পর সিরাজ তার বন্ধু-বান্ধবদের বিদায় দিলেও মোহনলাল নিয়মিতই আসতেন। ফৈজী আসার পর থেকে তাঁকেও আসতে দেখি না আর। ব্যাপারটা একটু বিসদৃশ বলে মনে হালা। তাঁর বোন সিরাজের বেগম। এখন তাঁর আরও বেশী আসা উচিত। কিন্তু এভাবে হীরাঝিলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক কেন যে তিনি উঠিয়ে দিয়েছেন বুঝলাম না। এখন তো বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হওয়াই উচিত।

কৌতূহল মেটাবার কোনো পথ নেই। সিরাজকে প্রশ্ন করলে সব জানা যায়, কিন্তু তাকে প্রশ্ন করার মতো মনের অবস্থা আমার নেই। তার দেখা পাওয়াও ভার।

মোহনলালকে বীর যোদ্ধা বলে জানি। বেগমসায়েবার মুখে তাঁর নাম প্রথম শুনি। বেগমসায়েবা সাধারণত কারও সুখ্যাতি করেন না। রাজা জানকীরামের মতো লোক সম্বন্ধে নবাব সুখ্যাতি করলেও, তাঁর মন্তব্য কোনোদিন শুনিনি। সেই বেগমসায়েবা যখন মোহনলালের সুখ্যাতি করলেন, তখন থেকেই তাঁর প্রতি একটা শ্রদ্ধাভাব গড়ে উঠেছিল আমার মনে।

হীরাঝিলে সিরাজের বন্ধুবান্ধব অনেকেই আসতো। তারা পাল্লা দিয়ে শরাব খেতো, স্ফূর্তি করতো। ঝিল থেকে বিদায় নেবার সময় তাদের পা টলতো। কিন্তু মোহনলালকে কোনোদিন শরাব স্পর্শ করতে দেখেনি কেউ। তিনি যখন এখান থেকে চলে যেতেন, তখন স্বাভাবিক মানুষের মতো দৃঢ় পদক্ষেপে যেতেন। এ সমস্ত দেখেশুনে তাঁর সম্বন্ধে আরও উঁচু ধারণা হয়েছিল আমার মনে।

কিন্তু যখন শুনলাম, নিজের বোনকে নবাবের বেগম করবার জন্যে তিনি দিল্লি থেকে নিয়ে আসছেন, তখন আমার এতদিনের শ্রদ্ধায় ফাটল ধরল। শুধু ফাটল নয়, একটা ঘৃণাভাব জন্মাল তাঁর প্রতি। বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে সামান্য একজন নর্তকীকে তিনি হারেমে পাঠালেন। হোক্ না কেন সে সুন্দরী, তবু একদিন কত লোকের মন জুগিয়েছে, দেহ বিক্রি করেছে।

মোহনলাল এখন আমার শত্রু। তবু জানতে হবে, তিনি কেন হীরাঝিলে আসেন না। ব্যাপারটা অদ্ভুত।

একেই বলে বোধহয় নারী-মন। আত্মহত্যার জন্যে পাগল হয়েও সামান্য একটা কৌতূহল মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠল ধীরে ধীরে। যতক্ষণ এ কৌতূহলের নিরসন না হয়, ততক্ষণ যেন শান্তি নেই।

অথচ কোনো প্রয়োজনও নেই। মরে গেলে তো সব কিছুর বাইরে চলে যাবো। সেই ভেবে নিজেকে কত বোঝালাম, কিন্তু সব বৃথা।

কৌতূহলের নিবৃত্তি হলো শেষে। সিরাজের মুখেই শুনলাম। তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে অবশ্য একটু কৌশল অবলম্বন করতে হলো। স্নানের সময় তার গোছলখানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানেই দেখা হলো।

'তুমি এখানে লুৎফা?'

'আমার যেন মনে হলো আপনি কাউকে ডাকছেন। কেউ এলো না দেখে আমি নিজেই এলাম। কোনো দরকার আছে কি, নবাবজাদা?'

'না, আমি তো কাউকে ডাকিনি।'

'ও, তবে আমারই ভুল।' নিরাশ হয়ে চলে আসতে চাইলাম।

'শোনো।' পেছন থেকে সিরাজ ডাকে।

ফিরে এসে তার সামনে দাঁড়াই।

'তুমি কি বলতে এসেছিলে, বলো?'

'আমি? কিছু না তো। ওই যে বললাম....'

'ও কথা থাক। কেন এসেছিলে?'

চুপ করে থাকি। ধরা পড়ে গিয়েছি। এতদিনের পরিচয়ের পরও সিরাজকে আমার জানা উচিত ছিল। তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের দিনই তো ধরা পড়ি। তবে কেন বোকার মতো একই কৌশল অবলম্বন করলাম?

'ভয় নেই, লুৎফা। বলো, কি জানতে চাও?'

'নবাবজাদা, অপরাধ নেবেন না তো?'

'না।'

'ফৈজী বেগম আসার পর থেকে মোহনলালকে হীরাঝিলে দেখি না। তিনি তো আপনার একজন হিতৈষী?'

আমার কথায় সিরাজ বিচলিত হয়। সে দু'বার পায়চারি করে। একবার হীরাঝিলের সীমান্তে গঙ্গায় দৃষ্টিনিক্ষেপ করে। তারপর আমার খুব কাছে এসে আমার মুখের দিকে তাকায়।

তার হাবভাবে সঙ্কুচিত হই। বলি, 'না বুঝে অন্যায় করে ফেলেছি, নবাবজাদা। মাফ করুন।'

'অন্যায় করোনি। আমি ভাবছি, এমন একটা কিছু তুমি লক্ষ্য করেছ যা ধারালো বুদ্ধি ছাড়া নজরে পড়ার কথা নয়। তুমি বুদ্ধিমতী জানি, কিন্তু সে-বুদ্ধি এতটা তীক্ষ্ণ জানতাম না। মোহনলালের জন্যে আমারও বড় অশান্তি।'

'কেন নবাবজাদা?'

'ফৈজী এখানে আছে বলে সে আর আসে না।'

বিস্মিত হয়ে বলি, 'কিন্তু তিনিই তো তার বোনকে আনিয়েছেন!'

'হ্যাঁ, সে আনিয়েছে, তবে চাপে পড়ে। তার আনার আদৌ ইচ্ছে ছিল না।'

'সেকি নবাবজাদা! নিজের বোন বেগম হলো, এ তো তাঁর সৌভাগ্য। তবে কি তিনি ফৈজীর ধর্মান্তরের জন্যে বিরক্ত?'

'ফৈজী বহুদিন আগেই মুসলমান হয়েছে।'

'তবে?'

'মোহনলাল বলেছিল, ফৈজী তার বোন হলেও সে নর্তকী। নর্তকীকে আমি বেগম হিসেবে নিই, ইচ্ছে তার ছিল না। কিন্তু তুমি তো জানো লুৎফা, লোকের মুখে তার রূপের খ্যাতি শুনে আমি পাগল হয়েছিলাম। তাই মোহনলালের আপত্তি সত্ত্বেও তাকে নিয়ে আসি। এখন তো দেখছো আমি ঠকিনি। ভারতের কোনো হারেমে ফৈজীর মতো সুন্দরী নেই।'

আমি অভিভূত হই। মোহনলালের প্রতি কিছুদিনের জন্যেও বিরক্ত হয়েছিলাম ভেবে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। এত বড় হিতৈষীকে সিরাজ চিনল না।

তবু মরার আগে একটা সান্ত্বনা পেয়ে গেলাম। বুঝলাম, সিরাজের কাছ থেকে শত আঘাত পেলেও তার বিপদের দিনে মোহনলাল দূরে সরে থাকতে পারবে না। বুক দিয়ে রক্ষা করবে সে সিরাজকে। তাকে ভালোবাসে বলেই মোহনলাল আজ এত দূরে।

সিরাজ হেসে বলে, 'বুঝলে লুৎফা, মোহনলালের রাগ রয়েছে। সে এখানে আর আসে না। না আসুক, ফৈজী থাকলে পৃথিবীতে আর কাউকে আমি চাই না।'

তাই বটে। বাংলার ভাবী উত্তরাধিকারীর উপযুক্ত কথাই বটে। দুঃখ হয়, কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারি

না। প্রতিবাদ করার মতো মনের জোরও নেই, সে অধিকারও নেই।

'নবাবজাদা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?'

'কি কথা?'

মোহনলাল যে রাগ করে হীরাঝিলে আসেন না, একথা কি ফৈজীকে বলেছেন?'

'না, সময় পাইনি। তার সঙ্গে এসব কথা বলার অবসর কই?'

'না বলে থাকলে আর বলবেন না।'

'কেন বলো তো?'

'এমন কিছু নয়। তবে একটা কথা বলে যাই নবাবাজাদা, মোহনলাল আপনার সুখের দিনে দূরে সরে গিয়েছেন বলেই বিপদের দিনে সবচেয়ে আগে এগিয়ে আসবেন।' কথাটা বলেই তাড়াতাড়ি চলে যাই। ছুটতে আর পারি না। তবু যতটা সম্ভব ছুটি—সিরাজের দৃষ্টির বাইরে।

নবাব আলিবর্দির মৃত্যু হলো। আকস্মিক মৃত্যু নয়, তবু শোকের ছায়া নামল সারা মুর্শিদাবাদ জুড়ে। নিদারুণ গ্রীষ্মের মধ্যেও নবাব মহল থেকে খোসবাগ পর্যন্ত অগণিত জনতা রাস্তার দু'পাশে ভিড় করলো। দু'পাশের বাড়ি থেকে নবাবের শবাধারের ওপর পুষ্পবৃষ্টি হলো। ফুলে-ফুলে ছেয়ে গেল রাস্তার রাঙা মাটি।

ছায়াশীতল খোসবাগে যখন নবাবের মৃতদেহ এসে পৌঁছল তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। ঘন বৃক্ষরাজির অসংখ্য শাখা-প্রশাখার আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়েছে।

বেগম মহলের সবাই এসে জড়ো হলো একটা আড়াল দেওয়া জায়গায়। সেখান থেকে বৃদ্ধ নবাবের মৃতদেহকে সমাধিস্থ হতে দেখা যাবে।

বেগমসায়েবাকে এই প্রথম কাঁদতে দেখলাম। নবাবের মৃত্যুর সময় তিনি কাঁদলেন না। তাঁকে নিয়ে এতটা পথ আসার সময়ও তঁর চোখে জল দেখিনি। কিন্তু নবাবের দেহ যখন মাটির নীচে অন্তর্হিত হলো, তখন তিনি আর সামলাতে পারলেন না নিজেকে। যেন পাহাড় ভেঙে পড়ল। জীবনে তাঁর বোধহয় এই প্রথম আর শেষ ক্রন্দন। আজীবন স্বামীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবনপথে এতদূর এগিয়ে এসে আজ তিনি সঙ্গীহারা হয়ে পড়লেন। পাটনার এক সামান্য কর্মচারীর জীবনের সঙ্গে যে জীবন একদিন জড়িত হয়েছিল, সুখে-সৌভাগ্যে নানান উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে সে-জীবন আজ বিচ্ছিন্ন হলো। নবাবকে দুঃসময়ে পরামর্শ দিয়ে, শোকে সান্ত্বনা দিয়ে, সুসময়ে পবিত্র প্রেমের মধ্যে দিয়ে, শেষদিন পর্যন্ত ঢেকে রেখেছিলেন বেগমসায়েবা। আজ আর কাকে ঢেকে রাখবেন তিনি? তাঁর কাজ ফুরিয়েছে। সব শূন্য হয়ে গেল, মনের ভেতরও খাঁ-খাঁ করছে, তাই তিনি কাঁদছেন।

তাঁর দিকে চেয়ে আমিও কেঁদে ফেলি।

হঠাৎ সিরাজের উচ্চ কণ্ঠস্বরে সবাই সচকিত হয়ে ওঠে। এ সময়ে সে এত উত্তেজিত কেন?

সমাধি ঢেকে দেবার জন্যে একটা স্বর্ণখচিত কৃষ্ণবস্ত্র আনা হয়েছিল। সেই বস্ত্র সমাধির কাছে বয়ে নিয়ে যাবার সময় সিরাজ ছুটে এসে বাধা দেয়।

সিরাজ বলে, 'এই কালো কাপড় কখনই দেওয়া হবে না দাদুর কবরে। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব আলিবর্দির সমাধির ওপর কৃষ্ণবস্ত্র? কে এনেছে এটা? কে?'

সবাই চুপ করে থাকে। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবের প্রশ্নের জবাব দেবার সাহস কারও নেই। হামিদার কাছে শুনলাম, জগৎশেঠ এনেছে ওটা। জগৎশেঠের মুখের দিকে চেয়ে স্পষ্টই বুঝলাম, সে প্রমাদ গণছে।

বেগমসায়েবা সোজা এগিয়ে যান সিরাজের সামনে। বলেন, 'এখন আর গোলমাল করিস নে,

সিরাজ। ওঁকে ঘুমোতে দে। ঘুম ভেঙে যাবে তোর চীৎকারে।'

তাঁকে জড়িয়ে ধরে সিরাজ শিশুর মতো কেঁদে বলে, 'না দাদি, তুমি অমন করো না। ও কাপড় আমি কিছুতেই দিতে দেবো না। দাদুর কবরের ওপর থাকবে লাল কাপড়—টক্‌টকে লাল।'

'ও কাপড় এখন কোথায় পাবি?'

'পাওয়া যাবে না? নিশ্চয় পাওয়া যাবে। কেউ আছে এখানে, এনে দিতে পারো লাল কাপড়? টক্‌টকে লাল।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ। সমস্ত ভিড় স্তব্ধ। তারপর একটা আলোড়ন দেখা যায় একদিকে। একজন ধীরে ধীরে বার হয়ে আসে সামনে। সিরাজকে কুর্নিশ করে সে বলে, 'আমি দিতে পারি, নবাব। টক্‌টকে লাল।'

সিরাজ তার হাত চেপে ধরে, 'তুমি পারো? সত্যি বলছো?'

'হ্যাঁ, নবাবা।'

'এখনই নিয়ে এসো, প্রচুর ছওয়াব মিলবে।'

'ছওয়াব আমি চাই না, নবাব। এ আমার সৌভাগ্য। আমার সৌভাগ্যই আমার ছওয়াব।'

জগৎশেঠ এতক্ষণে এগিয়ে আসেন। তাঁর সম্মানে ঘা লেগেছে। ভ্রূকুটি করে বলেন, 'তুমি অত বড় কাপড় কেন তৈরি করেছিলে? লাল রঙই বা করেছিলে কেন?'

'নবাব আলিবর্দির জন্যই পাঁচ বছর ধরে বুনেছি আমি। কিন্তু তাঁর সমাধির ওপর দেবো বলে তো বুনিনি। বড় আশা ছিল, চেহেল-সেতুনে তাঁর মসনদের ওপর বিছিয়ে দেবো। বর্গীর হাতে যখন পরিবার সমেত মারা পড়ছিলাম, তখন তিনি গিয়ে বাঁচান আমাদের। সেটা কি ভুলতে পারি? নবাবের সে চেহারা চিরদিন আমার চোখে ভাসবে।'

'হুঁ।' জগৎশেঠ চিন্তান্বিত হলেন যেন।

লোকটা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বলে, 'আজ সবচেয়ে বড় মসনদের ওপর পেতে দেবো সে কাপড়।'

লোকটা ছুটে চলে যায়। তার ভয়, তার আগেই অন্য কেউ লাল বস্ত্র নিয়ে এসে দেয়।

লাল কাপড়ের সমস্যা মিটলেও সকলের সেটা মনঃপূত হলো না। বিশেষ করে জগৎশেঠের। লোকটা যে কাপড় আনতে ছুটল, তা যত বড় শ্রদ্ধার সামগ্রীই হোক না কেন, তাতে সোনারূপার কাজ থাকবে না। নবাবের কবরের ওপর যেন সাক্ষাৎ উপহাসের মতো দেখাবে।

রাজবল্লভকে জগৎশেঠ সে-কথা বললো। সিরাজ শুনে ফেলে বলে, 'ওই কাপড়েই নবাব বোধহয় সবচেয়ে শান্তিতে থাকবেন, শেঠজী। সাধারণ কাপড় হলে কি হবে, মনের দরদ দিয়ে বোনা হয়েছে, যে! তাছাড়া কারুকার্য ওতে পরেও করে নেওয়া যেতে পারে।'

বেগমসায়েবা সিরাজের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন।

একজন মৌলানা বলেন, 'কিন্তু এই কৃষ্ণবস্ত্রটির কি হবে?'

'ওটা খোসবাগে ওই ঘরে থাকবে। নবাব-বংশ এখনো নির্বংশ হয়নি, পরেক কাজে লাগবে।' মৌলানা সিরাজের কথা শুনে থতমত খেয়ে চুপ করে যান।

একটা কাঠের পেটিকা মাথায় করে লোকটা হাজির হয়। জগৎশেঠ তাচ্ছিল্যভরে সেদিকে এগিয়ে যান। তাঁর সঙ্গে যান রাজবল্লভ ও আরও অনেকে। যেন বিরাট এক তামাশা দেখবে সবাই।

কিন্তু ঢাকনা খুলতে যে জিনিস চোখে পড়ে তা দেখে কারও কথা সরে না। গভীর বিস্ময়ে নির্বাক দৃষ্টিতে সবাই চেয়ে থাকে সেদিকে। মসলিন আর রেশমের অপূর্ব শিল্প—সর্বাঙ্গে সোনার কাজ।

কৃষ্ণবস্ত্রটির জন্যে মনে মনে জগৎশেঠের একটা গর্ব ছিল। কিন্তু পেটিকা থেকে লাল বস্ত্রটি বার করে যখন মেলে ধরা হলো, তখন পাশের ম্রিয়মাণ কালো কাপড়ের চেয়েও জগৎশেঠের মুখ আরও অন্ধকার হয়ে গেল। সকলের অজ্ঞাতে কালো কাপড়ের একাংশ দু'মুঠো দিয়ে চেপে ধরলেন, যেন সবটা মুঠোর মধ্যে নিতে পারলেই তিনি বেঁচে যেতেন। তারপর আস্তে আস্তে একটা আমগাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বেগমসায়েবার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সেই সঙ্গে উপস্থিত সকলের।

সিরাজ লোকটির দু'হাত চেপে ধরে বলে, 'কিভাবে তৈরি করলে এই জিনিস? তোমাকে দেখে তো ধনী বলে মনে হয় না।'

'আমি সত্যিই গরিব, নবাব। আধপেটা খেয়ে জমিজমা বিক্রি করে আমি আর আমার ছেলে এটা বুনেছি।'

'তুমি ছওয়াব চাও না, কিন্তু তোমার একটা ব্যবস্থা না করলে যে আমার শান্তি হবে না। নবাব হয়ে তোমার কাছে অনুরোধ করছি, চেহেল-সেতুনে একদিন যেও।'

লোকটা আভূমি নত হয়ে বলে, 'আপনার আদেশ মনে থাকবে, নবাব। প্রয়োজন হলে আপনার কাছে নিশ্চয়ই যাবো।'

মন আমার সব সময় ভীতিবিহ্বল। কেন এমন হয় জানি না। সর্বদাই মনে হয়, একটা নিষ্ঠুর হাত এগিয়ে আসছে মুর্শিদাবাদের টুঁটি চেপে ধরতে। ঘুমের ঘোরেও কেঁপে উঠি—চমকে ঘুম ভেঙে যায়।

বর্গীদের অমানুষিক অত্যাচারের মধ্যেও এমন ভয় কখনো পাইনি। তখন উন্মুক্ত আকাশের দিকে চেয়ে থাকলেও মন ভরতো। যদি দৃষ্টিনিক্ষেপ করতাম গঙ্গার অগাধ জলরাশির দিকে, তাহলে শান্তি পেতাম। মনে রং ধরতো বাগিচার সৌন্দর্য দেখে। ফলে-নত গাছের অবস্থা দেখে রক্তিম হয়ে উঠতাম।

এখন সবই রয়েছে, অথচ মনে সাড়া জাগে না। প্রথমে ভাবতাম হয়তো সিরাজের ব্যবহারে এমন হয়েছে। কিন্তু তাতে বাগিচার সৌন্দর্য উপলব্ধি না করলেও উদ্দাম আকাশের দিকে চেয়ে মুহূর্তের জন্যেও অন্যমনস্ক হবো না কেন? গঙ্গার জল যেন টগ্‌বগ্ করে ফুটছে। তাতে সামান্য শীতলতার কথাও ভাবতে পারি না এখন।

আত্মহত্যা করা হয়ে ওঠেনি। দু'মাসের শিশুকন্যার মুখের দিকে চেয়ে সব কিছু ভুলতে চেষ্টা করি। হুবহু সিরাজের মুখের আদল। দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে তন্ময় হয়ে যাই। সিরাজকে যেন নতুন করে পেয়েছি।

তবু মাঝে মাঝে সে মুখের দিকে চেয়ে ভয় পাই—ভীষণ ভয় পাই। শিশু যদি কথা বলে ওঠে, কে তুমি? তোমাকে তো চাই না। ফৈজীকে ডাকো।

তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে চেপে ধরি তাকে। নিজেকে বোঝাই, এ তো সিরাজ নয়, এ পুরুষও নয়, পুরুষ না হলে কি নিষ্ঠুর হওয়া যায়? কই, আমি তো সিরাজকে ভুলতে পারলাম না। কার জন্যে আমি আত্মহত্যা করিনি? নিজের সন্তানের জন্যে, কখনোই নয়। সন্তানের মধ্যে সিরাজকে পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষাতেই জীবনের ওপর ছেদ টানতে পারিনি। পৃথিবীতে কেউ একথা কি বিশ্বাস করবে?

শিশু কাঁদলে ভাবি, সিরাজই কাঁদছে। নির্দয় পৃথিবীর কাছে অবুঝ নবাব আঘাতের পর আঘাত পেয়ে শিশুর মতো চোখের জল ফেলছে যেন।

সত্যিই কি সিরাজ কাঁদছে না? ফৈজীর সঙ্গে হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যেও তার মুখখানা অমন শুকনো বলে মনে হয় কেন দূর থেকে? তার হাসিতে আগেকার স্বচ্ছতা দেখি না। ভয় হয়, বাংলার কোটি কোটি মানুষের বিপদের ছায়া বাংলার নবাবের মুখে ফুটে উঠেছে।

বাইরের খবর রাখি না। শত চেষ্টাতেও হীরাঝিলের বাইরের জগতের কোনো সংবাদই সঠিকভাবে আমার কানে এসে পৌঁছয় না। যা শুনি হয়তো তা অতিশয়োক্তি কিংবা বিকৃত, অথবা একেবারে মিথ্যে।

তবু সোফিয়ার ক্রূর হাসির মধ্যে সেদিন বড় বেশি অর্থ খুঁজে পেয়েছিলাম। বহুদিন সে মুর্শিদাবাদে ছিল না। মহম্মদের সঙ্গে ঢাকা গিয়েছিল। তার মহম্মদের আজকাল পদোন্নতি হয়েছে। আলিবর্দির বেগমের সেই করুণাশ্রিত লোকটির সঙ্গে নিজেকে তুলনা করলাম। মহম্মদের পদোন্নতি হলেও সে লুৎফার পায়ের কাছেও কোনোদিন পৌঁছতে পারবে না। হতে পারি আমি নবাবের পরিত্যক্তা এক নারী—তবু আমি বেগম। হীরাঝিলের বেগম মহলে আমার বাস, যেখানে নবাবের প্রিয়তমা ফৈজী অবধি দ্বিধাবোধ করে প্রবেশ করতে।

বেগম ফৈজীর মহল হীরাঝিলের একপাশে। সেটা বেগমদের বসবাসের জন্য তৈরি হয়নি। আমার প্রতি সিরাজের কেন যে এই অনুকম্পা, শত ভেবেও বুঝতে পারিনি। শুধু বুঝতে পারি, তার মন থেকে আমি একেবারে সরে গেলেও সম্মানের আসনে আগের মতোই প্রতিষ্ঠিত। সে সম্মান কেড়ে নিতে সম্ভবত তার বিবেকে বাধে। তার প্রথম সন্তান যে আমারই গর্ভের। তবে এটুকুই জানি, সে মেয়ে না হয়ে যদি ছেলেও হতো, তবু বাংলার মসনদে কখনো বসতে পারতো না। বাংলার মসনদ ফৈজীর গর্ভের এক অনাবিষ্কৃত অঙ্কুরের জন্য স্থির হয়ে রয়েছে।

সোফিয়াকে হাসতে দেখার পর থেকে আমি চঞ্চল হয়ে উঠি। তার কথাবার্তা আদব-কায়দার মধ্যে কোনো অভদ্রতা খুঁজে না পেলেও একটা বিদ্রূপ প্রকাশ পাচ্ছিল, যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাকে কিছু বলতে পারিনি সেজন্যে।

একসময় যখন অসহ্য হয়ে উঠেছিল তার উপস্থিতি, বলেছিলাম, 'ভবিষ্যতের কথা ভেবেই কি সোফিয়া বিবির এত আনন্দ?'

'ঠিক বলেছেন, বেগমসায়েবা। দিন মানুষের সমান যায় না, কত ওঠানামা হয়।'

'তুমি তো ওঠার দলে?'

'হ্যাঁ, নবাবের অনুগ্রহে।'

'আর নবাব নিজে কোন দলে?' সোফিয়ার চোখের দিকে তীব্রভাবে তাকাই কিছু খুঁজে পাবার আশায়। আমার দৃষ্টির সম্মুখে সে ম্লান হয়ে যায়। কোনো কথা বলে না।

'জবাব দিলে না যে?'

'নবাবের কথা এর মধ্যে কেন, বেগমসায়েবা?' তার গলা কেঁপে ওঠে।

'নবাবও মানুষ, সোফিয়া।'

'ঠিকই বলেছেন, বেগমসায়েবা। নবাবও মানুষ। আমি এখন যাই।'

সোফিয়া চলে যাবার উপক্রম করতে আমি চীৎকার করে উঠি, 'দাঁড়াও।'

সে থমকে দাঁড়ায়। তার ধৃষ্টতা দেখে আমার শরীর রাগে রি-রি করে।

'কি বলতে চাইছো তুমি, সোফিয়া?'

'কিছুই না তো, বেগমসায়েবা।' সে অবাক হবার ভান করে। কথা বার করা অসম্ভব।

'বেগমের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় কুর্নিশ করে যেতে হয়, সে-কথা ভুলে গিয়েছো?'

'অপরাধ মাপ করবেন, বেগমসায়েবা।' বিকৃত মুখে কুর্নিশ করে সে বিদায় নেয়। এরপর থেকেই মনের মধ্যে সব সময় আনচান করে। সঙ্গী সাথী কেউ নেই, যাকে দিয়ে বাইরের খবর আনাতে পারি। ঘরের মধ্যে বসে ছট্‌ফট্ করা ছাড়া উপায় নেই।

নবাব-পরিবারের যত কিছু অনাচার, ব্যভিচার আর কুৎসিত দৃশ্য সব কি শুধু আমারই চোখে পড়ে? এ পোড়া চোখকে উপড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়। আমার মতো নারীকে হিন্দুরা কি একটা বলে যেন, ঠিক জানি না। তবে সেটা প্রশংসার নয়। ঘসেটির ঘটনা দেখেছিলাম, আমিনা বিবির পদস্খলনও

নিজের চোখে দেখেছি। কিন্তু এবার যা চোখে পড়ল তা আগের সব কিছুকে ছাড়িয়ে নারীর ঘোরতর কলঙ্কের এক ইতিহাস রচনা করল। নিজের চোখকেও প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু একদিন নয়, দু'দিন নয়, তিনদিন একই রকম ভুল দেখা কখনো সম্ভব নয়।

নিজে নারী বলে আমারই মরে যেতে ইচ্ছে হলো। পুরুষের একান্ত নির্ভরশীল প্রেমের এমন জঘন্যতম প্রতিদান কেউ কখনো দিতে পারে? কুৎসিততম পুরুষের প্রেমেও যদি খাদ না থাকে, তাতে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করে বলেই এতদিন জানতাম, কিন্তু সে ধারণা ধূলিসাৎ হলো। নিদারুণভাবে তা ভেঙে গেল, যখন দেখলাম, শয়তানীর পাল্লায় পড়লে শ্রেষ্ঠ পুরুষের প্রেমও কেমন বৃথা হয়। পুরুষের নিষ্ঠুরতা এর চাইতে শতগুণে শ্রেয়। তাতে লুকোচুরি নেই, পেছন থেকে ছুরিমারা নেই। সে নিষ্ঠুরতা সকলের চোখের সামনে সোজাভাবে লক্ষ্যস্থলের দিকে এগিয়ে যায়।

সিরাজের মুখখানার কথা ভেবে অসহনীয় ব্যথায় বুকের ভেতর টনটন্ করে। তার সন্তানকে বুকের মধ্যে নিয়ে কাঁদি—শুধু কাঁদি। কেঁদেও যেন শান্তি পাইনে। শান্তি পেতে হলে এখনই সিরাজকে গিয়ে সব বলতে হয়। কিন্তু তার মনের মধ্যে তিল-তিল করে গড়ে ওঠা সৌধকে আমি ভেঙে চুরমার করে দিতে পারবো না—কিছুতেই নয়।

অথচ এতে আমার একটা হিংস্র আনন্দ হওয়াই উচিত ছিল। সিরাজও একসময় আমার সম্বন্ধে সেরকম একটা কিছু ভেবেছিল। এখনো নিশ্চয়ই তার সেই ধারণাটাই অটুক রয়েছে। অনেক বেগম ঘাঁটাঘাঁটি করে সে মেয়েদের মন সম্বন্ধে একটা ছক কেটে নিয়েছে। আমাকে সে সেই ছকের মধ্যেই ফেলে।

বেচারা সিরাজ! এই তিনদিনেব ঘটনা এখন তাকে বলতে গেলে সে বিশ্বাসই করবে না। উল্টে আমাকে হয়তো হত্যা করার আদেশ দিয়ে বসবে।

কিণ্ত, তবু বলাই যে উচিত। সারাদিনের পরিশ্রমের পর যখন সে ফৈজীকে নিয়ে মত্ত হবে, তখন আমি কি তা সইতে পারবো? ফৈজীর হাসির মুখোশ আর আহ্লাদে গলে-যাওয়া-ভাব দেখে কি স্থির থাকতে পারবো আমি? স্থির না থেকে উপায়ও নেই, সিরাজ দারুণ আঘাত পাবে।

দীর্ঘদেহ, আগুনের মতো গায়ের রং সেই পুরুষের। নবাবের একান্ত বিশ্বাসী আর প্রিয়পাত্র। হবে নাই বা কেন? সৈয়দ মহম্মদ খাঁ তো পর নয়। সিরাজের ভগ্নীপতি সে।

যত কিছু সর্বনাশ সবই দেখছি এই আত্মীয় আর বন্ধুর রূপের মধ্যে দিয়েই আসে। সৈয়দ মহম্মদ খাঁকে দেখে কয়েক বছর আগে আর-এক বীরপুরুষের কথা মনে পড়ে। হোসেন কুলিখাঁর জন্যে এখনো দীর্ঘশ্বাস ফেলি। তাঁকে কখনো অপরাধী বলে মনে হয় না। ঘসেটি যেদিন আমাকে পদাঘাত করেছিল, সেদিন তিনি যেভাবে আমাকে রক্ষা করেছিলেন, তা আজও আমার মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে। তাঁর সেই সহানুভূতিপূর্ণ সম্বোধন এখনো কানে বাজে। দুর্ভাগ্য যে, তিনি আমিনা বেগম আর ঘসেটির লালায় বোনা জালের মধ্যে এসে আটকে পড়েছিলেন। গবাক্ষের ধারে তাঁর চোখ-মুখের অসহায় আর বিরক্তির ভাব আর কেউ না দেখুক, আমি দেখেছিলাম। নারীদেহের সংস্পর্শে এসে সাময়িকভাবে তিনি উত্তেজিত হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সেটা তার ধীরবুদ্ধি আর বিবেচনা প্রসূত কার্য নয়। জালের মধ্যে পড়ে অন্য কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ফৈজীর সঙ্গে সৈয়দ মহম্মদ খাঁকে দেখে আমার হোসেন কুলিখাঁর কথাই মনে হয়েছিল। সেও হয়তো এমন পরিণতির কথা কখনো কল্পনা করেনি। কিন্তু তার দীর্ঘ ঋজু গৌরবর্ণ দেহখানা ফৈজীর নেশা ধরিয়েছে। শিকারকে বশে আনার জন্যে কথার ভঙ্গী আর কটাক্ষের ফাঁদ পেতে সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছে। এই তিনদিনে তারই পরিণতি দেখলাম।

পুরুষ মানুষ ইচ্ছে করেই ফাঁদে পা দেয় অনেক সময়। অন্তত সিরাজের স্বভাব দেখে আমার সেই ধারণাই হয়েছে। কারণ ব্যভিচারের ফলাফল তাকে ভোগ করতে হয় না বড় একটা। ফাঁদে পা দিতে

হলে বিপদের ঝুঁকি থাকে, কিন্তু সেই ঝুঁকি সম্ভবত পুরুষকে আরও উৎসাহিত করে। সাদামাটা কি একঘেয়েমির মধ্যে সে ঠিক তৃপ্তি পায় না।

ফৈজী নারী, কিন্তু তার মন নিশ্চয়ই পুরুষোচিত। নইলে সে কি কল্পনা করতে পারছে না, নিজের কত বড় সর্বনাশ সে ডেকে আনছে?

প্রথমে হয়তো সে এতটা ভেবে দেখেনি। কিন্তু সৈয়দ মহম্মদ যখন তাকে পাগল করল, তখন সব ভেবেও আর পিছিয়ে আসতে পারছে না। ফৈজী মহামূর্খ। সিরাজকে সে চিনতে পারেনি।

মেয়েটাকে হামিদার কাছে রেখে ধীরে ধীরে হীরাঝিলের ছাদে গিয়ে উঠি।

সিরাজ এখনো ফেরেনি চেহেন-সেতুন থেকে। কোনোদিন তো এত দেরি করে না, তাই ভাবনা হয়। এখন তার জন্যে ভাবনাটুকুই অবশিষ্ট রয়েছে, প্রতিকারের উপায় নেই। আগের মতো আমার কাছে এলে কি একদিনও দেরি করে ফিরতে দিতাম? এখন লুৎফা নামে একজন নারী যে হীরাঝিলে বাস করে, একথা হয়তো তার মনেই নেই। তবু নেপথ্যে থেকে প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে তার গাড়ির ঘোড়ার খুরের আওয়াজের জন্যে উন্মুখ হয়ে বসে থাকি। সে ঠিক সময়ে না এলে চিন্তিত হই।

ছাদ থেকে গঙ্গার অপর পারে মতিঝিলের চূড়া দেখা যায়। ঘসেটি বেগম রয়েছে সেখানে।

হাসি পেল ঘসেটি বেগমের কথা মনে হওয়ায়। নওয়াজিসকে নবাব করার বহু চেষ্টাই সে করেছে, কিন্তু সবই ব্যর্থ হলো।

গাড়ির আওয়াজ পাই। মন্থরগতিতে সিরাজের গাড়ি ফটক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। তার গাড়ির এমন ধীরগতি দেখে মন খারাপ হয়। অসুস্থ নয় তো সিরাজ? আস্তে গাড়ি চালানো মোটেই পছন্দ করে না সে। সর্বদাই সে চায় উল্কার বেগ।

ছাদ থেকে নেমে তার কক্ষের পাশে লুকিয়ে থাকি। ফৈজীর ঘরে প্রথমে না গেলে সে এখানেই আসবে। কান পেতে দাঁড়াই।

পায়ের শব্দ পাই। জানি, আমি তার সম্মুখে যাবো না। তবু বুক দুরুদুরু করে। এত কাছ থেকে অনেকদিন দেখার অভ্যাস নেই তাকে। সিরাজ আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় তার গায়ের বাতাস এসে লাগবে আমার গায়ে। তখন তার শরীরের সুপরিচিত গন্ধ পাবো আমি। কিন্তু যদি কেঁদে ফেলি?

একটা থামেব গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াই। নিজের পায়ের ওপর নির্ভর করা এক্ষেত্রে নিরাপদ নয়।

সিরাজ আরও কাছে এগিয়ে আসছে। কেমন যেন ঢিমেতালে হাঁটছে—মোটেই স্বাভাবিক নয়। নিজের মহলের মধ্যেও সে হাঁটে যুদ্ধক্ষেত্রের বীর যোদ্ধার মতো দ্রুত এবং সমান তালে। তার সেই রকম চলন দেখতে সবাই অভ্যস্ত। নবাব আলিবর্দির কাছে তার শপথের কথা ভোলেনি তো? শরাব ধরল নাকি আবার?

উঁকি না দিয়ে পারি না। সিরাজের ফৈজী থাকতে পারে, থাকতে পারে তার হাজারটা বেগম—রাজত্ব থাকতে পারে, সৈন্যসামন্ত থাকতে পারে, কিন্তু সে যে একান্তই আমার। তাকে আর কেউ চিনবে না, কেউ বুঝবে না, ভালোবাসতেও পারে না তাই।

তার মুখের দিকে চেয়ে শিউরে উঠি। একি চেহারা হয়েছে, অসুখ করেনি তো? চোখ দুটো লাল হলেও বুঝতে কষ্ট হলো না যে নেশার লাল নয়।

নিজের অজ্ঞাতে কখন যে তার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম জানি না। একেবারে তার সামনে গিয়ে খেয়াল হলো। সিরাজও আগে আমাকে দেখতে পায়নি। যখন দেখলো, তখন আর পালিয়ে যাবার উপায় নেই আমার।

'কে?' চমকে ওঠে সে।

আমি জবাব দিতে পারি না। লজ্জায়, দ্বিধায় সমস্ত শরীর মন জড়িয়ে আসে।

'লুৎফা?'

'হ্যাঁ, নবাব। এখনো বেঁচে আছি।'

'জানি। আমার আগে তুমি মরতে পারো না।' উদার কণ্ঠস্বর তার। তবু তার মধ্যে এমন একটা কিছুর স্পর্শ ছিল যা আমাকে আনন্দ দিল।

'ক্ষমা করবেন, নবাব। আপনার মুখের দিকে চেয়ে স্থির থাকতে পারিনি। নইলে আড়ালেই থাকতাম। সে চেষ্টা করেও ছিলাম।'

'আমার চমকে ওঠা ভুল হয়েছিল। বোঝা উচিত ছিল, তুমি আজ আসবে।'

'কেন নবাব?'

'সুখের সময়ে আড়ালে থেকে নজর রাখো, আর দুঃখের সময় দেখা দাও। আর একজনও এমনি আছে। তবে সে নারী নয়, পুরুষ। সে মোহনলাল।'

'দুঃখ! কিসের দুঃখ আপনার?'

'সাধারণ দুঃখে নবাবদের ভেঙে পড়তে নেই, তাই না, লুৎফা। আমার পিতা নিহত হলে তুমিই একথা বলেছিলে একদিন।'

আমার কথার এতখানি গুরুত্ব দেয় সিরাজ! কবেকার কথা এখনো মনে রেখেছে? আনন্দে চোখ ছাপিয়ে জল আসতে চায়।

'আপনার কি হয়েছে বলুন।'

'এক্রাম মারা গেল।'

স্তব্ধ হয়ে যাই। নওয়াজিস মহম্মদ এক্রামকে মানুষ করলেও ভাই-এর ওপর সিরাজের দরদ কারও অজানা নয়। কী সান্ত্বনা দেবো ভেবে পাই না।

'মতিঝিলেই তাকে গোর দেওয়া হলো।' সিরাজ ধীরে ধীরে বলে।

'আমি খবর পেলাম না?'

'ইচ্ছে করেই তোমাকে জানাইনি। অসুখটা ছোঁয়াচে—বসন্ত। তোমার মেয়ে রয়েছে.....'

মেয়ের কথা তাহলে সে ভোলেনি, আমাকেও ভোলেনি। তবু আমার সঙ্গে দেখা করে না। জন্মানোর পর মেয়ের মুখও দেখেনি এ পর্যন্ত। আশ্চর্য! নবাবরা সত্যিই সাধারণ মানুষ নয়।

'ঘরে চলুন, নবাবজাদা।'

'তুমি যাবে?'

'আপনি আপত্তি করলে যাবো না। ফৈজী বেগমের কাছে খবর পাঠাবো?' মুখে ফৈজীর কথা বললেও মনে মনে নবাবের কাছে থাকতে চাইছিলাম। আজকের দিনে তাকে আর কারও কাছে রাখতে মন চাইল না।

সিরাজের জবাবের অপেক্ষায় তার মুখের দিকে চেয়েছিলাম। ভয় হলো যে, আমার কথামতো হয়তো সে ফৈজীকে খবর পাঠাতে বলবে।

'তুমি ফৈজীকে ডাকতে চাও, লুৎফা?'

'আপনার অভিরুচি।'

'আমি তোমার কাছেই থাকতে চাই। তুমি এখানে না এলেও তোমার ঘরে যেতাম। এসব দিনে ফৈজীর কথা মনেও আসে না।

মনে মনে বলি, জীবনেও তার কথা মনে আসা উচিত নয়। সে শয়তানী। সে ঘোর পাপিষ্ঠা। সে অবুঝ যুবকের মন নিয়ে সাংঘাতিক খেলায় মত্ত হয়েছে।

মুখে বলি, 'মেয়েরা বড় নীচমনা, নবাব। আমাকে আপনার বিপদের দিনের প্রলোভন দেখাবেন

না। শেষে হয়তো আল্লার কাছে শুধু সেইসব দিনেরই প্রার্থনা করবো।'

সিরাজ গম্ভীর হয়ে বলে, 'তুমি তা পারবে না। তবে প্রার্থনা করার আর প্রয়োজন হবে না, লুৎফা। সেদিন আসছে, আর একটু ধৈর্য ধরো।'

সিরাজের হাত ধরে ঘরে নিয়ে যাই।

মতিঝিলের সুন্দর বাগিচার এক নির্জন কোণে মাটির নিচে সিরাজের ভাই এক্রামউদ্দৌলা একাকী শুয়ে রইলো। কিশোর এক্রামের কিশোরী বেগম নাকি তার শিশুপুত্রকে নিয়ে প্রতিদিন তার স্বামীর কবরের পাশে কাঁদতে বসে। পিশাচী ঘসেটির প্রাণে কিশোরীর এই ব্যথা বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেছে বলে বোধ হয় না। তার সম্বন্ধে নানারকম গুজব হীরাঝিলের কঠিন পাহারা ভেদ করে এখনো আমার কানে আসে।

আজকাল মতিঝিলে নাকি রাজবল্লভের ভারী আদর। হোসেন কুলিখাঁর মৃত্যু ঘটিয়ে ঘসেটির হাত পেকেছে।

নওয়াজিস মহম্মদের জন্যে কষ্ট হয়। সে তার বেগমের ঠিক বিপরীত। ঘসেটি হয়তো বাংলার মসনদের লোভ এখনও ত্যাগ করেনি। হয়তো কেন, সঠিক ভাবেই একথা বলা যেতে পারে। কারণ, রাজবল্লভ যেখানে যায়, সেখানে ষড়যন্ত্র না হয়ে পারে না। কিন্তু বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করেও বলা যায়, নওয়াজিস এ সবের মধ্যে নেই।

হামিদা একদিন এসে বললো যে, নওয়াজিস নাকি পাগলের মতো হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে হামিদা এরকম দু'চারটে খবর শুনে এসে আমাকে বলে।

সে বলল, এক্রামের বেগম কেঁদে ভাসায়, আর নওয়াজিস দু'হাত দিয়ে কবরের পাশের মাটি আঁচড়ায়। মাটি খুঁড়ে সে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরতে চায়। তবু যদি নিজের ছেলে হতো।

নওয়াজিস নাকি আর বাঁচবে। না। তার 'শোথ' মারাত্মক রকম বৃদ্ধি পেয়েছে। হাকিম দেখাবার কোনো ব্যবস্থা নেই। যার বেগম উদাসীন, তাকে আর দেখবে কে? তার কঙ্কালসার চেহারার প্রতি ঘসেটির আকর্ষণ থাকার কোনো কারণ নেই। তার চেয়ে রাজবল্লভ অনেক বেশি লোভনীয়। সে ষড়যন্ত্র করে, পরামর্শ দেয়। নওয়াজিসের মতো সরল-মুর্খ সে নয়। তার ওপর তার দেহ রক্তমাংসে ভরপুর, ঠিক হোসেন কুলিখাঁ যেমনটি ছিলেন।

মাঝে মাঝে ভাবি, ঘসেটি বেগম যদি মেয়ে না হয়ে নবাব আলিবর্দির পুত্র হয়ে জন্মাতো, তাহলে দাদুর শত আদরের নাতি হলেও সিরাজ কখনো মসনদে বসতে সক্ষম হতো না। যে ক্ষুরধার বুদ্ধি, প্রভাব বিস্তারের যে অপরিসীম ক্ষমতা, যে নিদারুণ কুটিলতা আর নির্মমতা ঘসেটির রয়েছে, তা যে কোনো পুরুষকে সার্থক নবাব হতে সহায়তা করে।

কিন্তু ঘসেটি নারী, তাই রক্ষা। সে পুরুষ হলে বাংলার ইতিহাস অন্যরকম হতো। নবাব আলিবর্দি তাহলে শেষদিন পর্যন্ত মসনদে থাকতেন না নিশ্চয়ই। সাজাহানের মতো কোনো দুর্ভেদ্য দুর্গে বসে সঙ্কীর্ণ গবাক্ষের মধ্য দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে তাঁর জীবন শেষ হতো।

পুরুষ হতে হতে নারী হয়ে জন্মেছে ঘসেটি, তাই নারী হতে হতে পুরুষ হয়ে জন্মানো নওয়াজিসের প্রতি শুধু বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছু সঞ্চিত নেই তার হৃদয়ে। মনে হয়, প্রথম কৈশোরে সে যখন নওয়াজিসকে পছন্দ করে শাদি করেছিল, তখন তার মেয়েলি মনের পুরুষোচিত কাঠিন্য নওয়াজিসের পুরুষ-মনের নারীসুলভ মিষ্টত্ব দেখে ভুলেছিল। তারপর যখন ঘসেটির দেহ যৌবন-জলতরঙ্গে পরিপূর্ণ হলো, তখন তার ভুল ভাঙল। সে বুঝল, তার দেহ-মনের পরিতৃপ্তির জন্যে আরও

নিষ্ঠুর নির্মম শক্তিশালী পুরুষের প্রয়োজন।

মতিঝিলের প্রাসাদ থেকে এক গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ছায়া পক্ষবিস্তার করে বাংলার সৌভাগ্য সূর্যকে ধীরে ধীরে গ্রাস করার চেষ্টা করছে, সিরাজের মুখ দেখে সেকথা স্পষ্ট অনুমান করি। মুখে সে কিছু বলে না, কিন্তু অন্তরে সে প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, তার মস্ত প্রমাণ হলো এই যে, ফৈজীকে এখনো পর্যন্ত বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেনি। সৈয়দ মহম্মদ খাঁর ঘন-ঘন হীরাঝিল পরিদর্শনকে সে অস্বাভাবিক বলে মনে করতে পারেনি।

তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী সিরাজের দৃষ্টি এড়িয়ে এ সমস্ত ঘটনা কখনোই ঘটতো না, যদি তার চিত্ত স্থির থাকতো। বুঝলাম, বাংলার মসনদ নিয়ে তার মনে ঝড় বইছে। হারেমের বাইরে যাদের চিরকাল বন্ধু বলে, আত্মীয় বলে জানে, তাদের ওপর এক ঘোর অবিশ্বাস তার মন ছেয়ে ফেলেছে—সে হাঁপিয়ে উঠেছে। তাই মনকে যেখানে মেলে দিয়েছে, সেখানে আর একই বিষয়ে দেখতে সে চায় না। হারেমে সে শান্তি চায়। তাই দুর্বহ চিন্তাভাবের মধ্যেও ফৈজীর কৃত্রিম হাসিতে এখনো সে মুগ্ধ, বিগলিত হয়। আগের মতোই হীরাঝিলের জলাশয়ে গভীর রাত পর্যন্ত এখনো তার বজরা ভাসে। সেই বজরা থেকে ফৈজীর নূপুরধ্বনি ভাসতে ভাতে গঙ্গার ডিঙি নৌকার মাঝি-মাল্লাদেব কানে গিয়েও পৌঁছায়। বাইরের কাঠামোটুকু ঠিকই বজায় রয়েছে, কিন্তু ভেতরে মস্ত ফাটল। বাইরে আর ভেতরে সিরাজ সর্বস্বান্ত হতে বসেছে।

ভেবে ভেবে রাত্রে নিদ্রা নেই আমার। মেয়েটার ফুলের মতো ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে তারই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে একের পর এক বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দিই।

ফৈজীর কথা সিরাজকে শত চেষ্টাতেও বলতে পারিনি। সে বড় আঘাত পাবে। শুধু আঘাত নয়, এমন কোনো কাণ্ড সে করে বসবে, যা হোসেন কুলিখাঁর মৃত্যুর চাইতেও ভয়ঙ্কর।

তবু ইচ্ছে করেই একদিন সিরাজের চলার পথের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালাম। ফৈজীর ঘরের দিকে যাচ্ছিল সে। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। অবাক হলো। এভাবে কখনো তার পথের মধ্যে এসে আমি দাঁড়াইনি। বিশেষ করে তার তনুমন যখন শুধু ফৈজীকেই চাইছে। কিন্তু এক্রামউদ্দৌলার মৃত্যুতে একদিনের জন্যেও আমাদের পূর্বের সম্পর্কের যেটুকু উন্নতি হয়েছিল তাতে আমার সাহস বেড়েছে। কারণ, সিরাজের মনটা বহুদিন পরে সেদিন আবার স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছিল আমার কাছে।

'কিছু বলতে চাও, লুৎফা?'

'তেমন কিছু নয়, পরেই বলবো।'

'না, এসেছো যখন বলো।'

ফৈজীর কথা নয়, মতিঝিলের কথা বলার জন্যে প্রস্তুত হই। সেখানে রাজবল্লভ আর জগৎশেঠের প্রতিদিনের জলসা আমার ভালো লাগেনি। তবু সিরাজকে স্পষ্ট বলতে সঙ্কোচ হয়। সে হয়তো ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেবে, কিংবা বিরক্ত প্রকাশ করবে, এসব ব্যাপারে আমার মতো সামান্য নারীর মাথা ঘামানোর জন্যে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে অধৈর্য হয়, 'বলছো না কেন?'

ঢোক গিলে বলি, 'বলছিলাম মতিঝিলের কথা।'

'কি হয়েছে মতিঝিলে?'

'জগৎশেঠ আর রাজবল্লভ সেখানে যাতায়াত করেন শুনেছি। এটা কি ভালো?'

'আশ্চর্য!'

'ক্ষমা করবেন, নবাব। সন্দেহ হলো, তাই না বলে থাকতে পারলাম না। কিছুই তো বুঝি না।'

'তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি বোঝো। তাই অবাক হচ্ছি।'

বিদ্রূপ করছে নিশ্চয়ই। তার সামনে থেকে সরে যেতে পারলেই বাঁচি। বলি, 'আমি যাই, নবাব।'

'না, শোনো।'

যেতে গিয়ে থেমে গেলাম। পা কাঁপতে শুরু করলো। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করতে লাগলাম, এইবার সে রাগে ফেটে পড়বে। কী কুক্ষণেই যে এত কথা বলতে গিয়েছিলাম, তাও আবার সে যখন ফৈজীর কাছে যাবার জন্যে ছুটছে।

কিন্তু রাগের লক্ষণ দেখলাম না তার চোখে-মুখে। আমার কাছে এগিয়ে এসে সে আমার কাঁধের ওপর তার ডান হাত রেখে বলে, 'তোমার দুটো চোখ ছাড়াও আর একটা চোখ আছে, লুৎফা। সে-চোখ সবার থাকে না। নবাব-বাদশাদের সে-চোখ থাকা ভাগ্যের কথা।'

এ তো বিদ্রূপ নয়। তার কথায় আর স্পর্শে অবশ হয় আমার দেহ-মন। শুধু মাথা নীচু করে প্রাণভরে আস্বাদ করি তার স্পর্শসুখটুকু। কতদিন সে নিজে থেকে আমার কাঁধে হাত দেয়নি এভাবে।

'লুৎফা।'

'বলুন নবাব'।

'তুমি ঠিকই ধরেছো। এক্রামের ছেলেকে ওরা নবাব করতে চায়। কলকাতা আর কাশিমবাজারে ইংরেজদের কাছে খবর পাঠিয়েছে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে। তারা নাকি রাজিও হয়েছে।

'কী সাংঘাতিক?' আর্তনাদ করে উঠি।

'সাংঘাতিক কিছুটা বৈকি। তবে, এ জাতীয় চক্রান্ত সব নবাবের জীবনেই আসে। ঘাবড়ালে তো চলবে না।'

'তবু এত জেনেশুনেও চুপ করে আছেন আপনি?'

'কারণ আছে। অনুমান করতে পারো নিশ্চয়ই।'

'শেঠ আর রাজাকে ঘাঁটাতে চান না।'

'সাবাস্!' সিরাজ আমার দুই কাঁধের ওপর তার দুই হাত বিস্তৃত করে দিয়ে বলে, 'ঠিখ ধরেছো। কিন্তু আরও একজন রয়েছে, সেখানেই বিপদ।'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকি।

সে বলে, 'এবার অনুমান করতে পারবে না।'

সত্যি অনুমান করতে পারি না।

সিরাজ বলে, 'আরব দেশের নবাবের রক্ত যার ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে।'

'কে সে?'

'মহামান্য মীরবক্সীকুল।'

'মীরজাফর?'

সিরাজ শুধু মাথা ঝাঁকায়।

কিছুক্ষণ পরে বলি, 'তবু এ চক্রান্ত ভেঙে দেওয়া যায়, নবাব।'

'হ্যাঁ জানি, তাই করবো।'

'ঘসেটি বেগম.....'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঘসেটি বেগমকে মতিঝিল থেকে সরিয়ে আনবো। সে থাকবে আমারই হীরাঝিলে আমার চোখের সামনে। বড় বেশি লোভ তার। এক্রামের বাচ্চাটাকে নামে নবাব করে ক্ষমতালাভের আশা তাকে পেয়ে বসেছে। এত বেশি আশা করা ভালো নয়।'

সিরাজ আমার কাঁধ থেকে হাত দুটো তুলে নেয়। কাঁধ ব্যথা করে। অন্যমনস্ক হয়ে বড় বেশি ভর

দিয়েছিল সে। ফৈজীর ঘরের দিকে না গিয়ে সে ফিরে যায় নিজের ঘরে। তার আজকের বৈকালের আনন্দ আমার জন্যে মাটি হলো।

নওয়াজিস মহম্মদ খাঁ মারা গেল।

এক্রামকে আর একা থাকতে হবে না। নওয়াজিসকেও আর তার কবরের পাশে মাটি আঁচড়াতে দেখা যাবে না পাগলের মতো। জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটির পাশে সেও আশ্রয় নিল। ছেলেবেলায় বাপ-মায়ের স্নেহ সে পেয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু জীবনের বাকি সময়টা তার কেটেছে নিদারুণ অভিশাপের মধ্যে। তার তৃষিত হৃদয় আজীবন মরল শুধু ছট্‌ফট্ করে। স্ত্রীর ভালোবাসা কখনো সে পায়নি। কর্মচারীদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেনি সে। তার জীবন-মরুভূমির একমাত্র মরূদ্যান ছিল এক্রাম। সে-মরূদ্যান যখন শুকিয়ে গেল, তখন সব অবলম্বনই সে হারিয়ে ফেললো।

নওয়াজিসের দেহ মতিঝিলের শীতল মাটির নীচে গিয়ে খুবই শান্তি পেয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও শান্তি পেল বোধহয় ঘসেটি নিজে। জীবনের একটি অযাচিত বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো।

তার স্বস্তির কথা ভেবে মনে মনে কৌতুক অনুভব করি। জানি, বেশিদিন আর তাকে মতিঝিলে বাস করে সর্বনাশকর চক্রান্তে লিপ্ত থাকতে হবে না। সিরাজ ইতিমধ্যেই মতি স্থির করে ফেলেছে। অবসর মতো একটা দিন দেখে সে ঘসেটিকে হীরাঝিলে চলে আসবার জন্যে জানাবে আমন্ত্রণ। সে আমন্ত্রণ যদি ঘসেটি প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে সামান্য একটু শক্তিপ্রয়োগ। শক্তিপ্রয়োগ করতে হতো না যদি ঘসেটির টোপের নবতম মৎস্য মীর নজরালির উদয় না হতো ইতিমধ্যে। রাজবল্লভের চেয়েও তার আদর নাকি এখন অনেক, অনেক বেশি মতিঝিলে। রাজবল্লভের বেলায় কুর্নিশ, আর নজরালির বেলায় কদমকেশী--নফর আর জারিয়াদের প্রতি কড়া হুকুম ঘসেটির।

যোদ্ধা বলে নজরালির খ্যাতি আছে। সিরাজ বলেছিল, সামান্য কিছু সৈন্যও সে নাকি জমা করে রেখেছে মতিঝিলে। কথাটা যদি সত্যি হয় তাহলে বুঝতে হবে, নজরালি শুধু যোদ্ধাই। ধূর্ততা বলে কিছু নেই তার মধ্যে। কিংবা এও হতে পারে যে, সে অতিরিক্ত ধূর্ত, ঘসেটির মন রেখে যতদিন মধুপান করা যায়। সেটাই সম্ভব। কারণ, নিজে যোদ্ধা হয়ে তার পক্ষে সিরাজের পরাক্রম না জানা অসম্ভব।

মতিঝিল আক্রমণ যদি অনিবার্য হয়ে ওঠে, তাহলে দেখা যাবে, সে-ই সর্বপ্রথম সিরাজের পায়ের ওপর এসে পোষা কুকুরের মতো লুটিয়ে পড়েছে। ঘসেটি হীরাঝিলে চলে এলে মধুপান করা যখন আর সম্ভব হবে না, তখন কেন শুধু শুধু নবাবের সঙ্গে শত্রুতা করা। বিশেষত যে নবাব শৌর্য, বীর্য আর পরাক্রমে অসাধারণ। সিরাজের বাহুবল শত্রুদের জানতে বাকি নেই। তাই তলে তলে এত আয়োজন। সে যদি সরফরাজ হতো, তাহলে এই সমস্ত গোপনীয়তার প্রয়োজন হতো না কখনই।

দেশের যাঁরা মাথা, যাঁদের হাতে দেশের চাবিকাঠি, তাঁরা সকলে সিরাজের বিপক্ষে থেকেও সহজে কিছু করতে পারছেন না। মীরজাফর মীরবক্‌সীকুল না হয়ে আজ মোহনলাল যদি সে পদে থাকতেন, তাহলে জগৎশেঠ আর রাজবল্লভ কেঁচোর মতো মাথা নীচু করে থাকতো। ইংরেজরা তাহলে এতদিনে জাহাজে গিয়ে উঠতো, কিংবা সমুদ্রে ডুবতো।

নিজের শয়নকক্ষে মেয়েটিকে নিয়ে খেলা করছিলাম, আর এসব কথা ভাবছিলাম। হামিদা হন্তদন্ত

হয়ে ছুটে এলো।

'কি হয়েছে, হামিদা?'

'নবাব আপনাকে ডাকছেন।' তার চোখে-মুখে ভীতির চিহ্ন পরিস্ফুট।

'তিনি চেহেল-সেতুন থেকে ফিরলেন কখন?'

'এই মাত্র।'

'এ সময়ে তো ফেরেন না তিনি। কোথায় আছেন?' মেয়েটিকে ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করি।

'ফৈজী বেগমের ঘরে।'

'সেকি! সেখানে আমাকে যেতে বলেছেন? ঠিক বলছো তো?'

'হ্যাঁ, বেগমসায়েবা।'

'কিন্তু সেখানে কেন যাবো?'

'ফৈজী বেগম ঘরে নেই।'

'নেই!' আমার পা কাঁপতে শুরু করে। তার সেখানে না থাকার গূঢ় কারণ রয়েছে। যদি সত্যি হয়, তাহলে ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটে যাবে অতি শিগ্‌গির। কেউ রোধ করতে পারবে না। ফৈজীর ঘরে এখন গেলে সিরাজ হয়তো আমাকেই হুকুম করবে তাকে খুঁজে বার করার জন্যে। আমি তা পারবো না—কিছুতেই নয়। আমি অনুমান করতে পারি, ফৈজী এখন কোথায় রয়েছে, কার সঙ্গে রয়েছে। অনুমান করতে পারি বলেই আমি নবাবের হুকুম তামিল করবো না।

নানান কথা ভাবতে ভাবতে ঘর ছাড়তে আমার দেরি হয়ে গেল। বাইরে সিরাজের পায়ের শব্দ পেলাম।

'হামিদা মেয়েটাকে নিয়ে শিগ্‌গির দরজার আড়ালে যা।'

হামিদা লুকোতেই সিরাজ প্রবেশ করে। তার চেহারার বর্ণনা আমি দিতে পারবেনা না। তবে এইটুকু বলতে পারি, অমন ভয়ঙ্কর মুখের চেহারা জীবনে দেখিনি।

'তুমি নিশ্চয়ই জানো, লুৎফা?' নবাব চেঁচিয়ে ওঠে।

'কিসের কথা বলছেন, নবাব?' চোখে-মুখে যতটা পারি অজ্ঞতা ফুটিয়ে তুলি। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অভিনয় আজ করতে হবে।

'ফৈজী কোথায় রয়েছে?'

'তার ঘরে নেই?'

'না নেই। আর এ সময় সে কোনোদিন থাকে না, সে খবরও সংগ্রহ করেছি। কোথায় যায় সে? বেগম হয়ে আমার অজ্ঞাতে কোথায় যায় সে? হীরাঝিলের বাইরে?' নবাব আমার জবাবের জন্য অপেক্ষা করে।

'আমি তো কিছু জানি না।'

'তুমি সব জানো। লুৎফা বেগমের চোখের আড়ালে দেশে কিছু ঘটতে পারে না, হীরাঝিল তো দূরের কথা।'

পা দুটো বড় বেশি কাঁপতে শুরু করে। ধীরে ধীরে বসে পড়ি শয্যার ওপর। একটা কিছু জবাব সিরাজকে দিতেই হবে। জবাব না শুনে সে যাবে না। মিথ্যে বলে যে বিদায় করবো, সেরকম মূর্খ সে নয়। অভিনয় করার দুরাশা ছাড়তে হলো। ধীরে ধীরে বলি, 'হীরাঝিলের বাইরে সে কখনোই যায় না। গেলে আমি জানতে পারতাম, নবাব।'

সিরাজ একটু সন্তুষ্ট হলো বলে মনে হয়। তার চোখ-মুখের উত্তেজনা যেন অনেকটা প্রশমিত। ছোট্ট একটা চৌকির ওপর তার ডান পা তুলে দিয়ে বলে, 'কোথায় তবে সে?'

'হীরাঝিলের ভেতরেই কোথাও আছে নিশ্চয়।'

'খুঁজে দেখেছি সব, নেই।'

মনে মনে বলি, সব খোঁজা হয়নি। একসময় আলিবর্দিকে যে প্রকোষ্ঠে আটকে রেখে অর্থ আদায় করা হয়েছিল, গোলকধাঁধার সেই ঘর কয়টি এখনো বাকি রয়েছে। ভালোবাসার পাত্রীকে সেই ঘরখানার রহস্য জানাতে যে তুমি বাদ রাখোনি সিরাজ।

মুখে বলি, 'তাহলে বোধহয় ফৈজী বেগম আপনার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে মজা করে।'

'লুৎফা!'

তার চীৎকারে ক্রোধ ফুটে উঠল না। বরং অসহায় আর্তনাদ বলে মনে হলো সে চীৎকার।

'মাফ্ করবেন, নবাব। আমার হয়তো ভুল হয়েছে।'

'ভুল নয়। তুমিই লুকোচুরি খেলে মজা দেখছো। মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছো তুমি।'

স্তব্ধ হয়ে যাই।

সিরাজ বলে, 'আসলে বলো ফৈজী কোথায় তা তুমি প্রকাশ করবে না। যে কোনো কারণেই হোক্ বলতে তুমি ভয় পাচ্ছো। কিন্তু সিরাজকে কি এখনো চিনলে না? ফৈজীর ধরনধারণ অন্যরকম মনে হতো বলেই আজ আমি অসময়ে ফিরে এসেছি। যখনই তার কাছে যাই, মনে হয় সে যেন ক্লান্ত। আমার সম্মান রাখার জন্য শুধু নিষ্প্রাণ পুতুলের মতো মন যুগিয়ে যায়! তাই সন্দেহ হয়েছিল। সিরাজকে সব কিছুতে ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু মনের ব্যাপারে ফাঁকি দেওয়া বড় কঠিন। সে ফাঁকি শুধু তুমি দাওনি, তাই চিরকাল তুমি লুৎফাই আছো।'

'হ্যাঁ, হীরাঝিল থেকে তাড়িয়ে দেননি বটে।'

'অভিমান করার যথেষ্ট কারণ তোমার রয়েছে। কিন্তু সব কিছু লক্ষ্য করে একটা জিনিস তোমার চোখ এড়িয়ে যায় কেন, লুৎফা? নবাব সিরাজউদ্দৌলা সব জায়গায় মাথা উঁচু করে থাকলেও, তোমার কাছে যখন আসে মাথা নীচু করেই আসে।'

'বছরে একবার দু'বার এলে সেভাবেই আসেন বটে। তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ বৈকি।'

'অভিমান করো না। এটা নবাব সিরাজের দুর্ভাগ্য সে কিমা-পোলাও ছেড়ে সে শরাবের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে। তাই তার এই দুর্দশা। কিমা-পোলাও নেশা ধরায় না বটে, কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে সেটারই দরকার।'

'নবাব এসব জানেন দেখছি!'

'জানি লুৎফা, সবই জানি। তবু নিজেকে সামলাতে পারি না। এবার বোধহয় সামলাবার দিন এসেছে। তুমি আমার জর্জ-বিরিঞ্জু, খিচ্‌রি, সেব-বিরিঞ্জু—তুমি আমার কিমা-পোলাও, সওলা—তুমি আমার দম-পোক্ত, কালিয়া-কাবাব, দুনিয়াজা। ফৈজী শরাব—শুধু শরাব। তাকে আমি খুঁজে বার করবোই। শরাবের পাত্র একদিন চূর্ণ করেছিলাম মনে আছে? আজ আবার সেদিন ফিরে এসেছে। তোমাকে আর বলে দিতে হবে না, কোথায় রয়েছে সে। আমি বুঝতে পেরেছি। হীরাঝিল আমার নিজের তৈরি। তার অতি গোপন স্থানও আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত। সে ঘর ছেড়ে চলে যেতে চায়।

'সিরাজ।' বহুদিন পরে তার গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রাখি। তার নাম ধরে ডাকি। চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়ায় আমার। চেপে রাখার চেষ্টা করি না।

'কি লুৎফা?'

'তুমি জানো সে কোথায় রয়েছে?'

'জানি বৈকি, তবে এতটা আশা করিনি।'

'তাকে ক্ষমা করো, সিরাজ।'

'না।'

'তাকে দূর করে দাও হীরাঝিল থেকে—বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সীমানার বাইরে।'

'তাহলে সত্যিই? কে রয়েছে তার সঙ্গে, লুৎফা?'

'সৈয়দ মহম্মদ খাঁ।'

সিরাজ শক্ত হয়ে ওঠে।

'তাকে ক্ষমা করো, সিরাজ।'

'না-না, ক্ষমা করতে পারবো না। তুমি এতদিন বলোনি কেন?'

'তুমি ব্যথা পাবে বলে।'

'আশ্চর্য! বেগম হয়ে বড় ভুল করেছো, লুৎফা। আমি যদি কৃষক হয়ে তোমাকে পেতাম, তাহলে বাংলার মসনদও চাইতাম না।'

'ক্ষমা করলে তো ফৈজীকে?'

'কথা দিতে পারি না।' সে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

হামিদা শিশুটিকে নিয়ে আড়াল থেকে বার হয়ে আসে। সে বলে, 'আমিও সব জানতাম, বেগমসায়েবা। ফৈজী বেগমের জন্যে এত করে বলা আপনার ভুল হলো।'

'ভুল হয়নি হামিদা। অনেকদিন থেকে তো নবাব-পরিবারে আছো। চিরকাল হিংসা আর প্রতিহিংসাই দেখলে। মনও তোমার সেইভাবেই তৈরি হয়েছে। একটু ক্ষমা করতে ক্ষতি কি?'

মেয়েটিকে শুইয়ে দিয়ে হামিদা বার হয়ে যায়। হামিদার কোলেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

সিরাজের কথাগুলো মনে মনে রোমন্থন করি। সেও শান্তির একটা ছোট্ট নীড় চায়। মসনদ ছেড়ে দিয়ে কৃষক হতে চায়, যদি কেউ তাকে প্রাণভরে ভালোবাসে। মসনদের চারিদিক ঘিরে অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্রের জন্যে তার কবি-মন বিষাক্ত।

আমিও একসময়ে বেগম হতে চাইতাম না। সাধারণ সৈনিকের বধূ হয়ে ছোট্ট সুখ আর ছোট্ট দুঃখে জীবন কাটিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখতাম। স্বপ্ন দেখতাম খড়ে-ছাওয়া কুটিরের, আর একটি পুরুষের একান্ত নির্ভরশীল প্রেমের। কোথা দিয়ে কি সব হয়ে গেল। পুরুষ-হৃদয়ের ভালোবাসা পেয়েছি, কিন্তু একেবারে একান্ত কি? আর একান্ত হলেও ভালোবাসা সর্বদা আমাকে ঢেকে রাখে না, শুধু অসময়ে আমার কাছে আশ্রয় আর সান্ত্বনা চায়। তাতে আমার বুভুক্ষু মন যে ভরে না। বাকি সময়টা যে আমি কেঁদে মরি।

সিরাজও হয়তো এই রকম একটা কিছু ভাবে। কৃষক-পরিবারে জন্মালে মনকে বিক্ষুব্ধ করার মতো নানা উপকরণ এসে জুটতো না। ফৈজীর নাগাল পাওয়া যেত না। নিশ্চিন্তে আমারই মুখের দিকে চেয়ে জীবন কাটাতে পারতো। কিন্তু সিরাজ কৃষক নয়, নবাব। সে চায় নবাবীর অপরিসীম ক্লান্তি অপনোদনের জন্য ফৈজীর মতো এক তীব্র নেশা। আর সবার ওপর সে প্রেমিক, তাই পদে পদে আঘাত পায়। ফৈজীর মন যে প্রেমিকার মন নয়।

সহসা চীৎকার শুনে দরজার দিকে এগিয়ে যাই। হামিদা এসে বলে, 'সর্বনাশ হয়েছে, বেগমসায়েবা।'

ফৈজীকে পাওয়া গিয়েছে?'

'হ্যাঁ, সৈয়দ মহম্মদ খাঁকেও?'

'জানি।'

'নবাব ক্ষেপে গিয়েছেন।'

'জানি।'

'যাবো। সৈয়দ খাঁ এখনো আছেন?'

'না, নবাব তাঁকে ছেড়ে দিয়েছেন।'

'কিছুই বলেননি তাঁকে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

জানতাম। ফৈজীর ওপরই নবাবের রাগ। আর রাগ নিজের অক্ষমতার ওপর। সাধারণ পুরুষের মতো সে যে সৈয়দের ওপর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠবে না, এ জানা কথা। সিরাজ ঘসেটি নয়।

হামিদাকে সঙ্গে নিয়ে যাই গোলকধাঁধার কাছে। সিরাজ একা দাঁড়িয়ে রয়েছে বাইরে। ভেতরে থেকে ফৈজী চীৎকার করে তাকে গালাগালি দিচ্ছে। নিজের কবর নিজে খুঁড়ছে সে। ভুলে গিয়েছে যে, সিরাজ তার প্রেম-ভিখারী হলেও সে বাংলার নবাব।

'শুনছো লুৎফা।' কাছে গিয়ে দাঁড়াতে সিরাজ বলে। অদ্ভুত শান্ত তার কণ্ঠস্বর। কোনোরকম উত্তেজনা নেই। এত শান্তভাব ভালো নয়।

আমি বলি, 'ফৈজী, চুপ করো। অন্যায় করেছো, তার জন্যে ক্ষমা চাও নবাবের কাছে।'

'ও, তুমিও এসেছো? এতদিনে লুৎফা বেগমের দিকে নজর পড়েছে নবাবের? ভালো, খুব ভালো।'

'পাগলামি করো না, ফৈজী। তুমি মোহনলালের বোন। শত অপরাধ করলেও ক্ষমা পেতে পারো।'

'চুপ কর্ বাঁদী, তোর কথা শুনতে চাই না।'

আমার গা গরম হয়ে ওঠে তার কথায়। আমি যে এককালে জারিয়া ছিলাম, সেকথা মনে করিয়ে দিতে চায় ও।

এবার সিরাজ বলে, 'আর তুমি নর্তকী। সম্মানের আসনে বসিয়েছিলাম, অথচ সে সম্মান রাখলে না।'

'নর্তকীদের স্বভাবই তাই, নবাব। ভুলে যাচ্ছো কেন যে, সে কারও বন্দী নয়। আমি সেধে আসতে চাইনি। যেচে আমাকে দিল্লি থেকে নিয়ে এসেছিলে। দয়া করে এসেছিলাম। নইলে তোমার মতো হাজারটা নবাবকে কিনতে পারে এমন লোকেরা আমার পা ধরে তুষ্ট করতো।'

আমি চেঁচিয়ে উঠি, 'ফৈজী, চুপ করো।'

কিন্তু সে তখন উন্মাদ। ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জা-শরমের আর বালাই নেই। তার ওপর সিরাজ তাকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রেখেছে।

'না, চুপ করবো না। জারিয়ার হুকুম আমি মানি নে। আমাকে হীরাঝিলের বাইরে দিয়ে এসো, তবে চুপ করবো।'

সিরাজ বলে, 'তোমার অপরাধের ভালো রকম কৈফিয়ত না দিলে ছাড়তে পারি না। বাংলার নবাব দিল্লির বাদশার তুলনায় সামান্য হলেও এখন তুমি তারই আওতায়।'

'কিসের কৈফিয়ত? আমি কোনো অন্যায় করিনি।'

'আমার মন নিয়ে তুমি ছিনিমিনি খেলেছো।'

'নবাব ভুলে যাচ্ছো কেন, ওটা আমাদের ব্যবসা।'

'তুমি বেশ্যা।'

'ঠিক বলেছেন, কিন্তু নবাবের মা তো বেশ্যা ছিলেন না। তিনি কেন হোসেন কুলিখাঁর সঙ্গে....

'ফৈজী!' সিরাজ রাগে থরথর করে কাঁপতে থাকে।

'সত্যি কথা বলতে ভয় পাই নে। তাঁর কেচ্ছা শুনলে আমারও লজ্জা হয়, নবাব।'

'ফৈজী!'

'ভয় দেখাচ্ছো কাকে, নবাব? বেশ্যা কারও ঘরে বন্দী থাকে না।'

'কিন্তু তুমি বন্দী থাকবে। তোমার সুন্দর শরীরের মাংস গলে পচে যে-কঙ্কাল বার হয়ে পড়বে, সেই কঙ্কালও বন্দী থাকবে এই হীরাঝিলে। হীরাঝিলের মধ্যেই সে-কঙ্কাল একদিন মাটির সঙ্গে মিশে যাবে।'

হঠাৎ দেখতে পাই, সিরাজের ইঙ্গিতে বাগিচা থেকে চার-পাঁচজন লোক ছুটে এসে ফৈজীর বন্দী-ঘরের সামনে দেওয়াল তুলে দিতে শুরু করে। ভয়ে আমার শরীর হিম হয়ে আসে। প্রথম থেকে সিরাজ তাহলে সব ঠিক করেই রেখেছিল। এতক্ষণ শুধু ফৈজীকে বাঁচবার সুযোগ দিচ্ছিল, আর সে হয়তো আমারই অনুরোধে।

সিরাজ যে সাংঘাতিক একটা কিছু করবে আমি জানতাম। কিন্তু সেটা যে এত অমানুষিক হবে কল্পনাও করিনি। আমি তার হাত চেপে ধরে বলি, 'নবাব, এ শাস্তি ওকে দিও না।'

'শুধু এই কথাটা তোমার আমি রাখতে পারবো না। এরপর থেকে তোমার সব কথারই মর্যাদা আমি রাখবো।'

'নবাব, ওকে ছেড়ে দাও, ও দিল্লি চলে যাক।'

'পাগল। ও ফিরে গেলে দু' মাসের মধ্যেই মুর্শিদাবাদ আক্রান্ত হবে।'

'তাহলে ওকে হোসেন কুলিখাঁর মতো হত্যা করো।'

'না, ও বন্দী থাকবে হীরাঝিলে। চিরকাল.....'

'নবাব।'

'ক্ষমা করো লুৎফা, শেষবারের মতো ক্ষমা করো।'

আমি ছুটে পালিয়ে আসি সেখান থেকে। পেছনে ফৈজীর ভীত আর্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। সে বুঝতে পেরেছে, বার হবার পথ চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে। নবাবের কাছে আকুল মিনতি জানাচ্ছে এতক্ষণ পরে। জানি, তার সব আকূতি বৃথা হবে.....সব বৃথা!

নিজের ঘরে গিয়ে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম। এমন সময় সিরাজ এসে প্রবেশ করে। কান্নায় ভেঙে পড়ি আমি, 'কেন এই নিষ্ঠুর কাজ তুমি করলে, নবাব?'

'আমারও কম কষ্ট হচ্ছে না, লুৎফা। সে মোহনলালের বোন।'

'শুধু তাই, আর কিছু না?'

'ভালোও হয়তো বাসতাম। কিন্তু তার চেয়ে নেশাটাই বড় ছিল। তুমি নেই, একথা ভাবতে পারি না। অথচ ফৈজী নেই, বেশ ভাবতে পারছি।'

'সে হয়তো এখনো বেঁচে রয়েছে। নিশ্বাস নেবার মতো যথেষ্ট বাতাস সেখানে অনেকক্ষণ থাকবে।'

'হয়তো থাকবে।'

'ওকে মুক্ত করে দাও।'

সিরাজ নিজের হাত দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে নিজের চুল টেনে বলে, 'না-না, কখনোই না।'

গবাক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। গঙ্গার জল রক্তবর্ণ, আকাশও লাল চারিদিকে শুধু লাল.....ফৈজীর রক্ত। অন্যদিন হলে মুগ্ধ হতাম, আজ ভীত হলাম। সিরাজ আর আমার মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যবধান আজ অপসারিত হয়েছে, অথচ আনন্দিত হতে পারছি না। সিরাজের কাজ শত নিষ্ঠুর হলেও খানিকটা চোখের জল ফেলে আমার নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হতে পারলাম কই?

হীরাঝিলের বাগিচার মধ্যে দিয়ে মোহনলালের হেঁটে আসতে দেখে সিরাজকে বলি সে-কথা।

'হ্যাঁ, তাকে আসতে বলেছিলাম।'

'তাঁকে তুমি কি বলবে, নবাব?'

'সত্যি কথা সব বলবো।'

'তুমি বন্ধু হারাবে। হাজার হলেও সে ফৈজীর ভাই—একই মায়ের পেটের ভাই।'

'তবু বলতে হবে লুৎফা, উপায় নেই।'

সিরাজের সঙ্গে আমিও পর্দার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই। বাইরে তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। একে-একে জ্বলে উঠছে হীরাঝিলের আলো। ঝিলের জল সে আলোয় চক্‌চক্ করছে, যেন ফৈজীর জন্যে কাঁদছে। ফৈজীকে নিয়ে বজরা আর ঝিলের জলকে মাতাল করে তুলবে না। বজরাটি এককোণে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ব্যথায় মূক যেন। নূপুরবাঁধা পায়ের তালে সে আর কখনো নাচবে না।

'আমাকে ডেকেছিলেন, নবাব?' কুর্নিশ করে মোহনলাল বলে।

'হ্যাঁ, বিশেষ প্রয়োজনে ডেকেছি, মোহনলাল। তোমাকে আজ যে খবর শোনাবো. তা না বলতে পারলেই জীবনে আমি সব চাইতে খুশি হতাম।'

'বলুন।'

'কিন্তু সে তো এখানে বলা যাবে না, আমার সঙ্গে একটু ওদিকে আসবে?'

গোলকধাঁধার কাছে মোহনলালকে নিয়ে যাবে সিরাজ। তাড়াতাড়ি সবার অলক্ষ্যে আগে থেকে আমিও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হই।

মোহনলালকে নিয়ে এসে সিরাজ বলে, 'মোহনলাল, আমাকে ক্ষমা করো।'

'সে কি নবাব!' —মোহনলালের দৃষ্টিতে বিস্ময়।

'হ্যাঁ। তুমি শুধু আমার সেনাপতি নও, তুমি আমার বন্ধু। নবাব হয়ে তোমার ওপর হুকুম চালাতে পারি বটে, কিন্তু নবাবী আওতার বাইরে অনেক কিছু আছে। তোমার বোনকে আমি যখন দিল্লি থেকে নিয়ে আসতে চাই, তুমি বার বার আমাকে নিষেধ করেছিলে। তখন তোমার কথায় কান দিইনি, বরং বিরক্ত হয়েছিলাম তোমার ওপর। আজ বুঝছি, তুমি যা বলো অনেক ভেবেই বলো, যা করো আমার মঙ্গলের জন্যই করো। ক্ষমা করো আমাকে।'

'এতে ক্ষমার কি আছে, নবাব?'

'আছে। সেদিন যদি তোমার কথা শুনতাম, তাহলে আজ তোমাকে এতবড় আঘাত পেতে হতো না। তুমি আমার মঙ্গল চেয়েছিলে, অথচ আমি তোমার সর্বনাশ করলাম।' সিরাজের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে।

'আপনার কথা কিছুই তো বুঝতে পারছি না, নবাব।'

'বোঝবার মতো করে বলতে আমার বাধছে: হয়তো আজ আমি তোমাকে হারাবো, তবু বলতেই হবে।'

'নবাব!' মোহানলালকে এবার বিচলিত বলে মনে হলো। সিরাজের কথায় হেঁয়ালির মধ্যেও তিনি আসল সত্য কিছুটা অনুমান করেছেন বোধহয়।

'ফৈজীকে আমি হত্যা করেছি।'

মোহনলাল একটু কেঁপে ওঠেন। তাঁর হাত-পা কেমন যেন শিথিল হয়ে যায়। কিন্তু অদ্ভুতভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন, 'উচিত কাজ করেছেন, নবাব। ওর ব্যভিচার আপনার দেশের অমঙ্গল ডেকে আনতো।'

'সে কি মোহনলাল, তুমি মানুষ!'

'যোদ্ধাদের সহজে বিচলিত হতে নেই, নবাব। তাহলে কোন্ ভরসায় আপনি আমাকে পাঁচ-হাজারী সেনাপতি করবেন?'

নিষ্ঠুর! পুরুষ মাত্রেই নিষ্ঠুর। ওরা সব পারে। নতুন ওঠানো দেওয়ালের ওপর হাত রেখে সিরাজ বলে, 'এরই পেছনে রয়েছে ফৈজী।'

'ভালোই হয়েছে।' মোহনলাল কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যান। অনেকক্ষণ তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসে। এতক্ষণে যেন তিনি প্রথম বুঝতে পারেন, প্রকৃত কি ঘটেছে। দু'হাত দিয়ে নতুন দেওয়াল আঁকড়ে ধরে সজোরে ঠেলতে থাকেন।

'ও কি করছো, মোহনলাল?'

ঝরঝর করে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে বাংলার সবচেয়ে সাহসী সেনাপতির। তিনি বলেন, 'ছেলেবেলায় ও আমার বড় অনুগত ছিল, নবাব। মা মারা গেলে আমিই ওকে কোলেপিঠে করে মানুষ করি। কতদিন আবদার করে কত জিনিস চেয়েছে, দিতে পারিনি বলে আমার বুক ফেটে যেতো। দেবার মতো যখন সামর্থ্য হলো আমার, তখন তো সব কিছু খুইয়ে বসে থাকল। চিরদিন দুঃখই পেলো ও।'

'মোহনলাল, ভেঙে ফেলছি দেওয়াল। এখনো হয়তো বেঁচে আছে সে! মোহনলাল.....'

'না-না, থাক্। ওখানেই থাক্।' ছুটতে ছুটতে চলে যান তিনি হীরাঝিল থেকে।

পর্দার আড়াল থেকে বার হয়ে এসে সিরাজের হাত ধরি।

'লুৎফা, সব কিছুর মুলে আমি।'

'না, ভাগ্য।'

সিরাজ মতিঝিল আক্রমণ করলো। ঘসেটি বেগম নবাবের সাদর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে। তার মতো সূক্ষ্মবুদ্ধির অধিকারিণীর পক্ষে সিরাজের মতলব বুঝতে কষ্ট হয়নি।

কিন্তু তার ভরসা নজরালি। সিরাজের বিরুদ্ধে সে বিন্দুমাত্র রুখে দাঁড়ালো না। বরং নবাবকে তুষ্ট করবার জন্যে নানা উপঢৌকন পাঠালো।

হীরাঝিলের একটি কক্ষ ঘসেটির জন্যে নির্দিষ্ট হলো। ভেবেছিলাম, রাগে আর লজ্জায় ঘসেটি হয়তো কোনো কাণ্ড করে বসবে, কিন্তু সিরাজ যখন নিজে বিচিত্র আয়োজনের মধ্যে হীরাঝিলে তাকে সাদর সংবর্ধনা জানালো, তখন তার মুখে হাসি ফুটতে দেখলাম।

আমাকে দেখতে পেয়ে কাছে এসে বললো, 'আমার দিন এতদিনে সত্যিই ফুরলো।'

'ও কথা বলছেন কেন?'

'আর কিছু করবার নেই আমার। ভাবছি কি করে সময় কাটাবো। আমি আমিনা নই, লুৎফাও নই। বেগম মহলের হাজারটা বেগমের মতোও আমি নই। হীরাঝিলে আমার অসম্মান হবে না জানি, কিন্তু তৃপ্তি পাবো না।'

'জানি ঘসেটি বেগম। আপনি নবাব আলিবর্দির পুত্র হয়ে জন্মালে বাংলার মসনদে সিরাজ বসতো না। আলিবর্দি তাঁর পুত্রের মধ্যেই নবাবের যোগ্য গুণাবলী খুঁজে পেতেন। হারেমের সুখ আর বিলাসিতায় তুষ্ট থাকা আপনার স্বভাবে নেই। আপনি চান বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র।'

ঘসেটি অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে থাকে। লজ্জিত হয়ে বলি, 'অমন করে কি দেখছেন?'

'না, কিছু না। ভাবছি তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা আদৌ নির্ভুল ছিল না।'

হেসে বলি, 'মতিঝিল আক্রমণের ব্যাপারে আমারও পরামর্শ ছিল?'

'এখন সে-কথা বিশ্বাস করি, তবু কি ঠেকাতে পারবে? বাইরে যে আগুন জ্বলছে।'

'সে আগুন কি নিভবে না?'

'খুব কঠিন।'

'আপনার পরামর্শ যদি পাই।'

'পরামর্শে সব সময় সব কিছু হয় না, লুৎফা। সিরাজের প্রতিটি নির্ভরযোগ্য লোক এখন মসনদের স্বপ্ন দেখে, যেমন আমি দেখতাম। কার ওপর বিশ্বাস করবে?'

চুপ করে থাকি।

ঘসেটি জিজ্ঞাসা করে, 'আমিনা কোথায়?'

'উনি তো এখানে থাকেন না। তবে আজ আসবেন শুনছি।'

'ও এখানে থাকলে ঝগড়া হবে। আমিনা একেবারে মেয়েমানুষ।'

বুঝলাম, ঘসেটির দিন সত্যিই শেষ হয়েছে, যেমন আলিবর্দির বেগমের দিন শেষ হয়েছে। যাঁর পরামর্শে একদিন বাংলা বিহার উড়িষ্যার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হতো, তিনি জীবিত থাকলেও এখন তাঁর কোনো কথারই দাম নেই। তেমনি ঘসেটির গুণাবলীও এখন নিষ্প্রয়োজন। হীরাঝিলের অনেক মেয়েমানুষের মধ্যে সেও একজন।

ঘসেটির সঙ্গে আমার কথোপকথনের কথা সিরাজকে বললাম।

সে বললো, 'একটু দেরিতে বুঝল ঘসেটি। সে আমার যা ক্ষতি করেছে অন্য কেউ তা করেনি।'

'কেন নবাব?'

'সে মসনদের স্বপ্ন না দেখলে জগৎশেঠ আর রাজবল্লভ কখনো হাতছাড়া হতো না। আর তারা আমার হাতে থাকলে মীরজাফর মাথা তোলার কথা ভাবতে পারতো না।'

'ইংরেজরা রয়েছে। তারা মীরবক্সীকুলের সহায় হতো।'

'ইংরেজ! জগৎশেঠ না থাকলে ইংরেজ সহায় হবে?'

'তাদের রণকৌশল অনেক ভালো শুনেছি।'

'কথাটা ঠিক। তবু তারা এদেশে আগন্তুক। এই তো শওকৎজঙ যুদ্ধ করতে আসছে। কই, সহায় হোক তো ইংরেজ? সাহস আছে?'

'শওকৎজঙ যুদ্ধ করতে আসছে?'

'হ্যাঁ, এইমাত্র সংবাদ পেলাম। নবাব হবার সাধ হয়েছে তার। সে সাধ ঘুচিয়ে দেবো।'

'কাকে পাঠালে তার বিরুদ্ধে?'

'মীরজাফরকে।'

'মীরজাফর!'

'চমকে উঠলে বলে মনে হলো।'

'হ্যাঁ, কথাটা অদ্ভুত শোনালো কিনা, তাই।'

সিরাজ হেসে বলে, 'কেন, মীরজাফর যুদ্ধ করতে পারে না?'

'খুব ভালো পারে। শওকৎজঙের সৈন্য হাতে পেলে আরও ভালো পারবে।'

'ভুল করলে, লুৎফা। বড় রকমের বিশ্বাসঘাতকতা করতে হলে ছোটখাটো ব্যাপারে নিজেকে একটু বেশি রকম বিশ্বস্ত বলে প্রমাণ করতে হয়। এ যুদ্ধে মীরজাফর সবচেয়ে বেশি বীরত্ব দেখাবে। তাই আমি নিশ্চিন্ত আছি। তবে তোমার কথাটা যে একেবারে ভাবিনি তা নয়। এর জন্যে তার সৈন্যের পেছনে মোহনলাল তার পাঁচ-হাজারি নিয়ে আত্মগোপন করে থাকবে।'

'মোহনলাল এর মধ্যেই কি সামলে উঠেছেন?'

'বড় গাছের ওপর দিয়ে কত ঝড়ঝাপটা যায়, তারা সামলেও ওঠে। বড় গাছ তো লতা নয় যে সামান্য ঝড়ে মাটিতে গড়াগড়ি যাবে।'

'কিন্তু বড় গাছ যে কতখানি দৃঢ় হতে পারে, মোহনলালকে না দেখলে, আমি বিশ্বাস করতাম না।'

'আমাকে দেখে?' সিরাজ মৃদু হাসে।

'না।' মুখ দিয়ে ফস্‌কে বার হয় কথাটা।

'আনন্দ হলো, লুৎফা। অন্য বেগম হলে বলতো, আপনি তো সবার ওপরে নবাব। আপনি গাছ নন, পর্বত। কী তোষামোদ?'

স্বস্তি পেলাম সিরাজের জবাব শুনে।

যুদ্ধে শওকৎজঙের নবাব হওয়ার সাধ ঘুচলো। মীরজাফরের অপূর্ব রণকৌশলে তার সৈন্য দাঁড়াতে পারেনি শুনলাম। তার পক্ষে শুধু অপূর্ব বীরত্ব দেখিয়েছে কোন্ এক শ্যামসুন্দর, কেউ চেনে না তাকে। সে নাকি জীবনে প্রথম যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিল। কিন্তু অনেক অভিজ্ঞ সৈন্য আর সেনাপতি অবাক হয়ে চেয়ে দেখেছে তার যুদ্ধ। মীরজাফরও দেখেছে। হয়তো পানাসক্ত আর ভীরু প্রভুর নির্বিকার আচরণ তার মনে প্রেরণা যুগিয়েছিল। নইলে এমন নাকি কখনো হতে পারে না। তবে তার বীরত্ব নিষ্ফলা হলো। প্রভুকে বাঁচাতে পারলো না, নিজেও বাঁচলো না।

শ্যামসুন্দরের কথা শুনে মোহনলালের কথা মনে হলো। শ্যামসুন্দর যুদ্ধ জানতো না, কিন্তু মোহনলাল যুদ্ধে পারদর্শী। সিরাজের দুর্দিন যদি তেমন আসে, তাহলে মোহনলালও এমনিভাবে লড়বে। সে থাকায় বুকে অনেক বল পাই। ফৈজী হত্যায় তাই আমি অতটা বিচলিত হয়েছিলাম। কিন্তু ভুল ভেঙেছে আমার। আদর্শকে অনুসরণ করার বেলায় এই যুবক বজ্রকঠিন। ফৈজী হত্যায় এটুকু প্রমাণিত হয়েছে যে, শত-সহস্র আঘাতেও আদর্শচ্যুত হবে না এই বীরপুরুষ।

ঘসেটি এসে বলে, 'রাজবল্লভ আর জগৎশেঠের মুখ ভার হয়েছে নিশ্চয়ই?'

'কেন?'

'এত বড় একটা সুযোগ নষ্ট হলো।'

'কিসের সুযোগ?'

'শওকৎকে নবাব করার।'

'তারা এর পেছনে ছিল নাকি?'

'হয়তো ছিল না। তবু শওকৎ নবাব হলে তাদের কপাল খুলতো। নিজেদের ইচ্ছেমতো নবাবকে চালাতে পারতো। সিরাজ বড় শক্ত ঠাঁই। তাকে বাগে আনা অসম্ভব। আমিই পারলাম না। সিরাজ হাতছাড়া হওয়াতেই তো ওদের এত রাগ।'

'ও!' আপন মনে ভাবি ঘসেটির কথা। তার চরিত্রের বোধহয় এতদিনে সত্যিই পরিবর্তন হয়েছে। নইলে এমনভাবে বলতে পারতো না সে।

'জাফরাগঞ্জের খবর জানো?' ঘসেটি হঠাৎ বলে।

'না তো।'

'সে কি! বাংলার বেগম হয়ে আসল খবরটা রাখো না, বেগমসায়েবা। সেখানে এখন যে জোর মজলিস চলেছে।

'কিসের মজলিস?'

'মীরজাফর যুদ্ধ থেকে ফিরে খুব তৎপর হয়ে উঠেছে। রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ এখন ওখানে দু'বেলাই যাতায়াত করছে।'

'কারণ?'

ঘসেটির মুখে বিচিত্র হাসি খেলে যায়, 'তাও কি বলে দিতে হবে? দেশের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করতে ব্যস্ত ওরা।'

'ষড়যন্ত্র করছে?'

'সাদা কথায় অর্থ তাই দাঁড়ায় বটে।'

'নবাব জানেন?'

'সিরাজ জানে না এমন কিছুই নেই। কিন্তু এখানে সে অনেকটা অসহায়।'

'তবে কি হবে?' অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘসেটির সামনে উদ্বেগ প্রকাশ করে ফেলি।

'অমন ব্যাকুল হয়ে আমাকে প্রশ্ন করা কি তোমার মানায়, বেগমসায়েবা? সিরাজকে বলো, আমি তো তোমাদের শত্রুপক্ষ। এতদিন তোমাদের বিরুদ্ধে ছিলাম বলেই না এখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে আমাকে।'

'নিজের লোকের কাছে থাকা বন্দীত্ব নয়, ঘসেটি বেগম।'

'তাই নাকি? তাহলে হীরাঝিলের জারিয়াদের মতো নিজের ইচ্ছেমতো বাইরে যাবার স্বাধীনতা আমার আছে?'

'সেটা নবাবকেই জিজ্ঞেস করবেন।'

'সে কি বলবে আমি জানি। বলবে, দেশের স্বার্থের খাতিরে খানিকটা বন্দীত্ব স্বীকার করতেই হবে।'

'মথ্যে বলবে না তাহলে।'

'তা ঠিক। নিজেকে আমিও বিশ্বাস করি না। বিশেষ করে রাজবল্লভের সামনে দাঁড়িয়ে বিবেক ঠিক রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।'

এমন স্পষ্ট আর উলঙ্গ স্বীকৃতি আমি কল্পনাও করিনি। ঘসেটি বেগম বলেই এ সম্ভব। পুরুষালি নারী!

ঘসেটি চলে যায়। তার অপসৃয়মান দেহখানার দিকে চেয়ে থাকি। রাজবল্লভ আর নজরালির দোষ কি? অমন সুন্দর চলার ভঙ্গী বেগমমহলে কয়জনের রয়েছে? ফৈজী সুন্দরী ছিল, কিন্তু এমন লীলায়িত ছন্দ তার ছিল না। ঘসেটির যৌবন ওই দেহখানাকে ছেড়ে যেতে চায় না। তাই যতদিন পারে আঁকড়ে ধরে বসে রয়েছে। হয়তো তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সে অমনিই থাকবে—চিরযৌবনা নারী।

ঘসেটির কথায় আমার মন আশঙ্কায় ভরে ওঠে। শওকৎ-এর মৃত্যুতে ভেবেছিলাম বুঝি চিরকালের মতো নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, কিন্তু তা নয়। হয়তো কোনো নবাবই কখনো মসনদ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। সব বেগমই চিরকাল এমনি ভাবেই দুর্ভাবনা আর দুশ্চিন্তায় দিন কাটায়। না, সব বেগম নয়। শুনেছি, নতুন নবাব অনেক ক্ষেত্রে মসনদের সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো নবাবের বেগমদেরও পায়। নারীও তো আসবাব, মন বলে কিছু নেই। তাই কিছুতেই তাদের ভাবনা নেই। নবাব পরিবর্তনে কিছু এসে যায় না, হারেমে থাকতে পারলেই তারা তুষ্ট।

মেয়েটা কাঁদছে। হামিদা নিয়ে গিয়েছে। কাঁদুক, যত পারে কাঁদুক। বড় হলে কান্নার ঝুলি নিঃশেষিত হয়ে কেবল হাসিটুকুই থাকবে। ওকে আমি ইচ্ছে করে কাঁদাই। সব সময় হাসে বলে বড় ভয় হয়। এখনই এত হাসি কিসের? জীবনের কিছুই শুরু হয়নি।

মেয়েটা ছেলে না হয়ে ভালোই হয়েছে। ছেলে হলে নিশ্চয়ই নবাব হতো। আর নবাব হলে সারা জীবন অশান্তি। সিরাজের মতো অল্প বয়সেই চিন্তার রেখা পড়তো তারও কপালে। নবাব আলিবর্দির তো সবে সেদিন মৃত্যু হলো—এক বছর হয়েছে মাত্র। এর মধ্যেই সিরাজের কপালে কুঞ্চন দেখা দিয়েছে। কিশোরের কপালের সেই মসৃণতা আর নেই।

সোফিয়া এসে প্রবেশ করে। সেদিন তাকে ভর্ৎসনা করেছিলাম। তারপরে আর আসেনি। ওকে দেখলে আজকাল আমি বিরক্ত হই—বিরক্ত হই মহম্মদের স্ত্রী বলে। নইলে এককালে সব জারিয়াদের মধ্যে শুধু ওর ওপরই আমার মায়া ছিল। কিন্তু মহম্মদের সঙ্গে থেকে ওর চরিত্রেরও পরিবর্তন হয়েছে। সেদিনের কথাবার্তায় সেটা বেশি প্রকট হয়ে উঠেছিল। আজ আরও রাগ হলো ওকে দেখে। কারণ মহম্মদের সর্বশেষ কার্যকলাপের বিবরণ হামিদার মুখে শুনলাম সেদিন।

জাফরাগঞ্জে সে নাকি বড় বেশি যাতায়াত করে আজকাল! মীরজাফরের পুত্র মীরনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছে সে। অনুগৃহীত মহম্মদের পক্ষে এটা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। আমারই চেষ্টায় সিরাজ তার খোশামোদের জাল থেকে যেদিন মুক্ত হলো, তারপরই মহম্মদ ওদিকে ঢলেছে। তার মনে বড় হবার জ্বালা। কিন্তু বড় হতে হলে যে বীরত্ব, সাহস আর বুদ্ধির প্রয়োজন, সে সবের কিছুই নেই মহম্মদের মধ্যে। তাই সহজ পথ বেছে নিয়েছে—কুটিল পথ। খোশামোদে সব হয়, যদি বিবেককে বর্জন করা যায়। মহম্মদের বিবেকের বালাই নেই।

সোফিয়া কুর্নিশ করে দাঁড়ায়।

'জাফরাগঞ্জের কোনো নতুন খবর আছে নাকি, সোফিয়া? দাঁতে দাঁত চেপে প্রশ্ন করি। ঘসেটির কাছ থেকে খবরটা পাওয়ার পর ভেতরে ভেতরে জ্বলছিলাম।

'সে কি বেগমসায়েবা? জাফরাগঞ্জের খবর আমি কি করে পাবো?'

'মহম্মদ তো সেখানে রোজই যায়।'

'হ্যাঁ যায়।' একটু সামলে নেয় যেন সে।

'মীরবক্সীকুল যুদ্ধে জিতে ফিরেছেন। উৎসব হচ্ছে না?'

'মীরবক্সীকুল নবাবেরই অধীন। তিনি জিতলে নবাবের জয়। উৎসব হীরাঝিলেই তো হওয়া উচিত।'

সোফিয়া আগের চেয়ে অনেক চতুর হয়েছে। মহম্মদ তাকে ভালোভাবেই শিক্ষা দিয়েছে সর্পিল পথে। প্রচণ্ড রাগে আমার মাথা গরম হয়ে ওঠে। সোফিয়ার কথায় কোনো রকম অমর্যাদা প্রকাশ না পেলেও খোঁচা ছিল।

'আচ্ছা, তুমি এখন যাও সোফিয়া, আমি ব্যস্ত আছি।'

সোফিয়া নড়ে না।

'দাঁড়িয়ে আছো কেন?'

'বেগমসায়েবা কি আমাকে একটা অনুমতি দেবেন?'

'কিসের অনুমতি?'

'কতদিন ঘসেটি বেগমকে দেখিনি, একবার দেখতে ইচ্ছে হয়। তিনি তো এখানেই রয়েছেন।'

সোফিয়ার হীরাঝিলে আগমনের উদ্দেশ্য এতক্ষণে আমার কাছে স্পষ্ট হয়। সে আমাকে নিতান্ত অজ্ঞ ভেবেই একথাটা বলেছে। নইলে ঘসেটির নাম সোজাসুজি উচ্চারণ করতে সাহস পেতো না। বুঝলাম, হীরাঝিলের সঙ্গে জাফরাগঞ্জের একটা নতুন যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা চলছে। ওদিকে রাজবল্লভ রয়েছে, এদিকে ঘসেটি। কিন্তু রাজবল্লভ জানে না যে, ঘসেটির তার প্রতি দুর্বলতা বিন্দুমাত্র না কমলেও সে আর আগের ঘসেটি নেই।

হাসি পায়। অজ্ঞতার মুখোশ পরে বলি, 'কিন্তু তাকে দেখলে তোমরা কাঁপতে এককালে। এখন দেখা করতে চাও কোন্ সাহসে?'

সোফিয়া বিগলিত হয়ে বলে, 'যখন কাঁপতাম তখন নবাব আলিবর্দি জীবিত ছিলেন। তাঁর কন্যার প্রতাপের মূল্য ছিল।'

'এখন নেই?'

'থাকলেও বাংলার বেগম স্বয়ং অনুমতি দিলে ভয় কি?'

'কেন দেখা করতে চাও?'

'এককালে তাঁর কত সেবা করেছি, তাই দেখতে ইচ্ছে হয়।'

'তাকে দেখতে হলে কি অনুমতির প্রয়োজন?'

'বেগমসায়েবা কি তা জানেন না?'

'না, নতুন শুনলাম।'

'নবাব বাইরের কারও সঙ্গে ঘসেটি বেগমের সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করেছেন।'

'কবে থেকে নবাবের এই হুকুম বহাল হয়েছে?'

'শওকৎজঙ্ নিহত হবার পর।'

তীক্ষ্ণবুদ্ধি সিরাজের। ঘসেটি ঠিকই বলেছে, কোনো কিছুই সিরাজের অজানা নেই। সে সব জানে, সব বোঝে, অথচ মুখে কিছুই বলে না। এমন সংযম সত্যিই অসাধারণ। সিরাজের কপালের কুঞ্চিত রেখার কারণ এবার খুঁজে পাই। প্রতি পদে যদি এতখানি ভেবে কাজ করতে হয়, তাহলে এমন হবেই। নবাব আলিবর্দির বেগমেরও তাই অমন হয়েছিল।

নিজের মসৃণ কপালের ওপর একবার হাত বুলিয়ে নিই। মনে মনে দুঃখ হয় সিরাজের জন্য। আমি কিছুই ভাবি না। তার দুশ্চিন্তায় অংশগ্রহণ করে তাকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করার ক্ষমতাও আমার নেই। সব বোঝা তারই ঘাড়ে।

সোফিয়াকে বলি, 'তুমি নবাবের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে বলো আমাকে?'

'সে কি বেগমসায়েবা! তা কি বলতে পারি? আপনিও যা, নবাবও তাই। আপনার আদেশে নবাবের আদেশের কড়াকড়ি কিছুটা কমাতে পারেন। বাংলার বেগমের ক্ষমতা নিশ্চয়ই রয়েছে।'

'শোনো সোফিয়া, ঘসেটির সঙ্গে তোমার দেখা হবে না। নবাবের আদেশ থাকলেও আমি তোমাকে দেখা করতে দিতাম না। তুমি এখনই হীরাঝিল ছেড়ে চলে যাও। আর ককনো আসবে না এখানে।' বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে, কোনো কিছু প্রকাশ না করে, আমি সোফিয়াকে দরজা দেখিয়ে দিই।

সে আমাকে দায়সারা কুর্নিশ করে দুপদাপ্ পা ফেলে চলে যায়। তার উদ্ধত গতি দেখে মনে হয়, কোনো খোজা ডেকে গর্দান নিতে হুকুম দিই। জানি, সোফিয়াকে ফিরিয়ে দিয়ে যে তরঙ্গ তুললাম, তার গতি অনেকদূর পৌঁছবে।

সৈন্যসামন্ত নিয়ে সিরাজ নিজেই কাশিমবাজারের দিকে রওনা হলো। খুব গুরুতর কিছু না হলে সে নিজে যুদ্ধে যায় না। কারণ সে মুর্শিদাবাদে না থাকলে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে আজকাল। ইংরেজরা একটু বাড়াবাড়ি করেছে একথা সত্যি। কিন্তু নবাবের এতটা বিচলিত হবার কারণ কি?

রওনা হবার আগে বলেছিলাম, 'এবারের মীরবক্সীকুলকে পাঠিয়ে পেছনে মোহনলালকে রাখলে হতো না?

'না।'

'ইংরেজরা শওকৎ-এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী নয়।'

'তা ঠিক। কিন্তু তাদের কৌশল সম্বন্ধে তুমিই তো একদিন বলেছিলে।'

'মীরবক্সীকুলের বিরাট সৈন্যের কাছে কাশিমবাজারের কয়েকজন মাত্র ইংরেজ কি করতে পারে?'

'একটু ভাবো বুঝতে পারবে।'

'আমি আর ভাবতে পারি না। তুমি মুর্শিদাবাদ ছাড়লে আমার ভয় করে।'

'ভয় আমারই কি কম? যতবার মুর্শিদাবাদ ছাড়ি ততবারই মনে হয়, এসে দেখবো মসনদে অন্য কেউ বসেছে।'

'তবে যাচ্ছো কেন?'

'ইংরেজরা নিজে যে নবাব হবে না।'

'বুঝলাম না।'

'আবার একটু ভাবো।'

''আমি সত্যিই আর কিছু ভাবতে পারি না, নবাব।'

সিরাজ আমার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে বলে, 'এটুকু বুঝলে না বেগমসায়েবা? শওকৎ নিজে নবাব হতে আসছিল। মীরজাফর তা হতে দেবে কেন? তার নিজেরই যে সেই সাধ। কিন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে পাঠালে সে ইংরেজদের হাত করে নেবে।'

'এখন তাহলে ওদের আক্রমণ করো না। ওরা তো যুদ্ধ করছে না।'

'তার চেয়েও বেশি করেছে। ওরা আমাকে অপমান করেছে। নবাবী আইন-কানুন মানছে না একটুও।' রাগে সিরাজের মুখ রক্তিম হয়ে ওঠে।

'তবু....'

সিরাজ আমার মুখ চেপে ধরে বলে, 'আর কিছু বলো না, লুৎফা। তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, তোমার অমতে কিছু করবো না। এ ব্যাপারে আর কিছু বললে নবাবী করা যাবে না।'

'কিন্তু তোমার অনুপস্থিতিতে এরা যদি মাথা তুলে দাঁড়ায়?'

'এদের দাবিয়ে রাখার মতো বুদ্ধি তোমার রয়েছে, সে ভার তোমাকে দিয়ে গেলাম। তাছাড়া রইলো মোহনলাল।'

'তাকেও তো পাঠাতে পারতে।'

'এই সামান্য ব্যাপারে তাকে পাঠাতে ইচ্ছে হলো না। তাকে রেখে দিয়েছি আমার ঘোর দুর্দিনের জন্যে। কাশিমবাজারে গিয়ে তার যদি ভালো-মন্দ কিছু ঘটে যায়, তখন কে থাকবে আমার পক্ষে?'

চীৎকার করে উঠি, 'আর তোমার বুঝি ভালো-মন্দ কিছু ঘটতে পারে না?'

'তবু মোহনলাল থাকবে। ইংরেজরা রাজ্যভোগ করতে পারবে না। নেমক-হারামির দেউড়ির কেউ মসনদ কলঙ্কিত করবে না।'

'নেমক-হারামির দেউড়ি! সেটা কি নবাব?'

'জাফরাগঞ্জ। আমি চলি, লুৎফা।' আমার গালে আলগোছে চুমু খেয়ে সিরাজ বিদায় নেয়।

নেমক-হারামির দেউড়ি। কথাটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে।

সিরাজ নিরাপদেই ফিরলো। সঙ্গে নিয়ে এলো দুই সায়েবকে। কাশিমবাজার কুঠির দুই মাতব্বর—ওয়াট্স্ আর চেম্বারস্। এমন অদ্ভুত নাম অনেক কষ্টে রপ্ত করেছি।

সায়েব দু'জনা নবাবের আদেশে মুর্শিদাবাদেই থাকবে নবাবের চোখের ওপর। বাংলার সমস্ত ইংরেজদের জামিন তারা। মন্দ বুদ্ধি বার করেনি সিরাজ। ইংরেজদের সমস্ত তৎপরতার চাবিকাঠি নবাবের হাতের মুঠোর মধ্যে। সায়েবদের মেমরাও এসেছে সঙ্গে।

মিষ্টি হাসি হেসে মেমরা নবাব-পরিবারের অনেকের সঙ্গেই আলাপ জমিয়ে ফেললো। হীরাঝিলে এসে আমার সঙ্গেও দেখা করতে চেয়েছিল তারা। আমি রাজি হইনি। ফুটফুটে সুন্দরী হলেই যে বাংলার বেগমের সঙ্গে দেখা করা সহজ হবে, এ ধারণা না থাকাই উচিত তাদের।

সিরাজ খুশি হলো। বেগমের মর্যাদা রাখতে জানি দেখে সে সেই রাত্রে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তার এমন উচ্ছ্বসিত ভাব আমি এর আগে মাত্র পাঁচ-ছয়বার দেখেছি। বুঝলাম, বেগমের মর্যাদা রাখাই এর

একমাত্র কারণ নয়। তার সঙ্গে অন্য কিছু যুক্ত হয়েছে। সেটা জানার ইচ্ছা থাকলেও জানতে চাইলাম না। প্রেমের মধ্যে বাস্তবতা এনে ফেললে সিরাজের উচ্ছ্বাস কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে, বড় মনমরা হয়ে পড়ে সে। নিজে যেমন অবুঝ হয়, আমাকেও তেমন অবুঝ দেখতে চায় সেই মুহূর্তে।

পরদিন আমিনা বেগমকে আমার ঘরে প্রবেশ করতে দেখে বিস্মিত হলাম। তিনি এসে কোনোরকম ভূমিকা না করেই প্রশ্ন করলেন, 'কথাটা কি সত্যি?'

'কোন্ কথা?'

'মেমদের সঙ্গে তুমি নাকি দেখা করোনি?'

'হ্যাঁ সত্যি। কেন বলুন তো?'

'তাতে আমাকে অপনাম করা হয়েছে, এটুকু বোঝো?'

'কেমন করে?' মনে মনে বিরক্ত হই।

'নবাবের মা হয়ে আমি দেখা করতে পারলাম, অথচ তুমি ওভাবে ওদের তাড়িয়ে দিলে?'

'আপনি চটেছেন। শান্ত হোন্, দেখবেন আমি ঠিকই করেছি।'

'ঠিক করেছ?' আমিনাবিবি অহেতুক ধমন দেন।

'হ্যাঁ। নবাবকে আপনি কতদিন দেখেননি?'

'দু'মাস হবে। সিরাজ আজকাল ব্যস্ত থাকে বলে আমার সঙ্গে দেখা করার সময় পায় না।'

'আমার সঙ্গে তার রোজই দেখা হয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই দেশের অনেক বিষয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। ইংরেজদের কথাও উঠে। ওরা আমাদের ঠিক বন্ধু নয়, একথা আপনি নিশ্চয়ই মানবেন। মেমদের হারেমে পাঠিয়ে গুপ্ত কথা জেনে নেওয়া অসম্ভব নয় ওদের পক্ষে। সেইজন্যেই দেখা করিনি।'

'ওয়াট্সের মেমের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে জানো?'

'শুনেছি। কিন্তু কাজটা ভালো করেননি। আর সেইজন্যেই বোধহয় নবাব আপনার সঙ্গে দেখা করা ছেড়ে দিয়েছেন।'

'লুৎফা'।

'আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

'না, ঠিকই বুঝেছি। নিচু ঘরের মেয়ে বেগম হলে তার কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করা অন্যায়।'

এই মুহূর্তে আমিনা বেগমকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে পারি। আমার মনের অবস্থা সেই রকমই। কিন্তু সামলে নিলাম, হাজার হলেও সিরাজের মা।

'আপনি এখন যেতে পারেন। আপনি যখন নবাবের মা, তখন ছেলেকে বলুন না কেন, আমাকে আবার জারিয়া করে দিতে।'

আমিনা বেগম একটু সময় থ' হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে গা ঝাড়া দিয়ে বলেন, 'তবে শোনো, বেগমসায়েবা, সায়েবদের ছেড়ে দেবার জন্যে সিরাজকে রাজি করিয়েছি। এর জন্যে তার সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন হয়নি। শুধু একটা চিঠিতেই কাজ হয়েছে।'

'ভালোই করেছেন। নবাবের মাতৃভক্তি তাহলে ভালোভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এর জন্যে আপনাকে ভবিষ্যতে কাঁদতে না হয়।'

'চিঠিতে যখন সেটা সম্ভব হয়েছে, তখন তোমার বেগমত্ব ঘুচিয়ে দিতে সিরাজের সামনে একটু

দাঁড়ালেই যথেষ্ট হবে মনে রেখো।'

আমিনা বেগম ছুটে বার হয়ে যান। আমি বসে দাঁতে দাঁত ঘষি।

আমার মেয়ের ভালো একটা নাম রাখা হলো না। যখন যা মনে আসে তাই বলে ডাকি। সেও সাড়া দেয়। নাম শুনে নয়, আমার গলার স্বর শুনে সাড়া দেয়। সে জানে, তাকে ডাকার সময় আমার স্বরে বিশেষ এক টান থাকে, যা অন্য সময়ে থাকে না। অন্য সবাইকে ডাকতে হলে আজকাল একটু গুরুগম্ভীর স্বরেই ডাকতে চেষ্টা করি, কিন্তু মেয়ের বেলায় আমি 'মা'।

সে আধো আধো 'মা' ডাকতে শিখেছে। কী মিষ্টি যে লাগে সে-ডাক। এক-একসময় ইচ্ছে হয়, তাকে পুরোনো বেগম মহলে সেই গবাক্ষের সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াই। দেখাই তার মা ছোটবেলায় কিভাবে দিন কাটিয়েছে, কিন্তু ওর কি বোঝবার বয়স হয়েছে? বড় হলে নিশ্চয়ই একদিন নিয়ে যাবো।

সেই গবাক্ষের স্বপ্ন এখনো দেখি। চোখের জলে ধুয়ে যাওয়া দেওয়ালের বিবর্ণতা এখনো অটুট আছে নিশ্চয়। নবাব আলিবর্দির সময়েও যে-দেওয়ালে রং পড়েনি, এখন পরিত্যাগ হয়ে মহলের সেই নির্জনতম স্থান কি আর কারও চোখে পড়ে? সারা মহলেই আর কখনো রং লাগানো হবে কিনা কে জানে? সিরাজের এত সাধের এই নতুন হীরাঝিলের বাগিচাও যেন আগের মতো শ্যামল নেই। এর মধ্যেই একটা রুক্ষতা এর শ্যামলতা শুষে নিয়েছে যেন।

মুহূর্তের জন্যেও যে নবাবের শান্তি নেই, যার পেছনে ষড়যন্ত্র সব সময়ে হাত বাড়িয়ে রয়েছে সামান্য অসাবধান হলে টুঁটি চেপে ধরবার জন্যে, তার বাগিচার এই দশাই তো হয়, আর তার বেগমদের হয় আমার দশা। আরশির সামনে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারি, আমার ভেতরেও একটু রুক্ষতা এসেছে। চেহারায় এবং মনেও—যে-মুখে জারিয়াদের হুকুম করি, সোফিয়াকে গালাগালি দিই, সে-মুখের কথা কি নবাবের কাছে প্রথম দিনের মতো মিষ্টি লাগে?

এইজন্যই বোধহয় নবাবদের হাজার বেগম—নানা বয়সের, নানা স্বভাবের। মনের অবস্থানুযায়ী নিত্য নতুন বেগমের ঘরে সময় কাটায় তারা—মনের সঙ্গে যখন যে-বেগম খাপ খায়। এইজন্যই বেগমদের বাইরের ঘটনা সম্বন্ধে অন্ধকারে রাখা হয়—নিশ্চিন্ত মনে তারা শুধু নবাবদের মনোরঞ্জনই করে। এ নিয়ম একদিকে অনেক ভালো। এমন হলে আমার মনে এত তাড়াতাড়ি এ কাঠিন্য হয়তো আসতো না—প্রথম দিনের লুৎফাই থেকে যেতাম।

বাইরে নবাবের আগমনবার্তা ঘোষিত হলো। চেহেল-সেতুন থেকে সিরাজ ফিরলো। আজকাল ফিরে সে আমারই কাছে আগে আসে। তাড়াতাড়ি পোশাক পরিবর্তন করে নিজেকে সাজিয়ে নিই। সম্প্রতি বুঝতে শিখেছি যে, শত ভালোবাসা থাকলেও পুরুষ মানুষ মেয়েদের সজ্জিত রূপটাই দেখতে চায়, বিশেষ করে সে যখন পরিশ্রান্ত হয়ে দিনান্তে ফেরে। নিজেকে আগোছাল করে রেখে দেখেছি, মুখে কিছু না বললেও আমার ওপর সিরাজের আকর্ষণ ততটা দুর্নিবার হয়ে ওঠে না। অথচ খুব সেজেগুজে বসে থাকলে সে এসেই প্রথমে আমাকে আদর করে। সাজানো রূপ যখন অত ভালোবাসে সিরাজ, তখন সেইভাবে থাকাই ভালো। আমি যে তারই।

কিন্তু সেজেগুজে লাভ হলো না কিছু। ঘরে ঢুকে আমার সঙ্গে কোন কথা বললো না সে। দু'বার ঘরময় পায়চারি করে গবাক্ষের সামনে গিয়ে বাইরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। সে বড় গম্ভীর। গভীর চিন্তান্বিত সে। কথা বলে তাকে বিরক্ত না করে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকি। কিন্তু দীর্ঘশ্বাসের শব্দ পেয়ে না ডেকে থাকতে পারি না।

'নবাব।'

জবাব নেই।

'সিরাজ।'

হঠাৎ সে তার সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলে, 'জানো লুৎফা, এই যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, এখনি একটা তীর কিংবা গোলা বাইরে থেকে ছুটে এসে আমাকে শেষ করে দিতে পারে।'

তাড়াতাড়ি তাকে গবাক্ষের সামনে থেকে টেনে সরিয়ে এনে বলি, 'তাহলে ওখানে তুমি দাঁড়িও না।'

'শুধু এটুকু সময়ে আমাকে রক্ষা করে কি হবে?' সিরাজের স্বরে বিমর্ষভাব।

'এসব কথা আজ বলছো কেন? আমার কি শুনতে সাধ হয়েছে?'

'না, তা নয়। বাংলার নবাবের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে, সে বিষয়ে তোমাকে একটু ওয়াকিবহাল করে রাখলাম।'

'নবাবীর পথে যে ফুল বিছিয়ে থাকে না, সে-কথা আমি জানি, নবাব।'

'কিন্তু আমার নবাবীর পথে শুধু কাঁটাই বিছিয়ে দেওয়া নেই, প্রতিটি কাঁটার ডগায় মাখানো রয়েছে তীব্র বিষ।'

'সেই বিষকে ডিঙিয়ে যাবার মতো বুদ্ধিও তোমার রয়েছে।'

'শত বুদ্ধি থাকলেও মানুষ মানুষই, লুৎফা। সব সময়ে সব বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। কার ওপর আস্থা রাখবো?'

'তোমার মোহনলাল রয়েছে।'

'মোহনলাল একা কি করবে? তাছাড়া সে বুদ্ধিমান হলেও কূট নয়। সে সরল, সে বিশ্বাসী, সে বলিষ্ঠ। এসব নোংরা ঘাঁটা তার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'কি সেই নোংরামি, নবাব?'

'সে-কথা আমার মুখে নাই বা শুনলে। মুর্শিদাবাদে এখনো হাওয়া বয়। সে-হাওয়া ভেসে ভেসে একসময় তোমার কানেও এসে পৌঁছবে। হীরাঝিলের লৌহদ্বার আর প্রাচীরে তা বাধা পাবে না।'

'তবু তুমিই বলো।'

'না।'

'সেই ইংরেজ দুটোর সম্বন্ধে কি?'

'না।'

'তাদের ছাড়লে কেন?'

'মায়ের অনুরোধে।'

'নিজের বিপদের আশঙ্কা জেনেও?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'দুটো ইংরেজকে আটকে রেখে যেটুকু লাভ, তার মেয়াদ ফুরিয়েছে। সাধারণ লোকে যদি আমাকে না চায়, তাহলে তাদের আটকে রেখে লাভ কি?'

'নবাব সিরাজদ্দৌলাকে জনসাধারণ চায় না?'

'এখনো হয়তো চায়, কিন্তু দু'দিন পরে আর চাইবে না। আমার পায়ের নিচের মাটি ধসে পড়ছে, লুৎফা। আমি বুঝতে পারছি, অথচ উপায় নেই।'

'আমাকে বলতেই হবে, কি হয়েছে?'

'না। শুধু শুনে রাখো, বিরাট ষড়যন্ত্র।'

'সে তো আজ প্রথম নয়।'

'এতদিন মানুষের মন ভাঙেনি, তাই আমার বুকে বল ছিল।' সে একটু থেমে বলে, 'ওসব কথা

থাক্, মায়ের দ্বিতীয় অনুরোধের কথা তোমাকে বলা হয়নি।'

'বলো।'

'তোমাকে বেগম থেকে আবার জারিয়া করে দিতে বলেছেন তিনি।'

'আজই কি আমাকে ঘর ছাড়তে হবে?'

'না।'

'আমার মেয়েটা কি জারিয়ার মেয়ে বলেই পরিচিতি হবে?'

'না।'

'আমাকে কি পুরোনো মহলে আমিনা বেগমের সেবার জন্যে রাখা হবে?'

'না।' সিরাজ হেসে আমার হাত দুটো নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলে, 'বেগমসায়েবা দেখছি জারিয়া হবার জন্যে প্রস্তুত। সিরাজের জন্যে কষ্ট হবে না?'

কথা না বলে তার বুকের ওপর মাথা রাখি।

হাওয়ায় সেই নিদারুণ খবরই ভেসে এলো। সিরাজ সত্যি কথাই বলেছিল। মুর্শিদাবাদে হাওয়া এখনো বয়ে চলেছে—সাংঘাতিকভাবে বয়ে চলেছে।

হামিদার মুখে গুজবটা শুনে দু'হাত দিয়ে নিজের কান চেপে ধরেছিলাম।

'বিশ্বাস হয়, হামিদা?' যেন তার জবাবের ওপর আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে।

'না, বেগমসায়েবা। নবাবকে আমি ভালোভাবে চিনে ফেলেছি। মসনদে বসার পর কিছুদিন তিনি শুধু নবাব আলিবর্দির আদরের নাতির মনোভাব নিয়েছিলেন, কিন্তু এখন তিনি প্রকৃত নবাব। তিনি এ কাজ করতে পারেন না।'

তার কথায় সত্যিই সান্ত্বনা পেলাম।

জাফরগঞ্জ দেউড়ি থেকে যার সূত্রপাত, এখন তা দেশের প্রতিজনের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। সিরাজের ওপর তাদের বিশ্বাসের মূলে কঠিন আঘাত হেনেছে।

সিরাজ যখন কাশিমবাজার থেকে ফিরছিল, তখন নাকি ঘটনাটা ঘটেছে। গঙ্গার বুকের ওপর দিয়ে ভেসে আসছিল বজরা। সেই বজরা থেকে সে দেখতে পেয়েছিল বড়নগরের ছাদের ওপর এক অপ্সরীকে। প্রথমে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল, তারপর নাকি সৈন্যসামন্ত নিয়ে রানী ভবানীর প্রাসাদ অবরোধ করে।

পাগল না হলে এমন কথা কেউ বিশ্বাস করে না। কিন্তু পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি লোকই যে গুজব-পাগলা। তাই সবাই বিশ্বাস করে বসে রয়েছে নিশ্চয়।

ছাদের সুন্দরী ছিল রানী ভবানীর বিধবা মেয়ে তারা। হিন্দু সমাজে বড়নগরের রানীর আসন কত উঁচুতে সিরাজ সে-কথা ভালোভাবেই জানে। রানীর পালিত পুত্র একজন মহাপুরুষ, একথাও হিন্দুদের মতো মুসলমানদেরও অজানা নয়। তাঁরই মেয়ের দিকে কটাক্ষপাত যে সিরাজের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়, একথা আমার চাইতে ভালো কে বুঝবে? আর বুঝবে ঘসেটি বেগম, যে নবাবকে হাড়েহাড়ে চেনে।

সিরাজ এলে বলি, বাইরের বাতাস হীরাঝিলেও ঢুকেছে নবাব।'

'জানতাম।'

'বিশ্বাস করি কিনা জিজ্ঞাসা করলে না?'

'আমি মূর্খ নই।'

'দেশের সবাই সত্যি বলে ভেবেছে।'

'তাদের পক্ষে সেটাই সম্ভব।'

'আমার পক্ষে?'

'তোমাকে বজরায় করে নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারি যে, বড়নগরের রাজবাড়ি গঙ্গা থেকে দেখাই যায় না। তাতে তুমি বিশ্বাস করবে। কিন্তু দেশের প্রতিটি লোককে তো সেভাবে দেখানো সম্ভব নয়।'

'কে বটালো এসব?'

'তা বলতে পারি না। তবে নেমক-হারামির দেউড়ি থেকেই রটেছে কথাটা।

'আমি জানি কে রটিয়েছে।' দরজায় ঘসেটি বেগমের কণ্ঠস্বরে আমরা উভয়েই চমকে উঠি। খবর না পাঠিয়ে এমন অকস্মাৎ সে কখনো আসে না।' সেরকম হুকুমও নেই। বুঝলাম, সব শুনে সে আর স্থির থাকতে পারেনি।

ঘসেটির কথায় সিরাজ উদ্‌গ্রীব হয়ে বলে, 'কে রটিয়েছে?'

'এত বুদ্ধি থাকতেও সহজ জিনিসটা বোঝোনি নবাব। সমস্ত হিন্দুকে তোমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে হলে হিন্দুদের নাড়ির খবর জানা দরকার। মুসলমানের পক্ষে তা সম্ভব নয়। রাজবল্লভ শেষ চাল চেলেছে, আর সেই চালে বাজীমাৎ। পারলে না তুমি সিরাজ, হেরে গেলে। বাইরের লোক এখন তোমাকে পশু বলে জেনে নিয়েছে।'

ঘসেটির কথায় বিদ্রূপ ছিল কিনা জানি না, কিন্তু ধৈর্য ধরে থাকতে না পেরে আমার চুলের বিনুনিটা নিজের বাঁ হাতের ওপর সজোরে আঘাত করে বলি, 'আপনার খুব আনন্দ হচ্ছে, তাই না ঘসেটি বেগম? সে-আনন্দ চাপতে না পেরে বিনা হুকুমে ছুটতে ছুটতে এসে এ ঘরে ঢুকেছেন।

ঘসেটির মুখ সাদা হয়ে যায়, কিন্তু মুহূর্তের জন্যে। গম্ভীর স্বরে সে বলে, 'তোমার বাঁ হাতকে আমার মুখ বলে ভুল করে লাভ নেই, বেগমসায়েবা। দেখছো না, তুলতুলে মাংস কেমন ফুলে উঠেছে?' সে সিরাজের দিকে চেয়ে বলে, 'তোমারও কি একই ধারণা, সিরাজ?'

'না। লুৎফা এখনো ছেলেমানুষ, ঘসেটি বেগম।'

'ছেলেমানুষের মতো থাকাই উচিত তবে।'

ঘসেটির কথায় বিনুনির চাবুকের জ্বালা প্রথম অনুভব করলাম। কিন্তু কিছুই করার ছিল না বলে ছট্‌ফট্ করতে লাগলাম।

ঘসেটি বলে, 'রাজবল্লভকে একবার আমার কাছে ডেকে আনতে পারো, সিরাজ?'

'কেন, কি হবে?'

'কি হবে এখনো বুঝছো না?' ঘসেটির চোখ জ্বলতে থাকে—পুরোনো মহলের সেই বিজন কোণে হোসেন কুলিখাঁ চলে গেলে আমাকে দেখে যেমন জ্বলে উঠেছিল। সেদিনের মতো আজও আমার বুক কেঁপে উঠল, যদিও আজ আর আমি জারিয়া নই, আমি বেগম লুৎফাউন্নেসা।

'স্পষ্ট করে বলো'। সিরাজ বলে।

'আলিবর্দির মসনদ আরব দেশের ওই কাপুরুষটিকে দিতে পারি না।' ঘসেটির কণ্ঠস্বরে শ্লেষ।

'যদি সেরকম দিন আসে তুমি কি করবে?'

'প্রতিহিংসা! আমাকে তুমি বন্দী করে রেখেছো, কিন্তু প্রতিহিংসা নিতে দেবে তো?'

'রাজবল্লভের সামনে গেলে তুমি বড় দুর্বল হয়ে পড়।'

'হ্যাঁ, তাই তো তাকে এই হীরাঝিলে আমার সামনে এনে দিতে বলছি।'

'কি করবে তাকে নিয়ে?' সিরাজের চোখে সপ্রশ্ন কৌতূহল।

'তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। নিজে পাগল হবো, তাকে পাগল করবো। তারপর তার মুখে একপাত্র বিষ ঢেলে দেবো।' কাঁপতে থাকে পুরুষালি নারী।

'তাতে বাংলার মসনদ সুরক্ষিত হবে না, শুধু প্রতিহিংসাই নেওয়া হবে। রাজবল্লভের মৃত্যু হলে আমার পশুত্ব সত্যি বলে প্রতিষ্ঠিত হবে।'

'সেটা প্রতিষ্ঠিত হবার অপেক্ষায় নেই সিরাজ। রাস্তা দিয়ে যখন যাবে, প্রজাদের মুখের দিকে চেয়ে দেখো তো, সে মুখে কি লেখা রয়েছে। রাজবল্লভের মৃত্যু না হলেও তোমার মসনদ আর কখনো সুরক্ষিত হবে না। সময় নেই সিরাজ, প্রস্তুত হও। বিশ্বাসী লোকদের একজোট করে সৈন্য ভাগ করে দাও।' ঘসেটি যেমন অকস্মাৎ এসেছিল, তেমনি চলে গেল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর সিরাজ মুখ খোলে, 'ঘসেটি বেগম যদি মসনদে বসতো, তাহলে এত তাড়াতাড়ি বাংলার বিপদ আসতো না।'

'কেন নবাব?'

'সে আমার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি ধরে।'

'সে কিন্তু বলে, তুমিই বেশি বুদ্ধিমান।'

'সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু ঘসেটি যা বলে গেল তা সম্ভব নয়। মীরজাফরের সৈন্য অপরের মধ্যে ভাগ করে দেবার সাহস আমার নেই।'

'তুমি না নবাব?'

'হুঁ, আইনত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক ব্যাপারেই বাধা আছে। তার সৈন্যরা আমার চেয়ে তারই বেশি অনুগত। আমার সঙ্গে তাদের আর কতটুকু সংযোগ? ঘসেটির কথামতো কাজ করতে গেলে অনর্থক একটা আলোড়নের সৃষ্টি হবে, যা আমি আপাতত চাই না।' চিন্তান্বিত হয়ে সিরাজ চলে যায়।

মেয়েটাকে নিয়ে হামিদা প্রবেশ করে। আমাকে অনেকক্ষণ না দেকে সে কাঁদছিল। কাঁদুক, যত পারে কাঁদুক।

মোহনলালকে ব্যস্তভাবে হীরাঝিলের বাগিচা অতিক্রম করে আসতে দেখে কেন যেন অমঙ্গলের আভাস পেলাম। এই লোকটাকে সিরাজের নবাবী-শাসনের স্তম্ভ বলে আমি মনে করি। স্তম্ভে সম্ভবত নাড়া লেগেছে। সম্ভবতই বা বলি কেন, নিশ্চয়ই তাই। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে বিচলিতভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সামান্যে বিচলিত হবার মতো পুরুষ মোহনলাল নন। নিজের বোন ফৈজীর সম্মুখে তুলে দেওয়া দেওয়ালের সামনে তাঁকে নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি বলেই একথা এমনভাবে আমি বলতে পারছি।

একবার মনে হলো, নিজেই ছুটে যাই তাঁর কাছে। জিজ্ঞাসা করি, তাঁর বিচলিত হবার কারণ কি। কিন্তু আমি যে বেগম, আমি তা পারি না।

সিরাজ আমার অনুরোধে চেহেল-সেতুনে আর যায় না। হীরাঝিলেই দরবার বসে। তবে এ ব্যাপারে তাকে সম্মত করতে যথেষ্ট বেগ হতে হয়েছে। প্রথমে সে হেসে উঠেছিল এই অবাস্তব অনুরোধে। দুর্গের মধ্যে বসে থেকে রাজ্যশাসনের পরামর্শ দেওয়া অবাস্তব তো বটেই। প্রজাদের সঙ্গে সংযোগ না রেখে নবাবী করা যায় না। কিন্তু যখন তাকে বুঝিয়েছিলাম যে, জাফরগঞ্জ থেকে রটনা করা বড়নগরের ঘটনাটির প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে কিছুদিন অন্তত তার বাইরে না যাওয়াই উচিত, তখন সে বুঝেছিল। তবু একটু প্রতিবাদ না করে ছাড়েনি। বলেছিল, এভাবে হীরাঝিলের মধ্যে বসে থাকলে প্রজারা গুজবটিকে বিশ্বাস করে নেবে। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। তাই বলেছিলাম, সে-বিশ্বাস

ভেঙে দেবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু এই উত্তেজনাময় মুহূর্তে বাইরে গেলে কোনো প্রজা মরিয়া হয়ে কিছু করে বসলে আর কোনো উপায়ই থাকবে না।

আমার কথার সম্মান রেখেছিল সিরাজ।

মোহনলালকে আসতে দেখে ভাবলাম, নবাব ইতিমধ্যে বাইরে চলে যায়নি তো? আমাকে না জানিয়ে গোপনে হয়তো মুর্শিদাবাদ পরিদর্শনে গিয়েছে প্রজাদের মন জানতে। কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসে। মনে হয়, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না, এখনই বুঝি পড়ে যাবো। মোহনলাল চরম দুর্ঘটনার খবর নিয়েই যেন ছুটতে ছুটতে আসছেন। বিশ্বাসঘাতকেরা তৎপর হয়ে উঠেছে বলেই বন্ধুপত্নীকে রক্ষা করতে আসছেন তিনি।

মেঝের ওপর বসে পড়ি। হামিদা ছুটে এসে হাত ধরে টেনে তুলে বলে, 'কি হয়েছে, বেগমসায়েবা?'

'নবাব বোধহয় আর বেঁচে নেই, হামিদা।'

'সে কি! এইমাত্র এ-ধার দিয়ে গেলেন তো।'

'নিজের চোখে দেখেছিস্? ভুল দেখিস্নি?'

'না-না, ওই দেখুন।'

হামিদার আঙুল বরাবর চেয়ে দেখি, সত্যিই সিরাজ এগিয়ে গিয়ে মোহনলালের সঙ্গে কথা বলছে। শরীরে আবার রক্ত চলাচল শুর হলো।

দু'জনাই খুব নিশ্চিন্ত হলেও স্বস্তি অনুভব করতে পারলাম না। মোহনলাল কি বললো শোনার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলাম।

সিরাজ গিয়েছে, মোহনলাল গিয়েছে—সবাই গিয়েছে। পলাশীর প্রান্তরে জমায়েত হয়েছে সবাই ইংরেজদের বিতাড়িত করতে। এখানে এখন আছে শুধু রাজবল্লভ, জগৎশেঠ—রয়েছে উমিচাঁদ, আর রয়েছে মীরজাফরের আদরের ছেলে মীরণ, যাকে সোফিয়ার স্বামী মহম্মদ ছায়ার মতো সব সময় অনুসরণ করছে। মীরণের ছায়া মহম্মদ, ভালোই হয়েছে।

এসব কথা হামিদা বলেছে আমাকে। আর হামিদাকে বলছে সোফিয়া নিজে। তার নাকি বরাত খুলেছে। এখন সে পায়ে হেঁটে কোথাও যায় না, গাড়িতে করে ঘুরে বেড়ায়। গাড়িতে করে এসেছিল সেদিন হীরাঝিলে। ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে চেঁচামেচি করে এক দৃশ্যের অবতারণা করেছিল। খোজারা ছুটে এসে আমাকে জানাতে আমি হামিদাকে পাঠিয়েছিলাম।

হামিদা যেতেই সে চীৎকার করে বলেছিল, 'এই যে বিশ্বস্ত জারিয়া, বেগমসায়েবার কাছে নিয়ে চলো। এরা আমাকে যেতে দিচ্ছে না। চেনে না কিনা।'

হামিদা মাঝে মাঝে বড় বেয়াড়া কথা বলে। সোফিয়া অহঙ্কারে ফুলে উঠেছে দেখে সে খোঁচা দেবার লোভ সামলাতে পারেনি, যদিও আমি বার বার করে বলে দিয়েছিলাম যে, শান্তভাবে বুঝিয়ে যেন তাকে বিদায় করা হয়।

হামিদা বলেছিল, 'এত বড় গাড়ি করে এসেছো, ঢুকতে দেওয়া ওদের উচিত ছিল। বেগম বলে ভাবাও স্বাভাবিক। কিন্তু চেনে বলেই ঢুকতে দিচ্ছে না।'

'চেনে কি রকম?' সোফিয়া রেগে উঠেছিল।

'তুমিই ওদের জিজ্ঞাসা করো, সোফিয়া।'

'বোরখার মধ্যে থেকে কি মুখ দেখা যাচ্ছে আমার?'

'আমারও তো মুখ বোরখায় ঢাকা, তাই বলে কি আমাকে চেনে না এরা? সব চেনে। এদের যে চিনতে হয়। নইলে পাহারা-দেওয়া চাকরি থাকবে না।'

সোফিয়া বলেছিল, 'তুমি হীরাঝিলে থাকো, ওরা তোমার স্বর চেনে, চলনও চেনে।'

'তুমি পুরোনো মহলে থাকতে, তোমারও গলার স্বর ওদের চেনা। তবে তোমার চলন বদলেছে।'

'সব বাজে কথা।'

'বাজে কথা নয়, দেখবে?' হামিদা দ্বারের একজনকে বলেছিল, 'তোমরা এই বোরখার বিবিকে চেনো না?'

'হ্যাঁ. ভালোভাবেই চিনি। সোফিয়া জারিয়া।' একজন দ্বাররক্ষী নির্বিকারভাবে বলেছিল।

'দেখলে তো জারিয়া, এরা বড়ই সাংঘাতিক।' হামিদা হেসে উঠেছিল।

সোফিয়া রেগে বোরখা খুলে অগ্নিদৃষ্টিতে দ্বাররক্ষীর দিকে চেয়ে বলেছিল, 'এখন আমি কে জানো?'

'হ্যাঁ জানি। মহম্মদের সঙ্গে শাদি হয়েছে। মহম্মদ যে আমার দোস্ত ছিল বিবি। তবে এলেম্ আছে তার, বেশ ওপরে উঠে গেল।'

সোফিয়া চোখ-মুখ লাল করে বলেছিল, 'সব তোমার শেখানো, হামিদা। আজ চলে যাচ্ছি বটে, কিন্তু পরে যখন আসবো, তখন আর কেউ বাধা দিতে সাহস পাবে না। কুর্নিশ করে পথ ছেড়ে দিতে হবে।'

'তাই নাকি! মহম্মদ কি নবাব হবে?' হামিদা রীতিমতো হিংস্র হয়ে উঠেছিল।

'তা হবে কেন?'

'তবে কি মীরণ তোমাকে বেগম করতে চেয়েছে?' হামিদা হা-হা করে হেসে উঠেছিল।

'যতই হাসো, তোমাদের দিন ফুরিয়েছে।'

'পলাশীর খবর কি তোমার কাছে এসে গিয়েছে?'

'খবর আগে থেকেই জানা আছে।'

'তাই নাকি!' হামিদা বিস্মিত হবার ভান করেছিল।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, পলাশীতে যুদ্ধ হবে না, মস্করা হবে।'

'তাহলে তো গেলে হতো. মজা দেখতাম।'

সোফিয়া চলে গেলে হামিদা এসে আমাকে সবিস্তারে সব জানায়। সোফিয়ার একটা কথাই আমার কানে বার বার বাজতে থাকে—পলাশীতে যুদ্ধ হবে না, মস্করা হবে। কেন সে ওকথা বললো? তবে কি জাফরাগঞ্জের চক্রান্তের খবর সে কিছু রাখে? এর মধ্যে কি কোনো সত্যতা রয়েছে?

সিরাজও ওই রকম একটা কিছু বলেছিল। বলেছিল যে, মাত্র কয়েক শ' ইংরেজ সৈন্যের কাছে যুদ্ধ বলে কিছুই হবে না। বিশাল ফৌজ নিয়ে গিয়ে ওদের সামনে দাঁড়ালেই নাকি ওদের কর্তা ক্লাইভ সায়েব এসে পা চেপে ধরবে।

কিন্তু কই, এখনো তো কোনো খবর এলো না। মুর্শিদাবাদ থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে পলাশীর প্রান্তর হতে খবর আসতে এত দেরি হবে কেন? আমি তো সিরাজকে বার বার করে বলে দিয়েছিলাম যে, প্রতিদিনের খবর জানিয়ে সে যেন একজন করে অশ্বারোহী পাঠায় আমার কাছে। অশ্বারোহীর পক্ষে সেখান থেকে মুর্শিদাবাদ আসতে একদিনের বেশি দেরি হতে পারে না। অথচ এ পর্যন্ত কেউ এলো না।

'বেগমসায়েবা এত মন-মরা কেন?' মেয়ে কোলে নিয়ে হামিদা দাঁড়ায়।

'পলাশীর কোনো খবর এলো না, হামিদা?'

'সে খবর নবাব নিজে এসেই দেবেন। ব্যাপারটা এত তুচ্ছ যে, শুধু শুধু অশ্বারোহী পাঠানো

প্রয়োজন বোধ করেন না তিনি।'

'তুচ্ছ হলেও সেটুকু জানানো উচিত ছিল। তাহলে নিশ্চিন্ত হতাম।' হামিদা কিছু বলার আগে আর একজন জারিয়া এসে কুর্নিশ করে।

'কি চাও?'

'ঘসেটি বেগম একবার এখানে আসতে চান।'

'আসতে বলো।'

ঘসেটি এলে তার দিকে চেয়ে থাকি অনেকক্ষণ। তার মুখের দিকে নয়, পরিচ্ছদের দিকে। খুব সাধারণ ঘরের মেয়েরাও বোধহয় এর চেয়ে দামী পোশাক পরে। পাশে হামিদার পোশাকের দিকে চেয়ে আমার নিজেরই লজ্জা হলো। শেষে রাগ হলো। এটাও ঘসেটি বেগমের চাল? সে কি প্রমাণ করতে চায় যে নবাব তাকে বন্দী করে রাখায় তার এ দুর্দশা হয়েছে। তার শরীরের কোথাও অলঙ্কার বা মণিমুক্তোর ছিটেফোঁটাও দেখলাম না। শুধু অলঙ্কারের শূন্য জায়গায় শরীরের ত্বকের ওপর সাদা সাদা দাগ উৎকটভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

'ঘসেটি বেগমের এ বেশের অর্থ?'

'রাগ করো না, লুৎফা, সাধারণভাবে থাকা অভ্যাস করছি।' তার মুখে ম্লান হাসি খেলে যায়।

'কেন, নিজের ভবিষ্যৎ কি এর মধ্যেই দেখে ফেলেছেন?'

'হ্যাঁ।' দৃঢ় জবাব।

'আর তার মূলে নবাব সিরাজদ্দৌলা নিশ্চয়ই?'

'না-না, ও ভুল করো না লুৎফা, ও ভুল করো না। যদি পারতাম প্রায়শ্চিত্ত করতাম। চিরদিন সিরাজের শত্রুতা করে আজ আমার অনুতাপ হচ্ছে। প্রথম থেকে তার পাশে দাঁড়ালে বোধহয় বাংলার এ দুর্দশা হতো না। সিরাজ আরও শক্তিশালী হতে পারতো।'

'আপনি এসব কি বলছেন?'

'প্রস্তুত হও লুৎফা, ভীষণ দুর্দিনের জন্যে প্রস্তুত হও।'

'আপনি কি পাগল হলেন? সিরাজ বলেছে, ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ বলতে কিছুই হবে না। নবাব সৈন্যের সংখ্যা দেখেই তারা আত্মসমর্পণ করবে।'

ঘসেটি কিছু বলে না। সে দৃঢ়ভাবে ঠোঁট দুটো পরস্পর চেপে ধরে। ঠিক আলিবর্দির বেগমের মতো দেখায় তার মুখ। কপালেও তেমনি রেখা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বুঝতে পারি সিরাজের চিন্তায়ও এ রেখা ফুটেছে। ঘরময় পায়চারি করে বেড়ায়। নবাব আলিবর্দিকেও এমনি অবস্থায় কতবার দেখেছি। হাত দুটো পেছনদিকে, একটার ওপর আর একটা পড়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণ এইভাবে ঘুরে সে সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপরই হামিদার কোলে আমার মেয়ের কাছে যায়। তার মাথাটা নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকে। জীবনে এই প্রথম তার মুখে একটা মাতৃত্বভাব ফুটে ওঠে। কিন্তু মেয়েটা কাঁদতে শুরু করে। তাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়ে অল্প হেসে ঘসেটি আবার আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমার মুখের দিকে বহুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। একসময় দেখি তার ঠোঁট দুটো কাঁপছে, তার দুটো চোখের কোণে জল চিক্‌চিক্ করছে।

তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠি আমি।

'কেঁদো না, লুৎফা। কাঁদার দিন গিয়েছে। কাঁদার দিন পরেও আসতে পারে। কিন্তু এখন তোমাকে শক্ত হতে হবে। তুমি বাংলার বেগম। বাংলার নবাবের মনোবল ফিরিয়ে আনতে শুধু তুমিই পারবে। যদি সে সুযোগ আসে—'ঘসেটি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, আমি যেমন করে আমার মেয়ের মাথাই দিই।

হামিদা স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। এবারে সে ধীরে ধীরে বলে, 'তবে কি সোফিয়ার কথাই

ঠিক? সে বলেছিল, পলাশীর যুদ্ধের খবর আগে থেকেই জানা আছে।'

ঘসেটি বেগম বলে, 'সোফিয়া ঠিক কথাই বলেছে। আজ সকাল থেকে হীরাঝিলের সামনে গঙ্গার বুকে রাজবল্লভ, জগৎশেঠ আর মীরণের বজরার ঘন ঘন আবির্ভাবে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি।'

'তারা ওভাবে আসছে কেন?' আমি বলে উঠি।

'হয়তো সিরাজের খোঁজে। একা সিরাজ কখন ফিরে আসে তাই দেখতে। কিংবা হয়তো হীরাঝিলকে দরবার বানালে কেমন হবে, এখন থেকেই তার ছক্ কাটছে।'

'পলাশীর যুদ্ধে কি তবে সত্যিই সিরাজের পরাজয় হবে?' মাথাটা আমার সহসা ফাঁকা হয়ে যায়, যেন স্বপ্ন দেখছি।

'পলাশীতে তো যুদ্ধ হবে না। যুদ্ধের নামে হবে বিরাট পরিহাস। এতক্ষণে হয়তো হয়েও গিয়েছে। সিরাজ জানতো বোধহয়।'

'তবে কেন গেল সে? কেন গেল?'

'মোহনলালের ভরসায়।'

'সে ভরসা কি আর নেই?'

'বোধহয় নেই। তাহলে সে এর মধ্যে আসতো। মীরজাফর নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত নির্লজ্জের মতো মোহনলালের বিরুদ্ধে তার সৈন্য লেলিয়ে দিয়েছে। অবশ্য এ সমস্তই আমার অনুমান।'

'আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। সব কিছু চিন্তার ক্ষমতা লোপ পায়।

ঘসেটি আমার চিবুক উঁচু করে ধরে আমার গালে চুমু খেয়ে বলে, 'বাংলার বেগমসায়েবা, তুমি শুধু হারেমের পুতুল নও, তুমি নবাবের সুখ-দুঃখের অংশের ভাগীদার। তৈরি থেকো। তোমার সাধের হীরাঝিল ত্যাগের জন্যেও মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করো।'

'আপনি তো আমার সঙ্গেই থাকবেন?'

'না, আমি দেখতে চাই, আমাকে নিয়ে ওরা কি করে?'

'যদি ওরা রাজবল্লভের হাতে তুলে দেয়?'

'আমি তো তাই চাই। রাজবল্লভের মরা-মুখ আমাকে দেখতেই হবে। কিন্তু তা কি কবে আর হবে? সে চতুর লোক। আমার ধারে-কাছেও আর ঘেঁষবে না বোধহয়।'

'কিন্তু নবাব কি সত্যিই পরাজিত?'

'আমার কথা যেন মিথ্যে হয়। যদি কেউ বলে যে আমি প্রাণ বিসর্জন দিলে এ সমস্ত মিথ্যে হবে, আমি তাতেও রাজি।'

'সিরাজের কি হবে?'

'পরাজিত নবাবের যা-যা হয় তারই একটা হবে। শোনো লুৎফা, যদি তোমাকে একলা কিংবা কারও সঙ্গে হীরাঝিল ছেড়ে পালাতে হয়, তাহলে কখনো জলপথে যেও না।'

'কেন?'

'জলপথে ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি। নদীর ধারে ধারে সৈন্যদের ঘাঁটি আছে। তাছাড়া নদীতেই যত ব্যবসা, যত কিছু। স্থলপথে গেলে নিজেকে লুকিয়ে রাখার সুবিধে অনেক বেশি।'

সেইদিনই গভীর রাতে সিরাজ এলো। চোরের মতো চুপিচুপি এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। তার চোখ-মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, কপাল কেটে রক্ত বার হচ্ছে। পোশাক ছিন্নভিন্ন, ধূলিমলিন, নগ্নমস্তক।

আমার সামনে দাঁড়িয়ে সিরাজ যেন কত সঙ্কুচিত, 'তোমাকে বিরক্ত করলাম, লুৎফা?'

'সে কি কথা?' ঘরের বাতি জ্বালিয়ে দিতে যাই।

সে আমার হাত চেপে ধরে, 'না-না, ও কি করছো?'

'এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকবে?'

'হ্যাঁ, নইলে ওরা যে দেখে ফেলবে।'

'কারা?'

'মীরজাফরের চর। সব জায়গায় আছে ওরা।'

'তবে কি ঘসেটি বেগমের কথাই সত্যি হলো?'

'ঘসেটি! সে কখনও বাজে কথা বলে না।'

'কি হবে, নবাব?'

সিরাজ আমার মুখ চেপে ধরে, 'চুপ, আমি নবাব হই। আমি, আমি.....'

'তুমি আমার নবাব।'

'এখনো একথা বলছো?'

'চিরকাল বলবো।'

'আমি আসায় তবে বিরক্ত হওনি?'

এবারে কেঁদে ফেলি, 'ওকথা কি করে বলছো তুমি?'

'ওরা বিরক্ত হলো কিনা, তাই বলছিলাম।'

'ওরা কারা?'

'অন্য বেগমরা। পুরোনো মহলেই আগে গিয়েছিলাম। আমার বেগমরা আজকের চেহারা দেখে হেসেই অস্থির। তাড়িয়ে দিলো। বললো, এতদিনে মনে পড়েছে। দূর হও। আর-একজন কে যেন চুপি চুপি ডেকে গঙ্গা পার করে দিলো। তাই তোমার কাছে এলাম।'

'ওরা নিষ্ঠুর, ওরা পাষাণ।'

'না লুৎফা, ওরাও তো মানুষ। আমি সেটা ভুলে গিয়েছিলাম।'

'তবু মানুষ হলে তোমার এ দুর্দিনে এভাবে উপহাস করতে পারতো না।'

'না-না, তারা ঠিকই করেছে।'

'থাক্ ওসব কথা, এখন ঠাণ্ডা হও। একটু ঘুমিয়ে নাও।'

'ঘুমিয়ে নেবো!' সিরাজ চমকে ওঠে। তারপরই পাগলের মতো হেসে ওঠে।

'কেন, তুমি কি করতে চাও?'

'পালাবো, পালাতে চাই।'

'কোথায়?'

'তা তো জানি না। তাই তো তোমার সঙ্গে শেষ দেখা করতে এলাম।'

এবারে আমার হাসির পালা। সত্যিই হাসি।

'তুমিও শেষে হাসলে, লুৎফা?'

'হাসির কথা বললে সবাই হাসে নবাব।'

'আবার নবাব?'

'হ্যাঁ, নবাব, নবাব, নবাব.....আমার নবাব।'

'কেন হাসলে?'

'তোমার শেষ দেখা করার কথা শুনে।'

'তুমি ঠিক বুঝছো না ব্যাপারটা।'

'সব বুঝেছি। তবু বলছি, শেষ দেখা অত সহজে হয় না।'

'তোমার কথায় হেঁয়ালি।'

'সব বলছি। একটু বসো।'

'বসবার সময় নেই।'

'বেশ, তবে একটু দাঁড়াও। হামিদাকে ডেকে আনি।'

'না-না, ডেকো না ওকে।'

'কেন?'

'ও হয়তো মীরজাফরের চর।'

'না নবাব, হামিদা আমার অনুগত। একটু দাঁড়াও।'

'কিন্তু ও যে আমাকে এ অবস্থায় দেখবে?'

'দেখুক, ক্ষতি কি? তোমার শত্রু নয় ও, বেগমও নয়। দেখে ও হাসবে না, কাঁদবে।'

হামিদা এসে সিরাজকে দেখে কাঁদতে কাঁদতে কদমকেশী করে। মেয়েটাকে তার কোলে তুলে দিয়ে বলি, 'নিজের মেয়ে ভেবে মানুষ করো হামিদা। যদি ভাগ্যবলে কোনোদিন তোমার দেখা পাই, তাহলে তোমার কাছ থেকে একে চেয়ে নেবো আবার।'

'এসব কি হচ্ছে!' সিরাজের মুখে বিস্ময়।

তার কথায় জবাব না দিয়ে সামান্য কিছু জিনিস কাঁধের ওপর ফেলে নিয়ে বলি, 'চলো।'

'কোথায়?'

'সে তুমি জানো।'

'আমি কোথায় যাবো তা তো জানি না, লুৎফা।'

'আমিও কি জানতে চাইছি? আমি বলছি, তুমি যেখানেই যাবে আমি সঙ্গে যাবো।'

'লুৎফা!' সিরাজ শিশুর মতো কেঁদে ওঠে।

তার মাথাটা বুকের মধ্যে চেপে ধরি, 'ভোর হতে আর দেরি নেই, নবাব।'

'চলো। মেয়েটাকে কি করবে?'

'হামিদা আমাদের সঙ্গে হীরাঝিলের বাইরে পর্যন্ত যাবে। তারপর সে নিজের পথে চলবে। আর আমি চলবো তোমার পথে।'

'আমার পথ তো সহজ নয়, লুৎফা। তুমি কি পারবে? তার চেয়ে হামিদার সঙ্গে চলে যাও মুর্শিদাবাদ ছেড়ে অনেক দূরে কোনো গাঁয়ে।'

'না, আমি বাংলার বেগম। বেগম কি কখনো নবাবের সঙ্গ ছাড়ে? বেগমরা যেমন সুখ-ঐশ্বর্য ভোগ করতে পারে, প্রয়োজন হলে তেমনি দুঃখও সহ্য করতে জানে।'

হীরাঝিলের বাইরে আসি সবাই মিলে। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে বেশিদূর অবধি হামিদাকে দেখতে পেলাম না। তবু যতক্ষণ দেখা গেল চেয়ে থাকলাম একভাবে, তার কাঁধের ওপর ঘুমন্ত পদ্মফুলের দিকে—বোঁটা ছিঁড়ে নেওয়া পদ্মফুল। অনেক কাঁদিয়েছি মেয়েটাকে, তবু কি কান্নার শেষ হয়েছে? হীরাঝিল থেকে মাটির ঘরে গিয়ে তার হাসি-কান্না দুই-ই হয়তো থেমে যাবে।

'দাঁড়িয়ে আছো কেন নবাব, যাবে না?' চোখের জল মুছে ফেলে বলি।

'হ্যাঁ যাবো, চলো।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিরাজ ধীরে ধীরে গঙ্গার পার ধরে চলতে থাকে। আমি অনুসরণ করি তাকে।

'দেখছো লুৎফা, গঙ্গা ভাঙতে ভাঙতে হীরাঝিলের দিকে কিরকম এগিয়ে আসছে? গ্রাস করবে শীগগিরই।'

'সেই ভালো। তাই হোক নবাব।'

হঠাৎ ঘসেটি বেগমের কথা মনে পড়ল। সে নদীপথে যেতে মানা করেছিল। সিরাজকে প্রশ্ন করি, 'আমরা কি ঘোড়ায় চড়ে যাবো?'

'না, বজরায়.....মানে নৌকায়। অন্ধকারে যে লোকটা আমাকে গঙ্গা পার করে দিলো, সেই ঠিক করে দেবে বলেছে। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষের সাধারণ পোশাকও সে যোগাড় করে এনে দেবে। অথচ মজা কি জানো, তাকে আমি চিনি না। মুর্শিদাবাদে আমার হিতৈষী এখনো কিছু কিছু আছে, লুৎফা।'

'অনেকেই আছে নবাব। যারা তোমার প্রকৃত পরিচয় জানে, অথচ শয়তানদের জন্যে তাদের কিছু করার উপায় নেই, তাদের অধীনে যে কোনো ফৌজ নেই। কিন্তু তোমার তো নদীপথে যাওয়া ঠিক হবে না।'

'কেন?'

'ধরা পড়তে পারি। ঘসেটি বেগম বলেছিল।'

'স্থলপথে যাবার কোনো আয়োজন তো করিনি।'

'তবু হেঁটেই যাবো।'

'আমার যে আর শক্তি নেই, লুৎফা।'

'কিন্তু এতে যে ধরা পড়তেই হবে। একটা নদীর দিকে নজর রাখা কত সহজ ওদের পক্ষে।'

'এখন সে-কথা বুঝছি: সুযোগ পেলে ঘসেটিকে কৃতজ্ঞতা জানাবো, আর যদি কখনো সেদিন আসে, বাংলার মসনদে তাকেই বসাবো।'

'নৌকায় যেও না, নবাব।' সকাতরে তাকে অনুরোধ করি।

'তাহলে এখানেই থাকি। আমি আর পারছি না, লুৎফা।' সিরাজ আমার কাঁধের ওপর ভর দিয়ে বসে পড়তে চায়। দেখলাম, তার কপালের ক্ষত দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

'না, চলো।' জানি, যেমন করেই হোক, যেতেই হবে থামলে চলবে না। হীরাঝিলের মায়া কাটাতে হবে, মুর্শিদাবাদকে ছাড়তে হবে। হয়তো বাংলাকেও ত্যাগ করতে হবে।

নিরুপায় হয়ে নৌকাতে গিয়ে উঠতে হয়েছিল। অন্ধকারের মধ্যে একজন পুরুষ সাধারণ কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে এসে বলে, 'এগুলো বদলে নিন। আপনাদের পোশাক গঙ্গার জলে ফেলে দেবেন।'

'ও! বেশ, তাই দেবো।'

'আমি চলি।' পুরুষটি বলে।

'যাও। কিন্তু তোমার পরিচয় তো দিলে না। তবু শেষ নিঃশ্বাস ফেলা অবধি তোমার কথা মনে থাকবে।'

'সেইটুকুই আমার সৌভাগ্য।' তার কথায় দৃঢ়তা। বিন্দুমাত্র বাষ্প নেই তাতে।

'উপকারীর পরিচয় না পেলে ভালো লাগে না, একথা জানো তো?' সিরাজ বলে।

তবে শুনুন, নবাব আলিবর্দির সমাধির ওপরে একখানা লাল বস্ত্র দেওয়া হয়েছিল, স্মরণ আছে আপনার?'

'হ্যাঁ আছে। কে দিয়েছিল নাম জানি না। তবে তাকে ভুলিনি, ভুলতে পারিনি। তাকে আসতে বলেছিলাম চেহেল-সেতুনে, কিন্তু সে আর আসেনি।'

'আমি তারই ছেলে।' পুরুষটি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়।

নৌকার ওপর একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে সিরাজ। সে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক। ভুলে গিয়েছে যে, চোরের

মতো পালিয়ে যাচ্ছে সে। বুঝলাম, উপকারী বন্ধুর চিন্তা তার মন অধিকার করে রয়েছে।

'পোশাক বদলে ফেলো, নবাব।'

'আর নবাব বলে ডেকো না। অভ্যাসটা বড় খারাপ। অন্ধকারে কে কোথায় লুকিয়ে রয়েছে কে জানে। পাশেই ওই জেলে-নৌকাটি হয়তো তাদের। দেখলে না, যে বন্ধুটি পোশাক দিয়ে গেল, সে একবারও নবাব বলে ডাকেনি। কারণ সে জানে, তাতে বিপদ ঘটতে পারে।'

ঠিক সেই সময় পারের কোনো গাছ থেকে পেঁচা ডেকে উঠল। সিরাজ আমার হাত চেপে ধরে বলে, 'দেখলে তো ধরা পড়ে গেলাম।'

'সে কি!'

'মীরজাফরের চরেরা চেঁচিয়ে উঠল, শুনলে না?'

'মানুষ নয়, পেঁচা ডাকলো। তুমি স্থির হয়ে বসো। মাঝ-নদীতে গিয়ে পোশাক বদলালেই চলবে।' বুঝলাম, পর পর কয়েকদিনের নিদ্রাহীনতা, পরিশ্রম আর দুর্ভাবনায় সিরাজের মস্তিষ্ক সুস্থ নয়।

'ও, পেঁচা? তাই বুঝি?' সিরাজ ছেলেমানুষের মতো হেসে ওঠে।

ভগবানগোলা অবধি সিরাজ একভাবে ঘুমোল। তবু ভালো যে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা জেনেও এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে সে ঘুমোতে পেরেছে। তবে তার জন্য আমার চোখে একবারে ঘুম নেই।

ভগবানগোলায় মাঝিরা নৌকা ছেড়ে ডাঙায় যেতে চাইল কিছু খেয়ে নিতে। সিরাজের জন্যেও সামান্য কিছু আনতে বললাম তাদের। তারা আমাদের চেনে। তাই বলেছিলাম, কোনোরকম ভাল খাবার যেন আনতে চেষ্টা না করে। সাধারণ যাত্রীরা যা খায়, তা পেলেই চলবে।

মাঝিরা ফিরে এলো, সঙ্গে এক ফকির। বোরখা টেনে দিয়ে মাঝিদের খাবারের কথা জিজ্ঞাসা করায় তারা বললো, 'খাবার তো আনিনি, দানাসায়েব নিজেই এলেন।'

'ইনি কে?'

'ফকির, খুব বড় ফকির।'

'কেন এলেন?' মনের ভয় চেপে রাখি।

'আমার সঙ্গে যাত্রী আছে শুনে উনি ছুটে এলেন।'

দানাসায়েব এবার নিজেই বিনীতভাবে বলে, 'আমার কুঁড়েঘর থাকতে বাজারের খাবার কেন খাবেন? মেহেরবানী করে সেখানে চলুন।'

'না-না, আমরা কোথাও যাবো না। আমরা নৌকাতেই থাকবো।'

'আপত্তি থাকলে যেতে বলছি না। তবে গেলে অনেক সুবিধে হতো।'

আমাদের কথাবার্তায় সিরাজের ঘুম ভেঙে যায়। সে সমস্ত শুনে দানাসায়েবের কুটিরেই যাওয়া স্থির করে। গোপনে আমাকে বলে, 'ভাগ্যই সব, লুৎফা। ভাগ্য খারাপ হলে শত চেষ্টাতেও নিজেকে বাঁচাতে পারবো না। তাই কোনো ব্যাপারে আপত্তি না করাই ভালো।'

দানাসায়েবের কুটিরে এসে কিন্তু ভালোই লাগল। হীরাঝিলে বাস করে কুটিরের এই শান্ত-শ্রীর কথা কল্পনা করা যায় না। এতটুকু জায়গা, অথচ পরিচ্ছন্ন আর ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে।

সেখানে বসেই আমার চোখের পাতা জড়িয়ে আসে। আর বসে থাকতে পারি না। সিরাজকে বলে একটু গড়িয়ে নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

ঘুম ভাঙল মানুষের চীৎকারে। ধড়মড় করে উঠে দেখি, দানাসায়েবের কুটির প্রাঙ্গণ সৈন্যসামন্তে ভরে গিয়েছে। সিরাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদেরই মধ্যে। আমাকে উঠে আসতে দেখে সিরাজ হেসে বলে, 'চললাম, লুৎফা।'

'কোথায়?'

'মুর্শিদাবাদে। এরা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে।'

'আবার যুদ্ধ করবে? এরা বুঝি তোমারই লোক।'

'এককালে আমারই ছিল। এখন আর নেই। দেখছো না....' একজন পুরুষকে দেখিয়ে দেয় সে। আমি চমকে উঠি। মীরণ!

'তাহলে কি....'

'হ্যাঁ, বন্দী আমি।' অদ্ভুত শান্ত তার স্বর।

'তোমার খাওয়া হয়নি।'

'খেতে দিলো না এরা। তাছাড়া খাবারের ব্যবস্থাও করেননি ফকির-সাহেব। ওটা এখানে নিয়ে আসার অজুহাত।'

দানাসায়েব নির্লজ্জের মতো হি-হি করে হেসে বলে, 'মুর্শিদাবাদে গিয়ে নবাব বাহাদুর কত ভালো ভালো খানা খাবেন, আমি শুধু তারই ব্যবস্থা করেছি।'

'চলো, আমিও যাবো।' সিরাজের পাশে গিয়ে দাঁড়াই।

'না, তোমাকে এখান থেকে ঢাকায় পাঠানো হবে। দাদিকেও সেখানে নিয়ে গিয়েছে এরা।'

'ঘসেটি বেগমদের?'

এতক্ষণে মীরণের মুখে কথা ফোটে। সে বলে, 'তারা এখনো মুর্শিদাবাদে আছে। তাদের ব্যবস্থা পরে করা হবে।'

'আমি সিরাজের সঙ্গে যাবো।'

'সম্ভব নয়।' মীরণের জবাব কঠিন।

'ওকে নিয়ে গিয়ে তোমরা কি করবে?'

'ঢাকায় বসে সব কিছুই আপনার কানে যাবে।'

সিরাজ বলে, 'চলি লুৎফা। জেদ করো না, লাভ নেই। ও তোমার সিরাজ নয়।'

'তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না?' চোখ দিয়ে আমার জল গড়িয়ে পড়ে। ইচ্ছে হচ্ছিল, উঠোনের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদি, কিন্তু বাংলার বেগমের পক্ষে সেটা দুর্বলতা। সিরাজ কৃষক নয়, আমিও কৃষক-পত্নী নই। কিন্তু হলে বড় ভালো হতো। কেঁদে শান্তি পেতাম।

সিরাজ এগিয়ে এসে বলে, 'দেখা হবেই আমাদের।' বুঝলাম, তার ইচ্ছে হচ্ছিল আমার চোখের জল মুছিয়ে দিতে, কিন্তু বোরখায় মুখ ঢাকা যে।

দেখা আর হয়নি। ঢাকায় এসে কিছুদিনের মধ্যেই সেই ভীষণ সংবাদ আমার কানে এলো। শুনে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলাম। ঢাকাতেও হাওয়া বয়। আমি ঢাকায় পৌঁছবার আগেই আমার সিরাজ পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

কিন্তু পথে সে-কথা আমাকে জানানো হয়নি। ওরা ভেবেছিল, জানালে আমাকে আর ঢাকায় নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারবে না। ঠিকই ভেবেছিল।

নেমক-হারামির দেউড়িতে এক গুপ্ত প্রকোষ্ঠে সোফিয়ার স্বামী মহম্মদের তরবারিতে আমার সিরাজ প্রাণ হারিয়েছে।

নবাব আলিবর্দির বেগমও আমার মতো মূর্ছা গিয়েছিলেন, কিন্তু সে মূর্ছা আর ভাঙেনি। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ নবাব আলিবর্দির সময়ে যাঁর পরামর্শে রাজত্ব চলতো, তাঁর এই মৃত্যুর কথা ইতিহাসে লেখা থাকবে কিনা জানি না।

একা থাকি ঢাকায়। পৃথিবীর সব রস শুকিয়ে গিয়েছে। গাছের পাতা পাংশু বর্ণ, আকাশের রং তামাটে। মানুষের চোখে দেখি রক্তের ক্ষুধা। তবু বেঁচে আছি। বেঁচে আছি ভরা যৌবন নিয়ে।

শুধু একটা ছোট্ট শিশুর মুখ মনের মধ্যে থেকে থেকে ভেসে ওঠে। সে-মুখের সঙ্গে সিরাজের মুখের কত মিল। তার কথা ভাবতে ভাবতে মনটা আনচান করে ওঠে। তখন ঘরময় পায়চারি করি। সে কি আর বেঁচে আছে? আমাদের মতো হামিদাও বোধহয় পথের মাঝে ধরা পড়েছে। সিরাজের শেষ চিহ্নটুকু তার বুক থেকে কেড়ে নিয়ে, তারই চোখের সামনে বোধহয় সিরাজের দেহের মতো খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলেছে শয়তানের দল।

ঘসেটি বেগম কোথায় রয়েছে কে জানে? আমিনা বেগমের খবরও রাখি না। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মীর্জা মহম্মদ নিরাপদে আছে কিনা জানি না। বলতে গেলে এই মীর্জা মহম্মদই আমিনা বেগমের নিজের ছেলে। সিরাজ ছিল নবাব আলিবর্দির কাছে, আর এক্রাম ছিল নওয়াজিস খাঁর সঙ্গে মতিঝিলে। তাঁর সবটুকু পুত্রস্নেহ সে একা ভোগ করেছে, সিরাজ আর এক্রাম ভাগ পায়নি।

হীরাঝিলেও আসতো না মীর্জা। তার মায়ের ভয় ছিল, পাছে কোনো চক্রান্তে পড়ে সে প্রাণ হারায়। তাকে শুধু আমি একবারই দেখেছি, নবাব আলিবর্দির সমাধিক্ষেত্রে। প্রায় সিরাজের মতো দেখতে, তবে দেহ অত সুঠাম নয়, একটু মেদবহুল আদুরে আদুরে ভাব। এক্রাম বড় হলে কিন্তু ঠিক সিরাজের মতো হতো।

বেগমগিরি আমার ফুরিয়ে গেল, কিন্তু প্রাণটুকু গেল না। সিরাজের নবাবী শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণও গেল। সে ভাগ্যবান। নবাব আলিবর্দির আদরের নাতি হিসাবে যার জীবন শুরু, মসনদ হারিয়ে বেঁচে থাকা তার পক্ষে বিড়ম্বনা। কিন্তু আমি তো জারিয়া ছিলাম, আবার কি জারিয়া হবো?

দানাসায়েবের কুটির প্রাঙ্গণে মীরণের চোখে যে ইঙ্গিত দেখেছিলাম, সেদিন তা ভেবে দেখার মতো মনের অবস্থা ছিল না, কিন্তু আজ ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠি। মীরণ হয়তো আমাকে অন্যান্য বেগমদের মতো হারেমের আসবাব হিসেবে ধরে নিয়েছে। মূর্খ বুঝতে পারেনি যে, যে-বেগম পরাজিত নবাবের সঙ্গে সাধারণ জেলেডিঙিতে করে হীরাঝিল থেকে বিদায় নেয়, সে শুধু হারেমের শোভা নয়; তার প্রাণ আছে। বুঝবেই বা কি করে? কতই বা বয়স? আমার চেয়ে বোধহয় ছোটই হবে। অথচ সাপের বাচ্চা ঠিক সাপ হয়েছে। মীরবক্সীকুল মানে নবাব মীরজাফরের সব দোষটুকু পুঞ্জীভূত হয়েছে তার দেহ-মনে।

আর জারিয়া হতে চাই না। কারণ, তাহলে মীরজাফরের হারেমে থাকতে হবে। সেখানে সোফিয়া থাকবে, মীরণও যাবে।

কিন্তু মীরণ যা ভেবেছে তাও হবে না। নতুন করে বেগমগিরি যদি করাতে যায় জোর করে, তার আগে মরবো।

সিরাজহীন হয়ে বেঁচে থাকার যে এত জ্বালা জানতাম না। সে যদি অত্যাচারী হতো, দুশ্চরিত্র হতো, তবু যেন ভালো ছিল। জানতাম, সে বেঁচে রয়েছে। একদিন না একদিন অকস্মাৎ আমার কাছে আসবেই। কিন্তু এখন সে যে নেই। সে আর আসবে না।

মরতেও পারি না। মেয়েটা এখনও বেঁচে রয়েছে হয়তো। হীরাঝিলে একসময় আত্মহত্যা করার জন্যে পাগল হয়েছিলাম। তখনও মেয়েটা আর সিরাজের কথা ভেবে পারিনি। তখন একদিন ছাদ থেকে

লাফিয়ে পড়ার আগের মুহূর্তে মেয়েটা পেটের মধ্যে নড়ে উঠেছিল, আর আজ সে আমার মনের মধ্যে নড়াচড়া করে।

ভয় হয়, কবে মীরণ সশরীরে এসে হাজির হবে, কিংবা প্রস্তাব পাঠাবে। দিনরাত শুধু সেই ভয়েই থাকি। আমার সিরাজ নেই, এখন আমি অসহায়।

কিন্তু প্রস্তাব এলো না। মীরণও এলো না। পরিবর্তে এলো বাংলার ভূতপূর্ব নবাবের বেগম হিসাবে আমার মাসোহারা। সায়েবরা নাকি এ ব্যবস্থা করে দিয়েছে। যতদিন বেঁচে থাকবো, মাসে মাসে কিংবা বছরে এইভাবে পেয়ে যাবো। নিশ্চিন্ত হলাম। একবার যখন সিরাজের বেগম হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছি, তখন আমাকে নিয়ে আর টানা-হেঁচড়া করবে না কেউ। মীরণের কবল থেকেও রক্ষা পেলাম।

বুড়ি জবেদা আমার কাছে থাকে। সে জারিয়া নয়। নওয়াজিস মহম্মদ খাঁ যখন ঢাকায় ছিলেন, সে তখন তাঁর কাছে থাকতো।

আমি যেদিন ঢাকায় এলাম, তার দু'চারদিন পরে সে এসে কেঁদে আকুল। চিনতাম না তাকে। তাই অপরিচিতা বৃদ্ধার কান্নায় অপ্রস্তুত হয়ে কারণ জানতে চেয়েছিলাম। তখনই আমার জীবনের সব চাইতে বড় সর্বনাশের কথা প্রথম জানাতে পারি। এর আগে সবাই জানতো, অথচ আমাকে অন্ধকারে রাখা হয়েছিল। এত বড় দুঃসংবাদ সেদিন সে দিয়েছিল, অথচ তাকে তাড়িয়ে দিইনি। তারই কোলের ওপর মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলাম। মূর্ছা ভাঙলে তাকেই জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলাম। তাকে দেখে মনে হয়েছিল, আমার ছেলেবেলার সেই বৃদ্ধা জারিয়ার কথা, আমাকে মানুষ করেছিল যে, যতদিন সে বেঁচেছিল, নিষ্করুণ বেগমমহলে একটু আদর আর স্বাদ শুধু তারই কাছে পেয়েছিলাম।

জবেদার কান্নায় সান্ত্বনা পেয়েছিলাম। মুর্শিদাবাদ থেকে ঢাকা কতদূর? অথচ এত দূরেও সিরাজদৌল্লার বিচ্ছেদে কাঁদে এমন মানুষও আছে।

মাসোহারা পেয়ে একটু আনন্দ হয়েছিল এই ভেবে যে মেয়েটা বেঁচে থাকলে তাকে আর হামিদাকে কাছে এনে রাখতে পারবো। সেই খবর জবেদাকে দিতে গিয়ে দেখলাম, প্রথম দিনের মতো সে আবার কাঁদছে।

'কাঁদছিস্ কেন, জবেদা?' আমার বুক দুরুদুরু করে। ঠোঁট শুকিয়ে ওঠে। আজকাল কথায় কথায় অমন হয়।

'আপনাকে শুধু দুঃসংবাদ দেবার জন্যেই কি আল্লা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন?'

'কী দুঃসংবাদ? আমার মেয়ে কি বেঁচে নেই?'

'সেইটুকুই শুধু ভালো খবর। আপনার মেয়ে বেঁচে আছে।'

'সত্যি বলছিস্, আমার মেয়ে বেঁচে আছে?' জবেদার চুপসে যাওয়া গালে অজস্র চুমু খেতে লাগলাম। ভুলে গেলাম যে আমি বেগম ছিলাম।

'এ কি করছেন? তটস্থ হয় বৃদ্ধা।

'তুই আমাকে আজ কি দিলি জানিস্ না। তোকে তো কিছু দেবার নেই আমার। শুধু এই মালা-ছড়াটা আছে, নে। সিরাজ থাকলে তোকে আমি কি যে করতাম জানিস্ নে, জবেদা।'

'ও মালা আপনি রেখে দিন। আমি কি করবো ওটা নিয়ে? আমার কি কেউ বেঁচে আছে? সেবারের বানে সব ভেসে গিয়েছে। জোয়ান ছেলে গিয়েছে, বৌ গিয়েছে, নাতি গিয়েছে, বুড়োও মরলো তার ঠিক পরেই।'

'তবু নে। যাকে ইচ্ছে বিলিয়ে দিস্।'

'আপনার কাছে রেখে দিন। মেয়েকে দেবেন। এতদিন পরে যাচ্ছেন।'

'কোথায় যাচ্ছি!' অবাক হই।

'মুর্শিদাবাদে। আপনাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে।'

'সে কি! কেন? বুকের ভেতরে ছ্যাঁৎ করে ওঠে। মীরণের মুখখানা চোখের সামনে দাপাদাপি করে।

'খোসবাগে থাকবেন আপনি। নবাব সিরাজদ্দৌলা যেখানে রয়েছেন। আপনি খোসবাগের দেখাশোনা করবেন। সায়েবদের হুকুম হয়েছে নবাব মীরজাফরের ওপর।'

খোসবাগ! কি শান্ত কথা! সিরাজ শুয়ে রয়েছে সেখানে। আমি সেখানে যাবো। আমার এমন সর্বনাশ করার পরও সায়েবদের এ দয়া কেন? নারীর অভিশাপের ভয়ে? সে সব বালাই কি তাদের রয়েছে? হয়তো আছে, নইলে গাছের গোড়া কেটে আবার তাতে জল ঢালা কেন? তবু এতে যেন মন সত্যিই শান্তি পাচ্ছে।

'কে বললো এ কথা? কার কাছে শুনলি?'

'যে খবর এনেছে, সে আবার আসবে। আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন বলে ফিরে গিয়েছে।'

'তুই কি পাগল হলি, জবেদা? তুই তো জানিস, আমি ঘুমোই না।'

'জানি। কিন্তু আপনি তখন ভাবছিলেন নবাবের কথা। আপনার মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল। আমি গিয়ে দাঁড়াতেও আপনি টের পেলেন না। সে সুখস্বপ্ন ভাঙাতে চাইনি আমি।'

জবেদা সব বোঝে। সেও যে আমার মতোই দুঃখিনী। জেগে জেগে আমারই মতো স্বপ্ন দেখে সে। জেগে জেগেই কত সময় সদ্য ফেলে আসা অতীতের মধ্যে ফিরে যাই আমি। ভুলে যাই যে, আমি ঢাকায় রয়েছি। মনে হয়, হীরাঝিলের সেই সজ্জিত কক্ষে বসে রয়েছি, সিরাজ সামনে দাঁড়িয়ে। সিরাজের স্পর্শও অনুভব করি। কিন্তু তারপরই রূঢ় বাস্তব সে-স্বপ্ন ভেঙে দেয়। তাই আমি কেঁদে ফেলি।

জবেদা বলে, 'আপনি চলে যাবেন, তাই কাঁদছিলাম।'

'তুই বড্ডো হিংসুটে জবেদা। এ তো সুসংবাদ। খোসবাগে থাকবো আমি, সেখানে সিরাজের কাছে প্রতিদিন বাতি দেবো। ধীরে ধীরে আমার দেহে আসবে বার্ধক্য—নুয়ে পড়বে আমার শরীর। তবু কম্পিত হাতে বাতি নিয়ে গিয়েই হয়তো ঢলে পড়বো তার পাশে, আর উঠবো না। এর চেয়ে সুখ আর কি আছে রে জবেদা? এরজন্যে তুই কাঁদিস?'

'আর কাঁদবো না, বেগমসায়েবা। সত্যি আমি হিংসুটে। নিজের দিকে শুধু আমি চেয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখ হয়, ঘসেটি বেগম আর আমিনা বেগমের জন্য। শেষে এই হাল হলো তাঁদের।'

'কি হয়েছে? কোনো খবর এসেছে?'

'হ্যাঁ। সেই কথাই তো বলতে বাধছিল এতক্ষণ। মীরণের হুকুমে তাঁদের ডুবিয়ে মারা হয়েছে। মাঝ-নদীতে বজরা নিয়ে গিয়ে বজরা ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

আমার অনুভূতি শক্তি নিশ্চয় অনেক কমে গিয়েছে ঘা খেয়ে-খেয়ে। নইলে এ সংবাদে বিশেষ বিচলিত হলাম না কেন? কিংবা সিরাজের কাছে ফিরে যাবো বলে, মেয়েটাকে পাবো বলে একটু আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছি কি?

আবার মুর্শিদাবাদে ফিরে এলাম। এ মুর্শিদাবাদের মসনদে সিরাজ নেই। এখানকার পুরোনো মহলে আমিনা বেগম ঘুরে বেড়ান না। মতিঝিলে নেই ঘসেটি বেগমের দাপট। তবু মুর্শিদাবাদ আছে—আগের

মতোই রাস্তায় লোকও চলছে। ছেলেরা খেলা করছে। ভেবেছিলাম এসে দেখবো, গাছপালার সব পাতা ঝরে গিয়েছে, গঙ্গার জল শুকিয়ে গিয়েছে। মানুষের মুখ হয়েছে রক্তশূন্য। কিন্তু তা তো নয়। সবই আগের মতো আছে। শুধু সে নেই।

কিরীটেশ্বরীর মেলায় যাবার জন্যে হিন্দুরা আগের মতোই খেয়া পার হচ্ছে। কাটরার মসজিদে তেমনি আজানধ্বনি। গঙ্গা বয়ে চলেছে, যেমন বয়ে চলতো মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে। এমনি বয়ে চলবে চিরকাল—যখন মীরজাফর থাকবে না, মীরণ থাকবে না, ইংরেজরা থাকবে না, কেউ থাকবে না। হাওয়ায় এখনো গাছে কাঁপন লাগে।

সবাই নেমক-হারাম। কিছুই মনে রাখতে চায় না। কেউ স্বীকার করে না, এই মুর্শিদাবাদের মসনদে কিছুদিন আগেও এক সুন্দর যুবক শোভা পেতো। বালক হয়েও যে বর্গীর হাঙ্গামার সময় দিনরাত ছোটাছুটি করেছে দেশকে বিপদ থেকে মুক্ত করবার জন্যে, সে আজ নেই। সবাই সব ভুলেছে, শুধু আমি কিছুই ভুলিনি।

জোড়া বলদে টানা একখানা সাধারণ গাড়িতে করে মুর্শিদাবাদের রাস্তা দিয়ে আমি চলেছি খোসবাগের দিকে। আর নাকি বেশিদূর নেই।

বুকের ভেতর কাঁপন ধরেছে। মুখ গরম হয়ে উঠেছে। এমন গরম হলে নাকি মেয়েদের মুখ রক্তিম হয়ে ওঠে। কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা ভাব। কিছুতেই নিজেকে সহজ করতে পারছি না। যুদ্ধে কিংবা অন্য কোনো কাজে বাইরে গিয়ে বহুদিন পরে সিরাজ ফিরে এসে আমার কাছে এলে অমন হতো। কি বলবো ভেবে পেতাম না, কি করবো তাও বুঝতে পারতাম না। কথা বলতে বাধো-বাধো ঠেকতো, দু-পা জড়িয়ে আসতো, আজ আবার ঠিক তাই হচ্ছে।

গাড়ি যত এগিয়ে চলেছে, বুকের কাঁপুনি ততই বাড়ছে। মনকে কতবার শান্ত করবার চেষ্টা করি, পারি না। মন অবাধ্য—সিরাজের কাছে গেলে চিরকাল যেমন অবাধ্য হয়েছে। গাড়োয়ান শেষে এক জায়গায় এসে থেমে যায়।

'এখানেই নামতে হবে। গাড়ি আর ভেতরে যাবে না।' সে বলে।

সামনে চেয়ে দেখি, রাস্তা শেষ হয়েছে একটা উঁচু দরজার কাছে এসে। সেটা বন্ধ। এই তো সেই জায়গা। নবাব আলিবর্দির মৃত্যু হলে এখানেই তো এসেছিলাম বটে, কিন্তু তখন তো এত নির্জন ছিল না জায়গাটা।

দেওয়াল দিয়ে ঘেরা জায়গাটার ভেতর থেকে আমগাছের শাখা-প্রশাখা প্রাচীর ডিঙিয়ে বাইরে এসে ঝুলে পড়েছে। ভেতরে পাখিদের মেলা বসেছে। তাদের কিচিরমিচির ডাকে কান ঝালাপালা।

গাড়ি থামিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও চুপ করে বসে থাকি। জানি যে, উঠে দাঁড়াতে পারবো না, পড়ে যাবো। ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ে আমার—হাঁপালে যেমন হয়।

যে বাঁদী এসেছিল আমার সঙ্গে, সে একটু অবাক হয়। বলে, নামুন বেগমসায়েবা।

'এই নামছি, আমাকে একটু ধরবি? পায়ে ঝিঁঝি লেগেছে।'

সে তাড়াতাড়ি এসে আমাকে ধরে। তার কাঁধে দেহের সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে পড়ি।

'এই হলো খোসবাগ—গোরস্থান।' বাঁদী বলে।

'ছেড়ে দাও আমাকে।'

'আপনি যে বললেন.....

কী বিশ্রী কথা! মনে হলো, এক ধাক্কায় তাকে ফেলে দিই।

'ছেড়ে দাও।' কথাটা একটু জোরে হয়েছিল। সে ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেয়।

'দরজা বন্ধ কেন? প্রশ্ন করি।

'এই যে চাবি, নিন।' সে খোসবাগের চাবি আমার হাতে দেয়।

প্রকাণ্ড দরজা। দারোয়ান গায়ের জোরে ঠেলে খোলে। সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে ফুলের গন্ধ এসে মন জুড়িয়ে দেয়। নানান গাছ আর লতাপাতায় মিশে একটা স্তব্ধ কুঞ্জ।

ভেতরে প্রবেশ করতেই পাখির ডাক থেমে যায়। আমাদের দেখে বোধহয় বিব্রত হয়েছে তারা। প্রাণভরে সিরাজকে গান শোনাচ্ছিল, বাধা পেলো আমাদের আগমনে। ফিরে এসে আবার প্রাচীরের বাইরে দাঁড়াই, যদি তারা শুরু করে তাদের গান।

'ভেতরে যাবেন না, বেগমসায়েবা?'

'চুপ।' কিন্তু পাখিরা আর ডাকে না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও নয়।

হতাশ হয়ে আবার ভেতরে যাই। দরকার নেই পাখির গানে, আমি শোনাবো গান আমার সিরাজকে।

'তুমি এখন যেতে পারো।' বাঁদীকে বলি।

'আপনার এখানেই থাকবো আমি।'

'থাকো, কিন্তু এখন একটু বাইরে যাও।' সিরাজকে আমি একা পেতে চাই, যেমন পেতাম হীরাঝিলে। প্রিয় মিলনের সময় বাইরের লোকের উপস্থিতি—ছি ছি!

বাঁদী চলে যায়। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই, যেখানে নবাব আলিবর্দির সমাধি রয়েছে—শুনেছি তাঁর কাছেই রয়েছে সে।

রক্তবর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত সমাধি। তার পাশেই এ কি! সেই কৃষ্ণবস্ত্র—আলিবর্দির মৃত্যুদিনে সিরাজ যে বস্ত্র ফিরিয়ে দিয়েছিল। সেদিন মূল্যবান বস্ত্রটির অপচয় হবে ভেবে অনেক রাজা-উজির মৃদু আপত্তি তুলেছিলেন। শেষে মৌলানার কথার জবাবে সিরাজ কি বলেছিল, এখনো কানে স্পষ্ট ঝংকৃত হচ্ছে, 'নবাব বংশ এখনো নির্বংশ হয়নি।' কথাটা শেষে এইভাবে সত্যি হলো?

লুটিয়ে পড়ি। আমার সিরাজ! মনে হলো, কে যেন হেসে উঠল। নবাব আলিবর্দি কি? আদরের নাতিকে কাছে পেয়ে আমার দুর্দশা দেখে হাসছেন তিনি। না, তিনি নন। তিনি হাসবেন না। তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে বিভীষিকার মধ্যে কচি শিশুকে টেনে নিয়ে গিয়ে তাকে শক্ত-সমর্থ করে গড়ে তুলতেন না। মৃত্যুশয্যায় তাকে কাছে ডেকে নিয়ে কোরান স্পর্শ করে শরাব খাওয়া ছাড়াতেন না। ভালোবাসার প্রবল উচ্ছ্বাসের মধ্যেও তাঁর একান্ত সাধ ছিল, সিরাজ হবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সার্থকতম নবাব। তাঁর সে-সাধ পূর্ণ হলো না বিশ্বাসঘাতকদের জন্যে। তাই নাতিকে কাছে পেয়েও এক তীব্র বেদনা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আলিবর্দি হাসতে পারেন না।

খোসবাগের প্রবেশ পথে চোখ পড়ে। দেখি, সেখানে বাঁদী গাড়োয়ানের সঙ্গে হাসাহাসি করছে। সেই হাসিই তবে কানে এসেছে।

পাখিরা আবার মিষ্টি গান গাইতে শুরু করেছে। তারা বুঝে ফেলেছে, আমি তাদেরই। এই কৃষ্ণ আর রক্তবর্ণ বস্ত্রের পাশে এক শুভ্রবর্ণ বস্ত্র মাত্র। আমার আলাদা কোনো সত্ত্বা নেই।

গাছের পাতা ঝরে পড়ছে, ফুল দুলছে। দুই সমাধির ওপর অজস্র ফুলের গালিচা.....আরও ঝরছে। আমার অশ্রু ঝরছে। তারা নিঃশেষিত হতে চায়। কী ব্যথা আর কী আনন্দ!

'বেগমসায়েবা।'

'কে?' পেছন ফিরে দেখি বাঁদী। 'কে তোমাকে আসতে বললো এখানে?'

সে কথা বলে না।

'তোমাকে কে পাঠিয়েছে এখান থেকে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে?'

'নবাব।'

'নবাব! ও, মীরজাফর?'

'হ্যাঁ, বেগমসায়েবা।'

'আগে তুমি কোথায় থাকতে?'

'জাফরাগঞ্জে।'

'তোমাকে আমি চাই না।'

'নবাবের হুকুম।'

'নবাবকে বলো, তার হুকুম আমি মানি না।'

বাঁদী চমকে ওঠে।

'হামিদাকে চেনো?'

'হ্যাঁ, সে আসবে। সে এলে আমি চলে যাবো।'

'তুমি এখনই যাও। আমি একা থাকবো।'

'আপনার অসুবিধে....'

'কিছু অসুবিধে হবে না। তুমি চলে যাও।'

বাঁদী চলে যায়।

ছুটতে ছুটতে আসে হামিদা। তার কোলে সিরাজের অবশিষ্ট। হামিদা ছোটে আর হাসে, সে ছোটে আর কাঁদে। আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করি। সে কাছে এলে তাকে জড়িয়ে ধরি।

'আমাকে নয় বেগমসায়েবা, আমাকে নয়। এই যে একে ধরুন।' সে মেয়েকে দিতে চায় আমার কোলে।

'না-না, তুমি হামিদা। ও নয়।'

'বেগমসায়েবা, আমি জারিয়া।'

'আমিও জারিয়া ছিলাম, হামিদা। আজ তুমিও জারিয়া নও। তুমি নবাব মহলে নেই এখন। বেগম মহলেও নেই। তুমি আছো আমার কাছে। আমার কাছেই থাকবে। তুমি আমার বোন, হামিদা।'

মেয়েকে নামিয়ে দিয়ে সে এতক্ষণে আমাকে দু'হাত দিয়ে আকুলভাবে বেষ্টন করে ফেলে। সে-হাত দুটোয় কোনো সঙ্কোচ নেই, কোনো দ্বিধা নেই—বোনের হাতের মতোই মায়া-ভরা, স্নেহ-ভরা। মনে হলো, ঘসেটি বেগমের আদেশে তার যে বোনকে একদিন ছাদ থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, তাকেই এতদিনে ফিরে পেয়েছে সে।

পাখির ডাক থিতিয়ে আসে, অন্ধকার নেমে আসে ধীরে ধীরে। এ রাত্রি যদি আর কখনো না কাটে। গাছের পাতায় ঝিরঝিরে বাতাসের শব্দ। এ বাতাস ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে যদি প্রলয় ঘটিয়ে একরাত্রে পৃথিবীকে রসাতলে দেয় খুব ভালো হয়।

'শুধু নবাব আলিবর্দি আর নবাব সিরাজদ্দৌলা নন, আর একজনও এসেছেন এখানে।' হামিদা

বলে।

'কে সে? কোন্ হতভাগ্য?' নতুন একটা সমাধি আমিও দেখেছি খোসবাগে—নগ্ন হয়ে রয়েছে অবহেলিত অবস্থায়। প্রথমে বিস্মিত হয়েছিলাম, ভেবেছিলাম বুঝি সমাধি নয়।

'মীর্জা মহম্মদ। নবাব সিরাজদ্দৌলার শরীরে যে-রক্ত, তাঁর শরীরেও যে সে-রক্ত ছিল। তিনি কি বেঁচে থাকতে পারেন?'

'হুঁ। আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল। আমিনা বেগমের স্নেহের পুতুল। তার কাছেও বাতি দেবো, হামিদা।'

'মীর্জা মহম্মদ নবাবের চেয়েও হতভাগ্য। নবাবকে মৃত্যুযন্ত্রণা পেতে হয়নি। মীরণের সে ইচ্ছে থাকলেও, নবাবের চোখের দিকে তাকিয়ে শয়তান মহম্মদ বোধহয় কেঁচোর মতো কুঁচকে গিয়েছিল। কোনোরকমে এক আঘাতে শেষ করে পালিয়েছিল। তাই তাঁর মৃতদেহ নিয়ে অত তাণ্ডব চলেছিল।'

'থাক্ থাক্ হামিদা, আমি শুনতে চাই না।'

'শুনতে হবে বোন, সব শুনতে হবে। নবাবের দেহ নিয়ে ওরা যত বীভৎস কাণ্ডই করুক না, নবাবকে তা সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু মীর্জাকে এরা তিলে তিলে মেরেছে। শরীরের দু'পাশে দুটো তক্তা রেখে চেপে ধরে হত্যা করা হয়েছে।'

'হামিদা, ওরা কি মানুষ?

'হ্যাঁ বোন, এরা মানুষ। পৃথিবীতে অমানুষ জন্মাতে পারে না। তাই স্বার্থের নেশায় প্রলোভনে পড়ে, কিংবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, মানুষের মনুষ্যত্ব কিছুকালের জন্যে মন থেকে উধাও হলেও, পরে তা আবার ফিরে আসে। ফিরে আসবেই। তখনই হয় অনুশোচনা, তখনই হয় অশান্তি। মহম্মদ শুনেছি পাগল হয়ে গিয়েছে।'

'আর সোফিয়া?'

'সে এখন সৈন্যসামন্তদের উপভোগের সামগ্রী।'

'আম্‌মা.....'

চেয়ে দেখি, মেয়েটা ডাকছে। আমার সিরাজের মেয়ে—সিরাজের মুখের আদল। দু'হাত দিয়ে তার মুখ উঁচু করে ধরে বলি, 'ডাকছো আমাকে?'

'ন্‌না।' সে হামিদাকে দেখিয়ে দেয়।

'ও আমাকেই মা বলে জানে।' হামিদা হেসে বলে।

'সেই ভালো। আমি আর মা হতে চাই না, হামিদা। আমি শুধু বেগম—আমি সিরাজের বেগম।'

মমতাজ-দুহিতা জাহানারা

মনে পড়ে সেই বিশেষ দিনটির কথা। তুর্কি বেগমের শ্বেত হর্ম্যের ছায়া পড়েছিল প্রাসাদের সামনের স্বচ্ছ সরোবরে। জুম্মা মসজিদের বুলন্দ দরওয়াজার মাথা সূর্যের শেষ আলোয় রাঙা হয়ে উঠেছিল। প্রাসাদের ক্ষুদ্র গুলিস্থানে খেলা করছিলাম আমি আর আমার ছোট বোন রোশনারা।

কতই বা বয়স হবে তখন? যৌবন তখন ঠিক এক কদম দূরে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে। বসন্তের হাওয়া, ফুলের গন্ধ আর পাখির গান নাম-না-জানা এক স্বপ্নপুরীর ইঙ্গিত শুরু করেছে মাত্র। স্পষ্ট ধারণা করতে পারি না কিছুই। মন তাই চঞ্চল। রোশনারা আমার চেয়েও চঞ্চল। কথায় কথায় ওর মুখের ত্বকের নীচে সারা শরীরের রক্ত এসে নৃত্য করে। সে এক ব্যথাভরা পুলকে ঘাসের গালিচার ওপর শুয়ে গড়াগড়ি দেয়। তাকে দেখে আমারও শরীরে কেমন যেন একটা শিহরণ জাগে—বুঝতে পারি না। রোশনারার মতো আমারও গড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়। কিংবা গুল-আবাস বৃক্ষের কাণ্ডের ওপর নিজের দেহটিকে এলিয়ে দিতে বাসনা জাগে। কিন্তু পারি না। মনে হয়, এইভাবে আনন্দ-প্রকাশের মধ্যে কোথাও যেন এক রুচি-বিকৃতি লুকিয়ে রয়েছে।

খেলতে খেলতে একসময় রোশনারা ছুটে আসে আমার পাশটিতে। সরোবরের অপর পারের দিকে আঙুল উঁচিয়ে দেখায়। চেয়ে দেখি এক রাজপুরুষ ধীর পদক্ষেপে হেঁটে চলেছেন অনির্দিষ্টভাবে। বোধ হয় বায়ু সেবন করছেন।

রোশনারার চোখের তারা দুটি উজ্জ্বল। কানের কাছে মুখ এনে উত্তপ্ত নিশ্বাস ফেলে মৃদুস্বরে বলল,—কী সুন্দর। তাই না?

কেন যেন আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। তাড়াতাড়ি বলে উঠি,—জানি না। যা।

—ইস্। রোশনারা আমার চিবুক ধরে নাড়া দিয়ে হরিণীর মতো লাফাতে লাফাতে গুলমিন্দা গাছের পাশে বসে পড়ে। ফুলের গায়ে গাল ঠেকায়।

ঠিক সেই সময়ে সেখানে প্রবেশ করেন আমাদের পিতা—শাহানশাহ্ সাজাহান। মুখে তাঁর স্মিত হাসি। হাতে তার দু'খানি সুদৃশ্য মোটা কিতাব।

আমরা সোজা হয়ে বসি।

তিনি দু'জনার মুখের দিকে চেয়ে বলেন,—এ দুটি কেন এনেছি জান? তোমাদের দু'জনকে দেব বলে।

কৌতূহল দমন করতে পারি না। বলে উঠি,—কার লেখা বাবা?

—কারও নয়। এমন সুন্দর বাঁধাই, অথচ ভেতরে রয়েছে সাদা পাতা। তোমরা লেখাপড়া শিখেছ। তোমাদের হাতের লেখায় এ দুটি একদিন সুন্দরভাবে ভরে উঠবে।

আনন্দ চেপে রাখতে পারি না। বলে উঠি,—কি লিখব বাবা?

—যা খুশি। তবে আমার মনে হয় আত্মকাহিনী লেখাই সব চাইতে ভাল। তৈমুর বংশের সেদিকে একটা জন্মগত কুশলতা আছে। এখনকার দিনের ঘটনাবলী যেন স্থান পায় তোমাদের লেখায়। শুধু নিজের সুখদুঃখের কাহিনী লিখে কি লাভ?

কিতাব দু'খানি আমাদের দুজনার হাতে দিয়ে বাদশাহ্ ধীরে ধীরে গুলিস্থান থেকে বার হয়ে প্রাসাদের দিকে চলে যান। তাঁর শরীরের আতরের খুশবু ফুলের গন্ধকে ছাপিয়ে অনেকক্ষণ ধরে

হাওয়ায় ভাসতে থাকে।

কিতাব পেয়ে আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ চমকে উঠি, চেয়ে দেখি রোশনারা রাগে কাঁপছে। তার নাসারন্ধ্র ফুলে ফুলে উঠছে। তার কিতাবটিকে সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ঘাসের ওপর।

—রোশনারা? তুই ফেলে দিলি?

—আমি সব জানি, সব বুঝি।

—কি বুঝিস তুই। পিতার স্নেহের উপহারকে এভাবে অবহেলা করার ব্যথা বুকে নিয়েও বিস্মিত হয়ে শুধাই।

—চেষ্টা করলে তুমিও বুঝবে।

বিরক্ত হই। বয়স তো হলো ওর মাত্র চোদ্দ বছর। এর মধ্যেই যেন একটা বন্য ভাব প্রভাব বিস্তার করছে ওর স্বভাবে।

বলি,—হেঁয়ালি ছাড়্। কেন এভাবে ছুঁড়ে ফেললি?

—একটু আগে সরোবরের ওপারে যে রাজপুরুষকে দেখলাম, ওঁকে আগেও দেখেছি। খুব সুন্দর দেখতে। কোথাকার যেন রাজা। ও একদিন দেওয়ান-ই খাসে আসছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে চেয়ে দেখছিলাম আমি। হঠাৎ পেছন থেকে হেসে উঠেছিল আওরঙজেব। কাছে এসে কি বলল জানিস?

—কি বলল?

—বলল, সবাইকে এমন দেখে দেখেই স্বাদ মেটাতে হবে শাহ্‌জাদী। শাদি আর তোমাদের হবে না।

—তার মানে?

—বাদশাহ্ আকবরের নির্দেশ। মুঘল শাহ্‌জাদীরা থাকবে চিরকুমারী।

রোশনারার কাছে নতুন হলেও, নতুন কথা নয়। হারেমের সবাই জানে। আমিও জানি।

বিষণ্ণ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ছিল রোশনারা। সে ভঙ্গীর দিকে দৃষ্টি ফেলে আমার নিজের ভবিষ্যৎও যেন জীবনে প্রথম স্পষ্ট দেখতে পাই। গুলিস্থানের ফুলের গন্ধ তাই ফিকে বলে বোধ হয়। সরোবরের স্বচ্ছ জল ঘোলাটে দেখায়। তুর্কি-বেগমের শুভ্র প্রাসাদ ম্লান।

মনের বিক্ষিপ্ত চিন্তাকে সংযত করে বলি,—তাই বলে কিতাবখানাকে ওভাবে ফেলে দিলি?

জ্বলে ওঠে রোশনারা। চেঁচিয়ে বলে,—চালাকি। বাদশাহের চালাকি। নিজেরা সব কিছু করবেন, আর আমরা হারেমে বন্দী হয়ে থেকে নাজীরের (দাসী) মুখ দেখে দেখে জীবন কাটিয়ে দেব, তোফা!

—ছিঃ রোশনারা। ওভাবে বলতে নেই।

—বলব। একশোবার বলব। হাজারবার—। রোশনারা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

ওর পিঠের ওপর হাত রাখি, মনের খেদ ওর অমূলক নয়। সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই, ওর কথা শুনে নিজেও যে সান্ত্বনা খুঁজে পাই না। যে যৌবন সূর্যাস্তের পূর্বে এক কদম দূরে থমকে দাঁড়িয়েছিল, সূর্যাস্তের সঙ্গে সে আমাদের দেহ-মনকে অধিকার করে বসে। কৈশোরের চাপল্য জীবন থেকে চিরবিদায় নিল।

সবুজ ঘাসের খাঁজে খাঁজে অন্ধকার জমে আরও গাঢ় করে তুলেছে। তারই ওপর রোশনারার কিতাবখানি একদলা কালো রক্তের মতো পড়ে থাকে।

মুঘল-শাহজাদীর আত্মকাহিনী। লিখতে বসলে হয়তো তা ব্যর্থ যৌবনের বিলাপ হয়ে ফুটে উঠবে। তবু লিখব। পিতার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখব না। ভবিষ্যতের মানুষ আমার জীবনীতে যৌবনের ক্রন্দন শোনে শুনুক—কিন্তু সেই সঙ্গে আরও কিছু লাভ করে যেন কৃতার্থ হয়।

অদূরে প্রাসাদের অসংখ্য রোশনাই জ্বলে ওঠে। একটু পরেই দেওয়ান-ই খাসের পাশের বারান্দা

দিয়ে নর্তকীদের আনাগোনা শুরু হবে, তাদের ঝুমুরের শব্দে আগ্রার প্রাসাদ উচ্চকিত হবে।

রোশনারাকে ধীরে ধীরে নাড়া দিয়ে বলি,—ওঠ্! সন্ধে হলো।

—না।

—বাবার ওপর রাগ করিস কেন? নির্দেশটা বাদশাহ্ আকবরের।

—তাই বলে সেটা চালু থাকবে?

—থাকবে কিনা কে বলতে পারে। তেমন দিন তো আসেনি।

—আসবে।

হেসে ফেলি,—আগে আসুক!

রোশনারা তবু বসে থাকে মুখ গুঁজে।

—উঠবি না? বড় দেরিতে রাগ করলি কিন্তু। আওরঙজেব তো কবেই কথাটা বলেছিল। এতদিন কিছু মনে হয়নি?

রোশনারা মুখ তোলে। আমার দিকে সোজা দৃষ্টি ফেলে বলে ওঠে,—না। কথাটা শুধু কান দিয়ে শুনেছিলাম। মনের মধ্যে যায়নি। কিন্তু আজ—

—আজ কি?

—ওকে আবার দেখেই বুঝলাম কি-ভীষণ নির্দেশ। আমি পারব না। কিছুতেই পারব না।

স্তব্ধ হয়ে যাই।

গুলিস্থানের সবটাই অন্ধকার হয়ে ওঠে। গাছপালা আর চেনা যায় না। আন্দাজে রোশনারার কিতাব তুলে নিয়ে এসে বলি, এটি তবে আমিই নিলাম।

—নে। বাবার বাধ্য মেয়ে তুই। তোকেই দিলাম। কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর, যা লিখবি সব যেন সত্যি হয়। মিথ্যের ছিটেফোঁটাও যেন না থাকে তোর লেখায়।

—বেশ প্রতিজ্ঞা করলাম।

গুলিস্থান থেকে প্রাসাদে আসি। রোশনারার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাড়াতাড়ি মায়ের শয়নকক্ষের দিকে চলতে শুরু করি। মনে যখন সন্দেহ জাগে, সংশয়ের দোলায় যখন দুলতে থাকে মন, তখনই মা যেন তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেন। তাঁর কাছে একবার গিয়ে দাঁড়াতে পারলে আমার সব সংশয়, সব অতৃপ্তি তামাকুর সাদা ধোঁয়ার মতো মুহূর্তে অনন্ত আকাশে মিলিয়ে যায়। মা আমার সংযম আর শান্তি, ধৈর্য আর সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি, এতগুলি সন্তানের জননী হয়েও তাঁর রূপের দরিয়ায় কিছুমাত্র ভাঁটা পড়েনি। শুধু গালের সেই রক্তিমাভা এখন আর তেমন দেখা যায় না। মুখখানি যেন সাদা মোম দিয়ে তৈরি। তাঁর ওই অপূর্ব ছন্দের দেহখানাই মোমের মতো মসৃণ আর শুভ্র।

হাকিম বলেছে রক্তাল্পতা দেখা দিয়েছে মায়ের শরীরে। বাদশাহের সেজন্যে দুশ্চিন্তার অবধি নেই। তাঁর সারাদিনের হাসিমাখা মুখের ওপরেও কিসের যেন ছায়া লেগে থাকে। তাঁর আদেশে নাজীররা আঙুরের নির্যাস নিয়ে হাজারবার ছোটাছুটি করে। খাওয়ার জন্যে সাধে মাকে। মা হাসেন। পিতার ব্যস্ততা বসে বসে উপভোগ করেন তিনি।

মায়ের প্রতি বাদশাহের এই অনুরাগ প্রথম দর্শনের পর থেকেই, সে গল্প শুনেছি হারেমের বৃদ্ধা নাজীর শাহ্জাদীদের মুখে। পিতামহ জাহাঙ্গীর তখন মসনদে। নওরোজ উপলক্ষ্যে সে সময়ে দেশের সেরা সুন্দরীদের বাজার বসত প্রাসাদের আঙিনায়। সেই রকম এক বাজারে একটি ছোট্ট বিপণী খুলে বসেছিলেন এক অমাত্যের ঘরণী নাম তাঁর আরজমন্দ বানু। অন্যান্য শাহ্জাদাদের সঙ্গে আমার পিতাও সেই বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। জিনিস কেনাকাটা গৌণ, মুখ্য হলো রূপসীদের রূপসুধা পান। চলতে

চলতে হঠাৎ তাঁর পা-দুটো একটি দোকানের সামনে এসে আপনা থেকে থেমে যায়। বিমোহিত দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে থাকেন। আরজমন্দ বানু আলো করে বসে রয়েছেন সেখানে। কিন্তু কী কিনবেন শাহ্জাদা। দোকানের সব জিনিসই যে বিক্রি হয়ে গিয়েছে। অমন রূপসীর দোকানে কি কিছু পড়ে থাকে? তবু রয়েছে। শুধু একতাল মিছরি। কতই বা দাম হবে সেই মিছরির। তবু শাহজাদা এগিয়ে যান কম্প্রবক্ষে। রূপসী সচকিত হয়ে ওঠেন। শাহ্জাদা মিছরি চেয়ে বসতেই তিনি তাড়াতাড়ি সবটা তুলে দেন তাঁর হাতে। হাতে হাত ঠেকে যায়। দুজনারই হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত। মিছরি নিয়ে গলার বহুমূল্য হার ছড়া খুলে দিয়ে মন চেয়ে বসেন দুঃসাহসী শাহ্জাদা।

আরজমন্দ বানুর ভাগ্য ভাল যে খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর স্বামী তাঁকে পরিত্যাগ করেন। নইলে হিন্দুস্থানের ইতিহাসে মমতাজ বেগমের নাম কেউ শুনতে পেত না। শাহানশাহ্ সাজাহানের স্বভাব তাঁর পিতার মতো নয়। নারীর জন্যে তিনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতেন না কখনোই।

অনেক কক্ষ পার হয়ে এগিয়ে যাই খা-আব-বাগ বা স্বপ্নপুরীতে। এককালে বাদশাহ্ আকবরের শয়নকক্ষ ছিল এটি। এখন মা সেখানে রয়েছেন, শাহানশাহের অনুরোধে। কক্ষটি ঠিক হারেমের অন্য কক্ষের মতো আব্রুওয়ালা নয়। প্রচুর আলো বাতাসের আনাগোনা এখানে।

বহুমূল্য কিংখাবের ওড়না গায়ে জড়িয়ে, হাতে একগুচ্ছ গুলদাউদা নিয়ে মা হয়তো বাদশাহের প্রতীক্ষায় ছিলেন। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতে তিনি হাসি মুখে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখে থেমে যান।

—এ সময়ে কেন জাহানারা? কিছু ঘটেছে?

লজ্জিত হই। সঙ্কুচিত হই। ঘাড় নেড়ে বলি,—কিছু হয়নি মা।

—তবে।

—আজ সারাদিন তোমাকে দেখিনি তাই।

—হেসে ফেলেন মা। কাছে ডাকেন। পাশে বসিয়ে বলেন,—এবারে সত্যি কথাটা বল্‌তো? আমাকে এত ভালোবাসিস কবে থেকে? শুধু দেখা করার জন্যে এই সময়ে খা-আব-বাগে চলে এলি? জাহানারা, আমাকে কি আবার নতুন করে তোদের চিনতে হবে?

মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হয়। মাকে ভালোবাসি একথা সত্য। কিন্তু সে ভালোবাসার সীমারেখা জানা আছে তাঁর। অকারণে তাঁর কাছে মন-গড়া কৈফিয়ৎ দিয়ে লাভ নেই। তাই সোজাসুজি সব কিছু বলব বলে স্থির করি।

—মা।

—বল্ জাহানারা।

—মুঘল শাহ্জাদীর শাদি হয় না?

—একথা আজ জানলি?

—না। বরাবরই জানি। তবে রোশনারা এ নিয়ম মানবে না।

—না মানুক। আমি তাই চাই।

বিস্মিত হই। বলি,—কিন্তু বাদশাহ্ বাধা দেবেন না?

—বংশগত একটা সংস্কার তাঁর মনে রয়েছে বটে। তবে তিনি অনেকটা উদার বলেই মনে হয়।

—কি করে বুঝলে?

—এতদিন রয়েছি তাঁর সঙ্গে, মন চিনব না? শোন্ জাহানারা, মুঘল শাহ্জাদীর সন্তান সিংহাসন দাবি করে পরিবারের বিপদ ডেকে আনবে বলে ভয় ছিল আকবর শাহের। কিন্তু সে বিপদ কি থেমে আছে?

—না।

মা মিষ্টি হেসে বলেন,—দারা সুজা, আওরঙজেব আর মুরাদও বড় হয়ে নিজেদের মধ্যে হানাহানি

করতে পারে। এদের সঙ্গে তোর আর রোশনারার তিন চারটে ছেলে যোগ দিলে এমন কিছু এসে যাবে না।

—তুমি তাহলে রোশনারার পক্ষে?

—হ্যাঁরে। তোর পক্ষেও। শাহানশাহ্ আমার স্বাস্থ্যের জন্যে যেরকম উঠে পড়ে লেগেছেন, আল্লার কৃপায় যদি কিছুদিন টিকে যাই, তোদের শাদি দেখে যাব।

নাচমহলে নৃত্য শুরু হয়েছে। দূরাগত সঙ্গীদের মতো এতগুলি কক্ষ পার হয়েও সে নৃত্যের ছন্দময় ঝঙ্কার শোনা যায়। বাতায়নের বাইরের আকাশ তারকাখচিত। ঈদের চাঁদের মতো একফালি চাঁদ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে পৃথিবীর দিকে। মায়ের মুখে বেহেস্ত-এর হাসি ছোঁয়াচ।

মা বলেন,—আকবরশাহ্ আর এক মস্ত ভুল করেছিলেন। মুঘল শাহজাদীদের কুমারী রাখার সিদ্ধান্ত নেবার সময় তাদের দৈনিক আহারের একটা ফিরিস্তিও তৈরি করে দেওয়া উচিত ছিল।

—কেন মা?

—কোপ্তা, কোর্মা, কাবাব আর সরাব খেয়ে কুমারী থাকতে গেলে পাগলই হতে হয়। অন্য পথ নেই। এসব জিনিসের এমনই গুণ। সেরকম ঘটনা ঘটেনি তা নয়। চোখ মেলে হারেমে ঘুরলে এখনো হয়তো দেখতে পাবি। হিন্দু বিধবাদের যে খাবার, মুঘল কুমারীদেরও সেই খাবারের বিধান দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল আকবর শাহের।

মায়ের কথার অর্থ পুরোপুরি ধরতে না পারলেও তাঁর চিন্তার গভীরতা দেখে মুগ্ধ হই। প্রাসাদের এক কোণে পড়ে থেকেও তিনি অনেক কিছু ভাবেন। বাদশাহের উচিত ছিল আজকে আমাদের দুই বোনের হাতে যেমন কিতাব তুলে দিয়েছেন, তার চেয়েও মোটা একটা কিতাব মায়ের হাতে তুলে দেওয়া। একটি অমূল্য সম্পদ লাভ করতে পারত জগৎবাসী।

একজন রূপসী নাজীর স্বর্ণখচিত পাত্র হাতে নিয়ে প্রবেশ করে।

—আবার নিয়ে এসেছ? মায়ের মুখে বিরক্তি।

—খেয়ে নাও মা।

—কত আর খাব। আমার কি মনে হয় জানিস? আমার ভেতরে আগুন ধরেছে। অত কিছু করেও তাই শরীরে আর আগের সজীবতা ফিরে পাই না।

মায়ের ভারী কোমর আর স্ফীত উদরের দিকে চেয়ে বড় কষ্ট হয়। আমাকে নিয়ে যে দুর্ভোগের শুরু আজ ষোলো বছর পরেও সে দুর্ভোগে ছেদ পড়ল না। আওরঙজেব পর্যন্ত প্রতি বছরই তিনি নিজের জীবনকে বিপদগ্রস্ত করে পৃথিবীতে তাঁর সব চাইতে আপনজন বাদশাহ্‌কে একটি করে সন্তান উপহার দিয়েছেন। তারপরে এই ধারাবাহিকতা ছিন্ন হলেও একেবারে থেমে যায়নি। প্রথম বয়সে উপহার দেবার সময় বাঁধভাঙা আনন্দই হয়তো মুখ্য বলে প্রতিভাত হতো, কিন্তু এখন যেন ক্লান্তিটাই বড় হয়ে ধরা পড়ে চোখে।

—অমন হাঁ করে কি দেখছিস জাহানারা?

মুখখানিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলি,—কিছু না।

মা হাসেন। বলেন—আমার কাছে তুই ছোটই আছিস। তবু বয়স হয়েছে তোর। অনেক কিছুই বুঝতে পারিস।

মমতাজ বেগমের মোমের মতো সাদা মুখে রক্তের ঢেউ দেখা যায়। লজ্জা পেলেন নাকি তিনি নব-যৌবনা কন্যার মনোভাব বুঝতে পেরে?

তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে ডাকি,—মা।

মুহূর্তে তাঁর চোখের ভাষা পালটে যায়। অগাধ স্নেহধারা ঝরে পড়ে সে চোখের দৃষ্টিতে। আমার গালের সঙ্গে নিজের গাল চেপে ধরে বলেন,—কিরে জাহানারা?

—মা, এবার কি হবে?

—বোন।

—কি করে বুঝলে?

—মন ডেকে বলছে।

—আমি কিন্তু মা তোমার প্রথম মেয়ে।

—জানিরে। তোর ওপর আমার পক্ষপাতিত্ব সেজন্যে একটু বেশিই বোধ হয়। বাদশাহ্‌রও।

—মেয়েদের ওপর নবাব-বাদশাহ্‌দের টান থাকে নাকি?

—বোধ হয় থাকে না। কিন্তু তোর বেলায় রয়েছে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে তুই ভাগ্যবতী। বাদশাহ্ অবশ্যি এর অন্য কারণ দেখান।

মা চুপ করে থাকেন। মুখের ভাব দেখে মনে হয় বেফাঁস কিছু বলে ফেলে অপ্রস্তুতে পড়েছেন। শেষে তাঁর মুক্তাপাতির মতো দাঁতগুলো একটু একটু দেখা যায় আবার। তিনি বলেন, তুই তো বেশ বড়ই হয়েছিস। তোকে বলতে আর বাধা কি?

—বলো।

—বাদশাহ্ বলেন, তাঁর সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে তোর সঙ্গেই নাকি আমার আশ্চর্য মিল রয়েছে।

—সত্যি মা? মায়ের কথা শুনে আমার খুব আনন্দ হয়। পৃথিবীবিখ্যাত রূপসী মমতাজ বেগমের রূপের ধারে কাছে পৌঁছতে পারা যে কোনো রমণীর পক্ষেই মস্ত গর্বের।

বাদশাহ্ হয়তো এখনই এসে পড়বেন। আমাকে দেখে বিরক্তও হতে পারেন। উঠে পড়ি।

—চললি?

—হ্যাঁ মা।

তাঁর মুখখানি হঠাৎ এক অকথিত ব্যথায় ভরে যায়। তাঁর দু' নয়নের প্রসিদ্ধ পল্লব ছাপিয়ে অশ্রু বার হয়।

—মা, তুমি কাঁদছ?

—শোন্ জাহানারা। একটা কথা কাউকে বলিনি। তোর বাবাকেও নয়। আমার মনে হয় কি জানিস? এবার আমি আর বাঁচব না।

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন মা। কক্ষের বাইরে কর্তব্যরত যে নাজীর ছিল কান্নার আওয়াজ শুনে সে ছুটে আসতে যায়। হাত উঁচিয়ে ইঙ্গিতে তাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে দু' হাতে মাকে জড়িয়ে ধরি।

—ছিঃ মা। কেঁদো না অমন করে। তোমার শরীর খারাপ হয়েছে। তাই আজেবাজে চিন্তা তোমার মাথায় আসে। এবার থেকে সবসময় আমি তোমার কাছে থাকব।

ধীরে ধীরে শান্ত হন মা। শেষে বলে,—আমি ঠিকই বলেছি। দেখিস, তোর বাবার কানে যেন কথাটা না যায়। ভীষণ দুঃখ পাবে। শাহানশাহ্ হলেও আসলে ও কবি। তাই অল্পে যেমন ওর সুখ, দুঃখও তেমনি অতি অল্পেই।

আমি স্তব্ধ হয়ে যাই। বাবার সম্বন্ধে মা কখনো এভাবে আমাকে বলেননি।

মা আবার বলেন,—তোকে আজ এত কথা বলার প্রয়োজন হতো না, যদি নিশ্চিত জানতাম এ-যাত্রা আমি বেঁচে উঠব। বাদশাহ্‌কে আমি ছাড়া কেউ চিনতে পারেনি। পারবেও না কেউ কোনোদিন চিনতে। ও ঠিক সাধারণ মানুষ নয়। তুই যেন চিনতে ভুল করিস না।

হারেমের বিভিন্ন কক্ষ থেকে মাঝে মাঝে উৎকট চিৎকার শোনা যায়। মা ছাড়া আরও যে সমস্ত বেগম রয়েছেন শাহানশাহের প্রতিদিন ঠিক এমনি সময়ে সরাব পান করে তাঁরা মাতলামি শুরু করেন। কারণ তাঁরা জানেন এমনি সময়েই বাদশাহ হারেমে আসেন এবং তাঁদের উপেক্ষা করে মমতাজ বেগমের কক্ষে প্রবেশ করেন। কিন্তু এত করেও বাদশাহের করুণা আকর্ষণ করতে পারেননি তাঁরা। খুব

কমই তাঁদের কক্ষে রাত কাটান পিতা। এক মাসের মধ্যে বড়জোর সাতটা দিন তাঁরা ভাগাভাগি করে বাদশাহ্‌কে কাছে পান। বাকি দিনগুলি মায়ের নিজস্ব।

মনে মনে ঘৃণা করেন বাদশাহ্ তাঁর অন্যান্য বেগমদের—তাদের মাতলামিকে। বিখ্যাত সরাবপায়ী জাহাঙ্গীরের আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও চব্বিশ বছরের আগে কোনোদিন মদ স্পর্শ করেননি পিতা। বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাই তাঁকে দু' চোখে দেখতে পারতেন না। তবে ইদানীং মাঝে মাঝে সরাবের পাত্র মুখে তুলতে হয় তাঁকে। কঠোর পরিশ্রম আর মানসিক দুশ্চিন্তায় এটা হাকিমি দাওয়াই।

বাইরে কর্তব্যরত প্রহরীদের সতর্ক অভিবাদনের আওয়াজ পাই। বাদশাহ্ আসছেন। আরও কিছু কথা ছিল মায়ের সঙ্গে। বলা হলো না। অন্য দরওয়াজা দিয়ে বাইরে চলে আসি।

ঠিক দু'দিন পরে ঘটে গেল ঘটনাটা। এত তাড়াতাড়ি ঘটবে স্বপ্নেও ভাবিনি।

ফুটফুটে সুন্দর একটি মেয়ের জন্ম দিলেন মা ভোরের বেলায়। বাদশাহ খবর পেয়ে ঘুম চোখে ছুটে এসে মেয়েটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে মা ম্লান হেসে বলেন,—এদের সবাইকে দেখো।

চমকে ওঠেন বাদশাহ্। বলেন,—তুমি একথা বললে কেন?

—এমনি।

বাদশাহ্ কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে যান। নবজাত কন্যাকে স্পর্শ না করেই উঠে দাঁড়ান। ধীরে ধীরে মায়ের শিয়রে এসে তাঁর কপালের উত্তাপ দেখেন। তারপর নিষ্পলক দৃষ্টিতে একভাবে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। ক্লান্ত মায়ের চোখদুটো তখন বন্ধ ছিল।

বাবা সন্তর্পণে আমার কাছে এগিয়ে এসে বলেন,—তুমি এখান থেকে যেও না জাহানারা।

—আমি এখানেই থাকব বাবা।

—প্রয়োজন হলেই আমাকে ডেকে পাঠিও।

আমি সম্মতি জানাই।

বাদশাহ্ চলে যান, হয়তো হাকিমের সঙ্গে পরামর্শ করতে। হাকিম আগেই বলেছেন, ভয়ের বিশেষ কারণ নেই। যেটুকু দুর্বলতা রয়েছে মায়ের, তার জন্যে দাওয়াই-এর ব্যবস্থা তিনি করেছেন। বিপদের সম্ভাবনা নেই বলে তিনি প্রসূতির ঘরে না থেকে পাশের ঘরে রয়েছেন।

নিস্তব্ধ কক্ষে আমি একা বসে। কিছু দূরে মা শায়িতা। খুব ধীরে ধীরে তাঁর শ্বাস পড়ে। আমার ছোট্ট বোনটি মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে। একজন অভিজ্ঞ নাজীর এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে শান্ত করে আবার রেখে যায়।

সকাল কাটে। দুপুর হয়। অন্যান্য কক্ষে শাহজাদী আর বেগমরা দিবা নিদ্রায় মগ্ন।

হঠাৎ একসময়ে দেখি মা ছট্‌ফট্ করছেন। তাঁর চোখ দুটো বড় বড়। ছুটে তাঁর পাশে গিয়ে বলি, —মা অমন করছ কেন?

হাঁপাতে হাঁপাতে মা কোনোমতে বলেন,—ওঁকে ডাক জাহানারা! শিগগির।

ভীত-বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে দেখি মায়ের শুভ্র শয্যা রক্তাক্ত।

নাজীরকে কাছে বসিয়ে বাদশাহ্‌কে ডাকতে আমি পাগলের মতো ছুটি। নিজেকে বড় অসহায় বলে বোধহয়।

দরবার কক্ষে ছিলেন বাদশাহ্। তাঁর কাছে খবর পৌঁছে দিতেই তিনি দৌড়ে আসেন।

হাকিমকে নিয়ে আমরা দু'জনে মায়ের কক্ষে প্রবেশ করি। চেয়ে দেখি মায়ের চোখ নিমীলিত—মুখ শান্ত। যে নাজীরকে বসিয়ে রেখে গিয়েছিলাম সে কাঁদছে।

হাকিম গিয়ে মায়ের ডান হাত সযত্নে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করেন। অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করেন। শেষে ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে নিজের মুখ ঢাকেন।

আমার পায়ের নীচের পাথরের মেঝে যেন সরে যায়। টলতে থাকি। ঠিক সেই সময়ে পিতার আকাশ-ফাটানো চিৎকার শুনি—মমতাজ!

অবোধ শিশুর মতো কঠিন পাষাণের ওপর বসে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন শাহানশাহ্ সাজাহান।

পিতার এ ক্রন্দন শুনলেন হাকিম, শুনল এক অতি সামান্য নাজীর। আর শুনলাম আমি। তাঁরা সেই মুহূর্তেই পিতাকে চিনে নিল। তাঁর হৃদয়কে চিনল।

সামনে শয্যার ওপর মায়ের মৃতদেহ। ভূতলে বাবা কেঁদে ভাসান। আমি বাবার পাশেই বসি, তাঁকে ধরে রাখি। মা যে আদেশ দিয়ে গেছেন। মায়ের শেষ আদেশ আমি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পালন করব। তিনি বেহেস্ত থেকে দেখে নিশ্চিন্ত হবেন।

মৃত্যু।

জিনিসটি কত স্বাভাবিক, অথচ কত অস্বাভাবিক। মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো দ্বিতীয় পরিণতি পৃথিবীর প্রথমদিন থেকে আজ পর্যন্ত কোনো জীবজন্তু কীটপতঙ্গ গাছপালার হয়েছে কি? অথচ এত জেনেও প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা আকুল হই, ব্যাকুল হই। আমরা অবিরাম অশ্রু বিসর্জন করি।

মায়ের দেহ যমুনার তীরে সমাহিত করার সময় আমরা ভাই-বোনেরা কাঁদলাম—এক সঙ্গে কাঁদলাম। সেইদিনই আমরা শেষবারের মতো অনুভব করলাম আমরা পরস্পরের কত আপন। বাদশাহের কান্না থেমে গিয়েছিল। আরাবল্লীর মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি মৌলবাদীদের সমস্বরে উচ্চারিত কোর-আনের পুণ্যবাণী শুনতে থাকেন। তার ঘন কৃষ্ণবর্ণ শ্মশ্রুর অধিকাংশই রূপালী জরির মতো চক্‌চক্ করছিল। মুরাদ একবার সেদিকে তাকিয়ে আরো জোরে কেঁদে ওঠে। সে সবার ছোট। বাবা যে কোনোদিন বৃদ্ধ হতে পারেন এ ধারণা তার ছিল না। তবু হয়তো সহ্য হ'ত তার। কিন্তু একদিন আগে যাঁর চেহারার মধ্যে বার্ধক্যের লেশমাত্র চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যেত না, একদিন পরেই তাঁর এ কী পরিবর্তন।

সমাধিক্ষেত্র থেকে ফিরে আসি। মায়ের কক্ষে প্রবেশ করি। সব ফাঁকা। বুকের ভেতরটা আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে।

বাইরে পর্দার কাছে কে যেন এসে থেমে যায়। হয়তো দারা কিংবা মুরাদ। লুকিয়ে পড়ে দরওয়াজার আড়ালে। হয়তো কাঁদতে চায়। বুকের ব্যথা নিঃশেষ করে দিয়ে কাঁদতে চায় মায়ের শূন্য শয্যার ওপর মুখ রেখে। কাঁদুক। প্রাণভরে কাঁদুক।

কিন্তু একী! বাবা!

ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে যান শয্যার পাশে। ভূতলে হাঁটু ভেঙে বসে শয্যার ওপর রিক্ত বাহু দু'খানা বিছিয়ে দিয়ে স্পষ্ট অনুচ্চস্বরে বললেন,—চলে গেলে তুমি মমতাজ। কি নিয়ে আমি থাকব?

বিছানায় মুখ ঘষতে ঘষতে কাঁদতে থাকেন তিনি।

—এমন তো কথা ছিল না। তুমিই বলেছিলে একই দিনে একই মুহূর্তে আমরা পৃথিবী থেকে বিদায় নেব। জীবনে যেমন ছাড়াছাড়ি হইনি, মৃত্যুর পরেও হবো না। তবে কেন চলে গেলে? কোনোরকম সতর্ক না করে দিয়ে এভাবে কেন ফাঁকি দিলে?

আমি আর সহ্য করতে পারি না, দরওয়াজার আড়াল থেকে বার হয়ে এসে ধীরে ধীরে বাদশাহের পেছনে গিয়ে দাঁড়াই। তাঁব কাঁধ স্পর্শ করে ডাকি,—বাবা!

বাদশাহের সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে। তিনি পেছন ফিরে আমাকে দেখেন। তাঁর মুখে তখন কি আঁকা ছিল ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না।

—বাবা, মা আমাকে রেখে গিয়েছেন!

—তোকে, রেখে গিয়েছে?

—হ্যাঁ বাবা। তিনি জানতেন, তিনি আর বাঁচবেন না। তোমাকে বললে তুমি কষ্ট পাবে, তাই বলেননি। আমাকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন তোমাকে দেখার জন্যে। আমি নাকি তাঁরই মতো দেখতে?

বাবা বিদ্যুৎ গতিতে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেন,—হ্যাঁ জাহানারা। তুই তোর মায়ের মতোই দেখতে। তোর স্বভাবও তোর মায়ের মতো। কিন্তু—। না থাক।

সহসা আমাকে ছেড়ে দেন তিনি। মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন। তাঁর বিমর্ষ ভাব অনেক কম বলে মনে হয়। সমব্যথী পেয়েছেন তিনি। মায়ের শয্যার দিকে আর একবার তাকান তিনি। ঘরের প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। শেষে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

আমি ধীরে ধীরে বলি,—বাবা, মা তোমাকে ছেড়ে যাননি। তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তুমি তোমার কর্তব্য শেষ করে তাঁর সঙ্গে গিয়ে মিললে তিনি সুখী হবেন। তুমি যে পুরুষ।

উত্তেজনায় বাবার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে ওঠে। সজোরে আমার কাঁধ চেপে ধরে বলেন,—সত্যি করে বল্ জাহানারা, একথা বলতে তোর মা শিখিয়ে দিয়েছে?

চুপ করে থাকি। কী বললে বাবা সুখী হবেন চিন্তা করি। শেষে বলি, —হ্যাঁ বাবা।

—আমি জানতাম হুবহু তোর মায়ের কথা কিভাবে তুই বলবি? তোর মায়ের কথাই আমি রাখব জাহানারা। আমার কর্তব্য আমি করব।

বাবা চলে গেলে আমি সচকিতে চার দেওয়ালের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিই। কোথায় মা? অনুভব করছি তিনি আছেন, অথচ দেখতে পাচ্ছি না। অস্ফুট স্বরে ডাকি—মা।

সাড়া নেই।

—মা গো! দেখা দাও আর না দাও, তোমার কথাগুলো এভাবে আমার মুখে জুটিয়ে দিও। নইলে বাবাকে যে সামলাতে পারব না।

শিশমহল। প্রাসাদের এক দুর্নিবার আকর্ষণস্থল এই শিশমহল। মায়ের মৃত্যুর পর তিন বছর পার হয়েছে। সেই থেকে জায়গাটি অব্যবহৃত পড়ে থাকে। বাদশাহ্ ভুলেও আর যান না ও পথে। আমি শুধু মাঝে মাঝে গিয়ে দাঁড়াই। চারদিকে রঙিন কাঁচে ঘেরা কক্ষটি। সূর্যের আলো হাজার রঙে রঙিন হয়ে কক্ষের ভেতরে এসে পড়ে এক লোভনীয় স্বপ্নজাল বিস্তার করে। এখান থেকে নগরীর দৃশ্য মনোরম। এখানে বসে থাকতে থাকতে একসময় আমার সর্বাঙ্গ আনচান করে ওঠে। মনে হয়, সবই রয়েছে অথচ কি যেন নেই। আয়োজন সম্পূর্ণ, অথচ কিসের অভাবে সব যেন ব্যর্থ হয়ে যায় দিনের পর দিন। সে ব্যর্থতার লজ্জা আমারই। শিশমহলের ঠিকরে-পড়া রঙগুলি আমার সর্বাঙ্গকে রঙিন করে দিয়ে কিসের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থেকে শেষে যেন আমাকেই ব্যঙ্গ করে ওঠে। ছুটে পালিয়ে আসি সেখান থেকে। কিন্তু ফিরে যাই আবার পরদিনই। না গিয়ে পারি না।

শেষবেলার সূর্য প্রতিদিনই শিশমহলকে সরাবে চুবিয়ে রাখে। নেশা কাটে না। কিছুদিন থেকে এ নেশা আমাকে পেয়ে বসেছে।

এমনি একদিন। প্রতিদিনের মতো কক্ষের পর কক্ষ পার হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম শিশমহলের দিকে। কাছাকাছি এসে সহসা যেন মনে হ'ল শিশমহল নির্জন নয়। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি।

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর শিশমহলের দেওয়ালের ভেতরে কারও ছায়া ভেসে উঠল। তবে কি মা? না না, আট সন্তানের জননী মমতাজ বেগমের অনেক দায়িত্ব। সমাধির বন্দী জীবন যদি তাঁর ভাল না লাগে, তবু তিনি শিশমহলে আসতে যাবেন না। বাদশাহের পাশে পাশে থাকবেন তিনি।

অন্য এক আশঙ্কায় বুকে কেঁপে ওঠে। মায়ের মুখে শোনার পর থেকে হারেমের বয়স্কা শাহজাদী, আমার পিতৃষ্বসা যে কয়জন রয়েছেন, তাঁদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে এসেছি। মা সত্যি কথাই বলেছিলেন। এঁরা কেউই ঠিক স্বাভাবিক নন। বয়স হয়েছে, অথচ গাম্ভীর্যের অন্তরালে একটা কুৎসিত কিছু তাঁদের মনকে সবসময়ই নাড়া দেয়। তাঁদের কথাবার্তা আর ব্যবহারের মধ্যে সেগুলি মাঝে মাঝে

প্রকট হয়ে ওঠে। তাঁদেরই কেউ কি শিশমহলের নির্জনতায় গিয়ে অস্বাভাবিক জীবনের জ্বালা জুড়াবার ফিকিরে ঘুরছেন? আত্মহত্যা করবার অমন আদর্শ স্থান তো একটিও নেই হারেমে। ইচ্ছে করলে লাফিয়ে পড়া যেতে পারে ওপর থেকে। কিংবা দড়ি নিয়েও ঝুলে পড়া যেতে পারে। একদলা আফিমও দুর্লভ নয় মুঘল-হারেমে।

ওই আবার। স্পষ্ট এক নারীমূর্তির ছায়া। পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। ত্রস্তে যে পথে এসেছিলাম সে পথে ছুটে যাই। জানাতে হবে কাউকে। অন্তত কোনো নাজীর কিংবা কোনো খোজাকে। তাদের কাউকে সঙ্গে না নিয়ে এসে অবস্থা আয়ত্তে আনা সম্ভব হবে না হয়তো।

কিছুদূর ছুটে নিজের উত্তেজনায় নিজেই সঙ্কুচিত হই। সামান্য জিনিসটিকে আতস কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখছি ভেবে নিজেকে ধমক দিই। হয়তো কিছুই নয়। আমার মতো কেউ শিশমহলে গিয়ে শোভা উপভোগ করছে মাত্র।

আবার এগিয়ে যাই। এবারে দৃঢ় পদক্ষেপে।

একটি জানালা খোলা ছিল শিশমহলের। ধীরে ধীরে সেখানে গিয়ে উঁকি দিই। ভেতরের দৃশ্য দেখে আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে যায়।

কোন পিতৃষ্বসা নয়। রোশনারা। হ্যাঁ রোশনারা সে। একলা নয়। হারেমে তার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে অল্পবয়সী সুন্দর খোজা—সেও রয়েছে। আমার বোন রোশনারা—শাহানশাহ্ সাজাহান-নন্দিনী রোশনারা বসে রয়েছে খোজার কোলের ওপর। হঠাৎ কি যেন মনে হয়। বিষধর সর্পিনীর মতো রোশনারা ছিট্‌কে তার কোল থেকে নেমে পড়ে। ভীষণভাবে চপেটাঘাত করে তার দুই গালে। তারপর পদাঘাত করে তাকে।

বিহ্বল দৃষ্টিতে খোজাটি একবার তার দিকে চায়। শাহ্‌জাদীর ক্রোধের কারণ সে অনুধাবন করতে পারে না। শেষে শান্তভাবে মাথা নীচু করে ঘর থেকে বার হয়ে যায়। তার মুখের পানে চেয়ে দেখি এই নাটকীয় ঘটনা তার দেহ-মনে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারেনি। বরং একটা শঙ্কার ছাপ—শাহজাদীকে সে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ব্যথা অনুভব করি তার জন্য। ব্যথা অনুভব করি সমস্ত খোজাকুলোর জন্য। এমন চমৎকার স্বাস্থ্য নিয়েও তারা একাকী। পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধের দুয়ার তাদের কাছে চিরদিনের জন্য অর্গল-বন্ধ।

খুব নীচু গলায় ডাকি,—রোশনারা।

—কে? আঁতকে ওঠে রোশনারা।

—আমি।

জানালার কাছে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসে সে। ফাঁকা দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলে—তুমি, তুমি দেখেছো?

—হ্যাঁ।

দরজা দিয়ে বাইরে বার হয়ে এসে আমকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো কাঁদতে থাকে আমার বোন।

—তুই এ কি করলি রোশনারা? ওরা কি পুরুষ? পুরুষ হলে বেগমমহলে কি ওদের ঠাঁই হ'ত?

—ওরা যে এমন তা জানতাম না।

—ছিঃ ছিঃ।

—ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলে মনে হয় দিদি।

—ভুল। ভবিষ্যৎকে ইচ্ছে করলে উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে পারিস।

—স্বপ্নের কথা বলছ?

—না, স্বপ্ন নয়। মায়ের মৃত্যুর আগে তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। তিনি শাহজাদীদের চিরকুমারী রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না।

—মা মৃত।

—তাঁর মনোভাব বাদশাহ্ নিশ্চয়ই জেনেছেন।

—জেনেও লাভ নেই।

—কেন?

—বাদশাহের অতটা হিম্মত হবে না। চিরাচরিত প্রথা মেনে চলতেই তিনি অভ্যস্ত। নতুন কিছু ভেঙে গড়ার মতো বলিষ্ঠ তিনি নন।

—এ কথা তুই বলতে পারলি তাঁর সম্বন্ধে।

—পারলাম। কারণ আছে তার। আওরঙজেব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

—আওরঙজেব দেখছি তোর পরামর্শদাতা হয়ে উঠেছে।

—ঠাট্টা করতে পার। কিন্তু ভাইদের মধ্যে সে ছাড়া আর কাউকে তো মানুষ বলে ভাবতে পারি না। প্রাসাদে থেকেও একমাত্র তাকেই দেখি, সমস্ত ভোগ বিলাসিতা থেকে নিজেকে যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রেখেছে। অন্যান্য ভাইরা বিলাসিতায় মত্ত, আর ও মৌলবীর কাছে নিয়মিত শিক্ষা নিতে চলেছে। ও খাঁটি মুসলমান।

—হুঁ। মোল্লাশালের শিক্ষায় শিক্ষিত বটে। আর দারা? সে আওরঙজেবের চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষিত, অনেক জ্ঞানী।

—কিন্তু সে মুসলমান নয়। সে আকবর শাহের ভেজাল ধর্মের প্রতীক।

—দেখ্ রোশনারা, আমি জানি এত কথা বলার কিংবা বোঝার বয়স তোর হয়নি। এখন থেকেই তুই অন্যের হাতের পুতুল হয়ে পড়েছিস। সাবধান হ'। অন্যে যেভাবে সুতো নাড়াবে সেভাবে নাচিস না।

—আমি জানি আওরঙজেবকে তোমরা কেউ দেখতে পার না।

—পারি। সেও আমার ভাই। কিন্তু তাব স্বভাবের কতকগুলো জিনিস আমার ঠিক ভাল লাগে না। হয়তো বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সে শুধরে নেবে।

—না শুধরোলেই আমি খুশি হ'ব। শুনছি রাজকার্যে নামার সঙ্গে সঙ্গেই বাবা তাকে দক্ষিণ ভারতের ভার দিয়ে পাঠাবেন। ভালই করবেন। নিজের মতো থাকতে পারবে সে।

—কিন্তু বাদশাহ্‌কে আওরঙজেব দুর্বল ভাবল কি করে?

—তাঁর এতদিনের কার্যকলাপ বিচার করে। সে বলে, প্রথম জীবনে বিদ্রোহ ছাড়া বাবা আর কিছুই করেননি। তিনি আকবরশাহ আর জাহাঙ্গীরের সারা জীবনের পরিশ্রমের মধুটুকু পান করে চলেছেন।

আওরঙজেবের ধৃষ্টতায় হতবাক হই। উনিশ বছর বয়স না হতেই বাদশাহের সমালোচনা করে সে। রোশনারার কথার জবাব অবধি দিতে পারি না। আমি জানি। শাহানশাহ্ সাজাহান শান্তিপ্রিয় হলেও দুর্বল মোটেই নন। স্থায়ীভাবে তিনি অনেক বিদ্রোহ দমন করেছেন। তাঁর উদার মন বিশ্বাসের দ্বারা দেশের আমীর ওমরাহদের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছেন, যার ফলে দেশের কোথাও কোনো অশান্তির ছিটেফোঁটা দেখা যায় না। আওরঙজেবের হয়তো ধারণা—অবিশ্বাস আর যুদ্ধই বলিষ্ঠতার পরিচয়। আল্লার কৃপাই বলতে হবে যে সে বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র নয়—জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশুকো।

—রোশনারা, বাদশাহ্ দুর্বল কিনা ইতিহাস তার বিচার করবে। তবে এটুকু তোকে বলতে পারি, যেভাবে তুই নিজের পরিতৃপ্তির পথ খুঁজতে শুরু করেছিস, জানতে পারলে, সমস্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি তোকে ক্ষমা করবেন না।

—জানি। তবু জেনে রাখো দিদি, প্রতিনিয়ত আমি এই একই চেষ্টা করে যাব।

শিশমহলের বাইরে দাঁড়িয়ে দিগন্তের দিকে চেয়ে রোশনারা বুক ভরে হাওয়া টেনে নেয়। আমার মুখের দিকে বহুক্ষণ চেয়ে থাকে সে। অন্তরে আমার কোন্ ভাবনা তোলপাড় করছে, হয়তো তা

অনুধাবনের চেষ্টা করে। একসময়ে তার কচি মুখে মৃদু হাসি ফোটে। আবার বুকের ওপর একখানা হাত রেখে বলে, দিদি, অন্ধকার ঘরে একা শুয়ে হা-হুতাশ করার জন্যে মানুষের জন্ম হয়নি। তার জন্মের এক বিরাট সার্থকতা রয়েছে।

চমকে উঠি আমি তার কথায়।

রোশনারা শিশমহল ছেড়ে চপল পদক্ষেপে ছুটতে ছুটতে অদৃশ্য হয়ে যায়। তবু আমি তার গমনের পথে চেয়ে থাকি। কথাগুলি যেন সে বলল না। বলল এক অদৃশ্য শক্তি,—নিয়তির মতো যা অমোঘ।

দূরে—প্রাসাদ পার হয়ে কোনো প্রান্তরের মধ্যে মিষ্টি গলায় কে যেন গেয়ে উঠল আবু সাইদের গান। সে গান দোলা লাগায় আমার মনে। একাকী দাঁড়িয়ে আমি শুনি, কান পেতে শুনি।

সে রাত্রে এক অদ্ভুত শব্দ স্বপ্ন দেখলাম। এ স্বপ্নের কথা কাউকে বলা যায় না। অথচ না বললে চলবে না। রোশনারার কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কিতাব দু' খানায় প্রতিটি অক্ষর সত্যি লিখব—মিথ্যের নামগন্ধ থাকবে না তাতে।

কিন্তু বলতে গিয়ে কান গরম হয়ে উঠছে। নিজের অস্তিত্বে নিজেরই লজ্জা হচ্ছে। পৃথিবীতে আমি ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী যদি আর না থাকত তবু স্বপ্নের বিবরণ নিজের কানকে শুনিয়ে উচ্চারণ করতে পারতাম না। ছিঃ ছিঃ।

রোশনারার কাছে আমি মনে মনে অপরাধী হলাম। প্রমাণ হয়ে গেল, তাতে আমাতে কোনো তফাৎ নেই, জেগে উঠেই সব স্বপ্নের মতো একেও উড়িয়ে দিতে পারলে বিবেকের এ-দংশন সহ্য করতে হ'ত না। কিন্তু তা তো পারিনি।

ভোর রাতে স্বপ্ন টুটে গেল। মৃদু সমীরণে রজনীগন্ধার লুপ্তপ্রায় সুবাস। চোখ মেলেই শেখ ইবন্-উল-আরাবীর মতো শক্তিলাভের জন্যে আল্লার কাছে সজল নয়নে আকুতি জানালাম। শেখ ইবন্ চিন্তাশক্তি দ্বারা স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার দুর্লভ রহস্য জানতেন।

বলব সেই লজ্জার কথা? বলেই ফেলি। হাজার হলেও মুখ ফুটে তো বলতে হচ্ছে না। লেখা আর বলা এক কথা নয়।

দেখলাম শিশমহলের ওপরে দাঁড়িয়ে আবু সাইদের প্রেমের গান একসময় আমাকে আকুল করে তুলল। সামলাতে পারলাম না নিজেকে। সবার অলক্ষ্যে বের হয়ে পড়লাম প্রাসাদের ঘেরা প্রাচীরের বাইরে। সঙ্গীতের সুর ভেসে আসছে তখনো প্রান্তরের দিক থেকে। সেদিক পানে চলতে শুরু করি। আমার গায়ের ওড়না পথের ধুলোয় লুটোতে লুটোতে চলে। দেখলাম, তবু তুলে নেবার শক্তি হ'ল না নিজের হাতে। সঙ্গীত আমার দেহমনকে অবশ করেছে। আমার নিজের বলতে কিছুই নেই। এ পথে যমুনার তীর বেয়ে গেলেই তো হিন্দুদের তীর্থস্থান বৃন্দাবন। আমি জানি বৃন্দাবনের সেই শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী। জানি রাধিকা, আর তাঁর অভিসারের কথা। সেই পথেই হয়তো কোনো এক সুদূর অতীতে অভিসারে চলেছিলেন তিনি। আজ আমিও চলেছি এক অচেনা দুর্গম পথে। আমার নায়ক কে?

আবছা অন্ধকার নেমে এসেছে পৃথিবীতে। আমি এগিয়ে যাই। শেষে একসময় দূর থেকে দেখতে পাই তাকে। আমার বুক নেচে ওঠে। ধীরে ধীরে উপস্থিত হই গায়কের একেবারে পাশটিতে।

কিন্তু একী! এ যে রোশনারা কর্তৃক বিতাড়িত খোজা। এত মিষ্টি তার গলা? উদাস স্বরে চলেছে সে। কোনোদিকে দৃষ্টি নেই তার। চোখ বেয়ে অবিরল ধারে অশ্রু ঝরে পড়ছে। তার অতি সুন্দর মুখখানা ব্যথায় থমথমে। প্রাণের দরদ দিয়ে সে গেয়ে চলেছে।

সহসা সন্দেহ হ'ল মনে। সত্যিই কি খোজা? খোজা কি এমন দরদ দিয়ে গাইতে পারে?

ধীরে ধীরে তার গা ঘেঁষে দাঁড়াই। আমার গায়ের খুশবু পেয়ে সে যেন সংবিৎ ফিরে পায়।

সে বুঝতে পারে শেষে। আমার দিকে চেয়ে তার সর্বশরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে। সে বিহ্বল।

ধীরে ধীরে ডাকি,—শোভান।

—শাহ্জাদী।

—এ কি তোমার মনের কথা?

শোভানের মুখ নীচু হয়। অনেকক্ষণ পরে সে মুখ তোলে। ধীর গম্ভীর স্বরে বলে,—হ্যাঁ শাহ্জাদী।

—কিন্তু কী করে সম্ভব?

—আঁধারে শোভানের মুখ অস্পষ্ট। কিন্তু তার অশ্রুপূর্ণ চোখদুটি স্থির সরোবরের মতো টল্‌টল্ করছিল। সেই চোখের দৃষ্টি কয়েকদণ্ড আমার চোখের সঙ্গে জট পাকিয়ে যায়।

—আমি খোজা নই শাহ্জাদী।

—তবে?

—আমি পুরুষ।

—পুলক শিহরণ প্রবাহিত হয় আমার শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরায়। তার সুঠাম দেহের ওপর হাত রেখে বলি,—সত্যি বলছ তুমি?

—হ্যাঁ। আপনি এসে দাঁড়িয়েছেন আমার পাশে—এ যেমন সত্যি। এই দিনকে এতদিন স্বপ্ন বলে ভাবতাম।

—শোভান। তবে তুমি—

—হ্যাঁ। কত কৌশলে খোজা বলে নিজের পরিচয় দিয়ে হারেমে থাকার অধিকার পেয়েছিলাম।

—কিন্তু কেন? কেন এই প্রবঞ্চনা? তুমি কি জান না এর শাস্তি কত ভয়ঙ্কর?

—জানি।

—তবে?

—তুর্কী বেগমের প্রাসাদের উদ্যানে এক সন্ধ্যায় যাকে হঠাৎ দেখে ফেলেছিলাম, তাকে যে না দেখে থাকার কথা কল্পনাও করতে পারি না শাহ্জাদী। তাই প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতে হলো। আমি জানি—ধরা পড়ব আমি। মৃত্যুদণ্ড হবে। তবু খেদ থাকবে না।

—কাকে দেখেছিলে শোভান?

সে চুপ করে থাকে। পাথরের মতো স্থির তার বলিষ্ঠ দেহখানি। চেয়ে থাকি আমি সেইদিকে কয়েক মুহূর্ত। অন্তরে আমার অদমনীয় কৌতূহল। অথচ তার স্তব্ধতার দিকে চেয়ে আবার প্রশ্ন করতে মন সায় দেয় না। সে যেন কোনো ইবাদৎখানায় বসে আল্লার কাছে প্রার্থনারত।

দীর্ঘ সময় পার হয়ে যায়।

শেষে আমিই শুরু করি।

শিশমহলে তোমার সঙ্গে রোশনারার ব্যবহারের আমি একমাত্র সাক্ষী।

ভীত হয় শোভান। আমিও তাই চাই। আমার মনের গভীর অন্ধকারে হিংসার বীজে কে যেন জল সেচন করেছে। সে বীজ ফেটে অঙ্কুর বার হয়েছে। সে অঙ্কুর আলোর জন্যে ছট্‌ফট্ করে মাটি ভেদ করে ওপরে উঠতে চায়।

—রোশনারার ব্যবহারে আমি লজ্জিত। কিন্তু যার জন্যে এতখানি দুঃসাহসী হলে তুমি, তাকে পেয়ে কি তোমার স্বপ্নসৌধ চুরমার হয়ে গেল শোভান?

শোভান কি যেন বলার চেষ্টা করে। আমি থামিয়ে দিই। আমি নিষ্ঠুর। আঘাতের পর আঘাত হেনে ওর হৃদয়কে রক্তাক্ত করে তুলব।

—কোনো বৈলক্ষণ্য দেখলাম না শোভান তোমার দেহে কিংবা মনে রোশনারার পরশে। ঠিক যেন সত্যিকারের খোজা। কেন শোভান? কেন এমন ব্যবহার করলে? সবই তো পেয়েছিলে। স্বপ্নকে সার্থক করে তুললে না কেন?

—শাহ্জাদী! অতি কষ্টে মুখ খোলে শোভান।

—তুমি কি শুধু মন চাও? আমাকে তাই বিশ্বাস করতে হবে?

আর্তনাদ করে ওঠে শোভান। সে আর্তনাদ্ আকাশ চিরে, বাতাস চিরে কিসের পানে যেন ধাওয়া করে। খুশি হই আমি। খুব খুশি হই।

—তেমনভাবে ভাবলে রোশনারার চপেটাঘাত কি খুব অন্যায় হয়েছে শোভান? ভাঙা গলায় শোভান বলে ওঠে,—সব ভুল। সব ভুল শাহ্জাদী। আপনি ভুল বুঝেছেন।

শোভান ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। আমার পানে চায়। সে দৃষ্টিতে কিসের যেন ব্যাকুলতা। সেই ব্যাকুলতা-ভরা চাহনি দিয়ে আমার দৃষ্টিকে বন্দী করে রেখে সে বলে,—আপনার বোনকে আমি তুর্কী বেগমের উদ্যানে দেখিনি।

—কাকে দেখেছিলে তবে?

—তোমাকে, তোমাকে জাহানারা। আমাকে ধরিয়ে দাও। মৃত্যুদণ্ড দাও। তবু বলব তোমাকে দেখেছিলাম। তারই জন্যে এত প্রবঞ্চনা—তারই জন্যে এত গোপনীয়তা। আর শুধু তারই জন্যে রোশনারার স্পর্শে আমার পৌরুষ গলে পড়েনি।

চতুর্দিকে আমার যেন সব শূন্য হয়ে যায়। আমার পাশে কিছু নেই! আমার পায়ের নীচে কিছু নেই, কোনোদিকে কিছু নেই। আশ্রয়ের জন্যে আকুল হয়ে হাত বাড়াই। আশ্রয় মেলে। শোভানের বক্ষের নিবিড়তা।

এবারে আমার কান্নার পালা।

ঘুম ভেঙে যায়।

ব্যাকুল হয়ে আল্লাকে ডাকি। শেখ-ইবন্-উল-আরাবীর শক্তি আমাকে দাও আল্লা। আমি স্বপ্নকে সার্থক করে তুলি।

দূরে যমুনার কূলে বাইশ হাজার কর্মরত শ্রমিকের কোলাহল বকুল গাছের ভ্রমর-গুঞ্জনের মতো প্রতিদিন কানে ভেসে আসে। সেই গুঞ্জন আমার মনকে এক অবর্ণনীয় বিষাদে ভারাক্রান্ত করে তোলে। নিজের ভাইরবোনেদের তখন বড়ই আপন বলে মনে হয়। দুর্বিনীত রোশনারার ওপর তখন আর রাগ করতে পারি না। মোল্লাশালের তত্ত্বাবধানে শিক্ষিত শুষ্ক-হৃদয় আওরঙজেবের প্রতি করুণা জাগে। দুই বছর আগে দক্ষিণ ভারতের শাসনকর্তা হয়ে গিয়েছে সে। কতই বা বয়স ছিল তখন। আমি জানি, বাদশাহ্ ইচ্ছে করেই তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। মুখে সবাই তাকে দোষারোপ করে। সে অন্য ভাইদের মতো সহজ সরল নয়। কিন্তু এর জন্যে কি সে দায়ী? বাবার ভাগ্যের ওপর আল্লার কৃপাদৃষ্টি বর্ষণের জন্যেই যেন তার মনকে কোরবানি দেওয়া হয়েছে। সে মনকে ফিরে পাবার বাসনা জাগতে পারে। পেলে আনন্দিত হবে সবাই। কিন্তু না পেলে আওরঙজেবকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তাই বিশেষ করে বাবা যখন তার সমালোচনা করেন হারেমের বেগমদের সামনে তখন মাঝে মাঝে মনে বড় ব্যথা পাই। ব্যথা পাই যমুনাকূলের বাইশ হাজার কর্মীর কর্মের কলরব কানে আসে বলে।

এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে, বাবা যখন বাদশাহ জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, শেষে দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে পাঠালেন তখন নিজের সততার নিদর্শন স্বরূপ দারাশুকো আর আওরঙজেবকে রাজধানীতে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সেই ভুলেরই মাশুল গুণতে হচ্ছে আজ। দারার কিছুটা বয়স হয়েছিল তখন। সে শিক্ষা পেয়েছিল যথেষ্ট তার আগেই। কিন্তু আওরঙজেবের তখন কচি বয়স। শিক্ষার হাতেখড়ি হয় সেই বয়সে। যেবারে মমতাজ বেগম জেসমিন প্রাসাদে নূরজাহানের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন, সেবারে নূরজাহান নিজের মুখে স্বীকার করেছেন যে আওরঙজেবের শিক্ষায় বাধা সৃষ্টি করার কোনো চেষ্টা থেকেই তিনি বিরত হননি। এমনকি সে যাতে

অমানুষ হয়ে ওঠে তার পাকাপোক্ত ব্যবস্থাও তিনি করে ফেলেছিলেন। আজ নুরজাহান সে সব দিনের কথা বলতে গিয়ে জেসমিন প্রাসাদের পাষাণের ওপর যত চোখের জলই ফেলুন না কেন, সে জলের ধারা তাঁর নিজের হাতে ছোপ দেওয়া আওরঙজেবের হৃদয়ের কালিমা কিছুতেই ধুয়ে সাফ্ করে দিতে পারবে না। তবু হয়তো পারা যেত। কিন্তু দারা বলে, মোল্লাশালের নীরস শিক্ষা সে পথেও অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দারা নাকি বাদশাহ্‌কে অনেক বুঝিয়েছিল যে আওরঙজেবের জন্যে একজন প্রকৃত জ্ঞানী শিক্ষাগুরু নিয়োগের জন্যে, বাদশাহ শোনেননি। কেন যেন ওকে তিনি দেখতে পারেন না। আমীর ওমরাহেরা বলাবলি করে, এসবের কারণ আওরঙজেবের ক্ষুরধার বুদ্ধি। হারেমের বেগমরা ফিসফিস করে বলে, আওরঙজেবের অপরূপ রূপই এর কারণ। পুত্রের প্রতি পিতার অবচেতন মনের ঈর্ষা। জানি না কোনটি সত্যি, কোনটি মিথ্যা। কিংবা কোনোটাই সত্যি কি না। শুধু কষ্ট হয়। কষ্ট হয় যমুনাকূলের কলরব, গুঞ্জনের মতো ভেসে আসে বলে। সে গুঞ্জন মনে করিয়ে দেয় আমরা ক'টি ভাইবোন যে মায়ের গর্ভে জন্মেছি, তিনি আমাদের ছেড়ে বেহেস্তের পথে বহুদূর এগিয়ে গিয়েছেন। আমরা মা-হারা সেই মায়ের সমাধির ওপর বাদশাহ্ সাজাহানের আদেশে দিনের পর দিন তিলে তিলে গড়ে উঠছে তিলোত্তমা।

বোগদাদ, আরব, সিংহল আর মিশর থেকে মহামূল্য স্ফটিকস্বচ্ছ প্রস্তররাজি এনে স্তূপীকৃত করা হয়েছে। পৃথিবীর অদ্বিতীয় হর্ম্য নির্মাণের অদম্য বাসনায় বাদশাহ্ পাগল। নির্মাণ তো নয় যেন রচনা। শিল্পীরা দিনের পর দিন এক একটি ছত্র রচনা করে চলেছে কবিতায়। এ যেন আবু সাইদ আর নাসীর-ই -খসরুর অপূর্ব সমন্বয়—প্রেম আর আধ্যাত্মিকতার মিলনক্ষেত্র।

তাজমহলের প্রধান শিল্পী ইসা-মামুদ-ইফেদি। তিনি এক প্রতিভাবান যুবকের কথা বাদশাহকে বলেছিলেন। সেই যুবকের সাক্ষাৎ পেলাম একদিন পিতার সঙ্গে গিয়ে।

যুবক তন্ময় ছিল। আমাদের উপস্থিতি টের পায়নি। নক্‌শা ছেড়ে সে একটি পাথর খোদাই-এ মনোনিবেশ করে। তবু খেয়াল করে না।

বাদশাহ্ সহসা প্রশ্ন কবেন—তাজমহলের নক্‌শার পরিবর্তন করছ?

কিছুমাত্র সচকিত হয় না যুবক! আমাদের দিকে না চেয়েই স্বাভাবিক গলায় জবাব দেয়,—হ্যাঁ।

—কার হুকুমে?

এবারে যুবক বাদশাহের দিকে চায়। কিন্তু তার পোশাক দেখেও চিনতে পারে না। বলে, —ইসা-মামুদ-ইফেদি আমাকে সে স্বাধীনতা দিয়েছেন।

তাঁর নকশা অনুযায়ী কাজ হলে কোনো অসুবিধে হ'ত?

তিনি খুবই উঁচুদরের শিল্পী। তবে আমার এই পরিবর্তনে তিনি অনুমতি দিয়েছেন। আপনি বাদশাহ্?

—হ্যাঁ।

যুবক আচমকা লাফিয়ে উঠে অভিবাদন করে। রীতিমতো অপ্রস্তুত হয় সে। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে আমি হেসে ফেলি।

এরপর প্রতিদিন তাজমহলে গিয়ে বাদশাহ্ শিল্পীর পাশে দাঁড়িয়েছেন। বিস্মিত দৃষ্টিতে তার বেহেস্ত-ছোঁয়া দৃষ্টির দিকে চেয়ে থেকেছেন। কোনো কথা বলেননি তাকে। কথা বললে তার স্বপ্ন ভেঙে যাবে—সে বাস্তব জগতে ফিরে আসবে। বাদশাহ তা চান না। কত সময় শিল্পী তাঁকে 'সিজদা' করেনি— উঠে দাঁড়ায়নি। এমনকি কথা পর্যন্ত বলেনি। অথচ বাদশাহের মুখে তার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখতে পাইনি আমি।

তবু একটি জিনিস আমার নজর এড়ায় না। শিল্পীর প্রতি ভুলেও কখনো শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে দেখেনি তাঁকে। প্রধান শিল্পী ইসা-মামুদের প্রতিও নয়।

বাদশাহ পুরুষ। তাঁর বাস্তববুদ্ধি প্রখর। তিনি জানেন, আজ থেকে অনেক বছর পরে প্রকৃতি যদি করুণা করে তাজমহলকে বাঁচিয়ে রাখে, তখন ইসা-মামুদ কিংবা অন্য শিল্পীকে সবাই ভুলবে। শাহনশাহ্ সাজাহানের কথা কেউ ভুলতে পারবে না। প্রতিদিন পিতার তাজমহল পরিদর্শনের সময় তাঁর নিত্যসঙ্গী হিসেবে আমার সব আনন্দের মধ্যে এইটুকুই শুধু দুঃখ।

ইসা-মামুদের এই তরুণ সহকারীর মনের কথা জানবার অদম্য কৌতূহল হয় আমার। দিনের পর দিন চেষ্টা করেও সে কৌতূহলকে সংযত করতে ব্যর্থ হই।

শেষে দুঃসাহসী হয়ে উঠি। আমার পরম বিশ্বস্ত নাজীর কোয়েলের কাছে একদিন তার অতি সাধারণ একপ্রস্থ পরিচ্ছদ চেয়ে বসি। কোয়েল কিছুক্ষণ হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কি দেখে সেই জানে। শেষে উঠে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে নিয়ে আসে পোশাক।

—এ যে হিন্দুর পোশাক কোয়েল।

—আমি মুসলমান কবে হলাম শাহজাদী!

—হিন্দুর পোশাকে তোমাকে তো দেখিনি কখনো।

—হারেমের বাইরে নগরীর রাজপথে আমি নাজীর নই। সেখানে আমি হিন্দু রমণী। রাজপুত।

—কিন্তু এ পোশাকে যে চলবে না।

একদণ্ড স্থির হয়ে থেকে কোয়েল প্রশ্ন করে,—শাহ্জাদী, অপরাধ না নিলে জানতে পারি কি কেন আপনার এ খেয়াল হলো?

কোয়েলকে গোপন ইচ্ছার কথাটা জানাতে আপত্তি ছিল না কারণ তাকেই সঙ্গী হিসেবে নিতে হবে। তাকে সব কিছু খুলে বললাম। যদিও বাদশাহের মনোভাবের কথা জানতে দিলাম না।

কোয়েলের মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়। বলে, বড় বেশি ঝুঁকি নিচ্ছেন শাহজাদী।

—জানি।

—না গেলেই ভাল করতেন।

—আমি যাব।

আমার দৃঢ়তা দেখে কোয়েল চুপ করে থেকে শেষে বলে,—এ পোশাকেই যান তবে।

—কেন?

—রাজপুত রমণী মুসলমানদের মতো অতটা পর্দানসীন নয়। অন্য পুরুষের সঙ্গে কথা বলার সুবিধা হবে আপনার।

আমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কোয়েলের বুদ্ধির তারিফ না করে পারি না। কিন্তু পরক্ষণেই নিরাশ হই। এ-বেশে হারেম থেকে বাইরে যাওয়ার অনেক বিপদ। কারণ হারেমে এ-বেশে কেউ ঘুরে বেড়ায় না।

কোয়েল আমার মনোভাব বুঝতে পেরে বলে ওঠে,—আপনি হতাশ হবেন না শাহজাদী। ওড়নাটা গায়ে জড়িয়ে চলে গেলে কেউ বুঝতে পারবে না। তবে আজকের দিবানিদ্রার মোহটুকু ছাড়তে হবে আপনাকে। দুপুরেই আসল সময়। সবাই ঘুমিয়ে থাকবে। পেছনের দরওয়াজার প্রহরীকে শুধু বশ করা।

—কি করে বশ করব?

কোয়েল বুড়ো আঙুলের সঙ্গে তর্জনী ছুঁইয়ে হাসিমুখে ইশারায় জানায়—টাকা।

সারা ভারতের সর্বকালের সব চাইতে ঐশ্বর্যশালী বাদশাহের নন্দিনী হয়ে নিজের হারেম থেকে চুপিসারে বার হবার জন্যে নিজেরই এক প্রহরীকে ঘুষ দিতে আমার গজদন্তের পেটরা খুলে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা কোয়েলের হাতে তুলে দিই। জানি অন্যায় করছি—খুবই অন্যায় করছি। কিন্তু উপায় নেই।

নিজের হাতে আমাকে রাজপুত রমণীর বেশে সাজিয়ে দেয় কোয়েল। আগ্রহ ভরে পরে ফেলি আমি। আমাদের পোশাকের সঙ্গে ওদের পোশাকের কত মিল, আবার কত অমিল! পোশাকের

অমসৃণতা আমার ত্বক প্রথমটা সহজভাবে নিতে পারেনি। একটু জ্বালা ধরায়। কিন্তু আমার ইচ্ছার প্রবলতা সে জ্বালাটুকুর কথা ভুলিয়ে দেয়। সহজ হয়ে আরশির সামনে গিয়ে নিজের নতুন রূপ দেখে হেসে ফেলি। কোয়েলও কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে হাসছে ভেবে মুখ ফেরাই।

কোয়েল গম্ভীর। আমার দিকে তার চোখ ছিল না। গবাক্ষের বাইরে রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের দিকে ব্যথাভরা দৃষ্টিতে চেয়েছিল সে।

—কি হলো কোয়েল? হাসছ না?

চমকে ফিরে দাঁড়িয়ে মুখে জোর-করা হাসি টেনে সে বলে,—এই তো হাসছি শাহজাদী। বেশ মানিয়েছে।

—আমাকে কি এতই বোকা ভাব তুমি?

—সে কি শাহজাদী! কোয়েলের কথায় অপার বিস্ময়।

—আমি ভুলছি না। বল, কেন তুমি গম্ভীর। কি ভাবছ তুমি?

—আমাদের কি ভাবনার অন্ত আছে শাহজাদী? সে সব কথা না-ই বা শুনলেন।

—না, বলো। আমার গলায় আদেশের সুর।

বেশ কিছুক্ষণ কাটে। তবু কোয়েল চুপ করে থাকে। তার মাথা নিচু। বুঝতে পারি, যে কথাই হোক, বলার ইচ্ছে ছিল না তার। শুধু আমার আদেশ বলেই বলবে। প্রস্তুত হচ্ছে তার জন্যে মনে মনে।

আমার দিকে সোজা দৃষ্টি ফেলে কোয়েল বলে,—এই পোশাক ছিল আমার বোনের শাহজাদী। এটি পরতে গিয়ে আপনার কত অস্বস্তি। অথচ আমার বোন প্রাণভরে পরতে চাইত না। তার সব চাইতে ভাল পোশাক ছিল ওটি। বাড়ির কেউ ওতে হাত দিলে সে কিভাবে যেন টের পেত। যেখানেই থাকুক ছুটে আসত হন্তদন্ত হয়ে। মা রাগ করতেন কত। ঠাকুমা হেসে বলছেন, পাগলি। বিয়ে হলেই ঠিক হয়ে যাবে। ওর বাপও ঠিক অমনটি ছিল। ঠাকুরদার তলোয়ার ছিল তার প্রাণ। কেউ হাত দিতে পারত না। শেষে তলোয়ারই তার কাল হলো।

—বোনটি কোথায়? বিয়ে হয়েছে কতদিন?

—বিয়ে তার হয়নি শাহজাদী।

—তবে কোথায় সে?

কোয়েল রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের দিকে আর একবার চেয়ে আঙুল দিয়ে দেখায়।

আমার গায়ের মধ্যে শিউরে ওঠে। পোশাকটি ভারী বোঝা বলে মনে হয়। ছেড়ে ফেলতে পারলে বাঁচি। চেঁচিয়ে উঠি,—কি করে অমন হলো?

—যমুনায় নাইতে গিয়েছিল বন্ধুদের নিয়ে। সবাই ফিরে এলো, ও এলো না।

—আমায় আগে বলনি কেন? পরতাম না তোমার বোনের জিনিস।

—সে কি শাহজাদী!

—তার স্মৃতি বিজড়িত জিনিসটি না আনলেই পারতে কোয়েল। তাছাড়া তার যখন এত মায়া ছিল এটির ওপর।

—সে বেঁচে থাকলে, আপনি পরবেন জানলে ছুটে এসে দিয়ে যেত। আপনি তো একবার মাত্র ব্যবহার করবেন। আবার তুলে রেখে দেব। একটি স্মৃতির জায়গায় দুটি স্মৃতি জড়িয়ে থাকবে ওটির সঙ্গে।

তবু মনের ভেতর একটা দ্বিধা থাকে। সে দ্বিধা নিয়ে দুপুর হতেই কক্ষ থেকে বার হই। কোয়েল আগে আগে চলে। সব দিকে ভাল করে দেখেশুনে নিয়ে সে ইশারা করে, আর আমি একটু একটু করে এগিয়ে যাই। কক্ষের পর কক্ষ পার হই। নিস্তব্ধ সব! ঘুমন্ত পুরী। শুধু খোজাদের ভারী পায়ের মশমশ শব্দ এদিক-ওদিক থেকে ভেসে আসে। হারেমের নাজীরদের আড্ডাখানা থেকে চাপা কথা আর কুৎসিত

হাসির মিলিত আওয়াজ শুনতে পাই। এ সময়ে তাদেরও বিশ্রাম। কোয়েলের মুখে শুনেছি, তারা এ সময়ে নিজের নিজের বেগমদের কেচ্ছার কথা আলোচনা ক'রে নারকীয় আনন্দ উপভোগ করে।

দরওয়াজার প্রহরী দূর থেকে আমাকে আর কোয়েলকে দেখে মুচকি হেসে দূরে সরে যায়। প্রাসাদের বাইরে পা দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হই।

শিল্পী এখনও পাথরের ওপর নিপুণ হাতে সূক্ষ্ম খোদাই-এর কাজ করে চলেছিল একমনে। কোয়েলকে একটু দূরে অপেক্ষা করতে বলে আমি তার পেছনে গিয়ে দাঁড়াই। দেখতে পায় না আমাকে। অমনভাবে যদি আরও বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি আমি, তবু দেখতে পাবে না সে। সে তন্ময়—মনের রসকে রূপ দিচ্ছে। সৃষ্টির উন্মাদনা তার শিরায়-উপশিরায়। আমি সেই অপূর্ব সৃষ্টি অবাক বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করি। মায়ের সমাধি-সৌধ পরিশেষে কী রূপ নেবে, পৃথিবীর শুধু দু'জন মানুষ তা জানে। সে দু'জনের একজন আমার সামনে। ভাবতেও ভাল লাগে।

আমি জানি প্রস্তরখণ্ডের ওপর ওই সূক্ষ্ম খোদাই-এর কাজ শেষ হলে শিল্পী সেটি অন্যান্য ভাস্করের সামনে রেখে নির্দেশ দেবে ওটি দেখে প্রয়োজনমতো দৈর্ঘ্য-প্রস্থের প্রস্তরে খোদাই করতে। সেই খোদাই করা প্রস্তরখণ্ডগুলি সযত্নে দড়ি দিয়ে তুলে হর্ম্যের একটি স্থানে স্থাপন করা হবে। শিল্পী জানে কোথায় হবে তাদের স্থান। কারণ ইসা-মামুদের প্রিয় সহকারী সে।

শিল্পী ঘামছিল। সূর্যরশ্মির প্রখরতা ততটা না থাকলেও সে ঘামছিল। অতিরিক্ত একাগ্রতা মস্তিষ্ক ও দেহে যে চাপের সৃষ্টি করে তাতেও মানুষ ঘামে। শিল্পীর কামিজ ভিজে উঠেছিল। তার কানের পাশ বেয়ে ঘাম পড়ছিল পাথরের ওপর। ওড়না দিয়ে ওর মুখ মুছিয়ে দিতে ইচ্ছে হলো আমার। এত বড় একটা কাজ যার পরিচালনায় এগিয়ে চলেছে তাকে বড় অসহায় বলে মনে হলো। ঠিক একটি ছোট্ট শিশুর মতো—যে শুধু খেলতেই জানে, নিজের ভালমন্দ বোঝে না।

একসময় সে হঠাৎ কাজ থামায়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানান ভাবে দেখে পাথরের ওপর নিজের কাজ। পরিতৃপ্তির শ্বাস ফেলে। তারপর হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে একেবারে কাছটিতে আমাকে দেখে অবাক হয়।

—কে তুমি?

মাথার ওড়না ফেলে দিয়ে মৃদু হেসে বলি,—আমি।

শিল্পী আমার দিকে চেয়ে থাকে। চোখের পলক পড়ে না তার। তার চাহনির আদি অন্তের হদিস মেলে না। বহুদূর থেকে যেন সে চেয়ে রয়েছে। যেন বহু যোজন দূর থেকে পৃথিবীর ওপর দৃষ্টি ফেলেছে চাঁদ। আমি লজ্জিত হই না। আমার মনে হয় এটাই যেন সব চাইতে স্বাভাবিক। আমি তৃপ্ত হই।

—কি সুন্দর! শিল্পীর কথা অস্ফুট।

—পাথর রয়েছে আপনার। আমার একটা মূর্তি গড়বেন?

চঞ্চল হয়ে ওঠে শিল্পী। মুখে তার আনন্দের উচ্ছ্বাস। চোখ দুটি তার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই একটা হতাশা তাকে আচ্ছন্ন করে। সে ধীরে ধীরে অস্বীকার করে।

—কেন?

—অনেক সময়ের দরকার। অত সময় তো তুমি দিতে পারবে না আমায়।

—কত সময়ের দরকার?

—অনেক—অনেক। তুমি পারবে না।

—যদি পারি।

—গম্ভীর হয় শিল্পী। ধীরে ধীরে বলে,—পারবে না। আমার কাছে তুমি আজীবন থাকতে পারবে?

—আজীবন?

—হ্যাঁ। তোমাকে দেখে আমার তাই মনে হচ্ছে। তার আগে কি মূর্তিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে

পারব? এ রূপের যে অন্ত নেই।

চুপ করে থাকি। শিল্পী একটাও মিথ্যে কথা বলছে না জানি। মনেপ্রাণে সে যা বিশ্বাস করে তাই বলছে। তার হতাশা ভাব কেটে যায়। সাময়িক একটা প্রলোভন থেকে সে নিজেকে ছিনিয়ে নেয়। স্বাভাবিক উদাসীনতা ফিরে পায় সে।

—বড় ঘেমেছেন আপনি।

—ও, তাই নাকি? তাই তো।

ওড়নাটা ওর হাতে দিয়ে বলি,—মুছে ফেলুন।

বাধ্য ছেলের মতো সে ওড়নার একপ্রান্ত দিয়ে মুখ মুছে ফেলে সেটি ফিরিয়ে দেয় আমাকে।

আড়চোখে একটু দূরে দণ্ডায়মান কোয়েলকে দেখি। ওড়নাটিও তার বোনেরই। মৃত বোনের জিনিসের ব্যবহার দেখে তার মধ্যে কোনো বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয়েছে বলে বোধ হ'ল না। সে যেন একটু খুশি।

আমি শাহানশাহ সাজাহানের কন্যা জাহানারা। জীবনে নিজের কোনো কাজ বড় একটা করেছি বলে মনে হয় না। অথচ শিল্পীর রোদে-পোড়া মুখের নতুন জমে-ওঠা ঘামের দিকে চেয়ে বলে ফেলি, —হাওয়া করি?

—না। সেকি? না। থতমত খায় সে।

আমিও লজ্জা পাই; ছিঃ ছিঃ। ওড়না দিয়ে হাওয়া করা কোয়েলও ঠিক সাধারণভাবে নিত না। একটু হলেই শাহজাদীর সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিতাম।

কর্মব্যস্ত শ্রমিকের নজর পড়েছে আমার ওপর। কাজের ভানে বড় বেশি ঘোরাঘুরি করতে শুরু করেছে আমাদের আশেপাশে। অথচ ঠিক যেখানে শিল্পী বসে রয়েছে সেখানে শিল্পকার্যের নমুন সংগ্রহ করা ছাড়া তাদের উপস্থিতির প্রয়োজনই নেই। যেটুকু আছে, তাতে এত শ্রমিকের আনাগোনা বড় বেশি দৃষ্টিকটু।

সঙ্কুচিত হই আমি। ঘাম-মোছা ওড়না মাথার উপর আবার টেনে দিই।

—তুমি এলে কি করে এখানে? মেয়েদের তো এখানে আসতে মানা।

তবু ভাল, শিল্পীরও নজরে পড়েছে তার অধীনস্থদের উগ্র কৌতূহল।

ভাঙা, অকেজো টুকরো-পাথর স্তূপীকৃত করা রয়েছে একদিকে। কয়েকজন লোক তার থেকে বেছে সংগ্রহ করছে নিজেদের পছন্দমতো। সেইদিকে দেখিয়ে বলি,—কয়েক টুকরো নিতে এসেছিলাম।

—সাংঘাতিক।

—কেন?

—আমার খেয়াল ছিল না। নইলে তোমাকে দেখামাত্র বের করে দিতাম এখান থেকে।

—সত্যিই আসতে নেই মেয়েদের?

—না।

—কি হয় এলে?

শিল্পী সঙ্কুচিত হয়ে বলে,—তুমি বুঝবে না।

—বলুন না।

একটু ইতস্তত করে সে। শেষে বলে, কত পুরুষ এখানে। বাইশ হাজার। কত দূর দেশ থেকে এখানে এসে কাজ করছে, পরিবারের কাছছাড়া হয়ে! তাই।

—কী তাই?

—জানি না, চলো তোমাকে বাইরে রেখে আসি।

—আপনিও তো দূর দেশের লোক।

—কি করে জানলে?

—জানতে অসুবিধে আছে নাকি। চেহারা দেখলে বোঝা যায় না?

—ঠিক বলেছ। কিন্তু আমি ঠিক—

হেসে উঠি।

—হাসলে যে?

—এমনি। আচ্ছা এখানে কখনো কোনো স্ত্রীলোক আসেনি?

—না।

—একজনও নয়?

—না।

—একজনও?

শিল্পীর ললাটের রেখা কুঞ্চিত হয়। যমুনার জলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে ওঠে—একজন আসেন।

—কে তিনি?

—শাহজাদী জাহানারা।

—তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন?

—পাগল নাকি? তিনি কি তোমার মতো রাজপুত? তাছাড়া আমার মতো সামান্য লোকের সঙ্গে কথা বলবেন কেন?

—তাঁকে দেখেননি?

—না।

—খুব সুন্দরী নিশ্চয়—তাই না?

—হয়তো তাই। কিন্তু তোমার মতো কখনই নয়।

—আমি সুন্দরী?

—জান না? আরশিতে মুখ দেখো না বুঝি? শিল্পীর স্বরে অভিমানের আভাস।

আমি কিছু বলতে পারি না। বুকের ভেতর কেঁপে ওঠে। পুরুষের অভিমান-ভরা কথা কখনো শুনিনি। এই প্রথম শুনলাম। শিল্পীর এই ছোট উক্তিটি আমার হৃদয়ের এক অজ্ঞাত তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তোলে। সে ঝঙ্কার আর থামতে চায় না। শিল্পীর মুখের দিকে চাইতে পারি না আমি। চাইলে দুর্বলতা ধরা পড়ে যাবে আমার। নারী হলেও আমি সাজাহান-দুহিতা জাহানারা। অসামান্য প্রতিভাবান এই স্রষ্টার আর যাই থাক সিংহাসন নেই। সিংহাসন না থাকলে, জগতের চোখে জাহানারার হৃদয়ের শতাংশের একাংশ পাওয়ার যোগ্যতাও তার নেই।

শিল্পীর সঙ্গে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই! কোয়েলের অস্তিত্ব অনুভব করি। সে আমাদের অনুসরণ করছে। প্রবল ইচ্ছে হয় তার সঙ্গে শিল্পীর পরিচয় করিয়ে দিতে। রূপসী না হলেও অসুন্দর নয় সে। শিল্পী তাকে পেয়ে তৃপ্ত হবে না? যদি তৃপ্ত হ'ত, আমার নিজস্ব কোষাগারের সঞ্চিত সব দিয়ে দিতাম ওদের।

যমুনার ধার দিয়ে অনেকটা এগিয়ে আসি, বাইশ হাজার শ্রমিকের আওতার বাইরে।

এতক্ষণে আসল প্রশ্ন করি তাকে,—এত যে পরিশ্রম করেন আপনি—কিসের জন্যে? টাকা?

—টাকা? না। টাকা হবে কেন?

—তবে?

—আনন্দ।

—পরিশ্রম করে আনন্দ?

—না। সৃষ্টির।

—আপনার এ সৃষ্টির মূল্য দেবে কে?

—সমস্ত পৃথিবী। কবি কাব্য লেখেন—মূল্য কে দেয়?

ভাবতে সময় নিই। শেষে বলি,—কাব্যে কবির পরিচয় থাকে। তাই তিনি অমর হন। কিন্তু আপনার কি অমর হবার সাধ নেই?

থমকে দাঁড়ায় শিল্পী। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলে,—কে তুমি?

—সাধারণ এক রাজপুতের মেয়ে।

—তুমি সাধারণ নও। তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি বিদূষী, তুমি অসামান্য রূপবতী। কে তুমি?

—সত্যি সাধারণ আমি। লেখাপড়া শিখেছিলাম কিছু।

উদাস স্বরে শিল্পী বলে,—অমর হবার সাধ কার না থাকে। সবাই কি হতে পারে? অমর না হতে পারি, সৃষ্টি তো রইল।

—হ্যাঁ, শুধু সৃষ্টিই থাকবে। শাহানশাহের নামকে ছাপিয়ে আপনার নাম কোনোদিনও কলারসিকদের কানে পৌঁছবে না।

—কে তুমি?

—বলেছি তো।

—বিশ্বাস হয় না।

—না হোক। আমার কথাটা তুমি বিশ্বাস করবে।

—তা করি। কিন্তু অত ভাবার সময় নেই, আর তো বেশি বাকি নেই। তারপরে এসো। দুজনে বসে ভাবা যাবে।

—আর আসব না।

—জানতাম।

—কি জানতেন?

—তোমার মতো মেয়ে দুবার আসে না।

শিল্পীর উদাসীনতায় বিস্মিত হই। শুধু তিনবার জানতে চাইল কে আমি। ব্যস্। জবাব পেল না। কৌতূহলও রইল না। অদ্ভুত।

হেসে বলি,—এবার আমি যাই।

শিল্পী কথা বলে না। নিদারুণ বিষণ্ণতা তার মুখখানাকে ছেয়ে ফেলেছে। সে চুপ করে থাকে।

আমার হাসি থেমে যায়। মাথা নিচু করে বলি,—যাব?

—এসো।

এক-পা এক-পা করে কিছুদূর এগিয়ে যাই। শিল্পী তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। বারবার পেছন ফিরে দেখি আমি। কোয়েল তার কাছ দিয়ে চলে আসে, তবু সে লক্ষ্য করে না।

হঠাৎ সে ডেকে ওঠে,—একটু শুনবে? অল্প একটু।

কোয়েল থমকে দাঁড়িয়ে যায়। আমি কোয়েলের পাশ দিয়ে তার কাছে যাই। কোয়েল বড় বড় চোখে চেয়েছিল। সেদিক চেয়ে আমি হাসতে চেষ্টা করি। পারি না। শিল্পীর ডাক আমার কাছে আল্লার নির্দেশ মনে হয়।

শিল্পীর সামনে গিয়ে দাঁড়াই। চোখ সজল তার। রুদ্ধ আবেগে বক্ষ স্ফীত। কথা বলতে পারে না সে বহুক্ষণ। শেষে অতি কষ্টে বলে,—আমি তোমার নাম জানি না। জানতে চাই না। কোথায় থাকো তাও জানব না। কারণ জানি তুমি সাধারণ কোথাও থাকো না। হয়তো এভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলা আমার পক্ষে খুবই অন্যায় তবু—

সে থেমে যায়। অন্যদিকে মুখ ফেরায়। আমি অপেক্ষা করি।

—তোমার মূর্তি গড়ে দিতে বলেছিলে। আমি গড়ব। এখানকার কাজ শেষ করে আমি গড়ব। এই আগ্রাতেই কোথাও সে মূর্তি স্থাপন করে দিয়ে চলে যাব আমি। তুমি দেখো। কিন্তু গড়তে হলে যে ভালোভাবে দেখে নিতে হবে তোমায়। মনের মধ্যে তোমার মূর্তি আজীবন স্পষ্ট হয়েই থাকবে। তবু আর একবার ভাল করে দেখে নিতে চাই। আপত্তি করো না। করবে না তো?

আমি দাঁড়িয়ে থাকি। শিল্পী চেয়ে চেয়ে দেখে। যেন কত যুগ চলে যায় দেখতে দেখতে—কত জল বয়ে যায় যমুনার বক্ষ দিয়ে। তবু সে দেখার শেষ নেই। আমার মাথাটি ধীরে ধীরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অশ্রুপূর্ণ হয়ে ওঠে চোখ দুটি। বড় বড় দু ফোঁটা জল গাল বেয়ে মাটিতে ঝরে পড়ে। কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়ে ওড়না দিয়ে মুছে ফেলে সামনে চেয়ে দেখি সে তখন টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে সমাপ্তপ্রায় স্মৃতিসৌধের দিকে।

পেছন থেকে আলগোছে আমার হাত চেপে ধরে কোয়েল। সে বুঝতে পেরেছিল আমি শিল্পীর দিকে পা বাড়িয়েছিলাম।

—কোয়েল? তোমারও চোখে জল?

—স্বর্গীয় কিছু দেখলে চোখের জল সামলাতে পারি না।

—কোয়েল, হারেমে ফিরে গিয়ে তোমার ওড়নাটি আগে নিও। তোমার বোন, আর আমি ছাড়াও আর একটি স্মৃতি এর সঙ্গে জড়িয়ে গেল। তুমি তো দেখেছ।

হ্যাঁ শাহজাদী। এ ওড়না এই অবস্থাতেই আমি তুলে রেখে দেব সযত্নে। বহুদিন পরেও এর ওই মলিন অংশটুকু অক্ষয় হয়ে থাকবে।

রোশনারা শাহজাদীর সম্মানবোধ হয় জলাঞ্জলি দেবে। তার মনের সুতীব্র কামনা আর বাসনা, রূপ হয়ে ফেটে পড়েছে তার দেহ বেয়ে। পুরুষেরা সে রূপের দিকে চাইলে উন্মাদ হয়। রোশনারা জানে সে কথা। পুরুষের সামনে তাই অল্পতেই তার শরীরে ব্যথা লাগে। সে কাতর হয়ে পড়ে। এই কাতরতার মধ্যে তার মনের আদিম ক্ষুধা উৎকটভাবে প্রকাশ পায়। দেখে শিউরে উঠি আমি। সে মনে করে কেউ বুঝি বুঝতে পারে না। পুরুষেরা বোঝে না হয়তো; কিন্তু আমার চোখকে কিভাবে ফাঁকি দেবে সে, আমিও যে নারী। যে প্রবৃত্তিগুলি তার মধ্যে দেখা দিয়েছে, আমাকেও যে সেগুলি অহরহ চঞ্চল করে তোলে। কিন্তু ওর মতো আমি ভুলে যাই না যে আমি শাহানশাহ সাজাহানের কন্যা। আর সবার ওপর আমি নারী।

রোশনারা এক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। মা বেঁচে থাকলে হয়তো একটা সমাধানের পথ খুঁজে দিতেন। কিন্তু তিনি নেই।

হঠাৎ মনে পড়ে জেসমিন প্রাসাদের কথা। হয়তো নূরজাহান এই বিপদে কোনো পথ দেখাতে পারবেন।

বাবা পছন্দ করেন না জেসমিন প্রাসাদে যাতায়াত। তাঁর ধারণা যত পরিবর্তনই হোক ভূতপূর্ব দিল্লীশ্বরীর, সুযোগ পেলে নিজ জামাতা শাহরীয়রের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ছাড়বেন না। অনেক আশা নিয়েই নূরজাহান জাহাঙ্গীরের অপর পুত্র শাহরীয়রের সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। আশা ছিল কন্যা একদিন তাঁর মতোই দিল্লির অধীশ্বর হবে। সে আশায় ছাই ঢেলে দিয়েছেন সাজাহান। তাই তাঁর ভয়।

মা জীবিত থাকতে যখন একবার জেসমিন প্রাসাদে গিয়েছিলেন, মুখে কিছু না বললেও মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন বাদশাহ। মুখে মায়ের কোনো কাজেরই কোনোদিন আপত্তি করেননি তিনি। সেই থেকে জেসমিন প্রাসাদে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন মা।

তাই বলে বাদশাহ কখনো অসম্মান করেননি নূরজাহানকে। বার্ষিক পঁচিশ লক্ষ টাকা বৃত্তি বরাদ্দ করে সযত্নে এককোণে সরিয়ে রেখেছিলেন নিজের বিমাতাকে। যে নারী ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত থাকাকালে মুহূর্তের জন্যেও সাজাহানের মঙ্গল চিন্তা করেননি, তাঁকে এইভাবে সসম্মানে বেঁচে থাকবার অধিকার দেওয়া সাজাহানের মতো উদার ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

পিতার অজ্ঞাতসারে জেসমিন প্রাসাদে যাবার জন্যে প্রস্তুত হই। গায়ে জড়িয়ে নিই 'বাদল-কিনারী' ওড়না। ওই ওড়না নূরজাহানেরই আবিষ্কার। ভাবলাম এভাবে সজ্জিত অবস্থায় গেলে প্রথম দর্শনে তিনি খুব খুশিই হবেন। সেই ছোটবেলায় কবে তিনি আমাকে দেখেছেন, এখন হয়তো চিনতে পারবেন না।

কাউকে সঙ্গে নিই না। কোয়েলকেও না। একা গিয়ে জেসমিন প্রাসাদের সোপানে দাঁড়াই। প্রহরী আর নাজীররা আমাকে দেখে অবাক হয়। আমার পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্যে তারা বুঝতে পারে সাধারণ নারী আমি নই। তাই বাধা দিতে পারে না ভেতরে প্রবেশ করতে। আবার নূরজাহানের অনুমতি ব্যতীত ছেড়ে দেওয়াও বিপদ। শেষে তাদেরই একজন অন্তঃপুরের দিকে দৌড়ে যায়।

মাথার ওপর ওড়নাটা ভালভাবে টেনে দিই—এসেই যাতে আমার মুখখানা স্পষ্ট না দেখতে পারেন তিনি। সোপানের ওপর অপেক্ষা করি।

একটু পরেই ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসেন একজন শুভ্রবসনা নারী। কিন্তু একি রূপ। যে-রূপ একসময়ে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এনেছিল প্রচণ্ড আলোড়ন—যে রূপের উগ্র মোহে বাদশাহ জাহাঙ্গীর অনেক সময়েই তাঁর ব্যক্তিত্বটুকু পর্যন্ত বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি, সেই রূপ এখনো ম্লান হয়ে যায়নি। এখনো তিনি নূরজাহান। ভারতবাসীরা হয়তো তাদের অসামান্যা রূপসী ভূতপূর্ব সম্রাজ্ঞীকে ভুলতে বসেছে। অন্তত বাদশাহ সাজাহানের সদা সতর্ক ব্যবস্থার ফলে নূরাজাহানের বর্তমান জীবন সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ নেই। কিন্তু একবার যদি এই শুভ্রবসনা রমণী আগ্রার দুর্গে উঠে ঝরোকা দর্শন দেবার সুযোগ পান তবে কি সাজাহানের শান্তির রাজ্যে ঝড় ওঠা একেবারে অসম্ভব?

হারেম কিংবা দরবারে নূরজাহানের নাম উচ্চারিত হয় না। কিন্তু আমি সোপানশ্রেণীর ওপর দাঁড়িয়ে অস্ফুটস্বরে বার বার বলি,—নূরজাহান—নূরজাহান—নূরজাহান।

মায়ের অসামান্য রূপ দেখেছি। যেন শিশির-স্নাত একগুচ্ছ বসরার গুলাব। তবু যেন তাতে কিসের অভাব ছিল। সমালোচকের নিক্তির বিচারে হয়তো মা অধিকতর রূপসী। কিন্তু ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে তাঁর রূপ নূরজাহানের মতো এতখানি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল কি?

শুনেছি বড় উগ্র ছিল নূরজাহানের রূপ। কিন্তু কোথায় সেই উগ্রতা? তবে কি আঘাত পেয়ে সে উগ্রতা বিনষ্ট হয়েছে? হয়তো তাই। আমি দেখি অতি স্নিগ্ধ জ্যোতি।

প্রথম দর্শনেই বুঝলাম সত্যিই পরিবর্তন হয়েছে নূরজাহানের। তিনি এসে একেবারে সামনে দাঁড়ান। কৌতূহলী নাজীর আর খোজারা দূরে দাঁড়িয়ে ব্যগ্রভাবে চেয়ে থাকে।

আমি মুখের ওপর থেকে ওড়নাখানা ধীরে ধীরে সরিয়ে দিই। চমকে ওঠেন তিনি। অস্ফুটস্বরে বলে ওঠেন,—আরজমন্দ বানু?

মৃদু হাসি আমি।

—কে তুমি?

—জাহানারা।

—আশ্চর্য।

—সত্যিই কি এতটা সাদৃশ্য?

—হ্যাঁ। তবে তার ত্বক ছিল আরও মসৃণ। তার চোখের তুলনা ছিল না। কিন্তু প্রথম দর্শনে চমকে দিতে পার।

নূরজাহান আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। অনেকক্ষণ সেইভাবে থাকেন। বুঝতে পারি আমার মাথার ওপর দু' ফোঁটা জল পড়ে।

তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলেন,—আরজমন্দ এককালে আমার খুব প্রিয় ছিল। কিন্তু ঐশ্বর্য অনেকের মতো তাকেও আমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। সে কিন্তু আমাকে ভোলেনি। বেগম মমতাজ হয়ে অনেক অসুবিধার মধ্যেও আমার সঙ্গে দেখা করে গিয়েছে।

—জানি।

নূরজাহান আপ্রাণ চেষ্টায় তাঁর ভাবাবেগ মন থেকে ঝেড়ে ফেলে আমার হাত ধরে প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। চলতে চলতে আমার ওড়না স্পর্শ করে বলেন,—বাদল-কিনারী?

—হ্যাঁ। দেখে আপনি খুশি হবেন—তাই।

—এমন আরও অনেক জিনিসের প্রচলন করেছিলাম। থাকবে কিনা জানি না।

শেষে একটি কক্ষের মধ্যে এসে তিনি থেমে যান। সে কক্ষে আসবাবপত্রের বালাই নেই। বন্দী হলেও নূরজাহানের বিলাসিতার পথে কোনোরকম অন্তরায়ের সৃষ্টি করেননি বাদশাহ। উপযুক্ত বার্ষিকীর ব্যবস্থা করেছেন। তবে এমন শ্রীহীন কেন নূরজাহানের কক্ষ? দেখি শুধু মাঝখানে একটা উচ্চ বেদীর ওপর অতি সাধারণ শয্যা। পরিধানে পোশাকের তো কোনো চাকচিক্য নেই। মনে মনে দুঃখ হয়। হিন্দু সন্ন্যাসিনীর মতো হয়তো তিনি দিনের পর দিন একটি করেই বলাসিতার সামগ্রী বিসর্জন দিয়ে চলেছেন। কতখানি মনের জোর আর সাধনার ফলে তাঁর মতো নারীর পক্ষে এটি সম্ভব! হয়তো জীবনের শেষ দিনে লজ্জা নিবারণের জন্য পরিধেয় বস্ত্রটি ছাড়া আর কিছুই তিনি রাখবেন না।

নূরজাহান কি হিন্দুধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হলেন শেষ পর্যন্ত?

না। কক্ষের এককোণে একটি ছোট্ট চৌকির ওপর কোর-আন শরিফ তখনো খোলা অবস্থায় রয়েছে। তাঁর চোখ-মুখের পবিত্র ভাব দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় আমি আসার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি একমনে পড়ছিলেন ওটি।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাই।

মৃদু হাসেন তিনি। আমার মনোভাব বুঝতে পারেন। ইঙ্গিতে পাশের ঘরে তাঁকে অনুসরণ করতে বলেন।

সে ঘরে গিয়ে স্তম্ভিত হই। যেন এক ফুলের রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। কক্ষের চারপাশের দেয়াল পুষ্পে পুষ্পে ঢাকা পড়েছে। একটি বিরাট শয্যা পাতা রয়েছে মাঝখানে, তার চতুর্দিকে চারটি সোনার বড় ধূপদানি। ধূপের সুগন্ধে কক্ষ আমোদিত। শয্যার ওপর গুচ্ছ গুচ্ছ রজনীগন্ধা। আর সেই রাশীকৃত পুষ্পের মাঝখানে সুবর্ণনির্মিত পটে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের প্রতিচ্ছবি।

আমি বিহ্বল হয়ে পড়ি। মুখ দিয়ে কথা সরে না। জাহাঙ্গীরের হাসি মুখখানা অতি পরিচিত হলেও এমন পরিতৃপ্তির ভাব এর আগে কখনো চোখে পড়েনি। তিনি যেন তাঁর প্রিয়তমা বেগমের প্রতিটি ভাব, প্রতিটি আবেগ আর কার্যকলাপের স্বাদ গ্রহণ করে চলেছেন একটু একটু করে। ফুলের শয্যার ওপর বসে গর্বে তাঁর বুক ভরে উঠেছে। বেঁচে থাকতে নূরজাহান হয়তো তাঁর সামনে কোনোদিনই এভাবে নিজেকে নিঃস্ব করে মেলে ধরতে পারেননি। হয়তো দিল্লীশ্বরের মনে চিরদিনই এক অপরাধবোধ ছিল যে মেহেরউন্নেসাকে তিনি জবর-দখল করেছেন পূর্ব-স্বামীর হেফাজত থেকে হীন চক্রান্তের দ্বারা—সেজন্য বেগমকে খুশি রাখতে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না।

নূরজাহানের চোখে জল। আমারও চোখ কেন যেন শুষ্ক থাকে না।

—আজ ওঁর জন্মদিন।

বড় লজ্জিত হই আমি। ভূতপূর্ব বাদশাহের জন্মদিনটি অন্তত পালন করার রীতি থাকা উচিত ছিল দেশে। হয়তো সব দেশেই পালন করা হয়। শুধু অভিশপ্ত মুঘলবংশে এ রীতি চিরতরে বন্ধ।

ভালোভাবে ভাবতে গেলে বাদশাহ জাহাঙ্গীরকেই দায়ী বলে মনে হয়। মসনদ নিয়ে পিতার সঙ্গে বিবাদের এক মারাত্মক সংক্রামক ঐতিহ্যের প্রচলন করে গিয়েছেন তিনি, যা তাঁর পুত্ররাও অনুসরণ করছেন। আমার ভাইদের রক্তের মধ্যেও সেই সর্বনাশা বীজ লুকিয়ে রয়েছে কি না কে বলতে পারে?

—তুমি সঙ্কুচিত হয়ো না জাহানারা। তোমার সঙ্কোচের কোনো কারণ নেই। এ দিনটি আমার ব্যক্তিগত। এ দিনের খবর আর কেউ রাখে না বলে কাউকে দোষ দিই না। দোষ তো ওঁর—যিনি ওখানে বসে মুচকি হাসছেন।

নূরজাহান আঙুল দিয়ে ছবিটি দেখিয়ে দেন।

এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির প্রভাব কাটতে সময় লাগবে জানি। তাই যে জন্যে ছুটে এসেছি এখানে সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে পারি না। বলতে পারি না তাঁকে, রোশনারার মতিগতির কথা। উপদেশ চাইতে পারি না।

বাইরের অলিন্দে গিয়ে দাঁড়াই আমরা। স্তব্ধ দ্বিপ্রহর। উদ্যানে সূর্যকিরণস্নাত গাছপালাগুলি অপরাহ্নের শীতল হাওয়া গায়ে লাগাবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। ফুলের সজীবতাও ম্রিয়মাণ।

—খুশবু পাচ্ছ জাহানারা?

—ফুলের?

—না।

—গোস্ত?

—হুঁ। মতবাখ থেকে ভেসে আসছে।

—গোস্ত! বিস্মিত হই আমি।

—হ্যাঁ! জহাঁগিরী খিচ্‌রী, দো-পেঁয়াজা, হালিম গোস্ত আর আবাজীর। বে-গোস্তও রয়েছে।

—কিন্তু আপনি তো গোস্ত খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন বলে শুনেছি।

—না না, আমার জন্যে নয়। ওঁর জন্মদিনে খাওয়াব। আর সুরাও। বড় ভালোবাসত সুরা। শেষের দিকে খেতে পারত না। হাকিমের কড়া নির্দেশ ছিল। খেলেই পেটে অসহ্য ব্যথা হ'ত। তাই দেখতে পেলেই হাত থেকে ছিনিয়ে নিতাম আমি। এখন সে কথা ভাবলে বড় কষ্ট হয়। তাই মনের সাধ মিটিয়ে সুরা দেব।

নূরজাহান পাগল নন। তাঁর চোখের দৃষ্টি বুদ্ধিতে উজ্জ্বল।

অনেকক্ষণ নীরব থাকি দুজনা। তারপর টুকরো টুকরো কথার আদান-প্রদান হয়। রোশনারার প্রসঙ্গ উত্থাপনের সুযোগ উপস্থিত হয়েছে জেনে ধীরে ধীরে তার দ্রুত পরিবর্তনের কথা নূরজাহানকে খুলে বলি।

শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকেন তিনি। শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন,—এমন হওয়াই তো স্বাভাবিক জাহানারা। কি করতে পার তুমি?

আমি বাধা দেব। বাবাকে বলব। ভাইদের বলব।

—খবরদার। সর্বনাশ হয়ে যাবে।

—আত্মহত্যা করবে তো? করুক।

—না আত্মহত্যা খুব সহজ সমাধান। তার চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে পারে।

—তাই বলে সে হারেমকে কলুষিত করবে?

নূরজাহান হেসে ওঠেন। আমার পিঠের ওপর আলগোছে হাত রেখে বলেন—হারেম আবার পবিত্র হলো কবে থেকে জাহানারা?

আমার সহ্য হয় না। উত্তেজিতভাবে বলে উঠি,—যে হারেমে যোধবাঈ জীবন কাটিয়েছেন, যে

হারেমে তাজবেগম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, পরভেজের কন্যা দারাশুকোর বেগম নাদিরার চপ্পল যে হারেমের পাষাণ স্পর্শ করে—সে হারেমে পবিত্রতার ছোঁয়া লেগেছে বৈকি।

নূরজাহানের মুখখানা মায়ের স্মৃতিসৌধের মতো সাদা হয়ে যায়। তবুও থামতে পারি না। বলে চলি,—হারেমের ছাদের গোপন কোণে বাদশাহের দৃষ্টির অলক্ষ্যে রাজপুত বেগমদের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ ভারতের সব শক্তিটুকু হাতে পেয়েও কি আপনি সরিয়ে ফেলতে পেরেছিলেন? বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময়ে হারেমের অনেক প্রকোষ্ঠেই কোর-আন-এর সুললিত সুর ধ্বনিত হ'ত। একথা ভালোভাবে জেনেও ক্ষমতায় মত্ত আপনার মর্মে গিয়ে পৌঁছায়নি সেদিন। কিন্তু আজ, এই জেসমিন প্রাসাদের অখণ্ড নীরবতার মধ্যেও কেন পৌঁছায় না বুঝে উঠতে পারি না।

ভূতপূর্ব ভারত সম্রাজ্ঞীর চোখের দৃষ্টি বিহ্বল। যে দৃষ্টিতে একসময় অগ্নিবর্ষণ হ'ত, সে দৃষ্টি দু' ফোঁটা জল হয়ে গড়িয়ে পড়ে আমার সামনে। চেয়ে চেয়ে দেখি অথচ নড়তে পারি না।

—তোমার কথায় যথেষ্ট সত্য আছে জাহানারা। তবু আমি স্বীকার করতে পারি না যে হারেমের পবিত্রতা মুহূর্তের জন্যেও কোনোদিন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কালো মেঘের বুকে বিদ্যুতের চমকের মতো হয়তো তা মাঝে মাঝে হারেমকে আলোকিত করেছে।

—আমাকে ক্ষমা করুন বেগমসাহেবা।

—সেকি?

—আপনার প্রতি রূঢ় হয়েছি।

—সত্যি বলে যা বিশ্বাস করো, তার প্রকাশ রূঢ় হলেও অন্যায় হয় না জাহানারা।

—কিন্তু আপনার মর্যাদা রেখে আমি কথা বলতে পারিনি।

—তোমার কথায় আমি আঘাত পেয়েছি। কিন্তু অমর্যাদা করেছ বলে নয়। এভাবে আমার মন বহুদিন নাড়া খায়নি। মনের নিচে অনেকদিন ধরে যে ময়লা জমেছিল ঝাঁকি খেয়ে আজ তা ওপরে ভেসে উঠেছে। এ-ময়লা পরিষ্কার করে ফেলার সুযোগ পাব। তুমি আমার মস্ত উপকার করেছ জাহানারা।

মতবাখ থেকে এখন হাজার পাত্র বাদশাহী খানা এসে পৌঁছবে জাহাঙ্গীরের চিত্রপটের জন্যে, নূরজাহান তখন অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় পাবেন না। আমার উপস্থিতি তখন অবাঞ্ছিত বলে মনে হবে তাঁর কাছে।

তাড়াতাড়ি বলি,—রোশনারাকে তবে তার সর্বনাশা পথেই চলতে দিতে পরামর্শ দিচ্ছেন আপনি?

—না। সে পরামর্শ আমি দিতে পারি না। তবে উপায় নেই কোনো। শুধু সে যাতে মাত্রা না ছাড়ায় কৌশলে তার ব্যবস্থা করতে পার।

—তার সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই। জানেন না সে কোন ধাতুতে গড়া। স্পষ্ট বলে দিয়েছে, 'দশ-পঁচিশী' খেলতে শুরু করবে শিগগিরই।

—'দশ-পঁচিশী'?

—হ্যাঁ। জীবন্ত ক্রীতদাসী নিয়ে আকবরশাহ্ শতরঞ্জ খেলতেন। ঘরটি পড়ে রয়েছে এখন। রোশনারার খেয়াল চেপেছে জীবন্ত পুরুষ নিয়ে সেই 'দশ-পঁচিশী' খেলাঘরকে আবার জীবন্ত করে তুলবে। পুরুষেরা হবে ঘুঁটি।

নূরজাহানের নিভাঁজ কপালে চিন্তার সূক্ষ্মরেখা দেখা যায়। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে তিনি বলেন, —মারাত্মক খেয়াল।

—ভীষণ মারাত্মক। আমি বাধা দেব।

—না। হঠাৎ ওভাবে কিছু করতে যেও না।

—কিন্তু—

—শোনো। 'দশ-পঁচিশী' ঘর তো দেওয়ান-ই-খাসের পথেই পড়ে। আজই গিয়ে সে ঘরখানা সুন্দরভাবে সাজিয়ে ফেল। প্রাসাদের সব ঘরের চেয়ে সে ঘরখানা যেন আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

—কেন বলুন তো?

—কারণ আছে বৈ কি। কাজের চাপে পরিশ্রান্ত হয়ে বাদশাহ্‌কে অনেক কক্ষ পায়ে হেঁটে পার হতে হয় বিশ্রামের জন্য। দেওয়ান-ই-খাসের কাছে অত সুন্দর জায়গাটিতে যদি বিশ্রামের সব রকম উপকরণ থাকে তবে কি তিনি বেশিদূর হাঁটতে চাইবেন!

সপ্রশংস দৃষ্টিতে নূরজাহানের দিকে চেয়ে থাকি।

তিনি স্মিত হেসে বলেন,—আমার ভেতরে কুটিলতার আভাস পেয়ে তোমার বোধহয় ঘৃণা হচ্ছে জাহানারা।

মাথা ঝাঁকিয়ে অস্বীকার করে বলি,—না। নিজের পরিবারকে সব রকম ঝড়ঝাপটা থেকে রক্ষার জন্যে প্রতিটি নারীর এই কুটিল হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃত নারীর ভেতর আল্লা বোধহয় এই বীজটি বপন করে দিয়েছেন।

—সত্যি কথাই তুমি বলেছ। কিন্তু ক্ষমতার লোভে এই কুটিলতা যখন ছড়ায় তখন নারী আর নারী থাকে না, হয়ে পড়ে রাক্ষসী। যেমন আমি হয়েছিলাম।

—নিজের সম্বন্ধে এভাবে বলার অধিকার আপনার নেই। আজ আপনি সব সমালোচনার ঊর্ধ্বে। আজ থেকে অনেক বছর পরে ঐতিহাসিকেরা নিরপেক্ষভাবে বেগম নূরজাহানের সমালোচনা যদি করতে পারেন, আমার ধারণা তখন তাঁরা খুব বেশি দোষের সাক্ষাৎ পাবেন না আপনার চরিত্রের মধ্যে।

কথা ঘুরিয়ে দিয়ে নূরজাহান বলেন,—ওসব থাক। অনেক দেরি হয়ে গেল। তুমি হয়তো আর বেশি সময় পাবে না। 'দশ-পঁচিশী' ঘরের পাশে নর্তকীদের থাকবার আয়োজন করবে।

—আমি এখনই গিয়ে সব বন্দোবস্ত করে ফেলছি। ফল ভালোই হবে মনে হয়। বাবা যদি ঘরখানাকে পছন্দ করেন, তবে রোশনারার জীবন্ত পুতুল নিয়ে শতরঞ্জ খেলা এ-জীবনে আর হয়ে উঠবে না।

জেসমিন প্রাসাদের উদ্যানে এসে উপস্থিত হই। মৃদু হাওয়ায় আমার 'বাদল-কিনারী' ওড়নায় সমুদ্রের ঢেউ খেয়ে যায়।

পেছন ফিরে চেয়ে দেখি ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন নূরজাহান। হাত নেড়ে আমাকে বিদায় দেন।

সন্ধ্যার দরবার শেষ হলে বাদশাহ্ দেওয়ান-ই-খাস হতে বার হয়ে আসেন। আমি পাশের ঝরোকার আড়ালে লুকিয়ে পড়ি। 'দশ-পঁচিশী' ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বাদশাহের মুখভাব কেমন হয় দেখতে হবে। সেখানে নর্তকীরা আমার নির্দেশে আসর জমিয়েছে। ঘরখানির শোভা অপূর্ব দেখতে হয়েছে। একদিন এই অসম্ভব সম্ভব হবে কল্পনা করিনি। ইজ্জৎ খাঁ সত্যিই করিতকর্মা পুরুষ। মাত্র পনেরো জন লোকের সাহায্য নিয়েছিল। হারেম থেকে কিছুটা দূরে বলে রোশনারার কানে ওই ওলটপালটের কথা পৌঁছয়নি এখনো।

ঘরে ঢুকতে সামনেই একটি শ্বেতপাথরের চৌকির ওপর অপূর্ব জিল্লাদার সুরার পাত্র শোভা পাচ্ছে। মায়ের মৃত্যুর পর বাদশাহের স্বাস্থ্য যেভাবে ভেঙে পড়েছিল, আমি অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। অতি সতর্কতার সঙ্গে তাঁর কাছে নিয়মিত সুরাপানের প্রস্তাব উত্থাপন করি।

আমার কথা শুনে প্রথমে বিস্মিত হলেও অনেক ভেবে শেষে গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন,—বেশ।

সেই থেকে তিনি সুরাপান করেন।

নর্তকীদের নূপুরের ঝঙ্কারে আকৃষ্ট হয়ে বাদশাহ যদি পর্দা তুলে ধরেন, তবে প্রথমেই কারুকার্য শোভিত সুরার পাত্র চোখে পড়বে। একটু চোখ ফেরালে শ্রেষ্ঠ নর্তকী গুলরুখ বাঈকে অপূর্ব বেশে সজ্জিত দেখতে পাবেন। তারপরই দেখবেন কক্ষটির শোভা।

নিজের পিতার জন্যে এ-জাতীয় আয়োজনে মন থেকে সাড়া পাওয়া যায় না। তবু আমি নারী। ভারতের সেরা রমণী নূরজাহানের শিক্ষা আমাকে গ্রহণ করতেই হবে। বাদশাহ্‌কে দেখে অবসাদগ্রস্ত বলে মনে হয়। তাঁর মুখে ক্লান্তির ছাপ। তিনি এগিয়ে যেতেই আমি ঝরোকার আড়াল থেকে বার হয়ে তাঁকে অনুসরণ করি।

নর্তকীরা আমার নির্দেশ মতোই কাজ করল। পিতা 'দশ-পঁচিশী' ঘরের কাছাকাছি যেতেই তাদের নূপুরের মিষ্টি আওয়াজ সেখানকার আবহাওয়াকে চঞ্চল করে তুলল। বাদশাহ্ দাঁড়িয়ে পড়েন। চারদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখেন। রীতিমতো অবাক হয়েছেন তিনি। আকবরের মৃত্যুর পর যে-মহল নির্জন পড়ে থাকত, সেখানে হাজার বাতির রোশনাই-এর মধ্যে শিঞ্জের ইঙ্গিত তাঁর বিলাসী মনে সাড়া জাগায়; অবসাদ কেটে যায় তার মুহূর্তে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে 'দশ-পঁচিশী' ঘরের পর্দা তুলে ধরেন। পরক্ষণেই ভেতরে অদৃশ্য হন।

ছুটে গিয়ে আমি পর্দার পাশে দাঁড়াই। উঁকি দিয়ে দেখি সুরার পাত্র হাতে নিয়ে তিনি হাসিমুখে ঘরের প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে দেখছেন। একটু পরেই তাঁর জন্যে নরম শয্যার ওপর উঠে বসে প্রশ্ন করেন,—এখানে এই আয়োজন কেন?

গুলরুখ বাঈ অভিবাদন করে জানায়,—দরবার থেকে বার হয়ে কষ্ট করে অনেকটা পথ আপনাকে যেতে হয় জাঁহাপনা। তাই।

—কার হুকুমে এ সব হয়েছে?

ইতস্ততঃ করে ওরা। সম্ভব হলে আমার নামটা এড়িয়ে যেতে বলেছিলাম ওদের। কিন্তু বাদশাহ উত্তরের প্রত্যাশায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। সে দৃষ্টির পানে চেয়ে নর্তকীরা কাঁপে।

গুলরুখ বলে,—আপনার শরীরের খবর তো শাহজাদী জাহানারা বেগমই শুধু রাখেন। বোধহয় তাঁর হুকুমেই।

—হুঁ। বাদশাহ্ মুখের সামনে সুরার পাত্র তুলে ধরেন। বহু বছর আগে চম্বল হ্রদে তিনি সমস্ত সুরা নিক্ষেপ করেছিলেন। মূল্যবান সুরার পাত্রগুলি ভেঙে টুকরো টুকরো করে গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। সে অনেকদিন আগের কথা।

আমি সরে আসি। একটু পরেই নেশাগ্রস্ত হতে পারেন বাদশাহ। তারপর অনেক কিছুই ঘটতে পারে, কন্যা হয়ে যা আমার পক্ষে দেখা শালীনতাবিরোধী। আমার লজ্জা হয়—ভীষণ লজ্জা। আমার দেহও যে ওই নর্তকীদের দেহের মতোই।

রোশনারা বহুদিন আগেই একবার আমাকে বলেছিল, সে নাকি সব কিছুই দেখেছে। সে সবিস্তারে বর্ণনা শুরু করেছিল। আমার ধমক খেয়ে চুপ করে যায়। শুধু রোশনারা কেন, আমি জানি হারেমের অধিকাংশ নারীই বাদশাহের প্রমোদকক্ষে উঁকি দেবার জন্যে জীবন-পণ করে। তবে তারা পাবে না। কড়া প্রহরা থাকে চারদিকে। সে প্রহরার ফাঁক গলিয়ে কেউ কাছে ঘেঁষতে পারে না। তারা জানে, কেউ কাছে যেতে চেষ্টা করলে খোজারা তাকে নির্বিচারে হত্যা করতে পারে। বাদশাহের কোনো পুত্র হলেও পারে। হুকুম রয়েছে তেমনি। রোশনারার কথা যদি সত্যি হয় মোটারকম 'দিনার' খরচা করতে হয়েছে তাকে।

'দশ-পঁচিশী'র কক্ষে নৃত্য শুরু হয়েছে। সে নৃত্যের শব্দ ভেসে আসে। আমি তাড়াতাড়ি দূরে চলে যাই—যেখানে গেলে নর্তকীদের নৃত্যের তাল আমার মনে কোনোরকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারবে না।

হঠাৎ খেয়াল হয়, কোনোরকম পাহারার ব্যবস্থা করা হয়নি 'দশ-পঁচিশী'র চারদিকে। হারেমে খবরটা রটলে হারেম খালি হয়ে যাবে। আর বাদশাহ্ সে খবর জানতে পারলে আমাকে রেহাই দেবেন না। নিজের কন্যা বলেও নয়।

নিজের কক্ষে ছুটে যাই। পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করে দেখি কোয়েল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

—কি হয়েছে কোয়েল?

ওর ওষ্ঠদ্বয় বারকয়েক কেঁপে কেঁপে থেমে যায়। কাছে গিয়ে ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিই। তবু কথা বলে না সে। শুধু দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

কোয়েলকে আমি বড় একটা কাঁদতে দেখিনি। যদিও সে নারী। বুঝলাম, এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে যা ওকে রীতিমতো আঘাত করেছে। কিন্তু একজন নাজীরের হৃদয়-বেদনার কথা শোনার মতো যথেষ্ট সময় হাতে নেই। পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে এখনি—হারেমের কেউ কিছু না জানার আগেই।

তাই দৃঢ়স্বরে বলি,—তোমার কথা পরে শুনব কোয়েল। এখন শিগগির যাও খোজাদের আড্ডায়। বলে এসো, নর্তকীরা আজ 'দশ-পঁচিশী' ঘরে জমায়েত হয়েছে। বাদশাহ এসেছেন সেখানে। পাহারা বসাক তারা এই মুহূর্তে।

কোয়েলের চোখের জল শুকিয়ে যায় মুহূর্তে। যেটুকু গালে লেগেছিল ওড়না দিয়ে মুছে ফেলে এগিয়ে যায় দরজার দিকে।

—যদি ওরা তোমার কথা না শোনে, বলবে আমার হুকুম।

আর আসবার সময় 'দশ-পঁচিশী'র পাশ দিয়ে এসো। কক্ষের ভেতর উঁকি দেবার চেষ্টা করো না। শুধু দেখো হারেমের কেউ সেখানে ভিড় করেছে কিনা।

কোয়েল ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে চলে যায়।

আমি পায়চারি করি। বাদশাহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতেই কোয়েলের চিন্তা মাথায় এসে ঢোকে। আমার ঘরে বসে কী এমন আঘাত সে পেতে পারে, যার জন্য অত বিচলিত হয়ে পড়েছিল। ভেবে কূলকিনারা পাই না।

তার বোনের পোশাক পরার পর থেকে একটু একটু করে কোয়েলের পরিবারের কথা মোটামুটি জেনে নিয়েছিলাম। বলতে কিছুতেই চায়নি। সহানুভূতি দেখিয়ে, মন ভিজিয়ে জানতে হয়েছে। ওদের কথা শুনলে পৃথিবীকে অন্যরকম বলে মনে হয়। প্রকৃত ভারতবর্ষকে চেনা যায়। কতখানি দরিদ্র ওরা—অথচ মানবিক বৃত্তিগুলির প্রাচুর্য শুধু ওদের মধ্যেই রয়েছে। ওদের পরস্পরের প্রতি স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসার কথা শুনলে অবাক হতে হয়। ভাবি, পৃথিবীতে মানুষ মানুষকে এতখানি ভালোও বাসতে পারে কোনোরকম স্বার্থ ছাড়া। মনে হয়, কোনো সাধারণ ভারতবাসী যদি তার ঘর থেকে বার হয়ে এক-পা এক-পা করে বাদশাহী মহলের দিকে অগ্রসর হয়, তবে তার মনের প্রকৃত গুণগুলি প্রতি পদক্ষেপে একটি একটি করে ঝরে পড়তে থাকবে। মসনদের পাশে এসে যখন সে পৌঁছবে তখন তার হৃদয় হবে ঠিক আমার মতো, রোশনারার মতো, আওরঙজেবের মতো—। হৃদয়ে তখন শুধু স্বার্থের পোকাগুলো কিলবিল করবে।

আপনা হতেই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

কোয়েলের স্থান কেন যেন আজ হারেমে, তার কারণ আমি জেনেছি। আর জানেন বাদশাহ্ নিজে। কিন্তু তিনি কখনো ওর সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনা করেননি। এই সামান্য ব্যাপারে সময় নষ্ট করা শাহানশাহের শোভা পায় না। তবু যদি তিনি কোয়েলকে আমার কাছে প্রথম পাঠানোর সময় তার সম্বন্ধে অল্প কিছু বলে দিতেন, তবে আজ পিতা হিসাবে আমার কাছ থেকে আরও বেশি শ্রদ্ধা পেতে পারতেন।

বাইরে কর্তব্যরত খোজার সচকিত কুর্নিশের আওয়াজ কানে ভেসে আসে। দ্রুত পদশব্দও শুনি সেই সঙ্গে। হয়তো কোনো শাহ্জাদী চলে যাচ্ছেন এ-পথ দিয়ে।

কিন্তু পরক্ষণেই কক্ষের ভারী পর্দা দুলে ওঠে। কোয়েল ফিরে এলো? সে এলে খোজা কুর্নিশ

করবে কেন?

রোশনারা!

পর্দার পটভূমিকায় উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে রোশনারা। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে সে আমার দিকে ক্ষুধিত বাঘিনীর মতো। চোখেমুখে তার নিদারুণ ঘৃণা।

—দাঁড়ালি কেন? এগিয়ে আয়। কাজ শেষ করে পেছনের দরজা দিয়ে চলে যা কেউ নেই ওদিকে।

রোশনারা সত্যিই এগিয়ে আসে।

কিন্তু বাইরের খোজাটা দেখে ফেলেছে। তাকে আগে শেষ করে আয়। সাক্ষী রাখিস না বোন!

—বিশ্বাসঘাতক।

—বাঃ, গালভরা কথা বলছিস দেখছি।

—আজ তোর জন্যে শুধু ঘৃণাই তোলা রইল আমার এই বুকে। রোশনারা তার সুপুষ্ট বুকের ওপর বাঁ হাতে সজোরে আঘাত করে।

—আহা! অত জোরে নয়। অমন সুন্দর বুকের গড়ন নষ্ট হয়ে যাবে যে। ফিরেও তাকাবে না তোর 'দশ-পঁচিশী'র জীবন্ত ঘুঁটিগুলি।

—ছিঃ ছিঃ। মায়ের পেটের বোনই বটে।

রোশনারার মুখের দিকে চেয়ে আমার হাসি পায়। এত আয়োজন সব ব্যর্থ হয়ে গেল। সব মাটি!

—তলোয়ারটা শুধু শুধু খাপ থেকে টেনে বার করলি?

—না।

—না? তাই নাকি? তবে দাঁড়িয়ে কেন?

—তোকে নয়। তোর এই নাজীরকে। মৃত্যুকে যে ভয় পায় না। তলোয়ার দেখলে হাসে। কত বড় স্পর্ধা!

—ও। তবে তুই-ই এসেছিলি আর একবার?

—হ্যাঁ।

ঘরে ঢোকার সময় কোয়েলকে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। আসল ঘটনা জানতে আগ্রহ হয়।

—তাকে মারতে চেয়েছিলি?

—হ্যাঁ। শুনে সে হাসল। হাঁটু ভেঙে বসে বুক পেতে দিয়ে বললে, শাহ্‌জাদীকে মারবেন না তো?

—বড় বোকা তো।

—তখন তাকে শেষ করে দিলেই ভাল হ'ত। আবার ছুটে আসতে হ'ত না। নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে যতই ভাবলাম, ততই মাথাটা গরম হয়ে উঠল। আবার এলাম তাই। সামান্য নাজীরকে তুই মাথায় তুলে দিয়েছিস।

—মাথায় না তুললে কি আমার হয়ে নিজের বুক পেতে দিত?

—সে বুকে পদাঘাত করেছি।

—কী? ক্রোধে আমার মাথার মধ্যে ঝাঁঝাঁ করে ওঠে। মরুভূমির উত্তপ্ত বালুরাশির মতো গরম হয়ে ওঠে আমার সর্বাঙ্গ। সম্মুখে দণ্ডায়মান নিজের বোনকে দেখে মনে হয় সাক্ষাৎ শয়তানি। কোমরের কাছে গুপ্ত ছোরার বাঁটে আমার ডানহাতখানা আপনা হতে গিয়ে স্পর্শ করে। জানি, তড়িৎগতিতে রোশনারার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে তাব তলোয়ার তাকে রক্ষা করতে পারবে না। সাধারণভাবে অস্ত্র চালনার ক্ষমতা ছাড়া বিশেষ কোনো পারদর্শিতা তার নেই।

তবু—তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। সাময়িক উন্মত্ততা অনেক কিছু অঘটন ঘটিয়ে দেয়, পরে যার জন্যে আফশোষের সীমা থাকে না। আকবরশাহ্ যে জন্যে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দিয়ে, সে দণ্ডাজ্ঞা একদিনের

জন্যে মুলতবী রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় দিনের আজ্ঞাই ছিল চূড়ান্ত।

মাথার রক্ত ধীরে ধীরে নেমে যায়। দপ্‌দপে শিরা-উপশিরা স্তিমিত হয়ে আসে। রোশনারার মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে দেখি আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করে সে যেন একটু অপ্রস্তুত।

—কোয়েলকে তুই চরম আঘাত দিয়েছিল রোশনারা। তলোয়ারের আঘাতে তার কোটিভাগের একভাগও হ'ত না।

চুপ করে থাকে রোশনারা।

—কোয়েল রাজপুত রমণী। মৃত্যুর ভয় দেখাস ওকে? ভয় ওর অপমানে। সেই অপমান তার বুকে এঁকে দিয়েছিস তুই।

—নাজীরের আবার অপমান।

—নাজীর? হ্যাঁ সেই রকমই দাঁড়িয়েছে বটে! কিন্তু আজকের এই ঘটনার জন্যে বাদশাহ্ সাজাহানকে আল্লার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

—তার মানে?

তোর কাছে প্রকাশ করা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছি না। তবু বলব তোকে। কারণ এরপরে কোয়েলকে অপমান করার আগে অন্তত একবার ভেবে দেখবি।

আমি দরওয়াজার দিকে যাই, পর্দা তুলে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখে নিই। কোয়েল নেই। ফিরে আসি। রোশনারার মুখোমুখি দাঁড়াই।

—আজ তুই শাহজাদী রোশনারা। ভারতঈশ্বর সাজাহানের কন্যা। কিন্তু আজ তুই নাও থাকতে পারিস। এ দেশের সিংহাসনে হয়তো অন্য কেউ বসত। আর এই হারেমে তোর বদলে অন্য কেউ ঘোরাফেরা করত।

—কেন? রোশনারার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়।

—কোয়েল নাজীর। সে তোর পদাঘাত বুক পেতে নেয়। কিন্তু তার বাবার বুকের রক্ত আর তলোয়ার আজ থেকে বহু বছর আগে বাদশাহের প্রাণ বাঁচিয়েছিল। শত্রুর বর্শা যখন বাদশাহের বুকের পাঁজর ভেদ করতে উদ্যত, ঠিক সেই মুহূর্তে কোয়েলের বাবা চকিতে ছুটে এসে সেই শত্রুর ডান হাত খণ্ডিত করেন। বাদশাহ্ রক্ষা পান, কিন্তু তাঁর রক্ষাকর্তা বাঁচেননি সে যুদ্ধে। বৃদ্ধা মা, বিধবা স্ত্রী আর দুই কন্যাকে অকূলে ভাসিয়ে তিনি চিরবিদায় নেন পৃথিবী থেকে। তাই কোয়েল আজ নাজীর। তাই আজ তোর পদাঘাত তাকে মুখ বুজে বুক পেতে নিতে হয়।

রোশনারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শেষে ধীরে ধীরে আমার কক্ষ থেকে বাইরে চলে যায়। হয়তো সে ভাবে বাদশাহের প্রাণরক্ষা করাই সৈন্যদের কর্তব্য। তার জন্যে মৃত্যু হলে ক্ষতি কি?

দূরে যমুনার কূলে মায়ের স্মৃতিসোধ শেষ সূর্যের আলোয় এক বিন্দু রক্তের মতো টলমল করছে। বাবা কৌশলে ভাইদের আলাদা করে রেখেছেন। দারাশুকো শুধু রয়েছে রাজধানীতে। তবু যেন মনে হয়, ভেতরে প্রবল চক্রান্ত চলেছে এক অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে। পৃথিবীর অভ্যন্তরের প্রচণ্ড আলোড়নের মতো সে চক্রান্ত মাঝে মাঝে অগ্ন্যুৎপাতের সৃষ্টি করে সচকিত করে দেয়। বাদশাহ্ স্থির হয়ে থাকেন। তিনি যেন জানেন, ভবিষ্যতের ললাটে কি লেখা রয়েছে। কিন্তু আমার ভয় হয়। তার চেয়ে হয় দুঃখ। এক অন্তহীন বিমর্ষতা আমাকে আচ্ছন্ন করে। সে বীমর্ষতা প্রাণহীন।

মায়ের স্মৃতিসৌধের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। তাজমহল। বাদশাহের স্বপ্নের তাজমহল তার স্বপ্নকে ছাড়িয়ে গিয়েছে শিল্পীর কল্পনায়। তাজমহলকে ঘিরে যে গুলিস্থান তাতে ইতিমধ্যেই নানান ফুলের শোভা। সৌধের কাজ শেষ হবার আগেই ফুলের গাছ এনে বপন করার ব্যবস্থা হয়েছিল। শুধু বড় বড় গাছের চারা এখনো আকাশের দিকে বেশিদূর উঠতে পারেনি।

দু'দিন আগে আনুষ্ঠানিকভাবে তাজমহলের উদ্বোধন করে এলেন বাবা। সঙ্গে ছিলাম আমি আর রোশনারা। দেশের বড় বড় মৌলবীরা এসে জমা হয়েছিলেন তাজবিবির সমাধির পাশে। তাঁদের অধিকাংশের চোখেই লক্ষ্য করেছি লোভাতুর উজ্জ্বলতা। তাঁরা জানতেন, তাজমহলের ভার ছেড়ে দেওয়া হবে তাঁদেরই মধ্যে একজনকে বেছে নিয়ে—যিনি মমতাজের সমাধির পাশে প্রতিদিন কোর-আনের পুণ্য বাণী শোনাবেন—যিনি প্রতি জুম্মাবারে সমাধি স্বর্ণখচিত বস্ত্র দ্বারা আবৃত করে দেবেন। তাজমহলেরই যে কোনো মিনারের এক প্রকোষ্ঠে বসে তিনি সারা দিনরাত নিশ্চিন্তে আল্লার আরাধনা করতে পারবেন। মৌলবীর কাছে এর চাইতে অধিক ইপ্সিত পদ আর কি থাকতে পারে? বাদশাহের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে স্বচ্ছন্দে পৃথিবীর সুন্দরতম ইমারতে জীবন কাটিয়ে দেবার সৌভাগ্য সারা দেশে একজনের ভাগ্যেই হওয়া সম্ভব।

অনুষ্ঠানকালে বাদশাহের দৃষ্টি প্রতিটি মৌলবীর মুখে মুখে ঘুরে শেষে আমাদের ঝরোকার ওপর এসে থেমে যায়। ঝরোকার পেছনে আমার সঙ্গে ছিল রোশনারা। বাবা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে মৃদুস্বরে ডাকেন। —জাহানারা!

—কি বাবা?

—পছন্দ করতে পারছি না। তুমি করেছ কি?

—হ্যাঁ।

—কাকে?

—সত্যিই কি আপনি পছন্দ করতে পারেননি?

—না।

—কোনো বৈশিষ্ট্যই কি কারও মধ্যে দেখতে পাননি?

—না। আজ আমি বিচারের ক্ষমতা হারিয়েছি। কেন যেন আমি বড় বেশি উত্তেজিত। বাদশাহের উত্তেজনার কারণ রয়েছে। মায়ের প্রতি তাঁর মনোভাব অজানা নয়।

—কাকে পছন্দ করলে জাহানারা?

—এঁদের মধ্যে যিনি শুধু আপনার নির্দেশ পালন করতেই এসেছেন অন্যদের সঙ্গে। গ্রামের ভগ্ন মসজিদ আর তাজমহলের অভূতপূর্ব সৌন্দর্যের মধ্যে যিনি কোনো তফাৎ বুঝতে পারেননি। যাঁর মন আর চোখ আরও উঁচুতে—ধূলিময় পৃথিবীর সব কিছু ছাড়িয়ে বহুদূরে।

—কে তিনি? বাদশাহের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়।

—ওঁদের মধ্যে সবচেয়ে শেষে যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন জড়োসড়ো, তাজমহলের মণিমাণিক্যের দিকে যাঁর দৃষ্টি নেই। বাদশাহের দিকেও নয়।

বাদশাহ দ্রুত এগিয়ে যান।

রোশনারার মুখে বিদ্রুপের হাসি। আমার কথায় পিতা গুরুত্ব দিলেন বলে হয়তো। কিংবা মৃতা মায়ের জন্যে এতদিন পরে এত বেশি মাথাব্যথা সে বরদাস্ত করতে পারছে না বোধহয়। সে জানে না তাজবিবি কী ছিলেন। জানে না বল্‌গাছাড়া বিলাসিতার মধ্যেও তাঁর প্রধান মহিষীকে বাদশাহ মুহূর্তের তরেও ভুলতে পারেননি। পরে সেদিনের অনুষ্ঠান শেষে বাদশাহ পরিতৃপ্তি নিয়ে ফিরে এসেছিলেন। বার বার সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন আমার দিকে। সঙ্কুচিত হয়েছিলাম আমি।

মৌলবী নির্বাচনে আমি খুশি হয়েছি। জানি, আমার মায়ের কানে যাঁর মুখনিঃসৃত কোর-আনের বাণী ঝঙ্কৃত হবে। তাঁর হৃদয়কে অর্থের লোলুপতা বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারবে না কোনোদিনও। তাজমহলের শ্বেতপাথরের মূল্য তাঁর কাছে আরাবল্লীর প্রস্তরের চেয়ে বেশি নয়। উজ্জ্বল্য মণিমাণিক্য তাঁর কাছে স্তব্ধ রজনীর গ্রহ-তারা-নক্ষত্র খচিত আকাশের তুলনায় তুচ্ছ।

তবু হঠাৎ আজ অস্তগামী সূর্যস্নাত তাজমহলকে একবিন্দু রক্তের মতো মনে হয় কেন? মা কি তবে

কাঁদছেন? তাঁরই সন্তানদের ভবিষ্যৎ কল্পনা করে কি তাঁর হৃদয় আজ রক্তাক্ত? কিন্তু কেন হবে? জাহাঙ্গীরে যে রক্তস্রোতের শুরু সাজাহানেই তো তা শেষ হয়ে যেতে পারে। তার জের কেন চলবে আরও?

মাথাটাকে ভালভাবে ঝাঁকিয়ে নিই, উদ্ভট চিন্তা করতে করতে আমারই মাথা খারাপ হয়েছে। দর্শন না ছাই। নূরজাহান শুধু শুধু আমার প্রশংসা করে আমাকে ফাঁপিয়ে দিয়েছেন—যার ফলে তাজমহলের স্বর্গীয় রূপকে উপভোগ করার নয়নও আমার নষ্ট হতে বসেছে। আমার জায়গায়, এই বাতায়নের পাশে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর যে কোনো নারী এসে যদি আজ তাজমহলের শোভা অবলোকন করত, তবে সে নিশ্চয়ই বিস্ময়াবিষ্ট হ'ত। তাজমহল তার কাছে প্রতিভাত হ'ত সমুদ্রের গভীরতা থেকে অতি কষ্টে সঞ্চয় করে আনা একটি মহামূল্য প্রবালের মতো। অথচ—

—শাহজাদী।

—কেন কোয়েল?

—কাল দেওয়ান-ই-খাসের ঝরোকায় আপনাকে যেতে হবে। দরবার বসার সাথে সাথেই।

—কেন? কোয়েলের কথা শুনে অবাক হই। দরবারে কখন যেতে হবে সে নির্দেশ আসে বাদশাহের কাছ থেকে। চিত্তাকর্ষক কিছু থাকলে বাদশাহ্ নিজেই ডেকে আমাদের দু' বোনকে বলে দেন। কিন্তু আজ কিছুই তো বলেননি।

—কাল শিল্পী আসবে দরবারে। কোয়েলের মুখে স্বচ্ছ হাসি ফুটে ওঠে।

—শিল্পী?

—হ্যাঁ। তাজমহলের শিল্পী। ইসা-মামুদের সহকারী। বাদশাহ পুরস্কৃত করবেন তাকে।

—আমি তো জানি না। তোমাকে কে বললে?

কোয়েলের মুখ সহসা রাঙা হয়ে ওঠে। কক্ষের অপসৃয়মান আলোতেও সে রঙ ধরা পড়ে। সে চুপ করে থাকে।

—চুপ করলে কেন?

থতমত খেয়ে কোয়েল বলে, -সে বলেছে।

—সে? মানে, শিল্পী নিজে?

কোয়েল মাথা নিচু করে থাকে। এতক্ষণে তার মন আমার কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ছুটে গিয়ে তার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠি,—কোয়েল।

ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ে তার দু'চোখ বেয়ে। আমি স্তম্ভিত হয়ে তার কান্নার দিকে চেয়ে থাকি।

কতক্ষণ কেটে যায় খেয়াল থাকে না। শেষে কোয়েল চোখের জল মুছে ফেলে। আমার পানে চেয়ে বলে,—শাহজাদী, হাত বাড়িয়ে সে কি চাঁদ ধরতে পারত? পারত না। চাঁদও কি অত নিচে নামতে পারত? তাই বোধহয় আমার মনে স্পর্ধা জেগেছিল। কিন্তু লাভ হয়নি কিছু। সে এখনো চাঁদের স্বপ্নই দেখে। সে যে শিল্পী।

আমার বুকের ভেতরে কেঁপে ওঠে। ভয়ে? হ্যাঁ ভয়ে। কোয়েলের কথা শুনে যে তীব্র আনন্দে আমি অভিভূত, সেই আনন্দের চিহ্ন আমার চোখে-মুখে ফুটে ওঠার ভয়। ধরা পড়ে যাব কোয়েলের কাছে—যেমন সে ধরা পড়েছে আমার কাছে।

কিন্তু বলতে গেলেই কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠবে। তাই সময় নিয়ে নির্বিকারভাবে বলি,—কতদিনের ঘনিষ্ঠতা তোমার সঙ্গে কোয়েল?

—সেদিনের পর থেকেই। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা তো নয়। একা একা কাজ করে সে তার ঘরে বসে। আমি আপনার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে একটু সাহায্য করে আসি। সেবা করার আনন্দ পাই।

—কোয়েল?

—শাহজাদী।

—কী লাভ?

—জানি না।

—তবে?

—শুধু আনন্দ।

—এ আনন্দ চিরস্থায়ী হবে?

—না, সে আমার দিকে ফিরেও চায়নি প্রথমে।

—এখন?

চায়। তবে আমার জন্যে আমার দিকে তাকায় না। তাকে প্রলোভন দেখিয়েছি। তাই আজকাল যখন যাই, ব্যগ্র চোখে চেয়ে থাকে। আমার দিকে নয়—আমার পেছনে।

—কেন?

—যার মূর্তি তৈরির জন্যে পাথর কেটে প্রস্তুত করছে সে, তাকে শুধু আর একবার নয়ন ভরে দেখবে বলে। আমি কথা দিয়েছিলাম দেখাব।

আমার মুখের রঙের পরিবর্তন হয়েছে বুঝতে পারি, তবু কিছু করতে পারি না। শুধু মুখখানা ঘুরিয়ে গবাক্ষপথে প্রায়ান্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে থাকি। সূর্য ডুবে গিয়েছে অনেকক্ষণ।

—শাহজাদী। আমি জানি, আমি অন্যায় করেছি। এইভাবে সরল শিল্পীকে প্রলোভিত করাতে আমার অন্তরের হীনতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু পারলাম না—কিছুতেই পারলাম না।

আস্তে আস্তে বলি,—আমি হলেও হয়তো পারতাম না কোয়েল।

আমার কথায় কোয়েলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিনা দেখার চেষ্টা করি না। তবে তাকে বলতে শুনি—কিন্তু আপনাকে না দেখাতে পারলে যে সে আমায় ঘৃণা করবে।

—যখন তুমি বুঝবে সে ঘৃণা করতে শুরু করেছে, আমাকে বলো।

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনি। নিষ্কৃতির নিঃশ্বাস।

চাপা নূপুরের ধ্বনি কানে ভেসে আসে। 'দশ-পঁচিশী'তে নাচের আসর বসেছে। বাদশাহ্ নিশ্চয় উপস্থিত হয়েছেন সেখানে। নূরজাহান দীর্ঘায়ু হোন।

হঠাৎ খেয়াল হয়, আসল প্রশ্নই করা হয়নি কোয়েলকে। বলি,—শিল্পী তো প্রাপ্য পেয়েছেন। তবে কেন আবার বাদশাহ পুরস্কৃত করবেন তাঁকে।

—শিল্পীও অবাক হয়েছে তাই।

অবাক আমিও কম হই না। শিল্পীকে তার যে প্রাপ্য দেওয়া—সে অঙ্ক সামান্য নয়। এরপরেও আবার বিশেষভাবে পুরস্কৃত করার চিন্তা কেন যে করছেন বাদশাহ বুঝি না। হয়তো তাজমহলের সৌন্দর্য দেখে বারবার মুগ্ধ হয়ে তাঁর ধারণা জন্মেছে শিল্পী যোগ্য পুরস্কার পায়নি। কিংবা আমি একটি পাষাণ-ফলকে ইসা-মামুদের নামের নিচে শিল্পীর নাম খোদিত করে তাজমহলের কোনো প্রাচীরের গায়ে প্রোথিত করার যে প্রস্তাব করেছিলাম সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাঁর অনুশোচনা হয়েছে। তাই শিল্পীর দু' হাত স্বর্ণমুদ্রায় ভরিয়ে দিয়ে অমরত্বের দাবি থেকে কৌশলে সরিয়ে দিতে চান।

অভিমান হয়। বাদশাহ যখন সব কিছু গোপন রেখেছেন আমার কাছে, আমিই বা কেন নিজে থেকে তাঁর কাছে আবদার করব? কাল দেওয়ান-ই-খাসে যাবার কথা তো একবারও বলেননি তিনি। অথচ সামান্য কোনো কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটলেই তিনি আমাকে দরবারে ঝরোকায় হাজির থাকতে বলেন।

কথায় কথায় আমার চোখ ফেটে জল গড়ায় না। নইলে হয়তো কাঁদতে বসতাম। ভারাক্রান্ত মনকে

হালকা করার জন্যে ছটফট করতে থাকি। শেষে নাদিরা বেগমের কথা মনে হয়। দারাশুকো আগ্রায় অনুপস্থিত দু'দিন থেকে। নাদিরা একা রয়েছে। খুবই নম্র স্বভাবের মেয়েটি। বড় ভালো লাগে। যখন তার শাদি হয় তখন উপহার হিসাবে প্রাপ্ত সামগ্রীর প্রদর্শনীর ভার আমার ওপর ছিল। আমীর-ওমরাহ্ সে সব জিনিস দেখে চোখের পাতা ফেলতে পারেননি। নাদিরা দারার যোগ্য বেগমই বটে, বরং দারার চেয়ে তার গুণ বেশিই বলব। সব গুণ থকা সত্ত্বেও দারা জেদী—একটু অলসও যেন। কিন্তু নাদিরা অতুলনীয়া।

ঘর থেকে বার হয়ে তার কক্ষের দিকে রওনা হই। কোয়েল আমাকে অনুসরণ করছিল। ইঙ্গিতে মানা করে দিই। সুন্দরী নাদিরা যেদিন হারেমে আসে সেদিন সব আনন্দের মধ্যে একটা আঘাত আমার হৃদয়কে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা দিয়েছিল। সেদিন আবার উপলব্ধি করেছিলাম আমার নিজের জীবনের নিদারুণ ব্যর্থতা। বাদশাহ বিবাহের সব কিছু ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে হয়তো ভেবেছিলেন, উৎসবের আনন্দ কোলাহলের মধ্যে নিজেব সম্বন্ধে ভাববার অবসর পাব না। ভুল ভেবেছিলেন তিনি। নাদিরার হাত ধরে তার নিজের কক্ষে পৌঁছে দিয়ে সবার অলক্ষ্যে রোশনারার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। অমন আনন্দের দিনে সে ছাড়া আমার সমব্যথী কেউ ছিল না পৃথিবীতে।

প্রাসাদে সেদিন কোটি কোটি চিরাগদানির উজ্জ্বল আলো। অথচ রোশনারার ঘর প্রায়ান্ধকার। তবু সেই ক্ষীণ আলোয় রোশনারার হাতের ছুরিকা ঝলসে ওঠে। আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। চেয়ে দেখি সে পাগলের মতো তার শয্যায় তাকিয়ার ওপর ক্রমাগত ছোরা বসিয়ে চলেছে।

—তাকিয়াটি বাদশাহ আকবরের নির্দেশ নয় রোশনারা। ওকে ফাঁসিয়ে লাভ নেই। চমকে থেমে যায় সে। পরিশ্রমে তার মুখে আর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিল। গম্ভীর হয়ে বলেছিল,—ধার পরীক্ষা করছি। নিজের বুকে চালাবো।

একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তার বাঁ-হাত নিজের হাতে তুলে দিয়ে বলি,—এই যে হীরের আংটি, এটিই তো যথেষ্ট।

—না।

—কেন?

—বুকের রক্ত চাপ চাপ হয়ে জমে থাকবে পাষাণের ওপর। বাদশাহ আসবেন. এসে দেখবেন, শাহজাদীদেরও দেহে রক্ত আছে। কত অফুরন্ত রক্ত। নাদিরা আর মমতাজের চেয়ে বেশিই। আরও উষ্ণ।

—ছিঃ। রোশনারা।

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সে। আমার বুকে মুখ রেখে সমানে কেঁদে চলে। নিজের শরীরের জ্বালা অন্তর্হিত হয়। তাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে মরি। পাই না। ভাবি, ভবিষ্যতে রোশনারা যত অন্যায়ই করুক সব কিছুর মূল কারণ একটি। তার কত অন্যায় অসহ্য বোধ হবে। কত অন্যায় অমঙ্গল ডেকে আনবে—মুখে সমালোচনা করব। অথচ মনে মনে তাকে ক্ষমা না করে পারব না।

বাঁধ ভাঙা পুরোনো চিন্তাস্রোতের মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে একসময় খেয়াল হয় নাদিরার ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছি।

গভীর মনোযোগ সহকারে নাদিরা কি যেন দেখছিল। আমার উপস্থিতি প্রথমটা খেয়াল করেনি। দেখতে পেয়ে ছুটে আসে সে। একটু অপ্রস্তুত।

হেসে বলে,—এই দ্বিতীয়বার।

—গুণে দেখ এই দু'দিনই দারাশুকো আগ্রা ছেড়েছে সম্ভবত।

লজ্জায় নাদিরা অধোবদন হয়। তার এই লজ্জা, মেয়ে হয়েও আমার ভাল লাগে।

শেষে বলে,—মিথ্যে কথা বলেননি আপনি। আমি বুঝিয়ে পারি না। ও যেন দিন দিন ভুলে যাচ্ছে

বাদশাহের বড় ছেলে ও। বড় বেশি ভাবুক হয়ে পড়েছে। ফলে ভাবুকের আলস্যও পেয়ে বসেছে ওকে।

—কি দেখছিলে অত মন দিয়ে?

—তসবীর।

—তসবীর? তুমি না মুঘল বংশের বেগম? তুমি না মুসলমান?

নাদিরার মুখ পাংশু হয়ে যায়। সে অসহায়ভাবে চেয়ে থাকে। আমার ধমকের অন্তরালে তারল্যের রেশ সে বুঝতে পারে না। হেসে ফেলি আমি। তবু সে হাসতে পারে না। একইভাবে চেয়ে থাকে। তার চিবুক ধরে নাড়া দিই।

—দারাশুকোর বেগম ঠাট্টাও বোঝে না।

—আমার অন্যায় হয়েছে।

—কিছু হয়নি। কই দেখি কার তসবীর?

নাদিরা ভয়ে ভয়ে সুন্দর কয়েকটি ছবি তুলে এনে দেখায়।

—বেশ হাত তো? কে এঁকেছে?

—দারা।

—কি বললে?

—সত্যি।

অবাক হই আমার ভাইটির প্রতিভা দেখে। এই সব সূক্ষ্ম কাজের প্রতিভা দেখে। আবার ভয়ও হয়। এ জাতীয় পুরুষ সার্থক বাদশাহ হতে পারে না। দারা অবশ্য বীর—দক্ষ যোদ্ধা সে। তবু প্রতিভা তাকে কোন্ পথে টেনে নিয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত কে বলতে পারে। যদি এদিকেই মন দেয়, আমার দুঃখ থাকবে না। কিন্তু মসনদের প্রলোভন আর প্রতিভার চাহিদা যদি তার চিত্তকে ক্ষতবিক্ষত করে তবে তার ভবিষ্যৎ বড়ই দুঃখের।

—দারাকে ঠিক পথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করবে নাদিরা।

—কোনটা ঠিক পথ?

—জানি না। নির্বাচনের ভার তোমার।

নাদিরা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। কি বুঝল সেই জানে।

পরদিন শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দরবারে যাবার মুখে বাদশাহের সামনে না দাঁড়িয়ে পারি না। সারারাত ছটফট্ করেছি। কৌতূহল একদণ্ড আমাকে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দেয়নি। শিল্পীকে পুরস্কার দেবার আড়ালে প্রচ্ছন্ন কোনো ইনসাফের ব্যবস্থা হয়েছে কিনা কে বলতে পারে? দরবারের কার্যরীতি বড়ই বিচিত্র। বাদশাহের কন্যা হয়েও এক একটি ঘটনা আমাকে চমকিত করেছে। বাদশাহও চমকিত হয়েছেন হয়তো। কারণ অনেক বিচারের গতি বাদশাহের অনিচ্ছায় আমীর-ওমরাহের প্রভাবে পড়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ নেয়। রাজনীতিতে প্রভাবশালী পুরুষদের কথা বাধ্য হয়েই মানতে হয় অনেক সময়। শুনেছি, আকবর বাদশাহ কারও কথা শুনতেন না। কথাটির মধ্যে সত্য থাকলেও, সবটুকু নয়। পদে পদে যুদ্ধের আশঙ্কাকে কোনো বাদশাহই মেনে নিতে চান না। যুদ্ধ ভালবাসলেও যুদ্ধের নেশা আকবরের ছিল না। যুদ্ধের নেশা যাদের থাকে দেশকে গড়তে পারে না তারা।

বাদশাহ সাজাহান আমাকে সামনে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন। মুখের দিকে তাকান। তাঁর এক এক সময়ের দৃষ্টি আমাকে বড় বেশি লজ্জা দেয়। সে দৃষ্টি আমি ঠিক চিনতে পারি না। হঠাৎ আমার দিকে চাইলেই অমন দেখা যায়। এতে তিনিও কম অপ্রস্তুত হন না।

—কি খবর জাহানারা?

—আজ দরবারে বিশেষ কিছু আছে কি?

—না।

অভিমানের সময় নেই। আমাকেও গিয়ে দাঁড়াতে হবে ঝরোকার পেছনে।

—তাজমহলের সেই শিল্পী নাকি আসবে?

—ও। হ্যাঁ। আমার হিতৈষীরা বলছিলেন তাকে আরও কিছু টাকা দেওয়া দরকার।

—কেন?

—তাঁরা চান না শিল্পী তার জীবনে দ্বিতীয় কোনো তাজমহল তৈরি করুক।

—সে কি? তার মানে?

—তাজমহলই যেন তার শেষ সৃষ্টি হয়।

ক্রোধে আমার গা কাঁপতে থাকে। আমীর ওমরাহেরা যা বলে বলুক। কিন্তু বাদশাহের এই অবহেলা অসহ্য। মানুষটির কাজকে প্রশংসা করেও মানুষকে সম্মান জানাতে পারলেন না।

উত্তেজিত হই। খুবই উত্তেজিত হই। বলি,—শাহনশাহ সাজাহান ছাড়া তাজমহল তৈরির অর্থ যোগানো আর কারও পক্ষে কি সম্ভব? শিল্পী কোথায় পাবে সেই অর্থ, যার ফলে দ্বিতীয় একটি তাজমহলের গম্বুজ দিগন্তের রেখায় শোভা পাবে।

—আমি সে-কথা বলেছিলাম। ওঁরা বলেন, মসনদ একটি জল-বুদবুদ। যে কোনো মুহূর্তে ফেটে গিয়ে তলিয়ে দিতে পারে। নতুন বুদবুদের ওপর নতুন লোক এসে ওই শিল্পীকে ডেকে এনে আরও বিস্ময়কর কিছু তৈরি করতে পারে।

বুঝলাম অমরত্বের মোহে অন্ধ হয়েছেন বাদশাহ। প্রথমে উদ্দেশ্য ছিল নিজের প্রিয়তমা বেগমকে অমর করা, এখন সেই সঙ্গে নিজেকেও জড়িয়ে ফেলেছেন। মুক্তির পথ তিনি খুঁজে পাবেন না। তবু শেষ চেষ্টা হিসাবে আমার বক্তব্য বাদশাহের কানে ছুঁড়ে দিই,—তেমন অঘটন যদি ঘটে তবে টাকা নিয়ে শিল্পী যে কথা দিয়ে যাবে সে কথা পালন করতে বাধ্য থাকবে কি?

বাদশাহ জবাব খুঁজে পান না। তাঁর ললাটে চিন্তার রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শেষে তাড়াতাড়ি শেষ অস্ত্র ছাড়েন,—এটা রাজনীতি জাহানারা। অনেক সময় নিজেকে অন্যের ইচ্ছায় সমর্থন না করলে রাজকার্যে জটিলতা দেখা দেয়। একজন শিল্পীর ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে গিয়ে সে জটিলতা নাইবা সৃষ্টি করলাম।

বাদশাহ চলে যান।

রাগে ক্ষোভে চোখের জল ফেলতে ফেলতে আমি ঝরোকার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই। দেখতে হবে। আগাগোড়া সব কিছু দেখতে হবে। জানতে হবে বাদশাহের প্রকৃত মনোভাব।

একটু পরে কোয়েলও এসে আমার পেছনে দাঁড়ায়। তার মুখে কিছু কিছু স্বেদ; কোয়েল ঠিক সাধারণ বুদ্ধির মেয়ে নয়। সেও বুঝতে পেরেছে শিল্পীকে প্রচুর এনাম দেবার পেছনে রয়েছে কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য। তাই তার মুখে চাপা আনন্দের রক্তিমাভার পরিবর্তে অনিশ্চয়তার বিন্দু বিন্দু ঘাম।

দরবারে প্রতিদিনের ওমরাহের দল রয়েছে। নতুন লোকের মধ্যে দেখলাম তাজমহলের ভারপ্রাপ্ত শিল্পী ইসা-মামুদ-ইফেন্দী আর দেখলাম ওস্তাদ হামিদ খাঁকে। লোকটি নাকি ইতিমধ্যে বেশ নাম করেছে ইমারত তৈরির ব্যাপারে। সম্প্রতি বাদশাহ দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরের বিষয়ে চিন্তা করছেন। সে ব্যাপারে উৎসাহ যুগিয়ে চলেছে এই হামিদ খাঁ।

হামিদ খাঁর নাকি মনে মনে বাসনা আর একটি বিস্ময় সৃষ্টি করবে সে। জানি না দিল্লির প্রাসাদের জন্যে বাদশাহ কত খরচ করবেন।

কিন্তু শিল্পী কই?

কোয়েলের দিকে চাই, দেখি সে তন্ময় হয়ে দরবারের শেষ প্রান্তে চেয়ে রয়েছে, তার দৃষ্টিকে

অনুসরণ করে দেখতে পাই শিল্পীকে। বসে রয়েছে সে। কেমন যেন সঙ্কুচিত সে। শুধু তার চাহনি অবাক বিস্ময়ে দরবারের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেওয়ান-ই-খাসে এই প্রথম এলো বোধহয়।

বাদশাহ শিল্পীকে ডাকতে বলেন।

এগিয়ে আসে সে এক-পা এক-পা করে। সে বুঝতে পারছে না কিভাবে দাঁড়াতে হয় বাদশাহের সামনে। ইচ্ছে হয়, গিয়ে তাকে শিখিয়ে দিই। কিন্তু কোয়েল পেছনে। আমার মনের ইচ্ছেও সে হয়তো জেনে ফেলবে। তার ধারণা, চাঁদ কখনো পৃথিবীতে নেমে আসতে পারে না।

কোনোরকমে বাদশাহকে কুর্নিশ করে শিল্পী দাঁড়ায়। তার পা কাঁপে। অথচ এই শিল্পীই কোনোরকম সম্মান না দেখিয়ে বাদশাহের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলেছে তাজমহলের আঙিনায়। ভাবি, সত্যিই অদ্ভুত এরা। না না, অদ্ভুত নয় অপূর্ব, ওর পায়ের কাঁপুনি থামিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। পা ধরে—। না না—কোয়েল রয়েছে পেছনে। পিতা গম্ভীর স্বরে বলেন,—তোমার কাজে আমরা বিশেষ করে আমি খুব খুশি হয়েছি। তাই তোমার যা পাওনা তুমি পেয়েছ, তার উপরও পঞ্চ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা এনাম দেব বলে মনস্থ করেছি।

শিল্পী বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সে জানত যে সে পুরস্কার পাবে। কিন্তু তার পরিমাণ যে এতটা কল্পনাও করেনি সে।

কোয়েল কেঁদে ওঠে। বুঝতে পারি পাঁচ হাজার সুবর্ণ মুদ্রার মূল্য যে কতখানি, শিল্পী না জানলেও কোয়েল অনুমান করতে পারে। তাই শিল্পীর চোখ শুষ্ক, অথচ কোয়েল কেঁদে মরে।

কিন্তু তার দিকে চাইবার মতো মনের অবস্থা আমার নয়। আমি জানি এরপর কি হবে। বুক কাঁপে আমার।

রত্নাগারের অধ্যক্ষ বেবাদল খাঁ একটি সুদৃশ্য গজদন্ত-নির্মিত ভারী পেটিকা একজন প্রহরীর মাথায় চাপিয়ে শিল্পীর দিকে এগিয়ে আসে।

হঠাৎ হামিদ খাঁ চেঁচিয়ে ওঠে—কিন্তু জাঁহাপনা—

বাদশাহ হাত উঁচিয়ে তাকে থামিয়ে দেন। তাঁর চোখে মুখে বিরক্তির ছাপ, ধীরে ধীরে বলেন,—কিন্তু এনাম নেবার আগে একটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে তোমায়।

কোয়েলের মুখ দিয়ে বিস্ময়ের অস্ফুট শব্দ বার হয়। শিল্পীও স্তব্ধ।

—তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে তাজমহলের মতো শিল্প-সৃষ্টি ভবিষ্যতে তুমি আর কখনো করতে পারবে না।

এবারে ইসা-মামুদ বলে ওঠে—তাহলে আমাকেও সেই প্রতিজ্ঞা করতে হয় জাঁহাপনা।

—না। তুমি আমার দরবারের লোক। শিল্পী বাইরের।

এই প্রথম শিল্পীর পায়ের কাঁপুনি থামে। তার মুখে এক ঝলক হাসি ভেসে ওঠে। তাকে বলতে শুনি—আপনি ছাড়া এ জগতে আর কে এ-কাজ করার সামর্থ্য রাখে? ভবিষ্যতে আপনার যদি এরকম কোনো ইচ্ছে হয়?

—হবে না।

বাদশাহের কথায় শিল্পী কি জবাব দেবে আমি অনুমান করতে পারি। তারপরে গজদন্তের পেটিকা প্রহরীর মাথায় চাপিয়ে সে দরবার ত্যাগ করবে। কিন্তু সে কোনো জবাব দেয় না। তাকে চিন্তান্বিত দেখি।

সামান্য কয়েকটি মুহূর্ত। অথচ মনে হয়—বহু যুগ। শিল্পী বাদশাহের দিকে সোজা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ম্লান হেসে বলে,—আমি কোনো প্রতিজ্ঞা করব না জাহাঁপনা।

পিতার মুখে কি ক্রোধ? না বিস্ময়?

—পঞ্চ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রার কথা ভুলে যাওনি তো?

ইসা-মামুদ উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর স্বরে বলে,—না বাদশাহ ভুলে না গিয়েই সে আপনার কথার জবাব

দিয়েছে। যে মুহূর্তে সে প্রতিজ্ঞা করবে সেই মুহূর্তে তার শিল্পী মন কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধা পড়বে। ও জানে, তাজমহল নির্মাণের সুযোগ কোনোদিনই ওর আসবে না তবু শৃঙ্খলিত শিল্পীমন নিয়ে তার কোনো সৃষ্টিতেই বেহেস্ত-এর পরশ থাকবে না।

বাদশাহের মুখে খুশির ঝলক। এইটুকু দেখবার জন্যেই আজ আমি দরবারে উঁকি দিতে এসেছি। মনের বোঝা আমার নেমে যায়।

যুবক-শিল্পীর চোখে জল। ইসা-মামুদের উদ্দেশ্যে সে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানায়। দরবারের নিয়ম অনুযায়ী বাদশাহ ছাড়া কাউকে সম্মান জানানো অবমাননাকর। তবু সবাই উপেক্ষা করে আজ।

শিল্পী ভাঙা ভাঙা গলায় বলে,—আপনি নিজে জানেন আমাদের মনের কথা জাঁহাপনা। আপনিও যে আমাদের দলে। আমাকে আপনি পরীক্ষা করছিলেন।

একজন ওমরাহ বলে,—এনাম ওকে দেবেন না জাঁহাপনা।

ঘুরে দাঁড়ায় যুবক তার দিকে। বলে,—এনাম আমি পেয়েছি দোস্ত।

কয়েকজন ওমরাহ একসঙ্গে বলে,—না পাওনি।

দৃঢ়স্বরে শিল্পী বলে,—পেয়েছি।

ওমরাহেরা উৎকণ্ঠিত হয়ে বাদশাহের দিকে চায়। তিনি যুবককে বলেন—তুমি যেতে পার।

—এনাম? কয়েকজন প্রশ্ন করে।

—নেবে না। বাদশাহ গম্ভীর।

—নেবে না? সমস্ত দরবার একসঙ্গে কথা বলে ওঠে।

শিল্পী ততক্ষণে দরওয়াজার দিকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে।

কোয়েল কেঁদে ওঠে।

—দুবারের কান্নাই কি আনন্দের কোয়েল?

নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দেয় সে,—হ্যাঁ শাহজাদী। কিন্তু এবারের আনন্দ আর ধরে রাখতে পারছি না।

আবার বুঝলাম কোয়েল সাধারণ মেয়ে নয়।

সেইদিনই সন্ধ্যায় আমার কক্ষে প্রবেশ করে কোয়েল এক অস্বাভাবিক বিবর্ণ মুখে। চমকে উঠি আমি।

—কি হয়েছে কোয়েল?

সে কথা বলে না। শুধু চেয়ে থাকে। তার চাহনিতে কোনো ভাষা নেই।

—কোয়েল?

বৃথা। দরবারের পর আমার কাছ থেকে ছুটি চেয়েছিল যে দুপুরবেলাটুকু। জানতাম, কোথায় যাবে। ছুটি দিয়েছিলাম তাই। অপেক্ষা করছিলাম তার আনন্দোজ্জ্বল মুখখানা দেখব বলে। কিন্তু একি? এমন কি দুর্ঘটনা ঘটেছে, যা কোয়েলের মতো স্থির মস্তিষ্কের মেয়েকেও এতখানি বিচলিত করেছে?

—রোশনারা আবার অপমান করেছে কোয়েল?

কথা বলে না তবু। কাছে গিয়ে শরীর স্পর্শ করতেই সে পড়ে যায়। জ্ঞান হারায়। প্রথমে আমি দিশেহারা হই। তারপর শাহজাদী হয়ে নাজীরের মাথায় ব্যজন করি। বহুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে আসে কোয়েলের। চোখ বড় বড় করে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ে। অমন বুক ভাঙা কান্না জীবনে শুধু একবার শুনেছিলাম—মায়ের মৃত্যুর দিনে।

তবে কি—! কিন্তু সে যে অসম্ভব। এর মধ্যে শিল্পীর এমন কি হতে পারে?

শান্ত হয় কোয়েল। তারপর সামান্য কয়টি কথায় যে সাংঘাতিক খবর সে বলে, তাতে আমি

নিজেকে সামলাতে পারি না। আমিও কাঁদি। ওর মতোই কাঁদি।

সাংঘাতিক। কেঁপে কেঁপে ওঠে আমার হৃদয়। এমন জঘন্য পাপী আমারই পিতার সাম্রাজ্যে বাস করে—এই আগ্রাতেই। ধিক্।

তার চেয়ে শিল্পীর প্রাণটুকু নিলেই পারত। আফশোষ থাকত না তার। আমাদেরও দুঃখ এত অসহনীয় হ'ত না।

বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে দিয়ে গেল শিল্পীর! পিশাচ তারা। তাই শিল্পকার্যে তন্ময় শিল্পীকে পাঁচ-সাতজনে একসঙ্গে আক্রমণ করে অমন সর্বনাশ করে গেল। মন বেঁচে থাকল ওর। চোখও জেগে রইল। অথচ হাত দিয়ে স্বপ্নকে রূপ দেবার উপায় রইল না।

কিছু সময়ের জন্যে ক্রোধও যেন আমাকে ত্যাগ করে যায়। হতাশা আর অশ্রুজল ছাড়া আর কিছুই থাকে না। কিন্তু আমি শাহজাদী জাহানারা। ধীরে ধীরে প্রতিহিংসা জাগে মনে। এক উদগ্র প্রতিহিংসা। তড়িৎবেগে উঠে আমি উন্মত্তের মতো সেদিকে যাই।

কোনোরকম খবর না দিয়ে ঝড়ের মতো ঢুকে পড়ি 'দশ-পঁচিশী'তে। নূপুরের আওয়াজ স্তব্ধ হয়। নর্তকীদের চপল পা স্থানুর মতো গালিচায় আটকে যায়। সচকিত হয়ে বাদশাহ মুখ তুলে আমাকে দেখেন।

—কেন এসেছ? বাদশাহের কণ্ঠস্বরে চাপা ক্রোধ।

সে ক্রোধে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে আমি বলি,—গুরুতর কারণ ঘটেছে বলেই এসেছি। তাছাড়া আমি জানি শাহানশাহ্ সাজাহান সুরাপান করে কখনো বেসামাল হন না।

নর্তকীদের ভয়চকিত দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ। তারা হয়তো কল্পনাই করতে পারেনি বাদশাহকে কেউ এভাবে কথা বলতে পারে—সে বাদশাহের যত আপন লোকই হোক না কেন। বাদশাহও হয়তো চমকে ওঠেন আমার কথা শুনে। এমন কথা জীবনে তিনি প্রথম শুনলেন আমার মুখে।

কিন্তু অতশত দেখবার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না। আমি চাই প্রতিহিংসা—নিষ্ঠুরতম প্রতিহিংসা।

বাদশাহ্‌কে দেখে মনে হয় তাঁর ক্রোধ অনেকটা অন্তর্হিত হয়েছে। পরিবর্তে একটা কৌতূহল জেগেছে মনে। তবু গম্ভীর হয়ে বলেন,—কিন্তু তোমার জীবন তো যেতে পারত প্রহরীদের হাতে। জানো না আমার আদেশ?

—জানি; কিন্তু 'দশ-পঁচিশী'র প্রহরীরা যে আমারই নিযুক্ত। তারা জানে এখানকার এই সান্ধ্য আসরের মূলে আমি।

হয়তো আমার মধ্যে এক অদেখা বেয়াড়াপনার সাক্ষাৎ পেলেন তিনি। তাই একটু চুপ করে থেকে বলেন,—কেন এসেছ?

—সবার সামনে বলতে পারব না।

নর্তকীরা নিঃশব্দে স্থান ত্যাগ করে। কক্ষের মধ্যে স্তব্ধতা বিরাজ করে। নীচের দিকে চেয়ে থাকি। 'দশ-পঁচিশী'র নানা বর্ণের চতুষ্কোণ ঘরগুলি শোভা পায় মেঝেতে।

—বলো জাহানারা।

আমি খুলে বলি সব। বলতে বলতে আমার বুকের মধ্যে বাষ্প জমে। সে বাষ্প অশ্রুর আকারে যে কোনো মুহূর্তে চোখ বেয়ে ধারা হয়ে নামতে পারে। তবু থামি না। বলে যাই—

নীরবে বাদশাহ শুনে যান। আমার বক্তব্য একসময় শেষ হয়। তবু তিনি নীরব। একটা সংশয়ের ছায়া আমার মনের মধ্যে উঁকি দেয়। তবে কি সাজাহানও এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মধ্যে রয়েছেন? আমার উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে শিল্পীকে শাস্তি না দিতে পেরে তিনি এভাবে তার ভবিষ্যতের সমস্ত সৃষ্টির সম্ভাবনা বিনষ্ট করে দিলেন! না না, তাও কি হতে পারে? এ আমি কি ভাবছি?

হঠাৎ বাদশাহের চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়। তিনি কাঁপতে থাকেন। বিলাসী সাজাহানের এই ভয়ঙ্কর রূপ আমি আগে কখনো দেখিনি। সামনের সুরার পাত্রটি ছুঁড়ে ফেলেন তিনি। ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যায় সেটি। তারপর উঠে দাঁড়ান। নিজের অদম্য রোষবহ্নিকে সংযত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে তিনি বলেন,—মানুষ এত হীন হতে পারে আমি ভাবিনি জাহানারা। অপরাধীকে আমি শাস্তি দেব—কঠোরতম শাস্তি দেব।

বাদশাহ্ 'দশ-পঁচিশী' কক্ষ থেকে বার হয়ে দেওয়ান-ই-খাসের দিকে দ্রুত চলে যান। কোনো প্রহরীর মাধ্যমে আদেশ পাঠিয়ে বাদশাহ ব্যবস্থা অবলম্বনের ঝুঁকি নিলেন না। তিনি নিজেই গেলেন। কার কাছে গেলেন আমি জানি। আর এও জানি, এ সময়ে দেওয়ান-ই-খাসে কেউ না থাকুক সে অন্তত একা বসে রয়েছে। বল্কের আমীর নজরৎ খাঁ। নতুন স্থান পেয়েছে দরবারে। বয়সেও নবীন। বীর যোদ্ধা বলে সুখ্যাতি আছে শুনেছি। যোদ্ধা তো বটেই—চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। অমন পেশীবহুল দেহ আর শক্ত গড়ন আমার ভাইদের মধ্যে মুরাদ ছাড়া কারও নেই।

বাদশাহ নজরৎ খাঁকে অল্পদিনেই বড় বেশি বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। না করেও উপায় নেই। কিসে মন ভেজে পিতার, সব যেন তার নখদর্পণে। এত বেশি গলিয়ে দিয়েছে সে বাদশাহকে যে সেদিন দারার অনুপস্থিতিতে তিনি হঠাৎ নজরৎ খাঁকে পাঠিয়ে দিলেন ঝরোকার কাছে। কোনো একটি স্ত্রীলোকের বিচারের ব্যাপারে আমার মতামত জানতে চেয়েছিলেন বাদশাহ। প্রথমে রীতিমত বিস্মিত হয়েছিলাম আমি—চিন্তিতও। তারপর নিজের মর্যাদা অনুযায়ী আমার মতামত নজরৎকে জানিয়ে দিয়েছিলাম।

আজ এই গোপন কাজটির ভার তিনি নিঃসন্দেহে ওরই ওপর দেবেন। জানি, সুষ্ঠুভাবে পালন করবে নজরৎ বাদশাহের আদেশ। কাল থেকে পৃথিবীর বুকে শিল্পীর আক্রমণকারী বিচরণ করে বেড়াবে না। একদিনেই প্রকৃত আক্রমণকারীকে খুঁজে বার করা যাবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলি। শত হলেও একটা নরহত্যা। আর আমি নারী। নজরৎ খাঁ তার বুকখানা ফুলিয়ে কাল দেওয়ান-ই-খাসে এসে দাঁড়াবে। তার চোরা চাহনি ঘন ঘন ঝরোকায় প্রতিহত হয়ে ফিরে যাবে। ক'দিন থেকেই এমন হচ্ছে। নিজের সম্বন্ধে তার খুবই উঁচু ধারণা। সে ধারণা অবিশ্যি অমূলক নয়। অমন সুপুরুষ বীর ওমরাহ আঙুলে গোনা যায়। কিন্তু সে যা ভেবে বসে রয়েছে সেটি ভুল। আমি তাকে পছন্দ করতে পারিনি।

ভারাক্রান্ত মনে ধীরে ধীরে নিজের কক্ষে প্রবেশ করি। কক্ষের এককোণে কোয়েল তখনো দাঁড়িয়ে। আমার পায়ের শব্দে ফিরে তাকায়। চেয়ে দেখি গালে তার শুষ্ক জলের রেখা।

আমার দিকে এগিয়ে আসে সে। আমি জানি কী ব্যথা তার বুকে। ভালোবাসা না পেয়েও নিজে ভালোবেসে মরেছে। আর যাকে ভালোবাসে তার জীবনের সব চাইতে দুর্দিন আজ। দ্বিতীয় তাজমহল পৃথিবীর বুকে আর কোনোদিনই মাথা তুলে দাঁড়াবে না। যুগের পর যুগ যাবে, কালের গ্রাস থেকে যদি আজকের তাজমহল রক্ষা পায় তবে শুধু এটিকে দেখেই সারা পৃথিবীর মানুষকে তুষ্ট থাকতে হবে।

—কোয়েল?

—শাহজাদী!

—তারা শাস্তি পাবে।

—কারা শাহজাদী?

—যারা এ কাজ করেছে।

—কী লাভ?

তাই তো। কী লাভ! যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। এখন আর কোনো কিছুতেই কোনো ফলই হবে না। শিল্পীর নষ্ট আঙুল আর জোড়া লাগবে না। কোয়েলের হতাশা এখন লাভ-লোকসানের বাইরে।

কিন্তু আমি কোয়েল নই। আমি জানি, অপরাধীকে শাস্তি পেতেই হবে। নইলে জগতের প্রতিটি শিল্পীই চিরকাল প্রতিভাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে এইভাবে নির্যাতন সয়ে যাবে। শাস্তির একটি উদাহরণ অন্তত রাখা চাই ভবিষ্যতের মানুষের সম্মুখে।

কিন্তু উদাহরণ তো থাকবে না। নিঃশব্দে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। কাক-চিলও জানতে পারবে না কিভাবে অপরাধীর মৃত্যু হলো। অপরাধী যে সাধারণ ব্যক্তি নয়, এটুকু সবাই বুঝেছে। নইলে নজরৎ খাঁয়ের ওপর তাকে শাস্তি দেবার ভার পড়ত না। যদি তার শব খুঁজে পাওয়া যায়, লোকে জানবে আততায়ীর হস্তে নিহত হয়েছে সে। ইতিহাসে এই শাস্তির কথা লেখা থাকবে না। লেখা থাকবে শুধু আমার এই একান্ত আপনার কিতাবটিতে, বাবা যা দিয়েছেন আমাকে। কিন্তু এ কিতাব আমার মৃত্যুর পর কতদিন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে জানি না।

—কোয়েল?

—শাহজাদী!

—সেই মূর্তি কতখানি গড়া হয়েছিল?

—মনে মনে সবটাই গড়েছিল। কিন্তু পাথরে খোদাই-এর কাজ সবে শুরু করেছিল। ইচ্ছে ছিল খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে—মূর্তির প্রতিটি অণু থেকে যাতে সৌন্দর্য ঝরে পড়ে। হলো না। তার সাধের তিলোত্তমা গড়া হলো না।

হঠাৎ এক অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার বুক কেঁপে ওঠে। কোয়েলের মনে সে আশঙ্কা হয়তো স্থান পায়নি এখনো। তাড়াতাড়ি বলে উঠি,— সে আত্মহত্যা করবে না তো কোয়েল?

—জানি না। তবে আজ করবে না। আজ তার কোনো বোধশক্তিই নেই। হয়তো পাগল হয়ে যাবে শেষে।

শয্যার ওপর গিয়ে বসি। নিজেকে বড় ক্লান্ত মনে হয়। এমন অবসাদ অনুভব করেছিলাম শুধু মায়ের মৃত্যুর রাত্রে। নবজাত বোনের কান্না শুনেও সেদিন দেখতে যাবার শক্তি ছিল না। সেদিনের পর থেকে খুব কমই গিয়েছি বোনের কাছে। কেন যেন মনে হ'ত মায়ের মৃত্যুর জন্যে সে দায়ী। সে মনোভাবের গোড়ায় কুসংস্কার কাজ করে জানি। তবু সে সংস্কার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারিনি। নাজীরদের কোলে কোলেই মানুষ হলো ছোট বোনটি। আজ সে সুন্দর ফুটফুটে একটি মেয়ে বড় শান্ত বড় ধীর। মাঝে মাঝে সঙ্কোচে আমার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসাই। আদর করি। বুঝতে পারি, দিনের পর দিন একটু একটু করে আমার মনের কাছে চলে আসছে সে। শত হলেও সে আমাদের চেয়েও হতভাগী।

নানান চিন্তা একসঙ্গে আমার মাথার ভিতরে জট পাকিয়ে আমাকে অন্যমনস্ক করে তুলেছিল। পালঙ্কের বাজু ধরে ফাঁকা দৃষ্টিতে চেয়েছিলাম বাইরে। আকাশে চাঁদ ছিল না। শুধু তারা। সে তারাও পাতলা মেঘে মাঝে মাঝে ঢাকা পড়ছিল। হঠাৎ একসময় মনে হয় বহুদূর থেকে কে যেন আমায় ডাকছে।

কোয়েল। কোয়েলই ডাকছে। একেবারে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকছে। কিন্তু তার গলার স্বর খুবই চাপা।

—বল কোয়েল।

—আমায় বিদায় দিন।

—আমিও সেকথা ভাবছিলাম। ওর কাছে তো কেউ থাকবে না। রাতে তুমিই গিয়ে থাকো।

—শুধু রাতের জন্যে নয়। চিরদিনের জন্যেই যাচ্ছি।

কোয়েল চলে যেতে চায়? চিরদিনের জন্যে? কোয়েল ছাড়া আমার নিজের অস্তিত্বের কথাও যে আজকাল ভাবতে পারি না। অসহায়ের মতো চেয়ে থাকি।

—অনুমতি দিন শাহজাদী। কোয়েলের কণ্ঠস্বরে আকুতি।

—বাধা দিচ্ছি না কোয়েল। তুমি যাও।

'সিজদা' করে সোজা হয়ে দাঁড়ায় সে। তারপর হঠাৎ নাজীরের সমস্ত দূরত্ব মুহূর্তে ধূলিসাৎ করে দিয়ে আমার ঊরুর ওপর মুখ রেখে কেঁদে ফেলে। আমার চোখও শুকনো রাখতে পারি না। কোয়েল শুধু সাধারণ একজন বাঁদী নয়, সে আমার বন্ধু। সে আমার পরামর্শদাতা। তার অভাব অনেকদিন অনুভূত হবে—যতদিন নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে না পারব।

ধীরে ধীরে মাথা তোলে সে। বলে,—জীবনে কেউ যেন আমার এ অবস্থায় না পড়ে। দু'দিকেই দুর্নিবার আকর্ষণ। কোনো একটা ছেড়ে দেওয়াই চূড়ান্ত বেদনার।

—কোয়েল? শিল্পী কি কখনও জানতে পারবে, কার মূর্তি সে গড়তে চেয়েছিল?

—হ্যাঁ। তবে যতদিন আগ্রায় থাকবে ততদিন নয়। আগ্রা থেকে দূরে—বহুদূরে বাংলার সেই নিভৃত পল্লীতে তার নিজের গৃহে যখন সে ফিরে যাবে, শুধু তখনই অবস্থা বুঝে তাকে বলব সব কথা। তখন বলব, তার জীবনের একমাত্র নারীর কথা।

—তুমি যাবে?

—হ্যাঁ, শাহজাদী। আমি ওর সঙ্গেই যাব। ওকে দেখবার আর কেউ নেই।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে কোয়েলের নতুন রূপের দিকে চেয়ে থাকি। আল্লার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। মুঘল-বাদশাহের হারেমে জন্মেও এই রূপ দেখার দৃষ্টি আমার কাছ থেকে কেড়ে নেননি।

—যাই শাহজাদী। যতদিন ওর আয়ু রয়েছে, ওর কাছেই থাকব; আয়ু ফুরালেও ওখানকার মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকব। তবে কখনও যদি ওই দূরতম অঞ্চলেও আপনার দুর্দিনের কথা ভেসে যায়, ঠিক চলে আসব। আপনার পাশে এসে দাঁড়াবো। আপনি হয়তো তখন চিনতে পারবেন না আমাকে। তবু আসব।

আমার জবাব শোনবার আগেই সে দরওয়াজার দিকে চলে যায়। শুধু আড়ালে যাবার পূর্বে একবার দাঁড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে সে আমাকে দেখে নেয়। পরক্ষণেই জোর করে নিজের দেহটিকে বার করে নিয়ে যায়।

চলে গেল কোয়েল। আর ফিরবে না।

অঙ্গুরীবাগের দিকে চেয়ে বসেছিলাম। দুপুরের তীব্র সূর্যকিরণ ধীরে ধীরে নরম হয়ে এসেছে। বাগের গাছপালা আর সবুজ তৃণের ওপর সোনার ছোপ এখনো লাগেনি। ফুলের দল এতক্ষণ অসহ্য জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাদের স্বাভাবিক বর্ণ আর সৌন্দর্য নিয়ে নিজেদের মেলে ধরবার জন্য প্রস্তুত হয়।

অঙ্গুরীবাগের ওই কোণে কারুকার্যশোভিত আসনটির দিকে দৃষ্টি পড়লে সুজার কথা মনে হয়। কত আশা আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে ওটি তৈরি করিয়ে ওখানে স্থাপন করেছিল। প্রথমে আমরা কেউই বুঝতে পারিনি। প্রশ্ন করলে সে মৃদু হাসত। তারপর এক সন্ধ্যায় বাগের ভেতরে হাজার সুন্দরীর মেলা দেখে অবাক হয়েছিলাম। ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখি, সুজা বসে রয়েছে তাঁর সখের আসনটির ওপর। বহুমূল্য পরিচ্ছদ তার পরনে। আর তার সামনে দিয়ে নৃত্যের ভঙ্গিমায় একটির পর একটি সুন্দরী এগিয়ে চলেছে তাদের শরীরের সবটুকু মাধুর্য পরিস্ফুট করে। নিজের নয়ন আর যৌবনের পরিতৃপ্তির এই অভাবনীয় আবিষ্কারের উন্মাদনায় সুজা মত্ত হয়ে উঠেছিল সেদিন। কিন্তু কপালে তার এ-আনন্দ সইল না বেশিদিন।

বাদশাহ একদিন দরবারে আমীর-ওমরাহদের সামনে তার হাতে একটি হুকুমনামা ধরিয়ে দিলেন। বাংলার শাসনকর্তার পদ। একদিকে অভাবনীয় আনন্দ, অন্যদিকে হাজার সুন্দরীর বিরহ। সুজা দিশে

হারিয়ে ফেলেছিল।

তার বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এলে আমার কক্ষে এসে চুপি চুপি বলেছিল—বাদশাহ আমায় ঈর্ষা করেন জাহানারা। তিনি চান জগতে তিনিই শুধু বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে যাবেন—আর কেউ নয়। হাজার মেয়ের খেল্ দেখে তিনি চমকে গিয়েছেন। তাই পাঠিয়ে দিলেন দূরে।

—রাগে সব মানুষই জ্ঞান হারায় সুজা। তুমিও হারিয়েছ। তাই বাদশাহ সম্বন্ধে এমন হীন মন্তব্য করতে পারলে। একটু ভাবলে বুঝতে পারতে, তোমার অন্ধকার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করে তুলবার পথ দেখিয়ে দিলেন তিনি। এখন পারা না পারা তোমার শক্তি, সাহস আর বুদ্ধির ওপর নির্ভর করছে। নিষ্কর্মা হয়ে বসে থেকে বিলাসিতার নতুন নতুন পথ দেখাতে আমার দরজার বাইরে ওই খোজাটিও পারে।

মুখ বেজার করে চলে গিয়েছিল সুজা সেদিন। আমার কথার কোনো জবাব দিতে পারেনি সে। আর সে আসেনি। বাংলায় ভালই কাজ দেখাচ্ছে বলে শুনেছি।

অঙ্গুরীবাগের গাছপালায় ক্রমে সোনার পরশ লাগে। চেয়ে চেয়ে দেখি। কোন কাজ নেই। কোয়েল চলে যাবার পর থেকে বড় ফাঁকা লাগে। কথা বলার লোক পাই না। ছোট বোনটি প্রায় রোজই আসে। তাকে নিয়ে কিছু সময় কাটে। নাদিরার ঘরে যাই, দারা যদি উপস্থিত না থাকে। রোশনারা আমাকে এড়িয়ে চলে। বুঝতে পারি, আমাকে সে ঠিক সহ্য করতে পারে না। সে খাঁটি পৃথিবীর মেয়ে। নিজের দেহ, নিজের রূপ আর নিজের ইচ্ছে নিয়েই মশগুল রয়েছে। জানে না রূপের আয়ু কতটুকু। বাদশাহের ভগিনীদের ঘরগুলো একবার করে ঘুরে এলেই বুঝতে পারত। যদি বুঝত, তাহলে ওর চিন্তার গভীরতাও অনেক বেড়ে যেত।

পদশব্দে ফিরে দেখি আমার নাজীর সযত্নে আমার অপরাহ্নের জলখাবার নিয়ে হাজির করেছে। নূরজাহানের পরামর্শে এ সময়ে আমি কিছু ফলমূল আহার করি। চেয়ে দেখি অনেক ফল। দর্দ-ই-চিরাগ, সফতালু, জর্দলু এমনকি অসময়ে একটি নব্বজকও ফলগুলির মধ্যে উঁকি দিচ্ছে। হাসি পায়। আমাকে তুষ্ট করার প্রয়াসের অন্ত নেই এর। সেই কবে কোয়েল চলে গিয়েছে, তারপর থেকে ওই-ই রয়েছে। কাজেকর্মে বেশ চটপটে। কাজই ওর ধ্যান-ধারণা। তার বেশি ভাববার মতো মস্তিষ্ক ওর নেই। তাই ও এত চটপটে, এত পটু। কোয়েল এমন ছিল না। কোয়েলের কাজ আমাকে কোনোদিন আনন্দ দিয়েছে কিনা চিন্তা করারও অবসর পাইনি। কারণ ও আশেপাশে থাকলেই আমার মনটি ভরে থাকত। ও নেই আজ, তাই আমার মনও ফাঁকা। এই নাজীরের সহস্র প্রচেষ্টা আমার মনের ফাঁকটুকু ভরাট করতে পারছে না।

সামান্য একটু জলযোগ সেরে আঙুরের রস পান করি। ওকে ইঙ্গিতে সব উঠিয়ে নিয়ে যেতে বলে আবার বাইরে দৃষ্টি ফেরাই। হারেমের এই গণ্ডীর ভেতরে বসে থেকে ইচ্ছে হয় মনটিকে মিলিয়ে দিই অসীমের সঙ্গে।

হঠাৎ নজর পড়ে অঙ্গুরীবাগের ঠিক পাশে একজন পুরুষের দিকে। একটু দূরে হলেও চিনতে মোটেই দেরি হয় না। অমন প্রশস্ত আর উন্নত বক্ষ আমীরদের মধ্যে শুধু একজনেরই রয়েছে। সে নজরৎ খাঁ। একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে সে আমার বাতায়নের দিকে। খোজাদের মধ্যে কাউকে অর্থ দ্বারা বশ করেছে নিশ্চয়ই। নইলে শাহজাদী জাহানারা কোন্ প্রকোষ্ঠে থাকে সেকথা জানার কথা নয় নজরৎ খাঁয়ের। বাইরের কেউই জানে না। নজরৎ খাঁয়ের অঙ্গুরীবাগের পাশে উপস্থিতিও ঠিক স্বাভাবিক নয়। কারণ স্থানটি বাদশাহের পরিবারের জন্য সুরক্ষিত। সম্ভবত কৌশলে বাদশাহের অনুমতি নিয়েছে সে। দারার কাছ থেকেও ছাড়পত্র পেতে পারে। দারার সঙ্গে কিছুদিন তার বড় বেশি মাখামাখি। ভাইদের মধ্যে দারার প্রতি যে আমার একটু পক্ষপাতিত্ব রয়েছে, জেনে ফেলেছে নাকি? এত তাড়াতাড়ি জানা সম্ভব নয়। দারাই একমাত্র শাহ্জাদা যে আগ্রায় রয়েছে। তাই দুটো পথই মসৃণ করে নিয়েছে বক্ষের

আমীর।

স্পষ্ট বুঝতে পারি আমীর সাহেব আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। কক্ষের অপেক্ষাকৃত কম আলোই তার কারণ।

হাবভাবে তার অস্থিরতা প্রকাশ পায়। এত আয়োজন সব ব্যর্থ হতে বসেছে। খুব মজা লাগছে।

হঠাৎ রোশনারার ভূত আমার ঘাড়ে চাপে। বয়সের ভূতও হতে পারে। নজরৎকে লোভ দেখাতে ইচ্ছে হয় আমার। নিজেই টোপ হয়ে বাতায়নের বাইরে মুখ বাড়াই।

নিশ্চল হয় বক্ষের আমীরের মূর্তি। দূর থেকে তার চোখ দুটো দেখতে না পেলেও সে চোখ যে আমাকে গিলছে তা অনুভব করতে অসুবিধা হয় না মোটেই। গিলুক। দেখে যদি তৃপ্তি পায় ক্ষতি কি। আমি জানি আমার মন।

মাথটাকে একবার একটু ভেতরে টেনে নেবার ভান করি। সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু ভুলে নজরৎ খাঁ তার দেহটিকে অদ্ভুতভাবে নাড়া দিয়ে দু'হাত তুলে প্রার্থনার ভঙ্গীতে দাঁড়ায়। নিশ্চিন্তে হেসে ফেলি। জানি, সে হাসি ওর চোখে পড়বে না। আরও কিছুক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকি। শেষে হঠাৎ ঘৃণা জন্মায় নিজের ওপর। ছিঃ ছিঃ। এই সস্তা আনন্দে আমিও মেতে উঠলাম? ভুলে গেলাম নিজের শিক্ষা, নিজের রুচির পরিচয়? শিল্পীর কথা এত তাড়াতাড়ি মন থেকে মুছে গেল? তবে কি অবচেতন মনে আমি দু'জন পুরুষের সঙ্গ-লিপ্সু? একজন আমার মনের জন্যে, অপরজন দেহের? না না।

শামুকের মতো মুহূর্তে নিজেকে গুটিয়ে নিই কক্ষের ভেতরে। নাজীর দাঁড়িয়েছিল দূরে। তাকে বলি মমতাজ বেগমের কাছাকাছি কোনো ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা করতে।

কুর্নিশ করে সে চলে যায়।

মায়ের সান্নিধ্যের বড় প্রয়োজন। বহুদিন মা-ছাড়া। ভেতরের আর বাইরের যত কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্বের তিনিই ছিলেন আমার পথপ্রদর্শক। তাঁর ঘরের কাছে থাকলে তাঁর উত্তাপ হয়তো অনুভব করব। মনের ক্লেদ তাতে দূর হবে।

ঠিক পরদিনই দরবার শেষ হবার মুখে দারা দ্রুত ঝরোকার পেছনে এসে দাঁড়ায়।

—কি হ'ল দারা?

—একটি প্রস্তাব রয়েছে। রাখবে?

—শুনি আগে।

—শুনলে সম্ভবত আনন্দই হবে তোমার। চাঘতাই বংশের একটা নতুন দিন খুলে যাবে।

—ভণিতা রাখো।

—নজরৎ খাঁ কেমন লোক?

চমকে উঠি। কোনোরকমে সংযত হয়ে বলি,—ভালই তো।

—বক্ষের বেগম হবে?

—মানে?

—মানে, নজরৎকে শাদি করবে?

ম্লানমুখে হাসি ফুটিয়ে বলি, শাহানশাহ্ সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপযুক্ত কথাই বটে।

—ঠাট্টা করছি না জাহানারা।

—নিজের কাজে যাও দারা। আর যদি কাজ না থাকে, নাদিরাকে একলা রেখো না।

মুহূর্তের অস্বস্তি কাটিয়ে দারা বলে,—তোমাকে আমি প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারি কথাটা বাজে নয়। বাদশাহের কানে পৌঁছেছে।

—কে দিয়েছে কানে?

—আমি।

—তিনি রাজি হয়েছেন?

—নিমরাজি। জোর করলে বাধা দেবেন না।

—তবে তুমি একজনের মস্ত উপকার করতে পার। তার জীবনকে বিকৃতির পথ থেকে মুক্তি দিতে পার। তার ভেতরের সুকোমল বৃত্তিগুলো আবার জাগিয়ে তুলতে পার দারা।

—কে সে?

—রোশনারা। তার ব্যবস্থা কর দারা। আমি তোমার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব।

—বাদশাহ্ রাজি হবেন না। তবে তুমি যদি এ ব্যাপারে রাজি হও, পরে তাঁকে রোশনারার বেলাতেও মত দিতে হবে।

—তার মানে তিনি নিজে উদ্যোগী নন।

—না।

—নজরৎ খাঁকে আমার পছন্দ নয়।

বিস্মিত দারা বহুক্ষণ কথা বলতে পারে না। নজরৎ হয়তো কালকের অঙ্গুরীবাগের ঘটনাকে আশাপ্রদ মনে করে দারাকে বুঝিয়েছে সেই অনুযায়ী। তাই আমার কথায় সে অবাক হয়। শেষে বলে—বঙ্কের শক্তি আমাদের কতখানি সহায়ক তুমি জানো।

—জানি। তাই বলে, সে শক্তির কাছে নিজের মনকে কোরবানি দিতে পারি না।

—সে কি জাহানারা। জিনিসটাকে এভাবে নিচ্ছ কেন?

—অন্যভাবে নেবার উপায় নেই। রোশনারার ব্যবস্থা কর দারা যদি পার, তাহলে বঙ্কের চেয়েও বড় শক্তি তোমার করায়ত্ত হবে।

মুখখানা বিকৃত করে দারা।

—তবে যাও।

—নজরৎ কিন্তু অন্যরকম বলেছিল।

—সে ভুল বলেছে। মুঘল শাহ্জাদীরা খেয়ালের বশে কিছু করে না। তারা ভেবে দেখে।

—কিন্তু কি বলব তাকে?

—বলবে, এখনো কিছু বলার সময় আসেনি। আর একটা কথা শাহজাদা হয়ে আমীর-ওমরাহের বিভিন্ন-হৃদয় বন্ধু হতে যেও না। পরিণামে ভুগবে।

মুখখানা ভার করে চলে যায় দারা। আশাহত হলো সে। এক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ এই ভাইটি। চরিত্রের জটিলতার জন্যে হয়তো কোনোদিনই সে শান্তি খুঁজে পাবে না। সে জ্ঞানী গুণী, আবার সেই সঙ্গে সে লোভীও। মুখে সে দার্শনিকসুলভ নির্লিপ্ততা মাখিয়ে রাখলে কি হবে, যত দিন যাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি আমার অন্যান্য ভাইদের মতো তারও সিংহাসনের প্রতি লোভ কম নেই। বরং বেশিই। তাই বাদশাহ্ কালেভদ্রে তাকে বাইরে পাঠাতে চাইলেও সে যেতে চায় না। সব সময়ই তাঁর পাশে পাশে থেকে নিশ্চিন্ত থাকতে চায়। বাদশাহের ক্ষমতার কিছু কিছু ব্যবহার করে তৃপ্তিলাভ করে। আভাসে ইঙ্গিতে তাকে জানাতে চেষ্টা করেছি কত, দেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের এই সুযোগ সে হেলায় হারাচ্ছে। কিন্তু জানতে চায়নি সে। তার ধারণা মসনদের আশেপাশে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখলেই ওর ওপর অধিকার পাওয়া সহজ। বুঝতে পারে না রাজনীতি অত সরল জিনিস নয়। নিজের মেজাজের বশে চললে রাজনীতি করা যায় না। রাজধানীর আমীর-ওমরাহদের খোসামোদ করে নিজের দলে রাখার চেষ্টা রাজনীতির এক চালেই ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে। জাহানারাকে বঙ্কের আমীরের হাতে সঁপে দিলেও সব দিক রক্ষা করা যায় না। দাক্ষিণাত্য থেকে যে খবর ভেসে আসে, তাতে আওরঙজেব সম্বন্ধে সবারই উঁচু ধারণা জন্মেছে। বাদশাহ চিন্তিত হয়েছেন—সেই সঙ্গে আমিও। আওরঙজেবের

চতুরতায় যত বেশি শান্ পড়বে ততই বিপদ। দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা সে—অথচ নাকি ফকির সেজে বসে আছে। নিজের হাতে টুপি তৈরি করে বিক্রি করে। আর সেই পয়সায় সংসার চালায়। মুসলমান ধর্মের এত বড় আদর্শ সবার সামনে ধরে রেখে মন জয় করা অত সহজ! শুধুমাত্র জাহানারাকে সমর্পণ করে এত ব্যাপকভাবে মন জয়া করা সম্ভব নয়। দারা বিজ্ঞ কিন্তু সে চতুর নয়। আমার দুঃখ এইখানেই।

'দশ-পঁচিশী'র সেরা নর্তকী গোয়ালিয়রের গুলুরুখবাঈ-এর নৃত্যের আয়োজন করি প্রাসাদের ভেতরের বিরাট চত্বরে। স্থানটি দরবারের কাছাকাছি। গুলরুখের নূপুরের শব্দ নিঃসন্দেহে দেওয়ান-ই-খাসে বাদশাহের কর্ণে প্রবেশ করবে। পাগল-করা নৃত্যের তাল একসময়ে বাদশাহকে অন্যমনস্ক করে তুলবে। কিন্তু দরবার ছেড়ে হয়তো তিনি আসবেন না। দরবারের সম্মান তিনি সব সময় বজায় রাখেন।

লক্ষ চিরাগদানির বাতিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চত্বর এবং চত্বরের আশপাশ। হারেমের সবাই আমার এই আয়োজনে নিমন্ত্রিত। একে একে তারা এসে আসন গ্রহণ করে। গুলরুখবাঈ অনতিদূরে একটি কক্ষে নিজেকে শেষবারের মতো সাজিয়ে নিচ্ছে। তার একটা নিয়ম, নৃত্য শেষ করে সে দাঁড়ায় না। হাওয়ায় উড়তে উড়তে দরবারকক্ষের পাশের অলিন্দ দিয়ে ভেসে যায় তার নিজের আবাসে। অনেকদিন তাকে বলেছি, নৃত্যের শেষে একটু অপেক্ষা করে বেগম শাহ্জাদীদের ধন্যবাদ গ্রহণ করতে। ওভাবে যাওয়া দৃষ্টিকটু। সে হাসে আমার কথা শুনে। তার হাসি এত সংযত আর এত দৃঢ় যে আমি বুঝতে পারি নাচ শেষ হবার পর বাদশাহ স্বয়ং তাকে অপেক্ষা করতে বললেও সে অপেক্ষা করবে না। চলে যাওয়াটাও যেন তার নৃত্যেরই একটি অঙ্গ। ওটুকু না হলে নৃত্য তার সম্পূর্ণ হয় না। সত্যিই সে অজ্ঞ, সে কথা অস্বীকার করেও লাভ নেই। তার এই অপসৃয়মান দেহখানা দেখবার জন্য ইতিমধ্যেই হারেমে একটা আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।

ওস্তাদদের বাদ্যযন্ত্র বেজে ওঠে। এক স্বর্গীয় পরিবেশ। ভুলে যেতে হয় পৃথিবীর সব কিছু ক্লেদ-গ্লানি। ভুলে যেতে হয় রাজনীতির নোংরামি। মন চলে যায় ঊর্ধ্বে—বহু ঊর্ধ্বে।

পাশেই রোশনারা বসে রয়েছে। গুলরুখকে সে অপছন্দ করে। অপছন্দ করে তার রূপের জন্য। তবু তার আসরে হাজির হয় সে। নাচ ভালবাসে রোশনারা। আওরঙজেবের সব নির্দেশ সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেও নৃত্যের বেলায় আদর্শভ্রষ্ট। আওরঙজেব নাকি দাক্ষিণাত্য থেকে লিখেছে, তার নিজের হারেমে নাচগানের চল বন্ধ করে দিয়েছে সে। ওসব ধর্মবিরুদ্ধ। দিন দিনই আমার ভাইটির মন শুকিয়ে যাচ্ছে। শেষ পরিণতি কি হবে জানি না।

গুলরুখ আসরের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। হাতজোড় করে প্রার্থনার ভঙ্গীতে সে আকাশের দিকে প্রণাম জানায়। হিন্দুদের রীতি। তারপর অভিবাদন করে আমাকে আর আশেপাশের সবাইকে। যারা তার নাচের ভক্ত, তাদের সবারই ভক্ত সে। শিল্পীর সঙ্গে শিল্প-রসিকের মনের যে সম্বন্ধ তাতে উভয় পক্ষই উভয়ের ভক্ত।

নাচ শুরু হয় মৃদুমন্থর গতিতে। স্তব্ধ আসর। শুধু গুলরুখের নূপুরের শব্দ। তার পা যেন মাটি স্পর্শ করে না। কী করে এমন সম্ভব বুঝে উঠতে পারি না। শুধু তার দেহখানা নানান্ ভঙ্গিমায় তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে। হাওয়ায় যেন নদীর জলে শিহরণ তুলে ঢেউ-এর সৃষ্টি করে, সুর তেমনি তার দেহে ঢেউ তোলে। কতবার দেখেছি, আশা মেটে না। প্রতিবারই নতুন করে চমক জাগে—প্রাণে এক অনাস্বাদিত সুরের হিল্লোল বয়।

গুলরুখকে আমি ভালোবাসি। নারী হয়ে নারীকে যতটা ভালোবাসা সম্ভব ততখানি। একবিন্দু কম নয়। অনেকদিন আমার নিজের কক্ষের দরজা বন্ধ করে ওর নাচ দেখেছি। সেখানে আমিই একমাত্র রসিক। সেই একক আসরে গুলরুখ যেন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। খেয়াল থাকে না তার কতক্ষণ সে নেচে

চলেছে। আমারও খেয়াল থাকে না। কোনো কোনোদিন এমন হয়েছে, ক্লান্ত হয়ে সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। মৃত্যু হয়েছে ভেবে ছুটে গিয়ে তার দেহখানা জড়িয়ে ধরে কেঁদেছি। একটু পরেই যখন দেখেছি প্রাণের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, সরে গিয়েছি তার কাছ থেকে। আমি শাহজাদী। সে সামান্যা নর্তকী।

গুলরুখ নেচে চলেছে। রোশনারা উত্তেজিত। এ উত্তেজনা কিসের বুঝতে পারি না। মনে হয়, অক্ষমের উত্তেজনা। সে চায় গুলরুখের মতো নেচে নেচে ক্লান্ত হয়ে পড়তে। সে চায় মোগলাইখানা প্রতিদিন তার শরীরে যে শক্তির সঞ্চয় করছে সে শক্তিকে সন্ধ্যার শীতলতায় নিঃশেষ করে দিতে। কিন্তু পারছে না। গুলরুখের পায়ের ছন্দ, তার লীলায়িত দেহবল্লরীর গুণা্বলীর অভাব রয়েছে রোশনারার। তাই সে উত্তেজিত।

তার এই অবস্থা একবার দারাশুকোকে দেখাতে পারলে হয়। কিন্তু দারা নেই। যদিও পাশের দরবারে সে উপস্থিত, একবারও তাকে এই আসরে উঁকি দিতে দেখিনি। দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরের ব্যাপারে কিছুদিন থেকেই দরবারের প্রতিটি লোক বড্ড ব্যস্ত। সেখানকার হর্ম্যরাজি অতি দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। দারা নূপুরের শব্দ শুনেও তাই পালিয়ে আসার সুযোগ পাচ্ছে না। নাদিরার দিকে ফিরে চাই। একটু দূরেই সে বসেছিল। তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হেসে ফেলে। সে হাসির অর্থ পরিষ্কার। সেও দারার কথাই ভাবছিল।

নাচ-শেষে গুলরুখের চলে যাবার পথের সরু দীর্ঘ অলিন্দে শত শত প্রদীপের সারি। দুই পাশের সেই প্রদীপগুলির শিখা মৃদু হাওয়ায় দুলছে। নৃত্যের তালে তালে তাল দিচ্ছে যেন। প্রদীপের আলোয় গুলরুখকে শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে।

নাচের তাল দ্রুততর হয়। শেষ হয়ে আসছে। আমাদের সবার মন একাগ্র। রোশনারাও এ সময়ে নিজের ব্যর্থতার কথা ভাবতে পারছে না। নাদিরা দারার কথা ভুলে গিয়েছে। বাদশাহের অবহেলিত বেগমদের জ্বালাধরা হৃদয়ে সাময়িক শান্তি বিরাজ করছে। গুলরুখ বিদায় নেবে। যে কোনো মুহূর্তে সে ওই অলিন্দপথ দিয়ে ছুটে যাবে।

সহসা ওস্তাদের বাদ্যযন্ত্র 'ঝম্' করে একটা আওয়াজ তুলে মুহূর্তের জন্য থেমে যায়। এই আওয়াজটি গুলরুখ-নৃত্যের বিশেষত্ব। তারই নির্দেশে বাদ্যের এই ছেদ। এই ছেদ মুহূর্তের জন্যে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে গুলরুখ। শুধু তার সর্বাঙ্গে এক অপরূপ হিল্লোল। ঠিক তারপরই গুলরুখ ছোটে অন্দরের দিকে। 'বাহবা' ওঠে আসর থেকে। আমার মন তৃপ্ত। গুলরুখের সম্মানে আমার সম্মান। তার জয়ে আমার জয়। কিন্তু একি?

আর্তনাদ কবে ওঠে গুলরুখ! চিরাগদানির কম্পিত শিখা তার ওড়নার প্রান্ত স্পর্শ করেছে। আগুন লেগেছে ওড়নায়। চুলের সঙ্গে আটকানো রয়েছে ওড়না। খুলতে পারছে না গুলরুখ। দিশেহারা সে। আগুন ছড়িয়ে পড়েছে।

আসরে সবাই বোবা। তারাও গুলরুখের মতো দিশেহারা।

আমি ছুটে যাই পাগলের মতো। তাকে জড়িয়ে ধরতে যেতেই সে অসীম যন্ত্রণার মধ্যেই দু' হাত সরে যায়,—না না শাহজাদী। আসবেন না।

—পাগলামী করো না গুলরুখ।

আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ে। ওর সর্বাঙ্গে লেলিহান শিখা।

—শাহজাদী মরতে দিন! বেঁচে আর লাভ নেই।

তার বাধা মানি না। সে বুঝতে পেরেছে অগ্নিদগ্ধ কুৎসিত রূপ নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে গুলরুখবাঈ-এর মৃত্যু ভাল। কিন্তু আমি তো তা ভাবতে পারি না। আমি দেখছি আমার প্রিয় নর্তকীর যন্ত্রণা। মৃত্যু ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। জড়িয়ে ধরি তাকে। আমার শরীরের শীতলতা যদি তার

দেহের অগ্নিশিখাকে শান্ত করতে পারে।

কিন্তু পারল না। লোভীর মতো লক্‌লকে জিভ বার করে নতুন জিনিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আগুন। চিৎকার করে ওঠে রোশনারা। কেঁদে ওঠে নাদিরা।

দেওয়ান-ই-খাসের টনক নড়ে এতক্ষণে। শুনতে পাই অনেক পুরুষের ব্যস্ত পদশব্দ। নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও লজ্জা পাই। দারা ছুটে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। পেছনে নজরৎ। সে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরতে চায়।

মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠি,—খবরদার! মুঘল-শাহজাদীর গায়ে যেন হাতের স্পর্শ না লাগে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে নজরৎ।

আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পাশেই মাটিতে অর্ধদগ্ধ গুলরুখ। ছট্‌ফট্ করছে। আমার গুলরুখ। তাকে আর চেনা যায় না। আমারও ওই অবস্থা হবে।

—জাহানারা! দারা চিৎকার করে ওঠে।

সহসা দেখি দেওয়ান-ই-খাসের ভারী পর্দা ছিঁড়ে নিয়ে কে যেন এগিয়ে আসছে। আমি বাধা দিয়ে উঠি,—স্পর্শ করবেন না।

—শাস্তি দেবার যথেষ্ট অবসর পাবেন শাহজাদী। এখন ভাল মেয়ের মতো চুপ করে থাকুন।

সে পর্দা দিয়ে আমাকে বলিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ধরে।

মুহূর্তের জন্যে চেয়ে দেখি ওকে। এমন সুপুরুষ—অথচ আগে দেখিনি। চোখের দিকে দৃষ্টি পড়ে এর মধ্যেও। সেই চোখ—তাজমহলের শিল্পীর মতো।

আমার আঁখি নিমীলিত হয আপনা থেকে। নিজের যন্ত্রণাকাতর দেহকে নিশ্চিন্তে সমর্পণ করি। আর কিছু মনে নেই।

আমি স্বার্থপর। নইলে এই দুই মাসের মধ্যে গুলরুখের কথা একবারও মনে হয়নি কেন? শয্যাশায়ী হয়ে আকাশপাতাল অনেক চিন্তাই করি। অথচ গুলরুখের চিন্তা মাথা থেকে সেই দুর্ঘটনার পরই বিদায় নিয়েছে।

পাশে বাদশাহ বসেছিলেন। আমার কপালে তাঁর হাতখানা। দেখলে মনে হয় এর মধ্যে তাঁর বয়স আরও অনেক বেড়ে গিয়েছে। আমি অসুস্থ হবার পর তাঁকে দেখবার কেউ নেই। রোশনারা যদি একটু দায়িত্বসম্পন্ন হ'ত, অনেক দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা পেতাম আমি।

—বাদশাহ।

আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে তিনি বলেন, বাদশাহ কিরে? বাবা বল্।

—বাবা! চোখ ছাপিয়ে জল বার হয় আমার।

বাদশাহও অন্যদিকে মুখ ফেরান।

—গুলরুখ কেমন আছে বাবা?

—সে নেই। ভালোই হয়েছে জাহানারা। বেঁচে থাকলে সে আত্মহত্যা করত।

—তবে আমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করলেন কেন? নানান দেশ থেকে এত হাকিম আনার প্রয়োজন কি? নর্তকী না হলেও মেয়ে তো আমি।

—জানি। তোকে বাঁচতে হবে আমার জন্য। তুই-ই যে আমার প্রাণ, জাহানারা। এক নিদারুণ অসহায়তা ফুটে ওঠে বাদশাহ সাজাহানের চোখে মুখে। মায়া হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় সাজাহানও স্বার্থপর। নিজের স্বার্থের জন্য আমাকে কুরূপ নিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন।

—আমি বাঁচব না বাবা।

—কেন?

—আমি শাহজাদী। রূপ না থাকলে আবার শাহজাদী?

—কে বলে তোর রূপ নেই জাহানারা?

ম্লান হেসে বলি,—সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

—না। তোর মুখে তো কিছুই হয়নি। তোর বুক আর উরু জখম হয়েছে।

—দেখা যায় না?

—না। এতদিন তুই সত্যিই জানতিস না?

মন আমার অনেক হালকা হয়ে যায়। বলি—জানতাম না বাবা। আরশি চাইতে ভরসা হ'ত না। যদি চোখের সামনে কদাকার একটি মুখ ভেসে ওঠে!

—তুই পাগল। বাদশাহ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ান। অনুমানে বুঝতে পারি দরবারে যাবার সময় হয়েছে তাঁর।

আমার বুকের পাষাণ-ভার নেমে যায়। মনে মনে আল্লাকে ধন্যবাদ দিই। তাঁর কাছে প্রার্থনা করি। যত বড় শাহানশাহই হোন না কেন, সবার উপরে তিনি। তিনি না থাকলে দেশ-বিদেশের হাকিমেরা কিছুই করতে পারতেন না। তিনি না থাকলে দেহের সব অংশ বাদ দিয়ে শুধু মুখখানাই দগ্ধ হ'ত। আমার এই মুখের দ্বারা তাঁর সব উদ্দেশ্য এখনো সিদ্ধ হয় না। আমার এই দেহ দ্বারাও নয়। নইলে সাত সাগর তেরো নদী পার হয়ে এদেশে এসে ঠিক এই সময়েই সাহেব-হাকিম হাজির হ'ত না। কি যেন হাকিমের নাম? গাব্রাল ব্রিংটন, না কি যেন! যেমন অদ্ভুত নাম, তেমনি অদ্ভুত চিকিৎসা। এদেশের সবাই হার মানলো, তারপর তো সে এলো। সত্যিকারের ব্যথা সেই-ই কমিয়েছে। যদিও আরও দু'মাস লাগবে সম্পূর্ণ ভাল হয়ে উঠতে। সে নাকি পোড়া দাগও মিলিয়ে দেবে অনেক।

বাদশাহ বিদায় নেবার কিছু পরেই দরওয়াজার পর্দা আবার দুলে ওঠে। নিশ্চয়ই নাদিরা কিংবা দারা।

না। আওরঙজেব! ও এলো কোথা থেকে? সে-ই কবে দাক্ষিণাত্যে গিয়েছিল, তারপর এই প্রথম।

—আওরঙজেব?

—জাহানারা! লম্বা লম্বা পা ফেলে আমার সামনে এসে দাঁড়ায় সে। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল আমার পাশে বসে আমার হাতে হাত রাখে। কিন্তু ওর সংযত স্বভাব বসতে দেয় না ওকে।

—আওরঙজেব?

হাসে আওরঙজেব। বলে,—বিশ্বাস হচ্ছে না?

—কতদিন পরে এলে?

—অনেকদিন। এখনো তো আসতাম না। কিন্তু দুর্ঘটনার খবর যে মুহূর্তে শুনলাম, আমি সব ছেড়ে তখনি রওনা দিলাম। তবু আসতে কত দেরি হয়ে গেল।

—সত্যি?

—হ্যাঁ জাহানারা। আমার সম্বন্ধে তোমাদের মনোভাব কি আমি জানি। সে মনোভাব ভুল নয়। তবু আমার ভেতরের স্নেহ, প্রীতি, ভালোবাসা সবই আছে। কঠিন আবরণে ঢাকা পড়ে থাকে। সে আবরণ ধর্মের। মসনদের ওপর আমার কতখানি লোভ আছে তা জানি না। তবে তুমি যদি ধর্মের বিরোধিতা কর আর যদি আমার যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে, তোমাকে আমি মৃত্যুদণ্ড দিয়ে একফোঁটা চোখের জলও না ফেলে মনের ভেতরটাকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলব।

—কী সাংঘাতিক?

—তোমরা একে সাংঘাতিক বল। কিন্তু নিজেকে আমি এইভাবেই গড়ে তুলেছি?

আমি প্রতিবাদ করি না। এতদিন পরে এসেছে, তাই চুপ করে থাকি। প্রতিবাদ করার শক্তিও আমার নেই, একটানা কথা বলে বলে ক্লান্ত মনে হয় নিজেকে।

এতক্ষণে আওরঙজেব পাশে বসে। গায়ে হাত বুলিয়ে শেষে আলখাল্লার ভেতর থেকে মালা বার করে জপ করতে শুরু করে। আল্লার কাছে প্রার্থনা করছে ও আমার জন্যে। ওর গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে বড় ভাল লাগে। এক বিরাট ব্যক্তিত্ব।

অনেকক্ষণ পরে চোখ মেলে আওরঙজেব। মালাটি আলখাল্লার ভেতরে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, —যাই জাহানারা। বাদশাহের সঙ্গে এখনো দেখা হয়নি। ভেবেছিলাম তোমাকে আরও খারাপ অবস্থায় দেখব। তাই আগে এখানে এসেছি।

—আল্লার কৃপা।

—নিশ্চয়। সেই কথাই সব সময় মনে রেখো। আর সব ঝুট।

লম্বা লম্বা পা ফেলে সে বার হয়ে যায়।

নাজীর কাছে আসে নিঃশব্দে। তাকে বলি,—আজ অনেক খানার আয়োজন করতে বল। আমার খিদে পেয়েছে খুব।

নাজীরের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নিজে থেকে আমাকে ও খাবার কথা বলতে শোনেনি কখনো।

—সব বানাতে বলো—বুজুগ, তন্দুরি বাব্বোরা, হালিম-গোস্ত, সমকোক্ষ।

—আর কিছু? নাজীর ঢোক গেলে।

—দো-পালা, মুতাঞ্জনতু মোরগ মুসল্লাম।

নাজীরের চোখ বড় বড় হয়। অসুস্থ ব্যক্তি এত খেতে পারে না। তার ভাগ্যেই সব জুটবে।

মনে মনে হাসি। আওরঙজেব এলো এতদিন পরে, সবরকম খানারই আয়োজন থাকা উচিত। তার মন যা চাইবে তাই খাবে। বাদশাহ আর দারার পাশে বসে খাবে সে আজ। অস্বস্তি হবে সবার—তবে খুশিও হবে। সরাবের আয়োজন করব কিনা বুঝতে পারি না। খাঁটি মুসলমান আওরঙজেব। সরাবের আয়োজন করলে যদি খানা ফেলে উঠে পড়ে?

শেষে খাদ্য তালিকায় সরাবকেও রাখলাম। খাঁটি মুসলমান ও আজ নতুন হয়নি। অথচ কোনোদিনই সুরাপাত্রের মোহ ও ছাড়তে পারেনি। দাক্ষিণাত্যে যদি ছেড়েও থাকে সেখান থেকে শত শত যোজন দূরে এই আগ্রার প্রাসাদে খানার পাশে সুরাপাত্র দেখলে হাত তার আপনা হতেই এগিয়ে যাবে। মুসলমান হলেও আওরঙজেব মুঘল। ওর শিরা-উপশিরায় ভারতে মুঘল-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের রক্ত প্রবাহিত। বাবরের মুখের প্রসিদ্ধ উক্তি ঃ

নওরোজ উয়-নওবহার-উয়
মি-উয় দিলরে-খাশত্।
বাবর বেশ কুশকে আলম
দো-বারা নিস্ত।

রিকাবখানা, আবদারখানা আর মেওয়াখানার কর্মচারীদের কাছে আমার নির্দেশ পৌঁছে দেবার জন্যে নাজীরকে পাঠাই। সেই সঙ্গে বলে দিই, ঠিক সময়ের কিছু আগেই যেন 'খুরিশ গরাণ' খাদ্যের স্বাদগ্রহণের জন্য উপস্থিত থাকে।

পাশ ফিরে শুই। অসুস্থ হলেও দায়িত্বের বোঝা মাথা থেকে নামে না।

তাজমহলের শুধু আভাস পাওয়া যায় শুয়ে শুয়ে। নিশ্চিন্তে মা নিদ্রা যান সেখানে। কোনো অশান্তি নেই তাঁর মনে। নিত্য দুবেলা কোর-আন শরিফ আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন মৌলবী।

কেন যে সবটুকু ভার আমার ওপর ছেড়ে গেলেন তিনি। বইতে পারবো তো?

সম্পূণ নিরাময় হয়ে উঠি একদিন। আওরঙজেব চলে গিয়েছে। সব কিছু একঘেয়ে। কিছুই যেন ভালো লাগে না। এতদিন পালঙ্কে শুয়ে থাকার পর সুস্থ হবার যে আনন্দ, সে আনন্দ মোটেই উপভোগ

করতে পারি না। নাদিরা এজন্যে আমার মনকে দায়ী করে। বলে, দু-চারদিন বাইরে ঘোরাফেরা করলে নাকি ঠিক হয়ে যাবে। দেখা যাক।

এদিকে বাদশাহ বড় ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। আগ্রার জলবায়ু মোটেই আর সহ্য হচ্ছে না তাঁর। বাবর বংশের কোনো পুরুষের স্বাস্থ্য যে এত স্পর্শকাতর হতে পারে ভাবিনি। চূড়ান্ত বিলাসিতাই হয়তো তাঁর দেহকে এই পর্যায়ে এনে ফেলেছে। দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরের জন্যে বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন তিনি। তাঁর ধারণা, দিল্লিতে ফিরে গেলে তিনি আবার স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন, আবার কর্মঠ হয়ে উঠবেন।

কক্ষের মধ্যে আপন মনে পায়চারি করি। নাজীরকে বাইরে পাঠিয়েছি। এ সময়ে একা একা থাকতে ভালোই লাগছে। একা আকাশ-পাতাল চিন্তা করেও সুখ। এতদিন শয্যাশায়ী থেকেও যেন তৃষ্ণা মেটেনি।

হঠাৎ এক সময়ে নিজের দেহের দগ্ধ অংশ ভালভাবে দেখবার ইচ্ছে হয়। কেউ কোথাও নেই। ধীরে ধীরে গিয়ে দরওয়াজা অর্গল বন্ধ করি। একটির পর একটি শরীরের রেশমের পোশাক পালঙ্কের ওপর রাখি। শেষে আর কোনো পোশাকই থাকে না।

দেওয়ালে প্রকাণ্ড আরশি। তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। সুযোগ পেলে এভাবে নিজের দেহকে সব মেয়েই যাচাই করে দেখতে চায়। যারা বলে যাচাই করে না, তারা মিথ্যা বলে। কিন্তু আমি নিজের দেহের সৌন্দর্য দেখতে চাই না। সে বাসনা না মরলে যাবে না তাও জানি। তবু আজ আমি শুধু দেখতে চাই কতখানি অসুন্দর আমাকে করেছে সেই ভয়ঙ্কর আগুনের শিখা যার গ্রাসে পড়ে গোয়ালিয়রের গুলরুখবাঈ-এর নূপুরপরা পায়ের ছন্দ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছে।

দেখতে পাই নিজের বুক। বাম স্তনের নিচে খানিকটা জায়গা সাদা হয়ে রয়েছে। কোমরের ওপরে আর কোথাও বিশেষ ক্ষত চিহ্ন চোড়ে পড়ে না। শুধু গায়ের রঙ যেন একটু মলিন। হয়তো শুয়ে থেকে থেকে এমন হয়েছে।

এবার দেহের নীচের অংশের দিকে চোখ নামাই। কোমর থেকে পায়ের আঙুল অবধি। উরুর ক্ষত আরও বিস্তৃত। অনেকখানি জায়গা বিশ্রী হয়ে রয়েছে। থাকুক। জাহানারা বেগমের দেহের এই দুই বিকৃতি যদি আমারণ এইভাবেই থাকে ক্ষতি নেই। পৃথিবীতে দ্বিতীয় ব্যক্তির দেখার সুযোগ ঘটবে না। চাঘতাইবংশের কুমারী জাহানারা বেগম—জীবন তার আকবর শাহের নিষ্ঠুর বিধানে গণ্ডীবদ্ধ।

হিন্দুরা আগুনকে বলে অগ্নিদেব। দেবতা যখন, তখন নিশ্চয়ই পুরুষ। আমার সঙ্গে রসিকতা করেছেন অগ্নিদেবতা। আমার কুমারীত্বের দিকে বহুদূর হাত বাড়িয়েছিলেন। কিছুটা হরণও করেছেন বলতে হবে। পৃথিবীতে পুরুষ মিলল না দেখে কৃপা করেছেন তিনি। আজ কোয়েল থাকলে আলোচনা করতে পারতাম! আমার বক্তব্য শুনে সে রাগ করতো কিনা কে জানে। সে যে হিন্দু।

কোয়েল থাকলে আর একটি খবরও এতদিনে মিলত, যে খবরের জন্য রোগশয্যার ওপর ছট্‌ফট্‌ করেছি, অথচ মুখ ফুটে কাউকে প্রশ্ন করতে পারিনি কখনো। আমার এই ধরনের সঙ্কোচ জীবনে খুব অল্পই অনুভব করেছি।

এ পর্যন্ত কখনো কাউকে প্রশ্ন করতে পারিনি,—আমার রক্ষাকর্তা কে? সেই সুপুরুষ বলিষ্ঠ আগন্তুকের চাহনি একটি বারের জন্যও ভুলতে পারিনি। মনের মণিকোঠায় কৃপণের ধনের মতো আগলে রেখেছি। প্রশ্ন করতে ভয়ও হয়েছে। এক অজানা আশাভঙ্গের ভয়। কিন্তু আজ যখন দু' পায়ের ওপর দাঁড়াতে পেরেছি, আরশির সামনে নিজের নিরাবরণ দেহখানাকে মেলে ধরেছি, তখন আর নিজের এতদিনের সংযমকে ধরে রাখতে পারি না। জানতে হবে—এই মুহূর্তেই জানতে হবে।

পোশাকগুলি একটির পর একটি পরে ফেলি। একটু ক্লান্ত বোধ হয়। তবু দেয়াল ধরে দরওয়াজার দিকে অগ্রসর হই। খুলে দিই দরওয়াজা। কিন্তু আর পারি না। চোখের সামনে কেমন যেন অন্ধকার হয়ে

যায়। কোনোরকমে শয্যায় এসে শুয়ে পড়ি।

—বেহুঁশের মতো পড়ে থাকি—কতক্ষণ জানি না। শেষে একসময়ে কপালে নরম হাতের স্পর্শ পাই। চোখ মেলে দেখি নাদিরা। আমার মুখের সামনে ঝুঁকে উৎকণ্ঠিত হয়ে চেয়ে রয়েছে।

—শরীর খারাপ হয়েছে?

—না নাদিরা। একটু দুর্বল বোধ করছি।

—এখন তবে যাই। পরে আসব।

—না বসো। ওর হাত ধরে বসাই।

চুপ করে বসে থাকে নাদিরা। কিভাবে শুরু করবে বুঝতে পারছে না বোধহয়। এতদিন কেটে গেল তবু ওর সঙ্কোচ গেল না। দারার নিশ্চয় ভালোই লাগে ভীরু নম্র স্বভাব।

—দারার তসবীর আঁকা কেমন চলছে নাদিরা?

—অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছে।

—সে কি? ছাড়ল কেন?

—বলতে পারি না।

—অমন খেয়ালে চললে কোনোটাই হবে না।

—এখন আবার সঙ্গীত শিক্ষার ঝোঁক চেপেছে।

—সে আবার কি!

—বুন্দেলা রাজা ছত্রশালের গান শুনে মুগ্ধ হন। তারপরই গানের দিকে ঝোঁক।

—বুন্দেলা রাজা? তিনি তো দরবারে আসেননি কখনো।

—এসেছিলেন। আপনি তখন অসুস্থ।

—তাই হবে।

হঠাৎ নাদিরার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সজোরে আমার হাত চেপে ধরে বলে ওঠে,—কিন্তু আপনি তো দেখেছেন তাঁকে।

—আমি?

—হ্যাঁ আপনি। নিশ্চয়ই দেখেছেন। তবে তা মনে থাকবার কথা নয়। অমন সময় কারও কিছু মনে থাকে না।

—কবে দেখলাম?

—সেই দুর্ঘটনার দিনে।

—কত লোক সেদিন দরবার ছেড়ে মজা দেখতে এসেছিল।

—কিন্তু তিনি যে আপনার আগুন নিভিয়েছিলেন। আপনার কথা শুনে কেউ সাহস পায়নি এগোতে। তিনি সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে আপনাকে জড়িয়ে ধরলেন। তবেই তো বাঁচলেন আপনি। সামান্য আহতও হয়েছিলেন তিনি।

আমার বুকের মধ্যে কাঁপতে থাকে। চোখের সামনে আবার অন্ধকার হয়ে আসে যেন। কোনোরকমে নাদিরাকে চলে যাবার জন্যে ইঙ্গিত করি। মাথার দিকে দু' হাত ছড়িয়ে উপুড় হয়ে শুই। ছত্রশাল— ছত্রশাল—ছত্রশাল। প্রশ্ন না করতেই উত্তর পেয়ে গেলাম। ছত্রশাল। গায়ক সে। আমি জানতাম এমন একটা কিছু হতেই হবে। দারা মুগ্ধ হয়েছে ওর গানে।

আবার কি আসবে সে? আসবে। আমাকে দেখেছে—আমার দেহ স্পর্শ করেছে। সে আসবে। আমার মন ডেকে বলছে, সে আসবেই।

সে এলো। আরও অনেক পরে।

জাহানারার শত স্বপ্ন মিথ্যে হতে পারে। কিন্তু তার মন ডেকে যা বলে তা কখনো মিথ্যে হয় না। তাই নিজের মনকে যেমন ভালোবাসি, তেমনি ভয়ও করি।

ঝরোকার পাশে সেদিনও দাঁড়িয়েছিলাম। দৃষ্টি ঘুরে মরছিল দরবারের প্রতিটি মানুষের চোখে। মন ভরে উঠেছিল হতাশায়। সহসা দেখলাম প্রবেশ পথ দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে এক পুরুষ। চমকে উঠলাম। ও চাহনি ভোলবার নয়। আমার গাল দুটি লাল হয়ে ওঠে কি? জানি না। সাক্ষী নেই কেউ। কোয়েল চলে যাবার পর থেকে একাই এসে দাঁড়াই এখানে। কিন্তু বুক যে বড় বেশি ওঠানামা করছে। মনে হয়, যতটা প্রশ্বাস সাধারণত আমি নিই তার চেয়েও বেশি বাতাস চাইছে আমার বুক। হাঁপিয়ে উঠি।

বাদশাহের একেবারে সামনে এসে অভিবাদন করে সে। বাদশাহ উঠে দাঁড়ান। বহু সম্মানের অতিথি কিংবা আমীর-ওমরাহ ছাড়া বাদশাহ নিজে কখনও উঠে দাঁড়ান না। নিজের পিতার প্রতি মন আমার প্রসন্নতায় ভরে যায়।

—ছত্রশাল, আপনার কাছে আমি ঋণী—সে কথা আবার স্বীকার করছি।

ছত্রশালের জবাব আমি শুনতে পাই না। চাইনি শুনতে। কারণ যেটুকু সন্দেহের অবকাশ ছিল তাও ভেঙে দিয়েছেন বাদশাহ। নানান চিন্তার জাল আমার মস্তিষ্কে। তবু তার মধ্যেও এটুকু আমি ভাবতে পেরেছি যে ছত্রশাল নয়, রাজা—আমি ওকে ছোট্ট করে 'রাজা' বলেই ডাকব।

ছত্রশাল সামনের একটি আসন গ্রহণ করেন। তাঁর পাশে নজরৎ খাঁ উপবিষ্ট। তুলনা হয় না। দেহে নজরৎ কম সুন্দর নয়। কিন্তু দেহের মধ্যেও সব মিলিয়ে দেহাতীত এক সৌন্দর্য রয়েছে রাজার যার তুলনা সহসা মেলা ভার। সেই সৌন্দর্য এক অপূর্ব আভিজাত্য এনে দিয়েছে তার বসবার ভঙ্গিতে, তার দৃষ্টিতে। আমীর হয়ে জন্মালেই এ জিনিস পাওয়া যায় না—এ জিনিস আল্লার দান। নিজের চেষ্টায় যেটুকু পাবার নজরৎ খাঁ তা পেয়েছে, কিন্তু চেষ্টার অতিরিক্ত যে জিনিসটি রয়েছে সে তা কি করে পাবে?

দারাকে বলা ছিল যে ঝরোকার ছিদ্র দিয়ে ওড়নার প্রান্ত গলিয়ে দিলে সে বুঝবে যে তাকে আমি ডাকছি। ঝরোকার পেছনে আমি থাকলে সে তাই ঘন ঘন চায় এদিকে। কিন্তু আজ সে একবারও চাইছে না, বহুক্ষণ আগেই আমার ওড়নার অনেকখানি ছিদ্রপথে ওদিকে চলে গিয়েছে। হয়তো হাওয়ায় দুলছে ওদিকে আমার চুমকি-বসানো মসলিন।

বড় রাগ হয়। দারার খেয়াল নেই। সঙ্গীতগুরুকে পেয়ে সে আত্মহারা। তার মুখ চোখের চেহারা দেখেই বোঝা যায়। নিজের আসন ছেড়ে সে গিয়ে রাজার পাশে শূন্য আসনে বসে তার হাতের ওপর হাত রাখে। রাজাও তার হাতখানায় চাপ দেয়। দারার কক্ষ হলে দারার মুখ দিয়ে কথার ফিনকি ছুটত। বড় রাগ হয়।

শেষে একসময় দয়া করে দারা এদিক-ওদিকে দৃষ্টি ফেলে। দেখতে পায় সে মসলিনের চুমকির উজ্জ্বলতা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। বাদশাহের পানে মুহূর্তকাল চেয়ে থেকে ঝরোকার দিকে এগিয়ে আসে। আমি আবার হাঁপিয়ে উঠি।

লজ্জিত হাসি হেসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে সে বলে,—একেবারে মনে ছিল না।

—তা থাকবে কেন? অমন ভুলো মন নিয়ে নাদিরার পাশে বসে থাকা যায়। মসনদে বসার দুরাশা করা যেতে পারে না।

—খুব রেগেছ?

—না, রাগব কেন? মুঘল-শাহজাদীদের রাগের কোনো মূল্য আছে?

—জাহানারা!

—দারা, এতদিন পরে ছত্রশাল এলেন। তাঁর দয়াতেই আমি গুলরুখকে অনুসরণ না করে এখানে

দাঁড়িয়ে আছি। অথচ তোমাদের কারও একবারও মনে হলো না যে আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে পারি?

—অন্যায় হয়েছে। আমি এখনি নিয়ে আসছি তাঁকে।

—তুমি না এলেও চলবে। শুধু তাঁকে পাঠিয়ে দাও।

দারা চলে যেতেই আমি দেওয়ান-ই-খাসের পাশে ছোট একটি ঘরে গিয়ে বসি। সে ঘর বেগম এবং শাহজাদীদের সঙ্গে বাইরের লোকদের সাক্ষাতের জন্যে নির্মিত। সে ঘরের সবটুকুতে ঝরোকার সূক্ষ্ম কাজ। বেগম শাহজাদীরা যাকে কৃপা করে, ঘরটির একপাশে এসে সে দাঁড়িয়ে মুঘল-নারীদের সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন করে। অথচ ঠিকমতো দেখতে পায় না ঝরোকার ভেতর দিয়ে। দরবার থেকে এই সাক্ষাৎকার দেখা যায় না।

কিছুক্ষণ পরে ভারী পায়ের শব্দ এগিয়ে আসে। নজরৎ খাঁয়ের মুখের অবস্থা একবার কল্পনা করি। তার পাশের আসন ছেড়ে রাজা এদিকে আসায় তার মনে ঝড় বইছে কি? জানি না। জানার মতো মনের অবস্থা আমার নেই। আমি ভাবি, কিভাবে কথা শুরু করব।

রাজা এসে দাঁড়ায় নির্দিষ্ট স্থানে।

—রাজা!

আমার কণ্ঠস্বরে আরও মধু ঢালতে পারতাম কি? ঝরোকার ভেতর থেকে দেখতে পাই ছত্রশালের উন্নত বক্ষ ফুলে ওঠে।

—রাজা, কাকে আপনি বাঁচালেন একবার দেখতেও ইচ্ছে হয়নি কি?

বলা হলো না। আমি জানি এর চেয়েও সুন্দর কথা আমি বলতে পারতাম। কিন্তু পারলাম না। অনেক চেষ্টা করেও পারলাম না। অতি সাধারণভাবে অতি নগণ্যভাবে তাই নিজের দীনতা প্রকাশ করে ফেলি।

জবাব দেবার আগে অপেক্ষা করে রাজা। এমনভাবে কথার সূত্রপাত করব, সে কল্পনা করেনি। ভেবেছিল, নিয়মমাফিক একটু কৃতজ্ঞতা, একটু কুশল প্রশ্ন করে ইতি টেনে দেব। ভাবেনি আমার প্রথম প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন দাবির সুর মেশানো থাকবে।

ধীরে ধীরে বলে রাজা,—বিপদ থেকে রক্ষা করা রাজপুতদের ধর্ম শাহজাদী। আর শাহজাদীকে রক্ষা না করা অপরাধ।

—সেই অপরাধের ভয়েই তবে সেদিন—

—না না। কোনো কিছুই মনে হয়নি সে মুহূর্তে।

—কিছুই নয়?

রাজা ইতস্তত করে।

—বলুন।

—শাহজাদী, রাজপুতরা তাদের মনের মধ্যে অনেক কথাই চেপে রাখতে পারে। কিন্তু মুখ ফুটে একবার বলতে শুরু করলে মিথ্যা বলতে পারে না। আপনি আমাকে প্রশ্ন করবেন না।

—কিন্তু প্রশ্ন যে আমি করবই রাজা। একটা কথা জেনে রাখুন, যাঁর দয়ায় আমি আজ বেঁচে আছি তিনি যদি সত্যি কথা বলেন, সে সত্যি যত অপ্রিয় হোক না কেন, অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে না।

—সে কথা ঠিক বলে মেনে নিলেও এখানে মুঘল-বংশ, রাজনীতি, আরও অনেক আদব-কায়দার প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। আপনি শাহানশাহ সাজাহানের দুহিতা আর আমি তাঁর অনুগত সামান্য এক রাজা।

—আপনি তো কোনো রীতিই মানেন না।

—সেকি শাহজাদী!

—আমার কথা শুনে নজরৎ খাঁ তো সেদিন আমাকে রক্ষা করতে সাহস পাননি। আপনি কেন এগিয়ে এলেন? আমি শাহজাদী, আমার আদেশ অমান্য করেছেন আপনি।

রাজা চুপ করে থাকে। সে বোধ হয় জবাব খুঁজে পায় না। খুব লজ্জা হয় আমার। অমন দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ পুরুষ আমার সঙ্গে কথায় হেরে গেল।

—তাই আমি বলছিলাম রাজা, ওসব ভুলে যান। ভাবুন আমরা দু'জন সাধারণ মানুষ। এখানে সত্যি কথা বলার বাধা নেই।

—তবু আছে।

—কোন্ বাধা?

—আপনি নারী।

—তবে আমি কি বুঝব নারীর কাছে পুরুষেরা সত্যি বলে না কখনো?

—বলে, নিশ্চয়ই বলে। তবে নারীবিশেষকে।

—আর আমি সেই বিশেষ নারীটি তাই না রাজা?

রাজা আবার চুপ। বড় সাংঘাতিক লোক দেখছি। নজরৎ হলে এতক্ষণ কি করত? সহজেই অনুমান করতে পারি। হাতে বেহেস্ত পেত সে। গলে পড়ত।

—রাজা, আগুনে আমি কতটা কুৎসিত হয়েছি?

—আপনি কুৎসিত হননি।

—কে বললে?

—সব খবর আমি রাখি।

—ও! যদি হতাম?

—আফশোষ থাকত।

বড় কাটা কাটা কথা বলে। ভেতরে কি রস বলে পদার্থ নেই? চোখের দৃষ্টি তো অন্য কথা বলে। সে দৃষ্টির মধ্যে চূড়ান্ত কিছু আছে।

হঠাৎ আমার চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। রাজা বুঝতে পারে না। সে ঝরোকার ওপাশে দাঁড়িয়ে।

—রাজা, সত্যি কথা জানতে চাই না। কিন্তু আপনাকে আমি জীবনে ভুলব না।

—শাহজাদী কাঁদছেন? ছত্রশাল পাথরের জালের ওপর হাত রেখে ছটফট করে।

—না কাঁদব কেন?

দরবার-কক্ষের উত্তেজিত আলোচনা ভেসে আসে। দিল্লিতে যাবার দিন স্থির হচ্ছে সম্ভবত। আর বেশি দেরি নেই। বাদশাহ দিল্লি গিয়ে দেখে এসেছেন ইতিমধ্যে। প্রাসাদ নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ। আমাদের দু'জনার কথা এ-সময়ে কারও মনে নেই। শুধু নজরৎ ছাড়া।

ছত্রশাল ঝরোকার ওপর মাথা রেখে বলে,—আমি সত্যি কথাই বলব শাহজাদী।

আমার স্বর কেঁপে ওঠে,—কিন্তু আমি তো সেই বিশেষ নারী নই।

—হ্যাঁ। আপনি সেই নারী। সন্দেহ নেই তাতে। শাহজাদী, সেদিনের মতো ঘটনা যে-কোনো জায়গায় ঘটলেই আমি ছুটে যেতাম। কিন্তু সেদিন আমার মনের প্রথম কথাটি ছিল এই অপরূপাকে পৃথিবী থেকে মুছে যেতে দেব না, কিছুতেই নয়। তাই আপনার আদেশ অমান্য করেছিলাম। আজ আপনি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। এবারে শাস্তি দিন।

এবারে কি বলব? মাথায় যে আসে না। সময় চলে যায়। ও পক্ষও নীরব। অথচ অনেক কিছুই যে বলার আছে। যদি শাহজাদী না হতাম, বলতে পারতাম।

—শাস্তি আপনি পেতে চান রাজা?

—হ্যাঁ, অন্যায়ের শাস্তি মাথা পেতে নিতে রাজপুতরা অভ্যস্ত।

—জানি। খুব ভালভাবে জানি। মুঘল-দুহিতাকে রাজপুত সম্বন্ধে বলবেন না। এই দেহের

অনেকটাই যে রাজপুত।

একটু থেমে ধীরে ধীরে বলি,—শাস্তি আমি দেব আপনাকে। কঠিন শাস্তি।

আমার কথা বলার ভঙ্গি কতখানি কঠিন হলো বলতে পারি না। কারণ অপরদিকে রাজার মুখে কৌতুকের হাসি ছড়িয়ে পড়ে। সে বলে,—শাস্তির কথা কি দরবার কক্ষে শুনতে পাবো শাহজাদী?

—না। এখনি বলছি। আজ দরবার-শেষে সবাই যখন চলে যাবে, তখন দারাকে ডেকে নিয়ে আপনি এই ঝরোকার সামনে গালিচায় এসে দাঁড়াবেন। আমি তানপুরা আনিয়ে রাখছি।

—শাহজাদী!

—কোনো প্রতিবাদ নয়। আমার হুকুমের নড়চড় হয় না। এখানে বসেই আমি শুনব আপনার সঙ্গীত।

শাহজাদী, আপনার দেহটিকে রক্ষা করার জন্য সেদিন যখন ছুটে গিয়েছিলাম, তখন কিন্তু কল্পনাও করতে পারিনি আপনার মন এত সুন্দর।

—এত সহজেই আমার মন জানা হয়ে গেল?

—হ্যাঁ। এতক্ষণ ধরে তবে কি বৃথাই কথা বললাম?

—আর কিছু জেনেছেন?

একটু ইতস্তত করে রাজা বলে,—হ্যাঁ। কিন্তু তাতে কি কিছু এসে যায়? —যায় বৈকি। আমার গলা কাঁপে।

রাজার প্রশস্ত ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে। সে বলে,—মাঝখানে পাথরের জালের ব্যবধান, শাহজাদী। চেষ্টা করলে বোধহয় আমি এ জাল ভেঙে ফেলতে পারি।

—শুধু শুধু অত শক্তি ক্ষয়ের প্রয়োজন নেই। সঙ্গীত-শেষে দারা আপনাকে অঙ্গুরীবাগে পৌঁছে দেবে। সেখানে দেখা হবে। এখন আপনি দরবারে ফিরে যান। মুখখানা যতটা সম্ভব ফ্যাকাশে করে মাথা নিচু করে টলতে টলতে গিয়ে আসন সংগ্রহ করুন।

ছত্রশাল অট্টহাস্য করে উঠতে গিয়ে চেপে যায়।

সে চলে যেতে আমি ভাবি, বাদশাহ সাজাহানের দুহিতা হয়েও বড় তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে গেলাম। যেন এতদিন ধরা দেবার জন্যেই উন্মুখ হয়ে বসেছিলাম। নিজের দৈন্য এতটা কিছুতেই প্রকাশ করতাম না। কিন্তু ও যদি হঠাৎ আবার চলে যায়? তাছাড়া মাঝখানে রয়েছে নজরৎ খাঁ। তার প্রতি দারার প্রীতির প্রাবল্য। রাজার কাছে একটু সুলভ হলামই বা।

সঙ্গীতের রস জীবনে প্রথম আস্বাদন করি। এতদিন যাকে সঙ্গীত বলে ভাবতাম সবই ঠুনকো বোধহয়। মুগ্ধ ভক্তের মতো বসেছিল দারা রাজার সম্মুখে। তার চোখে জলের আভাস।

সঙ্গীত শেষ হবার পরও একটা স্তব্ধতা বিরাজ করে। সুর ভেসে বেড়ায় অনেকক্ষণ।

শেষে দারা উঠে দাঁড়ায়। আমার কাছে এসে বলে,—ছত্রশালের সঙ্গে আজই দেখা করবে জাহানারা?

—হ্যাঁ। অঙ্গুরীবাগে পৌঁছে দিও।

দারা হেসে বলে,—ভুলে যেও না ছত্রশাল হিন্দু।

—তুমি ভুলে যেও না দারা, মুঘল-হারেমেও অনেক হিন্দু রমণী এসেছেন।

—ভুলে যেও না ছত্রশাল বিবাহিত।

—তুমি ভুলে যেও না দারা, সাজাহানের মমতাজ ছাড়াও অন্য বেগম আছেন।

—ভুলে যেও না জাহানারা, নজরৎ খাঁয়ের মতো শক্তিশালী আমীরকে হারালে বাদশাহ দুর্বল হয়ে পড়তে পারেন।

—তুমিও ভলে যেও না দারা, ছত্রশাল নজরৎ-এর চেয়ে কম শক্তিশালী নন।

এতক্ষণ মুচকি হেসে, এবারে জোরে হেসে উঠে দারা বলে,—বেশ, শেষ রক্ষা হলে হয়।

আমি একটু গম্ভীর হই। নজরৎ সব খবরই পাবে। সে সহ্য করবে না। ভায়ে ভায়ে দিনে দিনে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা মোটেই প্রীতির নয়। সুজা বাংলাদেশ থেকে মাঝে মাঝে লোক পাঠিয়ে এখানকার হালচাল জেনে নেয়। আওরঙজেবের লোক তো হামেশাই আসে। সে সময়ে রোশনারা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আওরঙজেবের প্রভাব থেকে তাকে মুক্ত করতে পারিনি। এই সমস্ত সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বের ভেতরে অসন্তুষ্ট নজরৎ দরবারে থাকলে বাদশাহ আর দারার ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। কিন্তু রাজনীতির ওপরেও আর একটি জিনিস রয়েছে—যুক্তিতর্ক ভেসে যায় যেখানে।

—তুমি যদি নারী হতে দারা, তুমি কি করতে? ছত্রশালকে এখান থেকে বিদায় দিতে পারতে? বলো, তোমার ওপর নির্ভর করছি।

বেশ কিছু সময় ভেবে নেয় দারা। তারপর বলে,—আমি অন্য কিছু করার কথা ভাবতে পারতাম না। নারী না হয়েও যে মজে গিয়েছি।

এবারে আমার হাসির পালা—তবে?

—আমি ওঁকে অঙ্গুরীবাগে পৌঁছে দিচ্ছি। কিন্তু বাইরে আনার ব্যবস্থা তুমি করবে। খোজাদের মুখোমুখি যেন না হন উনি।

—সে চিন্তা আমার।

তাড়াতাড়ি নিজের কক্ষের দিকে ছুটি। ভাল করে সাজতে হবে। যত ভাল করে পারি শরীরের সমস্ত অংশ আতরের গন্ধে ভরিয়ে দিতে হবে। রাজাকে মুগ্ধ করতে হবে। রাজাকে বন্দী করতে হবে। এমনভাবে বন্দী করতে হবে যাতে নিজের রাজ্যে বসেও দরবারে আসার জন্যে মন তার ছটফট করে।

আজ লিখতে বসে বহুদিন পূর্বের এক সন্ধ্যার ছবি স্পষ্ট মনের মধ্যে ভেসে উঠছে। সে ছবির স্মৃতি যেন মধুর, তেমনি বিষাদময়। দু'খানি কিতাব আমাকে আর রোশনারাকে উপহার দিয়েছিলেন পিতা। রাগে ঘৃণায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল রোশনারা তার কিতাব। সযত্নে গুলিস্তানের তৃণের ওপর থেকে আমি সেটি তুলে নিয়েছিলাম। কথা দিয়েছিলাম রোশনারাকে, সত্যি কথা লিখব আমি কিতাবে। কথা রেখেছি আমি। যা সত্যি বলে উপলব্ধি করেছি, তাই লিখেছি। অনেক কিছুই বাদ গিয়েছে জানি, কিন্তু উপায় নেই। সব কথা লেখা যায় না।

অবচেতন মনের কোথাও হয়তো রোশনারার প্রতি ছিটেফোঁটা কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছি তার কিতাবখানা দেবার জন্যে। তাই হয়তো তার ছবি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েনি আমার লেখায়। ভালই হয়েছে। সে আমার বোন। মমতাজ বেগমের গর্ভে তার জন্ম। শুধু শুধু কেন এক ছোপ কালি মাখিয়ে দিই তার মুখে। তাছাড়া আমি লিখছি নিজের কথা। এর মধ্যে রোশনারা আপনা হতে যতটুকু আসে আসুক। চেষ্টা করে আমি আনতে যাব না। কাউকেই আনব না। আনতে গেলে আমার এই রচনা হয়তো ঐতিহাসিক দলিলের গুরুত্ব পেয়ে বসবে। আমি তা চাই না। আমি চাই, ভবিষ্যতের কেউ যদি মুঘল-বংশের গৌরব আর অফুরন্ত ঐশ্বর্যের কথা শুনে বিস্ময়াবিষ্ট হয়, আমার কাহিনী পড়ে সে যেন সেই সঙ্গে একটি দীর্ঘশ্বাসও ফেলে। মুঘল-বাদশাহদের হারেম যে বেহেস্ত হয়, সে যেন মর্মে মর্মে তা অনুভব করে নিজের ক্ষুদ্র কুটিরে বসে শান্তি পায়।

দ্বিতীয় কিতাবে লিখতে বসেছি। কিন্তু কলম যেন কিছুতেই আঁচড় কাটতে চায় না। চলতে চায় না লেখনী। ভেবেছিলাম শুরু করব আমার রাজার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের ঘটনা নিয়ে। কিন্তু তা পারছি কই? কিতাবখানি সম্ভবত অশুভ মুহূর্তে খুলে বসেছি।

আজ সকালে খবর এলো নুরজাহানের বুকের স্পন্দন চিরতরে থেমে গিয়েছে। নাজীর এসে খবরটি দেবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম বাদশাহের কাছে। কিন্তু তিনি বড় ব্যস্ত। কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতি-জড়ানো আগ্রার এই প্রাসাদ ছেড়ে চলে যেতে হবে। চিরকালের মতো যেতে হবে। দিল্লি রওনা হবো আমরা। আর কখনো এখানে এসে এই অতি মধুর অতি পরিচিত জায়গাগুলি দেখবার সুযোগ হবে কিনা জানি না।

বাদশাহকে নুরজাহানের মৃত্যু সংবাদ জানাতেই তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন,—তোমাকে কে বললে?

—হারেমেই খবর পেলাম।

—সব ব্যবস্থা হয়েছে। তুমি ভেবো না।

—কখন যাব?

—কোথায়?

—জেসমিন প্রাসাদে?

—তুমি? না, তুমি না। শুধু দারা।

—আপনি?

—আমিও না।

—বাবা, মস্ত অপরাধ করতে চলেছেন।

—জানি জাহানারা। নূরজাহান বেগম যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিনই শুধু আমার শত্রু ছিলেন।

—তাও ঠিক নয়।

বাদশাহ চকিত দৃষ্টি ফেলেন আমার দিকে।

—মৃত্যুর আগে মা গিয়েছেন তাঁর কাছে। আমিও গিয়েছি পরে। তাঁর অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছিল। আমার হৈতিষী ছিলেন তিনি।

—হুঁ।

মায়ের কথা বলার পরই নিজের কথা বলায় তাঁর মুখ বন্ধ রইল।

—আজ এ সময়ে—

—না জাহানারা! বাদশাহ হতে হলে প্রতি ক্ষেত্রে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলা যায় না।

—কিন্তু মৃত্যুটি যে মানুষের স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি, বাবা!

—তবু। হারেমে যাও জাহানারা।

চলে আসার জন্য প্রস্তুত হই। তিনি ডেকে নিয়ে বলেন,—চোখের জল মুছে ফেল।

হতাশ হই। নুরজাহানের মুখখানা বার বার মনে পড়ে। সে মুখ এখন প্রশান্ত, সে আঁখি এখন নিমীলিত। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের স্মৃতি তাঁর মনকে আর দোলা দিতে পারে না।

নিজের কক্ষে গিয়ে অঙ্গুরীবাগের দিকে চেয়ে থাকি। ওই গুলআশরফী ফুলের পাশে সেদিন রাজাকে কত কথা শুনিয়েছিলাম। নির্বাক হয়ে শুনেছিল রাজা। হয়তো বাচাল ভাবছিল আমাকে। একজন পরপুরুষের সামনে ওভাবে কেউ বলতে পারে না। ভাবুক বাচাল। তার পরের ঘটনা তো প্রমাণ করে দিয়েছিল ছত্রশাল আমার বন্দী। আজীবন আমার বন্দী।

সেদিনের সেই ঘটনার পর ভেবেছিলাম বুঝিবা সমস্ত মুঘল সাম্রাজ্যেরই সুদিন এলো। নিজের ভরপুর হৃদয় নিয়ে সব কিছুকেই অপূর্ব বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু সে যে কত বড় ভুল, নুরজাহান বেগমের মৃত্যু তার প্রমাণ দিচ্ছে। কেন যেন মনে হচ্ছে, আরও আছে—আরও অনেক বাকি আছে। এর ঘোরতম দুঃসময় যেন এগিয়ে আসছে ধীর-নিশ্চিত পদক্ষেপে। দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তর, নুরজাহানের মৃত্যু, বাবার মনোভাব সেই ভয়ঙ্কর দিনেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে মাত্র। জানি না, এ আমার কল্পনা

কিনা—অলস মনের উদ্ভট কল্পনা। তাই যেন হয় আল্লা!

আগ্রার দিন শেষ হয়ে এলো।

দু'দিন পরে ঘুম থেকে চোখ মেলে এই আগ্রাকে আর দেখতে পাব না। স্মৃতিতে স্থান পাবে শুধু। ওই অঙ্গুরীবাগ, জানালা খুললে যার শত শত ফুলের গন্ধ ছুটে এসে মনকে মাতিয়ে তোলে, যার অপূর্ব বৃক্ষরাজি আর তৃণগালিচা তৈমুরলঙের রাজধানী সমরখন্দ-এর 'কানিবুল' উদ্যানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়. দু'দিন পরে তা স্মৃতির গর্ভে স্থান পাবে। অঙ্গুরীবাগ হবে অতীতের জিনিস। বাদশাহ স্থান ত্যাগ করলে এ উদ্যান নষ্ট হবে।

ওই যে শিশমহল। দিল্লিতেও হয়তো শিশমহল তৈরি হয়েছে। কিন্তু স্মৃতিহীন সে মহলের আভিজাত্যহীন চাকচিক্য মনকে এমনভাবে দোলা দেবে না কখনো। বাদশাহ আকবরের সাধের দশ-পঁচিশীর অস্তিত্ব সেখানে থাকবে না। আর থাকবে না তাঁর খা-আব-বাগ কক্ষ। খা-আব-বাগের কথা মনে হতেই বুকের ভেতরে কেঁদে ওঠে। মা থাকতেন সেখানে।

শেষবারের মতো কক্ষটি দেখার জন্যে ঘর ছেড়ে বার হই। এই সন্ধ্যায় আর কেউ তার আশেপাশে থেকে আমার ভাবাবেগে বাধা সৃষ্টি করবে না নিশ্চয়। শুধু আর একজন মাত্র থাকতে পারেন সেখানে। স্বয়ং বাদশাহ। আগে অনেকবার দেখেছি। কিন্তু আজ তাঁরও থাকার সম্ভাবনা বিশেষ নেই। কারণ আজকাল যেন তিনি তাঁর অতি প্রিয় মমতাজ বেগমের কথা ভুলে গিয়েছেন। আগের মতো আর ঘন ঘন তাজমহলের দিকে চেয়ে থাকেন না। নিজের অজ্ঞাতে চোখের কোণে আর অশ্রুও দেখা যায় না তাঁর। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই অনেকের মুখে শুনি, কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। হারেমে কত কথাই তো রটে। আমাকে কেন্দ্র করে যে, জঘন্য অপবাদটি রটেছিল, তাও তো এই হারেম থেকেই। তবু অনেক সময়ই বাদশাহের দিকে চেয়ে থাকি আর অবাক হই তাঁর পরিবর্তন দেখে। আগ্রা ছেড়ে যাবার জন্যে তিনি অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়েছেন।

মায়ের ঘরের পর্দা এখনো ঝুলে থাকে আগের মতোই। সেই পর্দা উঠিয়ে আস্তে আস্তে পা বাড়াই। আগের মতো ঝাড়ের আলো আর এখন ঘরকে আলোকিত করে না। কোনো বৃদ্ধা নাজীর শুধু একটি করে বাতি রেখে যায় ঘরের মাঝখানে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায়। যে বাতি হয়তো বেশিক্ষণ জ্বলেও না। আজও বাতি জ্বলছিল—হয়তো শেষ বাতি। শাহানশাহ্ সাজাহানের উপস্থিতিতেই যখন এ দশা, তিনি চলে গেলে যে কী হবে সহজেই অনুমান করা যায়। চোখ দুটো জ্বালা করে, অশ্রু জমা হয়।

মায়ের অনেক স্মৃতিই মনে পড়ছিল। শেষ দিনে এই গালিচায় বসে পড়ে শিশুর মতো কেঁদেছিলেন বাদশাহ। আর আজ?

দেয়ালে টাঙানো পর্দার আড়ালে মায়ের তসবীর রয়েছে। সে হাসি মুখখানি ফুটে উঠবে পর্দা সরালেই। কিন্তু না, এখন নয়। ঘর ছেড়ে যাবার সময় মায়ের কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নেব। দিল্লিতে তাঁর এ তসবীর যাবে না। বাদশাহের হুকুম। এমন অদ্ভুত হুকুম কেন যে তিনি দিলেন জানি না। দারা এ সবের একটা কারণ আবিষ্কার করেছে। সেটা কতখানি সত্যি বোঝা কঠিন।

সে বলে, মায়ের কথা বাদশাহ কিছুতেই ভুলতে পারেন না। ভুলতে পারেন না বলেই তাঁর শেষ কয়েক গুচ্ছ কাঁচা চুল দ্রুত সাদা হয়ে যাচ্ছে। তিনি কোনো কাজে মন বসাতে পারেন না। বিবেকের কাছে সব সময়েই অপরাধী থাকেন। তাই আগ্রা ছেড়ে যাবার জন্যে পাগল হয়েছেন। মমতাজ বেগমের কথা জোর করে ভুলে যেতে চাইছেন তিনি। তাই তাঁর এই কঠোরতা। তসবীর অবধি নিয়ে যেতে দেবেন না দিল্লিতে।

দূরে চন্দ্রকিরণ স্নাত তাজমহল। শিল্পীর সৃষ্টি তাজমহল। সে শিল্পী এখন কি করছে? কোয়েলের কোলে মাথা রেখে হয়তো শুধু কেঁদে চলেছে তার অজ্ঞাত গ্রামের কুটিরে। সেখানেও চাঁদ উঠেছে।

মায়ের সমাধির পাশে এতক্ষণ নিশ্চয়ই কোরাণের পুণ্যবাণী সুর করে পাঠ করা হচ্ছে। কিন্তু শুনছেন কি তিনি? তাঁর প্রিয়জনেরা তাঁকে ছেড়ে যে চলে যাচ্ছে। তিনি স্থির হতে পারছেন না। আজ তিনি কি সেখানে রয়েছেন? না না। আজ তিনি এখানে।

সহসা দমকা হাওয়া জানালা দিয়ে ঘরে ঢোকে। দরওয়াজার পর্দা প্রচণ্ডভাবে দুলে ওঠে। মায়ের তসবীরের পর্দা ওপর দিকে উঠে কিসের সঙ্গে যেন উৎকটভাবে আটকে যায়। ভেসে ওঠে তাঁর দেহ, মুখ অবয়ব।

বাতি নিভে যায়। অন্ধকার।

কানের কাছে কে যেন ফিসফিস করে বলে ওঠে,—চলে যেও না জাহানারা।

কে? মা? নূরজাহান?

কে? গুলরুখ?

চিৎকার করে উঠি,—না না। আমি যেতে চাই না। আমি চাই না যেতে।

চারদিক থেকে যেন হাওয়ায় কথা বলে,—যেও না, যেও না।

—না না গুলরুখ। আমি যেতে চাই না। বাদশাহ—তিনিই সব কিছুর মূলে।

ছুটতে থাকি। কোনদিকে দরজা? যেদিকে ছুটি সেদিকেই দেয়ালে বাধা পাই। একি হলো? ওই তো পর্দা। সাঁ সাঁ করে আবার দমকা হাওয়ায় তাড়া করে। পর্দাগুলো আমার পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে যায়—বেঁধে ফেলে আমাকে। পড়ে যাই আমি।

জ্ঞান হতে বাদশাহের উদ্বেগ-কাতর মুখ চোখে পড়ে। হাসার চেষ্টা করি।

—ভাল বোধ করছ জাহানারা?

—হ্যাঁ।

—কি হয়েছিল?

—কিছু না।

পিতা মুখ নিচু করেন। কি যেন ভাবেন। শেষে বলেন,—আমি এখানে না এলে কতক্ষণ পড়ে থাকতে ঠিক নেই।

—আমি ভেবেছিলাম আপনি আর আসেন না এখানে।

বাদশাহ বিচলিত হন। বলেন,—আসি জাহানারা। সবাই তোমরা আমাকে যা ভাবতে শুরু করেছ আমি ঠিক তা নই।

—ক্ষমা করবেন বাবা।

তাঁর চোখে জল দেখি। মায়ের তসবীরের পর্দা তখন আর উঠে নেই। স্বাভাবিকভাবেই ঝুলছে। বাতিটি জ্বলছে। বোধহয় বাদশাহ জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

তিনি আবার প্রশ্ন করেন—কি হয়েছিল জাহানারা?

—কিছু নয়, বাবা।

—আমি জানি।

—কি জানেন?

—সে তোমাকে ভালোবাসত খুব। আর আমাকে।

—কি বলছেন বাবা!

—সত্যি কথা বলছি। এই বাতিটা যেমন সত্যি, ঠিক তেমনি।

—আপনি এ সবে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন?

—না করলে যে উপায় নেই। মনে হয় ও আমাদের একেবারে ছেড়ে গিয়েছে কি করে তা সহ্য করা যায় বল তো?

স্তব্ধ হয়ে থাকি।

বাদশাহ গম্ভীর স্বরে বলেন,—তবে আর বিশ্বাস করব না। মমতাজ কোনোদিন পৃথিবীতে ছিল, ভুলে যাব সেকথা। তাই তো দিল্লি যাচ্ছি। তাই ওর তসবীর এখানেই পড়ে থাকবে।

অবাক হয়ে পিতার মুখের দিকে চেয়ে থাকি। তিনি অনেকক্ষণ আপন মনে ভাবেন। শেষে বলেন—চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মেয়ে হয়েও তাঁর সঙ্গে হারেমের দিকে যেতে সঙ্কোচ হয়। তাই বলি,—আমি একাই যাবো বাবা।

দাঁড়িয়ে পড়েন তিনি। ভ্রূ কুঞ্চিত হয় তাঁর। তারপর বলেন,—ও, আচ্ছা! হারেম বড় নোংরা জায়গা, তাই না জাহানারা?

—হ্যাঁ বাবা।

—তাই তো হারেমে যাই না। তোমার মা বেহেস্ত থেকে ছিটকে এসেছিলেন। চিন্তান্বিত হয়ে তিনি অন্যপথে প্রস্থান করেন।

দিল্লির পথে রওনা হই সকলে। চোখে আমার জল। রোশনারার মুখে হাসি, মন চঞ্চল। নতুন জায়গার দুর্নিবার আকর্ষণ তাকে পেয়ে বসেছে। তার দৃষ্টি সামনে। গাড়ির সামনের দিকে সে বসেছে। আমার দৃষ্টি পেছনে। আমি দেখছি কেমন ধীরে ধীরে তাজমহলের মিনারগুলি একসময়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার গম্বুজ আস্তে আস্তে কেমন ম্লান হয়ে আসছে। বার বার অবাধ্য চোখ দুটোকে মুছে ফেলি।

আমার ছোট বোনের মুখে অসহায় ভাব। তার দৃষ্টি সামনেও নয়, পেছনেও নয়। সে চেয়ে রয়েছে ওপরের দিকে। যৌবনের রেখা ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে তার মুখে, বুকে, নিতম্বে। সে হয়তো ভাবছে দিল্লিতেও এমন সূর্য ওঠে কিনা, দিল্লির আকাশে রাতে চাঁদের আলো ঝলমল করে কিনা। বড় অবহেলার মধ্যে মানুষ হয়েছে। শাহজাদী হিসাবে অনেক কিছুই সে জানে না, যা তার জানা উচিত ছিল।

আমাদের সামনের গাড়িতে রয়েছে দারা আর নাদিরা। নাদিরার ছোট ছেলে সিপারও রয়েছে তার কাছে। বড় ছেলে সুলেমান শুকো বাদশাহের গাড়িতে একেবারে সামনে। জাহাঙ্গীর যে গাড়িখানা উপহার পেয়েছিলেন সাগরপারের রাজার কাছ থেকে, তাই চড়ে বাদশাহ চলেছেন। পেছনে আরও কতশত গাড়ি। তাতে রয়েছে আমীর-ওমরাহ্‌দের পরিবার। আরও পেছনে রয়েছে রসদ। অশ্বারোহী সৈন্যদলকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একভাগ এগিয়ে গিয়েছে পথকে নিরাপদ করতে, অন্যদল রয়েছে পেছনে। তারও পেছনে রয়েছে হস্তী। চলতে চলতে কখনো আমরা যমুনা নদীর পাশে চলে আসছি, আবার কখনো দূরে সরে যাচ্ছি।

কল্পনা করতে বেশ লাগে, আমরা যেন বিরাট এক হজযাত্রীর দল। মক্কায় গিয়ে আমাদের যাত্রা শেষ। দূরে যেন দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি! মাঝে মাঝে তার পান্থপাদদের গাছ আর মরুদ্যান। ওই মরুভূমি-পথে যাত্রা শুরু করে শেষদিকে আমরা আমাদের পাদুকা আর মস্তকের আবরণ খুলে ফেলব। ভক্তিনম্র চিত্তে আমাদের পরমপবিত্র তীর্থস্থানের দিকে অগ্রসর হবো। পদতল প্রচণ্ড উত্তাপে আহত হবে। মস্তকের উপর অসহ্য রৌদ্র। তবু বিচলিত হবো না আমরা। মহম্মদের শুভ্র বস্ত্র শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাবার যে আর দেরি নেই। সে বস্ত্র স্পর্শ করতেই হবে। নইলে হজে এসে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করব না।

—এই!

চমকে উঠি। দেখি রোশনারা ডাকছে।

—অত কি ভাবিস বলতো? তবু যদি বুঝতাম—

—সন্ধে যে হয়ে এলো রোশনারা।

—হ্যাঁ। নামবি না?

তাই তো। আমাদের গাড়ি থেমে রয়েছে। ওদিকে শিবির ফেলা হচ্ছে। শতলোক কর্মব্যস্ত।

সে সন্ধ্যায় পাশের কোনো গ্রাম থেকে এক জ্যোতিষী বাদশাহের দর্শনপ্রার্থী হন। জ্যোতিষীদের বাদশাহ কখনো ফিরিয়ে দেন না। শিবিরের ভেতরে ডেকে আনা হয় তাঁকে। আমারও ডাক পড়ে। নিজের তাঁবু থেকে বার হয়ে জাল-ঘেরা পথে বাদশাহের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। জ্যোতিষী তখন হস্তবিচারে ব্যস্ত।

—ধীরে ধীরে তাঁর মুখ গম্ভীর হয়। কপালে চিন্তার রেখা পড়ে।

—কি দেখলেন?

—দেখছি আপনার অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ।

আমার মুখ রক্তশূন্য। বাদশাহও হতবাক। এমন স্পষ্ট ভাষায় তাঁর সামনে কেউ কখনো কথা বলে না।

বলে উঠি,—বাদশাহ হলেই ভবিষ্যৎ সব সময় উজ্জ্বল হয় না।

—তা মানি, কিন্তু এই হস্তের অধিকারীর ভাগ্যে রয়েছে অশেষ অপমান।

বাদশাহ রীতিমতো বিচলিত হন। আমার রাগ হয় জ্যোতিষীর ওপর। উত্তেজিত স্বরে বলি,—কোন্ স্বার্থান্বেষী আপনাকে পাঠিয়েছে? আপনি কি ভাবছেন এসব বলে বাদশাহের মনোবল ভেঙে দিতে পারবেন?

শান্ত হাসি হেসে তিনি উত্তর দেন,—না মা তা ভাবিনি। আমি বাদশাহের হিতৈষী। তিনি যাতে তাঁর বিপদের কথা আগে থাকতে জেনে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেন সে ব্যবস্থা করে যাব।

—কি ব্যবস্থা করবেন?

জ্যোতিষী আমার দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টি ফেলেন। তাঁর ভ্রূ-জোড়া কুঞ্চিত হয়। তিনি বলেন,—সব বলছি। কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ জানো কি?

—না।

আশ্চর্য। বাদশাহের সঙ্গে তোমার ভবিষ্যৎ একই সূত্রে গাঁথা। আপনি ভাগ্যবান জাঁহাপনা। এমন কন্যা পেয়েছেন।

পিতা হাসেন। আমাকে কাছে টেনে নিয়ে আমার পিঠে হাত রেখে বলেন,—আমি জানি। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ স্পষ্ট করে বললেন না।

—কেউ যদি আপনাকে নিহত করে সিংহাসনে বসতো বাদশাহ আমি কিছু বলতাম না। কারণ এমন ঘটনা হামেশাই ঘটে। কিন্তু বেঁচে থেকে আপনাকে তিলে তিলে দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে।

—আরও স্পষ্ট করে বলুন।

—না! আর নয়।

জ্যোতিষী তাঁর ঝুলি থেকে দুটি সুন্দর কাশ্মীরি আপেল বার করে বাদশাহের দিকে বাড়িয়ে বলেন,—এ দুটি ধরুন জাঁহাপনা!

পিতা দু' হাতে ধরেন।

—এবারে আপনার কন্যাকে দিয়ে দিন।

আমি আপেল দুটি পিতার হাত থেকে নিই।

—জাঁহাপনা, আপনার হাতে দেখুন সুমিষ্ট ফলের সুবাস। এই সুঘ্রাণ আপনার হাতে লেগে থাকবে। শত ধুলেও যাবে না। আতরে নষ্ট হবে না। কিন্তু যেদিন দেখবেন এর গন্ধ ক্ষীণ বলে মনে হচ্ছে সেদিন বুঝবেন আপনার অপমানের দিন খুবই নিকটে। আর যেদিন দেখবেন কোনো গন্ধই নেই, সেদিন বুঝবেন মৃত্যু অতি সন্নিকট। আমাদের কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে জ্যোতিষী সহসা উঠে বিদায়

নেন। বাধা দিতে পারি না।

বাদশাহ স্তম্ভিত। তাঁকে বড় ক্লান্ত দেখায়। দিল্লিতে গিয়ে নতুন উদ্যমে দেশ-শাসনের সব উত্তেজনা যেন মুহূর্তে অন্তর্হিত হয় তাঁর মধ্য থেকে।

শাহানশাহ্ সাজাহান শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে অসহায়ের মতো আমার দিকে দু' হাত বাড়িয়ে বলেন,—দেখ তো জাহানারা আপেলের গন্ধ আছে তো?

—হ্যাঁ বাবা আছে। আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? আমিও তো আপনার সঙ্গে আছি।

—তা আছিস বটে। তা আছিস।

বাদশাহকে বড় বেশি বৃদ্ধ বলে মনে হয় হঠাৎ। কষ্ট হয় খুব। আমি ধীরে ধীরে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

—জাহানারা, কালই আগ্রায় লোক পাঠাবো।

—কেন বাবা?

—তাজমহলের বিপরীত দিকে যমুনার অপর পারে আমার সমাধিস্থল নির্মিত হবে।

—ছিঃ বাবা।

—ছিঃ, নারে। এখন তৈরি না হলে পরে আর সময় পাবো না। কি রঙের হবে জানিস?

—না।

—লাল। এপারে সাদা আর ওপারে লাল। যেন স্বর্গ আর মর্ত্য। তাজমহল থেকে একটি কৃষ্ণবর্ণ সেতু বার হয়ে নদীর ওপর দিয়ে আমার সমাধিস্থলের সঙ্গে যুক্ত হবে। এই সেতুটি যেন মৃত্যু, আমাকে আর তাকে এক করে দেবে। বেশ হবে।

—হ্যাঁ, বাবা। কিন্তু এত ব্যস্ত হয়ে লাভ কি? দিল্লি গিয়ে লোক পাঠালেই চলবে।

—যদি দেরি হয়ে যায়?

—একটুও দেরি হবে না।

আবার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন,—দেখ তো গন্ধটা আছে কিনা?

জ্যোতিষীর ওপর ক্রোধে আমার সর্বাঙ্গ জ্বালা করে। ইচ্ছে হয় অশ্বারোহী পাঠিয়ে তাকে ধরে এনে মৃত্যুদণ্ড দিই।

বাদশাহ কি শেষে উন্মাদ হয়ে যাবেন? নিজের হাতের ঘ্রাণ নিজে নিয়েও হয়তো বিশ্বাস হয় না তাঁর। দিনে-রাতে নিদ্রায়-জাগরণে আমার কাছে ছুটে আসেন।

—ঠিক তেমনই রয়েছে, বাবা। মনে হচ্ছে চিরকালই এ গন্ধ থাকবে।

—তাই কি কখনো হয়? মানুষ অমর হতে পারে না। তবু মানুষ নির্ভাবনায় থাকে। কারণ সে তার ভবিষ্যৎ জানতে পারে না। যদি জানত, কী সর্বনাশই না হতো।

শিবিরের বাইরে অন্ধকার হয়ে আসে। উন্মুক্ত প্রান্তরের অপর সীমা থেকে ঝড়ের মতো হাওয়া ছুটে এসে বালিরাশি উড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। কিছু দূরে সৈন্যদলের হৈ-হুল্লোড়। অশ্বের ছটফটানি আর হ্রেস্বা রব অতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ইঙ্গিত দিচ্ছে। আমি অন্যমনস্ক হয়ে ভাবি যদি দিল্লিতে গিয়ে দেখি ছত্রশাল সেখানে হাজির, তবে আনন্দে হয়তো আমি মরেই যাব।

—জাহানারা।

অল্প সময়ের মধ্যেই বড় বেশি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। বাদশাহের ডাকে তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ি।

—জাহানারা, হারেমকে এখন কে শক্ত হাতে চালনা করে, আমি জানি। তোমার মায়ের মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে যে তুমি তাঁর স্থান দখল করেছ, সে কথা কেউ না বললেও বুঝতে দেরি হয় না।

—কিন্তু আমি তা চাই না।

—না চাইলেও অনেক জিনিস আপনা হতেই ঘাড়ে এসে পড়ে। তার মুল কারণ বুদ্ধি আর ব্যক্তিত্ব। আওরঙজেব ছাড়া তোমার সমকক্ষ আমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেউ নেই।

—আপনি আমাকে একটু বেশি স্নেহ করেন।

—না। স্নেহের আধিক্যে আমার বিচার-বুদ্ধি এক্ষেত্রে অন্তত আচ্ছন্ন হয়নি। জাহানারা, এতদিন যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও করে এসেছ, দিল্লিতে গিয়ে তাই হবে তোমার প্রথম কর্তব্য। নতুন জায়গায় শক্ত হাতে যদি লাগাম না ধর তবে অনেকেই ছিটকে যাবে। দিল্লির হারেম অনেক বেগমের মাথা খারাপ করে দেবে।

—এত সুন্দর?

—হ্যাঁ। সেজন্যই বলছি জাহানারা, ওখানে পৌঁছেই তোমার নানান কাজ। শুধু হারেম নয়—বাইরেরও।

—কেন? দারা?

—দারার পাশে তুমি না থাকলে সে মসনদে বেশিদিন টিকতে পারবে না। এক্ষেত্রে আকবরেব নির্দেশ অন্তত কাজে লেগেছে।

আমার বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। রাজার মুখখানা চোখের সামনে ভাসে। অতি কষ্টে দীর্ঘশ্বাস রোধ করি।

—জাহানারা, খলিলুল্লা খাঁয়ের শিবির কি অনেক দূরে?

কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি খলিলুল্লা খাঁ সম্বন্ধে তিনি বড় বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন। মাঝে মাঝে তাঁকে তিনি কাজে পাঠান আগ্রা থেকে দূরে। অর্থও দিচ্ছেন তাঁকে প্রচুর। এসবের কারণ হারেমে বসে পাওয়া যায় না। কিন্তু একদিন খলিলুল্লা খাঁয়ের বেগমকে হারেমে দেখে আমার তীব্র কৌতূহল হয়েছিল। তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, হারেমে আসার কারণ সম্বন্ধে। সে জবাব দিতে পারেনি। মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছিল তার। যাবার সময় শুধু বলেছিল,—শাহজাদী, মমতাজ বেগমের মৃত্যুর পর আর কোনো বেগমই বুঝি বাদশাহকে শান্তি দিতে পারছেন না?

কিছু বলতে পারিনি সেদিন তাকে।

আগ্রা ছেড়ে আসার আগের দিন বাদশাহ খলিলুল্লা খাঁকে সুরাটে পাঠাতে চেয়েছিলেন। অসুস্থতার অজুহাতে এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। তাঁর এই চালাকি বাদশাহ বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ তাঁর চোখেমুখে দেখেছি ক্রোধের অভিব্যক্তি।

বাদশাহের প্রশ্নের উত্তরে বলি,—তাঁদের শকট আমাদের অনেক পেছনে ছিল।

গম্ভীর হন পিতা। একটা চাপা উত্তেজনা মুখময় ছড়িয়ে পড়ে তাঁর। বাদশাহের শকট থেকে নিজের শকট অনেক দূরে রাখাও কি খলিলুল্লার চালাকি?

বাইরে গাঢ় অন্ধকার। ধীরে ধীরে পিতার শিবির থেকে চলে আসি। ইচ্ছে ছিল রোশনারার কাছে গিয়ে কিছু সময় গল্প করে কাটাই। কিন্তু এ সময়ে তার কাছে যেতে ভরসা হয় না। কি অবস্থায় দেখব ঠিক নেই। ওদিকে নাদিরার শিবিরও স্তব্ধ। একটু দূরে পদশব্দ। চেয়ে দেখি সুলেমান শুকো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেশ বড় হয়ে উঠেছে এর মধ্যে। আওরঙজেবের ছেলেটাও নিশ্চয় এত বড় হয়েছে। কখনো দেখিনি তাকে। আগ্রার সংস্পর্শ থেকে আওরঙজেব তার সমস্ত পরিবারকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখে। বোধহয় সে ভাবে যে তার ছেলেরা হবে ভবিষ্যতের বাদশাহ। এ ভাবনার একটি ইতিহাস আছে। আগে বলেছি কি না মনে নেই। কোনো এক ফকির একবার বলেছিল বাদশাহকে যে তাঁর সর্বাপেক্ষা গৌরবর্ণ পুত্রই হবে তাঁর উত্তরাধিকারী। কথাটা সেদিন আওরঙজেবের মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। সে-ই সব চাইতে গৌরবর্ণ।

—কে? সুলেমান চিৎকার করে উঠে।

—আমি। দেখে ফেলেছ?

—কাছে এগিয়ে আসে সে। হেসে বলে,—দেখব না? আমি যে পাহারা দিচ্ছি।

—কেন? পাহারা দেবার লোকের অভাব হলো না কি যে তোমাকে পাহারা দিতে হচ্ছে।

—এসব অচেনা জায়গায় তাদের ওপর নির্ভর করা যায় না কি? মেয়েরা কিছু বোঝে না।

খুব আমোদ লাগে তার কথা শুনে। বলি, —ঠিক বলেছ।

—কোন্ দিকে যাচ্ছ?

—বুঝতে পারছি না সুলেমান। বল তো কোথায় যাই?

—কোথাও গিয়ে কাজ নেই। নিজের শিবিরে গিয়ে বিশ্রাম কর।

—একথা বললে কেন?

সুলেমান হেসে ওঠে। রোশনারার শিবিরের দিকে ইঙ্গিত করে করে,—ওখানে খুব জমেছে।

—ছিঃ সুলেমান। তোমার এখনো এমন কিছু বয়স হয়নি যে ওভাবে কথা বলবে।

গম্ভীর হয় সে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—না বলতে পারলেই সুখী হতাম। সে চলে যায়।

ভাবি সত্যিই সুলেমান বড় হয়ে উঠেছে। দারার বিবাহের দিনের কথা একের পর এক চোখের সামনে ভেসে ওঠে। নাদিরার ব্রীড়া সঙ্কুচিত মুখভাব বড়ই সুন্দর লাগছিল দেখতে। তখন সে কিশোরী।

শাহানশাহ্ সাজাহানের সখের রাজধানী দিল্লি-প্রান্তে এসে উপস্থিত হই। দূরে রক্তবর্ণ 'কিল্লাই মুবারকের' মাথায় বৃহৎ গম্বুজ অপূর্ব লাগছিল দেখতে। বড় গম্বুজেব পাশে ছোট সাতটি মিনার কিল্লাই মুবারকের এক অভূতপূর্ব আভিজাত্য দান করেছে।

অধৈর্য হই ওখানে গিয়ে পৌঁছবার জন্যে। শকটগুলি যেন তাদের গতি শ্লথ করেছে। রোশনারা ছটফট্ করতে করতে অস্ফুটস্বরে গালাগালি দিয়ে ওঠে।

—ওতে লাভ হবে না রোশনারা। শকটের গতি একটুও কমেনি। তোর মনের গতি বেড়েছে।

—অপদার্থ সব।

হাসি আমি। বয়স রোশনারার কম হলো না। অথচ এখনো আগের মতোই। ছোট বোনটি কিন্তু নির্বিকার। আশা, উদ্যম, কৌতূহল—কিছুই যেন নেই তার।

ছোট বোনকে ঠেলা দিয়ে বলি,—কিরে চুপচাপ কেন? আনন্দ হচ্ছে না তোর?

—হুঁ।

—শুধু হুঁ। জানিস ওখানকার হারেম আর বেহেস্ত একই।

—তাই আবার হয় নাকি?

—হয় না মানে? সারা ভারতের অধীশ্বর, ইচ্ছে করলে কী না হতে পারে?

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চাই। এমন সংযত আর নিশ্চিত মতামত প্রকাশ করতে এ-বয়সে মুঘল হারেমের কোনো মেয়েকে দেখিনি। একে গুজরাটে মুরাদের কাছে পাঠাতে হবে। মুরাদ হলো এই সব নিরাশাবাদীদের মহৌষধ। কাউকে না হাসাতে পারলে সুড়সুড়ি দিয়ে হাসাবে। তাতেও না হলে তরবারির খোঁচা দিয়ে হাসাতে চেষ্টা করবে।

আমার মনোভাব অনুমান করতে পেরে মৃদু হেসে বোনটি বলে,—ভারতের অধীশ্বর মমতাজ বেগমকে বাঁচাতে পেরেছিলেন?

বুঝতে পারি কোথায় ব্যথা ওর। আজ যদি মমতাজ বেগম বেঁচে থাকতেন তাহলে এই অবহেলা আর নিরানন্দ সহ্য করতে হ'ত না তাকে। আমাদের মতোই হাসতে পারত, খেলতে পারত।

বড় কষ্ট হয় আমার। ওর মাথায় হাত রেখে বলি,—ঠিকই বলেছিস। ওই ওপরে যিনি রয়েছেন সবাই ওঁর হাতের পুতুল।

শকটগুলি হঠাৎ একের পর এক থেমে যায়। এবার সত্যিই আমি বিরক্ত হই। বাদশাহ যেন আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছেন। এ সময়ে এমনভাবে গতিরুদ্ধ করার কোনো অর্থ হয় না।

সুলেমান সামনে থেকে ঘোড়ায় চড়ে দারার দিকে যাচ্ছিল। থামাই তাকে।

—কি ব্যাপার সুলেমান?

—বাদশাহ বলে দিলেন যমুনার তীরে খিজরী দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে।

—বেশ তো। উনি সামনে আছেন। উনি যেদিকে যাবেন আমরাও তাই যাব। তার জন্য এভাবে থেমে যাওয়া কেন?

—তবু সবাইকে একবার বলে দিতে বললেন।

—বলে এসো।

রোশনারা দাঁতে দাঁত ঘষে। তার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ।

আমি বলি,—দেখিস, আর রাগিস না। টুসটুস করে রক্ত গড়াবে এবার।

—ঠাট্টা করার সময় অসময় আছে।

—এটাই সময়। বেশ লাগছে দেখতে তোকে।

আমার ছোট বোন মুখে ওড়না চাপা দিয়ে নিঃশব্দে হেসে ওঠে। তার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে রোশনারা গুম হয়ে থাকে।

একটু পরেই শকটশ্রেণী চলতে শুরু করে!

নতুন রাজধানী দিল্লি।

নতুন জায়গায় এসেছি। নতুন প্রাসাদের আশ্চর্য শিল্পকার্য দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। ছোট্ট বালিকার মতো রোশনারার পাশে পাশে ঘুরে বেড়িয়েছি হায়াৎবাগে, মহতাববাগে। ফুল ছিঁড়েছি—ছড়িয়েছি। তৃণের ওপর গড়াগড়ি দিয়েছি। মতিমহলের ভিতরে গিয়ে দাঁড়িয়ে কি করবো ভেবে পাইনি। রঙমহলের নির্জন কক্ষে উপস্থিত হয়ে নিজেকে মনে হয়েছে স্বর্গের অপ্সরী। সেখানে পায়ের কাছ দিয়ে বয়ে চলেছে নহরী-বেহেস্ত। কোনো প্রকোষ্ঠের ভেতর দিয়ে এভাবে মন্দাকিনী বিনিন্দিত প্রবাহিত বয়ে যেতে পারে না, না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। নানান্ বর্ণের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে তাতে। সব দেখে রোশনারা পাগল হয়েছে। ছোট্ট বোনটি পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত।

কিন্তু আমি?

আনন্দ আমারও হয়েছে। ওরা যেভাবে আনন্দ প্রকাশ করেছে, আমিও তা করেছি। কিন্তু ওদের মতো নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারছি কই? বুকের ভেতর কোথায় যেন কাঁটা বিঁধে রয়েছে। সব আনন্দ একটা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করতে চাইলেই খচ করে বেঁধে। বড় ব্যথা পাই তখন। বড় খারাপ লাগে। মনে হয়, যা দেখেছি সবই যেন বাইরের—মনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

মাকে ফেলে এসেছি আগ্রায়। সেইদিন সন্ধ্যায় আমাকে ধরে রাখার জন্যে নিশ্চয়ই তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কথার ছলে পিতা যে কথা বলেছিলেন তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। মা সেদিন আমাকে ধরে রাখতে পারেননি। পারা সম্ভব নয়। নূরজাহান বেগমও হয়তো সমাধির নিচে থেকে অশ্রুজল ফেলেছিলেন—তাঁর শেষ প্রিয়জন কাছছাড়া হলো বলে।

তবু সহ্য হ'ত, তবু সব ভুলে যেতে পারতাম—যদি সে আসত। দিল্লির দেওয়ান-ই-আমের একটি আসন আলো করার জন্যে সে কখনো আসেনি। হয়তো ভুলে গিয়েছে আমাকে। নিজের রানী, নিজের সন্তানের স্নেহ-ভালবাসার গণ্ডীর মধ্যে সে আপনহারা। সেখান থেকে ছিটকে এসে সেবারে আগ্রায় সামান্য একটু উত্তেজনার মোহে হয়তো অঙ্গুরীবাগে আমার দিকে অমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিল, অমন মধুর কথা বলে আমার মন হরণ করে চলে গিয়েছিল। এখন আর ওসব কথা মনে নেই।

একলা ধীরে ধীরে কিল্লার শীর্ষে উঠে সাতমিনারের একটি পাশে গিয়ে দাঁড়াই। পাশেই যমুনার

জল, তাতে গম্বুজ আর মিনারগুলি স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত। উত্তর-পূর্বদিকে শেরশাহ-পুত্র সুলেমানের সেলিমগড়ের দুর্গ মাথা উঁচু করে এখনো সাবধান করে দিচ্ছে শক্তিশালী মুঘল বাদশাহকে।

আবার যমুনার দিকে দৃষ্টি ফেরাই। এই বারিরাশি এগিয়ে যেতে যেতে আগ্রার তাজমহলের পাশে গিয়ে উপস্থিত হবে। আমার মনের ব্যথা কি মায়ের হৃদয় স্পর্শ করবে না? তিনি কি অস্থির হবেন না তখন? নিশ্চয়ই হবেন। শেষ বিচারের দিনে আল্লার কাছে তাঁর প্রথম প্রার্থনা হবে নিজের পুত্রকন্যাদের জন্যে তাঁর মতো কোনো মা-ই যেন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ না করে।

আমার বিশ্বাস, আমার মা তাঁর প্রিয়জনদের জন্যে অবিরত অশ্রু বিসর্জন করে চলেছেন। তাই চাঁদনী রাতে যখন সমস্ত পৃথিবী হাসে তখন তাঁর সমাধির দিকে চাইলে মনে হয় এক ফোঁটা অশ্রুজল যেন পৃথিবীর বুকের এক একান্ত কোণে টল্‌টল্ করছে।

বুন্দেলা ছত্রশাল। আমার এত যে ভাবনা, এত যে ব্যথাতুর কল্পনা—সব কিছুই তুমি মুছে দিতে পারতে যদি আর একবার শুধু আমার সামনে এসে দাঁড়াতে! আর একবার শুধু আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে বলতে যে সত্যিই তুমি আমাকে ভালোবাসো।

কিন্তু এলে না তুমি। এই যমুনার ওপর দিয়ে কত কিশ্‌তী যাতায়াত করছে, কত আমীর ওমরাহের কিশ্‌তী ঘাটে এসে ভিড়ছে। কিন্তু কই, তুমি তো এলে না।

হঠাৎ আমার চিন্তা ধাক্কা খায়। তীরে এসে একটি কিশ্‌তী লাগে। তার থেকে নজরৎ লাফ দিয়ে মাটিতে নামে। একটু দূরে হলেও চিনতে পারি তাকে। সে একবার কিল্লার ওপর চোখ বুলিয়ে নেয়। তারপর খিজরীর দরওয়াজার দিকে যায়।

এখনো আশা ছাড়েনি নজরৎ। দারা এখনো নজরৎ সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে বলে আমাকে। সে তো জানে না, এতে ভাবনা-চিন্তার ঠাঁই নেই। মুহূর্তেই এ সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

—জাহানারা!

চমকে উঠি। বাদশাহের কণ্ঠস্বর। কিল্লার ওপরে এই নির্জন স্থানে যে আমি এসেছি এ কথা তাঁকে কে বলল? তবে কি আমার গতিবিধির ওপর অলক্ষ্যে কেউ দৃষ্টি রাখছে? কিন্তু কেন? নিজের হারেমে এভাবে নজরবন্দী হবার কী কারণ থাকতে পারে?

—বাদশাহ্ এগিয়ে আসেন।

—একলা কি করছ জাহানারা?

—এমনি। নতুন জায়গায় এসে আগ্রার কথা মনে পড়ে।

—আমারও। কিন্তু তোমাকে একটু বেশি বিচলিত দেখছি ক'দিন থেকে। তাই তোমার নাজীরকে বলেছি তোমার ওপর দৃষ্টি রাখতে।

সব স্পষ্ট হয়। কিন্তু তবু এ সাবধানতার সঙ্গত কারণ খুঁজে পাই না।

—অবাক হলে তো?

—সত্যিই অবাক হয়েছি বাদশাহ্।

—আকবরশাহ যখন ফতেপুর সিক্রিতে চলে যান, তখন এক শাহজাদী তোমারই মতো বিমর্ষ হয়ে পড়েন। শেষে ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। জানি না তৈমুরের রক্তে এ-নেশা ছিল কিনা। তোমার মধ্যে যদি এ-নেশা চাড়া দিয়ে ওঠে?

—দিক না। মুঘল-শাহজাদীরা সংখ্যায় কমে গেলে কারও কিছু এসে যাবে না। বরং অনেক জটিলতা থেকে অনেকে মুক্তি পাবে।

স্নেহের হাসি হেসে বাদশাহ্ বলেন—তোমার দুঃখ আমি বুঝি জাহানারা। তোমরা নিজের পথে চলো, আমি বাধা দেব না।

পিতার কথায় বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা পাই না। তিনি নিরপেক্ষ। বহুদিনের একটা প্রথাকে ভাঙতে হলে

একমাত্র বাদশাহই উদ্যোগী হয়ে ভাঙতে পারেন। কিন্তু তিনি উদ্যোগী হতে চান না। বহু আগে রোশনারার শাদির প্রস্তাব করলে দারার মুখেই বাদশাহর মনোভাব জানতে পেরেছিলাম। তবু চুপ করে থাকি।

—শোনো জাহানারা। আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়ছি ধীরে ধীরে। ভেতরে বাইরে এক বিরাট সংঘাতের দিন এগিয়ে আসছে। এ সময়ে তোমাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন। শুধু হারেম সামলাতে নয়, দরবারের অনেক ব্যাপারেই তোমার মতামত আমার জানা দরকার।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি—আমার মতামত?

—হ্যাঁ, তোমার বুদ্ধিতে আমার আস্থা রয়েছে। আগেও সেকথা বলেছি।

—বাবা ভুলে যাবেন না আমি পুরুষ নই।

—ভুলিনি। তবু এমন অনেক গুণ তোমার মধ্যে রয়েছে, পুরুষের মধ্যেও যা দুর্লভ।

মনে মনে আল্লার কাছে প্রার্থনা করি, আমি চাই না পুরুষের গুণ। বিন্দুমাত্রও চাই না। অণুতে অণুতে নারী হতে চাই। প্রতিটি অণু দিয়ে যাতে আমি বাজাকে অনুভব করতে পারি।

পিতা তাঁর কথার জের টেনে বলেন,—তাই আজ তোমাকে আমি নতুন উপাধি দিচ্ছি। আজ থেকে তুমি 'বাদশাহ-বেগম জাহানারা'।

সমস্ত শরীরের রক্ত একসঙ্গে মাথায় এসে ধাক্কা খায়। মাথা ঘুরে ওঠে আমার। তবে বুঝি ছত্রশাল আমার ভেতর পুরুষালি ভাব দেখে বিরক্ত হয়ে ফিরে গিয়েছে—আর আসছে না।

অতিকষ্টে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে বলি,—আপনার আদেশ শিরোধার্য বাদশাহ্।

—শোনো বাদশাহ-বেগম, তোমার সুরাট রাষ্ট্রের শাসনকর্তা এবার থেকে তুমি নিজেই নিযুক্ত কববে। সেখানকার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব থেকেও আমি এই মুহূর্তে মুক্ত হচ্ছি। আর—

বাদশাহ্ তাঁর হাতের হস্তীদন্ত নির্মিত পেটিকা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেন,—এর মধ্যে রয়েছে আমার পাঞ্জা। এটি তোমার তত্ত্বাবধানে রইল।

আমি অস্থির হই। নিষ্কৃতিলাভের শেষ চেষ্টায় চিৎকার করে বলে উঠি,—এত সব দায়িত্ব আমাব মাথায় চাপিয়ে দিলেন বাদশাহ্, কিন্তু আমার দায়িত্ব? আমার দায়িত্ব কে নেবে?

পাষাণ মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন বাদশাহ্। অনেকক্ষণ পরে খুব ধীর গলায় বলেন,—সেটিও তোমার ওপর।

—তা কি পারব?

—হ্যাঁ—পারবে। বাবর পারেননি। আকবর পারেননি। আমি পারছি না।

বুঝলাম কিসের ইঙ্গিত দিলেন পিতা। পুরুষের মতোই অবাধ স্বাধীনতা দিলেন জীবনকে উপভোগ করার। অথচ নিজের কন্যাকে সেকথা স্পষ্ট করে হয়তো বলতে পারলেন না। তিনি বুঝলেন না দেহটাই সব নয়। ভালোভাবে জেনেও তিনি বুঝলেন না। দেহটাই যদি সব হতো মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর জন্যে আকুল না হয়ে অন্য বেগমদের কাছে ছুটতেন। হারেমে বেগমের অভাব হয়নি কখনো। দেহই যদি সব হতো তাহলে যমুনার তীরে তাজমহল শোভা পেত না। দেহই যদি সব হতো তাহলে রোশনারা এখনো জ্বলে পুড়ে মরতো না। সে বরাবরই স্বাধীন। পুরুষের কাছে দেহটার প্রাধান্য কত বেশি জানি না, তবে নারী চায় ধর্মসিদ্ধ আইনসিদ্ধ একটা নিশ্চিন্ত ভাব। রোশনারা যদি নিজের ঘর পেত তবে তার চেহারায় স্বভাবের অতখানি উষ্ণতা থাকত কি?

—তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আমাকে তুমি ভুল বুঝেছ বাদশাহ্ বেগম। অত নীচ আমি নই। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাইছি, তোমার যাতে তৃপ্তি তুমি তাই করতে পার। কিন্তু তোমার কর্ম যে তোমার রুচির ওপর নির্ভর করবে এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে।

বাদশাহের এ উক্তি না শুনলে সত্যিই তাঁকে ছোট বলে ভাবতাম। মনে মনে স্বস্তি অনুভব করি।

তবু অবাধ স্বাধীনতা তিনি যখন আমায় দিয়েছেন, তখন তাঁকে আমার সন্ধানী দৃষ্টির প্রথম পরিচয় দেবার লোভ সামলাতে পারি না। এখানে আসার পর থেকেই লক্ষ্য করছি, দরবারে শায়েস্তা খাঁ, নজরৎ খাঁ, মীরজুমলা, আমীন খাঁ সবাই হাজির হচ্ছে অথচ খলিলুল্লা খাঁয়ের আসনটি খালি পড়ে থাকে। গোপনে খবর নিয়ে জেনেছি তিনি সুস্থ আছেন এবং নিয়মিত তাঁকে নগরীর রাস্তায় দেখা যায়।

বাদশাহের দিকে সোজা দৃষ্টি ফেলে বলি,—খলিলুল্লা খাঁয়ের কাছ থেকে কোনো কৈফিয়ৎ তলব করেছে কি?

পিতার শরীরের কম্পন আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি ঢোক গিলে আমার দিকে চেয়ে বলেন, —কেন বলতো?

—নতুন জায়গায় এসে এভাবে দরবাবে অনুপস্থিত থাকা অমার্জনীয় অপরাধ।

—হয়তো সে অসুস্থ।

—না। আর আপনি জানেন সেকথা।

—জাহানারা!

—বাদশাহ, তাঁর প্রতি আপনার এই দুর্বলতার কি কোনো বিশেষ কারণ আছে? আগ্রা থেকে আসার পথে তাঁর ব্যবহারে আপনাকে বাগান্বিত হতে দেখেছি। এখন তো দেখি না।

নিজের দেহকে সোজা রাখবার জন্যেই যেন মিনারের গায়ে হেলান দেন। যমুনার স্রোতের দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকেন। শেষে বলেন,—জাহানারা, অতটা বুদ্ধিমতী হয়ো না। তুমি নিজেই দুঃখ পাবে।

—আমার বুদ্ধি সম্বন্ধে যখন একবার সচেতন করে দিয়েছেন, তখন তাকে আবাব থাবা দিযে চেপে দেবার চেষ্টা করবেন না। আমি স্বাধীন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে কোনো কথা না বলেই তিনি স্থান ত্যাগ কবেন।

আমি ভাবতে বসি।

বাদশাহ-বেগম উপাধি দেবার পর মুহূর্তেই তাঁকে এভাবে আঘাত না দিলেও পারতাম।

ক'দিন পরেই খলিলুল্লা খাঁয়ের রহস্য আমার চোখের সামনে বীভৎসভাবে উদ্ঘাটিত হলো। এভাবে না হলেই ভালো হ'ত। বাদশাহ ঠিকই বলেছিলেন—বেশি বুদ্ধিমতী হলে দুঃখ পেতে হয়। দুঃখ আমি পেলাম—চূড়ান্ত দুঃখ। আবালা-পোষিত এক শ্রদ্ধার মিনারের মাটি ধসে যেন একদিকে হেলে পড়ল। কবে তাকে আবার মনের সর্বশক্তি নিয়োগ করে সোজা করে তুলতে পারব জানি না।

সেদিনও অপরাহ্নে দাঁড়িয়েছিলাম কিল্লার ওপরে যমুনা দেখার নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে। যমুনার কালো জল ধীরে ধীরে আরো কালো হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ নজরে পড়ে একটি শিবিকা, চারদিকে ঢাকা তার, খিজরী-দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে প্রাসাদে। বিস্মিত হই আমি। জানি, হারেমের কেউ বাইরে যায়নি। কৌতূহল জাগে মনে। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসি। চেয়ে দেখি শিবিকাটি দিশেহারা হয়ে প্রাঙ্গণের মধ্যে দিয়ে চলেছে। বুঝলাম ভেতরের কর্ত্রীর নির্দেশে বাহকেরা বয়ে নিয়ে চলেছে। প্রথমে নহবৎখানার সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপর তাড়াতাড়ি মহতাবাগের পাশ দিয়ে দেওয়ান-ই-খাসের সামনে গিয়ে স্থির হয়। শেষে মতিমহল পার হয়ে রঙমহলের কাছাকাছি এসে শিবিকাটিকে মাটিতে নামানো হয়। বাহকেরা স্থানত্যাগ করে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হই আমি। রঙমহলের দিকে এগিয়ে যেতে গেলে শিবিকাটি দৃষ্টির আড়ালে পড়বে। সেই মুহূর্তে যে নারী মাটিতে পা দেবে তাকে দেখতে পাবো না। তাই অপেক্ষা করি। শিবিকার পর্দা উঠিয়ে দুটি পা বাইরে বার হয় প্রথমে। তারপর দেহ। চিনতে পারি আমি। সত্যিই চিনতে পারি আমি। চেনার জন্যে মুখখানা স্পষ্ট দেখার প্রয়োজন হয় না। খলিলুল্লা খাঁয়ের বেগম। কিন্তু কেন? বাদশাহের কাছে আমীরের হয়ে ক্ষমা প্রার্থনাব জন্য। তবে কি আমার কথা শুনে সত্যিই কৈফিয়ৎ তলব

করেছেন বাদশাহ। কিন্তু বাদশাহের সঙ্গে একজন আমীরের বেগম এই অদ্ভুত সময়ে কেন দেখা করতে আসবে? অন্য কোনো কারণে নয় তো? মানসিক দ্বন্দ্বে অস্থির হয়ে শেষে দ্রুতপদে অনেক কক্ষ পার হয়ে রঙমহলের দিকে যাই। নহরী-বেহেস্ত কলকল শব্দে বয়ে চলেছে। রঙমহলের প্রকোষ্ঠের ভেতর দিয়ে। বাইরে থেকে শব্দ পাই। গেল কোথায় সে? শেষে রঙমহলের ভেতরে চাইতেই চমকে উঠি। চেয়ে দেখি খলিলুল্লা খাঁয়ের পর্দানশীন বেগম খুব তাড়াতাড়ি তার দেহের প্রতিটি পরিচ্ছদ খুলে ফেলে নগ্ন হয়ে নহরী-বেহেস্ত-এর মধ্যে গিয়ে বসে। তারপর আঁজলা আঁজলা জল তুলে নিজের চোখ-মুখের ওপর ঢালতে থাকে। সে হাসছে—সব পাওয়ার পরিতৃপ্তি হাসি। মুখের ওপর জল ঢালতেই সুযোগ বুঝে আমি চট করে প্রকোষ্ঠের ভেতরে একটি আসবাবের আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন করি। শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। জীবনে কখনো নহরী-বেহেস্ত-এ অবগাহনের সুযোগ হবে না দেখে চোরের মতো আকাঙ্ক্ষা মেটাতে এসেছে।

খলিলুল্লা খাঁয়ের বিবি সত্যিই সুন্দরী। তার নগ্ন দেহ-বল্লরী দেখে আমার মতো সুন্দরীরও ঈর্ষা হয়। অপেক্ষা করি, স্নান শেষের জন্যে। কিন্তু তার আগেই এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটল।

রঙমহলের একটি দ্বার দিয়ে স্বয়ং বাদশাহ প্রবেশ করেন। তাঁর সাদা চুল নানান বর্ণের আলোয় অপূর্ব দেখাচ্ছিল। দারুণ উত্তেজিত হই আমি। এই মুহূর্তে তিনি দেখে ফেলবেন খলিলুল্লার বেগমকে। তারপর যে কি ঘটবে ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

বাদশাহ বড় একটা এখানে আসেন না। তিনিও নিশ্চয় আমার মতো একে আসতে দেখেছেন।

বাদশাহ এগিয়ে আসছেন। খলিলুল্লা খাঁয়ের বেগম কিন্তু নির্বিকার। কোনোদিকে খেয়াল নেই তার। আগের মতোই জল নিয়ে খেলা করছে। বাদশাহ একেবারে কাছে দাঁড়ান। তাঁর মুখে যেন হাসির আভাস।

খলিলুল্লার বেগম তাঁকে দেখতে পেয়েই জল থেকে উঠে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলতে থাকে। সব স্পষ্ট হয়ে যায় আমার কাছে। বুকের ভেতরে হাতুড়ির আঘাত। চোখ মুখ কান লজ্জায় রাগে পুড়ে খাক্ হয়ে যায়।

বাদশাহ ধীরে ধীরে তাঁর পাদুকা খুলে জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে বসেন। খলিলুল্লার বেগম নাচতে নাচতে তাঁর কোলের ওপর বসে।

শয়তানী হাসে। ঘন ঘন শ্বাস ফেলে। বাদশাহের কোলের ভেতর তার দেহখানা সাপের মতো কিল্‌বিল্ করে। শেষে জলের মধ্যে শব্দ হয়। পোশাক-পরিচ্ছদ সমেত জলের মধ্যে নেমে পড়েন বাদশাহ। অগভীর নহরী-বেহেস্ত।

এ সময়ে আল্লা যদি আমার চোখে ঘুম এনে দিতেন বড় ভালো হ'ত। কিন্তু তা দিলেন না। নিজেরই দুই হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে আমি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি।

মমতাজের প্রত্যক্ষ প্রভাব আর বাদশাহের ওপর নেই। আগ্রা ছেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রভাব ফিকে হতে হতে একেবারে মিলিয়ে গিয়েছে। নইলে এ নোংরামির মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতেন না বাদশাহ। নিজের নিজের বেগম রয়েছে তাঁর। তারা যত খারাপই হোক মানবী। মন ভোলাতে সাময়িকভাবে যেটুকু অভিনয়ের প্রয়োজন তারাও জানে। হয়তো খলিলুল্লার বেগমের চেয়ে ভালই জানে। কিন্তু বাদশাহ পরীক্ষা করে দেখেননি। তিনি চেষ্টাই করেননি। এই বয়সে নতুনত্বের মোহে ভুলেছেন। সর্বনাশ ডেকে আনছেন।

এই জন্যেই মা হয়তো শেষ চেষ্টা করেছিলেন আমাদের আগ্রায় ধরে রাখতে। পারেননি। মৃতার পক্ষে পারা সম্ভব নয়। মা বুঝতে পেরেছিলেন আগ্রা ছাড়ার অর্থ হচ্ছে সাজাহানের পতন। এ তো পতনই। এই পতন ধীরে ধীরে আরও কত সর্বনাশ ডেকে আনবে কে জানে।

ইচ্ছে হচ্ছিল, মাথা তুলে একবার বাদশাহকে চিৎকার করে বলি,—দেখুন তো বাদশাহ, আপনার

হাতে আপেলের গন্ধ আছে কিনা! খলিলুল্লার বেগমের ত্বকের গন্ধে আপেলের সুঘ্রাণ নষ্ট হয়েছে। আপনার হাত দূষিত। নহরী-বেহেস্ত-এর আতর মেশানো জলও আর আপনার হাত পরিষ্কার করতে পারবে না।

কিন্তু বলা সম্ভব নয়। আপন মনে বিড়বিড করি। পাগলরা যেমন করে।

কতক্ষণ ওইভাবে ছিলাম জানি না। শেষে এক সময়ে মুখ তুলে দেখি রঙমহল নির্জন। চলে গিয়েছে ওরা। কখন গিয়েছেন ওরা। কখন গিয়েছে বুঝতে পারিনি। বাইরে এসে দেখি শিবিকা নেই।

পরদিন সকালে বাদশাহের সামনে গিয়ে বলি,—এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি বাবা।

—স্বপ্ন?

—হ্যাঁ।

—সে তো অনেকেই দেখে। বলার কি কারণ ঘটল?

—স্বপ্নটা অদ্ভুত বলেই আপনাকে বলতে এলাম। অনেক স্বপ্ন নাকি আবার সত্যি হয়। এটি সত্যি হলে সমূহ বিপদ।

—বলো শুনি।

অনেক চেষ্টায় তৈরি করা কল্পিত কাহিনী বলতে শুরু করি,—দেখলাম জুম্মা মসজিদে গিয়েছি আমি। নির্জন মসজিদে কেউ কোথাও নেই। একা ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ কে যেন ডেকে উঠল, —জাহানারা। চমকে চেয়ে দেখি চারিদিকে নির্জন। গা ছম্‌ছম্‌ করে ওঠে। আবার শুনি,—ভয় নেই। আমি খোদাতাল্লা। শুনে পরম শান্তিতে আমার মন ভরে ওঠে। প্রার্থনার ভঙ্গিতে মাটিতে বসে পড়ি। তিনি বলেন,—নহরী-বেহেস্ত-এর জল দূষিত হয়েছে।

বাদশাহ আমাকে থামিয়ে ভীতকণ্ঠে বলেন—সে কি?

—আমি যা শুনলাম তাই বলছি বাবা। আল্লা বললেন,—মুঘল-হারেমের বাইরের এক শয়তানী ওতে অবগাহন করেছে, পাপ করেছে।

বাদশাহ চিৎকার করে ওঠেন,—আর কি কি বললেন আল্লা?

শান্তভাবে বলি,—আমি আরও জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি বললেন, আর কিছু আপাতত তিনি বলবেন না। তাতে নাকি আমি দুঃখ পাব—আত্মহত্যা করব। আর আমি আত্মহত্যা করার পরদিন আপনার পতন।

বাদশাহ আমার হাত ধরে কাকুতি করেন,—জাহানারা, তুমি আত্মহত্যা করো না।

—না বাবা, আমি আত্মহত্যা করব না। তাছাড়া সব কথা তো আল্লা আমাকে বলেননি। তেমন সময় এলে বলবেন। সব শোনার জন্যেও বেঁচে থাকতে হবে আমাকে।

আমি রোজই রঙমহলের চারদিকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করছি। বাইরের কেউ যাতে আর এদিকে না আসতে পারে।

—তাই করুন। আপনার আপেলের গন্ধ ঠিক আছে তো?

—দেখতো, দেখতো। তিনি সাগ্রহে হাত এগিয়ে দেন।

নাকের কাছে হাত এনে আড়ালে হাসি গোপন করি। তারপর বলি,—ঠিকই আছে।

ঘরের বাইরে আসি। বাদশাহ স্থানুর মতো বসে থাকেন। বুঝলাম আরও কিছুক্ষণ ওইভাবে বসে থাকবেন তিনি।

রাজা!

হ্যাঁ, কোনো ভুল নেই।

বুকের ভেতর লাফিয়ে ওঠে। দরবারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রাজা। কিন্তু এলো কখন? কোনো

সংবাদ তো পাইনি। হয়তো কয়েকদিন আগেই এসেছে—হয়তো আজই চলে যাবে। দারার ওপর অভিমান হয়। আজকাল সে কেমন যেন তফাতে সরে গিয়েছে। আগ্রার সেই স্নেহের বন্ধন অনেক আলগা হয়েছে।

রাজাকে কিভাবে সংবাদ দিই? আমি যে অনেক দূরে। কি করি? শেষে নাজীরকে ডাকি। সে এসে দাঁড়ায়। দারাকে খবর দিতে বলি। দরবারে যাবার আগে সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে যায়।

একটু পরে সে এসে বলে, দারা অনেক আগেই বাইরে চলে গিয়েছে। নাদিরা বলেছে, সে দরবারে যাবে না। জ্যেষ্ঠ পুত্রই বটে। আমি বাদশাহ হলে অমন ছেলেকে এক মুহূর্তে নাকচ করে দিতাম। আওরঙজেবের আর যাই হোক, সে কৌশলী, সে কর্মঠ, সে সংযত। মুরাদ যত নেশাই করুক, সে বীর, সে যোদ্ধা। সুজাও ভালো। দারার আলস্য আর খামখেয়ালিপনা তার পাণ্ডিত্যকেও হার মানিয়েছে। আজকাল সে সময়ে-অসময়ে নগরীতে চলে যায়—জানি না কেন। নাদিরাকে প্রশ্ন করলে তার মুখ ম্লান হয়ে ওঠে। নির্বোধের মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

নিজের কক্ষে গিয়ে বাদশাহকে চিঠি লিখি। মাত্র দুই ছত্রের চিঠি। সুরাটের শাসন ব্যাপারে আমি বুন্দীরাজের সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই। দরবার শেষে তিনি যেন আমার সঙ্গে ঝরোকার সামনে দেখা করেন।

নাজীরের হাতে চিঠিখানা দিয়ে বলি, দরবারে পৌঁছে দিতে। সেই অবসরে আমিও গিয়ে ঝরোকার আড়ালে দাঁড়াই। আমার ভয় হয়, পাছে বাদশাহ সবার সামনে জোরে আমার চিঠিটি পাঠ করেন। নজরৎ শুনলে জ্বলে উঠবে।

চিঠিখানা বাদশাহের হাতে পৌঁছায়। তিনি একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই সেটা তার হাতের মধ্যে রেখে দেন। তাঁর মুখভাবের কোনো বৈলক্ষণ্য দেখলাম না।

রাগ হয় আমার। যদি তাঁর মুখে মৃদু হাসিও দেখতে পেতাম মনকে সান্ত্বনা দেওয়া যেত। কিন্তু এ যেন চূড়ান্ত অবহেলা। উপাধি দিয়েছেন তিনি আমাকে 'বাদশাহ-বেগম', অথচ আমার এই কাজ তাঁর কাছে যেন ছেলেমানুষী। আজই তাঁর সামনে উপাধি ত্যাগ করার মনস্থ করি। ওই তো বসে রয়েছে আমার রাজা। আর সবার রূপ ওর কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে। ও যদি আমাকে ভালোবাসে তাহলে বাদশাহ-বেগম কেন শাহজাদীও থাকতে চাই না।

—বেবাদল খাঁ। বাদশাহের গুরুগম্ভীর উচ্চারণ শুনি।

বিস্মিত হই। মণি-মাণিক্য-জহরৎ-এর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বেবাদল খাঁ। বাদশাহের সমস্ত ঐশ্বর্য তার মুঠোর ভেতরে। সাধারণত কোনো বড় রকম যুদ্ধ ছাড়া বেবাদল খাঁ কিংবা তার স্থলাভিষিক্ত কারও ডাক পড়ে না। হ্যাঁ, ডাক পড়েছিল একবার। তাজমহল নির্মাণের সময়। কিন্তু আজ বেবাদল খাঁকে তলব কেন? কোনোরকম সংঘর্ষের সম্ভাবনা রয়েছে কি? কিন্তু বাদশাহ তো আমাকে জানাননি। এখানেও বোধহয় সেই অবহেলা। যত বুদ্ধিমতীই হই না কেন, আমি নারী। তাই যুদ্ধের ব্যাপারে আমার পরামর্শের প্রয়োজন হয়নি।

বেবাদল খাঁ কাছে এসে দাঁড়ায়।

—কত সোনা রয়েছে ভাণ্ডারে?

—কত আপনার প্রয়োজন বাদশাহ?

—এক লক্ষ তোলা?

সমস্ত দরবারে একই সঙ্গে বিস্ময়সূচক শব্দ ওঠে। আমিও অবাক হই। এত সোনার হঠাৎ এমন কি দরকার পড়ল?

—শুধু সোনা নয়, হীরা চুনিও লাগবে।

একজন আসন ছেড়ে উঠে বলে,—জাঁহাপনা।

বাদশাহ হাত তুলে ইশারায় তাকে বসতে বলেন,—সব বলছি। দেহে যখন কোনো অশান্তি নেই তখন আর একটি অত্যাশ্চর্য জিনিস তৈরিতে আপত্তি আছে আপনাদের?

নজরৎ খাঁ বলে,—কী সেই অত্যাশ্চর্য জিনিস যার জন্যে এত সোনার প্রয়োজন?

—তক্ত-তাউস। আমার মনের মতো একটি তক্ত-তাউস।

—তার জন্য অত অপব্যয়!

বাদশাহ্ গম্ভীর হয়ে বলেন,—নজরৎ, এত দেখেও মুঘল-ঐশ্বর্য সম্বন্ধে তোমার কোনো ধারণা জন্মায়নি। বেবাদল খাঁ—

—জাঁহাপনা।

—কোষাগার কি একেবারে শূন্য হয়ে যাবে?

—না জাঁহাপনা। সামান্য একটা অংশও ব্যয় হবে না।

বাদশাহ্ হাসেন। বলেন,—শুনলে নজরৎ খাঁ।

—আমায় মাফ করবেন জাঁহাপনা।

বেবাদল খাঁ, তোমারই ওপর ভার দিলাম। এটি ভারতবর্ষ। এ দেশের আসল পাখি হলো ময়ূর। আমি হিন্দুদের মতো সিংহাসন চাই না—আমি চাই ময়ূরাসন।

—জো হুকুম।

—তোমাকে এবারে একটি ভালো জিনিস হাতছাড়া করতে হবে।

বেবাদল খাঁ জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

—ইরানের শাহ বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে যেটি দিয়েছিলেন।

বেবাদল খাঁ চোখ দুটো বড় বড় করে প্রশ্ন করে,—পদ্মরাগ মণি? সেটি বাইরে আনবেন?

—হ্যাঁ।, ভাল জিনিস সবাই যদি না দেখল, তবে থেকে লাভ কি? আল্লা ওটি মানুষের হাতে দিয়েছিলেন সবার চোখকে তৃপ্তি দেবার জন্যে।

হঠাৎ দেখি রাজা উঠে দাঁড়ায়। তার মুখে হাসি। আমার মনের ভেতরেও হাসিতে ভরে যায়।

ছত্রশালের বক্তব্যটি কি?

—জাঁহাপনা, পদ্মরাগমণি আপনার ময়ূরাসনকে অলঙ্কৃত করুক ক্ষতি নেই। কিন্তু চোখকে তৃপ্তি দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে আর একটি জিনিসও জাগায় মানুষের মনে।

—কী সে জিনিস?

—হিংসা ও লোভ। পরিণামে অশান্তি।

—আশা করি দরবারের কারো মনে তেমন কিছু জাগবে না।

রাজা দুষ্টু হেসে বলেন,—হলপ করে তা কি বলা যেতে পারে?

—তোমার মনে?

—আমার কথা আলাদা জাঁহাপনা। প্রাণহীন কোনো রত্ন মহামূল্যবান হলেও আমাকে চঞ্চল করতে পারবে না।

বুকের ভেতরে ছম্ করে ওঠে। রাজার এ কথার কি গভীর কোনো অর্থ আছে? নিশ্চয়ই আছে। সে ঝরোকার দিকে এভাবে চাইছে কেন? সে ঠিক বুঝতে পারছে না, আমি এখানে রয়েছি কি না।

নজরৎ হঠাৎ লাফিয়ে উঠে রাজার দিকে ঘুরে বলে,—এর অর্থ কি দাঁড়ায়? ছত্রশাল? আপনি ছাড়া আমরা সবাই হিংসায় জ্বলে মরি?

—ছিঃ ছিঃ খাঁ সাহেব! নিজেকে অত ছোট ভাবেন কেন? আপনার দৃষ্টিও যে অনেক উঁচুতে, অন্তত আমি সেকথা জানি।

নজরৎ-এর চোখে সন্দেহের ছায়া নামে। সে রাজার দিকে বার বার আপাদমস্তক চেয়ে তার কথার

অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করে। সে আর যাই হোক, বোকা নয়। কিন্তু এখন চালাক হয়েও কিছু করার নেই। তাই মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর করে সে তার আসনে বসে পড়ে।

দরবারের কাজ খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়। ময়ূরাসনই ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়। বাদশাহের অনুমতি নিয়ে এক সময়ে সবাই ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করে। বাদশাহ নিজেও আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। আমি রাজার দিকে চেয়ে থাকি। সে তার আসনে বসে রয়েছে তখনো। নজরৎ উঠে দাঁড়িয়ে রাজাকে দেখে আবার বসে পড়ে। গা জ্বালা করে আমার।

বাদশাহ সামনের দিকে চেয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর হাতের মুঠোয় আমার চিঠিখানা। হয়তো ভুলে গিয়েছেন সেটির কথা। ওমরাহ্‌রা তাঁকে অপেক্ষা করতে দেখে ফিরে চাইতেই, ইশারায় তাদের চলে যেতে বলেন। শূন্য দরবার কক্ষে শুধু দু'জনা বসে থাকে। নজরৎ আর রাজা।

বাদশাহ তাদের বলেন,—বিশেষ কোনো প্রয়োজন আছে কি?

—না জাঁহাপনা! নজরৎ খাঁ জবাব দেয় প্রথমে।

—ছত্রশাল?

—শাহজাদা দারাশুকো অপেক্ষা করতে বলেছেন আমাকে ঃ সঙ্গীতচর্চা হবে একটু।

—তবে তুমি অপেক্ষা কর। নজরৎ, তুমি যেতে পার। কাল তোমার সঙ্গে একটু বিশেষ পরামর্শ আছে।

—পরামর্শটা যদি আজ—

—না না। আজ আমি বড় পরিশ্রান্ত।

নজরৎ-এর মুখ লাল হয়ে ওঠে। সে ধীরে ধীরে বলে,—সঙ্গীত জিনিসটা শিখতেও চেষ্টা করলাম না কোনোদিন। বড় আফশোষ হয়।

বাদশাহ হো হো করে হেসে ওঠেন। রাগ ভুলে আমি নিজেও হেসে ফেলি। ভাগ্যিস শব্দ হয়নি।

হাসতে হাসতে বাদশাহ বলেন,—এখন আর আফশোষ করে কি হবে নজরৎ। আমাকেও তাহলে আফশোষ করতে হয়।

—একটু শুনে যেতে পারব না জাঁহাপনা?

—না। বেরসিক লোক উপস্থিত থাকলে, রসিকদের রসগ্রহণে ব্যাঘাত জন্মায়।

নজরৎ রাজার দিকে জ্বলন্ত-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বাইরে চলে যায়।

বাদশাহ ডাকেন,—ছত্রশাল।

—জাঁহাপনা।

রাজা বাদশাহের সামনে এসে দাঁড়ায়। সে একটু অবাক হয়েছে।

হাতের মুঠো থেকে চিঠিখানা বার করে রাজার দিকে বাড়িয়ে দেন পিতা। আর সেই মুহূর্তে আমি নহরী-বেহেস্ত-এ খলিলুল্লা খাঁয়ের বেগমের সঙ্গে নোংরামির কথা একদম ভুলে যাই। ইচ্ছে হলো শাহানশাহের দুই পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ি। নিজেকে বড় বেশি বুদ্ধিমতী বলে মনে করি আমি। শাহানশাহ নিজেই আমার মনে এ অহঙ্কার সৃষ্টিতে সহায়তা করেছেন। কিন্তু তিনি কত বড় কৌশলী, আজ তাঁর কার্যে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম। দেশে যুদ্ধ নেই, বড় রকমের অরাজকতা নেই। সারা ভারতে মোটামুটি শান্তি বিরাজ করছে। শান্তি সবাই চায়। তাই ভাল লাগে এ অবস্থা। কিন্তু আমার মনে হয়, এই নিশ্চিন্ততা শাহানশাহ সাজাহানের বুদ্ধি আর প্রতিভার একটা বড় দিক নেপথ্যে রেখে দিয়ে গেল। শাহানশাহ নিজেও হয়তো বুঝেছেন একথা। তাই ঐতিহাসিকরা যাতে তাঁর কথা দুই পৃষ্ঠায় শেষ করে না দিতে পারে সেজন্যেই ময়ূরাসন, কিল্লাই মুবারকও সেজন্যে, জুম্মা মসজিদ। তাজমহলকে এই পর্যায়ে টেনে আনতে মন সায় দেয় না।

পিতা চলে যান। যাবার সময় ঝরোকার দিকে একবার চেয়ে যান।

দরবারে একমাত্র ব্যক্তি আমার রাজা। তেমনি বসে রয়েছে। অনড় নিস্পন্দ।

আঃ, বড় অদ্ভুত মানুষ তো? নড়ছে না কেন? এদিকে আসছে না কেন? মজা দেখছে নাকি? ঝরোকার পেছনে আমি ছট্‌ফট্‌ করছি—খুব ভালো লাগছে ওর।

পাথরের জালের গায়ে মুখ লাগিয়ে ডাকি,—রাজা!

নিজের স্বর নিজের কানেই বড় করুণ শোনায়। বড় মিষ্টি শোনায় যেন। এভাবে ডাকলে কি পুরুষ সাড়া না দিয়ে পারে?

কিন্তু তবু সে বসে রয়েছে। আমার ডাক তার কানে গিয়ে পৌঁছেছে বলে মনে হয় না।

—রাজা। চোখ দিয়ে আমার জল বার হয়। কিছুতেই সামলাতে পারি না। আসন ছেড়ে দ্রুত এগিয়ে আসে ও। ভারি পায়ের শব্দে স্তব্ধ দরবারকক্ষ কম্পিত।

—শাহজাদী।

—রাজা।

—সুরাটের শাসন ব্যাপারে?

—না, না। বুঝতে পারো না।

—এখন বুঝলাম। আমার ধারণা ছিল শাহজাদীদের মন প্রতি মুহূর্তে বদলায়।

—অঙ্গুরীবাগে দেখা হবার পরেও?

—হ্যাঁ।

—তবে আর কিছু বলার নেই আমার।

শরীরের সমস্ত শক্তি যেন অন্তর্হিত হয়।

—রাগ করো না জাহানারা। আগ্রায় অঙ্গুরীবাগের সেই কয়েকদিনের সন্ধ্যা পার হয়েছে। ভেবেছিলাম মুঘল-হারেমে বাস করে সে সন্ধ্যার স্মৃতি বুকের মধ্যে আঁকড়ে রাখা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

—ভুল ভেঙেছে রাজা?

—হ্যাঁ। অনুতাপ হচ্ছে এখন। তোমার কাছে কীভাবে ক্ষমা চাইব ভেবে পাচ্ছি না।

দুষ্টু বুদ্ধি জেগে ওঠে মনে। বলি,—যেভাবে আমি বলব। রাজি?

—রাজি।

—বেশ, তবে মহতাব-বাগে যাও।

—সেখানে অন্য কেউ নেই?

—না? আর সবাই হায়াত-বক্স-বাগে।

—তুমি এখনি আসবে?

—একটু পরে।

রাজা চলে যায়।

নিজের কক্ষে গিয়ে ভাবতে বসি, কোন্‌ সাজে সাজব। এতদিনের গোপন প্রতীক্ষায় আমার স্নায়ুমণ্ডলের ওপর ক্রমাগত চাপ দিয়ে চলছিল আজ তা নেই। স্নায়ুগুলি শিথিল যেন। রাজা মহতাব-বাগে বসে আছে জেনেও সাজসজ্জা করতে অবসাদ অনুভব করি। অথচ রাজার কাছে যাবার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা বিন্দুমাত্র কমেনি। শেষে অতি সাধারণভাবে নিজেকে সাজিয়ে মহতাব-বাগে প্রবেশ করি।

আজ আর এক সন্ধ্যা। এ সন্ধ্যায় দূরে তাজমহল শীর্ষ দেখা যায় না। দিগন্তের চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। চোখে পড়ে খোয়াবগাহ্‌। মাঝখানে নহবৎখানা রিক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে শাহানশাহ সাজাহানের জন্মদিনের অপেক্ষায়। সেদিন ওই নহবৎখানা থেকে ভেসে আসবে সুমধুর তান। সে তানের ঝঙ্কার

আজ আমার মনের মধ্যে। নহবৎখানার প্রয়োজন নেই।

তবু এমন একটি বিশেষ দিন আগ্রাতে হয়তো আরও ভালোভাবে উপভোগ করতে পারতাম। সেখানে যে মমতাজ বেগম রয়েছেন, আর রয়েছেন বেগম নূরজাহান।

নির্জন মহতাববাগের নির্জনতম স্থানে রাজার সাক্ষাৎ পাই। সামনে দাঁড়াতেই সে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে থাকে। নতুন করে ভুলে যাই—যৌবনের পথে আমি বহুদূর অগ্রসর হয়ে এসেছি। আমি যেন শিকারী—যৌবন উঁকি দিচ্ছে আমার জীবনে। মুখ নীচু হয়ে যায়।

—শাহজাদীর এই বেশ?

—শাহজাদী নই আমি।

—তবে?

—আমি শুধু—

—কি?

ওর সামনে বসে, ওর উরুদেশে মুখ রেখে বলি,—জানিনে।

ধীরে ধীরে আমার একটি হাত সে তার নিজের হাতে তুলে নেয়। কী তীব্র সুখ। শুধু পুরুষের দেহের সংস্পর্শে কি এত সুখ সম্ভব? যদি সম্ভব হয়, তবে বুঝবো রোশনারা ঠিক পথেই চলেছে। মুঘল-হারেমের কোনো শাহজাদীই তবে ভুল করেনি।

রাজার হাতের আঙুল আমার আঙুলগুলো জড়িয়ে ধরে। আমার শরীর যেন অবশ হয়ে যায়।

—এ কি বিরহের বেশ জাহানারা?

আমার দুই চোখে বন্যা আসে। তবু তার ঝাপসা মুখের দিকে চেয়ে বলি,—আর অভিনয় নয় রাজা।

রাজার মনের মুখোশ মুহূর্তে খুলে পড়ে। সে আগ্রহভরে আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চেপে ধরে। মুখে কথা নেই। তারও নয়, আমারও নয়। সব কথা তখন শিরায় শিরায়—বুকের ওঠা-নামায়।

মুদ্রিত নয়নে রাজার ওষ্ঠের সহস্র স্পর্শ অনুভব করি আমার সর্বাঙ্গে। এই ঠিক বেহেস্ত। গুলরুখবাঈকে রক্ষা করার চেষ্টায় যে আগুনের ছোঁয়াচ অনুভব করেছিলাম দেহের ওপরে, তার চেয়েও তীব্রতর আগুন আমার দেহের মধ্যে। কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারিনে। একি হলো! কি করব এখন? কোথায় যাব? আমি কি পাগল হয়ে গেলাম? নইলে এমনভাবে আমার নখের আঘাতে রাজার দেহ ক্ষতবিক্ষত করছি কেন?

ভীষণ ভয় পেয়ে যাই। চিৎকার করে উঠি,—আমাকে বাঁচাও রাজা।

অবলীলাক্রমে রাজা আমাকে নরম ঘাসের ওপর শুইয়ে দেন। কানে আমার ঝঙ্কৃত হয় রাজার অসংলগ্ন অতি সুমিষ্ট কথা। নিমীলিত চোখে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে রাজার অনুরূপ মুখচ্ছবি ভেসে ওঠে; হে আল্লা, এই মুহূর্তে পৃথিবীকে ধ্বংস করে দাও—

স্বপ্নের ঘোরে নিজের কক্ষে ফিরি আমি অনেক রাতে।

নাজীর আমার রাতের খাবার আগলে নিয়ে বসেছিল। তাকে বাইরে যেতে বলি। উজ্জ্বল আলোয় তার সামনে যেতে সঙ্কোচ হয়। ওদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুই এড়ায় না। শাহজাদীদের পদস্খলন দেখাই যেন ওদের কাজ। কিন্তু আমি পৃথিবীর সামনে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারি, এ আমার পদস্খলন নয়। এ যদি তাই হয়, তবে বাদশাহের সঙ্গে মমতাজ বেগমের সম্বন্ধও পদস্খলনের নজির। তবু জগৎ বড় কঠিন ঠাঁই। শাহজাদী হয়ে শাস্তির ভয় না থাকলেও সমালোচনার ভয় আছে—যে সমালোচনা ধীরে ধীরে পক্ষ বিস্তার করে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়তে পারে, অথচ যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

কে যেন রটিয়েছে দিল্লিতে এসে বাদশাহের শরীর একেবারেই সুস্থ যাচ্ছে না। তারপরই আমার

বিদেশের তিন ভাই-এর কর্মতৎপরতা দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠি। সুজা তার বিশ্বস্ত কর্মচারীদের দু-চারজনকে দিল্লিতে রেখে দিয়েছে। মুরাদও তার লোক রেখেছে এখানে। আর আওরঙজেব তার অনুচরকে নিয়মিতভাবে দরবারে আসন গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে। রোশনারাকে কৌশলে প্রশ্ন করে জানতে পারলাম মীরজুমলার ছেলে আমীর খাঁ দিল্লির নাগরিকদের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে চলেছে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে। রাগে দুঃখে আমি অভিভূত হই।

মুঘল-বংশের সেই একই নাটক পুনরাভিনীত হবে সন্দেহ নেই। রক্ত! তক্ত-তাউসের জন্য রক্ত। কেউ ছাড়বে না। দাক্ষিণাত্যের 'জীন্দাপীরেরেও' মনের রসনা থেকে লালা নিঃসৃত হচ্ছে। সেই লালা বিষাক্ত। তাতেই আমার সব চাইতে ভয়। দারা যদি একটুকু রাজনীতিজ্ঞ হ'ত, কিংবা আমি যদি পুরুষ হতাম, তবে জীন্দাপীরের জন্যে বিন্দুমাত্র চিন্তিত হতাম না। কিন্তু আমি নারী। হারেমের বাইরে আমার ক্ষমতা বেশিদূর বিস্তৃত হতে পারে না। পারতো, যদি রাজা দিল্লিতে বরাবরের জন্যে থাকত। কিন্তু তাকে নিজের রাজ্য বুন্দী ছেড়ে এখানে থাকতে বলতে পারি না। তবু কোনো কোনো মনসবদারের পদোন্নতির ব্যবস্থা করে, কোনো কোনো সামন্তকে উচ্চ সম্মান দিয়ে, কয়েকজন বিদেশী রাজ্যের রাষ্ট্রদূতদের অযথা জাঁকজমকের সঙ্গে অভ্যর্থনা করে জীন্দাপীর আওরঙজেবের সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনার অনেক অংশে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিলাম। তাই কিছুদিনের মধ্যেই তার কাছ থেকে পত্র পেলাম : তোমাকে যদি আমি পরামর্শদাতা হিসাবে পেতাম তাহলে আমি পৃথিবী জয় করতে পারতাম। কিন্তু সহজে পাব না জানি। কারণ আমার প্রতি তোমার স্নেহের অংশ বড়ই কম। তাই আল্লার কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে তিনি তোমাকে নারী করে পাঠিয়েছেন।

আবহাওয়া যখন এই রকম ঠিক সেই সময়ে এক সন্ধ্যায় নাদিরা ছুটে আসে আমাব কক্ষে। তার চোখ-মুখের চেহারা দেখে আমি আতঙ্কিত হই। কিছু বলার আগেই সে পালঙ্কের ওপর আছড়ে পড়ে বুকভাঙা কান্নায় কেঁদে ওঠে।

চমকে উঠি আমি। দারা? সুলেমান? সিপার? জানি না কার কি হলো।

—কি হয়েছে নাদিরা?

কথা বলে না সে। তেমনি কেঁদে চলে। শয্যার একটি অংশ একেবারে ভিজে যায়, তবু কথা বলে না সে। বার বার নিজেকে সামলে নিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়।

উদ্বেগে আমি ছট্‌ফট্ করি। তাকে বলি,—এভাবে কেঁদে চললে তো কিছুই হবে না নাদিরা। কি হয়েছে বল। যদি প্রতিকার করার থাকে করতে হবে তো?

সে হাত নাড়িয়ে জানিয়ে দেয়, কিছুই করার নেই।

এবারে সত্যি সত্যিই ভয় পাই আমি। তবে কি চূড়ান্ত কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেল? কী এমন দুর্ঘটনা যা শুধু নাদিরাই জানল।

কঠিন স্বরে বলে উঠি,—চুপ কর নাদিরা। যদি শুধু কাঁদতেই চাও, নিজের ঘরে গিয়ে কাঁদো। আমি এসব পছন্দ করি না।

বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে চেয়ে আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলে, আপনি ছাড়া যে আমার কেউ নেই।

আমার চোখ দুটো ভিজে ওঠে ওর কথার ধরনে। বিয়ের পরদিন থেকেই ওর প্রতি আমার দুর্বলতা। নিজের বোনদের ওপরও হয়তো অত টান নেই।

চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে স্নেহের স্বরে বলি,—বলতে চেষ্টা কর নাদিরা।

একটু চুপ করে থেকে শুধু বলে.—রানাদিল্।

—রানাদিল্

সে ঘাড় ঝাঁকায়।

—বাঈজী রানাদিল্?

ঘাড় ঝাঁকিয়ে সে বলে,—হ্যাঁ।

—রাস্তার রানাদিল্?

—হ্যাঁ।

—বাজারের রূপসী রানাদিল?

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলে,—হ্যাঁ।

—কি করেছে সে?

—দারাশুকো পাগল হয়েছে।

—কি বললে?

—সত্যি কথা। একটুও মিথ্যে নয়। প্রায়ই নগরে যেত। প্রথম প্রথম খেয়াল করিনি। পরে অস্বাভাবিক বলে মনে হলো। শেযে সন্দেহ করতে শুরু করলাম। পেছনে লোক লাগাই। আজ সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

—দারাশুকো রানাদিলের কাছে যায়। রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় যে রানাদিল্, তার কাছে যায় শাহাজাদা দারাশুকো?

—হ্যাঁ। গান গেয়ে ঘুরে বেড়ায় রানাদিল্। চারণ-কবির গান। সুন্দর গলা। দেখতে আরও চমৎকার। আমার চেয়েও। বয়স অনেক কম।

—বাজে কথা বলো না নাদিরা। দারার এ রুচি হতে পারে না। সে তো শিল্পী—সে এলেমওয়ালা লোক।

—রানাদিল্ও শিল্পী—সুগায়িকা। আমি কিছুই পারি না।

—আর কেউ জানে?

—সবাই জানে, শুধু আমরা ছাড়া। রানাদিল্ যে পথ দিয়ে হেঁটে যায় সে পথে গাড়ি-ঘোড়া যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়। শাহ্জাদার হুকুম।

—এতদূর?

—রানাদিল্ বাজারের পথে গান গেয়ে চললে আগে সবার চোখে লোভের আগুন জ্বলে উঠত, এখন সেই অগুনতি চোখে জাগে বিস্ময়, জাগে সম্ভ্রম।

—পায়াভারী হয়েছে রানাদিলের, তাই না?

—না। একবিন্দুও পরিবর্তন হয়নি তার। ঠিক আগের মতোই রয়েছে। সবার সঙ্গে কথা বলে। হাসে। শুধু তার রূপ আরও ফুটে বার হয়েছে।

—দারার মতলব কি?

—জানি না। আপনি ডেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আমার কথা বলার ইচ্ছে নেই।

নাদিরা আর কিছুক্ষণ চোখের জল ফেলে ধীরে ধীরে উঠে যায়। পেছন থেকে তার দিকে চেয়ে কষ্ট হয় আমার। কত বিশ্বাস, কতখানি স্নেহ-ভালোবাসা নিয়ে সে হারেমে থাকত। আজ থেকে তার সব শান্তি অন্তর্হিত। দিল্লির আবহাওয়ায় যখন বিপদের সঙ্কেত, অন্য তিন ভাই যখন অতিমাত্রায় কর্মব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে শাহানশাহ সাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র বাজারের নর্তকীর প্রেমে হাবুডুবু! চমৎকার?

দারাকে ডাকলাম। সব কিছু খুলে বলে রাগারাগি করলাম, কাঁদলাম, অভিমান করলাম। কোনো ফল হলো না। নাদিরাকে সে ভালোবাসে ঠিকই। কিন্তু রানাদিল্কে সে ছাড়তে পারবে না। নাদিরা এখন আর তার মনকে আগের মতো সতেজ করে তুলতে পারে না।

দারার মুখে এমন কথা শুনে দুঃখ হলো খুবই। আরও দুঃখ পেলাম সে যখন কোর-আনের নির্দেশ

তুলে ধরল। কোর-আনে রয়েছে একসঙ্গে চার বেগমকে রাখা যায়। তাতেও সন্তুষ্ট হলো না সে। এ বিষয়ে আবু-বিন-লায়লার ব্যাখ্যাও শুনিয়ে ছাড়ল আমাকে। কোর-আনের নির্দেশ ব্যাখ্যা করে নিয়ে তিনি দেখিয়েছেন একসঙ্গে উনিশ জন বেগমকে রাখা যায়। দারা হঠাৎ এমন খাঁটি মুসলমান হয়ে উঠবে স্বপ্নেও ভাবিনি। কোনোদিন যে কিতাব স্পর্শ করেনি সেও বোধহয় নিজের শাদির ব্যাপারে কিতাবী তত্ত্ব হাতড়ে বেড়ায় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে।

শেষে নিরুপায় হয়ে বাদশাহের কাছে গিয়ে রানাদিল্ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম। তিনি হেসে উঠলেন।

তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করি,—বাদশাহের হাসির কি কারণ ঘটল জানতে পারি কি?

রাগ হলে 'পিতা' সম্বোধন না করে এভাবে ঘুরিয়ে কথা বলা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে আজকাল।

বাদশাহ হেসে জবাব দেন,—নিশ্চয় জানতে পার বাদশাহ-বেগম। মুঘল বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্রের এমন দু-একটা তুচ্ছ কাজকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখার কোনো অর্থ হয় না।

—তাই বলে একজন সাধারণ নর্তকী?

—সবার চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায় বলেই সে সাধারণ। পোশাক-পরিচ্ছদ পরিয়ে হারেমে রাখলে সে সাধারণ থাকবে না। সে হয়ে উঠবে অসাধারণ।

—দারার বেগম হবে সে?

—বাইরের সমালোচনা বন্ধ করার জন্যে হবে বৈকি।

—তৈমুর-বংশের বেগম?

—তৈমুর-বংশের এমন অনেক বেগমই ছিল। শোনো বাদশাহ-বেগম, রানাদিল্ নামটা আমার অজানা নয়। সে সাধারণ নয় মোটেই। সে এক দুর্লভ রত্ন।

—আপনি জানেন?

—দারা ঘন ঘন দরবারে অনুপস্থিত বলে, তার কারণ অনুসন্ধানের গরজ যে আমার। স্তব্ধ হই। ভেবে পাই না, দারার প্রতি বাদশাহের এটি অন্ধ স্নেহ, না আর কিছু। নিজের দুর্বলতা ঢাকার জন্যেই কি রাতারাতি এমন উদার হয়ে উঠলেন তিনি? শুনতে পাই, শায়েস্তা খাঁয়ের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক সম্প্রতি আগের মতো নেই। কোনো এক বিশ্রী ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছেন।

নিজের কক্ষে এসে চোখের জল ফেলি। মায়ের কথা মনে পড়ে। বড় অসহায় বোধ হয় নিজেকে। আজ যদি মমতাজ বেগম বেঁচে থাকতেন।

নাদিরার অশ্রুসিক্ত চোখের সামনে একদিন রানাদিল্ এসে প্রবেশ করে হারেমে; দারার মুখে কী তৃপ্তির হাসি। নাদিরার দিকে চাইবার অবসরই পায় না সে। আমার বুক ভেঙে যায়। তবু এগিয়ে যাই। বাদশাহ-বেগম আমি। সংযতভাবে রানাদিল্কে অভ্যর্থনা করি। দেখে সত্যিই মুগ্ধ হই। কী নিষ্পাপ চাহনি। কোনো খেদ থাকে না। মনে মনে দারাকে তারিফ না করে পারি না। মুহূর্তের জন্যে নাদিরার দুঃখের কথাও ভুলে যাই।

রানাদিল্ ধীরে ধীরে নাদিরার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে। দারা অপ্রস্তুত। রানাদিল নাদিরার মুখের পানে চেয়ে দরদী কণ্ঠে বলে,—আপনাকে দেখেই চিনেছি। এ অবস্থাতেও আপনি সামনে রয়েছেন। অন্য কেউ হলে পারত না।

নাদিরা নীরব।

রানাদিল্ বলে,—আপনার অধিকার ছিনিয়ে নিতে আসিনি। আপনার অধিকার আপনারই রইল। আমি শুধু একপাশে পড়ে থাকব। এতে শাহজাদার সময় অনেক বাঁচবে। এতদিন শাহজাদা বাইরে যেতেন, দরবারে উপস্থিত হবার সময় পেতেন না। আপনার কাছেও আসতে পারতেন না।

নাদীরা ধীরে ধীরে বলে,—আল্লা তোমার মঙ্গল করুন। অধিকার কি কেউ নিজে থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে? সবই হচ্ছে আল্লার ইচ্ছে। আমি ব্যথা পেয়েছি খুবই। তাই বলে তোমাকে শত্রু বলে ভাবব না কখনো।

রানাদিলের মতো আমার মাথাও এই প্রথম নাদিরার প্রতি শ্রদ্ধায় আপনা হতে নত হয়।

বাদশাহ-বেগম আমি। দারাকে ডেকে নিয়ে রানাদিলের কক্ষ দেখিয়ে দিই। তার মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন। হারেমের একেবারে এক কোণে রানাদিল্‌কে রাখার ব্যবস্থা করেছি বলে মনে মনে সে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু মুখে কিছু বলতে সাহস পায় না। অন্তঃপুরে আমার ওপর কথা বলার অধিকার স্বয়ং বাদশাহেরও নেই।

রানাদিল বেগম হলো। রাস্তার মেয়ে হারেমের বিলাসিতার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। আমিও যেন তৃপ্তি পেলাম। এক ঝলকেই বুঝতে পেরেছি দারার প্রতি মেয়েটির প্রেমে বিন্দুমাত্র ভেজাল নেই। এ প্রেম সে নিজের জীবন দিয়েও রক্ষা করবে। বাদশাহ ঠিকই বলেছিলেন—দুর্লভ রত্ন রানাদিল্‌।

পরদিন দারাকে ঠিক সময়ে দরবারে উপস্থিত হতে দেখে বাদশাহ হাসলেন। নজরৎ খাঁয়ের মুখে বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠল। রাজা নেই। থাকলে কি করত জানি না। হয়তো হাসতো। হাসি নেই শুধু নাদিরা আর রোশনারার মুখে। নাদিরার না হাসার কারণ রয়েছে। কিন্তু রোশনারার চোখ দুটো রাগে লাল হয়ে উঠল—যেমন হয়েছিল বহুদিন আগে আগ্রায় 'দশ-পঁচিশী' ঘর হাতছাড়া হবার সময়ে। নহরী-বেহেস্ত-এ রোশনারার কর্তৃত্ব প্রায় বিলুপ্ত। বেশিক্ষণ আর সেখানে থাকতে পারে না। এখন সেখানে দারার সঙ্গে রানাদিলের আধিপত্য।

ইচ্ছে করে এই সব বিলাসিতার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায় না রানাদিল্‌। দু'-চারদিন তার সঙ্গে মিশে আমি বুঝতে পেরেছি। খুব সাধারণভাবে থাকতে চায় সে। কিন্তু দারা নাছোড়বান্দা। সে চায় রানাদিল্‌কে অপ্সরীর মতো সব সময় সাজিয়ে রাখতে।

রোশনারা আমার ঘরে এসে ফেটে পড়ে,—যত সব ভিখিরীর আস্তানা।

—কি হলো আবার?

—আজ বাইরে বার হয়ে রাস্তায় যত ভিখিরী দেখব, সব এনে ভরে দেব দারার হারেমে।

—এত রাগ কেন?

ঝাঁঝিয়ে ওঠে সে,—তুই তো বাদশাহ-বেগম। শুনি নাকি শাহানশাহের পরেই তোর ক্ষমতা।

—ঠিকই শুনেছিস।

—অতই যখন ক্ষমতা, তখন নহরী-বেহেস্ত-এ কুষ্ঠরোগীদের স্নানের ব্যবস্থা করে দে।

—সোজা কথা বল্‌ না রোশনারা।

—রানাদিল্‌ কি রঙমহলেই পাকাপোক্ত থাকার ব্যবস্থা করেছে?

—কেন?

—আর কেউ তো সেখানে যেতে পারে না। যখন যাই, দেখি গা চুবিয়ে বসে রয়েছে।

—তুই সামনে গেলে নিশ্চয়ই উঠে যেত।

—গা ঘিন্‌ ঘিন্‌ করে যেত।

—কিন্তু ওর রূপ? অস্বীকার করতে পারিস?

রোশনারা চুপ করে থাকে।

—ওই রূপের জন্যে মেহের-উন্নেসা নূরজাহান হয়েছিলেন। ওই রূপের জন্যে আরজমন্দ বানু হয়েছিলেন মমতাজ বেগম।

—তাদের পিতৃপরিচয় ছিল—আধিপত্য ছিল।

—ওরও হয়তো রয়েছে। আমরা শুনতে চাইনি।

—আভিজাত্য থাকলে, মরে গেলেও রাস্তার নর্তকী হয় না।

—রোশনারা, কে কখন যে কী হয়, কিছুই বলা যায় না।

একটু সময় গুম্ হয়ে থেকে সে প্রশ্ন করে,—কি ব্যবস্থা করছো?

—কিছুই না।

—আর তাই মেনে নিতে হবে?

—নিশ্চয়ই।

—বেশ।

রোশনারা যাবার জন্যে পা বাড়ায়, ঠিক সেই সময় আমার নাজীর এসে উপস্থিত হয়। সে উত্তেজিত।

—কোনো খবর আছে?

—হ্যাঁ, বাদশাহ-বেগম। ময়ূরাসন নিয়ে এইমাত্র বেবাদল খাঁ দরবারে এলেন। তাজ্জব বনে গিয়েছে সবাই।

রোশনারার রাগ মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়। সে ঝড়ের মতো বার হয়ে যায়।

আমি কিছুক্ষণ বসে থাকি। আজকাল সব কিছুই যেন অকস্মাৎ ঘটে চলেছে—আমি জানার আগেই। ময়ূরাসন আসবে আজ, সে খবরও বললেন না বাদশাহ। হয়তো তিনি নিজেও জানতেন না। নিয়মহীন এই সৃষ্টিছাড়া অব্যবস্থা সুলক্ষণ নয় মোটেই।

দরবারে ঝরোকার পেছনে হারেম ভেঙে পড়েছে। শাহজাদী, বেগম, নাজীর কেউই বোধহয় বাদ নেই। দরবারের সব কয়টি চোখ ময়ূররাসন ছেড়ে এখন ঝরোকার দিকে। একসঙ্গে একগাদা মেয়ের ভিড়ের স্বাভাবিক আওয়াজ তাদের কৌতূহলান্বিত করেছে।

রোশনারা ঝরোকায় মুখ লাগিয়ে রেখেছে। তার পিছনে রানাদিল বেগম। রোশনারা নিশ্চয়ই জানে না রানাদিলের উপস্থিতি। জানলে, ছিটকে বার হয়ে আসত।

রানাদিলের চোখ ময়ূরাসনের দিকে নয়। তার চোখ পাশের স্বর্ণ সিংহাসনের দিকে। সবাই জানে ওটি তৈরি হয়েছে শাহাজাদা দারাশুকোর জন্যে—ময়ূরাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী।

রোশনারা মুখ তোলে। রানাদিল্‌কে সরিয়ে সে আমার কাছে আসে। এতই অন্যমনস্ক যে সে দেখতেই পায় না রানাদিল্‌কে।

—কেমন দেখলি রোশনারা?

—অপূর্ব। তবে আওরঙজেব দেখলে হয়তো বলত বাজে খরচ।

—সে কি বলত, তাতে কিছু আসে যায় না।

—নিশ্চয়ই আসে যায়। তবে ওটির ওপর বসে কাজ চালাতে বোধহয় আপত্তি হবে না তার।

চিৎকার করে উঠি,—কী বলতে চাস্ তুই?

—মাথা ঠাণ্ডা রাখো বাদশাহ-বেগম। শাহানশাহ সাজাহানের পরে ওটি অধিকার করার মতো শক্তি, সাহস আর বুদ্ধি কার রয়েছে সেকথা তোমার অজানা নয়।

হারেমের সব কয়টি নারীর ভীত-চকিত চোখ আমাদের উভয়ের দিকে। আমাদের সবাই ভয় পায়, সমীহ করে। তাই রোশনারার ঔদ্ধত্যে তারা বিস্মিত। তারা ভালোভাবেই জানে ইচ্ছে করলে আমি রোশনারাকে বহিষ্কৃত করতে পারি—যদিও সে আমারই মতো শাহজাদী। শুধু হারেমে নয়, দরবারেরও অনেক সিদ্ধান্ত আমি উল্টে দিতে পারি, সে প্রমাণ তারা পেয়েছে।

কিন্তু আমি কিছুই করলাম না। রোশনারা শাহজাদী। সবার সামনে তাকে শাস্তি দেওয়া অবমাননা করা। গম্ভীর স্বরে বলি,—ভবিষ্যতে শুনে শুনে পা ফেলো রোশনারা। হয়তো আমার বাক্য, আচরণ কিংবা মুখমণ্ডলে বিস্ফোরণের পূর্বাভাস ছিল, যার ফলে রোশনারা কোনো কথা না বলে মুখ নিচু করে

চলে যায়। হারেমের নারীদের মধ্যে সাংঘাতিক কিছু দেখতে না পাওয়ার হতাশা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারা নিঃশব্দে স্থান ত্যাগ করে। আমি একলা বসে থাকি ঝরোকার কাছে। কিছুই ভালো লাগে না। মনে হয়, অনেক ভুলই করেছি আমি স্বাভাবিক মমতাবশে। সব জমা হচ্ছে। একদিন তার ফল পেতেই হবে। তবু উপায় নেই। মনুষ্যত্বকে বলি দিতে পারি না। পারতাম হয়তো, যদি রাজা আমার জীবনে না আসত।

মহতাব বাগের মাথার ওপরে নির্মল আকাশ। সেই আকাশের গায়ে সন্ধ্যা না হতেই একখণ্ড চাঁদ উঁকি দিতে শুরু করেছে। যেদিকে তাকাই শুভ্র ফুলের শোভা। বহুদিন পরে মহতাববাগে এসেছি। তাই এত শ্বেত শোভার অকৃপণতায় বিমুগ্ধ হই। এই বাগের একটি ফুলও অন্য রঙের নেই।

আমার হাতে গজমতির পাতা। সেই পাতায় রয়েছে রাজার হস্তাক্ষর। আজই পেয়েছি আমি চিঠিখানি। রাজার এক অতিবিশ্বস্ত অনুচর পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে। খুবই ছোট চিঠিখানি। তবু যেন তার মধ্যে অনেক কিছু লুকানো রয়েছে। যত পড়ি, ততই নতুন নতুন অর্থ বার হয়—ততই বুক উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। সেদিনের সেই চিরস্মরণীয় সন্ধ্যার মতো একটা আবেশ অনুভব করি। বুকের ভেতরে চেপে ধরি পত্রখানি।

মুহূর্তের জন্য ভুলে যাই, আমি বর্তমান যুগের কোনো নারী। ভুলে যাই শাহানশাহ সাজাহানের কন্যা আমি। মনে হয় আমি যেন অতীত দিনের সমরখন্দের তৈমুরের কোনো দুহিতা। আমার ইচ্ছা পূরণে সহস্র অশ্ব পর্বত-শিলা প্রকম্পিত করে দিগ্বিদিক ধাবিত হয় রাজ্যের সীমার বাইরে কোনো শস্যশ্যামলা দেশের দিকে। আমায় সন্তুষ্ট করার জন্যে শত শত বীর তরুণ ছুরিকাঘাতে নিজেদের বক্ষ ক্ষতবিক্ষত করে। আর আমি স্বর্গীয় কানিবুল উদ্যানের গুলবাহার দেখতে দেখতে সে সব কথা ভেবে মনে মনে হাসি। আমি জানি আমার প্রিয়তম কে, আমার হৃদয়ের তক্ত-তাউসে কার স্থায়ী আসন। সে আর কেউ নয়—বুন্দেলা ছত্রশাল।

চমক ভাঙে। চিন্তার অসংলগ্নতায় লজ্জিত হই। প্রতি নারীই এমন অবস্থায় বোধহয় এইরকম চিন্তা করে। বাস্তব জগৎকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। নইলে শাহানশাহ সাজাহান নন্দিনী হয়েও কেন আমি কানিবুল উদ্যানের স্বপ্ন দেখলাম। বাদশাহ তো তৈমুর-বংশের মধ্যে সব চাইতে ঐশ্বর্যশালী। তাজমহল নির্মাণের কথা অতীতে কেউ চিন্তা করতে পেরেছে কি? তবু—এ সবই রূঢ় বাস্তব। সুদূর সমরখন্দের অতীত দিনের স্বপ্ন মেশানো নেই তাতে।

রাজা লিখেছে শেষে ঃ বিন্ধ্যাচলের পরপারে যে দিগন্তরেখা সেখান থেকে উঠে আসছে এক সর্বনাশা ঝড়। জানি না, শাহানশাহ সামলাতে পারবেন কিনা।

আমিও বুঝতে পারি। দিল্লি অরক্ষিত। ঝড়ের গতিবেগ রোধ করতে হলে যে সাবধানতা, যে যোগ্যতা প্রয়োজন দিল্লিতে তার নিদারুণ অভাব। তার পরিবর্তে এখানে একদল লোক ঘরের ভিত দুর্বল করে তুলতে তৎপর হয়েছে—সামান্য ঝড়েই যাতে ধসে পড়ে। বাদশাহকে বলে ফল হয়নি। তিনি দারার ওপর অতিরিক্ত নির্ভর করতে শুরু করেছেন। অথচ তিনিই এক সময়ে আমাকে বলেছিলেন, জন্মের কয়েকদিন পরে দারার ললাটে তিনি জয়তিলকের পরিবর্তে দেখেছিলেন পরাজয়ের মসিরেখা। জ্যেষ্ঠপুত্রের এই দুর্ভাগ্যের চিহ্ন মমতাজের চোখে জল এনে দিয়েছিল। ভারী গলায় তিনি বাদশাহকে বলেছিলেন—মুঘল বংশের গৌরব সূর্য সম্ভবত অস্তমিত হলো। তোমাকে আমি সুখী করতে পারলাম না।

আরও অনেক কথাই নিশ্চয় হয়েছে, পিতা হয়ে যা তিনি আমাকে বলতে পারেননি। কিন্তু আজ সম্ভবত সব তিনি ভুলে গিয়েছেন। কিংবা ভুলে যাবার ভান করেছেন। কারণ দারার প্রতি স্নেহ তাঁর অন্ধ। তাঁর শেষ রক্তবিন্দু থাকতে সাধের ময়ূরাসন অন্য কোনো পুত্রকে ছেড়ে দেবেন না। অথচ অতি দ্রুত অশক্ত হয়ে পড়ছেন তিনি। দুর্ভাবনার সঙ্গে শেষ বয়সের অমিতাচার তাঁকে এই অবস্থায় এনে ফেলেছে। তাঁর রক্তের মধ্যে ঘুমন্ত যৌবনের নেশা হঠাৎ শেষবারের মতো জেগে ওঠে তাঁর আয়ুকে

নিঃশেষ করে দিচ্ছে। বুঝতে পেরেও বড় একটা বাধা দিতে পারি না। মেয়ে হয়ে সেটা সম্ভব নয়। বুঝতে তিনিও পারেন। তাঁর কোনো কোনো অঙ্গ এক একসময় অবশ হয়ে যায়। ভীত হয়ে আমাকে ডেকে পাঠান তিনি। অসহায়ের মতো তাঁর হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলেন—দেখতো জাহানারা। আপেলের সুঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে কি? শুনে চোখে জল আসে আমার। এ অবস্থায় কোনো পিতাই বড় ছেলের ওপর সব কিছু ছেড়ে দিতে না চায়।

মহতাব-বাগে সন্ধ্যা হয়। চাঁদ আরও উপরের দিকে ওঠে। চাঁদের আলোয় সাদা ফুলগুলি একাকার—তাদের পৃথক অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে।

হঠাৎ একটু দূরে মৃদু পদশব্দ। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। শব্দ এগিয়ে আসে। গাছের আড়ালে যাই।

একজন স্ত্রীলোক। মুখের বোরখা তার মাথার ওপরে তোলা। তবু চিনতে পারি না দূর থেকে। বুকের ভেতরে চাপা উত্তেজনা অনুভব করি। হারেমের কেউ নয়। কোনো নাজীরও নয়। নাজীরদের পরিচ্ছদ এত মূল্যবান হয় না।

আমি ভীত হই। আবার হয়তো কোনো নারকীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করা হবে আমার সাধের মহতাব-বাগে। কিছু ঘটবার আগেই পালাতে হবে। নহরী-বেহেস্ত-এ খলিলুল্লা খাঁ'র বেগমের ঘটনার পর থেকে সব সময়ই আমি ভয়ে ভয়ে থাকি।

স্ত্রীলোকটি আমার খুব কাছেই তৃণের ওপর বসে পড়ে। এবারে তাকে চিনতে পারি। শায়েস্তা খাঁয়ের বেগম। মহতাব-বাগে তার উপস্থিতির কি কারণ ঘটল বুঝতে পারি না। কানে যা আসে তাও কি তবে সত্যি? বাগের মধ্যে এরা সব আসেই বা কিভাবে? কঠোর শাস্তি দিতে হবে প্রহরীদের। নইলে ওদের অর্থের লোভ কমবে না। আজ আমি একে যেভাবে দেখছি, দু'দিন পরে আমাকেও এর চাইতে খারাপ অবস্থায় কেউ দেখবে কিনা ঠিক কি? তখন রাজা থাকবে। কী লজ্জা। আড়াল থেকে কেউ সব কিছু দেখছে কল্পনা করলেও আত্মহত্যার ইচ্ছে জাগে।

শায়েস্তা খাঁয়ের বেগমকে প্রহরীরা হয়তো বাধা দিতে সাহস পায়নি। কোনো বড় আমীর-ওমরাহের বেগম এসব বাগিচায় আসতে পারে না। তারা সাধারণত যায় শালিমার-বাগে। আজকের ব্যাপারে বাদশাহের কোনো সম্মতি নেই তো? বেগমের চঞ্চলতা এবং চারদিকে অস্থির চাহনি দেখে সেই রকমই যেন মনে হয়।

আবার পদশব্দ।

এবারে শায়েস্তা খাঁ। মুখের কুটিল হাসিতে তার ঘৃণা ঝরে। বেগম আঁতকে উঠে,—তুমি।

—হ্যাঁ, আমি। কত সাধ করে তোমায় শাদি করেছিলাম মনে আছে তো। বেগম কথা বলে না।

—ঘরের খেয়ে তুমি বাইরে মজা লুটবে, তাই কি সহ্য করতে পারি?

—বাজে কথা বলো না।

চাপা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে অত বড় পুরুষটি,—চোপ্ রহ্। তোমার মতলব বুঝতে আমার দেরি হয় না। আমি খলিলুল্লা খাঁয়ের মতো নিরেট নই।

—বলছ কি তুমি?

—ঠিকই বলছি। বাদশাহের ঠাণ্ডা দেহে যেটুকু উত্তাপ অবশিষ্ট রয়েছে, তুমি তাই উপভোগ করতে এসেছ। তাঁর ছেলের বয়সী আমি—অথচ আমার ফুটন্ত যৌবনে তোমার অরুচি ধরেছে। আমার যে তক্ত-তাউস নেই। তাই না বেগম?

—খাঁ সাহেব, বাদশাহ বৃদ্ধ।

—হ্যাঁ, বৃদ্ধ তো বটেই। তাই আমার বিশেষ ভয় নেই।

—তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘৃণা হয়।

—তোমার দিকে চাইতেও আমার মাথায় আগুন জ্বলে।

আড়ালে দাঁড়িয়ে আমার পা কাঁপে। খাঁ-সাহেবের কথাকে আমি অবিশ্বাস করতে পারি না। নহরী-বেহেস্ত-এর ঘটনার পর সব কিছু ঘটাই সম্ভব।

বেগম মাটি ছেড়ে সোজা উঠে দাঁড়ায়। খাঁ-সাহেবের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে বলে,—কেন এসেছ তুমি?

—তোমার হাত ধরে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে নয়। খলিলুল্লা খাঁয়ের মতো আমার বুকের মধ্যে আশ্রয় দেবার জন্যেও নয়।

বেগম হেসে ওঠে। নিজের হাতের ওপর মাথার বেণীকে আছড়াতে আছড়াতে বলে,—ওসব বড় বড় কথা ঘরে গিয়ে বলো। এটা মহতাব-বাগ। এখানে তেমন কিছু করলে খাঁ-সাহেবের অমন সুন্দর মাথাটি ঘাসের ওপর গড়িয়ে পড়ে সাদা মহতাব-বাগকে একটু লাল করে দেবে মাত্র।

শায়েস্তা খাঁ মোলায়েম স্বরে বলে,—আকাশে কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে দেখেছো? পাঁচদিন আগে ঈদ শেষ হয়েছে। আবার ঈদ আসবে। ঈদের পরে মহতাব-বাগের এ-দৃশ্য আরও কত বছর দেখতে পাওয়া যাবে কে জানে।

আমি বিস্মিত হই শায়েস্তা খাঁয়ের কথা বলার ভঙ্গীতে। বেগমও কম বিস্মিত নয়। সে নিশ্চয় ভেবেছে খাঁ-সাহেব ভীত। কিন্তু আমি ভালোভাবে চিনি তাকে। সহজে ভীত হবার পাত্র সে নয়।

সহসা কোষ থেকে তলোয়ার টেনে বার করে শায়েস্তা খাঁ। চাঁদের কিরণে খাঁটি ইস্পাত ঝলসে ওঠে। শূন্যে বার-দুই ঘুরিয়ে সে বলে ওঠে,—কিন্তু বেগম সাহেবা, আল্লার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তোমাকে জানাই, এর পরের আর কোনো ঈদই দেখার সৌভাগ্য হবে না তোমার। কালকের চাঁদটি কেমন উঠবে তাও দেখবে না।

বেগম আর্তনাদ করে ওঠে।

চোখের সামনে একজন নারীকে হত্যা করা হবে। কয়েক মুহূর্ত বাকি। কি করবো ভেবে পাই না। নারীহত্যাকারীদের আমি ঘেন্না করি। অথচ শায়েস্তা খাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি তাঁর বিদ্যা বুদ্ধি আর সাহসের জন্যে।

সামনে এগিয়ে যাই। ধীরে ধীরে বলি,—খাঁ-সাহেব কি তাঁর বেগমকে নির্জনে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছেন?

কেঁপে ওঠে পুরুষের দেহ। আমাকে সসম্মানে কুর্নিশ করে হেসে খাঁ-সাহেব বলে,—ঠিকই ধরেছেন বাদশাহ-বেগম।

—কিন্তু এ উদ্যান শুধু হাবেমের জন্যে। আপনার বেগম এলেন কি করে? আর আপনিই বা এলেন কেমনভাবে?

—অপরাধ হয়েছে বাদশাহ-বেগম। শাস্তি দিন। আমার ধারণা ছিল সন্ধ্যার পর সাধারণত উদ্যানে কেউ থাকেন না।

—আপনাদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারারাতও এখানে কেউ থাকতে পারে। সব কিছু নির্ভর করে শাহজাদী আর বেগমের মর্জির ওপর।

—ঠিক বলেছেন। এখনি চলে যাচ্ছি।

—প্রহরীরা আপনাদের দেখে ছেড়ে দিলেও আসার চেষ্টা করবেন না ভবিষ্যতে। শায়েস্তা খাঁ চলে যায়। তাকে অনুসরণ করে তার বেগম। শুধু আমার জন্যে সে বেঁচে গেল। বেঁচে গেল সারা জীবনের জন্যে হয়তো। কারণ খাঁ-সাহেব যত ঘৃণাই করুক না কেন তাকে, চতুর হলে তলোয়ারের খেল আর দেখাবে না তার ওপর।

যা আশঙ্কা করেছিলাম, শেষে তাই হলো। বাদশাহ শয্যা নিলেন। স্পষ্ট শুনতে পেলাম, ভারতের চারদিক থেকে উঠেছে অস্ত্রের ঝনঝনানি। রোশনারা অতিমাত্রায় ব্যস্ত। খবর পেলাম মীরজুমলা আর আমিন খাঁয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছে সে। আওরঙজেব প্রায় প্রতিদিনেরই খবর পাচ্ছে বোধহয়। ওদিকে গুজরাটে মুরাদের মতো ভালো মানুষও রণহুঙ্কার ছেড়েছে। সুজা তো তৈরি। বাংলাদেশ অনেক দূরে। তাই সে চঞ্চল।

এই অবস্থায় রাজার অভাব অতিমাত্রায় অনুভব করি। আজ যদি সে আমার পাশে থাকত, কোনো কিছুতেই বিচলিত হতাম না। দারাশুকো দায়িত্বের সমস্ত বোঝা একা বইতে পারবে কিনা জানি না। সে এখন বাদশাহের সব ক্ষমতাই পেয়েছে—শুধু ময়ূরাসন ছাড়া। হস্তীযুদ্ধের আদেশও সে দিচ্ছে—যে আদেশ বাদশাহ ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। আত্মতৃপ্তিতে দারা ভরপুর। রানাদিলের সামনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরে সে গর্বিত। কিন্তু এ গর্ব যে কতটা ক্ষণভঙ্গুর, তার মতো বিদ্বান লোক জেনেও, হৃদয় দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করছে না। বরাবরের কল্পনা-বিলাসী সে। কল্পনার ঘাড়ে চেপে আরও কতদূর অগ্রসর হবে কে জানে।

দারার হুকুম মেনে চলতে আমীর-ওমরাহদের মধ্যে স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে। খুবই অশুভ লক্ষণ। এ সমস্ত মীরজুমলার কৌশল। ধীরে ধীরে সে কূটনীতির বিষ প্রয়োগ করেছে সবার মনে। দারা বিধর্মী—সে কাফের। এর চাইতে ভাল অস্ত্র আর হতে পারে না।

সব বুঝি। অথচ বিশেষ কিছু করতে পারি না। বাদশাহের মনে বজ্র আর কুসুমের মেলামেশা। দারার মনে শুধুই কুসুম। বজ্রের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন।

মীরজুমলা। পারস্য থেকে এসেছিল একদিন। গোলকুণ্ডার পথে জুতো বিক্রি করত। পাকে-চক্রে শেষে একদিন দরবারে স্থান পেল! প্রথম দিনেই লোকটিকে আমার ভালো লাগেনি। বাদশাহকে সাবধান করে দিলাম। তিনি শুধু কান দিয়ে শুনলেন। কারণ মমতাজ বেগমের পর অনেকদিন অতিবাহিত হয়েছিল তখন! তাই আমার পরামর্শ আর আমার কথার মধ্যে তখন হয়তো মমতাজের ছায়া পাননি। একদিন দেখলাম তিনি মীরজুমলাকে দুর্লভ সম্মানে ভূষিত করলেন। উপাধি দিলেন 'মুয়াজুম খাঁ'। সেদিন আমি সত্যিই বিষাদে অভিভূত হয়েছিলাম।

আজ সেই মুয়াজুম খাঁ বিষদাঁত দেখাতে শুরু করেছে। তাঁর পুত্র আমিন খাঁও গোখরোর বাচ্চার মতো কিল্‌বিল্‌ করছে। অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কি বলব একে?

নানান চিন্তায় ভারাক্রান্ত মনে পিতার শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। তিনি তাঁর ডান হাতখানা বাড়িয়ে দেন। আমি বুঝতে পারি কেন তিনি বাড়িয়ে দিলেন হাতখানা। আজকাল অনেক সময় মুখে কিছুই বলেন না।

আমি ঘ্রাণ নিয়ে বলি—আছে বাবা। প্রথম দিনের মতোই আপেলের গন্ধ। একটুও কমেনি।

মুখ তার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,—তবে মরব না, কি বলিস?

আমি সায় দিই।

বহুক্ষণ অসাড় হয়ে পড়ে থাকেন তিনি। কোনো কথা বলেন না। আমি তাঁর শয্যার পাশে বসে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। সে মুখে প্রতিমুহূর্তে অভিব্যক্তির পরিবর্তন। তাঁর মন কাজ করে চলেছে অবিরত—তাঁরই প্রতিচ্ছবি।

শেষে এক সময়ে নিজেই বলে ওঠেন,—ইয়া তক্ত, ইয়া তাবুত।

চমকে উঠি আমি। বলি,—হঠাৎ একথা বললেন কেন?

মৃদু হাসেন তিনি। বলেন,—আমি যেন স্বপ্ন দেখছিলাম জাহানারা, আমার চার ছেলে ময়ূরাসনের সম্মুখে সাংঘাতিক এক যুদ্ধে লিপ্ত। যুদ্ধ করতে করতে মাঝে মাঝে উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠছে, —ইয়া তক্ত, ইয়া তাবুত। সে যে কী ভীষণ যুদ্ধ, না দেখলে কল্পনা করা যায় না। আমার বুক

ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিল। এক একজনের গায়ে আঘাত লাগছিল, আর আমার বুক থেকে রক্ত ঝরছিল। চেঁচিয়ে বলতে গেলাম,—তোরা থাম্। তোদের আমি ভাগ করে দিচ্ছি। ভারতবর্ষ খণ্ডিত হোক, কিন্তু তোরা বেঁচে থাক। তোরা যে মমতাজের ছেলে। শুনল না। কেউ শুনল না। একইভাবে চেঁচিয়ে উঠল, —হয় সিংহাসন, নয় মৃত্যু। জাহানারা আমি কি করব বলতে পারিস? তোর মা হলে কি করত, বলত?

বাদশাহ হাঁপাতে থাকেন। তাঁর সারা গা ঘামে ভিজে ওঠে। আমি মুখ নিচু করে ভাবতে থাকি।

—চুপ করে রইলি কেন জাহানারা?

—বাবা, দেশকে খণ্ডিত করার পক্ষপাতী আমি নই। তার চেয়ে বরং মমতাজ বেগমের তিন পুত্রের দেহ ক্ষতবিক্ষত হোক।

চোখ দুটো বড় হয়ে ওঠে বাদশাহের। যেন বিশ্বাস করতে পারেন না কথাগুলো আমিই বললাম।

—তুই—শেষে এই কথা বললি?

—হ্যাঁ বাবা। ওদের চেয়ে দেশ বড়। এ কথা কি অস্বীকার করা যায়! ভারতবর্ষে বহু বংশ রাজত্ব করে গিয়েছে। সবারই এক ছেলে ছিল না। কিন্তু ভাইদের মধ্যে মনোমালিন্য না ঘটেও একজনই সিংহাসনে বসেছে, এ বিরল নয়। তোমার ছেলেদের সে শিক্ষা হয়নি—তুমি দাওনি। তার জন্যে সারা দেশ ভুগতে পারে না। আত্মকেন্দ্রিক না হয়ে শুধু স্বপ্ন না দেখে, ওদের মধ্যে যদি ছেলেবেলা থেকে ভ্রাতৃপ্রীতি জাগিয়ে তুলতে পারতে তবে স্বপ্ন সত্যি হবার কিছুমাত্র সম্ভাবনাও থাকত না। কিন্তু তুমি তা পারনি। আজ এই শুধু আফশোষ করতে পার—আর কিছু নয়।

বাদশাহ স্তব্ধ। দেখে মনে হয় আমার কথাগুলো চার দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে বারবার তাঁর কানের মধ্যে প্রবেশ করছে। তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন। চোখের পাতা ভিজে ওঠে তাঁর। শেষে ধীরে ধীরে বলেন,—তুই বড় নিষ্ঠুর জাহানারা। এমনভাবে সত্যি কথা কখনো বলতে হয়? আমি যে অসুস্থ।

—তোমাকে ছুঁয়ে শপথ করছি বাবা, তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একদিনের তরেও নিজের ইচ্ছেতে তোমাকে ছেড়ে থাকব না। কিন্তু আমার যা সত্যি বলে মনে হবে, তাই বলতে দিও আমাকে। মিথ্যে বাক্য আমাকে দিয়ে বলিও না।

—তাই বলিস! কিন্তু দেখিস, আমার যেন খুব আঘাত না লাগে। যদি বুঝিস আঘাত পাবো, খুব আঘাত পাবো, তবে না হয় চুপ করে থাকিস।

ঠিক সেই সময়ে কোনোরকম খবর না দিয়ে নজরৎ খাঁ কক্ষের ভেতরে প্রবেশ করে। রাগে আর সঙ্কোচে আমি লাল হয়ে উঠি বুঝতে পারি। কারণ পিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলার সময় দারার উপস্থিতিও আমি সহ্য করতে পারি না। বাদশাহের সুবিধার জন্যে অসুস্থ হবার পর তাঁকে বাইরের দিকের এই কক্ষটিতে রাখা হয়েছে, যাতে আমীর-ওমরাহেরা খবরা-খবর পৌঁছে দিতে পারে কিংবা নিজেরা এসে বাদশাহের পরামর্শ নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাদের ওপর নির্দেশ রয়েছে দেখা করার আগে অন্তত আগমনবার্তা জানাতে। নজরৎ খাঁ সে নির্দেশ মানেনি।

দু পা এগিয়ে এসে বিগলিত স্বরে সে বলে,—মাফ্ করবেন বাদশাহ-বেগম। আমি ভেবেছিলাম বাদশাহ একা রয়েছেন।

বাদশাহের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। তিনি বলেন,—কোনো জরুরি খবর আছে নজরৎ?

—হ্যাঁ জাঁহাপনা। শাহজাদা সুজা দু-একদিনের মধ্যে বাংলা ছেড়ে এগিয়ে আসবেন।

উত্তেজিত স্বরে বাদশাহ বলেন,—এ খবর নতুন নয়। আমি জানি সে আসছে। তার ব্যবস্থাও করেছি।

নজরৎ খাঁ যেন হতবাক। শৃগালের মতো খল হলেও আমার চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারবে না।

—আপনি জানেন? আমি ভেবেছিলাম—

কক্ষ ছেড়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াই আমি। ওর উপস্থিতি সহ্য করতে পারি না। কিন্তু সেই মুহূর্তেই

বাইরে আসে সে। এত তাড়াতাড়ি আসবে বুঝতে পারিনি। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

—বাদশাহ-বেগম।

—বাদশাহের সঙ্গে আপনার কথা শেষ হয়েছে?

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি এমনভাবে কথা বলছেন কেন?

যতটা সম্ভব ভদ্র হবার চেষ্টা করে বলি,—এর চেয়ে ভালোভাবে কথা বলবার মতো মনের অবস্থা আমার নেই খাঁ-সাহেব। পিতা অসুস্থ। চারিদিকের সংবাদও আপনার অজানা নয়।

—আমি আছি বাদশাহ-বেগম। প্রাণ দিয়ে আপনার আর পিতার সম্মান রক্ষা করব। তাঁর মনে যে ইচ্ছাই থাকুক, সে ইচ্ছা পূরণের জন্যে আমি জীবন দেব।

—আপনারাই বাদশাহের ভরসাস্থল।

—কিন্তু একটি প্রার্থনা।

কী প্রার্থনা তা আমি জানি। তাই তাড়াতাড়ি বলি,—অন্য সময় কথা হবে। এখন আমি বড় ব্যস্ত।

নজরৎ সহসা নতজানু হয়ে আমার পায়ের ওপর দুটো হাত রেখে বলে,—ফিরিয়ে দিও না জাহানারা। কতদিন আমি অপেক্ষা করে আছি। আমি যে মানুষ।

প্রহরারত খোজা এই পরিস্থিতি থেকে আমাকে উদ্ধার করে। সে নিয়মমাফিক ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। নজরৎ উঠে দাঁড়ায়।

—জাহানারা।

—আপনি তো জানেন খাঁ-সাহেব, এভাবে কথা বললে আমি বিরক্ত হই।

—বিরক্ত? ও। কিন্তু ছত্রশাল যদি একথা বলত?

—তাহলে আমি কি করতাম, সে কথা দেখছি আপনার জানা আছে। শুধু শুধু প্রশ্ন করছেন কেন তবে?

—বেশ। মনে থাকে যেন বাদশাহ-বেগম।

—বাদশাহ-বেগমের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় তা কি জোর করে শিখিয়ে দিতে হবে খাঁ-সাহেব?

কুর্নিশ করে দ্রুত চলে যায় নজরৎ। সেদিক পানে চেয়ে বুঝতে পারি দারাশুকোর একজন পরাক্রমশালী শত্রু বাড়ল। কিন্তু উপায় নেই।

পরদিন প্রাতেই আমার সবচাইতে প্রিয় এবং শিক্ষিত কপোতটিকে তার ঘর থেকে বার করি। গায়ে হাত বুলিয়ে দিই। গালের সঙ্গে গাল ঠেকাই। তারপর তার পায়ে একটি ছোট্ট চিঠি বেঁধে প্রথম সূর্যের আলোয় একটি মিনারের পাশ থেকে যমুনার দিকে উড়িয়ে দিই। চিঠিতে লেখা ছিল ঃ তোমার জিনিসটিকে যে সবাই ছিনিয়ে নিতে চায় রাজা। তুমি নিশ্চিন্তে বসে আছো? খুব তাড়াতাড়ি এসো। বড় বিপদ।

এই দুর্দিনে দারা আর এক কাণ্ড করে বসল।

দিল্লির বাজারে প্রতি বছরই পশ্চিম দেশের স্ত্রী-পুরুষের চালান হয়। সে সময়ে বাজারে আমীর-ওমরাহ্‌দের ভিড় বাড়ে। মুসলমান নারীরা পর্দানশীন। নইলে, আমি হলফ করে বলতে পারি, নারীদের ভিড়ও কমও হ'ত না। অমন দুধে-আলতা রঙের রক্তমাংসের মানুষকে শুধু মোহরের বদলে সারা জীবন নিজের করে নেবার আদিম প্রবৃত্তি সবার মনেই সুড়সুড়ি দেয়। দুর্ভাগ্য নারীদের। তেমনি সৌভাগ্য আমীর-ওমরাহ্ আর শাহজাদাদের। প্রায় প্রত্যেকের অন্তঃপুরে সে দেশের যুবতীরা ঘর আলো করা রঙ নিয়ে বর্তমান। সুজার তো নেশাই ছিল ক্রীতদাসী ক্রয় করা। কিন্তু দারার ওসব বাতিক ছিল না।

সেই দারা একদিন বাজার থেকে নিয়ে এলো একজনকে। হারেমের প্রবেশ পথে নাদিরা পথ রোধ

করে দাঁড়ায়। সে সময়ে আমিও ছিলাম নাদিরার পাশে।

দারা থতমত খেয়ে প্রশ্ন করে,—এ কি করছ নাদিরা?

—রানাদিল্ হারেমে স্থান পাওয়ায় তোমার স্পর্ধা বেড়েছে। নাদিরার নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে ওঠে। দারার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আগে কখনো দেখিনি তাকে। কল্পনাও করিনি এ রকম দৃশ্য। একটু অবাক হই। আবার ভাবি বয়স যত বাড়ে, নারীর লজ্জা সঙ্কোচ আর সৌন্দর্য ধীরে ধীরে ঝরে পড়তে থাকে। এতে অবাক হবার কিছু নেই। নাদিরা মানবী। দুই পুত্র আর এক কন্যার মা সে। সহ্যের একটা সীমা আছে তার। হয়তো সে আগের মতোই লজ্জাশীলা থাকতে পারত—কিন্তু দারার অবিবেচনা তাকে থাকতে দিচ্ছে না।

নাদিরার দিকে চেয়ে অসহিষ্ণু স্বরে দারা বলে ওঠে, আঃ, তোমার ছেলেমানুষী গেল না। এ তো বেগম হতে যাচ্ছে না। এ যে ক্রীতদাসী।

দুঃখের হাসি হেসে নাদিরা বলে,—অমন অনেক আগুন-রঙের ক্রীতদাসী হারেমে আগুন জ্বালিয়েছে শাহজাদা। তাছাড়া, তোমাকে যে আগের মতো বিশ্বাসও করতে পারি না।

—তাই বলে নাজীর হিসেবেও ঠাঁই পাবে না হারেমে?

—না।

দারা মিনতি-ভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলে,—বাদশাহ-বেগম হারেমের কর্ত্রী নাদিরা হলো কবে থেকে?

—এক্ষেত্রে নাদিরার ইচ্ছাই, আমার ইচ্ছা দারা।

দারার মুখে হতাশা ফুটে ওঠে।

—তোমার লজ্জা হয় না দারা? দেশের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ কখনো? সুজার মতো সৌখিন মানুষও ধেয়ে আসছে দিল্লির দিকে। তোমার নিজের পুত্র গিয়েছে তাকে বাধা দিতে। আর তুমি? উপযুক্ত পুত্রের পিতা হয়ে কী করছ? ছিঃ ছিঃ! তুমি পণ্ডিত, তুমি চিন্তাশীল, তুমি দাতা—তোমার গুণের অন্ত নেই। অথচ কিছুদিন থেকে বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছ। যদি দৃষ্টিকে সামান্য একটু বাইরের দিকে মেলে দিতে তাহলে ক্রীতদাসের বাজারে গিয়ে ভিন্‌দেশী সুন্দরীদের হাত ধরে টানাটানি করতে না।

—কিন্তু—

—কোন 'কিন্তু' নয়। আমার কথা তুমি অস্বীকার করতে পার?

নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে দারা।

নাদিরার দিকে ঘুরে দাঁড়াই আমি। ইচ্ছা করে যতটা পারি নাসিকা কুঞ্চিত করি। তারপর বলি, —নাদিরা , এই বিদেশিনীকেও হারেমে ঠাঁই দাও। দেখিয়ে দাও পুরুষেরা হীন আত্মকেন্দ্রিক হলেও নারী তা নয়। নারীর ভালোবাসা দেহসর্বস্ব নয়। একদিন আসবেই যখন দারা নিজের ভুল বুঝতে পারেবে। সেদিন পৃথিবীর সব নারীকে ছেড়ে তোমার এই পা-দু'খানির সামনে লুটিয়ে পড়বে।

পাষাণ-প্রতিমার মতো নাদিরা দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রশ্ন করি,—রাজি আছো নাদিরা?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে খুব আস্তে আস্তে সে বলে,—হ্যাঁ। আমারই ভুল হয়েছিল বাদশাহ-বেগম। ভুলে গিয়েছিলাম দুর্ভাগ্যবশত আমি মুঘল শাহজাদার বেগম হয়েছি।

দারার মুখের সব রক্তটুকু অন্তর্হিত হয়। সে বোবার মতো চেয়ে থাকে তার সব চাইতে পুরাতন বেগমের দিকে।

—দাঁড়িয়ে আছো কেন দারা? নিয়ে যাও তোমার নতুন বেগমকে।

—থাক্ জাহানারা। একে না হয় বাইরেই কোথাও রেখে আসি।

—না। বাইরে রেখে এসে এই দুর্দিনে সব সময় সেখানে বসে ওর রূপসুধা পান করা চলবে না। যা কিছু করতে চাও হারেমে কর। কারণ তুমি হতভাগ্য বাদশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র। স্নেহান্ধ বাদশাহ সময়ে-অসময়ে তোমার উপস্থিতি কামনা করেন।

দারা তার ঠোঁট কামড়ে ধরে প্রশ্ন করে,—আমি কি সত্যিই এতটা নিচে নেমে গিয়েছি জাহানারা?

—আমি সামান্য নারী দারা। যা বলি, হয়তো ভাবাবেগে বলি। আমার কথার মূল্য কতটুকু? সময়ে সব কিছুরই বিচার হবে। তবে তখন আমরা কেউই থাকব না। কিন্তু এটুকু বলতে পারি, নাদিরার মতো বেগম পেয়ে যে পুরুষ অন্য নারীকে বেগমের মর্যাদা দেবার জন্যে ছট্‌ফট্ করে সে পণ্ডিত হলেও মূর্খ। সে উদার হলেও হীন। আমি বলছি না, যে পুরুষ হয়ে, শাহজাদা হয়ে, তুমি আজীবন শুধু নাদিরার আশেপাশে ঘুরে ঘুরে মর। তবে একটু কৌশলী হলে নাদিরার সম্মান অটুট রেখেও তোমার উৎকট প্রবৃত্তির তুষ্টিসাধন করতে পারতে। রানাদিলের সময় একথা আমার মনে হয়নি। কারণ তার চোখে দেখেছি তোমার প্রতি এক গভীর প্রেমের জ্যোতি। কিন্তু একে দেখে আমি সন্তুষ্ট হতে পারছি না। নাদিরাও হয়তো সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তাই এবারে কান্নায় ভেঙে না পড়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। এই বিদেশিনী ঘর সাজাবার সামগ্রী। ভুলেও ভেবো না, এ কোনোদিন একান্তভাবে তোমার হবে। যেখানে শক্তি, যেখানে মধু, সেখানেই ছুটে যাবে এ। এর কাছে হৃদয়ের মূল্য কানাকড়িও নয়।

—এইটুকু দেখেই এত কথা বলে দিতে পারলে?

—আমিও নারী দারা। নারীকে চিনতে একটি মুহূর্তই যথেষ্ট। নিয়ে যাও হারেমে। যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে।

—কি নাম দেব?

—উদীপুরী বেগম।

—এ তো কথা বলতে পারে না।

—সে ব্যবস্থা আমি করছি। প্রেম-নিবেদনের ভাষাটা অন্তত যাতে তাড়াতাড়ি রপ্ত করতে পারে, সেদিকে নজর রাখব।

নাদিরা বিদ্রুপের হাসি হেসে ওঠে। দারার মুখখানা লাল হয়ে যায়। সে তাড়াতাড়ি উদীপুরী বেগমকে নিয়ে ভেতরে চলে যায়। নাদিরা সেদিকে ফাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

পুরুষেরা সত্যই অদ্ভুত! কিন্তু আমার রাজা? ছত্রশাল? সে অদ্ভুত নয়—অপূর্ব!

আমার বয়স হয়েছে। নিশ্চয়ই হয়েছে। পিতার বার্ধক্য দেখে বুঝতে পারি আমার বয়স হয়েছে। দাদার মুখের আবছা রেখা দেখে বুঝতে পারি আমার বয়স হয়েছে। আর বুঝতে পারি, সাম্প্রতিক ঘটনার জন্যে। দারার পুত্র সুলেমানশুকো এক বিরাট সৈন্যদলের নায়ক। সেদিনের ছেলে সুলেমান। যাকে দুধ খাওয়াতে না পারলে নাদিরার স্তনজোড়া টন্‌টন্ করত। ভাবতে আনন্দ হয়। আবার সঙ্কোচে স্বীকার করছি, ভয় হয়। রাজার সঙ্গে কতটুকু মিশেছি আমি? এর মধ্যেই সে যদি আমাকে পেয়ে মহতাব-বাগের সন্ধ্যার মতো উন্মত্ত হয়ে ওঠে, তবে কিসের আনন্দ? সে আমাকে ভালোবাসে, চিরকাল বাসবে। কিন্তু সে যদি আমাকে পেয়ে পাগল না হয়, তবে যে লজ্জায় মরে যাব। সুলেমান আজ সেনাপতি, সে আজ প্রায় যুবক। আমি আর নিজেকে কীভাবে যুবতী বলে ভাবি।

আরশির সামনে দাঁড়ালে বুঝতে পারি, যৌবন যেন স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছে আমার দেহে। কিন্তু তবু কি একটু স্থূলাঙ্গী মনে হয় না নিজেকে? কোমর কি আগের মতোই সরু। জানি না। জানার জন্যে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে ভয় হয়। রোশনারা বলতে পারত। কিন্তু তাকে এ-ব্যাপারে প্রশ্ন করা যায় না। আমি যে বাদশাহ-বেগম। আমার সম্মান আকাশছোঁয়া। তাই মনে মনে জ্বলে পুড়ে মরি।

শুধু নাজীরকে ডেকে নির্দেশ দিই রুটি আমি একখানার বেশি খাব না। গোস্ত খাব নামমাত্র। আমার খাবার প্রধানত মেওয়াখানা, থেকে আসবে। শরীরের ওজন কমাতেই হবে। রোশনারা ঈষৎ স্থূল

হয়েছে। সে শরীরের দিকে বিশেষ নজর দিতে পারছে না। তার নজর এখন দক্ষিণ ভারতের দিকে। আওরঙজেব যদি আমার ভাই না হ'ত তবে রোশনারারকে দূর করে দিতাম।

রোশনারার পরামর্শে আমিন খাঁ রটিয়েছে শাহানশাহ সাজাহান মৃত। রাজধানীর অনেকেই কথাটা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। তাদের ধারণা দারাশুকো বাদশাহের মৃত্যু সংবাদ গোপন রেখেছে। কারণ, প্রকাশ পেলে তক্ত-তাউস নিয়ে রক্তারক্তি হবে। সবার বুক কাঁপে। একটা সাংঘাতিক কিছু আসন্ন।

ঠিক সেই সময়ে এক সন্ধ্যাবেলায় বাদশাহ ডেকে বলেন,—আয় তো জাহানারা তুলে ধর তো আমাকে।

তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বলি,—তুমি পারবে না বাবা।

—পারব না? আমি পারব না? ভুলে যাসনে আমি শাহানশাহ সাজাহান। আমি ইচ্ছে করলে সব পারি। আয়।

পিতার ধমকে ভীত হই। তাঁর কণ্ঠস্বরে এ দৃঢ়তা বহু বছর শুনিনি। ভুলেই গিয়েছিলাম। স্মৃতিতে ভেসে ওঠে আমার ছেলেবেলার কথা। তখন বাদশাহের প্রতিটি কথাতেই ছিল ঠিক এইরকম জোর। মুখে ছিল তাঁর সঙ্কল্পের দৃঢ়তা। আজও দেখলাম সেই দৃঢ়তার ছাপ।

হাকিম বলেছে, চুপচাপ শুয়ে থাকতে। নড়লে ক্ষতি হতে পারে। অথচ আমি তাঁর গায়ে হাত দিতেই তিনি আমার কাঁধের ওপর বাঁ-হাতখানা ফেলে দিয়ে বলেন,—পারবি তো?

—চেষ্টা করি।

—হ্যাঁ। তাই কর। ছেলেদের হাতের পুতুল হতে পারব না। শাহানশাহ সাজাহান ছেলেদের হাতের পুতুল! হাঃ হাঃ হাঃ।

চমকে উঠি।

—ওকি, কেঁপে উঠলি কেন? আমি পাগল হইনি। ঠিক উঠব আজ। দেশের সবার সামনে গিয়ে দাঁড়াব। তারা দেখবে, আমি মরিনি। বেঁচে আছি। তাদের মতোই বেঁচে আছি।

এরপরে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। আমার ওপর সামান্য ভর দিয়ে সত্যিই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আমি কথা বলতে পারি না। আনন্দে বিস্ময়ে আমি মূক। বাদশাহও নবজীবন পেয়ে খুশিতে বিহ্বল।

ঠিক সেই সময় দারা প্রবেশ করে ঝড়ের বেগে। কিন্তু বাদশাহের দিকে নজর পড়তেই সে থেমে যায়। পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

বাদশাহের মুখে মৃদু হাসি। তিনি একবার আমার দিকে, একবার দারার দিকে চেয়ে—শেষে আমাকে ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে দারার দিকে এগিয়ে যান।

দারা ছুটে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে। সেই মুহূর্তে যদি ভারতের সবাই উপস্থিত থেকে দৃশ্যটি দেখত, তাহলে বিশ্বাস করত যে দারাই একমাত্র পুত্র যে ময়ূরাসনের চেয়ে বাদশাহ সাজাহানকে বেশি ভালোবাসে। শত দুর্বলতা আর অক্ষমতা সত্ত্বেও কেন যে বাদশাহের স্নেহের প্রধান ধারা তার উপর বর্ষিত হয় এই মুহূর্তে আমি পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করলাম। আমার চোখে জল আসে।

কতক্ষণ পার হয় জানি না। দারা একসময়ে বাদশাহকে ধরে এনে শয্যার ওপর বসিয়ে দেয়। তাঁর পায়ের কাছে সে নতজানু হয়ে বলে—আওরঙজেব এগিয়ে আসছে।

—আসুক, আমি যখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি তখন হাজার আওরঙজেব এলেও ধুলোর মতো উড়ে যাবে।

—আপনি কি পারবেন? দারা প্রশ্ন করে।

—এখনো অবিশ্বাস?

—না। কিন্তু কঠিন পরিশ্রমে যদি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন? তার চেয়ে আপনি চলে-ফিরে বেড়ান, এই যথেষ্ট। লোকে তো জানল আপনি সুস্থ আছেন।

—না। আমার কথার নড়চড় হবে না। পরশু রওনা হব আগ্রার পথে।

দারা আর আমি পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকি। কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করতে পারি না। সে সাহস আমাদের হয় না।

আকুল প্রতীক্ষায় থেকে শেষে হতাশ হলাম। আমার চিঠির উত্তর পেলাম না রাজার কাছ থেকে। আমার প্রিয় কপোতটিও আর ফিরে এলো না। দুর্ভাবনা হলো। হয়তো পথের মধ্যে কপোতটির মৃত্যু হয়েছে। হয়তো ঝড়ের মধ্যে পড়ে নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। কিংবা কঠিন দায়িত্বের বোঝা নিয়ে যাবার সময় তৃষ্ণা পেলেও জল খায়নি। বুকের ছাতি ফেটে মরেছে। চিঠিখানা বেহাত হলে কোনো ভয় নেই। নিচে নাম লিখিনি। ওপরে সম্বোধন করিনি কাউকে। রাজা আমার হাতের লেখা চেনে। সে আমার কপোতটিকেও চেনে।

আশঙ্কা হয়, রাজার কোনো অমঙ্গল হয়নি তো? নজরৎ খাঁ যেভাবে সেদিন বিদায় নিল, তারপরে সব কিছু হওয়াই সম্ভব। রাজা দুর্বল না। নিজেকে রক্ষা করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি তার রয়েছে। তবু হীন ষড়যন্ত্রের কাছে তার মতো বিরাট হৃদয়ের পুরুষ প্রায়ই পরাস্ত হয়। ইতিহাসের পাতায় এমন নজিরের অভাব নেই।

অস্থির হয়ে ওঠে মন। ভেতরটা কেমন আনচান করে।

সেই অবস্থাতেই দিল্লি ত্যাগ করি। যাবার আগে হায়াৎবক্স-বাগ আর মহতাব-বাগের দিকে সজল নয়নে চাই। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে এখানে। অথচ যখন প্রথম এসেছিলাম, তখন কোনো স্মৃতিই ছিল না এদের বুকে।

জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে কী লেখা আছে জানি না। জানতে চাই না। শুধু একটি প্রার্থনা আমার আল্লার কাছে—রাজা যেন সুস্থ থাকে। সে যেন দীর্ঘজীবী হয়। আর একটিবার যেন অন্তত সে আমার জীবনে উদিত হয়ে আমার দেহমনের সব শৃঙ্খলা ভেঙে দিয়ে যায়। আর কিছুই চাই না।

পথিমধ্যে খলিলুল্লা খাঁ আর শায়েস্তা খাঁ বারবার বাদশাহের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করে। তারা চিন্তাক্লিষ্ট—তারা উদ্বেগাকুল।

তাদের এই উদ্বেগের কারণ আমি আন্দাজ করতে পারি কিন্তু বাদশাহকে বলতে পারি না। তিনি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। তাই উভয় খাঁ-সাহেবকে বাদশাহের কাছ থেকে দূরে রাখার যে সহজ উপায় তাই আমি বেছে নিলাম। বাদশাহের পাশে তাঁর শকটের মধ্যে গিয়ে বসলাম। ছট্‌ফট্ করে মরুক ওরা।

কিন্তু আমার সব সাবধানতা বিফলে গেল। ওরা অন্য পথ নিল। বাদশাহের কাছে ভিড়তে না পেরে দারাকে গিয়ে ধরল। তাকে বোঝাল বীরত্ব প্রকাশের এবং প্রজাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণের এমন সুযোগ সে আর পাবে না। বাদশাহকে আওরঙজেবের বিরুদ্ধে অভিযানে না পাঠিয়ে তার নিজেরই যাওয়া উচিত। দারা তাই বুঝল। খলিলুল্লা খাঁ আর শায়েস্তা খাঁয়ের মতো চিরপরিচিত গুণী লোকদেরও যে অনেক সময়ে অবিশ্বাস করতে হয় একথা তাকে বোঝাতে পারলাম না। অনেক চেষ্টা করেও পারলাম না আমি।

তাই এক সন্ধ্যায় বাদশাহের শিবিরে এলো সে। আমি জানতাম সে আসবে—তাই আগে থেকেই উপস্থিত ছিলাম।

আমাকে দেখে দারা একটু অসন্তুষ্ট হলো। হোক। নিজের যতটুকু সামর্থ্য আছে আমি কাজে লাগাব। কিন্তু দারাও দেখলাম বেশ চতুর হয়ে উঠেছে। হাসিমুখে সে এমন কথার উত্থাপন করল যে আমি থ হয়ে গেলাম।

সে বলল,—জাহানারার একটা ব্যবস্থা করতে হয় এবারে।

বাদশাহ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকান।

দারা বলে,—সারা জীবন একে মুঘল হারেমে বাদশাহ-বেগম করে রেখে লাভ নেই। এতে সম্মান আছে প্রচুর, কিন্তু শান্তি নেই।

—কি করে বুঝলে? বাদশাহ প্রশ্ন করেন।

—খুবই স্বাভাবিক। কেউ এভাবে ছন্নছাড়া জীবন কাটাতে পারে না। এ যেন বালির ওপর প্রাসাদ গড়া। জাহানারার একটা স্থিতি হওয়া প্রয়োজন।

—কি রকম?

—সারা পৃথিবীতে একটি মানুষকে পেলে ও সব কিছু ফেলে হিন্দুদের মতো হিমালয়ে গিয়েও থাকতে পারে।

—তাই নাকি? কে সে ভাগ্যবানটি? বাদশাহের কণ্ঠস্বরে রসিকতা। যদিও আমার বুক কাঁপে।

—বুন্দীরাজ ছত্রশাল।

বাদশাহের শয্যার একপাশে আমি বসে পড়ি। দারা আমাকে নিশ্চেষ্ট করার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র নিক্ষেপ করেছে।

বাদশাহ কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকেন। আমি তাঁর দিকে চাইতে পারি না। দারার কথাকে তিনি কিভাবে নিলেন আমি জানি না। শেষে তিনি বলেন,—জাহানারার নির্বাচনের তারিফ করতে হয়। একথা আমি কখনো ভাবিনি।

—আপনার মত আছে?

—আছে। হিন্দু বলে প্রশ্ন করছ তো? হোক, হিন্দু। হিন্দুদের সঙ্গে মুঘলবংশের সম্বন্ধ এই প্রথম নয়। অনেক দিয়েছে জাহানারা। যদি সত্যই সে ছত্রশালকে পেতে চায়, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

আমি কেঁদে ফেলি।

আমার কান্নার দিকে চেয়ে বাদশাহ বলেন—এতদিন বলিসনি কেন জাহানারা? এতে সঙ্কোচের কি আছে।

কোনো কথা বলতে পারি না। চোখের সামনে ভেসে ওঠে রাজার সুন্দর মুখ আর সুঠাম দেহ। আমি যেন আর সহ্য করতে পারি না। এতখানি নির্লিপ্ত হবার পর একটু একা থাকতে চাই—একা ভাবতে চাই। দারা বাদশাহের কাছে কোনো কথা উত্থাপন করবে জেনেও আমি তাঁর শিবির ছেড়ে নিজের শিবিরে চলে আসি। আমি নারী।

একান্তে বসে বসে দারার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে ওঠে। যদিও তাকে অশ্রদ্ধা করার মতো কোনো কারণই নেই। সে বিরাট পণ্ডিত—সারা হিন্দুস্থানে তার মতো সব ধর্মের প্রতি দখল বোধ হয় কারো নেই। সে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ উপনিষদের অনুবাদ করে 'রাফিজী'—বিধর্মী আখ্যা মাথা পেতে নিয়েছে। যার ফলে এত ভালো হয়েও সে অধিকাংশ আমীর-ওমরাহের চক্ষুশূল। তার সঙ্কলিত 'সর-ই আসবার' এক অপূর্ব গ্রন্থ। এমনকি সে খ্রীষ্টধর্ম নিয়েও গভীর পড়াশুনা করেছে। আজকাল তাকে যেন সেই দিকেই বেশি ঝুঁকতে দেখি। শুধু পণ্ডিত নয়—সে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। কোথায় লাগে মুরাদ। কোথায় লাগে আওরঙজেব আর সুজা। যদি বীরত্বের পরীক্ষা হয়—যদি সম্মুখ যুদ্ধ হয়, তবে দারার বীরত্ব সবাইকে ছাপিয়ে যাবে।

কিন্তু দারা সরল। তার মনে ময়লা নেই, নীচতা নেই, দীনতা নেই। স্বভাবতই সে সবাইকে বিশ্বাস করে। শুধু এই একটি কারণে আমি তাকে সবার চেয়ে দুর্বল বলে ভাবি। এই কারণেই আমার এত ভয় হয়। তাই আমি ওকে সুযোগ পেলেই তিরস্কার করি। নইলে সে তিরস্কারের ঊর্ধ্বে। নাদিরা অবধি একথা জানে। রানাদিলকে তাই সে বুকে টেনে নিয়েছে। উদীপুরী বেগমের মতো মেকি-হৃদয়ের সুন্দরীকেও সে দারার সম্মুখে কখনো অবহেলা করে না।

দারার ইচ্ছাই পূর্ণ হলো। শায়েস্তা খাঁ, মীরজুমলা, খলিলুল্লা খাঁ আর নজরৎ খাঁয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। আমি যেন দিব্য চক্ষে দেখতে পাই তাদের শিবিরে আনন্দের হিল্লোল। এতক্ষণে সরাবের নদী বয়ে যাচ্ছে সেখানে।

আগ্রা আর মাত্র একদিনের পথ। বাদশাহ আবার অসুস্থবোধ করতে শুরু করলেন। তাঁর দেহের একদিক ধীরে ধীরে অবশ হতে লাগল। হয়তো দারার নেতৃত্ব বরণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সেই বিস্ময়কর মনের জোরে ভাঁটার টান শুরু হয়েছিল। ভয় হয় আমার। আর একটা দিন যেন তিনি ভালো থাকেন।

দারা প্রস্তুত হয়ে বাদশাহের কাছে বিদায় নিতে এলে তিনি বললেন,—মানুষকে অবিশ্বাস করা হয়তো পাপ দারা, কিন্তু এই পৃথিবীতে বিরাট দায়িত্ব যাদের মাথায় এসে পড়ে, সূক্ষ্ম বিচার করে চলতে হয় তাদের। নইলে জীবনে প্রতি ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হতে হয়। বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে সব কিছু বিচার করে চলবে। তাতে যদি অতি বিশ্বস্ত বলে যাকে জান, তাকেও অবিশ্বাস করতে হয় করবে। দোষের কিছু নেই।

—ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনি কি শায়েস্তা খাঁ, দেওয়ান মীরজুমলার মতো মানুষকেও অবিশ্বাস করতে বলেন?

—নির্দিষ্টভাবে কাউকেই অবিশ্বাস করতে বলি না। তেমন কিছু দেখলে নিজের পুত্রকেও অবিশ্বাস করতে হয়। দেখতেও তো পাচ্ছ।

দারার ভ্রু কুঞ্চিত হয়। সে বাদশাহের কথায় আঘাত পেয়েছে। নিজের পুত্রদের কথা হয়তো ভাবছে।

আমি তাড়াতড়ি বলে উঠি,—হ্যাঁ, শায়েস্তা খাঁ, মীরজুমলা—এদেরও অবিশ্বাস করতে হবে, তেমন দেখলে।

—নারীর উপযুক্ত কথাই বললে জাহানারা।

—নারী এর চেয়েও কঠিন কথা বলতে পারে, যদি সে দেখে পুরুষ পৃথিবীর মাটির ওপর না দাঁড়িয়ে নিজের চিন্তাধারায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে সে বলে ওঠে—তোমার উপদেশ মনে থাকবে বাদশাহ-বেগম।

—মনে থাকলেই মঙ্গল। নইলে মুঘল-ইতিহাসে এমন কিছু ঘটে যাবে, যার ফল হয়তো স্বয়ং বাদশাহকে ভোগ করতে হবে। মনে থাকলেই মঙ্গল। নইলে এ-ই বোধহয় তোমার সঙ্গে আমার শেষ কথা।

ধন্যবাদ। দারা চলে যায়।

বাদশাহ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, আমারও সেই ভয় জাহানারা। ইচ্ছে ছিল, ওকে নিজের সঙ্গে রাখব। একা যেতে দেব না। কিন্তু কেন যেন অনুমতি দিয়ে ফেললাম। তারপর থেকেই অসুস্থ বোধ করছি।

—আগ্রায় পৌঁছে একটু বিশ্রাম নিলেই সুস্থ হয়ে উঠবেন বাবা।

আগ্রায় পৌঁছে বাদশাহ আরও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে কোনোরকমে কেল্লায় নিয়ে গিয়ে শয্যায় শুইয়ে দেওয়া হলো। আমার মন স্থির হয়ে ওঠে। একটা ঘোর অমঙ্গলের ছায়া যেন সমস্ত দেশকে আচ্ছন্ন করছে।

দারা এগিয়ে গিয়েছে। সুলেমানশুকো সুজাকে পরাস্ত করে ফিরে আসছে। তার কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছে, সে যেন সোজা গিয়ে দারার সঙ্গে মিলিত হয়ে তার শক্তি বৃদ্ধি করে। তবু কেন যেন ভরসা পাই না। কারণ দারার সঙ্গে রয়েছে কয়েকটি সাপের মতো খল লোক, যাদের প্রভাব সে কাটিয়ে উঠতে পারবে কিনা জানি না।

এই সময়ে যদি রাজা থাকত। তার কী হয়েছে জানি না। কোনো বিপদ না হলে এতদিন সে নিশ্চয়ই

আসত। অভিমানে আমার চোখে জল আসে। বিপদ হলে একটা সংবাদও কি দিতে নেই।

চোখের জল মুছে ফেলে বাদশাহের শয্যার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তিনি আমাকে লক্ষ্য করেন না। তিনি চেয়ে রয়েছেন বাতায়নের দিকে—যে বাতায়ন পথে দেখা যায় দূরের তাজমহলকে। বাদশাহের চোখে অশ্রু। অস্ফুটস্বরে তিনি ক্রমাগত উচ্চারণ করে চলেছেন,—মমতাজ, মমজাত, মমতাজ—

এখানে এসে অবধি তাজমহলের দিকে ভালোভাবে চাইবার অবসর আমি পাইনি। আজ বাদশাহের দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে চাই। স্তব্ধ তাজমহল। দুঃখভারাক্রান্ত তাজমহল। তার মর্মরের প্রতিটি বিন্দুতে শোকের ছাপ। তাজমহল কাঁদছে।

—জাহানারা! চিৎকার করে ওঠেন বাদশাহ।

—এই যে বাবা।

—ওঃ, তুই এখানে। দেখছিস জাহানারা, তোর মা কাঁদছে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

কোনো কথা বলি না। সযত্নে বাদশাহের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে স্থান ত্যাগ করি।

প্রাসাদ শিখরে উঠে সামনের দিকে চেয়ে থাকি। এখান থেকে রাস্তা চোখে পড়ে। পথের দিকে চাইলে যেন দেশকে অনুভব করা যায়। লোকের যাতায়াত আগের মতোই রয়েছে। কিন্তু কেমন যেন থমথমে ভাব। আগ্রা প্রায় আগের মতোই রয়েছে, কিন্তু কে যেন তার প্রাণটিতে সযত্নে তুলে নিয়ে কোথায় রেখে এসেছে। দেখলে মনে হয় মৃত-নগরী।

দূর থেকে একদল অশ্বারোহী ছুটে আসে দেখতে পাই। তাদের চেনা যায় না, অথচ তাদের মধ্যে একজনের দেহের গঠন দেখে মনের মধ্যে তোলপাড় করে। হে আল্লা, সে যেন হয়। তাকে আমার বড় প্রয়োজন।

অশ্বারোহীরা দুর্গের দ্বারদেশে এসে থেমে যায়। এবারে চিনতে পারি। আনন্দে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হয়। ছুটে নিচে নামি। সিঁড়ির যেন শেষ নেই। এত সিঁড়ি আগে তো কখনো ছিল না।

নিচে নামতেই একজন খোজা এসে বলে,—ছত্রশাল দর্শনপ্রার্থী।

—এখনি তাকে নিয়ে এসো। আমি অপেক্ষা করছি পাশের ঘরে।

প্রহরী চলে যায়। অধীর আগ্রহে আমার বুক ওঠা-নামা করে। নিজেকে মনে হয় সেই কত বছর আগের কিশোরী। হাসব, না কাঁদব বুঝতে পারি না। বুঝতে পারি না অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে থাকব কিনা। হয়তো এ বয়সে সেটা শোভা পাবে না। কিন্তু রাজার কাছে কি আমার বয়স বেড়েছে? আমার কাছে তো ও তেমনিই আছে। খোজার সম্ভ্রমসূচক আহ্বান কানে আসে। সে কক্ষের দরওয়াজা দেখিয়ে দিয়ে থেমে যায় বাইরে। ছত্রশাল ভেতরে প্রবেশ করে।

একি! এত রোগা হয়ে গিয়েছ? দূর থেকে তো বুঝতে পারিনি একটুও। চোখের কোণে কালি পড়েছে। নির্বাক দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। সব ভুলে যাই। ভুলে যাই প্রাসাদের অন্য কক্ষে বাদশাহ অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন। ভুলে যাই দারাশুকো আওরঙজেবের বিরুদ্ধে অভিযান করেছে। ভুলে যাই মুরাদও এগিয়ে আসছে—আওরঙজেব তাকে কৌশলে দলে টানছে। সব ভুলে যাই।

—রাজার ওষ্ঠ নড়ে ওঠে। কিন্তু শব্দ বার হয় না। আমি ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরি। আর পারি না। ভেঙে পড়ি কান্নায়। ছত্রশাল আমাকে চেপে না ধরলে তার পায়ের কাছে পড়ে যেতাম।

বহুক্ষণ পরে ছত্রশাল ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে, কবে এমন হলো?

—কি হলো রাজা?

—বাদশাহের মৃত্যু?

চমকে উঠি। দূরে সরে যাই। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলি,—কোথায় শুনলে একথা?

—নিজের রাজ্য থেকে শুরু করে আগ্রা পর্যন্ত—সব জায়গাতেই।

—আমিন খাঁ আবার নোংরা খেলা শুরু করেছে। আর এবারে সফলও হয়েছে।

—বাদশাহ তবে মৃত নন?

—না। তিনি অসুস্থ।

ছত্রশালকে চিন্তান্বিত দেখায়। বলে,—আজ থেকে বিশ্বস্ত লোক দিয়ে প্রচার শুরু কর যে তিনি বেঁচে আছেন। নইলে যুদ্ধ ছাড়াই আওরঙজেব জিতে যাবে।

—তুমি ব্যবস্থা কর।

—আমি পারতাম। কিন্তু এখানে অপেক্ষা করলে তো আমার চলবে না। শাহজাদা দারাশুকোর পাশে গিয়ে আমাকে দাঁড়াতে হবে।

—তুমি এখানেই থাকো রাজা! আমার পাশে।

—ক্ষমা করো জাহানারা। তোমার এই একটি অনুরোধ শুধু আমি রাখতে পারলাম না। যুদ্ধের সময় বুন্দীরাজের স্থান বাদশাহের পাশে। এখন দারাশুকো বাদশাহের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারি না।

ছত্রশাল আমার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দেয়। যেন ঘুম পাড়িয়ে দেবে এখুনি। আমি কোনো প্রতিবাদ করতে পারি না। সে যা বলেছে তার চেয়ে সত্যি কথা তো কিছু হতে পারে না। তবু ওকে অপ্রস্তুত করার লোভ সংবরণ করতে পারি না। বলি,—আমার কোনো অনুরোধ তুমি রেখেছ? কপোত পাঠিয়ে তোমার জন্যে প্রতিটি মুহূর্ত অপেক্ষা করেছি। তুমি এলে না। একটা সংবাদও পাঠালে না।

—আমি অসুস্থ ছিলাম জাহানারা। তুমি তো জানো, তোমার ডাকে সাড়া না দিয়ে আমি পারি না।

—কপোতটিকে ফিরিয়ে দিতে পারতে খবর সমেত।

—ভেবেছিলাম তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠে নিজেই দেখা করব।

—আমি এদিকে ভেবে মরি।

—তোমার শরীরও তো ভালো নেই জাহানারা।

—সূর্য যে আমার মাত্র একটি রাজা। সে সূর্যের উদয় না হলে কি সূর্যমুখী বাঁচে?

রাজা আবার আমাকে জড়িয়ে ধরে। তার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে আমি তার দ্রুত হৃদ্স্পন্দন শুনে যাই।

রাজা চলে যাবে। চলে যাবে চম্বল নদীর তীরে, যার অপর পাড়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে আওরঙজেবের সৈন্যবাহিনী।

কেন যেন মনে হয় রাজা আর ফিরবে না। ভাগ্যদেবী আজকাল পাপীদের প্রতিই বেশি প্রসন্ন। রুস্তম খাঁ, রামসিংহ, দায়ুদ খাঁ, আর ছত্রশালকে নিয়ে দারাশুকোর যে বিরাট বাহিনী, বীরত্বে সমস্ত পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিতে পারে। কিন্তু অন্যদিকে রয়েছে সেই পাপীর দল—যারা বুক ফুলিয়ে সামনে না দাঁড়িয়ে পেছন থেকে ছুরি চালায়। এদের হীনতা আর চতুরতা বীরেরা তাদের উদার হৃদয় নিয়ে সব সময় ধরতে পারে না। পারলে শুধু ছত্রশাল আর দায়ুদ খাঁ-ই পারবে। তারা বীর আবার সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। কিন্তু দারাশুকোকে তারা কতখানি প্রভাবিত করতে পারবে জানি না বলেই আমার ভয়।

আমার প্রকোষ্ঠে বসে রাজাও সেই কথা বলল। তার ভয় খলিলুল্লা খাঁকে। দারা এখনো তাকে বিশ্বাস করে অন্ধের মতো। রাজার অনুরোধে আমি দারাকে একখানা পত্র লিখে দিই।

ছত্রশালের সঙ্গে যুদ্ধ-সংক্রান্ত আরও বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পর হাঁপিয়ে উঠি। মনে হয় আজই শেষ দিন। এরপর হয়তো রাজার উষ্ণ সান্নিধ্য জীবনে আর কখনো পাবো না।

তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘুরিয়ে বলি,—আমার কপোতটিকে তো ফেরৎ দিলে না।

—সেটি আমার সঙ্গে রয়েছে। তুমি পাবে না।

—কেন?

—বলব?

—বলো।

—যুদ্ধক্ষেত্রে কপোতটিকে নিয়ে আমার বিশ্বস্ত অনুচর আমাকে অনুসরণ করবে।

—কেন?

—তোমাকে শেষ সংবাদ দেবার জন্যে।

—শেষ সংবাদ?

—হ্যাঁ। আমি জানি, আমাকে হত্যা করার জন্যে নজরৎ খাঁ সব আয়োজনই করে রেখেছে। সে তা পারত না, যদি আমি বারবার শাহজাদার সঙ্গে থাকতাম। কিন্তু সে সুযোগ পেয়েছে নজরৎ। অবশ্য আমার সামনে এলে তার নিস্তার নেই। কিন্তু সামনে সে আসবে না। সাহস নেই। যদি আমি নিহত হই জাহানারা, আমার অনুচরটি তোমার কপোতের গায়ে আমার রক্তের ছোপ লাগিয়ে ছেড়ে দেবে। তুমি বুঝতে পারবে রাজা আর নেই।

—উঃ।

—শুনতে খারাপ লাগে জাহানারা। কিন্তু এর চেয়ে তাড়াতাড়ি আর কেউ তো এসে তোমাকে দুঃসংবাদ দিতে পারবে না।

কী উত্তর দেব। কিছুই বলার নেই।

—জাহানারা। রাজার স্বর আবেগ-কম্পিত। সে একেবারে আমার কাছটিতে এগিয়ে আসে।

কত সময় চলে যায় জানি না। শেষে দেখি বাইরে দিনের আলো ফিকে হয়ে এসেছে। সন্ধ্যার একটি মাত্র তারা আকাশে জ্বলজ্বল করছে।

—চলো রাজা।

—কোথায়?

—তাজমহলে।

দু'জনা হাত ধরাধরি করে তাজমহলে প্রবেশ করি। আজ আর কোনো লজ্জা, কোনো সঙ্কোচ আমাকে বাধা দিতে পারল না। আমাদের এ সম্পর্ককে বাদশাহ অনুমোদন করেছেন। হয়তো এভাবে প্রকাশ্যে যাওয়াতে আমার সম্মান কিছুটা নষ্ট হলো, কিন্তু সম্মান ফিরে পাবার অনেক সুযোগ আসবে। আজকের এই সুযোগ জীবনে নাও আসতে পারে।

মায়ের সমাধির পাশে গিয়ে দাঁড়াই দু'জনা। স্তব্ধ পবিত্রতা বিরাজ করছে সেখানে। বাতিগুলি সমাধির চারপাশে নিঃশব্দে পুড়ে চলেছে। রাজা মাথা নত করে। হিন্দুর ছেলে সে। দেখে মনে হয় ঠিক যেন মায়ের আশীর্বাদ মাথা পেতে নিচ্ছে। সুন্দর লাগে দেখতে। নয়ন ভরে দেখে নিই ওকে।

—ওই মুহূর্তে এই বিরাট তাজমহলের শ্বেতমর্মর প্রচণ্ড শব্দ করে একসঙ্গে ভেঙে পড়তে পারে না রাজা?

—লাভ কি? এ মৃত্যুতে তো বীরত্ব নেই।

—তা নেই বটে। কিন্তু দু'জনা একসঙ্গে মরতে পারতাম।

—না। তুমি বেঁচে থাকো জাহানারা।

—বড় স্বার্থপর তুমি।

রাজা হাসে। দুষ্টুমি করে বলে,—বেশ ভেঙে পড়ুক তবে। এমন একটি সৌন্দর্য পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাক।

রাজার মুখ চেপে ধরে বলি,—ভয় নেই। অক্ষয় হয়ে থাকবে তাজমহল। এর প্রকৃত শিল্পী এক

অসাধারণ পুরুষ।

—দেখেছ তাঁকে?

—হ্যাঁ।

—কেমন দেখতে?

—ঠিক তোমার মতো।

—আমার মতো এই এত বড় দেহ শিল্পীর?

অনেকক্ষণ ভেবে, শেষে হতাশ হয়ে বলি,—তা তো মনে নেই। কিন্তু তার চোখ দু'টি ঠিক তোমার চোখের মতো।

—তাকে ভালোবেসেছিলে বুঝি?

—খুব। কত বছর আগেকার কথা। তোমার নামও শুনিনি তখন। এই শিল্পীকে বোধহয় হৃদয় দিয়ে ফেলেছিলাম।

—ভাগ্যবান সে।

—না, ভাগ্যাহত সে। আমার ভালোবাসায় অভিশাপ আছে রাজা।

—না। তোমার ভালোবাসায় আশীর্বাদ রয়েছে জাহানারা।

—সান্ত্বনা দিচ্ছ।

—একটুও না। আমার যা বিশ্বাস তাই বলছি। শিল্পীর কি বিশ্বাস ছিল জানি না।

—সে আমার পরিচয় জানত না রাজা। শুধু একবার একটু সময়ের জন্যে দেখেছিল।

রাজাকে সব কথা খুলে বলি।

রাত হয়।

মৌলবী একহাতে বাতি নিয়ে দূর থেকে ধীরে ধীরে সমাধির দিকে এগিয়ে আসেন। তিনি আমাদের দিকে না চেয়ে সমাধির পাশে সযত্নে রক্ষিত কোর-আন খুলে বসেন।

—মৌলবী সাহেব।

মুখ তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চান তিনি।

—আমরা রয়েছি, অসুবিধা হবে না?

—আমি তো জানতাম না মা তোমরা রয়েছ।

—আমাদের দেখতে পাননি?

—না। খেয়াল করিনি।

অবাক হই। তাঁর সৌম্য মুখের দিকে চেয়ে মন শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে। তাজমহলের উদ্বোধনের দিনের কথা মনে হয়। ঠিক আগের মতোই চেহারা রয়েছে—বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। পৃথিবীতে রাজত্ব পেলে বাদশাহ সাজাহানের মতো দ্রুত চেহারার পরিবর্তন হয়। কিন্তু তারও ওপরের রাজত্বের সন্ধান পেলে বয়স আর চেহারা যেন নিজেদের কাজ করতে ভুলে যায়।

—আমাদের আশীর্বাদ করুন।

—আমার আশীর্বাদের প্রয়োজন কি? এখানে যিনি রয়েছেন তাঁর আশীর্বাদই তো যথেষ্ট। পাশাপাশি তোমাদের দু'জনকে দেখে তিনি বুঝতে পেরেছেন—আশীর্বাদ করেছেন। কিন্তু তোমরা কে? এই সময়ে এলে কি করে?

একটু ইতস্তত করি। চিনতে পারেননি তিনি শাহানশাহ সাজাহানের দুহিতাকে। কি করেই বা চিনবেন? তাঁর জগতে তিনি একা—একচ্ছত্র। সেখানে বাদশাহেরও কোনো মূল্য নেই।

—আমি জাহানারা।

তিনি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে থাকেন। ধীরে ধীরে তাঁর মুখ পবিত্র হাসিতে উজ্জ্বল

হয়ে ওঠে,—মায়ের কাছে এসেছ। খুব ভাল করেছ। ইনি কে? ও, বুঝেছি।

লজ্জা পাই। অপাঙ্গে রাজার দিকে চেয়ে দেখি তার চোখে কৌতূহল।

—এঁকে আশীর্বাদ করুন মৌলবী সাহেব। ইনি কাল প্রত্যুষে যুদ্ধযাত্রা করছেন।

—তুমি কি পার্থিব সুখের জন্যে আশীর্বাদ চাইছ জাহানারা? তবে ভুল করেছ মা।

ছত্রশাল তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—না, পার্থিব সুখ নয়। সুখ বলতে আপনি যা বোঝেন, তাই চাইছি।

মৌলবী আনন্দিত হন। প্রসন্ন দৃষ্টিতে রাজার দিকে চেয়ে বলেন,—তার অর্থ যে দুঃখ।

আমরা চুপ করে থাকি।

মৌলবী ধীরে ধীরে বললেন,—তোমাদের মনকে আমি জানিতে পেরেছি। খাঁটি প্রেম মানেই তো দুঃখ। এই যে ইনি শায়িত রয়েছেন এখানে—মনে হয় কত দুঃখের। তোমাদের দু'জনকে আশীর্বাদ করলাম জাহানারা।

বুকেব ভেতর আমার কেঁপে ওঠে। কিন্তু রাজা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সে আমার হাত ধরে। আমি তাড়াতাড়ি মায়ের সমাধি থেকে একটি তাজা ফুলেব মালা তুলে রাজার সঙ্গে বাইরে যাই।

নির্জন উদ্যান। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র। আমি রাজার গলায় মালা পরিয়ে দিই।

রাজার চোখ চিকচিক করে ওঠে। সে বলে,—এ মালা আমার গলায় থাকবে জাহানারা।

—আর তো দেখা হবে না।

—না কাল ভোরেই চলে যাব।

মনে মনে ভাবি, বাজা যদি বাদশাহ হ'ত? আর আমি যদি তার বেগম হতাম, আজ সারারাত তাকে জড়িয়ে ধরে থাকতাম। কিন্তু উপায় নেই। হারেমে সে থাকতে পারে না। আমিও হারেমের বাইরে যেতে পারি না রাত্রে। এই শেষ। হয়তো শেষ বিদায়। রাজার নরম চুলে ভর্তি মাথা দু' হাত দিয়ে নামিয়ে এনে আমার বুকের মধ্যে চেপে ধরি।

ইতিহাস আমি লিখছি না। ইতিহাস লেখার জন্যে অনেক গুণী কলম উঁচিয়ে অপেক্ষা করছেন। শাহানশাহ সাজাহানের রাজত্বকালের সব ঘটনাও তাঁরা নিশ্চয়ই দিনের পর দিন লিখে যাচ্ছেন। তাঁর রাজত্বের শেষের দিকের এই অশান্তির কথাও হয়তো বাদ যাবে না। যদি ঘোর অমঙ্গল কিছু তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে, নিঃসন্দেহে তাও টুকে রাখবেন এঁরা। তারপর সাজাহানের দিন ফুরিয়ে যাবে একদিন। তক্ত-তাউসে নতুন বাদশাহ এসে বসবেন। কে সেই নতুন বাদশাহ কেউ জানে না এখন। কিন্তু একদিন জানবে। তখন তাঁর জয়গান, তাঁর কীর্তি কাহিনীও লেখা শুরু হয়ে যাবে। সত্যি-মিথ্যে অনেক কিছুই মিশানো থাকবে এসব লেখায়। তবে মূল্য রয়েছে এর। কারণ মোটামুটি সব ঘটনাই তাতে বিবৃত থাকে।

আমার লেখার কোনো মূল্যই নেই। নিজের খুশিমতো যা যখন মনে আসে লিখি। এই লেখা যদি কয়েক যুগ পার হয়ে কারও হাতে গিয়ে পড়ে, সে আমার নিজস্ব চিন্তাধারারই পরিচয় পাবে মাত্র। আর কিছু নয়।

তবু লিখে চলি। না লিখে থাকতে পারি না। সেই কবে কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে পিতার কাছ থেকে দু'খানা কিতাব পেয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম—তাঁর কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম আমিও বুঝি মুঘল বিদূষীদের একজনের মতো হতে পারব। আজ এতদিন পরে বুঝতে পারছি আশার মরীচিকার পেছনে ছুটেছি শুধু। হয়তো আমি বিদূষী। কিন্তু প্রতিভার ছিটেফোঁটাও নেই আমার মধ্যে। থাকলে এমন স্বার্থপরের মতো লিখতে পারতাম না। আমি বুঝতে পারি, এ লেখায় আমার অন্তরের আর বাইরের জ্বালাই শুধু প্রকট হয়ে উঠেছে। ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে সঞ্চারিত হবার মতো কোনো গুণই এ রচনায় নেই। তবু থামতে পারি না। অনেক দিনের পুরোনো অভ্যাস যে।

রাজা বিদায় নেবার পর কয়েকদিন হয়ে গেল। যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ নেই কোনো। শুনেছি সামুগড়ে প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। আর শুনেছি মুরাদ আওরঙজেবের পক্ষ হয়ে লড়ছে।

নিজের ঘরে এসে শত চেষ্টা সত্ত্বেও চোখে জল আসে না। বুকের ভেতরে আনচান করে, অথচ চোখ শুকনো। শয্যায় উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কত দুঃখ, কত কষ্টের কথা ভাবি। তবু কান্না আসে না। নারীর পক্ষে মাঝে মাঝে চোখের জল ফেলতে না পারা যে কতখানি দুঃসহ, নারী ছাড়া সে কথা আর কে বুঝবে?

বাইরে বেলা বাড়তে থাকে। একটু পরেই খাবার নিয়ে আসবে ঘরে। এখনো স্নান হয়নি। নহরী-বেহেস্ত-এর মতো কৃত্রিম কল্লোলিনী এখানকার কোনো কক্ষের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়নি। তবু এখানকার জল গায়ে দিলে প্রাণ জুড়োয়। আমার ছেলেবেলাকার অনুভূতি মনের মধ্যে জেগে ওঠে।

শয্যা ছেড়ে উঠতে গিয়ে আবার শুয়ে পড়ি। ভালো লাগে না কিছু। পৃথিবীর কোনো কিছুতে আর আকর্ষণ নেই। কেন যেন ভবিষ্যতে রাজার পরশ লাভের আশায় বুক বাঁধতে পারছি না। মন ডেকে বলছে, এ আশা নয়—দুরাশা। মৌলবীর কথাই ঠিক। খাঁটি প্রেম মানেই দুঃখ।

চোখে জল আসে এতক্ষণে। কী শান্তি। কোথায় ছিল এই জলরাশি। যমুনা কী শুকিয়ে গিয়েছিল।

বাইরে শুনতে পাই কোনো খোজার পদশব্দ। আমার দরজার পাশে এসে থেমে যায়! কাকে যেন সে ঘর অবধি পৌঁছে দিল। নতুন কে আসবে? হয়তো রোশনারার নাজীর কিংবা অন্য কেউ। তাকাই না আমি। এভাবে আমাকে দেখলে আসতে সাহস পাবে না।

যদি রাজা হয়? পর্দা তুলে হয়তো আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। এখনি ছুটে এসে অনায়াসে সে আমার দেহখানাকে তুলে ধরবে। না, না। কী ভাবছি? এ যে অসম্ভব।

পর্দা ছেড়ে দেবার মৃদু শব্দ হয়।

মনে হয় বহুদূর থেকে কে যেন ডাকে—শাহজাদী।

নারী কণ্ঠ। নিজের যুক্তিতর্ককে পরাস্ত করে যে অবাধ্য প্রদীপটি এখনই মনের মধ্যে জ্বলে উঠেছিল, সেটি দপ্ করে নিভে যায়। রাজা নয়।

—শাহজাদী! কণ্ঠস্বর গাঢ় এবারে।

এ সম্বোধন কে করবে? আমি যে অনেক বছরের বাদশাহ-বেগম। কণ্ঠস্বর ঠিক পরিচিত নয়, অথচ খুবই চেনা। বুঝতে পারি না।

দৃষ্টি ফেরাই দরওয়াজার দিকে। সাদা ওড়নায় ঢাকা মুখ।

—কে তুমি?

—আমায় চিনলেন না শাহজাদী? আমি তো চিনেছি আপনাকে।

—তোমায় আমি খুব চিনি। অথচ—

ধীরভাবে থেমে থেমে সে বলে—বলেছিলাম আপনার দুঃসময়ে আবার ফিরে আসব। তাই এসেছি। আমি কোয়েল।

—কোয়েল! তুমি! আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে বল যে তুমি ফিরে এসেছ? না, না। তুমি কোয়েলের প্রেতাত্মা। কিংবা আমি স্বপ্ন দেখছি।

—আমি সত্যিই কোয়েল শাহজাদী।

—তোমাকে আমি ধরতে পারব? তোমার গায়ে হাত দিয়ে তোমাকে আমি স্পর্শ করতে পারব? বলো কোয়েল?

—এই তো আপনার গায়ে হাত দিলাম।

—কী আশ্চর্য। যখন নিজের লোক একে একে পর হয়ে যাচ্ছে তখন এত বড় ব্যতিক্রম কেন হলো কোয়েল? তুমি যে আমার নিজের লোক। তোমার সুখের জন্যে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আমার যে কত বড় ক্ষতি হয়েছে, তা যদি জানতে কোয়েল। আমি দিনের পর দিন মুখ বুজে সে ক্ষতি সহ্য করেছি। কাউকে বলিনি। আমার বুকের ব্যথা প্রতি পলে সূঁচ ফুটিয়েছে, তবু—।

আমাকে জড়িয়ে ধরে কোয়েল। সে তো নাজীর নয়। সখ করে আমার নাজীর হতে এসেছে। এত দুঃখেও শান্তি পাই। এভাবে আমাকে ধরার অধিকার আর শুধু একজনেরই আছে—সে এখন সামুগড়ের যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে বেড়াচ্ছে।

—শাহজাদী। আগে তো আপনি বিচলিত হতেন না।

—এখনও হই না কোয়েল। কিন্তু আঘাতের পর আঘাত যখন এসে হানে তখন অন্তত একজনের কাছে বিচলিত না হতে পারলে যে পাগল হয়ে যাব কোয়েল।

—শাহজাদা সুজা সসৈন্যে বাংলা ছেড়ে দিল্লি আক্রমণ করতে আসছেন শুনে বুঝলাম অঘটন কিছু ঘটেছে। —এক মুহূর্তও আর অপেক্ষা করিনি। ছুটে এসেছি। শাহজাদা পরাস্ত হয়ে পথের মাঝে সৈন্যদল নিয়ে বসে রয়েছেন। আমি পাশ দিয়ে চলে এসেছি। ভেবেছিলাম বাদশাহ মৃত। কারণ পথে যাকে বাদশাহের কথা জিজ্ঞাসা করেছি সে-ই আকাশের দিকে হাত উঁচিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। কেমন করে এমন হলো শাহজাদী?

—আমীর খাঁয়ের কৌশল। সে-ই রটিয়েছে এ সব। বাদশাহ উত্থানশক্তি রহিত। তাঁকে যদি আগ্রা দুর্গের মাথায় এনে দাঁড় করাতে পারতাম, তাহলে ওরা বুঝতে পারত কতখানি হীন ষড়যন্ত্র তাদের প্রিয় বাদশাহের বিরুদ্ধে করা হয়েছে। কিন্তু উপায় নেই। তাঁকে তুলতে গেলেই হয়তো শেষ হয়ে যাবেন। হাকিমের আশঙ্কাও তাই।

কোয়েল স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে আমার মাথার বিনুনি নিয়ে খেলা করে। অতীতের দিনগুলির সঙ্গে এখনকার দিন মিলিয়ে নিয়ে সে নিজের মনকে শান্ত করছে। বাধা দিই না আমি। সময় নিক সে। ধাতস্থ হোক।

পর্দা আবার দুলে ওঠে। নাজীর সসঙ্কোচে মুখ বাড়িয়ে বলে,—খানা।

আমি কিছু বলার আগেই কোয়েল বলে,—নিয়ে এসো।

নাজীরের মুখ অন্তর্হিত হয়।

—কেন আনতে বললে কোয়েল। আমার কিছু খেতে ইচ্ছে নেই।

—তবু খেতে হয় শাহজাদী। জীবনে এ এক অদ্ভুত নিয়ম। দুঃখ ভোগ করার জন্যেও খেতে হয়। সব দুঃখের জ্বালা জল হয়ে যায়।

—সে-ই তো ভালো।

—সত্যি কি তাই? আমার তো মনে হয় দুঃখ ভোগের মধ্যেও আনন্দ আছে। সে এক রক্তাক্ত আনন্দ।

মনের মধ্যে শিল্পী সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে প্রবল ইচ্ছা জাগে, অথচ কেন যেন মুখের সামনে প্রশ্ন এসে থেমে যায়। শিল্পীকে কি আবার সঙ্গে করে এনেছে কোয়েল? এতদিন পরে নিজের সৃষ্টি দেখতে সে কি আগ্রায় ফিরে এসেছে?

—শাহজাদী।

—বলো।

—কে উনি?

চমকে উঠি। প্রশ্ন করি,—কার কথা বলছ কোয়েল?

—যাঁর কথা ভেবে আপনার দেহ-মনের এই অবস্থা?

—বাদশাহের ঘর থেকে একবার ঘুরে এসো কোয়েল। বুঝতে পারবে।

ম্লান হাসে কোয়েল। আমার বুকের ওপর হাত রেখে বলে,—তাতে কি বুক এত ফুলে ওঠে? শাহজাদী, আমি অভিজ্ঞ।

উত্তর দেবার ভাষা খুঁজে না পেয়ে কোয়েলের হাতখানা আরও জোরে বুকের মধ্যে চেপে ধরি। যে

আগুন জ্বলছে সেখানে সে-আগুনে ওর হাত দগ্ধ হবে হয়তো। তবু শীতলতার পরশে একটু আরাম বোধ করব।

—বলবেন না শাহজাদী?

—আমাকে কি এতই স্বার্থপর ভাব কোয়েল, বাদশাহের এই দুর্দিনে আমি ব্যক্তিগত কারণে বিচলিত হব?

—না। স্বার্থপরতা আপনার মধ্যে নেই। তবু দুঃখ প্রকাশের পথ এক এক ক্ষেত্রে এক এক প্রকারের। আপনি নারী, আপনাকেও কি বুঝিয়ে বলতে হবে? অভিজ্ঞতা আপনার অতটা হয়েছে কিনা জানি না; কিন্তু এ-জিনিস যে জন্মগত।

—তুমি এক আশ্চর্য নারী কোয়েল।

—না। আমি অতি সাধারণ নারী। তবে আমার মতো আপনার মনকে যাচাই করার দুঃসাহস কারও হয়নি। হলে যে কেউ বুঝতে পারত।

আমি থেমে থেমে বলি,—ছত্রশাল, কোয়েল।

—বুন্দীরাজ?

ঘাড় নেড়ে জানাই,—হ্যাঁ।

—কতদিন?

—বহুদিন। আগ্রা ছেড়ে যাবার আগেই এক অগ্নিকাণ্ডের সূত্র ধরে।

কোয়েল নীরব। সে আমাকে প্রশ্ন করে না। সে বুঝে নিয়েছে—সব কিছু বুঝে নিয়েছে। তবু তাকে একে একে ঘটনাগুলো বলে যাই। অশ্রুসজল চোখে সে শুনে যায়। মনে হয়, যেন আমার মন, আমার হৃৎপিণ্ড তার দেহ-মনে কাজ করে চলেছে। নাজীর খানা রেখে গিয়েছে। সে খানা তেমনি পড়ে থাকে। কোয়েলও অনুরোধ করতে ভুলে যায়।

শেষে আমিই ওকে সজাগ করার জন্য বলে উঠি,—অনেক তো শুনলে। এবার তোমার কথা বলো।

—আমার কথা?

—হ্যাঁ। প্রথমে বল, কিভাবে হারেমে প্রবেশ করলে? প্রহরীরা বাধা দেয়নি?

—না। তাদের মনে কোনো সন্দেহই জাগেনি। কিভাবে জাগবে? এখানকার হালচাল সবই আমার জানা।

—এবার বলো তোমার কথা।

—এখন কি আমার কথা শোনার ধৈর্য আপনার হবে শাহজাদী? সে অতি সামান্য কাহিনী।

—সামান্য? তোমার কথা সামান্য? শিল্পীর কথা সামান্য?

—আপনি মহৎ শাহজাদী।

—না। শিল্পী আমার মনের এক বিশেষ তন্ত্রীতে প্রথম ঝঙ্কার তুলেছিল। তুমিও জানতে সে কথা। এক্ষেত্রে মহৎ হবার মতো নির্লিপ্ততা আমার নেই। বলো কোয়েল তোমার কথা।

মাথা নীচু করে কোয়েল। সেইভাবেই বসে থাকে সে বহুক্ষণ। যখন সে মাথা তোলে, মুখখানা তার জলে ভেসে যাচ্ছে। নিঃশব্দে চেয়ে দেখি আমি। কোয়েলের মুখ বন্ধ।

—শাহজাদী।

—কোয়েল।

—কিছু মনে করবেন না শাহজাদী। আমি না জেনে অতীতের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম আমি আগ্রার হারেমে বসে আছি, আর সামনে রয়েছেন আপনি।

—এমন হয় কোয়েল।

—শাহজাদী, একটি দিনের তরেও সে শান্তি পায়নি।

আমার বুক কেঁপে ওঠে। সে শান্তি পাবে না জানতাম। কিন্তু এতদিন পরে সেই কথাই স্পষ্টভাবে শুনতে পেয়ে মন বিষণ্ণতায় ভরে যায়।

—শাহজাদী, সৃষ্টির ব্যর্থ বেদনায় সে মাঝে মাঝে পাগল হয়ে যেত। তখন আমাকেও চিনতে পারত না। একজন অশরীরী দেবীর সঙ্গে একমনে কথা বলে যেত। প্রথম প্রথম বুঝতাম না সে কে। পরে বুঝেছিলাম।

—কে?

—আপনি। আপনাকে সে জীবনে একটি দিনেব তরেও ভুলতে পারেনি। তাকে দেখে মনে হ'ত সে যেন স্পষ্ট আপনাকে দেখতে পাচ্ছে। সেইভাবে কথা বলে যেত। সে ভাবত আপনি ক্রমাগত অনুযোগ করে চলেছেন আপনার মূর্তি তৈরি হয়নি। সান্ত্বনা দিত তাই আপনাকে। আশ্বাস দিত। তারপরই নিজের আঙুলের দিকে লক্ষ্য পড়ত। উন্মাদ হয়ে যেত সে। প্রথম প্রথম মাঠ-ঘাট পার হয়ে দিগন্তের দিকে ছুটে যেত সে। পেছনে পেছনে আমিও ছুটতাম। অনেক সময় সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি এইভাবে ছুটেছি। শেষে সে একসময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ত। সব কিছু মনে পড়ে যেত তার। আমার কাঁধের ওপর মাথা রেখে শিশুর মতো কেঁদে উঠত। ফিরিয়ে নিয়ে যেতাম ঘরে।

কোয়েল থামে। আমি অশ্রুসিক্ত চোখে চেয়ে থাকি তার দিকে।

—শাহজাদী, সে যখন শান্ত থাকত, তখন সে একান্ত আমার। আমাকেও সে ভালোবেসেছিল। কিন্তু পাগল হলেই আমাকে ভুলত। বড় রাগ হ'ত আপনার ওপর। আপনার কথা যাতে মনে না হয় সেজন্যে পাগলামির উপক্রম হলেই একতাল মাটি এনে দিতাম সামনে। মাটি দিয়ে সুন্দর নারীমূর্তি গড়ে তুলত, ডান হাতের চার আঙুলের সাহায্যে। আমি সযত্নে সেগুলো শুকিয়ে রাখতাম। কিন্তু বেশিদিন রাখতে পারতাম না। লুকিয়ে সে ভেঙে টুকবো টুকরো করে ফেলত।

—কেন?

—সে চাইত পাথরের মূর্তি গড়তে, মাটিব নয়। সে ভাস্কর।

—তাকে এনেছ সঙ্গে?

থরথর করে কেঁপে ওঠে কোয়েলের দেহ। আমার দিকে নির্বোধের মতো চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে,—সে নেই।

—নেই!

—না পনেরো বছর বেঁচেছিল। শেষে—

—শেষে?

—আত্মহত্যা করেছে।

বাদশাহ সাজাহানের কথা ভুলে যাই। সামুগড়ের যুদ্ধের কথা মনে থাকে না। ছত্রশালের কথা মন থেকে অপসারিত হয় মুহূর্তের জন্যে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে বহু বছর আগের নির্মীয়মান তাজমহলের পথের ওপর যমুনার ধারে দেখা এক তরুণ মুখের ছবি। সে মুখে সেদিন দেখেছিলাম আশাতীত সম্ভাবনা আর উচ্চাশার প্রতিচ্ছবি। আমার চোখের অশ্রু এবার ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ে।

—শাহজাদী, তাকে আপনার পরিচয় দিয়েছি। সব বলেছি খুলে।

—খুব ঘৃণা হলো তার তাই না?

—না। শুধু বলেছিল, আমাকে আগে বলনি কেন? এরপর আর কথা বলতে পারেনি। বিষের ক্রিয়া শুরু হয়েছিল।

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি আমি। কোয়েল নীরব। দেশে গিয়েই কেন সে আমার কথা বলে দেয়নি জানি

না। সেইরকমই কথা ছিল।

সেই সময়ে একজন নাজীর ছুটে আসে। বাদশাহ এই মুহূর্তে আমাকে ডেকেছেন। এ সময় তিনি কখনো ডাকেন না। নিশ্চয় শরীর খুব খারাপ হয়েছে।

তাড়াতাড়ি কোয়েলকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ঘরে প্রবেশ করি।

—কে? জাহানারা? দেখ্ তো একটা পায়রা এসে বড় জ্বালাতন করছে আমায়। কিছুতেই চোখ বন্ধ করতে দিচ্ছে না। বারবার মুখে পাখার ঝাপটা মারছে।

সমস্ত বুকখানাকে খালি করে দিয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠি,—কোথায় সে? কোথায়?

আমার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী ঘুরতে থাকে। শত চেষ্টাতেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। কোয়েলকে চেপে ধরি শক্ত করে।

বাদশাহকে বলতে শুনি এই তো এখানে ছিল। কোথায় গেল। কিন্তু তুই অমন ভয় পেয়ে গেলি কেন জাহানারা?

আমি কোনোদিকে তাকাতে পারি না। তাকাতে চাই না। কি দেখব আমি জানি। পারাবতের গায়ে রক্ত মাখানো। সে রক্ত হাওয়ায় শুকিয়ে গিয়েছে। আমি জানি। আর কিছু হতে পারে না। হলে ওটি আসত না এখানে। অমন ব্যাকুলভাবে অসুস্থ বাদশাহকে উত্যক্ত করে তুলত না। আমার জীবনের সব সাধ সব আনন্দ নির্মূল হলো আজ। যোগ্য প্রতিশোধই নিলে নজরৎ।

কোয়েল ধীরে ধীরে বলে,—জানালায় বসে রয়েছে শাহজাদী।

কতক্ষণ কেটে যায় জানি না। বুঝতে পারি কে যেন আমার মাথায় হাওয়া দিচ্ছে। চোখ মেলে দেখি কোয়েল। বাদশাহের দিকে চাইতে পারি না। সেদিকেই যে জানালা।

—ওটি কোথায় কোয়েল?

—এখনো জানালাতেই বসে রয়েছে।

—নিয়ে এসো।

—ধরতে পারব?

—ধরা দেবার জন্যেই বসে রয়েছে। নিয়ে এসো।

কোয়েল সেটিকে এনে কাছে এসে বলে,—এর গায়ে—

—চুপ। আমার ঘরে এসো। ওটিকে তোমার ওড়নার নিচে ঢেকে রাখো।

—জাহানারা।

—পরে আসব বাবা।

—কিন্তু কী হয়েছে?

—বলছি এসে।

ঘরে এসে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করি। পায়রা তখনো কোয়েলের ওড়নার নিচে। বলে উঠি,—ওর গায়ে রক্ত, তাই না কোয়েল?

—হ্যাঁ শাহজাদী।

—আমি জানতাম।

—কিন্তু কি করে?

—সে রকমই কথা ছিল।

সব সংশয়ের অবসান। সব চিন্তার শেষ। এক গভীর দুঃখ আমার দেহ-মনকে নিস্তেজ করে তোলে। মৌলবীর কথা কানে বাজে,—খাঁটি প্রেম মানেই তো দুঃখ।

—কিছুই বুঝতে পারছি না শাহজাদী।

—ছত্রশাল আর নেই। তারই শেষ রক্ত বহন করে এনেছে কপোতটি।

কোয়েল বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকে।

আমিও তোমার দলে কোয়েল। ভয় কি? আমার বুকের সঙ্গে দৃঢ়-নিবন্ধ ছত্রশালের উপহার দেওয়া কাঁচুলি। যেন তারই স্পর্শ অনুভব করছি। এ কাঁচুলি যদি আর কখনো খুলতে না হতো, বেশ হতো।

ছত্রশাল নেই। নেই। পৃথিবী আর তার পদভরে কম্পিত হবে না। বাতাস আর তার গানের সুরে উন্মত্ত হবে না। সব কিছুর শেষ। আমার কাছে পৃথিবী চিরকালের মতো শুকিয়ে গেল। তবু আমি বেঁচে আছি। আরও কতদিন হয়তো বাঁচব। এই কয় বছর শুধু নীরব কর্তব্যই আমার জন্যে অপেক্ষা করছে—আর কিছু নয়।

সামুগড়ের যুদ্ধ শেষ। আওরঙজেব জয়ী। দারা বিতাড়িত। ছত্রশাল আর দায়ুদ খাঁয়ের কথা সে অবহেলা করেছে। তারই ফল হাতে হাতে পেয়েছে। খলিলুল্লাই শেষ পর্যন্ত তার পরম বিশ্বস্ত অনুচরের রূপ নিয়ে সর্বনাশ করল। তারই চক্রান্তে নিশ্চিত জয় শোচনীয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হলো। প্রতিশোধ নিয়েছে খলিলুল্লা। এ প্রতিশোধ দারার বিরুদ্ধে নয়, স্বয়ং বাদশাহের বিরুদ্ধে।

দারা আর ফিরতে পারবে না জানি। পুত্র আর পরিবার নিয়ে এখন দিনের পর দিন দুর্গম পথ ভেঙে তাকে এগিয়ে যেতে হবে অজানা দেশের উদ্দেশ্যে। জানি না কোথাও ঠাঁই পাবে কি না। ময়ূরাসনের আশা তার টুটলো।

—বাদশাহ-বেগম?

তীব্রস্বরে চমকে উঠি। চেয়ে দেখি দরওয়াজায় দাঁড়িয়ে রোশনারা। চোখ দুটো তার জ্বলজ্বল করছে। মহামূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত সে। বহুদিন পরে সে আমার ঘরে এলো।

—রোশনারা?

—হ্যাঁ। চিনতে পারছ না?

—বাইরে যাচ্ছিস?

—হ্যাঁ। যাবে তুমি?

—না।

—এত মন-মরা কেন বাদশাহ-বেগম?

—আমাকে তুইতো কখনো বাদশাহ-বেগম বলে ডাকিসনি।

—আজ ডাকছি। এরপরে এ-ডাক শোনার তো সৌভাগ্য হবে না তোমার।

—ও। তা বেশ করেছিস।

—আওরঙজেব কোথায় জানো?

—না।

—আর পাঁচ ক্রোশের মধ্যে।

চমকে উঠি। এত তাড়াতাড়ি? মুখের একটা রেখাও যাতে কুঞ্চিত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখি।

—আজ এসে পৌঁছবে বুঝি!

—হ্যাঁ। তাই তো এগিয়ে যাচ্ছি। অভ্যর্থনা করব বলে।

—যা।

—যদি বাঁচতে চাও তুমিও চলো।

হেসে বলি,—বাঁচতে আমি চাই না রোশনারা।

—ও। বিদ্রুপ ফুটে ওঠে রোশনারার কথায়। দাঁত দিয়ে সে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে। তারপর এক ঝটকায় বার হয়ে যায়।

সত্যিই হাসি পায় আমার। জীবন আর মৃত্যুর সীমারেখা আমার কাছে যে কত তুচ্ছ রোশনারা তা কী করে অনুভব করবে? তাই সে বিদ্রুপ করে চলে গেল। আওরঙজেব শুনবে একথা। হয়তো শাস্তিও দেবে আমাকে। কাউকে নিষ্কৃতি দেবার মতো উদারতা তার কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায় না। এ পর্যন্ত ভাইদের কেউ খুন হয়নি তার হাতে। হলেও বিন্দুমাত্র বিস্মিত হবো না। যেভাবে দারাকে কাফের বলে ঘোষণা করে চলেছে, ভয়ই করছে আমার। তবে বাদশাহের বিরুদ্ধে কোনো কথাই বলেনি এ পর্যন্ত। বলতে বোধহয় সাহস হচ্ছে না। দেশবাসীর ওপর শাহানশাহ সাজাহানের অসীম প্রভাবের কথা ভেবে সে ভীত। সে জানে বাদশাহ যদি সুস্থ থাকতেন, তাহলে সারা ভারতের সৈন্যদল নিয়েও একা বাদশাহের বিরুদ্ধে সে অভিযান করতে পারত না।

কিন্তু আর তো সময় নেই। সহজে প্রাসাদে প্রবেশ করতে দেব না আওরঙজেবকে। বাধা দিতে হবে। দেখাতে হবে বাদশাহ অক্ষম হলেও তাঁর শক্তি একেবারে নিঃশেষিত নয়। রোশনারা যত সহজে হারেম থেকে বাইরে গেল অত সহজে তাকে আর ফিরতে দেব না। তার প্রিয়তম ভাইয়ের শিবিরে দু-চারদিন কাটিয়ে অমন সোনার মতো গায়ের রঙ একটু কালো করে আসুক।

বাদশাহের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হই। তাঁর মতামতটা জানতে হবে। তাঁর অমতে কিছু করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

সেই একইভাবে বাইরে চেয়েছিলেন পঙ্গু বাদশাহ।

—বাবা।

—কে জাহানারা? শুনেছিস?

—হ্যাঁ বাবা।

—দারা ময়ূরাসনের উপযুক্ত নয়। আমি বরাবরই জানতাম সেকথা। আজ সে পথের ভিখিরী হয়ে অজানার উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছে। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে জাহানারা। তবু তাকে তক্ত-তাউসের উপযুক্ত বলে মনের কাছ থেকে সায় পাচ্ছি না। আমি যদি আওরঙজেবের বুদ্ধি আর দারার হৃদয় দিয়ে মেশানো একটি পুত্র পেতাম জাহানারা। তুই যদি আমার পুত্র হতিস।

—আওরঙজেব আগ্রার দুর্গ অধিকার করতে আসছে বাবা।

—সে তো আসবেই। এখানে যে আমি রয়েছি। অপমানের দিন শুরু হলো জাহানারা।

—আমি বাধা দেব।

—বাধা? কি দিয়ে? লোক কই।

—যা আছে তাই দিয়ে। তাছাড়া আমাদের সুবিধা বেশি।

—বেশ। যা খুশি কর।

এত তাড়াতড়ি অনুমতি পাব ভেবে পাইনি। কারণ প্রস্তাবটি প্রস্তাবই নয়। লক্ষ সৈন্যে বলীয়ান আওরঙজেবকে মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে দিয়ে বাধা দেওয়া পাগলের কল্পনা। তবু বাদশাহ অনুমতি দিলেন শুধু আমার মুখের দিকে চেয়ে। আর দিলেন একটি ক্ষীণ সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে ভেবে। তাঁর ধারণা যারই সৈন্যদল হোক না কেন শাহানশাহ সাজাহান জীবিত আছেন জানলে তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না।

আওরঙজেবের সৈন্যদল এসে উপস্থিত হয় বিকেলের দিকে। দূর থেকে তাদের দেখে বাদশাহকে খবর দিই। তিনি নিশ্চিন্তে ঘাড় নাড়েন শুধু।

প্রবেশদ্বার খোলা থাকবে ভেবেই হয়তো দ্রুত এগিয়ে আসছিল আওরঙজেব। রোশনারার কাছ থেকে এখানকার সব সংবাদ পেয়েছে সে। কিন্তু দুর্গ বন্ধ দেখে সদলবলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। বুঝতে পারে না, ইতিমধ্যে এমন কি ঘটেছে যার ফলে দ্বার রুদ্ধ।

আমাদের পক্ষ থেকে আক্রমণের কোনো চেষ্টাই করা হবে না। আমার নির্দেশও তাই। শুধু দেখতে হবে বাইরে থেকে একটি প্রাণীও যেন ভেতরে আসতে না পারে। আওরঙজেব সত্যিই সুচতুর, সে জানে, আক্রমণের শক্তি আমাদের নেই। তাই কোনোরকম হৈচৈ না করে সে তার সৈন্যদলকে দিয়ে ঘিরে বসে থাকল আগ্রার প্রাসাদ।

একদিন। দুদিন। তিনদিন।

দিন যায়। উভয় পক্ষই নিচেষ্ট। এমন ফল হবে ভেবে উঠতে পারিনি। আওরঙজেব চায় আমাদের তরফ থেকে আক্রমণ আসুক প্রথমে। সে জানে, আজ হোক, কাল হোক, একদিন মরীয়া হয়ে আমরাই আক্রমণ করব। কারণ অবরুদ্ধ হয়ে থেকে রসদ ফুরোবেই একদিন।

রসদ আমাদের প্রচুর রয়েছে। কিন্তু জল নেই। জলাভাব ঘটল। দিনে দিনে তার তীব্রতা বৃদ্ধি পেল। শেষে বাদশাহের সামনে ধরে দেবার মতো জলেও অনটন দেখা দিল।

সব দায়িত্ব আমার। তাই চিন্তার বলিরেখা আমার কপালে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নির্জনে বসে কোনো সিদ্ধান্তে আসার জন্যে প্রাসাদের ছাদের ওপর গিয়ে দাঁড়াই। ঠিক সেই সময়ে একটি তীর এসে আমার পায়ের সামনে পড়ে। তীরের মাথায় একটি পত্র।

খুলে দেখি আওরঙজেব লিখেছে বাদশাহকে ঃ দারাকে বাদশাহ করার অভিপ্রায় কোনো মুসলমানের ছিল না। তাই আমাকে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হয়েছিল। নইলে দিল্লির তক্ত-তাউসে বসার জন্যে আমার মতো সামান্য একজন ফকির লালায়িত নয় কখনোই। তক্ত-তাউস আমার প্রিয় ভাই মুরাদের জন্যে সংরক্ষিত! মুরাদ আমার সঙ্গেই রয়েছে। আপনি রাগ করে দুর্গদ্বার বন্ধ রাখবেন না। আপনার আশীর্বাদ আমাদের উভয়েরই পরম কাম্য। তাই জয়ের নেশায় উন্মত্ত সৈন্যদেরও ধৈর্য ধরতে বলেছি। জানি না কতদিন তারা আমার কথা শুনে চলবে। কারণ আপনি অসুস্থ।

চতুর আওরঙজেব। তার পত্রের ছত্রে ছত্রে চতুরতা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। পত্রটি নিয়ে গিয়ে বাদশাহকে দেখাই। ম্লান হাসেন তিনি। যে হাসির অর্থ আমি বুঝি। তাঁর কথামতো আওরঙজেবকে লিখি ঃ তোমার শক্তির বিরুদ্ধে সামান্য একটি দুর্গ বেশিক্ষণ আত্মরক্ষা করতে পারবে না, একথা সবাই জানে। তবু দুর্গদ্বার খোলার আগে আমার কয়েকজন লোককে বাইরে থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করে আনতে দাও। দুর্গে জলাভাব।

গোপন পথ দিয়ে একজন পত্রবাহক দুর্গের বাইরে যায়, আওরঙজেবের হাতে পত্রটি পৌঁছে দেবার জন্যে এবং তার উত্তর সঙ্গে করে আনার জন্যে। লোকটিকে শিবিরগুলোর দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে দেখে আবার বাদশাহের পাশে বসি।

—তোর কি মনে হয় জাহানারা?

—জল পাবো না বাবা।

—আমারও তাই অনুমান। চতুর হলেও এতটা চতুর আওরঙজেব নয় যে আমার লোককে জল নিয়ে আসতে দেবে। সেইখানেই ওর ভয়, ওর অবিশ্বাস। ভাববে, এই কয়দিনের সময় চেয়ে নিয়ে আমি কোনো গূঢ় উদ্দেশ্যে কালক্ষয় করছি। ওঃ জাহানারা, আমিই না শাহানশাহ সাজাহান। জ্যোতিষীর কথা কেমন বর্ণে বর্ণে মিলে যাচ্ছে দেখছিস। পুত্রের হাতে অবরুদ্ধ, এরপর হয়তো বন্দী হবো! চূড়ান্ত অপমান।

বাদশাহ শয্যার ওপর মাথাটা আছড়ে ফেলেন। আমি নীরব। অক্ষমতা আর অপমানের হা-হুতাশ কখনো তাঁকে করতে দেখি না। অসীম সংযম আর মানসিক বলের অধিকারী তিনি। তবু এক এক সময়ে তাঁর সংযমের বাঁধ ভেঙে যায়। শুধু তখনই মাথাটাকে অমনভাবে আছড়ে ফেলেন।

আমি সহানুভূতি দেখাবার কোনো চেষ্টা করি না। জানি, দেখাতে গেলে দ্বিগুণভাবে নিজের

অক্ষমতা তাঁকে পীড়া দেবে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ভাবি, সত্যিই কি ইনি শাহানশাহ সাজাহান? আপেলের গন্ধ হাত থেকে একেবারে মুছে যাক।

অনেক পরে পত্রবাহক ফিরে এলো—রিক্ত হাত, শুকনো মুখে। আমাদের অনুমান ঠিক হলো। পত্রবাহক বলে, চিঠিখানা পড়ে আওরঙজেবের মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেছিল। মুহূর্তকাল পরেই সে গম্ভীর হয়ে বলেছিল, এ পত্রের জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করি না। তুমি যাও।

ক্রোধে বাদশাহের রেখা-পাণ্ডুর মুখখানাও আরক্তিম হয়ে ওঠে। কাঁপতে কাঁপতে বলেন,—দেখ তো জাহানারা আমি উঠতে পারি কিনা? একবার ধরে তোল আমাকে—প্রাসাদের ওপর দাঁড়িয়ে একবার ঝরোকা দর্শন দেব শুধু। আওরঙজেব ওর শিবিরের মধ্যে গুঁড়িয়ে যাবে।

কিছু বলি না পিতাকে তুলে ধরার চেষ্টাও করি না। জানি, তাঁর কথার প্রতিটি বর্ণ সত্যি। কিন্তু তিনি উঠতে পারবেন না। কোনোদিনই পারবেন না।

—কী। চুপ করে রইলি কেন?

তাঁর মাথায় আস্তে হাত রেখে বলি,—বাবা, ভাগ্য মাঝে মাঝে বড় নিষ্করুণ হয়ে দেখা দেয়। তবু তাবে মেনে না নিয়ে উপায় নেই।

—কিন্তু আমি, শাহানশাহ সাজাহান জীবিত থাকতে—

—হ্যাঁ। অন্য কোনো পথ খোলা নেই। দারার শৌর্যের ওপর বিশ্বাস করে ভুল করনি। ভুল করেছিলে তার বুদ্ধির ওপর বিশ্বাস করে। ভুলের মাসুল না গুনে উপায় নেই। তুমি অক্ষম—শোচনীয়ভাবে অক্ষম।

এমনভাবে কঠোর সত্য শুনিয়ে ব্যথা পাই। আমার কথাগুলো পিতার উত্তেজনার ওপর যেন মুহূর্তে জল ঢেলে দেয়। তিনি নিস্তেজ হয়ে শুয়ে থাকেন। বুঝলাম শেষবারের মতো ভাগ্যকেই মেনে নিলেন তিনি। চেয়ে দেখি তাঁর শীর্ণ হাত শয্যার ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে শিয়রে রক্ষিত কোর-আন খানা চেপে ধরে শিশুর মতো নিশ্চিন্ত হন।

খানিক পরে মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বলেন,—ওদের আসতে দে।

—আসতে দেব। কিন্তু দলবল নিয়ে নয়। একা আসুক আওরঙজেব তার পরিবার নিয়ে।

—অতটা বিশ্বাস সে আমাদের করবে না।

—দেখা যাক। তার পুত্র মহম্মদকে প্রথমে পাঠাতে বলি। সেই কবে ছোটবেলায় আমাদের দেখেছে সে। পিতামহকে একবার দেখে যাক।

—মহম্মদকে পাঠালেও পাঠাতে পারে। কারণ মহম্মদের জীবনের কোনো আশঙ্কা স্বয়ং আওরঙজেবকে স্পর্শ করবে না।

—এ কী বলছ বাবা? এত নীচ ভাবো আওরঙজেবকে? নিজের পুত্রের জীবনের আশঙ্কায় সে বিচলিত হবে কিনা?

স্পষ্টস্বরে বৃদ্ধ বাদশাহ বলে ওঠেন,—না। হবে না।

—নিজের নামে আওরঙজেবকে চিঠি লিখি। মনে পড়ে বহু বছর আগে, আমি অগ্নিদগ্ধ হয়ে শয্যাশায়ী হলে বহুদূর থেকে শুধু প্রাণের টানেই ছুটে এসেছিল সে আমাকে দেখতে। তারপর কত বছর কেটে গেল। আওরঙজেবের মনের সেই গুপ্ত নরম স্থানটুকু এতদিনে নিশ্চয়ই পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠেছে। পিতার উক্তিতে এইটুকুই প্রতীয়মান হয়, সে এখন আত্মসর্বস্ব। পুত্রের জীবনের মূল্যও তার উচ্চাশার কাছে কানাকড়িও বোধহয় নয়।

লিখি, শুধু মহম্মদ যেন প্রাসাদে আসে প্রথমে। তারপর ইচ্ছে করলে আওরঙজেব তার পরিবার নিয়ে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু সৈন্যদল কখনোই নয় কারণ বাদশাহ সাজাহান এখনো জীবিত।

পত্রবাহক আবার ছোটে আওরঙজেবের শিবিরে। সবার মতো সেও পিপাসার্ত। একটা মীমাংসার জন্যে সবাই আকুল, তাই সে আবার ছোটে। সৈন্যদের দু-চারজন ইতিমধ্যেই অচেতন হয়ে পড়েছে। বাদশাহ নিজের পানীয় জল তাদের দিতে বলেছেন। তিনি নিজে জলাভাবে মরতে রাজি আছেন, কিন্তু আমাদের ফাঁকা জিদের বশে একটি প্রাণীও যেন না মরে—এই তাঁর হুকুম।

বাদশাহের অনুমানই ঠিক। মহম্মদ একা এসে দুর্গে প্রবেশ করে। তার পশ্চাতে পত্রবাহক। বহুদিন পরে দেখলেও দূর থেকে চিনতে কষ্ট হয় না মহম্মদকে। আওরঙজেবের চেহারার ছাপ আছে। আওরঙজেবের চেয়েও বলিষ্ঠ। প্রতিটি পদক্ষেপে মহম্মদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। কোনোদিকে না চেয়ে সোজা এগিয়ে আসছে সে। অথচ জানে, এখানে অস্ত্রধারী সিপাহীর অভাব নেই। আওরঙজেব হলে কখনোই এভাবে আসতে পারত না। যা শুনতে পেতাম তাই সত্যি বটে—বড় হৃদয় নিয়েই জন্মেছে মহম্মদ। ময়ূরাসনে আওরঙজেবের পরিবর্তে সে যদি বসে আমি সব চাইতে আগে গিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাবো।

পত্রবাহক অন্দরের প্রথম-ঘরটি দূর থেকে দেখিয়ে দিয়ে থেমে যায়। মহম্মদ একা এগিয়ে আসে। আমি ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকি। প্রথমেই পরিচয় দেব না। আগে দেখে নেব তাকে—তারপর।

কক্ষে প্রবেশ করে সামনে আমাকে দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে,—আমি কি বাদশাহ-বেগম জাহানারার সম্মুখে এসেছি?

—না। তিনি এখনই আসবেন।

—ও।

—আপনি দয়া করে বসুন।

মহম্মদ আসন গ্রহণ করে। আমাকে তবু দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে ছট্‌ফট্‌ করে। ভাবে হয়তো, অনর্থক কেন দাঁড়িয়ে রয়েছে এই মহিলাটি।

—শাহজাদা।

চমকে উঠে সে আমার ওড়না ঢাকা মুখের দিকে চায়।

—একটা প্রশ্ন করতে পারি কি?

মহম্মদের স্থির চোখে কৌতূহল প্রকাশ পায়। সে আমার অনাবৃত হাত দু'খানার দিকে ক্ষণিকের তরে চায়। তারপর বলে—কি প্রশ্ন?

—আপনি এখনও জাহানারা বেগমকে বাদশাহ-বেগমের সম্মান দিচ্ছেন কেন?

—তিনি বাদশাহ-বেগম, তাই।

কিন্তু আপনার পিতার এই জয়লাভের পর তাঁর এই উপাধি কি হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়নি।

কি যেন ভাবে মহম্মদ! তারপর বলে,—হয়তো তাই। কিন্তু আমি তাঁকে চিরকাল বাদশাহ-বেগমের সম্মান দেব।

—তাঁকে আপনি শ্রদ্ধা করেন দেখছি।

—মানুষ হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা করতে না পারাটা দুর্ভাগ্যের।

—তক্ত-তাউস আর সাম্রাজ্যের কাছে মনুষ্যত্বের মূল্য কতটুকু?

মহম্মদ হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। আমার দিকে দু'পা এগিয়ে এসে বলে, কে তুমি?

—সামান্য এক নাজীর।

কিন্তু তোমার কথাবার্তা তো ঠিক নাজীরের মতো নয়। তোমার পোশাক তেমন নয়।

মনে মনে ভাবি, আমি না হয় জাহানারাই হলাম মহম্মদ, কিন্তু পাশেই ওই থামের আড়ালে, কোয়েল দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে তো সত্যিই নাজীর। তার কথাবার্তা শুনলে এই কথাই বলতে।

—কথা বলছ না? মহম্মদের স্বরে অধৈর্য। নবীন যুবক। ধৈর্য একটু কম হবেই।

—আমি জাহানারা বেগমের নাজীর। তাই হয়তো আমার কথাবার্তায় তাঁর কথার ছাপ রয়েছে। আমার পোশাকও তাঁরই রুচি অনুযায়ী।

—তোমার মুখের ওড়না একটু তুলবে?

বুক কেঁপে ওঠে,—কেন শাহজাদা?

—মুখ দেখব।

সেই একই গলার স্বর, যা শুনেছিলাম ছত্রশালের মুখে। ছিঃ ছিঃ। কেন যে মিথ্যে পরিচয় দিতে গেলাম।

—না শাহজাদা, আমি যাই। ডেকে দিই বাদশাহ-বেগমকে।

মহম্মদ সহসা আমার হাত চেপে ধরে বলে,—কিন্তু তারপরে আমার সঙ্গে দেখা করবে। তুমি সুন্দরী, তুমি বুদ্ধিমতী—নাজীর কি চিরকালই থাকতে হবে?

কী করব ভেবে পাই না। সেই সময়ে কোয়েল সামনে এসে আমাকে ধমক দিলেও চলে যাবার পথ পেতাম! ছিঃ ছিঃ। কেন যে মরতে পরিচয় গোপন করতে গিয়েছিলাম। পরিচয় যখন গোপন করলাম, তখন কেন যে বড় বড় কথা বলতে গেলাম। ছিঃ ছিঃ।

—ছেড়ে দিন শাহজাদা। পরে দেখা করব।

—ঠিক?

—ঠিক।

—ভুল করো না লক্ষ্মীটি। মুঘল-হারেমে প্রাণ বলে কোনো পদার্থ নেই। তাই যেখানে প্রাণের সন্ধান পাই, সেখানে আমি চাতক পাখির মতো ছট্‌ফট্‌ করি। ভুলো না।

মহম্মদ আমাকে ছেড়ে দিতেই ছুটে পালিয়ে যাই। বেচারা, আমার বয়সটাও অনুমান করতে পারল না। করবেই বা কি করে। হাত দুটো যেন সেই আগের মতোই রয়েছে। মুখে চিন্তার ছাপ পড়লেও হাত নিটোল। বেচারা। আওরঙজেবের পুত্র হয়ে প্রাণের সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। জীবনে শান্তি পাবে না। তক্ত-তাউসও পাবে না। মানুষের সূক্ষ্মগুণে ভরপুর হৃদয় নিয়ে বাদশাহ হবার দিন চলে গিয়েছে মুঘলবংশ থেকে।

পরিচ্ছদ পরিবর্তন করে নিই তাড়াতাড়ি। মুখে নিয়ে আসি কৃত্রিম গাম্ভীর্য। তারপর ধীর গতিতে এগিয়ে যাই সেই একই ঘরে। এবারে ওড়নার কোনো বালাই নেই। কিন্তু হাত দু'খানা ভালভাবে ঢাকা।

আমাকে দেখেই মহম্মদ উঠে দাঁড়ায়।

—তুমি মহম্মদ? আমার স্বর যতটা পারি ভারী করি।

—হ্যাঁ। হেসে এগিয়ে এসে সে আমাকে অভিবাদন করে।

—বসো। বহুদিন পরে তোমাকে দেখলাম।

—আপনাকে আমি দেখলেও, আমার মনে নেই। অথচ আজ মনে হচ্ছে আপনি আমার কত পরিচিত বাদশাহ-বেগম।

—এ নামে ডাকতে কে বললে?

—এ-নামে আমি চিরকাল ডাকব।

—তোমার বাবা সন্তুষ্ট হবেন না নিশ্চয়।

—তা হবেন না বটে।

—তবে? তোমার নিজের ভবিষ্যৎ নেই?

—নিজের সততা আর বিবেককে বিসর্জন দিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমার কাম্য নয়।

—ভুল করছ মহম্মদ। আফশোষ হবে।

—আমাকে চিনতে আপনি বোধহয় ভুল করছেন বাদশাহ-বেগম।

হেসে বলি,—না। শুধু একটি পরীক্ষা করছিলাম মহম্মদ। বাদশাহ সাজাহান এখন আওরঙজেবের শত্রু। সে হিসাবে আমিও তার শত্রু। কারণ আমি পিতার কাছে রয়েছি। তবু তোমাকে আমি পুত্রের মতোই দেখি। তোমার মনের পরিচয় পেয়ে বড় আনন্দ হলো।

মহম্মদ আমার সামনে নতজানু হয়ে বসে আমার হাত দুটি তার দু'হাতে তুলে নিয়ে কপালে ঠেকায়। আমি তার পিঠে সস্নেহে হাত রেখে বলি,—উঠে বসো মহম্মদ।

মহম্মদ আসন গ্রহণ করে। একটু পরেই সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। বলে,—কিন্তু আমার তো অপেক্ষা করা চলে না। তাড়াতাড়ি না ফিরলে আপনাদের পানীয় জলের মীমাংসা হবে না। দেরি করলে হয়তো পিতা সন্দেহ করবেন।

—সে কি প্রথম থেকেই সন্দেহ করছে না?

—নিশ্চয়ই করছেন। কিন্তু সন্দেহ আরও গাঢ় হয়ে দেখা দেবে। এর পরিণাম অশুভ হতে পারে। আমি যাই।

—বাদশাহের সঙ্গে দেখা করবে না?

—আবার আসব।

—সে উঠে দাঁড়ায়। একটু ইতস্তত করে। চারিদিকে চায়। গোপনে হাসি আমি। এ চাহনির অর্থ জানি।

—কি বলবে মহম্মদ?

—না। আপনার এ-কজন নাজীর দেখলাম। সে কোথায়?

—কেন তাকে কি প্রয়োজন?

মহম্মদ রক্তিম হয়ে ওঠে। কোনোরকমে বলে,—সুন্দর কথা বলে সে।

—হ্যাঁ। কোয়েল বুদ্ধিমতী।

—কোয়েল? নামটিও সুন্দর তো।

—ডাকব তাকে?

—ডাকুন।

ডাকতেই কোয়েল সামনে এসে হাজির হয়। মুখে তার ওড়না ছিল না। বয়স প্রৌঢ়ত্বের সীমা স্পর্শ করেছে।

মহম্মদ সজোরে ঘাড় নেড়ে বলে,—না, না। এ নয়। অন্য কেউ।

আর তো কোনো নাজীর নেই মহম্মদ। অন্যাদের নাজীর এদিকে একজনও আসে না।

বিস্ময়ভরা চোখ নিয়ে মহম্মদ বলে,—কিন্তু আমি যে দেখলাম। আর কেউ আছে? নাজীর ছাড়া?

—কেউ নেই।

—সেকি? সে কিন্তু বললে, সে আপনারই নাজীর।

কোয়েল ধীরে ধীরে বলে,—আমি জানি।

আমরা দু'জনা একসঙ্গে ঘুরে কোয়েলের দিকে চাই। সে আমার কথা বলে দেবে নাকি?

মহম্মদ প্রশ্ন করে,—কে?

গম্ভীর হয়ে কোয়েল উত্তর দেয়,—নূরজাহান বেগম।

চমকে ওঠে মহম্মদ। আমি কিছু বলার আগেই কোয়েল বলে ওঠে,—আমি হিন্দু। আমি বিশ্বাস করি। আমি দেখেছি তাঁকে। জেসমিন প্রাসাদের আশেপাশে।

মহম্মদের মুখে ভাষা নেই। স্থির হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। শেষে বলে, কিন্তু আমি যে তাকে স্পর্শ করেছি।

—স্পর্শ? তাকে তুমি স্পর্শ করতে যাবে কেন মহম্মদ?

—ছোঁয়া লেগেছে তার দেহের সঙ্গে।

কোয়েল বলে,—অমন হয়। মনের ভুল। আপনি তখন সচেতন ছিলেন না শাহজাদা।

গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে মহম্মদ ধীরে ধীরে চলে যায়।

সে চলে যেতেই কোয়েলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলি,—ব্যাপার কি কোয়েল? সত্যিই দেখেছ?

হেসে ফেলে কোয়েল। বলে,—না। আপনার আর শাহজাদার লজ্জা ঢেকে দেবার জন্যেই মিথ্যেটুকু বলতে হলো। হারেমের সব নাজীরদের জড়ো করলেও আপনার মতো অমন একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে কি? রোশনারা বেগমের হাতও কি এত সুন্দর? তাই সুন্দরী নূরজাহানকে চোখে দেখতে হলো।

—তোমার অতিবুদ্ধির জন্যে আমি একদিন বিষ দিয়ে হত্যা করব।

—সেদিনের জন্যেই অপেক্ষা করছি শাহাজাদী।

কোয়েলের হাসির মধ্যে দুঃখ ঝরে পড়ে।

মহম্মদ চলে যাওয়ার পর প্রচুর পানীয় জল আসে। তবু আওরঙজেব নিজে আসেনি। সে তেমনিভাবে কিছুদিন শিবিরে অপেক্ষা করে রইল।

তারপরই ঘটে গেল সেই ভয়াবহ ঘটনা যা বাদশাহকে স্তব্ধ করে দিল। শোক প্রকাশের শক্তিটুকুও আর তাঁর রইল না। আমিও যেন পাথর হয়ে গিয়েছি নইলে দারার ছিন্ন শির দেখে ভেঙে তো পড়লাম না। একটু চমকে উঠেছিলাম মাত্র। এই জাতীয় একটা কিছুর জন্যে আমার মন যেন প্রস্তুত ছিল—ক'দিন আগে আর পরে।

আওরঙজেব জানত, বাদশাহের কাছে এই ছিন্ন শির ভেট পাঠাবার একান্ত প্রয়োজন ছিল। কারণ দারার মৃত্যুর পর ময়ূরাসনের ওপর যে কেউ দাবি করুক তিনি আপত্তি করবেন না। সে জানত, দারাকে হত্যা করা যেতে পারে, কিন্তু বাদশাহকে হত্যা করলে সারা ভারতে দাবানল জ্বলে উঠবে। পরিণামে তক্ত-তাউসে বসার কল্পনা ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে যাবে।

বুদ্ধির খেলায় আওরঙজেবই জয়ী হলো। দুর্বুদ্ধির কাছে শুভবুদ্ধি অনেক সময়ই এইভাবে পরাজয় বরণ করে। পরমাত্মীয়ের রক্ত নিয়ে যে হোলি খেলতে শুরু করেছে তার সঙ্গে কে পেরে উঠবে?

মনে পড়ে যায় নাদিরার কথা, সুলেমান, সিপার আর তাদের বোন জানির কথা। বড় দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিল তারা! মনে পড়ে রানাদিল আর উদীপুরী বেগমের কথা। কোথায় তারা কে জানে। হয়তো সব সংবাদই পাব যখন শেষ হয়ে যাবে সব। কারণ একথা আমি জানি, আত্মীয়ের রক্ত নিয়ে যারা মারাত্মক খেলায় মত্ত হয়, তারা জানে না কোথায় থামতে হবে। শুনলাম ধান্দরের অধিপতি মালিক জিওয়ান দারাশুকোকে ধরিয়ে দিয়েছে। এককালে দারা ওকে মস্ত বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিল। কৃতজ্ঞতা জানাবার এর চাইতে ভালো পথ আর ছিল না জিওয়ানের। আওরঙজেব ঘোষণা করল দারা 'রাফিজী'—তাই তাকে হত্যা করা হয়েছে। প্রজারা তাই বুঝল। দারার মৃত্যুর চাঞ্চল্য স্তিমিত হয়ে যেতে দু'দিনও লাগল না।

তারপর খাজুয়ার প্রান্তর। বীর সুজা সদলবলে সেখানে আওরঙজেবকে শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান

করল। যুদ্ধের গতি দেখে আওরঙজেবের মুখের রঙ বিবর্ণ হলো। সুজার অসির প্রতিটি আঘাতে ময়ূরাসনের স্বপ্ন ভাঙতে শুরু করল। অস্থির হয়ে উঠল আওরঙজেব। শেষে সেখানেও মিলল খলিলুল্লা, শায়েস্তা আর নাজীর খাঁয়ের দলের লোক। আলিবর্দী খাঁ। সুজার একান্ত বিশ্বাসী সে। অথচ অর্থ আর প্রতিপত্তির মোহে আওরঙজেবের দলে ভিড়ল। জয় যখন সুজার করায়ত্ত তখন আলিবর্দীর সর্বনাশা পরামর্শের জন্যে পরাজয় বরণ করতে হলো তাকে। ভাঙা দলবলের কয়েকজনকে নিয়ে ভাঙা মনে সুজা পালিয়ে গেল। জয়ী হতে হতেও পরাজয়ের কালিমায় তার মুখ কলঙ্কিত হলো। ইতিহাসের পাতায় এ সব কথা নিশ্চয়ই লেখা থাকবে।

আর লেখা থাকবে সরল মুরাদকে বন্দী করে গোয়ালিয়র দুর্গে নিক্ষেপ করার জঘন্যতম কৌশল। নিদ্রিত ছিল নিজের শিবিরে মুরাদ। সবে যুদ্ধ শেষ হয়েছে। তাই সুখস্বপ্নে বিভোর ছিল সে। তবু কোমরের অসি কোমরেই ছিল তার। চিরকালের অভ্যাস। নিদ্রিত মুরাদের সামনেও নিজে এগিয়ে যেতে সাহস পায়নি বিজয়ী আওরঙজেব। নিজের চার বছরের শিশুপুত্র আজীমকে মোহরের লোভ দেখিয়ে পাঠিয়ে দিল মুরাদের কোমর থেকে তলোয়ারখানা চুরি করে আনতে। হঠাৎ জেগে উঠলেও শিশুকে দেখে বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগবে না মুরাদের মনে।

শিশু কৃতকার্য হলো। ঘুম ভাঙল না মুরাদের। সেই অবসরে হাত-পা শৃঙ্খলিত হলো। সুখস্বপ্ন ভেঙে গেল তার। চোখ মেলে সব কিছু দেখে শুধু একটা তীব্র ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল আওরঙজেবের দিকে। কোনো কথা বলেনি সে।

গোয়ালিয়র দুর্গে বেশিদিন জীবিত থাকতে পারেনি মুরাদ। ভালোই হয়েছে। প্রতিদিন খাবারের সঙ্গে বিষ দিয়ে অন্যান্য আত্মীয়দের মতো তিলে তিলে মারেনি তাকে। সঙ্গে ছিল তার পরমাসুন্দরী যুবতী সরসুনবাঈ। যে সরসুনবাঈ তার মৃত্যু ত্বরান্বিত করল। দুর্গ থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই সে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে চিৎকার করে ওঠে। প্রহরীরা জেগে ওঠে। ফলে ধরা পড়ে যায় মুরাদ। এরপরই এক বিচারের প্রহসন বসে। কবে কোন্ যুগে গুজরাটে এক রাজপুরুষকে সে হত্যা করেছিল। তারই ফলে শাস্তি হয় প্রাণদণ্ড। চমৎকার বিচার।

সুজাও শেষ পর্যন্ত নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। সুদূর আরাকানে তার জীবন শেষ হলো। আওরঙজেব নিষ্কণ্টক।

এবার আসবে সে বৃদ্ধ সাজাহানের কাছে। শুধু বৃদ্ধই বললাম। কারণ বাদশাহ সাজাহান আর কি করে বলি? তবু আওরঙজেব চতুর! পিতাকে অসহায় জেনেও তাঁর কাছ থেকে তক্ত-তাউসে বসার অনুমতি চাইবে।

আগ্রার দুর্গের দ্বারে দ্বাবে নতুন প্রহরী। পরীক্ষার জন্যে কোয়েলকে বাইরে পাঠাই। সে ফিরে এলো। বাইরে যাবার হুকুম নেই। বুঝলাম সাজাহান বন্দী। সেই সঙ্গে আমিও। এখানে এসে উপস্থিত হবার আগেই আমাদের স্বাধীনতাটুকু কেড়ে নিয়েছে আওরঙজেব।

কোয়েল কাঁদে। কেঁদে কি হবে? চলে যেতে বলি তাকে। যেতে চায় না সে। শেষ পর্যন্ত আমাদের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে বেঁধে রাখতে চায়। অদ্ভুত নারী।

ধূসর আকাশ। তাজমহলের শুভ্রতা মলিন বলে প্রতিভাত হয়। বাতায়নে সর্বনাশা সংবাদ বহনকারী কপোতটি দূরের এক বুনো পায়রাকে দেখে একমনে ঘুরে ঘুরে ডাকতে শুরু করেছে। সে নিশ্চিত জানে, তার এই নাচ আর ডাক বুনো পায়রাটিকে মুগ্ধ করে কাছে ডেকে আনবে। সুন্দর এদের মন। কোনো ঘটনাই দাগ কেটে যায় না সেখানে। স্মৃতি বলে কোনো কিছুর বালাই নেই এদের। শুধু বর্তমান নিয়ে ব্যস্ত।

বর্তমান নিয়ে আমি বাঁচতে পারতাম না। পাগল হয়ে যেতাম। অতীতের দুঃখ স্মৃতিগুলো ছিল

বলেই সেগুলোকে রোমন্থন করে সময় কাটিয়ে দিই। ভুলে যাই আমি বন্দী। ভুলে যাই এক বৃদ্ধ ঠিক পাশেরই কক্ষে তার জীবনের সব গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় সময় গুনছে। তার হাতে আপেলের সুঘ্রাণ আজও আছে কিনা জানি না। না থাকাই ভালো। তবু সাহস করে সেই শীর্ণ হাতখানা তুলে নিয়ে ঘ্রাণ নিতে পারি না। বৃদ্ধ আছে বলেই এখনো আমার নিজের বেঁচে থাকার একটা ক্ষীণ অর্থ খুঁজে পাই। কিন্তু যে মুহূর্তে ওই বুকের ওঠানামা বন্ধ হয়ে যাবে—যে মুহূর্তে ওই দুর্বলতম দেহের স্পন্দন স্তব্ধ হবে, সেই মুহূর্তে আমার বেঁচে থাকারও যেন কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই নিশ্ছিদ্র অবসরের অপরিসীম ক্লান্তিকে উপেক্ষা করে ক্ষতবিক্ষত মন নিয়ে দিনে রাতে বার বার পাশের ঘরে গিয়ে দাঁড়াই। সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে দেখি, বৃদ্ধ জীবিত না মৃত। কখনো নিমীলিত চক্ষু দেখে কেঁপে উঠি। একটু কেশে উঠি তখন। চোখের পাতা খুলে যায় বৃদ্ধের। একটা নিস্পৃহ দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকান ক্ষণিকের তরে। তারপরই আবার চোখ বন্ধ করেন। আমার উপস্থিতি তাঁর মনে এখন কোনো আশা কোনো আনন্দই আর জাগাতে পারে না।

এমনি একদিনে আওরঙজেব এলো। বিজয়ী সে। দুর্লভ ময়ূরাসনের অধিকারী। কিন্তু বিজয়ীর মতো বুক ফুলিয়ে সে প্রবেশ করতে পারল না প্রাসাদে। দূর থেকে দেখলাম, কেন যেন তার মাথা নত হয়ে এলো। পদক্ষেপেও একটা ইতস্তত ভাব। নিজেকে অপরাধী বলে ভাবছে কি। কৃতকর্মের জন্যে কি সে অনুতপ্ত? না, না। আর ভুল করব না। অভিনয়ে দক্ষ আওরঙজেবের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব।

পিতার কক্ষে প্রবেশের পূর্বে সে আমার দর্শনপ্রার্থী হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে যাই। সামনে গিয়ে দাঁড়াই।

—জাহানারা। আওরঙজেবের চোখ দুটো কি সত্যি চিক্‌চিক্ করে উঠল? চুপ করে অপেক্ষা করি।

—জাহানারা, আমি ঘোরতর পাপী।

মনে মনে হাসি। সে ভেবেছে, তাকে আমি অভিশাপ দেব, তিরস্কার করব। সেই তিরস্কারে তার ভারাক্রান্ত মন হালকা হয়ে উঠবে। সে সহজ হবে। অতটা নির্বোধ আমি নই। যে দুর্দমনীয় চাপে তার মনে ধীরে ধীরে অশান্তি দানা বেঁধে উঠছে সে চাপ ভেতরে ভেতরে চিরকাল তাকে অস্থির করে রাখুক। অন্যায় থেকে সে জীবনে কখনো সরে আসতে পারবে না জানি। সজ্ঞানে একটার পর একটা অন্যায় সে করে যাবে। তার ওই রক্তাক্ত হাত আরও লাল হয়ে উঠবে—যার পরিণামে অশান্তি তাকে রাহুর মতো গ্রাস করবে।

—জাহানারা আমি অপরাধী।

—তুমি বৃদ্ধ সাজাহানের সঙ্গে দেখা করতে চাও?

—হ্যাঁ, কিন্তু তার আগে—

—আদেশ কর। আমি নিয়ে যাচ্ছি।

—একি জাহানারা, তুমি এভাবে কথা বলছ?

—সাজাহান যে সময়ে বাদশাহ ছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে এভাবেই কথা বলতাম বাদশাহ। আজকাল আদব-কায়দার পরিবর্তন হলেও আমি তা জানতে পারিনি। কারণ আমি বন্দী?

—কে বলে তুমি বন্দী?

কোনো সুযোগ দিই না কথার ওপর কথা বলতে। তাই নিজের বন্দীত্ব প্রমাণ করতে তর্ক জুড়লাম না।

সে আবার বলে ওঠে—কে বলে তুমি বন্দী?

—বৃদ্ধ ওই ঘরে শুয়ে রয়েছেন। এসো।

স্তব্ধ আওরঙজেব আমাকে অনুসরণ করে।

আনুষ্ঠানিকভাবে যে 'শাহানশাহ' উপাধি অনেক আশা নিয়ে বহুদিন পূর্বে গ্রহণ করেছিলেন সাজাহান, আজই তার শেষ দিন। আজ আওরঙজেব তার অভিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাবে এক রক্তাক্ত হৃদয়ের মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের সম্মুখে। কৌতূহল যে আমার হয় না একেবারে, এ-কথা বলতে পারি না।

নতজানু হয়ে আওরঙজেব বৃদ্ধের শয্যার পাশে বসে পড়ে। চোখে তার অশ্রু। সে সাজাহানের ডানহাতখানা উঠিয়ে চুম্বন করে। বৃদ্ধের চোখ তবু খোলে না। আজকাল আর ঘাড় ফিরিয়ে যখন তখন তাজমহলের দিকে চেয়ে থাকে না। হয়তো দৃষ্টিশক্তি দ্রুত ক্ষীণ হয়ে এসেছে। চোখে পড়ে না তাজমহল।

—আপেলের গন্ধ যদি না পাস জাহানারা, বলিস না। খবরদার বলিস না।

কান্না পায় আমার। আওরঙজেবকে আমি বলে ভুল করছেন পিতা। চেয়ে দেখে শিউরে উঠল আওরঙজেব। রোশনারার মুখে নিশ্চয়ই সে শুনেছে আপেলের বৃত্তান্ত।

চোখ বন্ধ করেই তিনি বলে চলেন,—জাহানারা। এপারে শ্বেতশুভ্র তাজমহল, ওপারে রক্তবর্ণ সমাধি। কৃষ্ণবর্ণ সেতু মৃত্যুর মতো দুই সমাধিকে যোগ করে দিয়েছে।

আওরঙজেবের মুখ বন্ধ। সে একবার অসহায়ভাবে আমার দিকে চায়। সে অধৈর্য হয়ে ওঠে। বাইরে তার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।

ধীরে ধীরে ডাকি,—বাবা।

—রাগ করিস না জাহানারা। যেকথা বলেছিলাম, স্বপ্নের ঘোরে বলেছিলাম। আমি আর কল্পনা করি না। পৃথিবীকে আওরঙজেবের মতোই দেখতে চেষ্টা করি। রঙচঙে দেখি না আর। দেখছিস না, তাজমহল চোখে পড়বে বলে ভয়ে চোখ বন্ধ করে থাকি?

—বাবা, আওরঙজেব এসেছে।

—কে?

—আওরঙজেব।

চোখ খুলেই নিজ পুত্রকে দেখতে পান তিনি। একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। যেন কত অচেনা। ধীরে ধীরে অদ্ভুত হাসিতে ভরে ওঠে মুখ। শীর্ণ হাতখানা তাড়াতাড়ি বুকের ওপর নিয়ে গিয়ে বুকখানা খুলে দেবার চেষ্টা করতে করতে বলেন,—শত হলেও এককালে বাদশাহ ছিলাম আওরঙজেব। দাদার মতো মাথা কেটে ফেল না। এইখানে, এই বুকের ওপর বসিয়ে দাও।

অধীর আগ্রহে তিনি চেয়ে থাকেন—অপেক্ষা করেন।

আওরঙজেব আরও নত হয়। শেষে সে শয্যার ওপর মাথা রেখে কাঁদতে থাকে।

—না, না। আর ওসব অভিনয়ের প্রয়োজন কি? শেষ করে দাও। জাহানারার কথা ভাবছ বুঝি? সে সব দেখবে? ওকেও শেষ করে দাও। মিটে যাক। ওর জীবনও বড় বেশি টেনে-হিঁচড়ে চলছে। কিছুই মনে করবে না। মনে করবি জাহানারা?

—না বাবা।

—আমরা প্রস্তুত আওরঙজেব।

—হত্যার জন্যে আমি আসিনি পিতা। ক্ষমা চাইতে এসেছি। যদিও জানি, এ-কথা আজ আমার মুখে বিদ্রূপের মতো শোনাচ্ছে। কারণ আমি অপরাধী। মুঘল-বংশের ওপর যে অভিশাপ রয়েছে, আপনার মতো আমিও তা কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

আওরঙজেব থামে।

সাজাহান বলেন,—তারপর?

তাঁর কথার ধরনে আমি চমকে উঠি। যেন কোনো রূপকথার গল্প শুনে যাচ্ছেন তিনি।

আওরঙজেব থেমে গেল বলে আরো শোনার জন্যে বায়না ধরেছেন। কৌশলে আওরঙজেব উল্লেখ করেছে যে সিংহাসন লাভের পথে তাঁরও অসি আত্মীয়ের রক্তে সিক্ত হয়েছিল! কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি তিনি। তিনি বরাবরই জানতেন সিংহাসন লাভ করতে না পারলে তাঁর নিজের জীবন অনিবার্যভাবে বিপন্ন হ'ত। কারণ নূরজাহান তখন ছিলেন ক্ষমতার অধিকারিণী। অসীম প্রতিপত্তি ছিল তাঁর। যেটুকু রক্তপাত ঘটেছে তখন, তা রোধ করা যেত না। তাই বলে আত্মীয়তার সূত্র ধরে আওরঙজেবের মতো একের পর একজনকে গোয়ালিয়র দুর্গে নিক্ষেপ করে খাদ্যের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেননি। নিজের পুত্র ছাড়া বাকি সবাইকে হত্যা করেননি। শিশু কিংবা রমণীর কোনো ক্ষতিই তিনি করেননি। আর সবার চেয়ে বড় কথা এই যে, নীচতা আর হীনতা তাঁর মনে স্থান পায়নি।

আওরঙজেব বুঝতে পারে তার কৌশল ব্যর্থ হয়েছে। তাই আবার ঢোক গিলে বলে,—ছেলেবেলা থেকে আমি অবহেলিত। যার হাতে আমি গড়ে উঠেছি শিক্ষার নামে এক উদারতাহীন অশিক্ষা সে আমার মনে গেঁথে দিয়েছে। এর ফলে এক আপসহীন মুসলমান আমার ভেতরে অবিরত কাজ করে যাচ্ছে। সে অন্য কোনো ধর্মকে সহ্য করতে পারে না। সে মুসলমান ধর্মেও কোনো শিথিলতা সহ্য করতে পারে না। তাই দারাশুকোকে আমি বেঁচে থাকতে দিতে পারিনি।

—তুমি মহানুভব, আওরঙজেব। মুসলমানরা যুগে যুগে তোমার কীর্তিগাথা গাইবে।

—বাদশাহ, জানি আজ আমি আপনার বিদ্রুপের পাত্র। তবু ক্ষমা চাইতে এসেছি। তবু অনুমতি নিতে এসেছি ভারতের শাসনভার গ্রহণের পূর্বে। শত অপরাধ করলেও আপনি চাইবেন না—মুঘল ছাড়া অন্য কেউ দিল্লির তক্ত-তাউসে বসুক।

—ও! ক্ষমা চাইতে এসেছো? জাহানারা, আওরঙজেব ক্ষমতা চাইতে এসেছে। ক্ষমা করি, কি বলিস? ক্ষমা করলাম আওরঙজেব।

সাজাহানের মুখের কথার ধরনে আওরঙজেবের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সে আমার দিকে চায়। আমার মুখে কোনো সমর্থন সে খুঁজে পায় না। তাই আবার বাদশাহের দিকে মুখ নিয়ে কিছু বলতে যেতেই বাদশাহ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন,—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানি। শাসনভারের অনুমতি তো? জাহানারা, আমি অনুমতি না দিলে বেচারা তক্ত-তাউসে বসতে পারছে না। অনুমতি দিই, কি বলিস? অনুমতি দিলাম আওরঙজেব।

কিছুক্ষণের জন্যে আওরঙজেব স্থানুর মতো বসে থাকে। বুঝতে পারি চেষ্টা করেও সে নড়তে পারছে না। দরজার বাইরে তাই দেহরক্ষীরা সম্ভবত অপেক্ষা করছে। ভেতরে শুধু সে একা—আর তার কোষবদ্ধ অসি। কিন্তু সে অসি দিয়ে আত্মরক্ষার ক্ষমতা তার নেই।

আমার বুকের ভেতরে লুকানো রয়েছে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা। আওরঙজেবের আগমন সংবাদ পেয়েই আমি লুকিয়ে রেখেছি। এতক্ষণেও তার শীতলতা দেহের উত্তাপ নষ্ট হয়নি। গোয়ালিয়র দুর্গে এখনো আমার হতভাগ্য ভাইদের কোনো পুত্র হয়তো জীবিত আছে। সেখান থেকে নিয়ে এসে এখনো ময়ূরাসনে বসিয়ে দেওয়া যায়! যদি সবাই জানতে পারে, সাজাহানের তাই অভিলাষ—কেউ আপত্তি করবে না। সাজাহানকে দর্শনের জন্যে আগ্রার দুর্গদ্বার সবার কাছে খুলে দেব। তারা নিজের চোখে দেখে যাবে তাঁকে। শুনে যাবে আওরঙজেবের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী। নজরৎ, খলিলুল্লা, শায়েস্তা খাঁ, আলিবর্দীর সব চক্রান্ত এক মুহূর্তে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আমার বুক কাঁপতে থাকে। অস্ত্রের শীতলতা শরীরে কাঁপুনি ধরায়। সামনে আওরঙজেব বসে—নিশ্চেষ্ট। আমার ভাই আওরঙজেব। প্রাণের টানে এই ভাই একদিন দক্ষিণ ভারত থেকে ছুটে এসেছিল আমাকে দেখতে। আজ তার কি পরিণতি!

তড়িৎগতিতে ছুরিকা বার করে আওরঙজেবের সামনে ধরি। সে বিহ্বল। কোষের অসি টেনে বার

করার অবসর পায় না। চিৎকার করতে পারে না। সে জানে, চিৎকারের চেষ্টা করলে এই তীক্ষ্ণ অস্ত্র তার বক্ষ ভেদ করবে। অস্ত্রবিদ্যায় আমার পারদর্শিতার কথা তার অজানা নয়।

—আওরঙজেব, দিল্লির তক্ত-তাউসে কোনো রমণী বসলে বেশ হয়। তাই না?

সাজাহান নির্বাক। আওরঙজেব কাঁপতে থাকে। আমার কব্জির জোরের পরিচয় সে আগে অনেক পেয়েছে। আমি যদি রোশনারা হতাম, এক ঝটকায় এতক্ষণে সে সরিয়ে দিত। কিন্তু আমার দাঁড়াবার ভঙ্গি ছিল নিখুঁত।

—জাহানারা! আওরঙজেবের কণ্ঠস্বর ভগ্ন। তার সব আশা সব আকাঙ্ক্ষার সমাধি। মনে মনে আফশোষ করছে সে। এমন আফশোষ জীবনে আর সে করেনি।

একটুও নড়বার চেষ্টা করো না আওরঙজেব। হাত দুটো ওইভাবেই যেন শয্যার ওপর থাকে।

—তুই ওকে মেরে ফেলবি জাহানারা? মেরে কি হবে? ছেড়ে দে চলে যাক।

ছত্রশালের মুখ মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। এই অবস্থায় পড়লে আওরঙজেবের মতো সে কখনো সঙ্কুচিত থাকত না। হেসে উঠত সশব্দে। নারীকে সে কখনো আক্রমণ করেনি। কিন্তু আঘাত না করেও নিজেকে বাঁচাবার ক্ষমতা সে রাখত। আওরঙজেবও কম শক্তিমান নয়। কিন্তু তার অপরাধবোধ তাকে দুর্বল করে তুলেছে।

—ভেবে দেখ বাবা, তোমার সব পুত্রের হত্যাকারী এই আওরঙজেব। তোমার বংশের সবার মৃত্যুর কারণ।

—জানিরে জানি। তবু ছেড়ে দে। আমি তো জানি তক্ত-তাউসের ওপর তোর কোনো লোভই নেই। তীবনে তোর একটি আশাই ছিল। সে আশার প্রদীপ নির্বাপিত।

আওরঙজেব সকৃতজ্ঞ নয়নে পিতার দিকে চেয়ে থাকে। তার দৃষ্টিতে অনুনয় ঝরে পড়ে।

—আওরঙজেব, কৌশলে আর হীনতার দ্বারা অনেক কিছুই করা যায়। কিন্তু সব মানুষ সে পথে চলতে পারে না। চললে, এই পৃথিবী হয়ে উঠত শয়তানের রাজত্ব। মসজিদে আজান-ধ্বনি শুনতে পেতে না তাহলে। ফকির সাহেবরা সংসার ছেড়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন না। তাজমহলেরও সৃষ্টি হ'ত না। বেহেস্ত-এর ছোঁয়া পায় বলেই পৃথিবীতে আজও মানুষ আশায় বুক বেঁধে বেঁচে আছে—আজও শিল্পী বেঁচে আছে, সাহিত্য বেঁচে আছে। শুনলাম, একদল গায়ক তাদের বাদ্যযন্ত্রগুলো কবরস্থ করেছে। তুমি খুব আনন্দ পেয়েছ। বলেছ, কবর থেকে যেন না তোলা হয়। ভালোই বলেছ। তোমার মতো মানুষেরও বোধহয় প্রয়োজন আছে। তোমাদের কার্যকলাপের ফলেই মানুষ উপলব্ধি করতে পারে সততা কী, মনুষ্যত্ব কী, শিল্প কী।

—আমায় ক্ষমা করো জাহানারা।

—ক্ষমার প্রশ্ন এখানে উঠছে না। কেন উঠছে না সেকথা তুমি জানো। তবু একটি খবর জেনে নিতে চাই। নাদিরা কোথায়?

—মারা গিয়েছে। আমার হারেমে আসতে চায়নি। নিজে জোর করে মরেছে।

—জানতাম। রানাদিল?

—সে-ও। রূপ ছিল তার অফুরন্ত। সেই রূপের কথা আমি উল্লেখ করায় নিজের ওপর নিজে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ছোরা দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করল নিজের মুখ, নিজের বুক।

—শুনছ বাবা? রানাদিল।

—হ্যাঁ। তাইতো পথ থেকে তুলে আনতে বাধা দিইনি।

—উদীপুরী বেগম?

—আমার হারেমে। সুখে আছে সে।

—সুখে থাক।

—ছুরিকা নিক্ষেপ করি কক্ষের এক প্রান্তে। ঝনঝন করে শব্দ হয়। সমস্ত প্রাসাদ যেন কেঁপে ওঠে—কেঁপে ওঠে সারা ভারতবর্ষ। এতক্ষণ যেন কোটি কোটি হৃদয় অপেক্ষা করছিল চরম একটা কিছু দেখবার জন্যে। কিন্তু তাদের আশায় ছাই ঢেলে দিয়ে আমি ছুরিকা নিক্ষেপ করলাম। আওরঙজেব ছুটে গিয়ে সেটি নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে। তার চোখ-মুখে ফুটে ওঠে নিশ্চিন্ততা।

শয্যার সামনে গিয়ে বলে,—আমি চলি বাবা।

—হ্যাঁ। এসো। তবে পাহারার ব্যবস্থাটা একটু শক্ত করবে। কারণ জাহানারাকে ঠিক বিশ্বাস নেই। অনেক কিছুই করতে পারে। এই মাত্র যা দেখাল, আমি চমকে গিয়েছিলাম। তোমার এত সাধের তক্ত-তাউস—। এসো।

মাথা নিচু করে আওরঙজেব।

আমি প্রশ্ন করি,—আবার আসবে নাকি আওরঙজেব?

—আসব। ইতিমধ্যে বাবার সময় কাটাবার জন্যে কিছু পশু পাঠিয়ে দেব। তাদের লড়াই দেখবেন।

—দেখতে পারবেন কি?

—নিশ্চয়ই পারবেন। ওঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে বাইরে বসালে দেখতে পারবেন। সব রকম পশুই পাঠাব। বাংলার বাঘও থাকবে।

মনে মনে জানি, ওভাবে পিতাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া কতখানি অসম্ভব। তবু মুখে বলি, —ধন্যবাদ।

আওরঙজেব বাইরে যাবার সময় ইশারায় আমাকে ডাকে। বিস্মিত হই। এত কিছুর পরেও সে স্থির। শুধু একটু কুণ্ঠার আভাস ছাড়া আর কিছু নেই তার মুখে। কাছে এসে বলে,—জাহানারা, তোমার ওপর আমার বিন্দুমাত্রও রাগ হচ্ছে না। রোশনারা আমার জন্যে অনেক করেছে। কিন্তু তুমি আমার শ্রদ্ধেয়া। তুমি আমার বন্দী নও। তুমি স্বাধীন। কিন্তু পিতার সঙ্গে যতদিন আছো, ততদিন—।

—আমি বুঝেছি আওরঙজেব।

—আমাকে ভুল বুঝো না বোন।

চুপ করে থাকি। সে চলে যায়।

সে যাবার অনেক পরে কোয়েলকে একবার দুর্গদ্বারে পাঠাই। ফিরে এসে খবর দেয় প্রহরীর সংখ্যা দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আওরঙজেবকে চিনতে এখন আর একটুও ভুল হয় না।

ভেবেছিলাম আর লিখব না। একঘেয়ে দিন যাপনের গ্লানি মনের সব সজীবতা যেন নষ্ট করে দিয়েছে। আওরঙজেব বিদায় নেবার পর থেকেই মনে হতে লাগল, আর কেন? সব তো শেষ হয়ে এলো। এবার পিতাপুত্রীর জীবন শেষ হলেই আওরঙজেব নিশ্চিন্ত হতে পারে। আমাদের জন্যে তক্ত-তাউসে বসেও তার সুখ নেই। আমাদের অজ্ঞাতে গোয়ালিয়র দুর্গের মতো যদি এখানেও খাদ্যের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিত, বেশ হ'ত।

বিষ সে দেয়নি বটে, কিন্তু বিষ ছাড়াই দিনে দিনে মন আমার বিষিয়ে উঠছিল। জীবনের সব কিছুর মূল্য হারিয়ে ফেলায় এক হাঁ করা শূন্যতা আমাকে গ্রাস করছিল। এতদিন ধরে নিজের খেয়ালে যা লিখেছি সব ভুয়ো—সব মিথ্যে বলে প্রতীয়মান হলো। তাই নিদ্রাহীন রজনীর শেষ প্রহরে পিতার উপহারের কিতাব দুটি নিয়ে বাইরে বার হয়ে আসি। লেখার শুরু থেকে একটা একটা করে পাতা ছিঁড়ে

উড়িয়ে দিতে থাকি নীচের দিকে। যাক, সব যাক। চোখ দুটো জলে ভরে আসে। পিতার সেই বহুদিন আগের সন্ধ্যাবেলার মুখখানা মনে পড়ে যায়। কত আশা করেই না সেদিন আমাদের দুই বোনের হাতে কিতাব দু'খানি তুলে দিয়েছিলেন তিনি। ভবিষ্যতের কত সুখ-কল্পনাই না করেছিলেন। আজ ভাবি, সেদিন যদি তিনি তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ আবছাভাবেও দেখতে পেতেন তবে কখনোই তাঁর কর্মব্যস্ত সময় থেকে কয়েক মুহূর্ত চুরি করে নিয়ে অত আগ্রহভরে কিতাব দুটি দিতে আসতেন না আমাদের। তাঁর কল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। আমার কল্পনাও ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতা-ভরা রচনা রেখে লাভ কি? যাক্—সব যাক্। আওরঙজেব আর রোশনারার হাতে এ দুটি পড়বার আগেই শেষ হয়ে যাক। তারা দেখতে পেলে অট্টহাস্য করে উঠবে। রোশনারা হয়তো খানাপিনার আয়োজনই করে বসবে এই উপলক্ষে।

ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলতে থাকি পাতাগুলোকে এক এক করে। নিজের দেহ থেকে যেন এক এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে ফেলছি। বিষণ্ণভাবে পাতাগুলো ঘুরপাক খেতে খেতে নীচের দিকে পড়তে থাকে। চেয়ে চেয়ে দেখি আমি। পাতাগুলো বিশেষ আপত্তি করেনি। টানতেই খুলে এসেছে। তারাও বুঝতে পেরেছে তাদের সর্বাঙ্গের কালো আঁচড়ের ব্যর্থতা। স্রষ্টার ব্যর্থতায় তারা ব্যর্থ। তবু এতদিনের মায়া কাটাতে বোধহয় কষ্ট হচ্ছিল। তাই দু-একখানি পাতা মাঝে মাঝে দক্ষিণের দমকা বাতাসে ফিরে এসে আমার গায়ে লেপটে যাচ্ছিল। এমনি একটি পাতা তুলে নিয়ে খেয়ালের বশে চোখের সামনে তুলে ধরতে দেখি মাযের কথা লেখা রয়েছে তাতে। যে মুহূর্তের কথা লেখা রয়েছে, সেই মুহূর্তটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

বুকের ভেতরে হু হু করে উঠল। কী করলাম আমি? এমন কত মধুর কত অমূল্য মুহূর্ত যে ধরা পড়েছে আমার লেখায়। আর তো ফিরে পাবো না।

—শাহজাদী!

—কে কোয়েল?

—হ্যাঁ শাহজাদী। অঙ্গুরীবাগ থেকে আপনার জন্যে একগুচ্ছ ফুল এনেছি। খুঁজতে খুঁজতে এখানে এলাম। একি শাহজাদী, আপনি কাঁদছেন?

—কোয়েল সব নষ্ট করে ফেলেছি।

—কী নষ্ট করলেন?

—এই দেখ কোয়েল।

—প্রথম কিতাবটি দেখাই। দ্বিতীয়টি অক্ষতই ছিল।

—একি করলেন শাহজাদী। এ যে আপনার অনেকদিনের সঙ্গী। সেই কবে আমি হারেম ছেড়েছিলাম, তারও কত আগে দেখেছি। প্রায় অর্ধেক পাতাই যে ছিঁড়ে ফেলেছেন। ছিঃ ছিঃ! কোথায় ফেললেন? পুড়িয়ে ফেলেননি তো?

আঙুল দিয়ে নীচের দিকে দেখিয়ে দিই। সেখানে ঘাসের উপর যেন এক ঝাঁক বুনো পায়রা উড়ে এসে বসেছে।

—ইস! আমি এখনি গিয়ে কুড়িয়ে আনছি। কিন্তু শিশিরে যদি সব অস্পষ্ট হয়ে যায়? ঘাসের ওপর যে সারা রাতের শিশির জমে রয়েছে শাহজাদী।

—তবু তুমি যাও কোয়েল। দেখো, যদি ওদের বাঁচাতে পার।

—তার আগে ও দুটি দিন তো। আপনার কাছে আর রাখব না। যখন দরকার হবে চেয়ে নেবেন।

—তাই ভালো, তোমার কাছেই থাক।

কোয়েল নিচে চলে যায়।

কিছু পরে পাতাগুলো কুড়িয়ে এনে সযত্নে জোড়া লাগায়। আমি ভয়ে চাইতে পারি না। হয়তো অনেক পাতা নষ্ট হয়েছে—অনেক লেখা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কোয়েলকে প্রশ্ন করতেও সাহস হয় না। সেও নিজে থেকে কিছু বলে না। প্রথম কিতাবখানি তার কাছে, দ্বিতীয়টি আমাকে ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে।

আওরঙজেব জানে, বিদ্রুপ আর তুচ্ছতা নিয়ে যে ক্ষমার কথা পিতা উচ্চারণ করেছেন—সে ক্ষমা ক্ষমা নয়। সে জানে উত্তরাধিকার সূত্রে সে ময়ূরাসনের অধিকার পায়নি। পেয়েছে এক ঘোরতম পাপের পথে, এক সর্বনাশা অভিশাপের মধ্যে দিয়ে। নিশ্চিন্ত হতে পারেনি তাই। আমাকে ইতিমধ্যে অনেক পত্র দিয়েছে সে। কিন্তু সব পত্রেই ঘুরে ফিরে এক কথা—পিতার অন্তরের কথা জানতে চায় সে। একটি পত্রেরও জবাব আমি দিইনি। জবাব দিতে ঘৃণাবোধ হয়েছে। জ্ঞানের আলোকের মধ্যে দিয়ে যে ইসলাম ধর্ম বিকশিত হয়ে উঠতে পারত, সেই ইসলাম ধর্মের ওপর সে চাপিয়ে দিয়েছে এক দুরপনেয় কলঙ্ক। অন্তরে অন্তরে সে বুঝতে পেরেছে তার অন্যায়। তাই সে কম্পিত। সে কম্পন তার প্রতিটি বাক্যে—সে কম্পন তার প্রতিটি কার্যে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এ কম্পন থেকে তার নিষ্কৃতি নেই।

ইতিমধ্যেই নিজের লোককেও অবিশ্বাস করতে শুরু করেছে সে। তাই এতদিন যে শাস্তি অন্যের জন্যে তোলা ছিল, সে শাস্তি নিজের পরিবারের ওপরই বর্ষিত হতে শুরু হয়েছে। মহম্মদ সম্প্রতি কারারুদ্ধ হয়েছে।

প্রাসাদের শিখরে দাঁড়িয়ে আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠি—আওরঙজেব, তোমাকে আমি ক্ষমা করব। তোমার সব অন্যায় আমি ভুলে যাব ভাই। শুধু একটি শর্ত। এই সর্বনাশা পথ থেকে ফিরে এসো।

—শাহজাদী।

—কোয়েল? তুমি কি ছায়ার মতো সব সময়ই আমার কাছে থাকো কোয়েল?

—আর যে জায়গা নেই আমার।

—কোয়েল আমি কিন্তু পাগল হইনি। এই নির্জনে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম বটে। কিন্তু আমার মাথা ঠিক রয়েছে।

—আমি জানি শাহজাদী। আমিও যে অমন কথা বলি একলা একলা।

—কোয়েল! এই দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কখনো ভেবেছ কি?

—অতখানি বড় জিনিস ভাববার শক্তি কোথায় আমার শাহজাদী। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়েই যে ব্যস্ত থাকি।

—তুমি একথা বললে আমি বিশ্বাস করব না। দেশ সম্বন্ধে কি কোনো দুর্ভাবনাই হয় না তোমার?

—স্পষ্ট করেই তবে বলি শাহজাদী, কোনো দুর্ভাবনাই হয় না।

—সম্ভব বটে। তুমি হিন্দু। মুসলমান ধর্মের ভেতরে গ্লানি ঢুকলে তোমার মন কেনই বা কাতর হবে।

—কিন্তু আপনি তো ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেননি! আপনি প্রশ্ন করেছিলেন দেশ সম্বন্ধে।

—ধর্ম আর দেশ যে এখানে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আওরঙজেবের ধর্মবোধ দেশের হিন্দু প্রজাদের শান্তি নষ্ট করবে। তার ফল কতখানি মারাত্মক তা কি জানো না?

—আমি তাও ভেবে দেখেছি শাহজাদী। কিন্তু নিজে থেকেই এক অদ্ভুত সমাধান খুঁজে নিয়েছি। সে সমাধান কারও মনঃপূত না হলেও আমি তাতে তুষ্ট।

—কী সে সমাধান?

—শাহজাদী! অনন্তকালের পটভূমিকায় ফেলে বিচার করলে আওরঙজেব বলুন আর মুঘলবংশ

বলুন সবই তো তুচ্ছ। এই জগৎ এক অসাধারণ গতি নিয়ে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে যেন ছুটে চলেছে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছলেই তার পরিপূর্ণতা লাভ। এই লক্ষ্যে যাবার জন্যে যে গতি, সেই গতির ফলে সংঘর্ষের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দেবেই। আওরঙজেবের মতো এক একজনের উত্থান সেই সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। এর ফল হয়তো ভালোই। গতির শক্তি বৃদ্ধি হয়।

হতবাক হয়ে কোয়েলের দিকে চেয়ে থাকি নিষ্পলক দৃষ্টিতে। তাকে আমার চেয়ে অনেক উঁচু বলে মনে হয়। ধীরে ধীরে বলি,—তুমি দার্শনিক কোয়েল।

—লজ্জা দেবেন না শাহজাদী। দার্শনিক কাকে বলে আমি জানি না, তবে আমি হিন্দু। সান্ত্বনা লাভের আশায় অসম্ভব কিছু ভেবে নিতে আমাদের বাধে না। সান্ত্বনা পাইও তাতে।

কথা বলতে বলতে নিচে নামতেই একজন খোজা এগিয়ে এসে কুর্নিশ করে। চমকে উঠি তাকে দেখে। বহুদিন আগে রোশনারার কক্ষের সামনে প্রহরী নিযুক্ত থাকত সে। রোশনারাকে একবার তার সঙ্গে শিশমহলে দেখেছিলাম। আর আমি দেখেছিলাম এক স্বপ্ন। খোজার বয়স বেড়েছে, কিন্তু চিনতে বিন্দুমাত্র ভুল হয় না। নামটিও মনে এসে যায়। শোভান।

শোভান বলে,—একজন আমীর আপনার সাথে দেখা করতে চান।

—কী নাম?

—তিনি বললেন, আপনি তাঁকে চেনেন। তাই নাম জানালেন না।

রাগ হয়। সেই সঙ্গে একটু কৌতূহলও হয়। যাবার জন্যে পা বাড়িয়েও থেমে যাই। খোজাকে প্রশ্ন করি, তুমি কতদিন এখানে আছো?

—আজ থেকে।

—এর আগে কোথাও ছিলে?

—রোশনারা বেগম আমিন খাঁয়ের সঙ্গে রেখেছিলেন।

মুহূর্তে সব বুঝতে পারি। এককালে খোজাটির প্রতি অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক পক্ষপাতিত্ব ছিল। রাজধানী পরিবর্তনের সময়ে তাকে দিল্লিতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। রোশনারা বাধা দিয়েছিল। বলেছিল, পুরোনো লজ্জাকে দিল্লিতে বয়ে নিয়ে যাবার দরকার নেই। তার যুক্তি আমি সহজেই মেনে নিয়েছিলাম। তখন ভুলেও ভাবতে পারিনি যে খোজাটি তারই দলের লোক।

আজ একে দেখে আমার ঘৃণা হয়। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তিনটি কক্ষ পার হতেই দেখতে পাই সেই বিরাট সুপরিচিত লোকটিকে। দাঁড়িয়ে পড়ি।

কিন্তু সে এগিয়ে আসে। বিনীতভাবে অভিবাদন করে আমার সামনে দাঁড়ায়। ওড়নার আড়ালে আমার ভ্রূ-কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। আবার কি উদ্দেশ্য নিয়ে আসতে পারে নজরৎ খাঁ? যৌবনে তো এখন আমার ভাঁটার টান। প্রতিপত্তি নিঃশেষিত।

—খাঁ সাহেবের আগমনের কারণ জানতে পারি কি?

একটু যেন অবাক হয় নজরৎ খাঁ। আমার কণ্ঠস্বরে হয়তো পূর্বের গাম্ভীর্য, সে আশা করেনি। সে বলে,—আপনি কি সত্যিই অনুমান করতে পারেননি?

—না।

—আজ আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আমার ক্ষমতা।

—হ্যাঁ।

—আপনি বুঝতে পেরেছেন শুধু বাগাড়ম্বর ছাড়া ছত্রশালের আর কিছুই ছিল না। যুদ্ধে নেমে তাই বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারল না। অত যারা সঙ্গীত নিয়ে মাথা ঘামায় তারা যুদ্ধ করতে পারে না।

—খাঁ সাহেব কি মৃতকে উপদেশ দিচ্ছেন?

—না। আপনাকে বলছি। কারণ আপনি সরল বিশ্বাসে এক অপদার্থের ওপর আপনার স্বর্গীয় প্রেম ঢেলে দিয়েছিলেন।

ইচ্ছে হচ্ছিল সেই মুহূর্তে শয়তানকে ঘর থেকে বার করে দিই। কিন্তু তা করলাম না। এ জীবনে আর কিছু শিক্ষা হোক আর না হোক ধৈর্য আর সহিষ্ণুতার শিক্ষা হয়েছে। বলি,—বাঃ, আপনিও দেখছি শিল্পী হয়ে উঠেছেন। চমৎকার কথা বলছেন।

—জাহানারা, আর বিদ্রূপ করো না। প্রৌঢ়ত্ব ধীরে ধীরে আমাকে গ্রাস করছে। তবু তোমাকে ভুলতে পারিনি। কবরে গিয়েও ভুলতে পারব না। জাহানারা, আজ আমি জানি তুমি বন্দী। কোনো ক্ষমতাই তোমার নেই। তবু ছুটে এসেছি। অনেক ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তোমাকে নিতে এসেছি।

হেসে উঠি আমি। সশব্দে হেসে উঠি। নজরৎ খাঁ হাঁ করে চেয়ে থাকে।

—এই যে ওড়না দেখছেন খাঁ সাহেব, যা দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছি, এটি ছত্রশাল উপহার দিয়েছিল। আমার মসলিন ভেদ করে যে অপূর্ব কাঁচুলি উঁকি দিচ্ছে, এটিও ছত্রশালের দয়ার দান। আর আমার দেহ? তার কথা নাইবা শুনলেন খাঁ সাহেব?

—তুমি এখনো—

—হ্যাঁ। এখনো। সেই কবরে যাবার যে কথা বললেন আপনি, ওটি আপনার বেলায় মন ভোলাবার কৌশল মাত্র। আমার বেলায় খাঁটি সত্যি। আপনি বহুদিনের এক পুরোনো প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য জেদের বশে এখানে এসেছেন আজ। ভুল করেছেন।

—আমার কথায় আপনি রাজি নন?

—এতক্ষণ কথা বলতে পেরেছেন, এই তো আপনার সৌভাগ্য। এবারে চলে যান। দেরি করলে বার করে দেওয়া হবে।

অট্টহাসি হেসে ওঠে নজরৎ খাঁ। মুখে পৈশাচিক কুটিলতা আর প্রতিহিংসার ঘৃণ্য ছাপ। সে বলে, —আপনি সামান্য একজন বন্দী। আপনার মুখে এসব কথা ধৃষ্টতা মাত্র। আপনি জানেন না—এখানকার প্রহরীরা আমারই অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হয়।

—আর তাদের মধ্যে অনেকেই বেশ ভালোভাবেই জানে, এখনো যদি আমি আওরঙজেবকে বলি, দুশমন নজরৎ খাঁয়ের ফাঁসি দাও, সেই মুহূর্তে তোমার গলায় সেই অতি-পিচ্ছিল দড়ি পরিয়ে দেবার হুকুম দেবে সে। আর একটা কথা শুনে রাখবে নজরৎ, আমি আওরঙজেবের বন্দী নই। বিশ্বাস না হয়, তাকেই জিজ্ঞাসা করবে? যাও এখন, দূর হয়ে যাও শয়তান।

মুখ লাল করে দরজার দিকে এগিয়ে যায় নজরৎ। ঠিক সেই মুহূর্তে এক অদৃশ্য স্থান থেকে কোয়েল খিলখিল করে হেসে ওঠে। নজরৎ ছুটতে শুরু করে।

দিন যায়।

মাস যায়।

বছর যায়।

কত বছর কেটে গেল, খেয়াল থাকে না। শুধু একদিন নজরে পড়ে আমার সামনে একগোছা সাদা চুল। যৌবন গেল। যাবেই তো। যৌবনকে কি ধরে রাখা যায়? এতদিন ভাবতাম, যৌবন বিদায় নিলে পাগল হ'ব। এখন দেখছি সে চলে যাওয়ায় নিশ্চিন্ত হলাম। রোশনারার মাথায়ও এমন দু-এক গুচ্ছ শুভ্রকেশ নিশ্চয়ই মিলবে। দিল্লিতে আছে সে। সুখেই আছে হয়তো। সুখে থাক। সবাই সুখে থাক। পৃথিবী যেন স্থায়ী সুখের আলয় হয়ে ওঠে।

ওই তাজমহল। ওর মাথার ওপরে একখণ্ড গাঢ় মেঘ। তারই ছায়া পড়েছে সৌধের গায়ে। এই মেঘটুকু ঝরেও পড়তে পারে ওখানে। তপ্ত প্রস্তর শীতল হবে। তাজমহল শুধু স্মৃতি—আর কিছু নয়।

ওই কক্ষে জরাজীর্ণ অবস্থায় যিনি রক্তমাংসের দেহখানা এখনো বজায় রেখেছেন, তিনিও স্মৃতি। ওঁর ভেতরে যেটুকু প্রাণের স্পন্দন রয়েছে, কান পেতে শুনলে তাজমহলেরও সেটুকু স্পন্দন ধরা পড়বে।

যা ছিল তার কিছুই নেই। আমি নিজেও কি নিজের স্মৃতি নই? কোথায় সেই বাদশাহ-বেগম, যার প্রতাপে এককালে দিল্লির হারেম কাঁপত! নেই। সে নেই। হারিয়ে গিয়েছে। শুধু পাথরের সৌধে পরিণত হতে বাকি আছ তার আর সাজাহানের। সাজাহানের সাধের রক্তবর্ণের সমাধি আর শেষ হয়ে ওঠেনি তাজমহলের অপর পারে। কোথায় তাঁর স্থান হবে জানি না। সবই নির্ভর করছে নবীন গৌরবর্ণ বাদশাহ 'আলমগীরের' ইচ্ছার ওপর।

কিন্তু আমি চাই না আমার দেহের ওপর পর্বতপ্রমাণ পাষাণসৌধ। আমি চাই সবুজ ঘাস আমার এই বহু প্রতীক্ষার সার্থক দেহখানিকে ঢেকে রাখুক। প্রস্তরের তাপ আমার এ-দেহ সহ্য করতে পারবে না— যত অর্থই ব্যয় হোক তাতে। ছত্রশালের দেহখানা কোথায় হারিয়ে গিয়েছে জানি না। শুধু এটুকু জানি, তাঁর দেহাবশেষ তৃণগুল্মের সঙ্গেই জড়াজড়ি করে মাটিতে মিশে গিয়েছে। আমার বেলাতেও তাই চাই। যদি ক্ষমতা থাকত, সামুগড় প্রান্তরের কোনো এক স্থানে আমাকে ফেলে রেখে আসার নির্দেশ দিতাম। কিন্তু তা সম্ভব নয়। আমি বাদশাহ-বেগম নই—আমি তার স্মৃতি।

বাইরে ছায়া পড়ে। কোয়েল এসেছে। সে ছাড়া আর কেউ নেই। সবাই চলে গিয়েছে। আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়েছে বলে তাদের তো হয়নি। তারা সুপারিশ করে আগ্রা থেকে দিল্লিতে বদলি হয়েছে। পরিবর্তে এসেছে কয়েকজন বৃদ্ধা, অক্ষম নাজীর। কোনো কাজ তাদের দিয়ে করানো সম্ভব নয়।

—শাহজাদী। বাদশাহের দাওয়াই খাবার সময় হয়েছে।

—ও। চলো কোয়েল। আচ্ছা কোয়েল, একটা কাজ করতে পারবে?

—বলুন।

—আমি যখন থাকব না তখন আওরঙজেবের হাতে এক টুকরো লেখা দিতে পারবে?

—কার লেখা?

—আমার। আমি লিখে দেব। আমার সমাধিতে সেটুকু যদি ও উৎকীর্ণ করার অনুমতি দেয়—

—কিন্তু আপনিই কি আগে যাবেন?

—তা বটে। তুমিও তো আগে যেতে পার. তোমার কথা আমার মনে হয়নি কোয়েল।

—তা হোক। আপনি আমাকে দেবেন। আমি ব্যবস্থা করব।

—আচ্ছা কোয়েল, তোমার শিল্পীকে তো দাহ করা হয়েছিল।

—হ্যাঁ শাহজাদী।

—তারপর তুমি কি করলে?

—দেহাবশেষ নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল। আমি হাতে করে নিয়ে এসেছিলাম কিছু।

—কি করলে সেটুকু?

—বাড়ির আঙিনায় মাটির নিচে শিল্পীরই গড়া একটি পাত্র রেখেছি। ওপরে লাগিয়েছি একটি শিউলি গাছ।

—সুন্দর। আমারও অমন হলে বেশ হ'ত কোয়েল।

—শাহজাদী!

—শিল্পীও আমার মূর্তি গড়ে গেলে বেশ হ'ত, তাই না?

—হ্যাঁ শাহজাদী! তারও কোনো ক্ষোভ থাকত না।

—আমি তার সঙ্গে ঠিক দেখা করতাম কোয়েল। তখনও ছত্রশালকে দেখিনি। শিল্পী আমার জীবনের প্রথম পুরুষ। তবু তোমার কথা শুনে বিদায়ের সময়ও দেখা করতে পারিনি। তুমি বলেছিলে,

চাঁদ কি মাটিতে নেমে আসতে পারে? পারে কোয়েল, নিশ্চয়ই পারে। তুমি বিশ্বাস কর, পারে।

—আমি এখন বিশ্বাস করি শাহজাদী। তখন আমার বয়স কম ছিল। অনেক কিছুই বুঝতাম না।

—কোয়েল!

—বলুন শাহজাদী।

—তোমার মুখে বয়সের রেখা পড়েছে। আমারও পড়েছে, তাই না?

—না শাহজাদী। কোনো রেখা পড়েনি। তবে বয়স হয়েছে বোঝা যায়।

—এখন ছত্রশাল যদি হঠাৎ এসে দেখত, মুখ ফিরিয়ে নিত?

—তা কি হয় শাহজাদী? আপনি যে তার আপন। তাঁর আত্মার সঙ্গে আপনার আত্মার সম্পর্ক।

—আমি তা জানি কোয়েল, আমি তা জানি। তবু একথা তোমার মুখে শুনতে সাধ হলো। শুনতে বড় ভালো লাগে।

ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে পিতার কক্ষে প্রবেশ করি। শয্যার ওপর ভূতপূর্ব শাহানশাহ সাজাহানের স্মৃতি। নীরব। নিস্পন্দ। দাওয়াই নিয়ে তাঁর মুখের ওপর ঝুঁকে ডাকি,—বাবা।

কয়েকবার ডাকার পরে তাঁর চেতনা হয়। যেন কতদূর থেকে আস্তে আস্তে বলেন,—কে? মমতাজ?

—আমি। জাহানারা।

—জাহানারা।

—বাবা!

অর্ধচেতন অবস্থায় হাত উল্টে তিনি বলেন,—নেই।

—কি নেই বাবা?

দুর্বল কণ্ঠেও আনন্দের রেশ ধ্বনিত হয়। বলেন—আপেল।

—কোন্ আপেল বাবা?

—সেই? কে যেন দিয়েছিল।

আজকাল এমন সব কথা তিনি বলেন। তাই মৃদু গলায় বলি,—আমি এনে দেব বাবা।

—না। আর আসবে না। বাঁচলাম। মমতাজ বড় কাঁদছিল।

হঠাৎ খেয়াল হয়, পিতার হাতের আপেলের সুঘ্রাণ নেওয়া হয়নি বহুদিন। হাতখানা নাকের সামনে নিতেই বুক কেঁপে ওঠে। যেন মৃত্যুর গন্ধ ভেসে উঠেছে হাতে। আমার হাত থেকে তাঁর হাতখানা খসে পড়ে।

এবারে তিনি ঝাপসা দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলেন,—নেই। আমি জানতাম। মমতাজ কাঁদতে কাঁদতে বলে গেল,—নেই।

—তোমার আনন্দ হচ্ছে বাবা?

—হ্যাঁরে, তোর হচ্ছে না?

—তোমার কথা ভেবে আনন্দই হচ্ছে। কিন্তু আমি কি করব?

পিতার রোগ পাণ্ডুর মুখেও যেন বিষাদের ছায়া নেমে আসে। একটু পরে অতি কষ্টে বলেন, —ছত্রশালের কথা এখনো ভাবিস জাহানারা?

—হ্যাঁ বাবা। সবসময়।

—তাই ভাবিস। শান্তি পাবি। আর প্রার্থনা করিস আল্লার কাছে।

একটু ছট্‌ফট্ করেন তিনি। দাওয়াই খাইয়ে দিই। তারপর বলি,—তুমি কথা বলো না বাবা।

—শোন্ জাহানারা। আয়, কাছে আয়। একেবারে মুখের সামনে কান নিয়ে আয়।

—বলো বাবা!

—তোকে অনেক—অনেক আগে কিতাব দিয়েছিলাম। মনে আছে?

—হ্যাঁ বাবা!

—লিখতিস?

—হ্যাঁ লিখতাম।

—আমার মাঝে মাঝে বড় ইচ্ছে হ'ত শুনতে। কিন্তু তুই নিজের কত কথা লিখেছিস ভেবে কিছু বলতাম না।

—সে কিতাব এখনো আছে বাবা। এখনো লিখি। রোশনারারটা তো আমি নিয়েছিলাম। আর মাত্র তিন-চার পাতা বাকি।

পিতার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। বলেন,—তোকে আমার চিনতে ভুল হয়েছিল, জাহানারা। তুই তো ঠিক আমার মেয়ে নোস, তুই মমতাজের মেয়ে। তোকে চিনতে পারিনি।

—ওসব কথা থাক বাবা।

—কি লিখেছিস, জাহানারা?

—সব। যা দেখেছি—যা ভেবেছি, সব। তবে একটা ঘটনা কিতাব থেকে বাদ দিতে হবে বাবা। আজই বাদ দিয়ে দেব।

—কোন্ ঘটনা?

—খলিলুল্লা খাঁয়ের বেগমের সঙ্গে তোমাকে নহরী-বেহেস্ত-এ দেখেছিলাম।

—না, না। বাদ দিস না। খুব ভালো করেছিস লিখে। দোষগুণ মিলিয়েই তো মানুষ। কত দোষ থাকে মানুষের মধ্যে। তবু কোনো কোনো মানুষের এমন একটা গুণ বড় হয়ে ওঠে, যার ফলে তার অন্য দোষ ঢাকা পড়ে যায়।

—তুমি আর কথা বলো না বাবা। তোমার শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে।

—আর একটু। কতদিন আমরা এখানে আছি জাহানারা?

—কোয়েল বলে, সাত বছর হতে চলল।

—সাত বছর! অনেকদিন। তুই বরং গোপনে আওরঙজেবকে একটা চিঠি লিখে দে। শত হলেও মুঘলবংশের ধারা তারই মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হবে। লিখে দে—আমি দেখা করতে চাই। আর, আর সে এলে মণিমাণিক্যগুলো দিয়ে দিস। বেচারার ঘুম হচ্ছে না।

—দেবো বাবা। তুমি চুপ কর।

পিতা মুখখানা বিকৃত করে চুপ করেন। আমি চলে যাই ঘরে ছেড়ে। আমি থাকলে ঝোঁকের মাথায় বড় বেশি কথা বলেন।

আওরঙজেব এসে পৌঁছবার আগেই সব শেষ হয়ে যায়।

পত্রখানা ঠিক সময়েই লিখেছিলাম? তবু আওরঙজেব শেষ সময়ে শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হতে পারেনি। নবীন বাদশাহের সঙ্গে ভূতপূর্ব বাদশাহের শেষ সাক্ষাৎ হলো না। পিতার অন্তিম ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে গেল।

শবযাত্রার ব্যবস্থা করব কি না ভাবি। কোথায় সমাধিস্থ করা হবে, তাও ভাবি। এমন সময়ে এক অশ্বারোহী খবর আনে আওরঙজেব আসছে।

অপেক্ষা করি তার জন্যে শবদেহের পাশে। বহুমূল্য আতরে সিঞ্চিত করি তাঁর শয্যা। আর পিতার মণিমাণিক্যের পেটিকা থেকে তাঁর অতি প্রিয় কতগুলি মণি একটি সুবর্ণনির্মিত কৌটায় করে তাঁর পাশে রাখি।

আওরঙজেব এসে উপস্থিত হয়! অন্তিম শয়ানে শায়িত শাহানশাহ সাজাহান। বাদশাহ আলমগীর তার সামনে কিছুক্ষণ অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে। মুহূর্তের জন্যে হয়তো তার মধ্যে এক ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়েছে। তার চোখের সামনে দিয়ে হয়তো অতি দ্রুত ভেসে চলেছে অতীতের অনেক স্মৃতি।

কক্ষে আর কেউ নেই। সবাই অপেক্ষা করছে বাইরে।

আমি কর্তব্যমুক্ত। পৃথিবীতে আমার আর কিছুই করার নেই। আগেও কখনো কিছু করতে পারিনি। তবু শাহানশাহ সাজাহানের পাশে পাশে থেকে তাঁকে যদি সামান্য সাহায্যও করতে পেরে থাকি, যদি তাঁকে সামান্য শান্তিও দিতে পেরে থাকি সেইটুকুই যথেষ্ট। আল্লা হয়তো তার চেয়ে বেশি কিছু করার জন্যে আমাকে পাঠাননি।

আওরঙজেব হঠাৎ নিজেকে ছিনিয়ে নেয় পিতার কাছ থেকে। সে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়।

—জাহানারা।

আমি মুখ তুলি।

—বাবার কাছে যে অমূল্য রত্নরাজি ছিল সেগুলো নিশ্চয়ই তুমি নিয়েছ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু জানো, সেগুলোর ওপর তোমার অধিকার বিন্দুমাত্রও নেই।

আমার ওষ্ঠ কেঁপে ওঠে ওর কথায়। অতি কষ্টে অশ্রু সংবরণ করে বলি,—আমি তো নিইনি আওরঙজেব, আমি রেখেছি। বাবা তোমাকে দেবার জন্যে আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গিয়েছেন। তুমি তো মৃত্যুর আগে পৌঁছতে পারনি।

—কোথায় সেগুলো?

—এখনি চাও আওরঙজেব?

—হ্যাঁ।

আমি ধীরে ধীরে কক্ষের এক গুপ্তস্থান থেকে পেটিকাটি এনে আওরঙজেবের সামনে রাখি। আমার পা কাঁপছিল, আমার হাত কাঁপছিল। আমি নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না ওর মনের দৈন্য দেখে। তবু শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকি।

চেয়ে দেখি মৃত পিতার শবদেহের পাশে তাঁরই একমাত্র জীবিত পুত্র কিরকম আকুল হয়ে পেটিকা হাতড়াতে থাকে।

—কয়টি জিনিস পাচ্ছি না জাহানারা। বাবার প্রিয় জিনিসগুলোই নেই। তুমি আমার সঙ্গে তামাশা করছ?

শবদেহের পাশে দেখিয়ে বলি,—দেখতো ওগুলো কি না?

ওগুলো শাহানশাহ সাজাহানের প্রিয় ছিল। তাই তাঁর সঙ্গেই দিয়েছিলাম।

আওরঙজেব তাড়াতাড়ি সুবর্ণনির্মিত কৌটাটি তুলে নিয়ে খুলে ফেলে। ভেতর থেকে নানান বর্ণের জ্যোতি বার হয়। সে আমার দিকে যেন অবাক হয়ে চায়। কেন অবাক হলো বুঝি না।

অনেক পরে কম্পিত স্বরে বলে,—এগুলো তুমি ওঁর সঙ্গে পাঠাচ্ছিলে জাহানারা?

—হ্যাঁ আওরঙজেব। আমার ভুল হয়েছিল। উনি তো মৃত।

—তোমার নিজের কোনো লোভ নেই?

—সে কি আওরঙজেব। আমার লোভ থাকবে কেন?

—এগুলো যে অমূল্য।

—ও, অমূল্য। ভালোই হলো তুমি এসে। নইলে মাটির নিচে নষ্ট হ'ত।

আওরঙজেব তার দুটো হাত আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে আবার পেছনে টেনে নেয়। কী যেন ভাবে সে।

কিছুক্ষণ পরে বলে,—তুমি আমাকে সোজাসুজি কখনো তিরস্কার করনি জাহানারা। হয়তো তিরস্কারই করনি। যা শুনেছি সবই রোশনারার বানানো কথা। তবু আর একটি কাজ আমি করব, যার জন্যে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে রাখছি। জাহানারা, তোমার কাছে আমার চরিত্রের কিছুই লুকানো থাকতে পারে না জানি। তোমার বুদ্ধি ক্ষুরধার। তুমি জানো বাদশাহীতে আমার প্রলোভন, ধর্মের ওপর প্রলোভনের চেয়ে অনেকগুণ বেশি। আমার বাদশাহী বিপন্ন হোক আমি তা চাই না। তাই পিতার শবদেহ পেছনের প্রাচীর ভেঙে নিঃশব্দে নিয়ে যাওয়া হবে। কারণ তাঁর মৃতদেহ সবাই দেখলে আমার বিরুদ্ধে ভয়াবহ বিদ্রোহ ঘটতে পারে। তার পরিণামে অনেক কিছুই হতে পারে।

আমি চুপ করে থাকি।

—কথা বলো জাহানারা।

—তোমার যা অভিরুচি।

—আমি মমতাজ বেগমের পাশেই তাঁর সমাধির ব্যবস্থা করেছি!

আমার চোখ দুটি সজল হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে বলি,—তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ আওরঙজেব।

মমতাজ বেগম এতদিন ছট্‌ফট্‌ করে এখন সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন। বহুদিন পরে প্রিয়তমকে পেয়ে তিনি নিশ্চিন্ত। আর কিছুই তিনি চান না। অনেক কিছু তিনি চেয়েছিলেন—কিন্তু না পাওয়ার বেদনা বার বার তাকে আঘাত করেছে। তাই সব চাইতে যা কাম্য সেটুকু পেয়েই তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। একটু দূরেই, দুর্ভাগ্যের রিক্ত ললাট নিয়ে যে পুত্র তাদের জন্মগ্রহণ করেছিল, তার মস্তক প্রোথিত রয়েছে। তিনি সে কথাও ভুলেছেন। যাকে নিয়ে জীবন শুরু, তাকে নিয়েই শেষ! মাঝখানের সব কিছু মায়া—প্রপঞ্চ। সূর্যের আলো পড়ে তাজমহল তাই হাসছে। তাজমহল আর কাঁদবে না কখনো।

হতভাগী জাহানারার কথাও কি মমতাজের মনে নেই? পিতা বলেছিলেন আমি তো তাঁরই মেয়ে। আমি মমতাজ-দুহিতা জাহানারা।

না, মনে নেই। শুধু মমতাজের কেন, সেদিন অবধি যাঁকে আগলে রেখেছি সেই বাদশাহেরও মনে নেই। কিন্তু—

হ্যাঁ, তার ঠিক মনে আছে। সে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তার দেহের পাশে আমার দেহের স্থান হবে না জানি। কিন্তু সেই শেষ বিচারের দিনে আমার পাশে এসে সে দাঁড়াবেই। সে আমার—সে শুধু আমার।

প্রাসাদের বাইরে কলরব। দিল্লি যাবার আয়োজন চলছে। আওরঙজেব আমার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে। আমাকে আবার দিল্লিতে নিয়ে যাবে সে। সব কিছু প্রস্তুত।

বদ্ধ কক্ষে শুধু আমি আর কোয়েল। আমি আমার দ্বিতীয় কিতাবের শেষ পৃষ্ঠায় দ্রুত লেখনী চালিয়ে যাচ্ছি। আজই শেষ।

জেসমিন প্রাসাদের এই প্রকোষ্ঠে আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি। তবু তারই মধ্যে আমি লিখে চলেছি।

কোয়েল পাশে এসে দাঁড়ায়।

—দাঁড়াও কোয়েল। আর একটু বাকি।

—আপনার সেই লেখাটি বাদশাহ আলমগীরের হাতে দিয়েছি।

—কোন্‌ লেখাটি?

—যেটি আপনার সমাধিতে উৎকীর্ণ করতে বলেছেন। আমি পড়েছি। বহুদিন পরে যারা আপনার সমাধির পাশে এসে দাঁড়াবে তারা যে চোখের জল না ফেলে পারবে না। অত করুণভাবে কি লিখতে হয় শাহজাদী?

কোয়েল কেঁদে ফেলে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। আমি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে তার কান্না দেখি। কাউকে তো কাঁদাতে চাইনি আমি।

কোয়েল নিজেকে সামলে নিয়ে আপন মনে লেখাটি বলে চলে ঃ

'তৃণগুচ্ছ ছাড়া আর কোনো আস্তরণ করো না আমার সমাধির ওপর। অবনমিতার সমাধিটুকু ঢেকে রাখুক শুধু তৃণ।'

কোয়েল আবার চোখের জল ফেলে। কেন সে কাঁদে আমি বুঝি না। যে তৃণ আমার রাজাকে ঢেকে রেখেছে, সেই তৃণই যে আমার পরম কাম্য।

—শাহজাদী! বাদশাহ আলমগীর সেটি পড়ে অবাক হয়ে আমার দিকে চাইলেন। তারপরে সযত্নে রেখে দিলেন।

—ও। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাব না কোয়েল। তাতে তুমি খুব ছোট হয়ে যাবে। আমি শাহজাদী বটে, কিন্তু নারী হিসেবে আমি তোমার চেয়ে অনেক নিচে। আশীর্বাদ কর যেন শেষদিন পর্যন্ত আমি রাজার কথা ভাবতে পারি। তার কথা ভাবতে ভাবতেই যেন আমার আয়ু ফুরিয়ে যায়।

—শাহজাদী, আপনি হিন্দু হলে বলতাম, পরজন্মে তিনি আপনারই অপেক্ষায় রয়েছেন।

আমার চোখে আনন্দের বান আসে। লিখতে পারছি না। তবু লিখাতে হবে। প্রতিটি কথা লিখতে হবে। এই কয়টি কথাই শেষ কথা।

—কোয়েল। তুমি বাংলায় ফিরে যাচ্ছ। শিউলি গাছের গোড়ায় জল ঢেলে তোমার দিন কাটবে। শেষে একদিন তুমিও ওখানকার নদীর জলে গিয়ে মিশবে। তুমি কত সুখী। তোমাকে আমার হিংসে হচ্ছে কোয়েল।

কোয়েল চোখের জল মুছে কিতাব দু'খানার জন্য হাত বাড়িয়ে বলে,—দিন শাহজাদী।

তাকে বলেছি, গোপনে জেসমিন প্রাসাদের এক শিলাতলে কিতাব দু'খানা লুকিয়ে রাখবে সে। এমনভাবে লুকিয়ে রাখবে যাতে বাদশাহ আলমগীর থাকতে ও দুটির সন্ধান না পায়। এই আমার শেষ সম্বল—বাদশাহের কোষাগারের সমস্ত রত্নের চেয়েও এর মূল্য আমার কাছে অনেক বেশি। এতে মা রয়েছেন, বাবা রয়েছেন, ভাইরা রয়েছে—আর রয়েছে রাজা ছত্রশাল। এ জিনিস কি আওরঙজেবের লাল হাতে অর্পণ করতে পারি। সে যে বিষ দেবে একে। না, না—

বাইরে দরওয়াজায় ধাক্কা শুনি। সঙ্গে সঙ্গে আওরঙজেবের কণ্ঠস্বর। ডাকছে সে আমাকে। বুক কেঁপে ওঠে। আর লেখাও যাচ্ছে না। ঘর অন্ধকার। কোয়েলের মুখ অস্পষ্ট। সূর্য অস্তমিত।

এবার আগ্রা ছেড়ে যাবার সময় কেউ আর বাধা দেবে না। মা-বাবা কেউ না। নূরজাহান? দারা? নাদিরা? কেউ না। সুলেমান—সিপার? তারাও নয়। কেউ নেই। একা আমি।

তবে আমি চলি।

—নাও কোয়েল। চুপ্ করে লুকিয়ে ওই গোপন পথ দিয়ে চলে যাও। কেউ যেন দেখতে না পায়। যাও। ওরা এক্ষুনি দরওয়াজা ভেঙে ফেলবে। যাও কোয়েল। আমার সর্বস্ব তোমায় দিলাম। ওভাবে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলো না আর। চুপি চুপি ওই পথে চলে যাও। কেউ চেনে না 'ও পথ'। আওরঙজেবও নয়।